

GOVERNMENT OF INDIA  
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL  
ARCHÆOLOGICAL  
LIBRARY

ACCESSION NO 19840.

CALL No. 181.43/Tor.





GOVERNMENT OF INDIA  
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL  
ARCHÆOLOGICAL  
LIBRARY

ACCESSION NO. \_\_\_\_\_

CALL No. \_\_\_\_\_

D.G.A. 79

সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

Nayaya-darsana  
ন্যায়দর্শন

(গৌতমসূত্র) Gautama sutra

বাংলায় স্যায়ন ভাষ্য

ও Vaytsyayana

বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত

Bhasya  
with translation

প্রথম খণ্ড

First Part

19840

Phani Bhushan Tarkabagisa

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

D3422



10:

D3445

77/33

কলিকাতা, ২৪৩১ নং আপার সাকুলার রোড,

Calcutta

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

Vandya Sahitya

প্রকাশিত

Parisod Mandir

181.43

বঙ্গাব্দ ১৩২৪

B.S. 1324

Tar

(93)

মূল্য—

সদস্ত পক্ষে— ১৫  
সাধা-সভার  
সদস্ত পক্ষে— ২৫  
সাধারণ পক্ষে— ২৫

D3422



কলিকাতা,  
২৪নং ব্রাহ্মবাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির বসে,  
ঐতিহ্যচরিত্র রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL  
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 19840.....

Date .. 22.6.63.....

Call No..... 181.43 / Tax. 3



# ভূমিকা

## জ্ঞানদর্শনের পরিচয় ও প্রয়োজনাদি

যে বড় দর্শন পুণ্যভূমি ভারতের অপূর্ণ অধ্যাত্ম-জ্ঞানগৌরবের গৌরবময়, বিশ্বময় বিজয়-পতাকারূপে আজিও দীর্ঘদর্শীকে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র নীলা দর্শন করাইতেছে, জ্ঞানদর্শন তাহারই অন্ততম দর্শনশাস্ত্র। জীবের পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভে আত্মাদি পদার্থের যে দর্শন বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার চরম কর্তব্য ও পরম কর্তব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহার জন্ত প্রথমে শাস্ত্র-দ্বারা আত্মাদি পদার্থের শ্রবণরূপ উপাসনা, তাহার পরে হেতুর দ্বারা মনন অর্থাৎ স্বার্থ অনুমান-রূপ উপাসনা, তাহার পরে নির্দিষ্টাশন অর্থাৎ ধ্যানাদিরূপ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে<sup>১</sup>, জ্ঞানশাস্ত্র ঐ আত্মাদি দর্শনের সাধন-মননরূপ দ্বিতীয় উপাসনা নির্বাহরূপে মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হওয়ায় দর্শনশাস্ত্র নামেও অভিহিত হইয়াছে। আত্মাদি পদার্থের শ্রবণের পরে যুক্তির দ্বারা তাহার যে “টেকা” বা মনন অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মতরূপে অনুমান, তাহাকে “অবীক্ষা” বলে। এই অবীক্ষা নির্বাহের জন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহা “আবীক্ষিকী” নামে অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী অনুমানকে “অবীক্ষা” বলে, “জ্ঞান”ও বলে। ঐ অবীক্ষা বা জ্ঞানের জন্ত অর্থাৎ উহাতে যে সকল পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, তাহা সম্পাদন করিয়া উহা নির্বাহের জন্ত যে বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ জন্ত আবীক্ষিকী বলে, জ্ঞান-বিদ্যা বলে, জ্ঞানশাস্ত্র বলে; এই আবীক্ষিকী বিদ্যা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্ম-বিদ্যা। এই আবীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের নিরূপণ করিয়াছে, তর্কশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে; এ জন্ত ইহাকে তর্কবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রও বলে। ইহা “জ্ঞান” ও “তর্ক” নামেও উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ অক্ষপাদ মহর্ষি-সূত্রগ্রন্থের দ্বারা এই আবীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি ইহার স্রষ্টা নহেন। আবীক্ষিকী বিদ্যা বেদাদি বিদ্যার জ্ঞান বিশ্বস্রষ্টার অমুগ্রহ-দান। মহাজ্ঞানেতে পাওয়া যায়, নীতি, ধর্ম ও সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্ত দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান্ শত সহস্র অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি বহু বিষয় এবং জ্যোতি, আবীক্ষিকী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্বিধ বিপুল বিদ্যা দর্শিত হইয়াছে<sup>২</sup>। ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্তায়নও বলিয়াছেন যে, প্রামিগণ বা মানবগণকে অমুগ্রহ করিবার জন্ত (ত্রয়ো প্রভৃতি) এই চারিটি বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাদিগের মধ্যে চতুর্থী এই আবীক্ষিকী জ্ঞানবিদ্যা। শ্রীমদ্-

১। আত্মা বা অগ্নি স্রষ্টাঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নির্দিষ্টাশিতব্যো মৈত্রৈয়াস্কনো বা অগ্নে দর্শনেন শ্রবণেন মতাঃ বা বিজ্ঞানেনেব সর্বং বিদিতম্।—বৃহস্পরশাখা ২।৪।২। শ্রোতব্যঃ পূর্করাচার্য্যাত আগমততঃ। পশাদান্তব্যাবর্ততঃ।—শঙ্করভাষ্য।

২। ত্রয়ো চাবীক্ষিকী চৈব বার্তা চ দণ্ডতর্কতঃ। দণ্ডনীতিক বিপুল বিদ্যাপ্তত্র নির্বর্তিতাঃ।—শান্তিপর্ক ৪২।৩৩।



ভাগবতে পাওরা যায়, আত্মিকী, অরী বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্বিধ বিদ্যা এবং ব্যাকৃতি ও  
 ঞ্জব বিশ্বস্তার জদয়াকশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে<sup>১</sup>। তাই বলিয়াছি, আত্মিকী বিদ্যা  
 বিশ্বস্তার অন্তর্গত-নাম। ছানোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম ধ্রুও পাওরা যায়, কোন  
 সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিদ্যা-প্রার্থী হইলে, সনৎকুমার বলিলেন,  
 “তুমি কি কি বিদ্যা জান, তাহা অশ্রে বল; তাহার পরে তোমার অজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ করিব।”  
 তত্ক্ষণে নারদ বলিলেন,—“আমি সৃগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ষবেদ জানি,  
 পঞ্চম বেদ ইতিহাস, পুরাণও জানি এবং ঐ সমস্ত বেদের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রও জানি।  
 পিত্রা (শ্রাদ্ধকর), রাশি (গণিত), দৈব (উৎপাতবিদ্যা), নিবি, (মহাকালাদি নিখিশার),  
 বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা [বেদান্ত  
 শিকাকরাদি], ভূতবিদ্যা [ভূততত্ত্ব], ক্ষত্রবিদ্যা [ধনুর্বেদ], নক্ষত্রবিদ্যা [জ্যোতিষ], সর্পবিদ্যা  
 [গারুড়], দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ গন্ধযুক্তি নৃত্য-গীত, বাদ্যশিল্পাদি-বিজ্ঞান, এই সমস্তও জানি<sup>২</sup>।  
 নারদের অধিগত কথিত বিদ্যার মধ্যে যে “বাকোবাক্য” আছে, ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার  
 ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্”। সংহিতাকার মহর্ষি কাত্যায়ন প্রত্যহ বাকোবাক্য  
 পাঠের ফল কীর্তন করিয়াছেন<sup>৩</sup>। সংহিতাকার গৌতম বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতে বেদাদি  
 শাস্ত্রের সহিত বাকোবাক্যে অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন<sup>৪</sup>। কোষকার অমরসিংহ আত্মিকী  
 শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—‘তর্কবিদ্যা’<sup>৫</sup>। আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যায়সারে আত্মিকী বিদ্যাকেই  
 বাকোবাক্য বলিয়া বুঝা যায়। মহাভারতের সভাপর্কে বহুশ্রুত নারদের বিদ্যার বর্ণনায় নারদকে  
 পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়বাক্যের গুণ-দোষবেত্তা বলা হইয়াছে<sup>৬</sup>। গৌতম জ্ঞায়শাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ববৃক্ত  
 জ্ঞায়বাক্যের অসুকুল তর্করূপ গুণ এবং হেতুভাস প্রভৃতি দোষ নারদ জানিতেন। টীকাকার  
 নীলকন্ঠও সেখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে নারদের পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়বিদ্যার পাণ্ডিত্য  
 বর্ণিত হওয়ার ছানোগ্যোপনিষদে বর্ণিত নারদের অধিগত তর্কশাস্ত্রকে পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়বিদ্যা বলিয়া

১। আত্মিকী অরী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।

এবং ব্যাক্তয়শ্চাসন্ অথবা অস্ত দ্ব্যতঃঃ—ভূতীয় স্বত্ব। ১২।৪৪।

জায়দীনাং পূর্বাধিক্রমণোৎপত্তিমাং আত্মিকীকীতি। আত্মিকীকীতি। যোজ-ধর্মকামার্থবিদ্যাঃ। দ্ব্যতঃঃ  
 জদয়াকশাং।—স্মিটীকা।

২। সৃগ্বেদঃ ভগবোহযোনি যজুর্বেদঃ সামবেদমাধর্ষকং চতুর্থং, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্রাঃ,  
 রাশিঃ দৈবঃ নিবিঃ বাকোবাক্যেসকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাসমতন্-  
 ভগবোহযোনি”। ৭।১।২।

৩। সাংস্কীরৌপনমস্তুজাভিস্তর্পয়েৎ পঠন্। বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চাখহং। ১০শ গণ্ড। ১১।

৪। স এন বহুশ্রুতো ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্যাকোবাক্যকোতিহাসপুরাণকুশলঃ। ইত্যাদি। অষ্টম অঃ।

৫। আত্মিকী দণ্ডনীতিস্তর্কবিদ্যাশাস্ত্রয়োঃ।—অমরকোষ। স্বর্গবর্গ। ১৫৫।

৬। পঞ্চাবয়ববৃক্ত বাক্যস্ত গুণদোষবিৎ।—সভাপর্ক। ৫।৫।



বুঝা যাইতে পারে। কারণ, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিবে, ইহা মহাভারতই বলিয়াছেন<sup>১</sup>। অল্প উপনিষদেও বেদাদি বিদ্যার সহিত জ্ঞানবিদ্যারও উল্লেখ দেখা যায়<sup>২</sup>। জ্ঞানস্বত্ব-বৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথ “জ্যোতীর্নামাংসা বর্ষশাস্ত্রাণি” এই বাক্যটি স্মৃতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতি ও পুরাণে জ্ঞানবিদ্যা চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত<sup>৩</sup> হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনায় যে “জ্ঞানবিস্তর” বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞান, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানতত্ত্ব, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। জ্ঞানমঞ্জরীকার মহামনীষী জয়ন্ত ভট্ট ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যাই ঐ জ্ঞানবিস্তর শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত, উহাই আত্মিকী। বৈশেষিক ঐ জ্ঞানশাস্ত্রের সমান তত্ত্ব, স্মৃতিরূপ বৈশেষিকের আর পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু জ্ঞান না বলিয়া “জ্ঞানবিস্তর” কেন বলা হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যিক। পরন্তু মহাভারত বলিয়াছেন,—“জ্ঞানতত্ত্ব অনেক”।<sup>৪</sup> মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,—বৈশেষিক, জ্ঞান, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু ও সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের ভূমিকায় মহাভারতের ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞান-বৈশেষিকাদির সহিত ব্রহ্মনীমাংসাও যে অংশবিশেষে জ্ঞানতত্ত্ব, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যা ভিন্ন কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা বিশেষেরও আত্মিকী নামে উল্লেখ দেখা যায়। ভগবানো বট অবতার দত্তাত্রেয় অলক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে “আত্মিকী” বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে<sup>৫</sup>। দত্তাত্রেয়-প্রোক্ত ঐ আত্মিকী যে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা, উহা গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যা নহে, ইহা স্বীকার করা যায় না। শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও উহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “প্রাণতোষিণী” নামক তত্ত্ব-সংগ্রহকার,

১। ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্ বেদং সনুপবৃহৎ২। বিস্তৃতজ্ঞানভাষ্যেণো নামগ্নং প্রহরিত্যতি। আদিপর্ব, ১ম অঃ (২৩৭)।

২। তৈত্তির্য্যতন্ত্র মহতো ভূতত্ত্ব নিঃসৃতিমবেতদৃগুৎসো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা কলো বাকরবঃ নিরুক্তং হনো জ্যোতিসামরবঃ জ্যোতীর্নামাংসা বর্ষশাস্ত্রাণি ইত্যাদি। সুবালোপনিষৎ। ২য় খণ্ড।

৩। পুরাণজ্ঞাননীমাংসা-বর্ষশাস্ত্রাঙ্গমিহিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং বর্ষশাস্ত্র চ চতুর্দশ। বাজবল্ক্যসংহিতা (১১)৩

অঙ্গানি চতুরো বেদা নীমাংসা জ্ঞানবিস্তরঃ।

পুরাণং বর্ষশাস্ত্রক বিদ্যাশ্চেতাস্তচতুর্দশ।

আয়ুর্বেদো যজুর্বেদো সামর্কর্কশ্চৈতি তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্দশ বিদ্যাঃ স্তুতাদশৈব তু।—বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অঃ, ৩ অঃ।

৪। জ্ঞান-তত্ত্বাঙ্গনেকানি তৈত্তির্য্যতন্ত্রানি বাদিতিঃ।

হেতুগ্নম-সদাচারৈর্গুহ্যং তদুপাস্ততাঃ।—শাঙ্খিপর্ব (২১০)২২।

জ্ঞানতত্ত্বানি তাত্ত্বিক-বৈশেষিক-কাণিল-পাতঞ্জলানীনি। হেতুভূতিঃ, আপমো বেদঃ, সদাচারঃ প্রত্যক্ষং, তৈঃ প্রমাণৈঃ কুত্বা ঐতদ্ব্যুত্তিষ্ঠির্গুহ্য উক্তং তদুপাস্ততাঃ।—নীলকণ্ঠ।

৫। বটমত্রেয়পতাক্য বৃত্তঃ প্রাণোহনন্যহয়ঃ।

আত্মিকীমলকায় প্রহ্লাদাবিতা উচিহান্। ভাগবত (১১)১১১ আত্মিকীং আত্মবিদ্যা।—শ্রীধরস্বামী।



মহা বাঙ্গালী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দ্বিজেন্দ্র-প্রোক্ত আত্মিকিকী ও গৌতম-প্রকাশিত আত্মিকিকী এই উভয়েই আত্মিকিকী বলিয়া, তন্মধ্যে গৌতম জ্ঞানশাস্ত্রের নিন্দা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বচনাবলম্বনে অবতারণিত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন এবং মহাভারতের শাস্তিপর্বের যে শ্লোকের দ্বারা আত্মিকিকীর নিন্দা সমর্থন করা হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়া অন্তরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। তাহার মীমাংসায় বহু বক্তব্য থাকিলেও তিনি গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যা ও তাহার অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, ইহা সিদ্ধান্ত করেন নাই; পরন্তু তাহার প্রতিবাদই করিয়াছেন, এই মাত্রই এই প্রসঙ্গে এখানে বক্তব্য। অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য নাংথ্যকেও আত্মিকিকীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কথা পরে আলোচনা করিব। শাস্তিপুত্রের মহানবী, শ্রুতি ও জ্ঞান গ্রন্থের বহু টীকাকার রামামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য জ্ঞানসূত্রবিবরণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রবণের পরে ঈশ্বর অর্থাৎ বেদোপনিষৎ আত্মমনকে আত্মিকী বলে। তাহার নির্বাহক শাস্ত্র আত্মিকিকী, ইহা আত্মিকিকী শব্দের বৈশিষ্ট্য অর্থ। এই অর্থে অন্ত শাস্ত্রও আত্মিকিকী হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞানের বলবত্বাবশতঃ এবং উহাতেই আত্মিকিকী শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ থাকায় গৌতমীয় জ্ঞান-বিদ্যাতেই আত্মিকিকী শব্দের রুচি কর্তৃক করিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র-বোধ্যক আত্মিকিকী শব্দটি বৈশিষ্ট্য। তাহা হইলে কোন বৈশিষ্ট্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই কোন কোন অধ্যাত্মবিদ্যা বা মনন-শাস্ত্রও আত্মিকিকী নামে কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার বাংজ্ঞান আত্মিকিকী শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রথমেই বলিয়াছি, তদনুসারে গৌতম-প্রকাশিত জ্ঞানবিদ্যাই আত্মিকিকী। বাংজ্ঞানও জ্ঞানবিদ্যা ও জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া তাহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। এবং প্রমাণ ও প্রমাণ বলিলেই সকল পদার্থ বলা হয়, আবার পৃথক্ করিয়া সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ কেন বলা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বাংজ্ঞান বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ এই চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যার পৃথক্ গ্রন্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। গ্রন্থানের ভেদেই বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি ও আত্মিকিকী, এই চতুর্বিধ বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থান আছে। তন্মধ্যে আত্মিকিকীর গ্রন্থান সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ। উহা আর কোন বিদ্যায় বর্ণিত হয় নাই। উহার জ্ঞানবিদ্যার পৃথক্ গ্রন্থান কেন? উহাদিগের তৎ-জ্ঞানের প্রয়োজন কি? তাহা প্রথম সূত্র-ভাষ্যে বাংজ্ঞান বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান-বার্তিক উদ্যোতকর ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি জ্ঞানবিদ্যায় সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিদ্যা হইত না। তাহা হইলে ইহা কেবল মাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া জ্ঞানের অন্তর্গত হইত। ফলকথা, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি হইতে চতুর্থী যে আত্মিকিকী বিদ্যার উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, ঐ চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যা গৌতম-প্রকাশিত জ্ঞানবিদ্যা। ঐ বিদ্যা অক্ষপাদের পূর্ব হইতেই আছে। অক্ষপাদ সূত্রগ্রন্থের দ্বারা উহা বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার কর্তা নহেন। ইহাই বাংজ্ঞান, উদ্যোতকর প্রভৃতি জ্ঞানচার্যগণের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়।

আমরাও দেখিতেছি, মহাদি সংহিতাকার ঋষিগণ বিচার দ্বারা রাজ্য রক্ষার জন্য



রাজাকে ত্রয়ো, বার্তা ও দণ্ডনীতির সহিত চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকী শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন¹।

মহাদি স্ববিগণ যে উদ্দেশ্যে রাজাকে আত্মিকী বিদ্যার আলোচনা করিতে বলিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে উহা যে জ্ঞানবিদ্যা, তাহা বুঝা যায়। কুহুতট্টও মনু-বচনোক্ত আত্মিকীর অন্তরূপ কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। জ্ঞানসুত্রবৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও মনু-কৃত আত্মিকীকে জ্ঞানশাস্ত্রই বলিয়াছেন। মেধাতিথি প্রথমে তর্কবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র ঐতিহ্যিক আত্মিকী বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে ‘আত্মবিদ্যা’ আত্মিকীর বিশেষণ। রাজা আত্মহিতকরী তর্কশ্রয়া আত্মিকী শিক্ষা করিবেন। নাস্তিক তর্কবিদ্যা শিক্ষা করিবেন না। বস্তুতঃ মহাদি স্ববিগণ বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রকে অসংশয়িত বলিয়া তাহার অধ্যয়নাদিকে উপপাতকের মধ্যে গণ্য করায়² রাজার শিক্ষণীয়রূপে তাহাদিগের কথিত আত্মিকীকে নাস্তিক তর্কবিদ্যা বলিয়া বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু নাস্তিক গ্রন্থে “শাস্ত্র” শব্দের জ্ঞান নাস্তিক তর্কবিদ্যাতে আত্মিকী শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে তাহা হইয়াছে, ইহা আমরা মেধাতিথির কথার দ্বারাও বুঝিতে পারি এবং মহাদি সংহিতায় বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা দেখিয়া তদনুসারে মহাভারতেও নাস্তিক তর্ক-বিদ্যারই নিন্দা বুঝিতে পারি। মূলকথা, মনু-বচনে আত্মবিদ্যা আত্মিকীর বিশেষণ হইলেও ঐ আত্মিকী, জ্ঞানবিদ্যা হইতে পারে। কারণ, জ্ঞানবিদ্যা উপনিষদের জ্ঞান কেবল আত্মবিদ্যা না হইলেও আত্মবিদ্যা। কেবল আত্মবিদ্যারূপ কোন আত্মিকী আত্মিকী শব্দের দ্বারা রাজার শিক্ষণীয়রূপে কথিত হয় নাই, ইহা যাজ্ঞবল্ক্য ও গোতমের বচনের দ্বারাও বুঝা যায়। বিচারের জন্ত, বাদ-প্রতিবাদের জন্ত, যুক্তির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের জন্ত জ্ঞানবিদ্যায় অভিজ্ঞতা রাজার বিশেষ আবশ্যক। মহাভারতও রাজ-ধর্মবর্ণনায় রাজাকে শব্দ-শাস্ত্রাদির সহিত যুক্তি-শাস্ত্রও জানিতে বলিয়াছেন³। শ্রীরামচন্দ্র

১। মৈবিনোভাস্ত্রয়ী বিবাদদণ্ডনীতিক শাস্ত্রী।

আত্মিকীকাস্ত্রবিদ্যাঃ বার্তারভাষ্যে লোকঃ ১—মনুসংহিতা ৭।৪৩।

যরত্নধোপ্তাভিকিয়াঃ দণ্ডনীতায় তথৈব চ।

বিনীতস্বপ বার্তায়্যো ত্র্যাক্ষৈব মনুসংহিতাঃ ১—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।৩১১।

রাজা সর্বস্ত্রেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্য সাধুকামী

জ্ঞাৎ সাধুবাণী, ত্র্যাক্ষৈ আত্মিকীকাস্ত্রবিনীতঃ—গোতমসংহিতা ১।১ অঃ।

২। অসম্ভ্রান্তাধিগমনঃ কৌশিলবাস্ত চ ত্রিমা।—মনুসংহিতা ১।১।৩৬।

অসম্ভ্রান্তাধি চার্কাকনির্ঘঃ। যজ্ঞ ন প্রমাণঃ বেদঃ, ন কর্ম স্বলস্বদ্ব্যমপব্যতে।—মেধাতিথি। প্রতিস্থতি-বিরুদ্ধ-শাস্ত্রশিক্ষণঃ। কুহু কতট্ট।

অসম্ভ্রান্তাধিগমনমাকরেধিকারিতা।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩।২৪১।

৩। ত্র্যাক্ষৈপালনযুক্তস্ত ন কতি লভতে কচিৎ।

যুক্তি-শাস্ত্রক তে জেহ্য শব্দশাস্ত্রক ভারতঃ—অমুশাসন পর্ক, ১৩৪।১৪৮।

উত্তরোত্তর যুক্তিতে বৃহস্পতির স্থায় বক্তা ছিলেন, ইহা বাস্তবিক বর্ণন করিয়াছেন<sup>১</sup>। সেখানে বাস্তবিক স্থায়-শাস্ত্রোক্ত পারিতোষিক 'কথা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা রামাহুজের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যমুর্জের ও রাজনীতির সহিত আত্মিকিকী বিদ্যারও অবয়বন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে<sup>২</sup>।

মহাভারতের শাস্তিপর্বে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজাকে বলিয়াছিলেন যে,<sup>৩</sup> বেদান্ত-জ্ঞান-কোবিন বিশ্ববস্তু গন্ধর্ব্ব আমার নিকটে বেদ বিষয়ে চতুর্কিংশতি প্রশ্ন এবং আত্মিকিকী বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। আমি তাহার উত্তর দিবার জন্য চিন্তা করিতে একটু সময় লইয়া, সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করিয়া পরা আত্মিকিকীর সাহায্যে উপনিষৎ ও তাহার বাক্যশেষ অর্থাৎ উপসংহার-বাক্যকে মনের দ্বারা মনন করি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই চতুর্থা অর্থাৎ ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি ইহাতে চতুর্থা বিদ্যা আত্মিকিকী মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। এই বিদ্যা তোমাকে বলিয়াছি। বিশ্ববস্তু গন্ধর্ব্ব আত্মিকিকী বিষয়ে যে পঞ্চবিংশ প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে সৌতম নতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও সেই মোক্ষের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। স্মরণীয় বিশ্ববস্তুর প্রশ্ন যে অত্র কোন আত্মিকিকী বিষয়ে নহে, ইহা নীলকণ্ঠেরও স্বীকৃত। তাহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য যে চতুর্থা বিদ্যা

১। ..... ন বিগৃহ্য কথাক্রিঃ। উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা।—অমোঘাখ্যাপঃ। ২। ৪২। ৩।

২। সরস্বতঃ যমুর্জেরং ধর্ম্মান্ স্তায়পথায়ত্তথা।

তথা চাত্মিকিকীং বিদ্যাং রাজনীতিকং বহুবিধাং।—১০। ৪৪। ৪৪।

স্তায়পথান্ নীমাংসাদীনু। আত্মিকিকীং তর্কবিদ্যাং।—শ্রীবরদাসী।

৩। বিশ্ববস্তুস্ততো রাজানু বেদান্তজ্ঞানকোবিনঃ।

চতুর্কিংশত্যন্ততোহপুঙ্খং প্রশ্নান্ বেদস্ত পার্থিব।

পঞ্চবিংশতিম প্রশ্নং পঞ্চজ্ঞাত্মিকিকীং তদা। ২। ৭। ২৮।

তদ্ব্যাপনিসবকৈব পরিশেষক পার্থিব।

মণ্ড্যমি মনসা তাত তুষ্টি। চাত্মিকিকীং পরাং। ৩৩।

চতুর্থা রাজশার্দ্বল বিদ্যাং সাম্প্রদায়িকী।

উদীরিতা মহা ভুক্তাং পঞ্চবিংশতিযুক্তিতা।

এবা তেহাত্মিকিকী বিদ্যা চতুর্থা সাম্প্রদায়িকী। ৪৪।

বিশ্বোপেতাঃ ধনঃ কুত্বা ইত্যাদি। ৪৮।

অক্ষরদ্বয়ং প্রজননে ইত্যাদি। ৪৯। শাস্তিপর্ক। ৩১। ৮। ৮।

প্রবদন্ত ইক্ষা যুক্ত্যা আলোচনমর্থীনা তৎপ্রদানাত্মিকিকীং। ১২।

চতুর্থা, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতিকাপেক্ষ। সাম্প্রদায়িকী—মোক্ষায় হিতা। ৩৪।

বিশ্বোপেতাঃ ধনঃ আত্মিকিকী বিদ্যাঃ সহিতঃ ধনঃ.....সেবনবিদ্যা ধনঃ, তাং সোপগন্তিকঃ সম্পাদ্য প্রবদন্তমনে কুর্বেতি ভাবঃ। ৪৮। প্রজননে অনিত্যার্থে অক্ষরদ্বয় পরোক্তং প্রকৃতা অক্ষপাদিত্ব আচার্য্যি অত্র ব্যবহারে যদন্ত-বাক্যশাসি তদেবাব্যাহারিতাঃ। ৪৯।—নীলকণ্ঠ।



আত্মিকতার সাহায্যে মনের দ্বারা উপনিষদের মতন করিয়াছিলেন, তাহাও যে বিচার দ্বারা, তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের অতুল্য কোন তর্কবিদ্যা, ইহাও বুঝা যায়। মহাভারতের পূর্বোক্ত স্থলে ঐ আত্মিকতাকে চতুর্থী বিদ্যা ও মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী বলিয়া বেদবিদ্যাকে ঐ আত্মিকতাকে বিদ্যায়ুক্ত করিবে অর্থাৎ বেদবিদ্যার দ্বারা শ্রবণ ও আত্মিকতাকে বিদ্যার দ্বারা মনন করিবে, ইহাও বলা হইয়াছে। এবং পরে সাক্ষোপাদ সমগ্র বেদ পড়িয়াও বেদবেদ্য না বুঝিলে সে ব্যক্তি 'বেদভারহর' এই কথা বলিয়া বেদবাক্য বিচারের আবশ্যকতাও সূচিত হইয়াছে। এবং জ্ঞানশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদবাদের আশ্রয়ে মোক্ষলাভ হয় না; মোক্ষ আছে, এই মাত্র বলা যায়। অর্থাৎ বিচার দ্বারা বেদার্থের শ্রবণ আবশ্যক, তর্কের দ্বারা মনন আবশ্যক; নচেৎ কেবল বেদ পড়িলেই মুক্তি হয় না, এই কথাও শাস্ত্রপক্ষে পাওয়া যায়। সুতরাং মহাভারতের ঐ আত্মিকতাকে—জ্ঞানবিদ্যা, বাজবল্য উহার সাহায্যে বেদার্থ বিচার করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যার পূর্বোক্তরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। জ্ঞানস্বত্ব-বৃত্তিকার মহামনসীষী বিশ্বনাথও মহাভারতের পূর্বোক্ত "তদ্রোপনিষদৈক্যং" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। বাৎস্তাযন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য—চতুর্থী আত্মিকতাকে জ্ঞানবিদ্যাই বলিয়াছেন। বৈদান্তিক-চূড়ামণি শ্রীহর্ষও নৈষধীর চরিতে গোতম-প্রকাশিত জ্ঞান-বিদ্যাকে আত্মিকতাকে বলিয়া মোক্ষোপযোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন<sup>১</sup>। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় গোতম-প্রণীত জ্ঞানশাস্ত্রকে আত্মিকতাকে নামে উল্লেখ করিয়া সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বোক্তাচার্য্যগণের কথার দ্বারাও মহাভারতের ঐ চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকতাকে যে তাহার গোতম-প্রকাশিত জ্ঞানবিদ্যাই বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে এই প্রশ্নে ইহাও বলিতে পারি যে, মহাভারতের শাস্ত্রপক্ষে ইন্দ্র-কান্ড-সংবাদে যে আত্মিকতাকে 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নাস্তিক তর্কবিদ্যা। তাহাকে গোতম-প্রকাশিত বেদান্তগত আত্মিকতাকে বলিয়া পূর্বোক্ত আচার্য্যগণ বুঝেন নাই। মহাদি সংহিতা ও মহাভারতে বৈরাগ্যে আত্মিকতাকে বিদ্যার উল্লেখ আছে এবং মহাভারত সভাপর্বে যে জ্ঞানবিদ্যার নারদ মুনির পাণ্ডিত্য বর্ণন করিয়াছেন এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিশ্বাবস্থ যে আত্মিকতাকে বিবরণে বাজবল্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন, বাজবল্য তাহার উত্তর দিয়াছেন, ইহাও মহাভারত বর্ণন করিয়াছেন, সেই আত্মিকতাকে মহাভারত 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না, ইহাও প্রশংসন করা আবশ্যক।

বস্তুতঃ মহাভারত শাস্ত্রপক্ষে ইন্দ্র-কান্ড-সংবাদে বেদনিন্দক, নাস্তিক, সর্বশঙ্কী, বেদবাক্য বিবরণে ব্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাষী, মুর্থ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তিরই নিন্দা।

১। বেদবাদঃ বাসাস্তিকঃ মোক্ষোহন্ত্যন্তি প্রভাবিতুঃ।

অপেতজ্ঞানশাস্ত্রেণ সর্বলোকবিগহিণা।—শাস্ত্রপর্ক, ২৩৮ অঃ। ৬৬।

২। উদ্দেশ্যসর্বপাণি লক্ষণেশ্বরি সিনোদিতৈঃ সোক্তশক্তিঃ পদার্থৈঃ।

আত্মিকতায় বদনশব্দমালীং তায় মুক্তিকায়া কলিতায় প্রভৃতিঃ। ১০ সর্গ। ৬১

করিয়া, তদ্বারা বৈদিক মত পরিত্যাগপূর্বক নাস্তিক-মতাবলম্বী হইবে না, বৈদিক মার্গেই অবস্থান করিবে, এই উপদেশ করিয়াছেন। ঐ স্থলে যে তর্কবিদ্যায় অমুরজ হইলে বেদপ্রামাণ্য, পরলোকাদি কিছুই মানে না, নাস্তিরবাদী ও সংশয়বাদী হয়, বেদনিন্দাদি তথাকথিত কার্য্য করে, সেই তর্ক-বিদ্যায় অমুরজ হইবে না, অর্থাৎ তাহার মত গ্রহণ করিবে না—ইহাও উপদেশ করিবার উদ্দেশে তাহাকে নিরর্থক তর্কবিদ্যা বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে<sup>১</sup>। মহাভারতের ঐ নিন্দার উদ্দেশে বুঝিলে এবং সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিলে ঐ তর্কবিদ্যা যে বাহ্যস্পত্য সূত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যা এবং তর্কবিদ্যায় নিবন্ধন তাহাতে আত্মিকী শব্দের গোপ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদ-নিন্দক, নাস্তিক, বেদবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাবী ইত্যাদি কথার দ্বারা মহাভারত ঐরূপ ব্যক্তিকে কোন্ তর্কবিদ্যায় অমুরজ বলিয়াছেন, তাহা সুধারণ চিন্তা করিবেন। শেষে অশ্ব-শাসন পর্বে ঐ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে<sup>২</sup> এবং অশ্বশাসনপর্বে অন্ততঃ যুদ্ধিষ্ঠিরের প্রস্তোভের ভীষ্মদেব প্রত্যক্ষমাত্র-প্রামাণ্যবাদী নাস্তিকদিগকে হৈতুক বলিয়া নাস্তিহবাদী ও সংশয়বাদী এবং অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন<sup>৩</sup>। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন যে, হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যে ব্রাহ্মণ মূলশাস্ত্রদ্বয় শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবজ্ঞা করিবে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণ বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন<sup>৪</sup>। ভাব্যকার মেধাতিথি, টাকাকার গোবিন্দরাজ ও

- ১। অহমানঃ পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।  
আত্মিকীঃ তর্কবিদ্যামমুরজো নিরর্থিক্যঃ।  
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংস্থ চ হেতুসং।  
আত্মোক্তি চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণ্যকো চ বিজ্ঞান্।  
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ দুর্ভঃ পণ্ডিতমানিক্যঃ।  
জ্ঞেয়ং কলনির্কৃতিঃ শৃণোলস্যঃ মম দিল।—শান্তিপর্ক। ১৮০।৪১।৪৮।৪৯।
- ২। অপ্রামাণ্য বেদানাং শাস্ত্রাণ্যাক্তিকজনন্য।  
অব্যবস্থা চ সর্বত্র এতরাশনমাত্মনঃ।১১।  
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।  
আত্মিকীঃ তর্কবিদ্যামমুরজো নিরর্থিক্যঃ।১২ঃ  
হেতুবাদান্ ব্রহ্মন্ সংস্থ বিজ্ঞেতাং হেতুবাদিকঃ।  
আত্মোক্তি চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সর্বেষাং হি। ১৩ঃ  
সর্বশঙ্কীঃ দুর্ভঃ বালঃ কটুকথাগণি।  
বোদ্ধব্যস্তাশ্রয়স্তা নরঃ শ্বানঃ হি ত্যাবিহুঃ।১৪ঃ—অশ্বশাসনপর্ক, ৩৭ অঃ।
- ৩। ব্রাহ্মণ্যং কাশ্যং দুষ্ট্য হৈতুক্যঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ।  
নাস্তীত্যেকঃ ব্যবস্তস্তি সত্যং সংশয়মেব চ।  
তদ্ব্যবস্ত্যং ব্যবস্তস্তি বাল্যঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ইত্যাদি। অশ্বশাসন, ১৩২।৪।৩।
- ৪। বোহবমস্তুত স্তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়দ্বিজঃ।  
স শাস্ত্রিকর্ষিকাদ্যো নাস্তিকে বেদনিন্দকঃ।—মনুসংহিতা, ২।১১।



নারায়ণ মনুসংহিতা ঐ হেতুশাস্ত্রকে নাস্তিক-তর্কশাস্ত্র বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদ্বৈত যে কোন তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া, নাস্তিক হইয়া বেদনিন্দা করিলেও সাধুগণ তাহার শাসন করিবেন, ইহাও বেদনিন্দক ও নাস্তিক শব্দের দ্বারা হেতু স্মৃতি করিয়া মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু মনুসংহিতায় নাস্তিক ও আস্তিক বিবিধ হৈতুক ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়। বাহ্যিক শাস্ত্র না মানিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হেতুবাদবক্তা, তাহার নাস্তিক হৈতুক। মনু এই হৈতুককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—“হৈতুকান্ বকব্রুতীংস্ত বাও মাজ্জেপাণি নার্কয়েৎ”। ৪।৩০। এখানে পাণ্ডিত্য, বকব্রুতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহচর্য্যবশতঃ হৈতুক শব্দের দ্বারা নাস্তিক হৈতুক-দিগকেই বুঝা যায়। ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রভৃতিও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাহার পরে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্ত, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের জন্ত মনু প্রথমে যে মহাপরিষদের বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনু—বেদজ্ঞ, নীমাংসা-তর্কজ্ঞ, নিকলজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত হৈতুক পণ্ডিতেরও উল্লেখ করিয়াছেন<sup>১</sup> এবং ঐ হৈতুক পণ্ডিতকে বেদজ্ঞজ্ঞ পণ্ডিতের গণেই দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। এখানে মেধাতিথি অনুমানাদি-কুশল পণ্ডিতকে এবং কুলক ভট্ট কতিশ্রুতির অবিকল জ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে হৈতুক বলিয়াছেন। মনু কেবল তর্কী বলিলেও নীমাংসাতর্কজ্ঞ পণ্ডিতের জ্ঞান জ্ঞানতর্কজ্ঞ পণ্ডিতও বুঝা বাইত। তথাপি বিশেষ করিয়া তর্কীর পূর্বে হৈতুক পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়াছেন<sup>২</sup> তাহা হইলে কতিশ্রুতির অবিকল জ্ঞানশাস্ত্র স্মৃতিরূপ হইতেই আছে এবং ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আস্তিক হৈতুক পণ্ডিতও ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয়-পরিষদের অন্ততমরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহা মনুর কথার দ্বারা বুঝা বাইতেছে এবং মনু পূর্বে যে হৈতুকদিগকে অসম্মান্য বলিয়াছেন, তাহার নাস্তিক হৈতুক, ইহাও বুঝা বাইতেছে। তাহা হইলে মনুসংহিতা ও মহাভারতের পূর্বোক্ত সমস্ত বচনগুলির সমন্বয়ের দ্বারা মহাভারতে বেদপ্রামাণ্য পরলোকাদি-সমর্থক সর্বশাস্ত্রপ্রদীপ গৌতম জ্ঞানশাস্ত্রের নিন্দা নাই, নাস্তিক তর্কশাস্ত্রেরই নিন্দা আছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

বাস্তবিক রামায়ণে পাওয়া যায়, সীরামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন যে,<sup>৩</sup> বৎস! তুমি ও

১। ত্রেবিকো হৈতুকতর্কী নৈকজ্ঞে ধর্ম্মপাঠকঃ।

অন্যদ্যাদিমাণ্য পূর্বে পরিগণ্য জ্ঞান ধর্ম্মাবরাঃ—মনুসংহিতা (১২।১১)।

(হৈতুকঃ) অনুমানাদিকুশলঃ। তর্কী অহম্ব্রাহ্মণোহবুদ্ধিযুক্তঃ। মেধাতিথি। (হৈতুকঃ) কতিশ্রুতি-বিকলজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞঃ।

(তর্কী) নীমাংসাস্ত্রতর্কবিৎ। কুলকভট্ট।

২। শব্দ ও লিখিত মুনিও নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে ধর্ম্মনির্ণয়-পরিষদের অন্ততমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানসমুদ্রীকার জয়ন্তভট্টের কথায় পাওয়া যায়। “শব্দলিখিতৌ চ ধর্ম্মদ্বয়সামান্যধর্ম্মবিদঃ বডুদ্বয়বিদ ধর্ম্মবিন্দ্যাকাবিদ নৈয়ায়িকো নৈলৈকো ব্রহ্মচারী পঞ্চাশ্রিতি দশাবরা পরিব্রিজুচতুঃ”।—জ্ঞানসমুদ্রী, ২০০ পৃষ্ঠা।

৩। কতির লোকায়তিকান ব্রাহ্মণাস্তাত দেবসে।

অনর্থকুশলা জ্ঞেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রবু মুখোবু বিবামানেবু দ্বর্কী বাঃ।

বুদ্ধিমানীকিকীং প্রাপ্যঃ নিরর্থ্যঃ প্রবদন্তি তে—অন্যোদ্যাক্যে (১০০।৪৬।৩৩)।



লোকায়তিক ব্রাহ্মণদিগকে সেবা কর না ? পরে কেন তাহাদিগের সেবা করা রামচন্দ্রের অনভি-  
 প্রেত, তাহা বলিতে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু তাহার অর্নব-কুশল এবং অজ্ঞ হইয়াও  
 পণ্ডিতভিন্যাসী। মুখ্য ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ এবং তদ্ব্যুৎক ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই  
 ছর্ষধুগণ আত্মিকী বুদ্ধি লাভ করিয়া অনর্থক প্রবাদ করে। এখানে লোকায়তিক ব্রাহ্মণ-  
 মাজকেই অনর্থকুশল ছর্ষধু প্রকৃতি বলিয়া বোঝানো করা হইয়াছে, তদ্বারা ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ  
 করিয়া নাস্তিক-মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণেরই নিন্দা বুঝা যায়। সুতরাং এখানে আত্মিকী বুদ্ধি  
 বলিতে নাস্তিক-তর্কবিদ্যার অন্তরাগাদি মূলক নাস্তিকের বুদ্ধি বা মতবিশেষই বুঝা যায়। টীকাকার  
 রামানুজ এখানে চার্লীক-মতাবলম্বীদিগকে প্রথম প্রকার লোকায়তিক বলিয়া জ্ঞান-  
 মতাবলম্বীদিগকে দ্বিতীয় প্রকার লোকায়তিক বলিয়াছেন। রামানুজের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা গ্রহণ  
 করা না গেলেও পূর্বকালে জ্ঞানশাস্ত্রও যে লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা রামানুজের  
 কথায় বুঝা যায়। সুতরাং নৈরাসিকদিগকেও রামানুজ লোকায়তিক শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে  
 পারিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে প্রথম শ্লোকে যে লোকায়তিকগণ নিন্দনীয়রূপে বুদ্ধিহীন, দ্বিতীয়  
 শ্লোকেও তাহারই “তৎ” শব্দের দ্বারা বুদ্ধিহীন, ইহা প্রমাণিত করা আবশ্যিক। আত্মিক হৈতুক  
 মাজকেই বাত্মিকী ঐক্যে বর্ণন করিতে পারেন না। নাস্তিক হৈতুক সম্প্রদায় গোতম জ্ঞানশাস্ত্র  
 হইতে তর্ক শিক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যে নাস্তিক-মতের সমর্থন করিতে পারেন। বাত্মিকী তাহা  
 বলিলেও জ্ঞানশাস্ত্রের নিন্দা হয় না। তাহা হইলে অজ্ঞ শাস্ত্রেরও নিন্দা হইতে পারে।  
 বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক জ্ঞানবৈশেষিকের আর্থ সিদ্ধান্তের ঐক্যে নিন্দা ত্রিরামচন্দ্র করিয়াছেন,  
 ইহাও বাত্মিকী বর্ণন করিতে পারেন না। পরন্তু ত্রিরামচন্দ্রের রাজসভায় হেতুবাদকুশল  
 হৈতুক পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞান আত্মিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত সম্মানে নিমন্ত্রণ দেখিতে  
 পাই<sup>১</sup>। মূল কথা, লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ করিয়া রামায়ণে হৈতুক পণ্ডিত মাজেরই  
 নিন্দা হয় নাই। মহাসংহিতায় যেমন হৈতুক শব্দের প্রয়োগ করিয়াই নাস্তিক হৈতুকদিগকে  
 অসম্মান্য বলা হইয়াছে, তদ্রূপ রামায়ণেও লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ করিয়া নাস্তিক হৈতুক-  
 দিগকেই অসম্মান্য বলা হইয়াছে। তবে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত  
 হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকটে শুনিয়াছি। রামানুজের কথাতেও তাহা বুঝা যায়।  
 পরন্তু অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য তাহার সমস্ত আত্মিকী বিদ্যার মধ্যে লোকায়ত বলিয়াছেন<sup>২</sup>। কোটিল্য

১। হেতুপচারকুশলান হৈতুকান্ বহুশ্রুতান্।—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০৭-৮। হৈতুকান্ তর্কিকান্।—  
 রামানুজ।

২। চতুর্থ এব বিদ্যা ইতি কোটিল্যঃ। তত্ত্বার্থার্থী বহুবিদ্যাং তদ্বিদ্যাং বিদ্যাং। সাংখ্যং বৌদ্ধং লোকায়তক  
 ইত্যাত্মিকী। ধর্মার্থার্থী জ্ঞানঃ। অর্থার্থার্থী বাণীয়াঃ। ন্যায়ান্যৌ দণ্ডনীত্যঃ। বলাকলে চৈতন্যঃ হেতু-  
 রবীক্ষমাণা লোকজ্ঞানকরোতি বাসনেতুকায়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞানাক-ক্রিয়া-বৈশারদ্যক কয়োতি—

অর্থঃ সর্কবিদ্যানাং উপায়াঃ সর্ককর্মণাঃ।

আশ্রয়ঃ সর্কধর্মশাস্ত্রাঃ দণ্ডবীক্ষকী মতাঃ।—অর্থশাস্ত্র।

ছায়শাস্ত্র না বলিয়া লোকায়ত শব্দের দ্বারা বার্ষ্পতা সূত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যাকেই গ্রহণ করিলে তিনি "বিদ্যা" ও "আত্মীকরী" শব্দের যে ব্যুৎপত্তি সূচনা করিয়াছেন এবং আত্মীকরী বিদ্যার যে সকল কল কীর্তনপূর্বক প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না। সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব কণ্ঠের উপায়, সর্ব ধর্মের আশ্রয় বলিয়া শেষে যে প্রশংসা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তিনি যে ন্যায়শাস্ত্রকেও আত্মীকরী মধ্যে বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। বাৎস্তায়ন ভাষ্যেও "প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের ঐক্য প্রশংসা দেখা যায়। সূত্রের কোটিল্য লোকায়ত শব্দের দ্বারা ছায়শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। বার্ষ্পতা সূত্রের মত লোকসম্মত—লোকবিস্তৃত। অধিকাংশ লোকই দেখেই আত্মা মনে করে, পরলোকে বিশ্বাস করে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঐ মত লোকসিদ্ধ, ইত্যাদি প্রকার ব্যুৎপত্তি অল্পস্বারে ঐ মত ও ঐ মত-প্রতিপাদক গ্রন্থ স্মৃতিরকাল হইতে "লোকায়ত" নামে উল্লিখিত দেখা যায়। বাৎস্তায়নের কামসূত্রেও (১২ অঃ, ২৪ সূত্রে) পরলোকে অবিধানী সংশয়বাদীর "লোকায়তিক" নামে উল্লেখ দেখা যায়। এইরূপ বহু গ্রন্থেই লোকায়তিক ও কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দেরও প্রয়োগ পূর্বোক্ত অর্থে দেখা যায়।<sup>১</sup> কিন্তু ছায়দর্শনের অনেক মত লোকসিদ্ধ। আত্মার কণ্ঠস্থাদি সর্ব-লোকসিদ্ধ এবং সকল লোকই তর্ক করে, অনুমান করে, অনুমানের দ্বারা লোকবাক্য নির্বাহ করে; সূত্রের ন্যায়শাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত লোকসিদ্ধ, ইহা লোকবাক্য-নির্বাহক বলিয়া লোকে বিস্তৃত, এইরূপ কোন ব্যুৎপত্তি অল্পস্বারে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও 'লোকায়ত' নামে অভিহিত হওয়া অসম্ভব নহে। নাস্তিক শাস্ত্রবিশেষেই লোকায়ত শব্দের ভূমি প্রয়োগে লোকায়ত শব্দের ঐ অর্থই প্রসিদ্ধ হওয়ায় পরিবর্তী কালে ন্যায়শাস্ত্র বলিতে লোকায়ত শব্দের প্রয়োগ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাও অসম্ভব নহে। প্রাচীনগণের প্রযুক্ত অনেক শব্দ পরবর্ত্তিগণ সেই অর্থে ব্যবহার করেন নাই, ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ভাবাপ্রয়োগের পরিবর্তন স্মৃতিরকাল হইতেই হইতেছে। প্রাচীন কালে বৈশেষিক অর্থে যোগ শব্দেরও প্রয়োগ হইত। হেমচন্দ্র স্মৃতি যোগ শব্দের অন্যতম অর্থ বলিয়াছেন—'নৈমায়িক' (বাচস্পত্য অভিধানে যোগ শব্দ দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কালে নৈমায়িকগণ যোগ নামেও অভিহিত হইতেন। পরন্তু হরিবংশের কোন স্রোকে<sup>২</sup> "লোকায়তিকমুখ্য" শব্দ দেখিতে পাই। সেখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রসিদ্ধ অর্থে অল্পপপত্তি দেখিয়া লক্ষণা অবলম্বনে

১। লোকায়ত শব্দের পরে তদ্ধিতপ্রত্যয়ে "লোকায়তিক" প্রয়োগের দ্বারা "লোকায়তিক" এইরূপ প্রয়োগও হয়, ইহা বামাত্মজ ও নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাস্বারে তাহারিণের সম্মত বুঝা যায়। নামাধরণ ও হরিবংশে "লোকায়তিক" এইরূপ পাঠও প্রকৃত হইতে পারে। কোন বহুক্রত উপাখ্যায় মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি, "লোকায়তি" শব্দের উত্তরে তদ্ধিত প্রত্যয়েই কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা লোকেই বাহারিণের আয়তি, (উত্তরকাল) অর্থাৎ বাহারিণের মতে উত্তরকালীন পরলোক নাই, এইরূপ অর্থে লোকায়তিক বলিতে নাস্তিক। নামাধরণে তাহারাই নিশ্চিত।

২। ইকানানামসংযোগ-সমবায়-বিশারদৈঃ।

লোকায়তিক-মুখ্যস্তমুখ্যঃ পদবীৰ্ত্তঃ।—হরিবংশ, ভবিষ্যতপর্ব, ৭৭ অঃ, ৩০।



অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ লোকায়তিকমুখ্য বলিতে ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিলে সেখানে কোন অল্পপত্তি থাকে না এবং সেখানে তাহাই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। মূলকথা, রামানুজের কথা, কোটিল্যের কথা এবং হরিবংশের শ্লোক চিন্তা করিলে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্র “লোকায়ত” নামেও অভিহিত হইত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। লোকায়ত-শাস্ত্র দ্বিবিধ হইলে, আন্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ লোকায়তিক হইতে পারে। হরিবংশে লোকায়তিক-মুখ্য বলিয়া আন্তিক লোকায়তিকেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং রামায়ণে অনর্থকুশল, অজ্ঞ, দুর্কৃত ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিন্দা করিয়া কথিত লোকায়তিকদিগকে নাস্তিক বলিয়াই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মহাভারতে বেদনিবন্ধ, নাস্তিক প্রভৃতি বহু বাক্যের দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত করিয়া বলা হইয়াছে। পরন্তু যদি লোকায়তিক শব্দের দ্বারা চার্মাক-মতাবলম্বী ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাই না যায়, ন্যায়শাস্ত্রের “লোকায়ত” নামে উল্লেখ কোন কালে হয় নাই বলিয়াই নির্ণীত হয়, অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য, বার্ষস্পত্য সূত্রাদিকেই যদি “লোকায়ত” বলিয়া আত্মসিদ্ধিকীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রামায়ণে লোকায়তিক শব্দের দ্বারা নৈয়ায়িকের গ্রহণ অসম্ভব। সূত্ররং রামানুজের ব্যাখ্যা করনা-প্রস্তুত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এ পক্ষেও অর্থশাস্ত্রে আত্মসিদ্ধিকীর মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ নাই, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, কোটিল্যের শেষ কথাগুলি পর্যালোচনা করিলে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা না বুঝিয়া পারা যায় না। সূত্ররং অর্থশাস্ত্রে যোগ শব্দের দ্বারা ন্যায় অথবা ন্যায়বৈশেষিক উভয়ই আত্মসিদ্ধিকীর মধ্যে কথিত হইয়াছে, ইহাই এ পক্ষে বুঝিতে হইবে। এবং অর্থশাস্ত্রে “যোগঃ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝিতে হইবে। ক্লীবলিঙ্গ “যোগ” শব্দের যে প্রাচীন কালে ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ হইত, তাহা ভাব্যকার বাস্তবায়নের প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায়। হেমচন্দ্র সূত্রির কথা এবং আরও অনেক জৈন সূত্রের গ্রন্থের দ্বারা ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবায়নের “যোগানাং” এই কথার ব্যাখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। বাস্তবায়নের “সাংখ্যানাং যোগানাং” এই প্রয়োগ দেখিরা কোটিল্যের “সাংখ্যং যোগং” এই প্রয়োগের প্রতিপাদ্য বুঝা যায় (২২৬। ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত বলিতে ন্যায়শাস্ত্র বুঝিলে, যোগ বলিতে কেবল বৈশেষিক অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। আত্মসিদ্ধিকীর মধ্যে যোগশাস্ত্রও কোটিল্যের বক্তব্য হইলে সাংখ্য শব্দের দ্বারাও সাংখ্য-প্রবচন উভয় দর্শনকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কোটিল্য ন্যায়শাস্ত্রকে আত্মসিদ্ধিকী না বলিলে হেতুর দ্বারা স্রষ্টা, বাক্তা, দণ্ডনীতির বলাবল পরীক্ষা করতঃ লোকের উপকার করিতে কোটিল্যের কথিত কোন আত্মসিদ্ধিকী সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। মহাত্ম্যের বিদ্যা ত্রিবিধ, ইহাও কোটিল্য বলিয়াছেন। রামায়ণেও ত্রিবিধ বিদ্যার উল্লেখ আছে। তবে সে কথার দ্বারা আর বিদ্যা নাই, ইহা বুঝা যায় না। সেখানে বিদ্যার পরিগণনা উদ্দেশ্য নহে। মহাভারতেও কোন স্থলে ঐরূপ প্রশ্নে ত্রিবিধ বিদ্যারই উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহা ইউক, কোটিল্য অর্থশাস্ত্রে ন্যায়শাস্ত্রকে কোন বিদ্যার মধ্যে গণ্য করেন নাই, সূত্ররং তাহার সময়ে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না বা তাহার আলোচনা ছিল না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু যে দিন হইতে শাস্ত্রার্থবিচারের আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞায় জ্ঞায়শাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, কিরূপে বিচার করিতে হইবে, বাদবিচার কাহাকে বলে, সহস্রর কাহাকে বলে, অসহস্রর কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিচারকের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় জ্ঞায়শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। বিচারোপযোগী সংশ্লিষ্ট চতুর্দশ পদার্থ জ্ঞায়শাস্ত্রেরই প্রদান। অহুমান-প্রমাণের বিত্ত ও অন্তত্ব হেতু বা হেতুভাসের নিরূপণপূর্বক তাহার সর্বান্ব এই জ্ঞায়শাস্ত্রেই সম্যকরূপে নিরূপিত হইয়াছে। শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে অহুমান-প্রমাণের সম্যক জ্ঞানও যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা সর্বদ্যত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অহুবাকে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি-পুরাণাদি শব্দপ্রমাণের সহিত অহুমান-প্রমাণেরও উল্লেখ আছে।<sup>১</sup> ভগবান্‌ মহুও পূর্বোক্ত পরিবদ্বর্ণনের পূর্বেই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ধাব্য ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্ররূপ শব্দ-প্রমাণের সহিত অহুমান-প্রমাণকেও সম্যকরূপে বুঝিবেন এবং তাহার পরশ্লোকেই আবার বলিয়াছেন যে, যিনি বেদশাস্ত্রের অধিরোহী তর্কের দ্বারা শাস্ত্র-বিচার করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানেন; যিনি ঐরূপ তর্কের দ্বারা শাস্ত্র বিচার করেন না, তিনি শাস্ত্রগম্য ধর্ম্ম জানিতে পারেন না<sup>২</sup>। এখানে মহু-বচনের “তর্ক” শব্দের দ্বারা অনেকে তর্কশাস্ত্র বুঝিয়াছেন। জ্ঞানস্বত্ব-বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে জন্ত এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে তাহারও উহাই অভিপ্রেত বুঝা যাইতে পারে। অনেকে ঐ “তর্ক” শব্দের দ্বারা অহুমান-প্রমাণ বুঝিয়াছেন<sup>৩</sup>। ভাষ্যকার মেঘাতিথি প্রথমে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়া পরে মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত তর্কের কথাও বলিয়াছেন। কুন্তু ভট্ট “মীমাংসাদিক্তার” বলিয়া প্রমাণ-সহকারী সর্বপ্রকার তর্কই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য “তর্ক” শব্দ পূর্বোক্ত অনেক অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। অহুমান-প্রমাণ অর্থেও তর্ক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শাস্ত্রীয়ক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও কোন কোন স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মহু পূর্বশ্লোকে প্রমাণত্রয়ের কথা বলিয়া পরশ্লোকে ঐ প্রমাণের সহকারী তর্কের কথাই বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ঐ তর্ক জ্ঞানদর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক পদার্থ। উহা কেবল অহুমান-প্রমাণেরই সহকারী নহে, উহা সকল প্রমাণেরই সহকারী। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও তর্কিকরকাকার বরদরাজ জ্ঞানদর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝাইয়াছেন এবং মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত তর্কও যে জ্ঞানদর্শনোক্ত তর্কপদার্থ অর্থাৎ যে তর্কের নাম “মীমাংসা”, তাহাও জ্ঞানদর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত

১। স্মৃতি: প্রত্যক্ষ: ইতিজ্ঞা অহুমানচতুর্বিধ:। এতৈরানিত্যভেদেন তর্কোপেব বিধায়তে ॥ ১. ২।

২। প্রত্যক্ষমহুমানিক শাস্ত্রক, বিবিধাগম:।

এবং স্মৃতিভিঃ কাব্যং ধর্ম্মতত্ত্বভিঃ পুণ্যং।

আর্য্য ধর্ম্মোপদেশক বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

সম্বন্ধেণাসম্বন্ধে স ধর্ম্ম: বেদ নেভয়ে ॥ ১২, ১০৫-৬।

৩। জ্ঞানদর্শনীর জয়প্রভট মহুমানোক্ত “তর্ক” শব্দের অর্থ “অহুমান”ই বলিয়াছেন। তৎপশ্য: কেচিদহুমানো

প্রত্যক্ষতে বদ্য। স্মৃতিকাব্য: আর্য্য ধর্ম্মোপদেশক ইত্যাদি।—জ্ঞানদর্শনী, ১০৮ পৃষ্ঠা।



তর্ক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা বুঝাইতে সেখানে মীমাংসাতার্ক্যের কারিকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বরদরাজ ন্যায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত মনু-বচন উদ্ধৃত করায় তিনি মনু-বচনের ঐ তর্ক শব্দের দ্বারা প্রমাণ-সহকারী ন্যায়দর্শনোক্ত উহাবিশেষরূপ তর্কই বুঝিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদান্তসূত্রে বেদব্যাস<sup>১</sup> “তর্কীপ্রতিষ্ঠানাদপি” এই কথা বলিয়া পরেই আবার ঐ সূত্রেই বলিয়াছেন যে, যদি বল—অন্য প্রকারে অনুমান করিব, তাহা হইলেও অর্থাৎ অনুমান করিতে পারিলেও সেই অনুমান-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কজন্য জ্ঞান মোক্ষ-সাধন নহে। বেদব্যাস তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, এই কথা বলিয়া শেষে আবার ঐ কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, তর্কমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে লোকব্যাভার উচ্ছেদ হয়। পরন্তু যদি তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ হয়, অনুমানমাত্রেরই প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রই যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে? কতকগুলি তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তদৃষ্টান্তে তর্কের দ্বারাই অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাই তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তর্কমাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠ বা সন্দিগ্ধ-প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠাও তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। শঙ্কর এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। শেষে বোদ্ধার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণসহকারী অনেক তর্কবিশেষও আবশ্যক, সুতরাং তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহাও বলিয়াছেন। ইহা সমর্থন করিতে সেখানে পূর্বোক্ত “প্রত্যক্ষমহুমানক” ইত্যাদি মনু-বচন ছাইট উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে আনন্দগিরি মনু-বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে দর্শ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মও পরিগৃহীত। অর্থাৎ বিচারের দ্বারা দর্শনির্ষণের ন্যায় ব্রহ্ম-নির্ণয়েও বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, বেদান্তদর্শন বা শারীরক ভাষ্যে তর্কমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠ বলা হয় নাই। পরন্তু শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে অনুমান-প্রমাণ ও প্রমাণ-সহকারী তর্কবিশেষ আবশ্যক, ইহা আচার্য্য শঙ্কর সমর্থনই করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে মনুর কথা তিনিও স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তর্ককে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেহই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিচার দ্বারা বীহারাই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার সকলেই তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বেদব্যাসের বেদান্তবাক্য-মীমাংসাও তর্কই। তাহার অবিরোধী যে সকল তর্ক পূর্বমীমাংসা ও ন্যায়দর্শনে কথিত হইয়াছে, সেগুলি ঐ বেদান্ত-বাক্য-মীমাংসার উপকরণ, ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভান্ডারী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথাতাই ব্যক্ত আছে<sup>২</sup>।

১। সম্পূর্ণ বেদান্ত-সূত্রটাই এই—তর্কীপ্রতিষ্ঠানাদপ্যস্তথাস্ত্রমেষমিতি চেষেবন্যাবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। ২, ১, ১১।

২। তদ্ব্যবহৃত্তজিহ্বাদোপপাদ্যমুখেন বেদান্তবাক্য-মীমাংসা-তদবিরোধিত্বকৌপকরণ্য প্রস্তুতম্।—শারীরক ভাষ্য, ১ম সূত্রভাষ্যের শেষ। সূত্রভাষ্যপূর্বদ্বন্দ্বসংহতি তদ্ব্যবহিত। বেদান্ত-মীমাংসা ভাব্য তর্ক এষ, তদবিরোধিনশ্চ বেদস্তেহপি তর্ক। অক্ষরমীমাংসায়ঃ স্তব্ধে চ বেদপ্রত্যক্ষাদি-প্রামাণ্য-পরিশোধনাবিনুক্তান্ত উপকরণঃ বস্তুতঃ সা তদ্ব্যবহিত।—ভান্ডারী।

বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বেদব্যাখ্যাসিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শব্দপ্রমাণের ত্রায় সাধ্যাৎ সম্বন্ধেও যুক্তি অর্থাৎ অহুমান-প্রমাণকেও আশ্রয় করিয়াছেন। ( “বুক্তেঃ শব্দান্তরাত্ ২।১।১৮ স্বত্র প্রট্য ” ) ।  
 বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর আশ্রয় নিত্য স্বাধন করিতে শেষে “জ্ঞানাত্” (৩।৪) ইত্যাদি সম্বন্ধের দ্বারা তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনের এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার জন্ত সকল আচার্য্যই বহুবিধ তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বিচারশাস্ত্রে, দর্শনশাস্ত্রে তর্ক সকলেরই অপরিহার্য্য অবলম্বন। সকলেই হেতু উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। হেতুবাদ পরিত্যাগ করিলে কেহই স্বপক্ষের সমর্থন ও বিজ্ঞাপন করিতেই পারেন না,—তাহা অসম্ভব। “শাস্ত্রোনিবৃত্তাৎ,” “তন্ম সম্বন্ধাৎ,” “ঈক্ষতের্নাশকং” ইত্যাদি বেদান্তস্বত্রেও হেতু উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ও বলিয়াছেন,—“ব্রহ্মহুতপদৈশ্চৈব হেতু-মদভিকিনিশ্চিতৈঃ” (১০।৫); সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“হেতুমত্তিবুজ্জি-বুক্তৈঃ।” শ্রীধরবামী “ঈক্ষতের্নাশকং” ইত্যাদি বেদান্তস্বত্রেও উল্লেখ করিয়াই ঐগুলি হেতুনিশ্চিত, ইহা দেখাইয়াছেন। এখন যদি হেতুর দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হয়, শব্দপ্রমাণেরও সহকারি-রূপে হেতু বা যুক্তি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হেতু কাছাকে বলে, কোন্ হেতুর দ্বারা কোন্ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কোন্ হেতুর দ্বারা তাহা পারে না, হেতুর দোষ কি, গুণ কি, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক জ্ঞান যে নিত্য আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি, শাস্ত্রে কোথায় কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও সকলকেই বুঝিতে হইবে। উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি বড় বিধ লিঙ্গের দ্বারা বেদের যে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেও ত তর্কের দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয়। ফলকথা, হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বিচার দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। তাই ভগবান্ মহু ধর্ম্মনির্ণয়-পরিষদে হৈতুক পণ্ডিতকে বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্ব, অহুমান-প্রমাণের তত্ত্ব, তর্কের তত্ত্ব জ্ঞানশাস্ত্রেই সম্যকরূপে—সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইয়াছে, ঐগুলি জ্ঞানবিদ্যারই প্রাধান। সুতরাং হেতুর দ্বারা কিছু বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলেই জ্ঞানশাস্ত্র অপরিহার্য্য অবলম্বন। তাই পুরাণে এবং বেদের চরণবাহু জ্ঞানশাস্ত্র “জ্ঞানতর্ক” নামে বেদের উপাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে<sup>১</sup>। আচার্য্য শঙ্করও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় স্বত্ৰভাষ্যে বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে বেদকে বলিয়াছেন—  
 “অনেকবিদ্যাহানোপনৃহিত”। অনেক অঙ্গ ও উপাঙ্গ বেদের উপকরণ। পুরাণ, জ্ঞান নীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শিক্ষাকলাদি বড়ল, এই দশটি বিদ্যাস্থান অর্থাৎ বেদার্থবোধে হেতু। বেদ এই দশটি বিদ্যাস্থানের দ্বারা উপকৃত। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকার শঙ্করের ঐ কথার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদার্থ-বোধের জন্য সুপ্রাচীন কালেও বেদান্ত ব্যাকরণশাস্ত্রের ন্যায় বেদের উপাঙ্গ ন্যায় শাস্ত্রও আলোচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং যে আকারেই হউক, ন্যায়শাস্ত্র সুপ্রাচীন কালেও ছিল, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সকল বিদ্যারই পরমাত্মা হইতে প্রবৃতি, ইহা উপনিষদে

১। নীমাংসা-জ্ঞানতর্ক উপাঙ্গ: পরিকীর্তিতঃ ॥—জ্ঞানহুতপদিকারের উদ্ধৃত পুরাণ-বচন। তন্মহা সাধনমীতা ব্রহ্মলোকে মহীকতে। তথা প্রতিপদমহুপং ছন্দো ভাবা ধর্ম্মী নীমাংসা জ্ঞানতর্কী ইত্যুপাঙ্গানি ॥—চরণবাহু।



বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তন্মধ্যে “সূত্রানি” এই কথাও পাওয়া যায় (২।৪।১০)। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার “সূত্রানি ভাষ্যানি” এই কথার দ্বারা সূত্রের ন্যায় ভাষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায় (৩ অঃ, ১৮৯)। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও ভাষ্যভাষ্যের শেষে অক্ষপাদ শব্দের সম্বন্ধে ভাষ্যশাস্ত্র প্রতিষ্ঠাত হইয়াছিল, এই কথা বলিয়াছেন; অক্ষপাদ শব্দকে ন্যায়শাস্ত্রকর্তা বলেন নাই। ন্যায়-বার্ত্তিকারস্তু উদ্যোতকরও অক্ষপাদ মুনিকে ন্যায়শাস্ত্রের বক্তা বলিয়াছেন, কর্তা বলেন নাই।

পরন্তু বিচারপূর্ব্বক বেদার্থবোধে যেমন ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক, তজ্জপ মনুস্কর শ্রবণের পর কর্তব্য মননে ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ আবশ্যক। কারণ, শাস্ত্র দ্বারা যে তত্ত্বের শ্রবণ অর্থাৎ শব্দ বোধ করিবে, অহুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ নির্ণীত তত্ত্বের পুনর্জানই মনন। শ্রুত তত্ত্ব দৃঢ়শ্রদ্ধা হইবার জন্যই বহু হেতুর দ্বারা ঐ জ্ঞাত বিষয়েও পুনঃ পুনঃ অহুমানরূপ মননের বিধি শাস্ত্রে উপদিষ্ট। (মন্তব্যশোপ-পন্থিভিঃ)। শ্রবণের পরে মনের দ্বারা ধ্যানাদিই মনন নহে। ধ্যানাদি (নিদিধ্যান) মননের পরে বিহিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির “মন্তব্যঃ” এই কথার ব্যাখ্যা ভাষ্যকার শব্দরও বলিয়াছেন—“পশ্চান্নমন্তব্যত্বকৃতঃ”। অর্থাৎ শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা মনন করিবে, উপনিষদ্রুত যোগাঙ্গবিশেষ উৎকৃষ্ট তর্কেই মনন বলেন নাই। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে শব্দর বলিয়াছেন যে, বেদান্তবাক্যের অবিরোধি অহুমান প্রমাণও শ্রুত বেদার্থজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য অবলম্বনীয়। কারণ, শ্রুতিই তর্কে সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। এই বলিয়া শেষে “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্করী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ঐ মননের ব্যাখ্যা করিতে যুক্তিবিশেষের দ্বারা বিবেচনাকে মনন বলিয়াছেন এবং ঐ যুক্তিকে বলিয়াছেন—অর্থাৎপন্থি অথবা অহুমান। মীমাংসক-মতে অর্থাৎপন্থি অহুমান-প্রমাণ হইতে ভিন্ন প্রমাণ; সুতরাং বাচস্পতি মিশ্র তাহারও প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মতে অর্থাৎপন্থি অহুমানবিশেষ। মূলকথা, শ্রবণের পরে অহুমানরূপ মনন সর্ব্বসম্মত। আচার্য্য শব্দরও তর্কের দ্বারা মনন কর্তব্য বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আত্মবিষয়ে কুতর্কেরই নিবেদন করিয়াছেন, তর্কমাত্রের নিবেদন করেন নাই। পরন্তু শ্রুতিই যে ঐ বিষয়ে তর্কে অবলম্বনীয় বলিয়াছেন, ইহাও শব্দর বলিয়াছেন। কঠোপনিষৎ দেখানে আত্মাকে “অতর্ক্য” বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—“নৈবা তর্কেণ মতিরূপেনেয়া,” সেখানে ভাষ্যকার শব্দর ঐ তর্ক শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—শাস্ত্র-নিরূপক স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা উৎকৃষ্ট কুতর্ক।

শাস্ত্রদ্বারা আত্মার শ্রবণ (শব্দ বোধ) করিয়াই পরে সেই শাস্ত্র-সম্মতরূপে অহুমানরূপ মনন করিতে হইবে। শাস্ত্রকে অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীন বুদ্ধিবলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। এবং বেদশাস্ত্র-বিরোধি তর্ক—কুতর্ক। এই সকল সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়েরই সম্মত। ভাষ্যশাস্ত্রেও উহার বিপরীত বাদ নাই। বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক গোঁতম মতে

১। অতর্ক্যমতর্ক্যঃ শব্দদ্ব্যাহুত্বেন কেবলেন তর্কেণ। নহি কুতর্কস্ত প্রতিষ্ঠা। কচিৎবিদ্যতে। নৈবা তর্কেণ শব্দদ্ব্যাহুত্বেন।—কঠ, ১ অ, ২ বকী। ১-২। শব্দরভাষ্য।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ অহুমান ভ্রায়ই নহে, উহা ভ্রায়ভাস নামে কথিত; উহা অপ্রমাণ। ভ্রায়বৃত্তকার মহর্ষি গোতম কোন স্থানে কোন বিরুদ্ধ অহুমানের চিত্তা করিয়া “শ্রুতিপ্রামাণ্যচ” (৩।১।২৯) এই সূত্রের দ্বারা ঐ অহুমানের বেদবিরুদ্ধতা সূচনা করতঃ উহার অপ্রামাণ্য সূচনা করিয়া গিয়াছেন। গোতম মতে শ্রুতি অপেক্ষার যুক্তিই প্রধান, অহুমানের অবিরোধে শ্রুতির প্রামাণ্য, ইহা একেবারেই অসত্য কথা। শ্রুতিসেবক ঋষির ঐরূপ মত হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অহুমানই অস্বীকা। সেই অস্বীকা নির্বাহের জন্তই আধৌগিকী বিদ্যার প্রকাশ। সুতরাং ভ্রায়দর্শনে মীমাংসা-দর্শনের ভ্রায় বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বাক্যার্থ বিচার হয় নাই। কিন্তু ভ্রায়শাস্ত্রবক্তা গোতম যে বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অহুমানের দ্বারাই আত্মা দি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায় না। বেদপ্রতিপাদিত পদার্থকে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ভ্রায়ের দ্বারা পরীক্ষা করিলে ঐ পদার্থে কাহারও সংশয় বা আপত্তি থাকে না। কারণ, ঐ পঞ্চাবয়বের মূলে সর্বপ্রমাণ থাকায় ঐ ভ্রায়নির্ণীত পদার্থ সর্বপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই জন্ত ঐ ভ্রায়কে পরমভ্রায় বলা হইয়াছে; উহাই প্রকৃত ভ্রায়। ঐ প্রকৃত ভ্রায়ের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞার মূলে সর্বত্রই আগম-প্রমাণ থাকিবে। বোধার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে ঐ পরমভ্রায় অবলম্বনে বোধার্থের পরীক্ষা আবশ্যক হয়। গোতমের পঞ্চাবয়বরূপ ভ্রায় নিরূপণের ইহা মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাত বোধার্থের সমর্থন করিতে দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই অহুমানেরও অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। বোদান্তসূত্রেও তাহা পাওয়া যাইবে। কেবল অহুমানের দ্বারাও অনেক স্থলে আচার্য্যগণ সকলেই অনেক তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে অহুমান বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহা বৈদিক সম্প্রদায়ের সকলের মতেই অপ্রমাণ। কোন্ অহুমান বেদবিরুদ্ধ, তাহা নির্ণয় করিতেও পূর্বে বোধার্থ নির্ণয় আবশ্যক। বেদে বহু প্রকারে বহু চর্য্যোদ তত্ত্বের বর্ণন আছে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদে সকল সিদ্ধান্তই বর্ণিত আছে। পূর্বপক্ষরূপে সমস্ত নাস্তিক মতেরও উল্লেখ আছে। বেদের সর্বাত্মশই মহর্ষিগণের অধিগত ছিল। যে সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞাতব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যার দ্বারা জ্ঞাপন আবশ্যক। সকল বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ স্মৃতির দ্বারা তাহার জ্ঞাপন ও সমর্থন না করিলে আর কেহ তাহা করিতে পারে না। বোধার্থ স্মরণপূর্বক পুরাণশাস্ত্র, ভ্রায়শাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্র প্রভৃতির প্রণেতা মহর্ষিগণ শিষ্ট, তাঁহারা সকলেই বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সকল বিদ্যাস্থানের দ্বারা বেদ উপকৃত, ইহা আচার্য্য শব্দের বক্তব্যবিশেষ বুঝাইতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন<sup>১</sup>। মূলকথা, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ জীবের সকল চরণের নিদান মিথ্যাজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে রূপা করিয়া নানা-প্রকারে বেদবর্ণিত নানা সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়াছেন। অধিকারাহুসারে

১. “মনেকবিদ্যাস্থানোপকৃতিতন্ত্র”। পুরাণ-জাযমীমাংসাবয়ো দশ বিদ্যাস্থাননি তৈত্তর্য্য তত্ত্বা দ্বারা উপকৃততন্ত্র। তদনেন সমস্ত মিত্তননপরিগ্রহোপাশ্রাণাশাশাস্ত্রাশ্রুত। পুরাণাদি-প্রবর্তকো হি মহর্ষয়ঃ শিষ্টাতিত্ত্বতত্ত্বা তথা ভাষ্য বেদান ব্যাক্যাবয়ববর্ণকাবেদোমুচিষ্ঠিক্তিঃ পরিগৃহীতো বেদ ইতি।—ভাস্করী, ৩ দ্বয়।



গুরু ও শাস্ত্র-সাহায্যে বিচার দ্বারা শ্রবণ ও মনন করিলে গুরুপদটি তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে অধিকার জন্মে না; সুতরাং পরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য বিবিধ তত্ত্বের বিচারাদি আবশ্যক হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে কৰ্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন পূৰ্ব্বক ধ্যান-ধারণাদির ফলেই চরমজ্যেষ্ঠ তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সে জন্য মুমুক্শু মাত্রকেই যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জায়হরেকার মহর্ষি গোতমও শেষে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই সর্বদংশঃ ছিন্ন হইয়া যায়। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য, বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিবার জন্য দার্শনিক ঋষিগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বর্ণন করিলেও তাঁহাদিগের মতভেদ দেখিয়া প্রকৃত অধিকারীর শ্রবণ-মননাদি সাধনা আজও উদ্ভিয়া যায় নাই। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-গুলির বিচার ও সমালোচনা হইয়াছে। তাহার ফলে যে, জ্ঞান-রাজ্যের কোনই উন্নতি হয় নাই, তদ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের পথে আজ পর্য্যন্ত কোন লোকই যে অগ্রসর হন নাই, ইহা বলিলে পরম সত্যের অপলাপ করা হইবে। ঋষিগণ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ, আচার্য্যগণ সূত্রির কাল হইতে বহু প্রকারে জ্ঞানরাজ্যের বিপুল বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদেরিগের গুরু। সকলের সিদ্ধান্তই তত্ত্বনির্ণায়ক জাতব্য। সিদ্ধান্তের ভেদ না থাকিলে বিচার প্রবৃত্ত হয় না; এ জন্য মহর্ষি গোতম যোড়শ পদার্থের মধ্যে সিদ্ধান্তের বিশেষ উল্লেখপূৰ্ব্বক সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ বলিয়া সিদ্ধান্তের ভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গোতম অত্র দর্শনের সিদ্ধান্তকেও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। সকল সিদ্ধান্তবাদীই বিভিন্ন প্রকার তর্কের দ্বারা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তকে শ্রোত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বিচারদ্বারা তত্ত্বনির্ণায়ক সে সমস্ত ব্যাখ্যাও আলোচ্য। ন্যায়চার্য্যগণ বৈরূপে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণ্যস্থানে পাওয়া যাইবে। এখন প্রকৃত কথা এই যে, মুমুক্শু তত্ত্ব শ্রবণের পরে বহু হেতুর দ্বারা ঐ তত্ত্বের যে মনন করিতে হইবে, তাহাতে ন্যায়দর্শন সকল সম্প্রদায়েরই পরম সহায়। কারণ, জায়দর্শনে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তের মননের হেতু বলা হইয়াছে, তাহা সকল সাধকেরই গ্রাহ্য। আত্মা নিত্য, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপে বহু হেতুর দ্বারা দীর্ঘকাল মনন করিলে পরলোক, জন্মান্তর কৰ্ম্মকল প্রভৃতি সিদ্ধান্তে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ঐ সকল সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস সকল সাধকেরই সর্বগ্রাে আবশ্যক। এইরূপ আরও অনেক সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তের সমর্থন জায়দর্শনে আছে। জায়দর্শন যে ঐ সকল মননের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা নির্ণিবাদ। পরন্তু যে সম্প্রদায় গুরুপদেশ অনুসারে বৈরূপেই যে তত্ত্বের মনন করিবেন, ঐ মননের হেতুজ্ঞান এবং ঐ হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার নিত্যই আবশ্যক। অনুমানরূপ মনন নির্বাহ করিতে হইলে তাহাতে যে সকল জ্ঞান আবশ্যক, তাহা জায়শাস্ত্রের সাহায্যেই সম্যক্ লাভ করা যায়। হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বর্থাৎকরণে মনন হইতেই পারে না। সুতরাং বেদের আদেশানুসারে সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই যখন অনুমানরূপ মনন করিবেই হইবে, তখন সেই মনন নির্বাহের জন্য ন্যায়শাস্ত্র সকলেরই আবশ্যক। শ্রবণ-মননের কোনই প্রয়োজন নাই, পরন্তু শাস্ত্র-বিচার ও তর্ক,

ভক্তির পরিপন্থী ; সুতরাং ইহা বর্জনীয়, ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে। শাস্ত্রাহুদারী কোন সম্প্রদায়ই ইহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না। শ্রবণ ও মনন ব্যতীত কেহ উত্তমাবিকারী হইতে পারে না। যে কোন জন্মে শ্রবণ ও মনন করিয়া মহাস্বর্ণগণ সকলেই উত্তমাবিকারী হইয়াছেন এবং সকলকেই তাহা করিয়া উত্তমাবিকারী হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবও শাস্ত্রব্যক্তি-অনিপুণ ব্যক্তিকেই উত্তমাবিকারী<sup>১</sup> বলিয়া কৃতশ্রবণ ও কৃতমনন ব্যক্তিকেই উত্তমাবিকারী বলিয়াছেন এবং তিনি জিজ্ঞাসু সম্মানিগণকে তাঁহার অবলম্বিত ঈশ্বর-পরিণাম-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইয়া হেতু ও দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ঐ সিদ্ধান্তে আপত্তি খণ্ডন পূর্বক তর্কযারা নির্জিকাররূপে ঈশ্বরের মনন-পদ্ধতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসাবশতঃই দেখানে বহু বিচার ও তর্ক করেন নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক<sup>২</sup>।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণের বাক্য অবলম্বনে অনেক কণার আলোচনা করা গেল। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে ১০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িলে ভাষদর্শনের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যাইবে। পুনরুক্তি অকর্তব্য বলিয়া এখানে আর যে সকল কথা বলা গেল না।

### ভাষদর্শনের অধ্যায়াদি-সংখ্যা

ভাষদর্শনে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহিক আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এক দিবসে যতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাই একটি আহিক নামে কথিত হইয়াছে। দশ দিনে সমস্ত ভাষসূত্র রচিত হওয়ায় দশটি আহিক হইয়াছে। কিন্তু ভাষ-সূত্রকার মহর্ষি সর্বপ্রথমে এক দিবসে যতগুলি সূত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তাহাই আহিক নামে কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। বাচস্পত্য অভিধানে পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচ-স্পতি আহিক শব্দের অস্তুতম অর্থ লিখিয়াছেন, সূত্রগ্রন্থের ভাষার পাদাংশ ব্যাখ্যাবিশেষ। এবং এক দিবসে পাঠ্য, ইহাই ঐ আহিক শব্দের বৌগিক অর্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সূত্রগ্রন্থের অংশবিশেষও আহিক নামে কথিত হইয়াছে। তদনুসারেই তাহার ভাষারও অংশবিশেষ আহিক নামে কথিত বলিয়া বুঝা যায়। পরে যে দেবীপুরাণের বচন প্রদর্শন করিব, তাহাতে ভাষসূত্রকার গোতম দশ দিনে প্রথমে শিব্যগণকে ভাষসূত্র পড়াইয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইবে।

পঞ্চাধ্যায়ী ভাষসূত্রই যে মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি

১। শাস্ত্রব্যক্তি-অনিপুণ দূঢ় শ্রদ্ধা যার।

উত্তমাবিকারী হিহো তাৎপরে সংসার।—টো. ৫০, মধ্য, ২২।

২। অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।

বেঙ্কায় ভগবৎরূপে পায় পরিণাম।

তৎকালি অচিন্ত্য শক্তো হুয় অবিকারী।

প্রাকৃত মণি তারে দৃষ্টান্ত যে ধরি।

মানা রত্নরাশি হয় চিত্তামণি বৈভেত।

তৎকালিহ মণি রহে স্বরূপ অবিবৃতে।

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।

ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইহে কি বিষয়।

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৭ম পং।



আচার্য্যগণ নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কোন সংশয়েরও সূচনা করেন নাই। কিন্তু এখন কোন কোন ঐতিহাসিক মনীষীর সমালোচনায় ইহাও পাইয়াছি যে, প্রচলিত ভ্রাম-দর্শনের অবিকাংশ সূত্রই পরে অত্র কর্তৃক রচিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পরে রচনা করিয়া সংযোজিত করা হইয়াছে। ঐ সকল অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতের আলোচনা থাকায়, উহা বৌদ্ধ-যুগে রচিত এবং মূল ভ্রামশাস্ত্র কেবল হেতুবিদ্যা; উহাতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন কথাই ছিল না। এই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নবীন মতের আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থ-শেষে সমালোচনা দ্বারা সকল কথা বুঝা যাইবে।

পঞ্চাধ্যায় ভ্রামদর্শনই মহর্ষি অকপাদের প্রণীত, এ বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদের চিহ্ন না থাকিলেও ভ্রামসূত্রের সংখ্যা ও অনেক সূত্র পাঠে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দেখা যায়। বাংভ্রাম্যনের পূর্ক হইতেই নানা কারণে ভ্রামসূত্র বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল। বাংভ্রাম্যন ভ্রামসূত্রের উদ্ধার করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাংভ্রাম্যনের পূর্বেও যে ভ্রামসূত্রের সংখ্যা ও পাঠ লইয়া বিবাদ ছিল, তাহা বাংভ্রাম্যনের কথার দ্বারাও অনেক স্থানে মনে আসে। বথাস্থানে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। বাংভ্রাম্যন ভ্রাম-ভাষ্যে ভাব্যলক্ষণানুসারে প্রথমতঃ সূত্রের ভ্রাম সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করিয়া পরে নিজেই ঐ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাকেই বলে “স্বপদ-বর্ণন”। পরে বাংভ্রাম্যনের ঐ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলির মধ্যে অনেক বাক্যকে অনেকে ভ্রামসূত্র-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার প্রকৃত ভ্রামসূত্রকেও অনেকে বাংভ্রাম্যনের ভাব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে হস্ত-লিখিত পুথিতে সূত্র ও ভাষ্য কোন চিহ্নাদি যোগ ব্যতীত লিপিবদ্ধ থাকায় অনেকের ঐরূপ ভ্রম হইয়াছে। সেই ভ্রমের ফলেও ভ্রামসূত্র বিষয়ে কতকগুলি মত-ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। আবার অনেকে স্বমত সমর্থনের জন্তও ভ্রামসূত্রের কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। ভ্রামসূত্র-বিবরণকার রাখানোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য চতুর্থাধ্যায়ের সর্বশেষে “তদ্বস্ত্ব বাদরাগণং” এইরূপ একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া তাহারও বিবরণ করিয়া গিয়াছেন। ভাব্যকার বাংভ্রাম্যন হইতে বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ পর্যন্ত কোন আচার্য্যই ঐরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; ঐ ভাবের কথাই কেহ বলেন নাই। নবীন গোস্বামিভট্টাচার্য্য যে ঐ সূত্রটি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। তিনি ঐ সূত্রটি কোন পুস্তকে পাইয়া, উহা নাসূত্র হওয়াই সম্ভব ও আবশ্যক মনে করিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ঐ সূত্রটি যে পরে কোন পণ্ডিতের রচিত, ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। মহর্ষি অকপাদ ভ্রামদর্শনে বলিবেন যে, “যাহা বলিলাম, তাহা তত্ত্ব নহে। তবু কিন্তু বাদরাগণ হইতে অর্গাং বেদব্যান-প্রণীত শাস্ত্র হইতে জানিবে”, ইহা কি সম্ভব? কোন দর্শনকার যমি কি এইরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন? গোস্বামি ভট্টাচার্য্যও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা সংগত বোধ না হওয়ায় কষ্ট-কল্পনা করিয়া অত্র প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ঐরূপ ভাব একেবারে যায় নাই। ফলকথা, বহু কারণেই ভ্রামসূত্রের সংখ্যা ও পাঠ বিষয়ে বহু মত-ভেদ হইয়াছে।

প্রাচীন উদ্যোতকরের সময়েও ন্যায়সূত্র-পাঠে মত্তভেদ ছিল, ইহা তাঁহার বার্তিকে প্রকটিত আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অতিরিক্ত কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ পূর্বক তাহার বৃত্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকারের সংক্ষিপ্ত বাক্যমধ্যেও তাঁহার কোন কোন সূত্র দেখা যায়। বিশ্বনাথের পূর্বে উদয়নাচার্য্য বোগসিক্তি বা ন্যায়পরিশিষ্ট নামে এবং গবেশের পুত্র বর্তমান উপাধ্যায় “অবীক্ষানর-তত্ত্ববোধ” নামে স্তায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। মিথিলেশ্বরস্বরি নবীন বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়-তত্ত্বালোক নামে ন্যায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়া ন্যায়সূত্র-পাঠ নির্ণয়ের জন্য ন্যায়সূত্রোক্তার নামে গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছেন। ফলকথা, ন্যায়সূত্র-পাঠাদি বিষয়ে সূচিরকাল হইতেই যে নানা নতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নানা গ্রন্থের দ্বারা ই বুঝা যায়। এবং তাহার দ্বারা পূর্বকালে স্তায়সূত্র যে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হইয়া বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল, ইহাও বুঝা যায়। তাহাতেই সর্বতত্ত্বতত্ত্ব শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকা নির্মাণ করিয়াও স্তায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠাদি বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবার জন্য “স্তায়সূচীনিবন্ধ” রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ গ্রন্থে স্তায়দর্শনের পাঁচ অধ্যায়ে যে যে সূত্রের দ্বারা যে নামে যে প্রকরণ আছে, তাহাও সেই স্থানেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে আবার সমস্ত সূত্রাদির গণনার দ্বারা ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, “এই স্তায়শাস্ত্রে অধ্যায় ৫। আঙ্কিক ১০। প্রকরণ ৮৪। সূত্র ৫১৮। পদ ১৭২৬। অক্ষর ৮৩৮৫। বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে সমস্ত স্তায়সূত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্ধারণ করিয়া কেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা সুদীর্ঘ চিন্তা করিয়া দেখুন। স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকাকার সর্বতত্ত্বতত্ত্ব শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রই যে “স্তায়সূচীনিবন্ধ” রচনা করিয়াছেন, ইহাই পণ্ডিতদলদের সিদ্ধান্ত। কারণ, স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি স্তায়সূচীনিবন্ধের প্রারম্ভেও দেখা যায় এবং স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে “ইচ্ছামঃ কিমপি পুণ্যং” ইত্যাদি যে চতুর্থ শ্লোকটি আছে, উহা ( চতুর্থ চরণ “উদ্যোতকরণবীনাং” এই স্থলে “শ্রীগোতমদ্বগবীনাং” এইরূপ পরিবর্তন করিয়া ) “স্তায়সূচীনিবন্ধে”র শেষে উল্লিখিত দেখা যায় এবং স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার শেষে কথিত “সংসারজলধিনৈতৌ” ইত্যাদি শ্লোকটিও স্তায়সূচীনিবন্ধের শেষে দেখা যায়। গ্রন্থারম্ভেও “শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ” এইরূপ কথা রহিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র নামে অন্য কোন পণ্ডিত, ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে তিনি সুবিখ্যাত বাচস্পতিমিশ্রের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকাদি লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের পরিচয়-বোধের বিরোধি কার্য্য কেন করিবেন? ঐ সব শ্লোক তাহার নিবন্ধ করিবার কারণই বা কি আছে? অন্য কোন একজন পণ্ডিত “স্তায়সূচীনিবন্ধ” রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষে অপর কেহ তাৎপর্য্যটীকাকারের শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কোন কারণ নাই। নিকারণে ঐরূপ কল্পনা করিলে নানা গ্রন্থেই ঐরূপ বর্ণনা করা যায়। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার যেসকল সূত্রপাঠের উল্লেখ করিয়াছেন, স্তায়সূচীনিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাহার সাম্য দেখা যায়। হুই এক স্থানে যে একটু বৈষম্য দেখা যায়, তাহা লেখক বা সূত্রাকরের প্রমাদ-জন্ম, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। বৃত্তিত



তাৎপর্যটীকা গ্রন্থে অনেক স্থলে স্তায়সূত্র পাঠের উল্লেখ দেখাও যায় না ( দ্বিতীয়াদ্যায়ের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য )। আবার মুদ্রিত তাৎপর্যটীকার লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ কোন কোন স্থলে অনেক অংশ মুদ্রিতও হয় নাই; ইহাও এক স্থলে ভাষাব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি ( ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ফলকথা, তাৎপর্যটীকা গ্রন্থের সহিত স্তায়সূত্রানিবন্ধের কোন বিরোধ নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু স্তায়সূত্রানিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাৎপর্যটীকার সূত্রপাঠের যে নাম্য দেখা যায়, তাহার দ্বারা তাৎপর্যটীকার বাচস্পতি মিশ্রই যে স্তায়সূত্রানিবন্ধকার, ইহা বুঝা যায়। এই গ্রন্থের টিঙ্গনীতে যথাস্থানে তাহা দেখাইয়াছি এবং স্তায়সূত্রপাঠে মতভেদের আলোচনাও করিয়াছি। উদ্যোতকর স্তায়বার্ত্তিকে স্তায়সূত্রগুলির উদ্ধার করিয়াই পরে তাহার নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সৰ্বত্র তাহার সমস্ত সূত্রপাঠ নির্ণয় করা যায় না। মুদ্রিত বার্ত্তিক গ্রন্থে সূত্রপাঠের বৈষম্যও দেখা যায়। উদ্যোতকর বার্ত্তিকনিবন্ধে অনেক স্থলে “ইহা সূত্র” ইত্যাদি প্রকারে সূত্রের পরিচয় দিলেও অনেক স্থলে ঐরূপ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু কোন স্থলে সূত্রপাঠে বিবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের টীকা করিয়াও শেষে স্বতন্ত্রভাবে স্তায়সূত্রের পাঠাদি নির্ণয়ের জন্য স্তায়সূত্রানিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে সমস্ত স্তায়সূত্রের অক্ষপাদ-সংখ্যা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি ইহাতে প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত বহুশ্রুত মহানবী তাৎপর্যটীকার বাচস্পতি মিশ্রের স্তায়সূত্রানিবন্ধই সৰ্বাপেক্ষা মান্ত। তাই স্তায়সূত্রানিবন্ধানুসারেই সূত্রপাঠাদি গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে স্তায়সূত্রানিবন্ধের সূত্রপাঠেরও সমালোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে স্তায়সূত্রানিবন্ধানুসারেই সেই অধ্যায়ের প্রকরণগুলির নাম ও সূত্রসংখ্যা প্রকাশ করিয়াছি। প্রথমাদ্যায়ের প্রকরণাদি-সংখ্যা এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### স্তায়সূত্রকার মহর্ষির নামাদি

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বহু আচার্য্য স্তায়সূত্রকার মহর্ষিকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্তায়সূত্র যে মহর্ষি গোতম বা গোতম মুনির প্রণীত, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ আছে; বহু গ্রন্থকারও তাহা লিখিয়াছেন। স্তায়সূত্রকার মহর্ষির অক্ষপাদ নামবিষয়ে কোন বিবাদ নাই; কিন্তু তিনি যে গোতম বা গোতম, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। কেহ বলেন গোতম, কেহ বলেন গোতম। গোতম মুনি বলিলে অস্ত্র গোতম মুনিকেও বুঝা যাইতে পারে, এই জন্তই মনে হয়, ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি দূরদর্শী আচার্য্যগণ অক্ষপাদ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন অক্ষপাদ কোন্ মুনির নামান্তর, ইহা জানিতে পারিলেই স্তায়সূত্রকার মহর্ষির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অতুলসন্ধানের ফলে সন্দেহপূরণে পাইয়াছি, অহল্যাপতি গোতম মুনির নামান্তর অক্ষপাদ। অহল্যাপতি ঋষি যে গোতম, ইহা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে

১। অক্ষপাদো মহারোগী গোতমাখোহতবদমুনিঃ।

গোদারীসমনেতা অহল্যায়্য পতিঃ শ্রুতঃ—মহাভারতঃ কুমারিকাণ্ডে, ৫৪ জা, ৫ শ্লোক।

পাওয়া যায় এবং তিনি গৌতম নামেই সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারতাদি বহু গ্রন্থের গৌতম পাঠ অশুদ্ধ বলা এবং ঐ সুপ্রসিদ্ধিকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ নৈষধীর চরিত্রে ইন্দের নিকটে চার্বাকের কথা বর্ণন করিতে স্মারশাস্ত্রবক্তা মুনিকে গৌতম নামে উল্লেখ করিয়াছেন<sup>১</sup>। চার্বাক স্মারশাস্ত্রবক্তা মুনিকে গৌতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠ বা মহাবৃষভ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, ইহা শ্রীহর্ষ ঐ শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ গৌতম বলিয়াও ঐ উপহাস বর্ণন করিতে পারিতেন। কারণ, গৌতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠের বংশধর, এই অর্থেও গৌতম বলিয়া চার্বাক ঐ ভাবে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ বখন গৌতম নামের উল্লেখ করিয়াই চার্বাকের উপহাস বর্ণন করিয়াছেন এবং “গৌতমং তং অবৈতৈব বধা বিধ্বং তথৈব সঃ” অর্থাৎ তেনার বিচার করিয়াই তাহাকে গৌতম বলিয়া যেমন জান, তিনি তাহাই, এইরূপ কথা বলিয়া ঐ উপহাস বর্ণন করিয়াছেন, তখন শ্রীহর্ষ যে স্মারশাস্ত্রবক্তা মুনিকে গৌতমই বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈষধীর চরিত্রের চার্বাকারগণও ঐ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৌতমের বহু অপত্য বুঝাইলেই পারিনি সূত্রোক্তগারে গৌতম পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং “গৌতমং” এই প্রয়োগে গৌতমের অপত্য বুঝাও যায় না।

রামায়ণাদি বহু গ্রন্থে আমরা অহল্যাপতি শ্বশুর গৌতম নামে উল্লেখ দেখিলেও এবং এ দেশে এইরূপ সুপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মিথিলার তিনি গৌতম নামে প্রসিদ্ধ, ইহাও জানা যায়। বর্তমান দারভাঙ্গা ষ্টেশনের ৭ ক্রোশ উত্তরে কানতৌল ষ্টেশন। সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে গৌতমের আশ্রম নামে সুপ্রসিদ্ধ একটি স্থান আছে। তত্রতা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কথায় জানা যায়, ঐ আশ্রমেই গৌতম মুনি তপস্বী করিয়া গৌতমী গঙ্গা আনয়ন করেন। তদ্ব্যতীত যে কূপ আছে, তাহা দেবদত্ত কূপ। এক সময়ে গৌতম মুনি পিপাসায় পীড়িত হইয়া দেবগণের নিকটে জলপ্রার্থী হইলে দেবগণ অদূরস্থ কূপকে উদ্ধৃত করিয়া যে দিকে গৌতম শ্বশুর অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিক দিয়া বক্রভাবে প্রেরণ করেন। এইরূপে কূপ গইয়া দেবগণ জলের দ্বারা গৌতম শ্বশুরকে পরিতৃপ্ত করেন। ঋগ্বেদসংহিতায় এইরূপ বর্ণন আছে। পূর্বোক্ত গৌতমের আশ্রমের দুই ক্রোশ দূরে “আহিরিয়া” নামে প্রসিদ্ধ অহল্যাস্থান আছে। বর্তমান ছাপরা নগরীর সম্মিহিত গঙ্গাতীরেও অহল্যাপতি গৌতমের অপর আশ্রম ছিল। কিছু দিন পূর্বে মহাশি গৌতমের স্মরণার্থ ঐ স্থানে “গৌতম পাঠশালা” নামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সদাশিব গবর্ণমেন্ট ঐ পাঠশালার মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কিন্তু

১। মূলত্রে ২১ শিলাহার শাস্ত্রবৃদ্ধে সচেতনঃ।

গৌতমঃ তমবৈতৈব বধা বিধ্বং তথৈব সঃ। ১৭, ৭৫।

২। সচেতনঃ চৈতন্যবানঃ। স্বপ্নবোধোদভবাকার্য শিলাহার পাণ্ডলাবহাজপারি মুক্তয়ে মুক্তিঃ প্রতিপাদয়িতুঃ। শাস্ত্র-  
বৃদ্ধঃ স্মরণশীলঃ নিঃস্মরণঃ, যুগ্মঃ তং স্মরণেন অস্মিতা কিয়দৈব গৌতমঃ। এতদ্রামানঃ বধা বিধ্বং জানীত স এন তদা নাক  
ইত্যর্থঃ। স গৌতমো বধা যুধ্যাকঃ সমস্তপুত্রা মমাপীত্যর্থঃ। নামঃ পরং নারো গৌতমঃ, কিন্তু প্রকৃত্তো সৌঃ গৌতমো  
মহাবৃষভঃ পশুতরো। চার্বাকার্যঃ।



মিথিয়ার আশ্রমেই জায়হুজ রচিত হইরাছে, মিথিলাতেই জায়হুজের প্রথম চর্চা, ইহা মৈথিল পণ্ডিতগণের নানা কারণে বিশ্বাস। ( পূর্বোক্ত গোতমের আশ্রম সম্বন্ধে মৈথিলবারী “জায়তবর্ষ” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য )। বস্তুতঃ ঋগ্বেদসংহিতার গোতম ঋষির কৃপ লাভের কথা আমরা দেখিতেছি। ঐ মহত্বের পূর্বমস্তের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য পূর্বোক্তরূপ আখ্যায়িকার বর্ণন করিয়াছেন। রাহুগণ গোতম ঐ মহত্বের ঋষি। কানী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়াক্ষর বহুদর্শী ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিদ্যোত্তরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় প্রথমে জায়কন্দলীর ভূমিকার, মৎস্তপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত উশিজ মহাবীর পুত্র দীর্ঘতমা নামে অন্ধ গোতমকে জায়হুজকার বলিয়াছিলেন। পরে জায়বার্তিক-ভূমিকার তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত অজ্ঞাতমূলক বলিয়া নানা কল্পনার আশ্রয়ে রাহুগণ গোতমকেই জায়হুজকার বলিয়াছেন। তিনি স্তম্ভদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া তাঁহার শাস্ত্রকর্তৃত্ব সম্ভব। দীর্ঘতমা গোতম অন্ধ, তাঁহার শাস্ত্র-কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। পরন্তু অন্ধের অঙ্গপাদদ্ব প্রমাণ সহস্রেও হয় না। রাহুগণ (রহুগণপুত্র) গোতম বিদেবরাজের পুরোহিত ছিলেন, ইহা শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। অহল্যার পুত্র শতানন্দ জনকরাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহা বায়ীকি রামায়ণেও বর্ণিত আছে। স্তত্রং রাহুগণ গোতমই অহল্যাপতি। তাঁহারই পুত্র শতানন্দ। তিনি গোতম নহেন। শ্রীহর্ষও জায়হুজকারকে গোতম বলিয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয়ের এই সকল কথা ও শেব সিদ্ধান্ত “জায়বার্তিক ভূমিকা” পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

দ্বিবেদী মহাশয়ের যুক্তির বিচার না করিয়া এখন এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি ঋগ্বেদাদি-বর্ণিত রাহুগণ গোতমকেই অহল্যাপতি ও জায়হুজকার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, বিদেব-রাজবংশে তাঁহার পুরোহিত্য নিবন্ধন জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও তিনি গোতমবংশীয় বলিয়া তাহাকে গোতম বলিতে হয়। কারণ, বৌদ্ধায়ন, গোত্রপ্রবর্তক সপ্তর্ষির মধ্যে বে গোতমের নাম ( পাঠান্তরে গোতম ) বলিয়াছেন, তাঁহারই দশটি শাখার মধ্যে রাহুগণ সপ্তম শাখা। বৌদ্ধায়ন গোতমকাণ্ডে ( ২ অঃ ) রহুগণ ঋষিকেও গোতম-

১। বিজ্ঞান দুহুদেহবতঃ তয়া দিশাহ-

সিচ্চরংসং গোতমায় ভূকলে।

আগচ্ছ্যতমবস্যা চিত্তভানবঃ

কামঃ বিপ্রস্ত তর্পয়ত ধামতিঃ ১১ মঃ ১৪মঃ ৮২হুক্ত। ১১।

নাথপত্ন্যা।—মন্তব্যঃ “হবতঃ” উচ্ছৃতা কৃপাং বক্তাং নিশি ঋষির্জনিত “তয়া দিশা” “বিজ্ঞাং” বক্তাঃ ত্রিযাক্ষঃ “দুহুদে” প্রেরিতবস্তাঃ। এযং কৃপাং নীচা কথ্যাস্তদেবহৃদ্যাঃ “ভূকলে” ভূমিতার “গোতমায়” তদর্থাৎ “উৎসং” জলপ্রবাহঃ কৃপাচ্ছৃতা “অসিকন্” আহবেতবানয়ন্। এযং কৃপা “ইমং” এযং স্তোত্রায়ঃ যদি “চিত্তভানবঃ” বিচিত্রদীপ্তযুক্তে মন্তব্যঃ “হবতঃ” ইদৃশেন রক্ষণেন নহ “আগচ্ছতি” তৎসমীপং প্রাপ্নুযতি। জালাঃ “বিপ্রস্ত” মেধাধিনো গোতমস্ত “কামঃ” অভিলষাঃ “ধামতিঃ” আয়তো দারকৈরনকৈঃ “তর্পয়তঃ” অতর্পয়ন্।

২। বিদেবো হ মাধবোহস্মি বৈতানবঃ যুগে বজ্রায়। স্তত্র গোতমো রাহুগণঋষিঃ পুরোহিত আসি। ৩মঃ। ১৩১।

গণের মধ্যে বলিয়াছেন। স্মৃতরাং রাহুগণ যদি সোত্রপ্রবর্তক মূল পুরুষ গোতমের অপত্য হওয়ার তিনি গোতম। ফলকথা, রাহুগণ যে গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম নহেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই (“নির্ণয়সিদ্ধ” গ্রন্থের গোত্রপ্রবর-নির্ণয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। স্মৃতরাং তিনি স্মৃতদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া গোতম-বংশে তাঁহার প্রাচীন নিবন্ধন বেদে মূল পুরুষ গোতম নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হয়। পূর্বকালে মূল পুরুষের নামেও প্রধান ব্যক্তির নাম ব্যবহার ছিল। জনক রাজার পূর্বপুরুষ নিমিরাজার পৌত্র জনক প্রথম জনক রাজা ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই রাজা জনক জনক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহা বান্দীকি রামায়ণের কথায় বুঝা যায় (আদিকাণ্ড, ৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য)। গোত্রকারী সপ্তর্ষি বসিষ্ঠাদিও পূর্ববর্তী বসিষ্ঠাদির অপত্য বলিয়া গোত্র হইয়াছেন অর্থাৎ বসিষ্ঠাদির অপত্যও বসিষ্ঠাদি নামে গোত্র হইয়াছেন, ইহাও “নির্ণয়সিদ্ধ” গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। এখন যদি রাহুগণ, গোতমবংশীয় হইয়াও পুরোহিত কারণে বেদে গোতম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীহর্ষও ঐ প্রসিদ্ধি অনুসারে এবং বৈদিক প্রয়োগানুসারে তাঁহাকে গোতম বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। নচেৎ গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম মূনি অথবা অজ্ঞ কোন গোতম মূনি জায়হৃৎবক্তা, এ বিষয়ে অজ্ঞ কোন প্রমাণ না থাকায় শ্রীহর্ষ তাহা কিরূপে বলিবেন? স্বন্দপুরাণে যখন অহল্যাপতি গোতম মূনিরই অক্ষপাদ নাম পাওয়া যাইতেছে এবং নিখিলা প্রদেশে অহল্যাপতি মূনিই জায়হৃৎ রচনা করেন, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কারও তদেন্দীয় এবং এতদেন্দীয় বহু পণ্ডিতের আছে, তখন অজ্ঞ বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত অজ্ঞ কোন গোতম বা গোতম মূনিকে জায়হৃৎকার বলা যাইতে পারে না। মহা-মনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাচস্পত্য অভিধানে অহল্যাপতি মূনিকে গোতমই বলিয়াছেন। তিনি স্বন্দপুরাণের বচনের উল্লেখ করেন নাই। তিনি খেতবাবাহ কল্পে ব্রহ্মার মানস পুত্র গোতমের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই জায়হৃৎকার বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষপাদ নামের বা জায়হৃৎ-কর্তৃত্বের কোন প্রমাণ দেন নাই। পরে পুরোহিত শ্রীহর্ষের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মৃতরাং তিনি শ্রীহর্ষের শ্লোকানুসারেই জায়হৃৎকারকে অহল্যাপতি গোতম বলেন নাই, ইহা বুঝা যায়। বিশ্বকোবেও তাঁহারই কথার অনুবাদ করা হইয়াছে। শ্রীহর্ষের শ্লোকে আরও অনেকেই নির্ভর করিয়াছেন। আমিও তদনুসারে এই গ্রন্থে জায়হৃৎকারকে বহু স্থলে গোতম নামে উল্লেখ করিয়াছি। যে কারণেই হউক, শ্রীহর্ষ যখন জায়হৃৎকারকে গোতম বলিয়াছেন, তখন তদনুসারে জায়হৃৎকারকে গোতম বলা যাইতে পারে। তবে শ্রীহর্ষের ঐরূপ উল্লেখের পুরোহিত প্রকার কারণ বুঝিলে সাদৃশ্য হয়; অহল্যাপতি মহর্ষির গোতম নামেরও অপলাপ করিতে হয় না, লোকপ্রসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করিতে হয় না। বাহাতে সর্বসামঞ্জস্য হয়, সেইরূপ চিন্তা না করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চিন্তাই কর্তব্য নহে।\*

১। যদ্যপি বসিষ্ঠাবীনাং ন গোত্রকং যুক্তং তেষাং সপ্তর্ষিভ্যম্ তদনুজ্ঞাতাভাবাৎ তদ্যপি তৎপূর্বজাবিবসিষ্ঠাভা-  
শতাত্মেন সোত্রকং যুক্তং।—অতএব পূর্বকথাঃ পরোক্ষাৎ এতদ্ব্যসোক্তা। নির্ণয়সিদ্ধ, ২০২ পৃষ্ঠা।

\* পরে দেবীপুরাণের কোন কালে গহিরাঙ্কি, “গদা বাচা তমরতি পদমতি” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে



গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গৌতমের শিষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এক সময়ে গৌতমের মতের নিন্দা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর এ চকুর দ্বারা উহার মুখ দর্শন করিব না। শেষে বেদব্যাস জ্ঞতির দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ যোগবলে নিজ চরণে চক্ষুঃ স্থষ্টি করিয়া তদ্বারা বেদব্যাসকে দর্শন করেন। তখন বেদব্যাস অক্ষপাদ নামোক্তে তাঁহার জ্ঞতি করায় তিনি তখন হইতে অক্ষপাদ নামে অভিহিত হন। এই প্রবাদের মূলে ঐক্যপট্ট ঘটনা আছে কি না বা ঐক্যিতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও বাচস্পত্য অভিধানে (অক্ষপাদ শব্দে) পূর্বোক্ত প্রকার প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা পৌরাণিক কথা। কিন্তু অশেষ-শাস্ত্রদর্শী তর্কবাচস্পতি মহাশয় অস্বাভাব্য মূলে পুরাণাদি গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিয়াও ঐ স্থলে ঐ কথা কোন্ পুরাণে আছে, তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনিও পূর্বোক্ত প্রবাদদ্বারা ঐ কথা কোন পুরাণে আছে, ইহা বিশ্বাস করিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রবাদই একেবারে নিমূল হয় না। ঐতিহ্য বা জনশ্রুতির নিরপেক্ষ প্রামাণ্য না থাকিলেও উহার মূল একটা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, দেবীপুরাণের শুভ-নিশুভ-মখন-পাদে গৌতমের অক্ষপাদ নাম ও জ্ঞানদর্শন রচনার কারণাদি বর্ণিত আছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, রজিপুরাণের মোহনের জন্ত এক সময়ে নাস্তিক্য মতের প্রচার হয়; তাহার ফলে বাগবদ্ভাদি বিলুপ্ত হইতে থাকে। তখন দেবগণ শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার আদেশে গৌতমের শরণাগত হন। গৌতম তখন নাস্তিক্য মত নিরাসের জন্ত যাত্রা করিলে, শিব শিশুরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নাস্তিক্য মতের অতুল তর্ক করিতে থাকেন। সপ্তাহ কাল বিচারে কাহারও পরাজয় না হওয়ায় গৌতম চিন্তিত হইয়া মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন শিব গৌতমকে উপহাস করিয়া বলেন যে, 'হে বেদবর্ধক মূলে। মেধাবিন্। তুমি এই ক্ষুদ্র নাস্তিক বালক আমাকে পরাজিত না করিয়া কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ? তুমি কিরূপে সেই বৃদ্ধ, লোক-সম্মত, বিদ্বান্ নাস্তিকগণকে মহাযুদ্ধে নিরস্ত করিবে? অতএব শীঘ্র পলায়ন কর। তখন গৌতম মুনী তাঁহাকে

জ্ঞানপুরুষকার অক্ষপাদ "গৌতম" নামে এক গৌতমের বংশজাত বলিয়া "গৌতম" নামেও অভিহিত হইয়াছেন। পূর্বোক্ত অর্থে অক্ষপাদ "গৌতম" নামে অভিহিত হইলেও কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। সে কখনই এই—

যৌর্জীক্ তদৈব তময়ন্ পরান্ গৌতম উচ্যতে।

গৌতমাত্মজয়েতি গৌতমোহপি স চাক্ষপাৎ ॥

—ভট্টনিশুভমখনপাদ, ১৩ অঃ

২। ভো মূলে বেদবর্ধক কিং তুমীমাত্ততে চিরঃ।

মামনির্জিতা মেধাবিন্ ক্ষুদ্রনাস্তিকবালকঃ।

বন্ধঃ বিভ্রমো বুদ্ধান্ নাস্তিকান্ লোকসম্মতান্।

বিরোবাসি মহাযুদ্ধে তং পলায়নং মাচিতঃ।

শিব বলিয়া বুদ্ধিগা তাহার ভব করিলে শিব তাহার প্রার্থনামুদারে তাহাকে ব্যবহানরূপ দর্শন করাইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া<sup>১</sup> বলিলেন যে, তুমি তর্কে কুশল, তুমি ভিন্ন বাদ-যুদ্ধের দ্বারা আর কে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে ? আমি তোমার এই বাদের জন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমার নাম ধারণ করিব, তুমি ত্রিনেত্র হইবে। শিব যখন এই সকল কথা বলেন,<sup>২</sup> তখন তাহার বাহন বৃষ, নিজ দন্ত-লিখিত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থকে প্রদর্শন করতঃ জ্ঞপ্ত করেন। পশ্চাৎ শিবের কৃপা লাভ করিয়া গৌতম মুনি ঐ যোড়শ পদার্থের ঈক্ষা অর্গাৎ দর্শন করায় তিনি “আবীক্ষিকী” নামে বিদ্যা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন এবং শিবের আদেশবশতঃ তিনি নাস্তিক্য-মত-নাশিনী ঐ বিদ্যাকে দশ দিনে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করান। তাহার কিছু কাল পরে<sup>৩</sup> বেদব্যাস

- ১। সাধু গৌতম ! ভঙ্গস্তে তর্কেণ কুশলো হসি।  
 বাহুতে বাহুদ্বয়েন কো মাং তোষয়িতুং ক্রমঃ ।  
 অনেকেন তব বাসেন তেজিতোহহং মহামুনে ।  
 ত্বমাস ধারয়িষ্যামি ত্বং ত্রিনেত্রো ভবিষ্যসি ।
- ২। ইত্যেকং ব্রহ্মতঃ শস্তোজ্জ্বলন্তে বাহনো বৃষঃ ।  
 দর্শয়ন্ দন্তলিখিতান্ প্রমাণানীশ্চ যোড়শ ।  
 শস্তোঃ কৃপামনুগ্রাণ্য বদীকামকরোমুনিঃ ।  
 তেন চাবীক্ষিকীসংজ্ঞা বিদ্যাঃ প্রাবর্তয়ৎ কিস্তৌ ।  
 আদেশেন শিবস্তৈব স শিবান্ বশভিচ্ছিনেঃ ।  
 পাঠয়ামাস তাং বিদ্যাং নাস্তিক্যমতনাশিনীং ।
- ৩। ততঃ কালেন কিম্বতা কাসো গুপ্তনিদেশতঃ ।  
 সমাবুস্তো মুহুর্হোহবুধুবৈববাখ্যানিকোবিনঃ ।  
 স তর্কং নিন্দয়ামাস ব্রহ্মপুত্রোপদেশকঃ ।  
 তচ্ছ্ৰুত্বা গৌতমঃ ক্রুদ্ধো বেদব্যাসঃ প্রতি দ্বিতঃ ।  
 প্রতিজ্ঞে চ নৈকাত্যাং বুগ্ভ্যাং পশ্যামি তদ্ব্যং ।  
 যঃ শিষ্যো যেষ্ট বৈ তর্কং চিরায় গুরুসম্মতঃ ।  
 বাসোহপি ভগবান্তুস্ত গুরোঃ কোপঃ বিবৃণু চ ।  
 আবরৌ বরিতপ্তত্র যজ্ঞাতুপৌতমো মুনিঃ ।  
 অদকৃদ্বগ্ধবুধা পাবরৌঃ প্রদীপতা চ ।  
 প্রসাদয়ামাস গুপ্তং কৃতকৌ নিন্দিতো মদ্বা ।  
 প্রসন্নো গৌতমো বাসে প্রতিজ্ঞাং স্বাক্ সংস্বরন্ ।  
 পাসেহস্মি যেষ্টেয়ামাস দোহকৃপাযন্তোহভবৎ ॥”

—বেদীপুরাণ, গুপ্তনিগুপ্তমখনপাৰ, ১৬ অঃ ।

বেদীপুরাণের এই অংশ মুক্তি হইয়াছে। নিখিল-শাস্ত্রবিশী, নানা শাস্ত্রগ্রন্থকার, অক্ষপাদগৌতমবংশধর, খনামখ্যাত পূজাপাৰ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কর মহাশয়কে আমি গৌতমের অক্ষপাদ নামের প্রবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অমুগ্রহপূৰ্ণক প্রাচীন পুস্তক হইতে এই ঘটনাবলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি ইহা তাহার নিকটেই পাইয়াছি, অক্ষর পাই নাই। এ জন্ত তাহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাহার মতেও ভাদ্রহর্যকার অখ্যাপাতি গৌতম।



গুরু গৌতমের আজ্ঞানুসারে সমাবর্তনের পরে গৃহস্থ হইয়া ব্রহ্মসূত্রে তর্কের নিন্দা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া গৌতম, বেদব্যাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই চকুর দ্বারা তাহার মূৰ দেখিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। বেদব্যাসও গুরু গৌতমের ক্রোধবাক্য পাইয়া নীত্র গৌতমের নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া বলেন যে, আমি কুতর্কের নিন্দা করিয়াছি। তখন গৌতম মুনী প্রসন্ন হইয়া পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ নিজ চরণে চকু দৃঢ়ীকৃত করেন, তজ্জন্ত তিনি অক্ষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্লোক্ত বচনগুলির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাই যে গৌতমের অক্ষপাদ নামাদি সম্বন্ধে পূর্লোক্ত প্রকার প্রবাদের মূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। হতরাং ঐ প্রাচীন প্রবাদের মূল পূর্লোক্ত বচনগুলি যে আধুনিক নহে, ইহা বুঝা যায়।\* ব্রহ্মাওপুরাণে শিববাক্য পাওয়া যায়,<sup>১</sup> “সপ্তবিংশ দ্বাপরে জাতুকর্ণা যে সময়ে ব্যাস হইবেন, সে সময়েও আমি প্রভাসতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া লোকবিশ্রুত যোগান্না দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্ম্মা হইব। সেখানেও আমার সেই তপোদন পুত্রগণ (চারি শিষ্য) হইবে”। (১) অক্ষপাদ, (২) কপাদ বা কুমার, (৩) উলুক, (৪) বৎস। বায়ুপুরাণেও (পূর্বখণ্ড, ২৩ অঃ) ঐ কথা আছে। ব্রহ্মাও ও বায়ুপুরাণে অক্ষপাদ প্রভৃতি চারি শিষ্যকেই পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, লিঙ্গপুরাণে ( ২৪ অঃ ) অক্ষপাদ প্রভৃতিকে সোমশর্ম্মার শিষ্য বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। তবে লিঙ্গপুরাণে “কপাদ” স্থলে “কুমার” আছে। অনেক ব্রহ্মাও ও বায়ুপুরাণেও “অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ” ইহাই প্রকৃত পাঠ বলেন। সে বাহা হউক, অক্ষপাদনামা তপোদন যে সপ্তবিংশ দ্বাপর যুগের শেষে প্রভাস তীর্থে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা ব্রহ্মাও, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণের দ্বারা জানিতে পারি। পুরাণবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, চতুর্দশ দ্বাপর বা কলিতে<sup>২</sup> হরক্ষণ ব্যাসের আবির্ভাব হইলে যে গৌতম শিবের অবতাররূপে যোগের উপদেশ করেন, তিনিই আবার সপ্তবিংশ দ্বাপরের শেষে অক্ষপাদ নামে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে জগতে জ্ঞান প্রচার করেন। বর্ত্তমঃ স্বন্দপুরাণে অহল্যাপতি গৌতম মুনীই অক্ষপাদ ও মহাযোগী বলিয়া কথিত। কুশ্মপুরাণে তিনি শিবের অবতার বলিয়া কথিত। স্বন্দপুরাণে বহু স্থলে তাহার পরম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

\* গঙ্গেশের পূর্ববর্তী ভাষ্যভট্টও ভাষ্যমঞ্জরীর শেষে অক্ষপাদ যে বাদে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা লিখিয়াছেন।

১। সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পত্রিবর্ষে ক্রমাগতে। জাতুকর্ণাঃ দ্বা বাসো ভবিষ্যতি তপোদনঃ । ১৪১।

তপাংসঃ ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ। প্রভাসতীর্থমাসাদ্য যোগান্না লোকবিশ্রুতঃ । ১৪০।

তদাশি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোদনঃ। অক্ষপাদঃ কপাদশ্চ উলুকো বৎস এব চ । ১৪১।

—ব্রহ্মাওপুরাণ, অমৃতলপাদ, ২৩ অঃ।

২। যদা ব্যাসঃ হরক্ষণঃ পর্ষায়ে তু চতুর্দশে। তদাশি পুনরব্যবঃ ভবিষ্যামি দুগন্ধিকে।

কমঃ স্কন্ধিনঃ শ্রেষ্ঠো মোক্ষো নাম যোগবিনঃ। তদাৎসববিখ্যতে পুত্রাঃ গৌতমঃ নাম তখনঃ।

—ব্রহ্মাও, অমৃতলপাদ, ২৩ অঃ।

মহাভারতে অহল্যাপতি গোতমের বহু সহস্র শিষ্যের কথা, প্রিয়তম শিষ্য উভয়ের উপাখ্যান ও অহল্যার কুণ্ডলানয়ন-বার্তা বর্ণিত আছে (অশ্বমেধপর্ব, ৫৬ অঃ দ্রষ্টব্য)। দোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে অক্ষপাদ কৃষ্ণদৈবায়ন বাসের বহু পূর্বে আবির্ভূত, ইহা ব্রহ্মাওপুরাণাদির দ্বারা বলা যায়। তবে তিনি কোন সময়ে জ্ঞানসূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দোমশর্ম্মার শিষ্য হইয়া প্রভাস তীর্থেই জ্ঞানসূত্র রচনা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। অক্ষপাদ গোতম দীর্ঘতপা, সুদীর্ঘজীবী, মহাদোষী। কন্দ-পুরাণে তাঁহার নানা স্থানে ভ্রমণাদি ও গোতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। তবে মিথিলাতেই সর্বাপ্রায়ে জ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ চর্চারস্ত ও নানা জ্ঞানগ্রন্থ নির্মাণ হইয়াছে। মিথিলাবাসী গোতম মিথিলার আশ্রমেই জ্ঞানসূত্র রচনা করেন, ইহা পণ্ডিত-সমাজের ধারণা। মৈথিল পণ্ডিত-গণও তাহাই বলেন। কিন্তু যেখানে গোতম পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই জ্ঞানসূত্রের রচনা হইয়াছে, ইহাও অনেকের ধারণা। এ সকল বিষয়ে যে এখন প্রকৃত তথ্য নিঃসন্দেহ হওয়া ঘাইতে পারে, তাহা মনে হয় না।

### ভাষ্যকার বাংজ্ঞান ও বার্তিককার উদ্যোতকর

জ্ঞানদর্শন-ভাষ্যকার বাংজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা এখন অতি দুসোধ্য বা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজে জ্ঞানদর্শন-ভাষ্যকার বাংজ্ঞান, মুনি, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কার ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যোগবশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য-প্রকরণের শেষে বর্ণিত মুনিগণের মধ্যে বাংজ্ঞান নামে মুনিবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেকে ভাষ্যকার বাংজ্ঞানকে পঞ্চিল স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তার্কিকরকার প্রারম্ভে বরদরাজের কথা ও টাকাকার মজিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, জ্ঞানদর্শন-ভাষ্যকার বাংজ্ঞানের অপর নাম পঞ্চিল এবং তিনিও জ্ঞানসূত্রকার অক্ষপাদের জ্ঞান মুনি<sup>১</sup>। বাচস্পত্য অভিধানে মহামনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও “পঞ্চিল” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—গোতম হুজ্রভাষ্যকার মুনিবিশেষ। তাঁহার প্রকাশিত বাংজ্ঞান ভাষ্যকেও তিনি “বাংজ্ঞান মুনিরূপ ভাষ্য” বলিয়া লিখিয়াছেন। দয়ানন্দ স্বামী তাঁহার “ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা” গ্রন্থে জ্ঞানদর্শন-ভাষ্যকারকে বাংজ্ঞান মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৬ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন জ্ঞানচর্চায় উদ্যোতকর জ্ঞানবার্তিকের শেষে ভাষ্যকার বাংজ্ঞানকে “অক্ষপাদপ্রতিম” বলিয়াছেন<sup>২</sup>। জ্ঞানবার্তিক-ভাষ্যটাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উপমানহুজ (১৬) ভাষ্য-ব্যাখ্যায় এবং তার্কিকরকার বরদরাজ উপমান ব্যাখ্যায় নিজের ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্ত ভগবান্

১। অক্ষপাদপঞ্চিলমুনিপ্রভৃতয়ো বর্ণয়ন্তি।—তার্কিকরকার।

অক্ষপাদপঞ্চিলৌ পুত্রভাষ্যকারৌ।—মজিনাথ টকা।

২। অক্ষপাদপ্রতিমো ভাষ্য বাংজ্ঞানমো জগৌ।

অস্মারি মহত্তমজ জ্ঞানজ্ঞানেন বার্তিকঃ।



ভাষ্যকার বলিয়া বাংস্ত্রায়নের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তार्কিকরকার টীকায় মহামনীষী মল্লিনাথ সেখানে লিখিয়াছেন যে, বরদরাজ ভাষ্যকারের প্রামাণ্য হুচনার জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ হুত্রকার অক্ষপাদ এ কথা না বলিলেও ভগবান্ ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নের কথায় হুত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। ফলকথা, উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কথায় স্তায়ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়ন, অক্ষপাদপ্রতিম ভগবান্ পক্ষিল সুনী ও পক্ষিল স্বামী, ইহা আমরা পাইতেছি। এখন বিশেষ বক্তব্য এই যে, বহুশত প্রাচীন মহামনীষী শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্র ষাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তিনি যে বিশেষ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন, ইহা স্বীকার্য। উদ্যোতকর ও কুমারিল তদ্রূপ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত আত্মিক-শিরোমণি মহামনীষিগণকে বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ক্ষয়ি বা আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির স্তায় ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ষাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতে পারেন না, এমন কোন ব্যক্তিকে কেহ স্তায়ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সে সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথাকে উপেক্ষা করা যায় না।

এতদেশীয় অনেক বিজ্ঞতম ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থাশাস্ত্রকার কোটিল্যই স্তায়দর্শন-ভাষ্যকার। তাঁহারই অপর নাম বাংস্ত্রায়ন ও পক্ষিলস্বামী। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনে প্রথম কথা এই যে, হেমচন্দ্রসূরী অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে<sup>১</sup> বাংস্ত্রায়নের যে আটটি নাম বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কোটিল্য, চণকায়জ, পক্ষিলস্বামী ও বিষ্ণুগুপ্ত, এই চারিটি নামের দ্বারা বুঝা যায়, কোটিল্যই পক্ষিলস্বামী ও বাংস্ত্রায়ন। পক্ষিলস্বামীই যে স্তায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক আচার্য্যই লিখিয়াছেন। পক্ষিলস্বামী ও বাংস্ত্রায়ন, কোটিল্য বা চণক্য পণ্ডিতের নামান্তর হইলে তিনিই স্তায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বুঝা যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোটিল্য তাঁহার অর্থাশাস্ত্র গ্রন্থে “বিদ্যাসমুদ্যেশ” প্রকরণে আত্মীক্ষিকী বিদ্যার প্রশংসা করিতে শেষে যে শ্লোকটি<sup>২</sup> বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের প্রথম চরণত্রয় স্তায়দর্শনভাষ্যও দেখা যায়। তাহাতে বুদ্ধিতে পারা যায় যে, কোটিল্যই স্তায়ভাষ্যে তাঁহার অর্থাশাস্ত্রোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ পরিবর্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্তায়ভাষ্যে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণ বলা হইয়াছে, “বিদ্যোদ্যেশে প্রকীর্ষিতা”। ঐ চতুর্থ চরণের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে,—কোটিল্য স্তায়ভাষ্যে বলিয়াছেন,—আমি “বিদ্যোদ্যেশে” অর্থাৎ আমার কৃত অর্থাশাস্ত্র গ্রন্থের বিদ্যাসমুদ্যেশপ্রকরণে এই আত্মীক্ষিকীকে এইরূপে কীৰ্ত্তন করিয়াছি। তৃতীয় কথা এই যে, অর্থাশাস্ত্রের শেষে কোটিল্য শাস্ত্রোক্তার করিয়াছেন, ইহা বর্ণিত

১। বাংস্ত্রায়নে মহানাথঃ কোটিল্যশৃণকায়জঃ।

জাযিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তঃ। হুচনঃ নঃ ॥—সদ্যঃকণ্ঠ। ১১৮

২। প্রবীণঃ সর্গবিদ্যানামুদ্যায়ঃ সর্গকর্তৃণাঃ।

শাস্ত্রজঃ সর্গকর্তৃণাঃ। শৃণকায়জঃ সত্য।—অর্থাশাস্ত্র।

আছে'। তাহার দ্বারা তিনি জ্ঞানস্বত্বের উদ্ধার করিয়াছেন, ভাষা রচনা করিয়া তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, হেমচন্দ্রস্বরির শ্লোকের দ্বারা কোটিল্যই জ্ঞানভাষ্যকার, ইহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, নামের ঐক্যে ব্যক্তির ঐক্য সিদ্ধ হয় না। জ্ঞানভাষ্যকারের জ্ঞান কোটিল্যেরও বাৎস্তায়ন ও পক্ষিলস্বামী, এই নামদ্বয় থাকিতে পারে। পরন্তু তর্কিকরকায় বরদ-রাজের কথা ও মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, জ্ঞানভাষ্যকার বাৎস্তায়নের নামান্তর পক্ষিল। সুতরাং "স্বামী" তাহার উপনাম ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞানকন্দলীর প্রারম্ভে "পক্ষিল-শব্দস্বামিনো" এই প্রয়োগের দ্বারাও তাহা মনে হয়। তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি 'পক্ষিল' এই নামের পরে স্বামী এই উপনামের যোগে বাৎস্তায়নকে পক্ষিলস্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞানভাষ্যকার বাৎস্তায়ন পক্ষিলস্বামী বলিয়া স্থানিক ছিলেন, ইহা বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির কথায় বুঝা যায়। কিন্তু যদি কোটিল্যের নামান্তর "পক্ষিলস্বামী" এবং জ্ঞানভাষ্যকারের নামান্তর "পক্ষিল," ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ নামের দ্বারা জ্ঞানভাষ্যকারকে কোটিল্য বলিয়া গ্রহণ করাও যায় না। বাৎস্তায়ন নামের দ্বারাও কোটিল্যকে জ্ঞানভাষ্যকার বাৎস্তায়ন বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বাৎস্তায়ন এই নাম যদি গোত্রনিমিত্তক নাম হয়, তাহা হইলে অন্তরেও ঐ নাম হইতে পারে। এ সব কথা যাহাই হউক, কোটিল্যই জ্ঞান-ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে পূর্বোক্ত হেমচন্দ্র স্বরির শ্লোক অথবা ত্রিকাংশে পুরুষোত্তমদেবের শ্লোক প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য।

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও জ্ঞানভাষ্যকার ও অর্থশাস্ত্রকার অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, মঙ্গলাচরণ-শ্লোক প্রভৃতি কোন কোন শ্লোকবিশেষ ব্যতীত ঐরূপ শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থকারের অভিন্ন সিদ্ধ হয় না। এক গ্রন্থকার কোন উদ্দেশ্যে অপর গ্রন্থ-কারের শ্লোকের আংশিক উল্লেখও করিতে পারেন। পরন্তু কোটিল্য জ্ঞানভাষ্য রচনা করিয়া যদি তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা অর্থশাস্ত্রে আবীক্ষিকীর কীর্তন করিয়াছেন, ইহা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেন, তাহা হইলে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণে "অর্থশাস্ত্রে প্রকীর্তিতা" এইরূপ কথাই বলিতেন। অর্থশাস্ত্রের "বিদ্যাসমুদ্দেশ" নামক প্রকরণকে বিদ্যোদ্দেশ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, অতি অস্পষ্টভাবে নিজ বক্তব্য কেন বলিবেন? আর যদি "বিদ্যোদ্দেশ" বলিলেই অর্থশাস্ত্রের ঐ প্রকরণটি বুঝা যায়, তাহা হইলে কোটিল্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তিও জ্ঞানভাষ্যে ঐ কথার দ্বারা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপে এই আবীক্ষিকীর প্রশংসা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারেন। বক্তব্যঃ জ্ঞানভাষ্যকার প্রথমে "দেয়নাবীক্ষিকী" এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা" এই কথা বলিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা যায় যে, "বিদ্যোদ্দেশে" অর্থাৎ শাস্ত্রে অথবা প্রভৃতি চতুর্বিধ বিদ্যার যেখানে উদ্দেশ অর্থাৎ নামকথন হইয়াছে, সেখানে এই



আবৌফিকীর কীর্তন হইয়াছে। অর্থাৎ এই আবৌফিকী বিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত চতুর্বিধ বিদ্যার অন্তর্গত চতুর্থী বিদ্যা, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। জায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের কথ্যতেও এই ভাব পাওয়া যায়। জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া পূর্বোক্ত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। তাহার উক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ “বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা”। জয়ন্তভট্টের উল্লিখিত পাঠে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে চতুর্বিধ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই আবৌফিকী বিদ্যা, পরীক্ষিত বা অবধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই জ্ঞানবিদ্যাই যে চতুর্থী আবৌফিকী বিদ্যা, ইহা নিশ্চিত। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও পূর্বে জ্ঞানবিদ্যাকে চতুর্থী আবৌফিকী বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার যে, কোন একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিতেই পূর্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ ঐরূপ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য। অর্গশাস্ত্রের শেষে কোটিল্যের যে শাস্ত্রের উদ্ধার, শস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের কথা আছে, তদ্বারা তিনি যে জ্ঞানস্বত্বের ভাষ্য করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তিনি নানা শাস্ত্র হইতে যে রাজনীতি-সমুচ্চয়ের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই শস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের সহিত ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু ঐ শ্লোকের দ্বারা কোটিল্য শাস্ত্রোদ্ধারাদির পরে অর্গশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং তিনি অর্গশাস্ত্র রচনার পূর্বে জ্ঞানভাষ্যে “বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা” এই কথা কোন অর্থে বলিতে পারেন, তাহাও চিন্তা করা উচিত। অর্গশাস্ত্রে কোটিল্য নামের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুগুপ্ত নামে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে<sup>১</sup>। বিষ্ণুগুপ্তই কোটিল্যের মূখ্য নাম ছিল, ইহা অর্গশাস্ত্র প্রতীতি অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। সুত্রারাক্ষস নাটকে কবি বিশাখদত্তের রচনার দ্বারাও তাহা বুঝা যায় (৭ম অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। কোটিল্য জ্ঞানভাষ্য রচনা করিলে তিনি অর্গশাস্ত্রের জ্ঞান বিষ্ণুগুপ্ত নামে অথবা স্মরণিক কোটিল্য বা চাণক্য নামে কেন গ্রন্থকার-পরিচয় দিবেন না এবং উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহই তাহার গ্রন্থিক কোন নামের কোন উল্লেখ করিবেন না, ইহাও বুঝি না। জ্ঞানভাষ্যের শেষে বাৎস্তায়ন নামে গ্রন্থকার-পরিচয় আছে<sup>২</sup>। কামহৃত্ত গ্রন্থেও বাৎস্তায়ন নামে গ্রন্থকার-পরিচয় পাওয়া যায়। কামহৃত্তের টীকাকার বশোদর, কামহৃত্তকার বাৎস্তায়নের বাৎস্তায়ন ও মল্লনাগ, এই দুইটি নাম বলিয়াছেন। বাৎস্তায়ন তাহার গোত্রনিমিত্তক নাম, মল্লনাগ তাহার সাংস্কারিক নাম<sup>৩</sup>। কোটিল্যই কামহৃত্তকার বাৎস্তায়ন, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। কিন্তু কামহৃত্তের টীকাকার বশোদর, বিষ্ণুগুপ্ত নামের উল্লেখ না করিয়া মল্লনাগ নামকেই কামহৃত্তকার বাৎস্তায়নের সাংস্কারিক নাম বলিয়াছেন; তিনি তাহাকে

১। দৃষ্ট, বিপ্রতিপত্তিঃ বহুশা শাস্ত্রোক্ত ভাষ্যকারাণাম্।

স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশব্দকার হৃত্তক ভাষ্যক।—অর্গশাস্ত্রের শেষ।

২। বোহকপাধবদ্বিঃ। জ্ঞানঃ প্রভাভাদ্বদত্যং বহু।

তস্ত বাৎস্তায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবদ্বহুং।

৩। বাৎস্তায়ন ইতি গোত্রনিমিত্তকং নামক, মল্লনাগ ইতি সাংস্কারিকী। ১ অবি, ২ অঃ—১৩ হৃত্তটীকা।

পলিলস্বামী বলিয়াও উল্লেখ করেন নাই। অর্পশাস্ত্রে কোটিল্য স্বমতের উল্লেখ করিতে কোটিল্য নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কামসূত্রে গ্রহকারের স্বমতের উল্লেখ করিতে বাংজায়ন নামের উল্লেখ দেখা যায়। অর্পশাস্ত্র ও কামসূত্রের ভাবারও অনেক বৈষম্য বুঝা যায়। জ্ঞানভাষ্য ও কামসূত্রের ভাব ও গ্রহরস্তুপ্রণালীও একরূপ নহে। কামসূত্রের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ আছে, জ্ঞানভাষ্যের প্রারম্ভে তাহা নাই। ফলকথা, কামসূত্রকার বাংজায়নই জ্ঞানভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কোটিল্যই জ্ঞানভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ বক্তব্য এই যে, জ্ঞানভাষ্যকার সাংখ্যশাস্ত্রকেও যে চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকিকী বলিতেন, ইহা বুঝিতে পারি না। অর্পশাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রও চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকিকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানভাষ্যে আত্মিকিকী শব্দের বিশেষ ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া তদনুসারে জ্ঞানবিদ্যা ও জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া আত্মিকিকী শব্দের অর্থ বিবরণ করা হইয়াছে এবং সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থকে আত্মিকিকী বিদ্যার প্রধান বলা হইয়াছে। উদ্যোতকর ঐ প্রধানভেদ-বর্ণনায় “সংশয়াদিভেদাহুবিবাদিনী আত্মিকিকী” এই কথা বলিয়া আত্মিকিকী বিদ্যার স্বরূপও বলিয়াছেন। জ্ঞানভাষ্যকারও প্রথমে জ্ঞানবিদ্যাকেই চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যা বলিয়া, শেষে “সেবমাত্মিকিকী” ইত্যাদি কথা বলিয়া, “বিস্কোদেধে প্রকীর্তিতা” এই কথার দ্বারা জ্ঞানবিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যা, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কথার পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। ফলকথা, জ্ঞানভাষ্য ও অর্পশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আত্মিকিকী বিদ্যা বিষয়ে মতবৈষম্য নাই, ইহা কোনরূপেই বুঝিতে পারি নাই। বাংজায়ন, উদ্যোতকর, জ্যোত্বট প্রভৃতি জ্ঞানচর্চাযুগে যে জ্ঞানবিদ্যা ভিন্ন সাংখ্যাদি শাস্ত্রকেও চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকিকী বলিতেন, তাহা তাহাদিগের গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই মনে হর না। এখন যদি জ্ঞানভাষ্য ও অর্পশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আত্মিকিকী বিদ্যা বিষয়েই মতবৈষম্য থাকে, তাহা হইলে অর্পশাস্ত্রকার কোটিল্যই জ্ঞানভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করা যায় না। ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে উভয় গ্রন্থে আত্মিকিকী বিদ্যা বিষয়ে পূর্বোক্তরূপ মতবৈষম্য আছে কি না, তাহাই সর্বোপায়ে বুঝা আবশ্যক। সুদীপন উভয় গ্রন্থের কথাগুলি দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন। অর্পশাস্ত্রে কোটিল্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কোটিল্য যে আত্মিকিকী বিদ্যার মধ্যে জ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখই করেন নাই, এই মতও স্বীকার করিতে পারি নাই। অর্পশাস্ত্রে “আত্মিকিকী” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে কোটিল্য চিরপ্রসিদ্ধ “আত্মিকিকী” শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই এবং বাংজায়ন প্রভৃতি জ্ঞানচর্চাযুগে কোটিল্যের জ্ঞান “আত্মিকিকী” শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই, ইহাও চিন্তনীয়। কোটিল্য পূর্বোক্তচর্চাযুগের মত বর্ণন করিতেও বলিয়াছেন—“আত্মিকিকী”।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে দ্বাদশী খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং অনেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ভাষ্যকার বাংজায়নের সময় বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে খৃষ্টপূর্ববর্তী কোটিল্য যে জ্ঞানভাষ্যকার হইতেই পারেন না, ইহা বলা নিম্নপ্রয়োজন। কিন্তু ভাষ্যকার বাংজায়ন খৃষ্টপূর্ববর্তী অতিপ্রাচীন, ইহাই আমাদের বিখ্যাত। বাংজায়ন ভাষ্যের ভাষা পর্যালোচনা



বহু পূর্ববর্তী, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাংস্তায়ন পাণিনিমুত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ( ২।২। ১৬ স্বত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। পাণিনি গৌতম বৃহেরও পূর্ববর্তী, ইহাও আমাদের বিশ্বাস। ঐথা-সরিংসাগরের উপাখ্যান প্রমাণ নহে। বাংস্তায়ন ( ৫।২।১০ স্বত্র-ভাষ্য ) মহাভাষ্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত নহে। কারণ, এমন অনেক বাক্য আছে, বাহা স্মৃতির কাল হইতে উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য বহু প্রহকারই উল্লেখ করিতেছেন। ঐ বাক্যের প্রথম বক্তা কে, তাহা সর্বত্র নিশ্চয় করা যায় না। পরন্তু বাংস্তায়নভাষ্যে মহাভাষ্যের ঐ বাক্যও যথাযথ দেখা যায় না। উভয় গ্রন্থে কোন অংশে পাঠভেদ থাকায় বাংস্তায়ন, মহাভাষ্যের বাক্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। ( “বৃদ্ধিরাশিচ” এই স্বত্রের মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য )। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ প্রমাণসমুচ্চর গ্রন্থে বাংস্তায়ন ভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা নির্কির্বাদে নিশ্চিত। কিন্তু দিঙ্‌নাগের সময় নির্কির্বাদে নিশ্চিত নহে। বিশ্বকোষে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী দিঙ্‌নাগের সময় নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু বহুদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দত্তীশচন্দ্র বিদ্যাক্ষুণ্ণ মহাশয় “বৌদ্ধজ্ঞান” প্রবন্ধে প্রমাণসমুচ্চরকার দিঙ্‌নাগকে কালিদাসের সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষবর্তী বলিয়াছেন এবং উদ্যোতকর জ্ঞানবাস্তিকে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম-কীর্তি ও বিনীতসেবের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া উদ্যোতকরকে ধর্মকীর্তি ও বিনীতসেবের সমসাময়িক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষবর্তী বলিয়াছেন। বিশ্বকোষে উদ্যোতকরকে আরও বহু পূর্ববর্তী বলা হইয়াছে। জর্দান পণ্ডিত জ্যেকবির প্রবন্ধে বাংস্তায়নের সময় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং উদ্যোতকের সময় ষষ্ঠ শতাব্দী নির্ধারিত হইয়াছে জানিয়াছি।<sup>১</sup> বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ ঐ সকল মতভেদের বিচার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ববর্তী, তিনি দিঙ্‌নাগের বেশী পূর্ববর্তী নহেন। এই বিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, শ্রীমদ্বাচস্পতি মিত্র তাৎপর্যটীকার প্রারম্ভে “অতিজ্ঞরতীনাং” এই কথার দ্বারা উদ্যোতকের বার্তিককে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন<sup>২</sup>। জ্ঞান-

১। ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

\* বাংস্তায়ন সম্বন্ধে জর্দান পণ্ডিত জ্যেকবির মত—The results of our researches into the age of the Philosophical Sūtras may be summarised as follows :—“Nayadarsan” and “Brahma Sūtra” were composed between 200 and 450 A. D. During that period lived the old commentators :—Vatsyayana, Upavarsa, the Vṛttikara (Bodha Yana ?) and probably Sabaraswamin.

উদ্যোতকর সম্বন্ধে—He (Uddyotakara) may therefore have flourished in the early part of the Sixth century or still earlier (The dates of the Philosophical Sūtras of the Brahmins by Herman Jacobi.

1911 Vol. 31, Journal of the American Oriental Society).

২। ইচ্ছাঃ কিনিপি পুণাঃ হস্তরকুনিবন্ধ-পঞ্চময়ানাঃ।

উদ্যোতকর-গণানামতিজ্ঞরতীনাং সমুচ্চরণাং।

বার্তিক-তাৎপর্য-পরিগৃহীতে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের কথাগুলির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়<sup>১</sup>, উদ্যোতকরের বার্তিক বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের বহু টীকা হইয়াছিল। কিন্তু কালবশে উদ্যোতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় সেই সকল টীকা বা নিবন্ধ ‘কুনিবন্ধ’ হইয়াছিল। অর্থাৎ উদ্যোতকরের বার্তিকের সে সমস্ত টীকা যথার্থ টীকা হইতে পারিয়াছিল না। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার জিলোচন-নামা অধ্যাপকের নিকটে উদ্যোতকরের বার্তিকের রহস্যবোধক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞানবার্তিক-তাৎপর্য্যটীকা নামে টীকা করিয়া, ঐ বার্তিক গ্রন্থের উদ্ধার করেন। বাচস্পতি মিশ্র যে জিলোচন গুরু উপদেশ পাইয়া, তদনুসারে ভাব্য ও বার্তিকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকায় (প্রত্যক্ষ সূত্রে) তাঁহার নিজের কথাতেও পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্রের জ্ঞানসূচীনিবন্ধের শেষোক্ত শ্লোকে<sup>২</sup> পাওয়া যায় যে তিনি ৮৯৮ বৎসরে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ “বৎসর” শব্দের দ্বারা বৈক্রম সংবৎ বুঝিলে ৮৪১ খৃষ্টাব্দে এবং শকাব্দ বুঝিলে ৯৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। শেষোক্ত পক্ষই বহুসম্মত। মনে হয়, বাচস্পতি মিশ্র সর্বশেষে জ্ঞানসূচী-নিবন্ধ রচনা করায়, ঐ গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের (৯০৬ শকাব্দ) উল্লেখ করিয়াছেন<sup>৩</sup>। উদয়নের কিরণাবলী গ্রন্থের প্রথম শ্লোকট লক্ষণাবলীর শেষেও দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য, ভ্রূহর্ষের পূর্ববর্তী, ইহাও স্বপ্নন-খণ্ড-খান্য পাঠে জানা যায়। এখন বক্তব্য এই যে, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষবর্তী হইলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্র, উদ্যোতকরের বার্তিককে “অতিজরতীনাং” এই কথার দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থ বলিবেন এবং উদয়নাচার্য্য উদ্যোতকরের সম্প্রদায় লোপ প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রকার কথা বলিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। এখনও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির জ্ঞানগ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয় না। উদ্যোতকরের বার্তিকের আলোচনায় মনে হয়, তিনি ভট্ট কুমারিন ও ভট্টহরিরও পূর্ববর্তী। জ্ঞানবার্তিকে ভট্টহরির মতের কোন আলোচনা বা ভট্টহরির কোন কথা এবং মীমাংসক মতের

১। নমু চিরন্তনেনহিন্ম নিবন্ধে মহাজনপরিগৃহীতে বহবো নিবন্ধাঃ সঙ্ঘীতি কৃত্তমেনেনাত আহ ইচ্ছাম ইতি। নমু যদি গ্রন্থকারসম্প্রদায়কিচ্ছবেন তে নিবন্ধাঃ কথা কুনিবন্ধাঃ? অথ সম্প্রদায়ো বিচ্ছিন্নাঃ? কথা তবাপীয়াঃ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়্য তাৎপর্য্যটীকা স্থনিবন্ধ ইত্যত আহ অতিজরতীনামিতি। উদ্যোতকরসম্প্রদায়ো হ্রস্ববাঃ বৌধব্যঃ ততঃ কালবশাদ্ভগলিতমিথ, কিমসমাজ জিলোচনস্তুয়োঃ সকাশাচ্ছপদেশ-নরসায়নমাস্যাবিতমমুখ্যঃ পুনর্দাবীভাবায় বীজত ইতি বুজাতে। ন চ কুনিবন্ধ-শঙ্কময়ানাং তদ্বাত্ত্বচিতিমিতি তদ্রাহুংকুখ্য স্থনিবন্ধস্থলে সরিবেশনরূপ-সমুজ্ঞপণেনেব নাপ্রকট-মিতার্থঃ।—তাৎপর্য্য-পরিগৃহী, ৯ পৃষ্ঠা।

২। জ্ঞানসূচীনিবন্ধোহসাবকারি হবিদ্যা মুখে।

ঐ বাচস্পতিমিশ্রের বৎসরবৎ (৮৯৮) বৎসরে।

৩। তর্কাস্বরাজ (৯০৬) প্রমিতেনতীতেষু শকাব্দতঃ।

সর্বমুখ্যমন্ত্রজে জবোবাঃ লক্ষণাবলীঃ।



আলোচনায় ভট্ট কুমারিলের কথা বা মতের আলোচনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। উদ্যোতকরের উত্থাপিত মীমাংসক মতকে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র জরমীমাংসক মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্লোকবার্ত্তিকে অহুমান-প্রমাণের প্রমের বিষয়ে কুমারিল নিজ মতের সমর্থনপূর্ব্বক অন্যের মত বলিয়া এই বিষয়ে উদ্যোতকরের সমর্থিত মতটিরও উল্লেখ করিয়াছেন (শ্লোকবার্ত্তিক, অহুমান পরিচ্ছেদ, ৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেখানে টীকাকার পার্থ-সারণি মিশ্র এই মতকে নৈয়ায়িকের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিল কোন অপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মতের উল্লেখ ও সমর্থন করিতে পারেন না। এই মতটি কুমারিলের পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। বাৎস্তায়ন যে এই মতাবলম্বী নহেন, তাহা বহু স্থলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। উদ্যোতকরই অহুমান-প্রমাণের প্রমের বিষয়ে অজ্ঞান মত ও দিঙ্নাগের মত খণ্ডন পূর্ব্বক এই নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি (১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভট্ট কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে অহুমান পরিচ্ছেদে দিঙ্নাগের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। পরন্তু কবি বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হর্ষচরিতে প্রথমে যে বাসবদত্তা কাব্যের অতি প্রশংসা করিয়াছেন, উহা কবি সুবন্ধু-রচিত প্রসিদ্ধ বাসবদত্তা কাব্য, ইহাই পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এই বাসবদত্তা কাব্য বাণভট্টের পূর্ব্বেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা স্বীকার্য্য। সুবন্ধু এই বাসবদত্তা কাব্যে উদ্যোতকরের নানোক্তে করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে উদ্যোতকর যে সুবন্ধুর পূর্ব্ব হইতেই দেশে জ্ঞানমত-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও সুবন্ধুর কথায় বুঝিতে পারা যায়। এ সব কথা উপেক্ষা করিলেও বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তাহারা উদ্যোতকরের বার্ত্তিককে বৈরাগ্য প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উদ্যোতকর যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র “অতিজরতীনাং” এই কথা বলিয়া যে বার্ত্তিকের প্রাচীনত্বের ঘোষণা ও তাহার উদ্ধারের প্রয়োজন হুচনা করিয়াছেন এবং তাহার উদ্ধারের জন্য তিনি ত্রিলোচন গুপ্তর উপাসনা করিয়াছেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিক গ্রন্থের প্রাচীনত্ব বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য ভ্রান্ত ছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

উদ্যোতকর প্রতিজ্ঞা-সূত্রবার্ত্তিকে “বাদবিদ্যি” ও “বাদবিদ্যানটীকা” নামে বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মকীর্ত্তির “বাদজ্ঞান” নামক গ্রন্থকেই “বাদবিদ্যি” নামে এবং বিনীতসেবের “বাদজ্ঞানব্যাক্য্য” নামক গ্রন্থকেই “বাদবিদ্যানটীকা” নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। এই সকল মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রকৃত নাম ত্যাগ করিয়া করিত নামে উল্লেখেরও কোন কারণ বুঝি না। উদ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতসেবের সমসাময়িক হইলে তাহার ঐরূপ নাম-ভ্রমেরও কোন কারণ বুঝি না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রচুর

মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সদৃশ নামেও অনেক গ্রন্থ ছিল ও আছে। বিভিন্ন গ্রন্থকারের বিভিন্ন গ্রন্থে বিষয়বিশেষের বিচারে সদৃশ ভাষারও প্রয়োগ হইয়াছে ও হইয়া থাকে। উদ্যোতকরের উদ্ধৃত বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ-সমন্বিত দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথার উদ্যোতকর, দিগ্‌নাগ ও সুবন্ধুর গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট পাওয়া যায়। উদ্যোতকরের কথিত “বাদবিধানটীকা” সুবন্ধুরচিত কোন গ্রন্থের টীকা, ইহা মনে হয়। বাচস্পতি মিশ্র ঐ স্থলে পূর্বে উদ্যোতকরের উল্লিখিত কোন লক্ষণকে সুবন্ধুর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দর্শকীর্তি ঐ মত সমর্থন করিয়া তাঁহার “জ্ঞানবিন্দু” গ্রন্থে উদ্যোতকরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু উদ্যোতকর যে দর্শকীর্তির কোন গ্রন্থের উল্লেখাদি করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি নাই। মূল গ্রন্থ না পাইলে অথবা কোন প্রামাণিক প্রাচীন সংবাদ না পাইলে তাহা বুঝা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিয়া বান নাই। উদ্যোতকর আরও বহু স্থলে বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে “সর্বাভিগমরহস্য” নামে কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ঐ সকল গ্রন্থের কোন পরিচয় দিয়া বান নাই। বহু স্থলে কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের পরিচয়ও দিয়াছেন। দর্শকীর্তির গ্রন্থ যে তাঁহার বিশেষ অধিগত ছিল, তাহার পরিচয় ভ্রামতী ও তাৎপর্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। দিগ্‌নাগের সমলমায়িক বহুবন্ধু নামে যে প্রধান বৌদ্ধ নৈরায়িকের বার্তা পাওয়া যায়, বাচস্পতি মিশ্র তাঁহাকেই সুবন্ধু নামে বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সে বাহাই হউক, মূল কথা, উদ্যোতকর দ্বিতীয় সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ববর্তী এবং ভগবান্ বাংজায়ন খৃষ্ট-পূর্ববর্তী, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এখানে নিজের বিশ্বাসানুসারেই এ সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম। প্রধান ঐতিহাসিকগণের কথা এবং অনুসন্ধান দ্বারা ফলে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা গ্রন্থশেষে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি পাঠ ও অনুসন্ধানাদি করিয়াছি, তাহাতে নানা মতভেদই পাইয়াছি; কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাই নাই। মতভেদ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের টিপ্পনীর মধ্যেও কোন কোন কথা বলিয়াছি।

ভাষ্যকার বাংজায়ন কোন দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। বাংজায়ন দাক্ষিণাত্য, ইহা অনেকে সমর্থন করেন। বাংজায়ন ও উদ্যোতকর উভয়েই মৈথিল, ইহাও অনেকে বলেন। ভাষ্য ও বার্তিকের দ্বারা এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করা যায় না। কোন কোন কথার দ্বারা বাহা কল্পনা করা যায় এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, বখা স্থানে তাহার আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থশেষেও পুনরায় এ সকল বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে।



## নিবেদন

ভগবানের কৃপায় বঙ্গভাষায় অহুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীর সহিত বাংজায়ন ভাষা সমেত আর-দর্শনের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হইল। বাংজায়ন ভাষা বৈকুণ্ঠ অতি দুর্লভ গ্রন্থ, তাহা স্বধী-সমাজের অবিদিত নহে। মাদৃশ ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রকৃত ব্যাখ্যা দি কার্যে অযোগ্য। তথাপি কতিপয় বিদ্যোৎসাহী সুশিক্ষিত স্নহৎ ব্যক্তির আন্তরিক উৎসাহের বলেই অতি ছুঃসাধের পরিচয় দিয়া আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। স্বধীগণ এই গ্রন্থে আমার প্রচুর ভ্রম-প্রমাদের পরিচয় পাইবেন এবং এই অতি ছুঃসাধা কার্য সম্পাদন করিতে আমি কাহারও পক্ষা অহুসরণ করিতে না পারার পদে পদে আমার পদস্থলন অবশ্যস্বাভাবী, ইহা জানিয়াও এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার গুরুতর পরিশ্রমের ফলে যদি বাংজায়ন-ভাষা-পাঠার্থীদের কিছুমাত্র ও সাহায্য হয়, পরিশ্রমের লাভ হয়, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

নানা কারণে বহু স্থলে বাংজায়ন ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা এখন ছুঃসাধা হইয়াছে। পরন্তু প্রচলিত ভাষা পুস্তকে যেরূপে ভাষা-সন্দর্ভ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষ্যের সংগতি এবং পূর্ণপক্ষ উত্তরপক্ষ-সন্দর্ভ এবং প্রমুখ ও উত্তর-সন্দর্ভের নির্ণয় করাও সর্বত্র সহজে সম্ভব হয় না। এই সমস্ত কারণে বাংজায়ন ভাষা আরও অতি দুর্লভ হইয়াছে। এ জন্ত এই গ্রন্থে ভাষা-সন্দর্ভগুলি পৃথকভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে যথামতি চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে মূল ভাষা অপেক্ষাকৃত সুবোধ হইবে, আশা করা যায়। উদ্যোতকদের বার্তিক ও বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ ও নানা পাঠভেদের যথামতি পর্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থে ভাষা-পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির সম্মত ভাষা-পাঠ নির্ণয় করিতে না পারার প্রচলিত পাঠই গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

প্রাচীন বাংজায়ন ভাষ্যে যে প্রণালীতে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, বর্তমান বঙ্গভাষায় ঐ প্রণালীতে বাক্যপ্রয়োগ হয় না। তথাপি মূলানুযায়ী অহুবাদের অহুরোধে ভাষ্যের প্রণালীতেই ভাষ্যের অহুবাদ করিতে হইয়াছে। স্বধীন ভাষার মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণন করিলে তাহা মূলের অহুবাদ হয় না; তদ্বারা মূলের পদ পদার্থ বুঝিয়া, প্রতিপাদ্য বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয় না। বাংজায়ন ভাষ্যের তাৎপর্যবোধের জায় বহু স্থলেই শব্দার্থ-বোধও অতি সুকঠিন। এ জন্ত অনেক স্থলে অহুবাদে ভাষ্যের শব্দই উল্লেখ করিয়া পরে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং সর্বত্রই বাহাতে অহুবাদের দ্বারা মূল ভাষ্যের বাক্যার্থ-বোধে সহায়তা হইতে পারে, যথাসক্তি সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছি। ভাষ্যকার হৃদয়ের জায় সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা প্রথমে তাহার বক্তব্যটি বলিয়া, পরে আবার নিজেই সেই নিজ বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা ভাষ্যগ্রন্থের লক্ষণ। উহার নাম স্বপদ-বর্ণন। ভাষ্যের ঐ সকল অংশের অহুবাদের পূর্বে সর্বত্র “বিশদার্থ” বলিয়া ঐ সকল ভাষ্য-সন্দর্ভের অহুবাদ করিয়াছি। ঐ সকল ভাষ্যসন্দর্ভকে ভাষ্যকারের স্ববাক্য-



বর্ণন-ভাষা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষ্যের জায় অল্পবাদেও বহু স্থলে ভাষ্যের প্রণালীতে স্বাক্যবর্ণন বা পূৰ্ব্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা করিয়াছি; অনেক স্থলে ভাষ্যের তাৎপর্য বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছি। বহু স্থলে যথাশক্তি সরল ভাষায় অল্পবাদের পরে “বিস্তৃতি”র দ্বারা মূলের প্রতিপাদ্য বিষয়টী বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছি। হুজুর দার্শনিক গ্রন্থের কেবল অল্পবাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তাৎপর্য বুঝা যায় না। অনেক স্থলে নানাবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াও প্রকৃতার্থ-বোধে প্রতিবদ্ধক হয়। বিশেষতঃ বাৎস্তায়নভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্যার্থবোধ বা তাৎপর্য্যবোধ নানা কারণে অতি দুষ্কঠিন, এই বিশ্বাসে সর্বত্র সংযুক্ত টীকার প্রণালীতে বহুভাষ্যর একটি টিপ্পনী প্রকাশ করিয়াছি। টিপ্পনীতে সর্বত্রই হুজুর ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝাইতে এবং বাৎস্তায়ন ভাষ্য বুঝিতে গেলে যে সকল জিজ্ঞাস্তা উপস্থিত হয়, তাহারও যথামতি যথাসম্ভব আলোচনা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন জায়গার্য্য উদ্যোতকর, বাৎস্তায়নভাষ্যের বে বার্তিক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জায়হুজেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উহা জায়বার্তিক নামে প্রসিদ্ধ। উদ্যোতকর বার্তিক গ্রন্থের লক্ষণানুসারে স্বাধীন সমালোচনার দ্বারা বহু স্থলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও মতের খণ্ডন করিয়াছেন এবং নিজে অন্তরূপ হুজুর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ত্রৈমূল্যচম্পতি মিশ্রও জায়বার্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা নামে উদ্যোতকরের বার্তিকেরই টীকা করিয়া উদ্যোতকরের মত সমর্থন করিতে ভাষ্যকারের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য বাচম্পতি মিশ্রের ঐ টীকারই জায়বার্তিক-তাৎপর্য্য-পরিণতি নামে টীকা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কিয়দংশ-মাত্র মুদ্রিত হওয়ার সর্বাংশ দেখিতে পাই নাই। জায়বার্তিকে উদ্যোতকর এবং তাৎপর্য্যটীকার বাচম্পতি মিশ্র বাৎস্তায়ন ভাষ্যের বে যে স্থলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাহাদিগের নামোন্মেষে যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছি। অজ্ঞাত স্থলে আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র চিন্তার দ্বারা যেমন বুঝিয়াছি, অগত্যা সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছি। বাৎস্তায়ন ভাষ্যের অল্পবাদের সঙ্গে জায়বার্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার অনেক অংশের অল্পবাদ করাও কর্তব্য মনে করিয়া টিপ্পনীতে তাহাও যথামতি করিয়াছি। সে জন্তও টিপ্পনী অনেক স্থলে বিস্তৃত হইয়াছে। উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র বে যে স্থলে বাৎস্তায়নের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, আমি সেই সেই স্থলে বাৎস্তায়নের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি এবং অনেক স্থলে উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি গুরুপাদগণের কথা বুঝিতে না পারিরাই বিদ্যার্ণীর জায় স্থবীসমাজের নিকটে অসংকোচে আমার সংশয় জ্ঞাপন এবং অনেক স্থলে সিদ্ধান্তের ভাবে আমার পূৰ্ব্বপক্ষেবই নিবেদন ও সমর্থন করিয়াছি। প্রাচীন গুরুপাদগণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে; মাদৃশ ব্যক্তি তাহা করনাও করিতে পারে না। আমি প্রাচীনগণের কথা বুঝিতে না পারিরাই আমার সংশয় ও পূৰ্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া বিদ্যার্ণীর জায় স্থবীসমাজে নিবেদন করিয়াছি। স্থবীসমাজ ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিবেন, দেশে প্রাচীন জায় গ্রন্থের প্রচুর আলোচনা হইবে, বাৎস্তায়নের মতের এবং তাহার ভাষ্যের বিশেষ আলোচনা হইবে, ইহাই আমার আশা ও উদ্দেশ্য। এ জন্ত অনেক স্থলে প্রাচীন ও নব্য নৈমারিকগণের মতভেদেরও যথামতি



আলোচনা করিয়াছি। অনেক স্থলে বাস্তবজ্ঞানভাষ্যে ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থব্যাখ্যা করিতেও টিপ্সনীতে আবশ্যক বোধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গভাষায় বিবিধ বিষয়ে অনেক আলোচনার ফলে যদি পাঠকগণের কোন অংশে কোন বিষয়ে কিছু উপকার হয়, ইহাও আমার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত বিবিধ আলোচনা করিতে যাইরা মাদৃশ ব্যক্তির বহু অজ্ঞতা ও ভ্রমের পরিচয় দিতে ইহঁবে জানিয়াও পূর্বোক্তরূপ নানা উদ্দেশ্যে আমি অসংকোচে নানা আলোচনা করিয়াছি। পরন্তু দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ ত্রায়শাস্ত্র বঙ্গভাষায় বুঝাইতে ইহঁলে সংক্ষেপে তাহা বুঝান অসম্ভব। বিশেষতঃ বাস্তবজ্ঞান ভাষ্যের ত্রায় অতি দ্রুত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সকল কথা বিশেষরূপে বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলা আবশ্যক হয়। এ জ্ঞাত ও টিপ্সনীতে বহু কথা বলিতে ইহঁয়াছে। কিন্তু দ্রুত সংস্কৃত টীকার ত্রায় অনেকে এই গ্রন্থের টিপ্সনীরও সর্বাংশ না পড়িয়া কেবল ব্যাখ্যাংশমাত্রও পড়িতে পারেন। অনেক স্থলে মূল ভাষা ও অনুবাদ না পড়িয়াও কেবল টিপ্সনী পড়িলেও এবং অনেক স্থলে কেবল অনুবাদ ও বিবৃতি পড়িলেও বাহ্যতে ভাষ্যের প্রতিপাদ্য বুঝা যায়, সেইরূপ চেষ্টাও যথাসক্তি করিয়াছি। সর্বশ্রেণীর পাঠকগণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি যথাসক্তি এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও নানা কথার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, বঙ্গভাষায় ত্রায়-দর্শন ও বাস্তবজ্ঞানভাষ্য বুঝাইতে আমি যথাসক্তি চেষ্টা করিলেও বাহ্যরা এই সকল বিষয়ের কোনরূপ আলোচনা করিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই, তাহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে ইহঁবে। কোন অজ্ঞাত হ্রস্ব বিবরণ প্রথমে সহজে কেহই বুঝিতে পারেন না। বঙ্গভাষায় ত্রায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেও বিষয়ের হ্রস্বোক্তবশতঃ সে ব্যাখ্যাও সর্বত্র সুবোধ হইতে পারে না। সরল ভাষায়, স্বাধীন ভাষায় সহজে ত্রায়শাস্ত্র বুঝাইবার অনুরোধে জ্ঞানপূর্বক প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ বা পরিত্যাগ করা যায় না। পারিভাষিক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অল্প অপ্রসিদ্ধ শব্দের দ্বারা ঐ সকল পারিভাষিক শব্দার্থ প্রকাশও অসম্ভব। এইরূপ নানা কারণে এবং সর্বোপরি আমার অক্ষমতাবশতঃ অনেক স্থলে অনুবাদাদি ইচ্ছা নহেও সুবোধ করিতে পারি নাই। মূলানুবাদী অনুবাদ করিতে অনুবাদের ভাষার পূর্ণতা বা সৌষ্ঠব-সাধনেও স্বাধীন ভাবে যত্ন করিতে পারি নাই। পরন্তু এই প্রথম অধ্যায় বিশেষ হ্রস্বোক্ত বলিয়া এবং এই অধ্যায়ে কষ্টব্যবোধে অনেক কথার আলোচনা করার অনেক স্থলে এই গ্রন্থে অনেক পাঠকের নিকটে সম্ভবতঃ অতি হ্রস্বোক্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। আমার প্রথম চেষ্টায় এই প্রথম খণ্ডে আরও অনেক প্রকার ত্রুটি ও ভাবাদোষ প্রভৃতি ঘটিয়াছে, ইহা আমিও বুঝিতেছি। অন্ত্যস্ত খণ্ডে ভাবাদোষের দিকে বিশেষ মনোযোগী আছি। আর তিন খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা এই যে, সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাকে নিজ নিজ অভিমত জানাইবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরমবিদ্যোৎসাহিতার ফলে যে মহান উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই গ্রন্থের সৌষ্ঠবসাধন আমার পরম কর্তব্য ইহঁয়াছে, তজ্জন্ত আমি সকলেরই অভিমত ও

উপদেশ গ্রহণ করিতে সর্বদা ইচ্ছুক। পাঠকগণ এই গ্রন্থকে নিজের গ্রন্থ মনে করিয়া ইহার সৌষ্ঠবসাধনের জন্য আমাকে উপদেশ করিলে, তদনুসারে অল্প খণ্ডে এবং গ্রন্থশেষে আমি দোষ সংশোধনে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আর যদি পাঠকগণের উৎসাহের ফলে আমার জীবনে কখনও এই গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ হয়, তবে তখন আমি ইহার সৌষ্ঠবসম্পাদনে বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে পারিব। আমার আর বাহা বাহা বলিবার আছে, তাহা গ্রন্থশেষেই বক্তব্য। ইতি।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪

২৭শে শ্রাবণ

পাবনা

}

শ্রীফণিভূষণ শর্মা

— ০ —



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
৮ম সূত্রে—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ-ভেদে শব্দপ্রমাণের দ্বৈবিধ্য কখন, ( ভাষ্যে ) ঐ সূত্রের প্রয়োজন কখন ও "দৃষ্টার্থ" ও "অদৃষ্টার্থ" শব্দের ব্যাখ্যা	... ১৫৭
৯ম সূত্রে আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের নামোক্তরূপ প্রমেয়-বিভাগ ও প্রমেয়ের সামান্ত-লক্ষণ সূচনা	... ১৬০
ভাষ্যে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের পরিচয় ও ত্রব্যগুণাদি সামান্ত প্রমেয়ের অস্তিত্ব কখন পূর্বক ত্রাদিসূত্রে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের প্রমেয় নামে বিশেষ উল্লেখের কারণ কখন, প্রমেয়মধ্যে সূত্রের অন্তর্ভুক্তির কারণ কখন	... ১৬১
১০ম সূত্রে ইচ্ছাদি গুণের আত্মলিপ্ত কখন দ্বারা আত্মার লক্ষণ সূচনা	... ১৬৭
ভাষ্যে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা ও অনাব্যবাহার মত খণ্ডিত	... ১৬৯
১১শ সূত্রে শরীরের লক্ষণ	... ১৭৬
১২শ সূত্রে ইন্দ্রিয়ের বিভাগ ও লক্ষণ সূচনা ও ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব কখন	... ১৭৭
ভাষ্যে—ইন্দ্রিয়ের সামান্ত লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা ও ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব স্বীকারের যুক্তি প্রদর্শন	... ১৭৮
১৩শ সূত্রে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত কখন, ভাষ্যে ঐ সূত্রের প্রয়োজন কখন	... ১৮০
১৪শ সূত্রে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ কখন পূর্বক তাহার লক্ষণ সূচনা	... ১৮০
১৫শ সূত্রে বুদ্ধির লক্ষণ ( ভাষ্যে ) সাংখ্যমত নিরাস	... ১৮২
১৬শ সূত্রে মনের সাধক উল্লেখ পূর্বক লক্ষণ সূচনা	... ১৮৩
ভাষ্যে সূত্রানুসারে মনের সাধন	... ১৮৪
১৭শ সূত্রে প্রবৃত্তির লক্ষণ	... ১৮৬
১৮শ সূত্রে দোষের লক্ষণ	... ১৮৭
১৯শ সূত্রে প্রেত্যভাবের লক্ষণ, ভাষ্যে প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যা ও অনাদিত্ব কখন	... ১৮৯
২০শ সূত্রে ফলের লক্ষণ	... ১৯৫
২১শ সূত্রে দুঃখের লক্ষণ	... ১৯১
২২শ সূত্রে অপবর্গের লক্ষণ	... ১৯৩
ভাষ্যে—মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এই মতের বিশেষ বিচারপূর্বক খণ্ডন	... ১৯৫—২০১
২৩শ সূত্রে সংশয়ের লক্ষণ ও পক্ষবিধ বিশেষ কারণজ্ঞ পক্ষবিধ সংশয়ের সূচনা	... ২০৬
ভাষ্যে পক্ষবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ	... ২০৮—২১৬
২৪শ সূত্রে প্রয়োজনের লক্ষণ	... ২১৯
২৫শ সূত্রে দৃষ্টান্তের লক্ষণ	... ২২০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৬শ সূত্রে সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণ ...	২২২
২৭শ সূত্রে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের বিভাগ ...	২২৪
২৮শ সূত্রে সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২২৫
২৯শ সূত্রে প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২২৬
৩০শ সূত্রে অধিকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২৩০
৩১শ সূত্রে অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২৩২
৩২শ সূত্রে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের বিভাগ ...	২৩৫
ভাষ্যো—দশাবয়ববাদের উল্লেখ, ব্যাখ্যা ও খণ্ডন ...	২৩৭
৩৩শ সূত্রে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ ...	২৪০
৩৪শ সূত্রে হেতুর সামান্ত লক্ষণ ও সাধর্ম্য্য হেতুর লক্ষণ ...	২৪৮
৩৫শ সূত্রে বৈধর্ম্য্য হেতুর লক্ষণ ...	২৪৮
৩৬শ সূত্রে উদাহরণের সামান্ত লক্ষণ ও সাধর্ম্য্যোদাহরণের লক্ষণ ...	২৬৩
৩৭শ সূত্রে বৈধর্ম্য্যোদাহরণের লক্ষণ ...	২৬৯
৩৮শ সূত্রে উপনয়ের লক্ষণ ...	২৭৮
৩৯শ সূত্রে নিগমনের লক্ষণ ...	২৮২

ভাষ্যো—প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বে সর্বপ্রমাণের মিলন কখন ও

তাহার হেতু কখন, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন বর্ণন ২৮৬—২৯৮

৪০শ সূত্রে তর্কের লক্ষণ ও তর্কের প্রয়োজন কখন ... ৩০৪

ভাষ্যো—তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন ... ৩০৫

তর্ক, তত্ত্বজ্ঞান নহে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সহায়, ইহার হেতু কখন ... ৩১৩

৪১শ সূত্রে নির্ণয়ের লক্ষণ ... ৩১৬

ভাষ্যো—সাধন ও উপালম্ব, এই উভয়ই নির্ণয়-সাধন হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষের

সমর্থন ও নিরাস এবং নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে, ত্রাসসূত্রোক্ত নির্ণয়-

লক্ষণ নির্ণয়মাত্রের লক্ষণ নহে, এই সিদ্ধান্ত কখন ... ৩১৭

## দ্বিতীয় আশ্রিক

১ম সূত্রে বাদের লক্ষণ ... ৩২৬

ভাষ্যো বাদলক্ষণের ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ পদগুলির প্রয়োজন বর্ণন ... ৩২৮

২য় সূত্রে জল্পের লক্ষণ, ভাষ্যো জল্পলক্ষণের ব্যাখ্যা, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা

কোন পদার্থের সাধন হইতেই পারে না, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন পূর্বক তাহার

উত্তর ... ৩৩৯



বিষয়	পৃষ্ঠা
৩য় সূত্রে বিতণ্ডার লক্ষণ	৩৪৬
৪র্থ সূত্রে হেত্বাভাসের বিভাগ	৩৪৯
৫ম সূত্রে সব্যভিচারের লক্ষণ	৩৫৯
৬ষ্ঠ সূত্রে বিকল্পের লক্ষণ	৩৬৯
৭ম সূত্রে প্রকরণময়ের লক্ষণ	৩৭৫
৮ম সূত্রে সাধ্যাসমের লক্ষণ	৩৭৯
৯ম সূত্রে কালাতীতের লক্ষণ	৩৮৪
ভাষ্যে কালাতীত হেত্বাভাস-লক্ষণের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন, সূত্রের অর্থান্তরের উল্লেখপূর্বক তাহার খণ্ডন	৩৮৪
১০ম সূত্রে—ছলের সামান্ত লক্ষণ	৩৯২
১১শ সূত্রে—ত্রিবিধ ছলের বিভাগ	৩৯৩
১২শ সূত্রে—বাক্‌ছলের লক্ষণ, ভাষ্যে বাক্‌ছলের উদাহরণ ও অসম্ভবত্ব সমর্থন	৩৯৪—৪০৭
১৩শ সূত্রে—সামান্ত ছলের লক্ষণ, ভাষ্যে—সামান্ত ছলের উদাহরণ ও অসম্ভবত্ব সমর্থন	৪০৪—৪০৬
১৪শ সূত্রে—উপচারছলের লক্ষণ, ভাষ্যে—উপচারছলের উদাহরণ ও অসম্ভবত্ব সমর্থন	৪০৯—৪১২
১৫শ সূত্রে—বাক্‌ছল হইতে উপচারছল ভিন্ন নহে, সুতরাং ছল দ্বিবিধ, এই পূর্ণপক্ষ	৪১৫
১৬শ সূত্রে—বাক্‌ছল হইতে উপচারছলের ভেদ জ্ঞাপন করিয়া পূর্ণসূত্রোক্ত পূর্ণপক্ষের প্রতিবেশ	৪১৬
১৭শ সূত্রে—বাক্‌ছল ও উপচারছলের বিশেষ স্বীকার না করিলে ছলের একত্বাপত্তি কখন	৪১৭
১৮শ সূত্রে—জাতির লক্ষণ	৪১৮
১৯শ সূত্রে—নিগ্রহস্থানের লক্ষণ	৪২২
২০শ সূত্রে—জাতি ও নিগ্রহস্থানের বহুত্ব কখন	৪২৪

# ন্যায়দর্শন

## বাৎস্তায়নভাষ্য ।

ভাষ্য । প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ

প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং ।

অনুবাদ । প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে প্রবৃত্তির সফলতা হয়, অতএব প্রমাণ এই পদার্থের অব্যভিচারী ( এবং ) সর্বাপেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যেহেতু গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকে প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সেই প্রবৃত্তিই সফল হয়, অতএব বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাত্ত পদার্থকে যাহা এবং যেরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেইরূপই হয়, কখনও তাহার অন্তথা হয় না এবং সর্বত্রই সর্বাপেক্ষা প্রমাণেরই প্রয়োজন অধিক ।

বিবৃতি । জীব তাহার গ্রাহ্য পদার্থের প্রাপ্তি এবং ত্যাজ্য পদার্থের পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল পদার্থকে যথার্থরূপে না বুঝিয়া অর্থাৎ এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া অথবা এক প্রকার পদার্থকে অন্য প্রকার পদার্থ বলিয়া ভুল বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই সফল হয় না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না । জলার্থী ব্যক্তি তৈলকে জল বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা জলকে তৈল বুঝিয়া তাহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কি সফল হয় ? সেখানে কি তাহার বস্তুতঃ জলের প্রাপ্তি এবং তৈলের পরিত্যাগ হয় ? তাহা কখনই হয় না । যে কোনরূপে উদ্বেগ-সিদ্ধিই এখানে প্রবৃত্তির সফলতা নহে, তাহা ভুল বুঝিয়াও হইতে পারে । কুপের জলকে গঙ্গাজল বুঝিয়া পান করিলেও পিপাসা নিবৃত্তি হয়, কিন্তু গঙ্গাজল বুঝিয়া গঙ্গাজল-লাভের যে প্রবৃত্তি, তাহা সেখানে সফল হয় না । কোন স্থলে ভুল বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইয়া আশাতীত ফললাভও হইতে পারে, কিন্তু সেখানে যাহা বুঝিয়া যাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ-বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সে প্রবৃত্তি কিন্তু সফল হয় না, কারণ, সেই প্রবৃত্তির বিষয় সেই পদার্থ অথবা সেইরূপ পদার্থ সেখানে থাকে না, তাহা থাকিলে সে বোধ যথার্থই হইত । পদার্থের যথার্থ বোধ হইলেই তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ-বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইয়া থাকে । সুতরাং যে বোধ সফল



প্রবৃত্তির জনক, তাহাকেই যথার্থ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। ঐ যথার্থ বোধ আবার প্রমাণ ব্যতীত হয় না। উহা প্রমাণেরই ব্যাপার, সুতরাং উহার দ্বারা প্রমাণও সকল প্রবৃত্তির জনক। সুতরাং বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ প্রমাণের প্রামাণ্য আছে, তাহা না হইলে প্রমাণ কখনই সকল প্রবৃত্তি জন্মাইত না। ফলকথা, এইরূপ অহুমানের দ্বারা সামান্ত্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। এবং প্রমাণ ব্যতীত যখন কোন পদার্থেরই যথার্থ বোধ হয় না, যথার্থ বোধ না হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি সকল হয় না, সুতরাং প্রমাণ সকল প্রবৃত্তির জনক, প্রমাণ যথার্থ অহুভূতির সাধন; অতএব বুঝা যায়, প্রমাণই সর্বাংগে নিতান্ত আবশ্যক, সর্বাংগে প্রমাণেরই অধিক প্রয়োজন, এ জন্ত মহর্ষি গৌতম সর্বাংগে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

টিপ্পনী। ন্যায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রের দ্বারা “প্রমাণ”, “প্রমের” প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সলাভে আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানসাধনের জন্য তাঁহার এই ন্যায়দর্শন আবশ্যক। নিঃশ্রেয়সলাভে গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক কেন? ইহা পরে ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি গৌতমের ঐ কথার এক সময়ে শূন্যবাদী ও সংশয়বাদী বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমাণের দ্বারাই যখন সকল পদার্থের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তখন প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান সর্বাংগে আবশ্যক। প্রামাণ্যই প্রমাণের তত্ত্ব, কিন্তু সেই প্রামাণ্য নিশ্চয়ের কোনই উপায় নাই। বাহা “প্রমাণ” নামে অভিহিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করিব কিরূপে? অহুভূতির সাধন হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, বাহা বস্তুতঃ প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া দার্শনিকগণ তাহাকে বলিয়াছেন “প্রমাণভাস”,—ভ্রমসাধন সেই প্রমাণভাসের দ্বারাও অসংখ্য অহুভূতি হইতেছে। বাহা যথার্থ অহুভূতির সাধন, তাহাকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই অহুভূতি যথার্থ হইল কি না, ইহা নিশ্চয় করিবার উপায় যখন কিছুই নাই, তখন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় কোনরূপেই হইতে পারে না। প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া যথার্থরূপে বুঝিতে না পারিলেও তাহার দ্বারা অন্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব, সুতরাং অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া গৌতমের এই শাস্ত্র অনর্থক। আর এক কথা, গৌতম আত্ম প্রভৃতি “প্রমের” পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের চরম কারণরূপে দ্বিতীয় সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতে আত্ম প্রভৃতি “প্রমের” পদার্থগুলিই প্রধান মোক্ষোপযোগী, তাহা হইলে ঐ “প্রমের” পদার্থের সর্বাংগে উল্লেখ না করিয়া “প্রমাণ” পদার্থেরই সর্বাংগে উল্লেখ করা তাঁহার উচিত হয় নাই। এই সমস্ত আপত্তি নিরাসের জন্য গৌতমমতপ্রতিষ্ঠাকামী ভাষ্যকার বাৎস্যরন ভাষ্যরসে বলিয়াছেন;—

“প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ প্রমাণং”

ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের উপায় আছে ; অহুমান প্রমাণের দ্বারা তাহা নিশ্চয় করা যায়। অহুমানের দ্বারা বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী। “প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী” এই কথা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে, প্রমাণ যে পদার্থকে যাহা এবং যে প্রকার বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেই প্রকারই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না, অন্যথা হইলে বুঝিবে, তাহা প্রমাণ নহে—“প্রমাণাভাস”। “প্রমাণাভাস” তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে। কারণ, প্রমাণাভাসের প্রতিপাদ্য পদার্থ বস্তুতঃ তাহা নহে অথবা সেই প্রকার নহে। “প্রমাণাভাস” রজ্জ্বকে “সর্প” বলিয়া প্রতিপন্ন করে, কিন্তু রজ্জ্বর বার্থ জ্ঞান হইলে তখন বুঝা যায়, উহা সর্প নহে। প্রমাণাভাস আত্মাকে বিনাশী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, কিন্তু আত্মার তব্ব বুঝিলে তখন বুঝা যায়, আত্মা সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী, আত্মা নিত্য। সুতরাং বুঝা যায়, প্রমাণাভাস তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী। প্রতিপাদ্য পদার্থের এই অব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য। এই অব্যভিচারিতার অহুমানই প্রমাণের প্রামাণ্যের অহুমান। ভাষ্যকার “প্রমাণং অর্থবৎ” এই কথার দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই অহুমানে হেতু বলিয়াছেন “প্রবৃত্তিসামর্থ্য”। “সামর্থ্য” শব্দটি প্রাচীন কালে ফলসম্বন্ধ বা সফলতা অর্থেও প্রযুক্ত হইত। প্রাচীনগণ সফল প্রবৃত্তিকে “সমর্থপ্রবৃত্তি” বলিতেন। যে প্রবৃত্তির “অর্থ” কি না বিবর সমাক, অর্থাৎ বার্থ জ্ঞানের বিবর হইয়াছে, তাহাই “সমর্থপ্রবৃত্তি,” তদ্বিন্ন প্রবৃত্তি বার্থপ্রবৃত্তি, নিফল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির সামর্থ্য বলিতে প্রবৃত্তির সফলতা।\* ভাষ্যকারের ঐ কথার কলিতার্থ বুঝিতে হইবে—সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব। ভাষ্যকার ঐ হেতুর দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, প্রমাণ যখন সফল প্রবৃত্তির জনক, তখন বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী, অর্থাৎ তাহার প্রামাণ্য আছে। প্রমাণ যদি প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী না হইত, তাহা হইলে কখনই সফলপ্রবৃত্তি জন্মাইত না। যাহা প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন “প্রমাণাভাস”। প্রমাণাভাসের দ্বারা বুঝিয়া সেই বস্তুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই সফল হইতে পারে না, কারণ, প্রমাণাভাসের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, বস্তুতঃ তাহা অথবা সেই প্রকার বস্তু সেখানে থাকে না। তাহা না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ কিরূপে হইবে? তাহা কোন-

\* “অর্থবসিতি নিত্যবোধে মতুঃ। নিত্যতা চাব্যভিচারিতা, তেনার্থাব্যভিচারীত্বাৎ। ইয়মেব চার্থা-  
ব্যভিচারিতা প্রমাণত্ব, বস্তুতঃকালান্তরাবস্থান্তরাবিন্যাসোৎপত্ত্বপ্ৰকারোৎপত্ত্বপদর্শিতয়োঃ। অত্র হেতুঃ  
প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যদি পুনরেন্তদর্থবজ্ঞাতবিদ্যায় সমর্থ্যঃ প্রবৃত্তিমক্টিহাৎ যথা প্রমাণা-  
ভাস ইতি ভাবিত্বেকী হেতুঃ, অথব্যভিচারেকী বা অহুমানত্বাৎ প্রমাণত্বাৎ অর্থবজ্ঞাপি সম্ভবাৎ” —ভাটবার্তিক,  
‘তাত্ত্বিক’।



রূপেই হইতে পারে না। ফলতঃ এইরূপে পূর্বোক্ত প্রকার অহুমানের দ্বারা সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে, ইহাই ভাষ্যকারের প্রথম কথা। “অর্থ” শব্দের দ্বারা বস্তুমাত্র বুঝা গেলেও ভাব্যকার গ্রাহ ও ত্যাজ্য পদার্থকেই এখানে “অর্থ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাষ্যকার নিজেই পরে তাহা বলিয়াছেন। ফলকথা, তাহা গ্রাহ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, কিন্তু উপেক্ষণীয়, তাহা পদার্থ হইলেও এখানে “অর্থ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। কারণ, উপেক্ষণীয় পদার্থে কোন প্রবৃত্তিই হয় না; প্রবৃত্তির সফলতার কথা সেখানে বলা যায় না।

হৃদয়দর্শীর আপত্তি হইতে পারে যে, যে অহুমান প্রমাণের দ্বারা ভাষ্যকার সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই অহুমানের প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইবে? তাহার জন্য আবার অন্য অহুমান উপস্থিত করিলে তাহারই বা প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইবে? এইরূপে কোন দিনই প্রমাণের প্রামাণ্য-সন্দেহ নিবৃত্ত হইবে না, তবে আর প্রামাণ্য নিশ্চয় করা গেল কৈ? এতদ্বত্তে বক্তব্য এই যে, অহুমান মাত্রের প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। এই যে ঘড়ি দেখিয়া সময়ের অহুমান করিয়া তদনুসারে এখন সর্বদেশে অসংখ্য কার্য চলিতেছে, লিপিপাঠে অহুমানের দ্বারা কত কত প্রব্রবর্তীর নির্ণয় হইতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত তরুণ তত্ত্বের অহুমান করিয়া তদনুসারে কত কত কার্য নির্বাহ হইতেছে, তুলাদণ্ডের সাহায্যে ত্রবোর গুরুত্ববিবেকের অহুমান করিয়া সূচিরকাল হইতে জ্বর-বিক্রম ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, ভূয়োদর্শনসিদ্ধ অবিসংবাদী সংস্কারসমূহের মহিমায় আরও কত কত অহুমান করিয়া সূচিরকাল হইতে জীবকূল জীবনবাত্রা নির্বাহ করিতেছে, এই সকল অহুমানে কি বস্তুতঃ সর্বত্রই প্রামাণ্য-সংশয় হইয়াছে ও হইয়া থাকে? তাহা হইলে কি সংসার চলিত? অবশ্য অনেক স্থলে প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় এবং জ্ঞানে যথার্থতা-সংশয় হইয়া থাকে, এ জন্য ন্যায়চার্য্যগণ অন্য দার্শনিকের ন্যায় একেবারে “স্বতঃপ্রামাণ্য” পক্ষ স্বীকার করেন নাই। ইহারা “পরতঃপ্রামাণ্য”বাদী। অর্থাৎ ইহাদিগের মতে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হয়, কারণ, “এই জ্ঞান যথার্থ কি না, ইহা প্রমাণ কি না”, এইরূপ সংশয় বহু স্থলে হইয়া থাকে। প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ্য হইলে এইরূপ সংশয় কখনও হইত না। কিন্তু অনেক প্রমাণবিবেকের স্বতঃপ্রামাণ্য ন্যায়চার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, তাহা সত্য, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে, সেই সকল প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয়ই হয় না। কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাইয়া এবং কোন নান্দুনা পত্রাদি পাইয়া তাহার অবশ্য একজন লেখক ছিল বা আছে, এই বিষয়ে যে অহুমান হয়, তাহাতে কি কখনও প্রামাণ্য-সংশয় হইয়া থাকে? সংশয়বাদী ইহাতেও সংশয় করিলে পদে পদে সত্যের অপলাপ করিয়া বিনষ্ট হইবেন (“সংশয়াচ্ছা বিনশ্রুতি”)।

পরন্তু সংশয়বাদী ইহা স্বীকার না করিলে স্বপক্ষ সমর্থনই করিতে পারেন না। সর্বত্র সংশয়ই তাহার স্বপক্ষ। তিনি যুক্তির দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিবেন, নচেৎ তাহার কথা কে মানিবে? কেবল “সংশয় সংশয়” বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও কেহ তাহা শুনিবে না, কেন

সংশয়, তাহার যুক্তি বলিতে হইবে। “যুক্তি” বলিয়া স্বতন্ত্র কোন একটা পদার্থ নাই। অহুমান প্রমাণ এবং তাহার সহকারী “তর্কে”র প্রচলিত নামই “যুক্তি”। অহুমান মাত্রই প্রামাণ্য-সংশয় করিলে তাহার দ্বারা সংশয়বাদীর পক্ষও নির্ণীত হইবে না। ঐ সংশয়েও সংশয়, আবার তাহাতেও সংশয়, এইরূপই বলিয়া যাইতে হইবে। যুক্তির দ্বারা কিছু স্থির হয় না, সর্বত্র সংশয় থাকে, কোন যুক্তিই প্রতিষ্ঠিত নহে, এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ, ঐ কথাগুলিও যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিয়াই বলা হইতেছে। পরন্তু সংশয় ননোগ্রাহ্য। সংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যায়। সে মানস প্রত্যক্ষে বস্তু স্বতঃপ্রমাণ। সুতরাং কোন বিষয়ে সংশয় হইলে সংশয় হইয়াছে কি না, এইরূপ সংশয় কাহারই হয় না। সর্বত্র প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যাইত। যে সকল প্রমাণে বস্তুতঃ প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তাহাতে ভাষ্যাক্ত প্রকারে প্রামাণ্যের অহুমান করিতে হইবে। সেই হেতুতে ব্যভিচার-সংশয় হইলে অহুকুল তর্কের দ্বারা তাহা দূর করিতে হইবে। তাহাতেও ঐরূপ সংশয় হইলে অন্তরূপ অহুমানের দ্বারা এবং অন্তরূপ তর্কের দ্বারা তাহা দূর করিবে। এইরূপে স্বতঃপ্রমাণ অহুমান আসিয়া পড়িলে তখন আর কেহ প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলিতে পারিবেন না। প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলিতে গেলেও তাহার কারণ বলিতে হইবে। বিনা কারণে সংশয় হইতে পারে না। সে কারণও প্রমাণসিদ্ধ করিয়া দেখাইতে হইবে। প্রমাণমাত্র প্রামাণ্য-সংশয় করিলে কিছুই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা চলিবে না। ফলতঃ যাহা অসম্ভবসিদ্ধ, তাহা স্বীকার না করিলে, প্রকৃত সত্যের অপলোপ করিলে সংশয়বাদীরও নিস্তার নাই। শূন্যবাদীর কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। মূল কথা, কোন স্থলে স্বতঃ, কোন স্থলে অহুমানাদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। ভাষ্যকার যে অহুমানের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের কথা বলিয়াছেন, ঐ অহুমান স্বতঃপ্রমাণ। উহাতে আর প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। যাহা সফল প্রবৃত্তির জনক, তাহা অবশ্য প্রমাণ। তাহা প্রমাণ না হইলে কখনই সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না, ইহা বুঝিলে এই অহুমানের উপরে আর প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। কারণ, এই অহুমানের হেতু নির্দোষ বলিয়াই নিশ্চিত। অবশ্য প্রমাণ স্বতঃই সফল প্রবৃত্তির জনক নহে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ”, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পূর্ণোক্ত গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য পদার্থের জ্ঞান হইলে যদি ঐ পদার্থ উপকারী বলিয়া মনে হয়, তবে সংসারীর তাহা পাইতে ইচ্ছা হয় এবং অপকারী বলিয়া মনে হইলে তাহার পরিহারে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাবশতঃ তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারে প্রবৃত্ত হইলে অত্যাশ্চর্য কারণ সত্ত্বে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার হইয়া থাকে। সুতরাং সেখানে সেই প্রবৃত্তি সফল হয়। এই ভাবে প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক। “প্রমাণাভাস” সফল প্রবৃত্তির জনক নহে। কারণ, প্রমাণাভাসজন্ম জ্ঞান ভ্রম। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহা পাইতে অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিভাগ হইতে পারে না। বস্তু না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার কিরূপ হইবে? সুতরাং সেখানে



প্রবৃত্তি সফল হয় না। যথার্থ জ্ঞানই সফল প্রবৃত্তির জনক। এই যথার্থ জ্ঞান প্রমাণ বাতীত হয় না। উহা প্রমাণেরই বাপার। সুতরাং এই যথার্থজ্ঞানরূপ বাপারের দ্বারা প্রমাণও সফল প্রবৃত্তির জনক। সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুলিলে যেমন প্রমাণজ্ঞ জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয় হয়, তদ্রূপ সেখানে প্রমাণেরও এই হেতুর সাহায্যে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। তাহা হইলে প্রমাণের দ্বারা প্রমের প্রবৃত্তি পদার্থবর্গের তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব নহে এবং অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া মহাবি পোতমের এই জ্ঞানশাস্ত্র অনর্থকও নহে।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুলিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তির সফলতার পূর্বে প্রমাণকে সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া নিশ্চয় করা গেল না। সুতরাং তখন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ও হইল না। প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও পদার্থ-নিশ্চয় হইল না। পদার্থ-নিশ্চয় না হইলেও প্রবৃত্তি হইল না। প্রবৃত্তি না হইলে প্রবৃত্তির সফলতা অলীক। সুতরাং কোন কালেই প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের আশা থাকিল না। আপত্তিটা আপাততঃ একটা গুরুতর কিছু মনে হইলেও ইহা গুরুতর কিছু নহে। কারণ, প্রবৃত্তিতে পদার্থ-নিশ্চয় নিয়ত কারণ নহে। পদার্থ-সন্দেহ স্থলেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে এবং পূর্বে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলেও প্রমাণজ্ঞ জ্ঞান হইবার কোন বাধা নাই। প্রমাণের দ্বারা পদার্থ-বোধ হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে ইচ্ছাবিশেষ প্রযুক্ত প্রবৃত্তি হইয়া যখন এই প্রবৃত্তির সফলত্ব নিশ্চয় করে, তখনই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। পদার্থজ্ঞান এবং প্রবৃত্তির পূর্বে সর্বত্র প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক হয় না। উদয়নাচার্য্য “জ্ঞানবান্ধিক-তাৎপর্য্যপরিণতি”তে এ কথাটা আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ। ঐহিক ফলের জন্ত এবং পারলৌকিক ফলের জন্ত। পারলৌকিক ফলের জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্বে প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক। কিন্তু ঐহিক ফলের জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাহাতে পদার্থ-নিশ্চয়ও অপেক্ষা করে না এবং প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় দূরে থাকুক, প্রামাণ্য কি, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন সময়ে পূর্বেও প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইয়া পড়ে, তাহাও সে স্থলে প্রবৃত্তির কারণ নহে। ইহা স্বীকার না করিলে যিনি জয়লাভের ইচ্ছায় প্রামাণ্য খণ্ডন করিবার জন্ত বিচারে প্রবৃত্তি হইতেছেন, তাহার এ প্রবৃত্তি কেন হইতেছে? তাহারও ত জয়লাভ একান্ত নিশ্চিত নহে। সুতরাং পদার্থ-নিশ্চয় না হইলেও প্রবৃত্তি হয়, ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য এবং সত্য।

যেখানে একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থ-জ্ঞান হইতেছে, যেমন আদানিগের চকুরাদি ইন্দ্రిয়ের দ্বারা প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ কত প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেখানে প্রথম প্রমাণকে সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুলিলে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া যায়। শেষে তজ্জাতীয় প্রমাণ মাত্রেরই “ইহা যখন তজ্জাতীয় অর্থাৎ সফল প্রবৃত্তিজনক প্রমাণের সজাতীয়,” তখন ইহা অবশ্য প্রমাণ, এইরূপে প্রামাণ্যের নিশ্চয় পূর্বেও হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। প্রমাণমূলক প্রচলিত

ব্যবহারে এইরূপ স্থল প্রচুর। অদৃষ্টার্থক বোধের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও এইরূপে পূর্বেই হইয়া থাকে ; সুতরাং অদৃষ্টকলক পারলৌকিক কার্যকলাপে প্রবৃত্তি হওয়ার বাধা নাই। বোধপ্রামাণ্য-নিশ্চয়ের কথা এবং প্রমাণ সম্বন্ধে অন্যান্য আপত্তি ও সমাধান মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। যথা-স্থানেই তাহার বিশদ প্রকাশ হইবে।

মহর্ষি সর্বপ্রথমে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার পূর্বোক্ত আদি-ভাষ্যের দ্বারা ইহারও উত্তর দিয়া গিয়াছেন। সে পক্ষে “অর্থবৎ” এই স্থলে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন এবং ঐ স্থলে “অতিশায়ন” অর্থে মতুগ্ প্রত্যয় বিহিত। তাহা হইলে “প্রমাণঃ অর্থবৎ” এই কথার দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষে বুঝা যায়, প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতেও পূর্বোক্ত “প্রবৃত্তিসামর্থ্য”ই হেতু। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বুঝিয়া প্রবৃত্তি হইলেই যখন প্রবৃত্তি সফল হয় এবং প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থেরই যথার্থ বোধ হয় না, প্রমাণই সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক, “প্রমেয়” প্রভৃতি যাবৎ পদার্থই প্রমাণের সুখাপেক্ষী, তখন বুঝা গেল, প্রমাণ সর্বাপেক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ষি সর্বপ্রথমে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার যে অহুমানের দ্বারা প্রমাণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন, উহাও স্বতঃপ্রমাণ। সকল পদার্থসিদ্ধি বাহার অধীন এবং বাহাই যথার্থ বোধ জন্মাইয়া তদ্বারা জীবের প্রবৃত্তিকে সফল করে, তাহার যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, এ বিষয়ে প্রতিবাদ হইতে পারে না। এইরূপ অহুমানে প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। এইরূপ অনেক প্রমাণের “স্বতঃপ্রামাণ্য” পরতঃপ্রামাণ্যবাদী ন্যায়াচার্যগণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা” প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার সংবাদ দিতেছে।

“প্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ জ্ঞান। কেবল প্রতিপত্তি বলিলে প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানও বুঝা যায়, কিন্তু তাহা কোন অহুতানে প্রবৃত্তি জন্মায় না এবং প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইলেও উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে উপেক্ষাই করে, সেখানে গ্রহণও নাই, ত্যাগও নাই, সুতরাং সেখানে তদ্বিষয়ে কোন অহুতান নাই, সেখানে প্রবৃত্তির সফলতার কথা বলা চলে না। তাই কেবল প্রতিপত্তি না বলিয়া বলিয়াছেন “অর্থপ্রতিপত্তি”। “অর্থ” শব্দের দ্বারা যে এখানে গ্রাহ ও ত্যাজ্য পদার্থই লক্ষ্য অর্থাৎ স্বধ এবং স্বধের কারণ এবং ভ্রুংথ ও ভ্রুংথের কারণ পদার্থবর্গই যে ভাষ্যকারের এখানে “অর্থ” শব্দের অর্থ, এ কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। পরে অনেক বার ভাষ্যকার ঐ অর্থে “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার জন্ত এবং ভাষ্যের পূর্বাধার সংগতির জন্য কেবল “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোক্ত “অর্থ”ই তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে।

প্রমাণভাসের দ্বারাও পূর্বোক্ত অর্থপ্রতিপত্তি হয়, কিন্তু সেখানে প্রবৃত্তির সফলতা হয় না। তাই বলিয়াছেন ‘প্রমাণতঃ’। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা এবং প্রমাণ হেতুক। ভাষ্যকার “প্রমাণেন” অথবা “প্রমাণাৎ” এইরূপ কোন প্রয়োগ না করিয়া “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন



কেন? উহাতে কি কোন গুণ অভিসন্ধি আছে? আমরা এখন এসব কথার চিন্তা না করিলেও উদ্যোতকর ইহার চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ইহার মধ্যে তিনি ভাষাকারের অনেক অভিসন্ধি দেখিয়াছিলেন। এই কথার উদ্যোতকর এখানে বাহা বলিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে কথাগুলির বিশদ মর্ম্ম এই যে, “প্রমাণতঃ” এই পদটি তৃতীয়া বিভক্তির সকল বচনেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং উহার দ্বারা বিভিন্ন বিভক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এক একটি করিয়া বহু অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কোন স্থলে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা, কোন স্থলে দুই বা বহু প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বোধ হয়, এ সিদ্ধান্ত ভাষাকার পরে বলিয়াছেন। এখানেও তদনুসারে “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার দ্বারা একমাত্র প্রমাণের দ্বারা অথবা দুই প্রমাণের দ্বারা অথবা বহু প্রমাণের দ্বারা, এই তিনটি অর্থই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু “প্রমাণেন” অথবা “প্রমাণাভ্যাং” অথবা “প্রমাণৈঃ” ইহার কোন একটি বাক্য প্রয়োগ করিলে ঐরূপ অর্থ বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই এবং পক্ষান্তরে পক্ষমী বিভক্তির সকল বচনেও “প্রমাণতঃ” এই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। হেতুর্থে পক্ষমী হইলে উহার দ্বারা বুঝা যাইবে, প্রমাণ অর্থপ্রতিপত্তির হেতু। পক্ষান্তরে ভাষাকারের ইহাও বিবক্ষিত ছিল। উদ্যোতকরের এই কথার সমর্থনের জন্য তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণের দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি হয়, এই কথা বলিলেও প্রমাণ অর্থপ্রতিপত্তির হেতু, ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলেও হেতুর্থে পক্ষমী বিভক্তির দ্বারা উহা প্রকাশ করিলে উহা শীঘ্র বুঝা যায়। তাহাতে প্রমাণ ও তজ্জন্ত অর্থপ্রতিপত্তি যে একই পদার্থ নহে, ভিন্ন পদার্থ, ইহাও শীঘ্র স্পষ্ট বুঝা যায়। হেতু বলিয়া বুঝিলে তাহার ফলকে হেতু হইতে ভিন্ন বলিয়াই শীঘ্র বুঝা যায়। ভাষাকার ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া তাহাও বুঝাইয়াছেন এবং যথার্থ বোধের অন্তান্ত কারক হইতে তাহার করণকারক প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বপ্রথমে তাহার উল্লেখ এবং প্রতিপাদন যুক্তিসূত্র, ইহা দেখাইবার জন্ত এক পক্ষে করণে তৃতীয়া বিভক্তি-সিদ্ধ “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলকথা, প্রয়োগ-চতুর ভাষাকার যেমন “অর্থবৎ” এই স্থলে অনেকার্থ “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া দুইটি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জপ “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন। অন্যরূপ প্রয়োগে ভাষাকারের বিবক্ষিত সকল অর্থ প্রকটিত হয় না। \*

কোন পুস্তকে ভাষ্যান্তে “ও” নমঃ প্রমাণায়” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ঐ পাঠ করিত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষাকারের মঙ্গলাচরণের কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু বঙ্গদেশের প্রাচীন মহাদার্শনিক শ্রীধর ভট্ট তাহার ‘জায়-কন্দলী’র প্রারম্ভে মঙ্গল-বিচারপ্রসঙ্গে স্বায়-ভাষাকার পক্ষিন্দ্রাবী ভাষ্যান্তে মঙ্গলবাক্য নিবদ্ধ

করেন নাই, ইহা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মঙ্গল-বাক্য নিবদ্ধ না করিলেও তিনি গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীধরভট্ট অহুমান করিয়াছেন। শ্রীধরভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি যে ৯:৩ শাকাদে “জায়কন্দলী” রচনা করেন, ইহা “জায়কন্দলী”র শেষভাগে তিনি নিজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।\*

বৃত্তিকার বিখ্যাত মহর্ষি গোতমের মঙ্গলাচরণ বিষয়ে বিচার করিয়া শেষে নিজের মত বলিয়া বাক্য করিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম প্রথম হস্তে সর্গপ্রথম “প্রমাণ” শব্দের উচ্চারণ করাতাই তাঁহার মঙ্গলাচরণ হইয়াছে। কারণ, “প্রমাণ” বিষ্ণুর একটি নাম। বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে আছে “প্রমাণঃ প্রাণনিলয়ঃ”। আমরা ভাষ্যকারের মঙ্গলাচার বিষয়ে বৃত্তিকারের ঐ কথাটিও বলিতে পারি। কারণ, ভাষ্যকারও সর্গাশ্রে “প্রমাণ” শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। অন্ত উদ্দেশ্যে এবং অন্ত তাৎপর্যে উচ্চারণ করিলেও বৃত্তিকার মনে করেন, নামের মহিমা যাইবে কোথায়?

ভাষ্য। প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ, নার্থপ্রতিপত্তিমন্তরেণ প্রবৃত্তিসামর্থ্যং। প্রমাণেন, খল্লয়ং জ্ঞাতার্থনুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা। তন্ত্বেপ্সা জিহাসাপ্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃতিরিভ্যুচ্যতে। সামর্থ্যং পুনরস্তাঃ ফলেনাভিসম্বন্ধঃ। সমীহমানস্তমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা তমর্থমাপ্নোতি জহাতি বা। অর্থস্ত সূখং সূখহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ। সৌহৃদ্যং প্রমাণার্থোহপরিসংখ্যেয়ঃ, প্রাণভূদ্ভেদস্তাপরিসংখ্যেয়স্তাৎ।

অনুবাদ। প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থবোধ হয় না। অর্থের যথার্থবোধ ব্যতীতও প্রবৃত্তির সকলতা হয় না। এই জ্ঞাতা ব্যক্তি অর্থাৎ সংসারী জীব প্রমাণের দ্বারাই অর্থকে উপলব্ধি করিয়া, সেই অর্থকে পাইতে ইচ্ছা করে অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। প্রাপ্তির ইচ্ছা অথবা ত্যাগের ইচ্ছায় প্রণোদিত সেই জীবের সমীহা অর্থাৎ তদ্বিষয়ে যে প্রবৃত্তিবিশেষ, তাহা “প্রবৃতি” এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় অর্থাৎ তাহাকেই প্রবৃত্তি বলে। এই প্রবৃত্তির “সামর্থ্য” কিন্তু ফলের সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাষ্যে “প্রবৃত্তিসামর্থ্য” শব্দের দ্বারা প্রবৃত্তির সকলতা বুঝিতে

\* “অসত্যপি নমস্কারে জায়মীমসোভাষ্যোঃ পরিসংখ্যেয়ঃ”। “ন চ জায়ন বাংলাভাষ্যকারাভ্যাং ন কৃতো নমস্কারঃ কিন্তু তত্রানুপনিবন্ধঃ”। “যদিমৌ পরমাশ্রিতৌ পঙ্কিলশব্দবাহিনৌ নানুতীতত ইত্যাসম্ভাবনমিৎ” — (জায়কন্দলী)

“আমীদক্ষিণরাচার্যঃ যিজ্ঞানঃ ত্বরিকর্মণাম্।

ত্বরিত্বিরিতি আমো ত্বরিশ্রেষ্ঠিব্যবহারঃ”।

“আদিকবশোভরনবশতশাকাদে জায়কন্দলী রচিতা”।



হইবে। সমীহমান অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবর্তমান জীব সেই অর্থকে (পূর্বোক্ত অর্থকে) পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ সেই অর্থকে প্রাপ্ত হয় অথবা ত্যাগ করে। “অর্থ” কিন্তু সুখ ও সুখের কারণ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাষ্যে “অর্থ” শব্দের দ্বারা সুখ ও সুখের কারণ-রূপ গ্রাহ্য পদার্থ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণরূপ ত্যাজ্য পদার্থই বুঝিতে হইবে। যাহা গ্রাহ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, কিন্তু উপেক্ষণীয় পদার্থ, তাহা ঐ “অর্থ” শব্দের দ্বারা ধরা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিগণের অথবা প্রাণিবৈচিত্র্যের নিয়ম না থাকায় অর্থাৎ যাহা একের সুখ বা সুখের কারণ হয় অথবা দুঃখ বা দুঃখের কারণ হয়, তাহা অন্য সকল প্রাণীরও সেইরূপই হয়, এমন নিয়ম না থাকায়, সেই এই “প্রমাণার্থ” অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন পূর্বোক্ত সুখদুঃখাদি অনিয়ম্য, (তাহার নিয়ম করা যায় না) অর্থাৎ যাহা সুখের কারণ, তাহা সকলেরই সুখের কারণ, ইত্যাদি প্রকার নিয়ম নাই। প্রমাণের প্রয়োজন সুখদুঃখাদি কোন নিয়মবদ্ধ নহে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার ভাষ্যলক্ষণানুসারে এখানে তাঁহার পূর্বোক্ত ভাষ্যের পদবর্ণন করিয়াছেন। নিজের কথার নিজের ব্যাখ্যা করাই স্বপদবর্ণন। উহা ভাষ্যের একটা লক্ষণ। ভাষ্য কাহাকে বলে, এ জন্ত প্রাচীনগণ বলিয়া গিয়াছেন,—

“স্বভার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ স্বভাষ্মসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ” ॥

পরশরপুরাণে ১৮ অধ্যায়ে এইরূপ ভাষ্যলক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা কোন পুস্তকে দেখা যায়। স্বভার ভাষ্য হইলে সেখানে স্বভাষ্মসারী পদসমূহের দ্বারা স্বভার্ত্ব-বর্ণন থাকিবেই এবং স্বপদ-বর্ণনও থাকিবে। কিন্তু আদিভাষ্যে কেবল স্বপদ-বর্ণনরূপ ভাষ্য-লক্ষণই সম্ভব। তাহাতেই আদিভাষ্যের ভাষ্যত্ব নিষ্পত্তি হয়। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত সন্দর্ভকে “আদিভাষ্য” নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

“প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ” অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত অর্থপ্রতিপত্তি হয় না, এখানে ‘প্রমাণ’ শব্দ আছে বলিয়া অর্থের বার্থ বোধ হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম-জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু বার্থ বোধ প্রমাণের দ্বারাই হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা তাঁহার আদিভাষ্যের “প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ” এই কথার তাৎপর্য ও সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্থ বোধ প্রবৃত্তিকে সফল করে, ভ্রম-জ্ঞান তাহা করে না। ঐ বার্থ বোধ যখন প্রমাণেরই কার্য এবং প্রবৃত্তির সফলতা সম্পাদনে প্রমাণেরই ব্যাপার, তখন উহার দ্বারা প্রমাণ সফল প্রবৃত্তিজনক। সুতরাং প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী এবং নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহাই ভাষ্যকারের

তাৎপর্য্য এবং ঐ কথাটি না বলিলে প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের বিশেষ বলা হয় না। তাহা না বলিলেও প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন হয় না।

“সোহয়ং প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি ভাষ্য পড়িলে বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণার্থ অর্থাৎ ভাষ্যকার যাহাকে “অর্থ” বলিয়াছেন, সেই স্বথ-হুংখাদি অসংখ্য ; কারণ, প্রাণিগণ অসংখ্য। তাৎপর্য্য-টীকাকারের কথার বুঝা যায়, উদ্যোতকের পূর্ব্ব বা সমকালে কেহ কেহ ঐ ভাষ্যের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিতেন। কিন্তু উদ্যোতক ঐ ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্বথ-হুংখ প্রভৃতি “অর্থ” এক একটি গণনার অসংখ্য হইলেও ভাষ্যকার স্বথ, স্বথহেতু এবং হুংখ ও হুংখহেতু, এই চারি প্রকারে তাহার বিভাগ করিয়া সংখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং “প্রমাণার্থ অসংখ্য”—ইহা ভাষ্যার্থ নহে। পরন্তু ঐ অর্থে ভাষ্যকারের হেতুটিও সম্ভব হয় না, ঐ কথা বলিবারও কোন প্রয়োজন নাই। তবে ভাষ্যার্থ কি ? উদ্যোতক বলিয়াছেন—প্রমাণের প্রয়োজন স্বথ-হুংখাদি অনিয়ম, ইহাই ভাষ্যার্থ। ভাষ্যে “প্রমাণার্থঃ” এই স্থানে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন। চন্দনবিবরক প্রমাণের প্রয়োজন বা ফল স্বথ, কণ্টকবিবরক প্রমাণের প্রয়োজন বা ফল হুংখ। ইহার নিয়ম নাই, কোন প্রাণীর পক্ষে ইহার বিপরীত। উষ্ট্র কণ্টক প্রত্যাক করিয়া এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া স্বথ ভোগই করে। মধুঘ্রাদি তাহাতে হুংখানুভবই করে। যাহা একের স্বথহেতু, তাহা অন্তের হুংখহেতু। স্বথ হুংখ কাহারও স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে সকল পদার্থই সকলের স্বর্থকর হইত। অস্বাভাবিক হইলে তাহা কালনিক পদার্থ হইয়া পড়ে, তাহা প্রমাণের প্রয়োজন হইতে পারে না, এই আশঙ্কা নিরাসের জন্তই ভাষ্যকার “সোহয়ং প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি ভাষ্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্বথ-হুংখ স্বাভাবিক না হইলেও কালনিক নহে ; উহা নৈমিত্তিক। নিমিত্তের ভেদ ও বৈচিত্র্যাবশতঃ তাহার ভেদ ও বৈচিত্র্য হয়। জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসমূহের বৈচিত্র্যাবশতঃ যাহা একের স্বথ বা স্বর্থের কারণ, তাহা অন্তের হুংখ বা হুংখের কারণ হইতেছে। তাই হেতু দেখাইয়াছেন—“প্রাণভূতভেদস্তাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ”। ভাষ্যে “অপরিসংখ্যেয়” বলিতে এখানে অসংখ্য নহে ; উহার অর্থ অনিয়ম। “প্রাণভূতভেদস্য” এই কথার দ্বারা প্রাণিগণের যে ভেদ অর্থাৎ বৈচিত্র্য, ইহাও ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ প্রাণিগণের যে ভেদ, কি না—বৈচিত্র্য, তাহার নিয়ম না থাকায় স্বথ-হুংখাদি অনিয়ম। যাহা অনিয়মকারণ-জন্ত, তাহা সমস্তই অনিয়ম, এইরূপ সামান্যাত্মমানের দ্বারা ইহা নিশ্চিত আছে।

ভাষ্য। অর্থবতি চ প্রমাণে প্রমাতা-প্রমেয়ং-প্রমিতিরিত্যর্থবন্তি ভবন্তি। কস্মাৎ ? অততমাপায়েহর্থস্থানুপপত্তেঃ। তত্র যস্যোপদ্রাজিহাসা-প্রযুক্তস্ত প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা। স যেনার্থঃ প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং। যোহর্থঃ প্রমীয়তে তৎ প্রমেয়ম্। যদর্থবিজ্ঞানং সা প্রমিতিঃ। চতস্রস্বেবস্বিধাতু তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে।



অনুবাদ। প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি ইহারা সমীচীনার্ণ হয়। অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে—প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই “প্রমাতা,” “প্রমেয়,” “প্রমিতি,” ইহারা সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। [প্রশ্ন] কেন? [উত্তর] যে হেতু প্রমাণের অভাবে অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও তাগের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া যাচার প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির যথার্থ বোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে “প্রমাতা” বলে। সেই প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে, তাহাকে “প্রমাণ” বলে। যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাকে “প্রমেয়” বলে। পদার্থবিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাকে “প্রমিতি” বলে। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের অব্যভিচারী চারিটি প্রকার [প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি] থাকতে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তাহা গ্রাহ্য মনে হইলে গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে তাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, তাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্যাবসান হইতেছে।

বিস্তৃতি। প্রমাণ পদার্থের অব্যভিচারী, ইহা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে, প্রমাণ যে পদার্থকে বোঝে, যে প্রকারে প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ ঠিক সেইরূপ, সেই প্রকারই হয়, কখনও তাহার অন্তর্থা হয় না। প্রমাণভাসের দ্বারা পদার্থ বোধ হইলে সেখানে এইরূপ হয় না। প্রমাণ যখন পদার্থের অব্যভিচারী, তখন “প্রমাণে”র দ্বারা যে ব্যক্তির বোধ হইয়াছে, সেই “প্রমাতা” ব্যক্তি এবং সেই বোধের বিষয় “প্রমেয়” পদার্থ এবং সেই যথার্থ বোধরূপ “প্রমিতি”—এই তিনটিও প্রমাণের দ্বারা পদার্থের অব্যভিচারী। কারণ, প্রমাণ বাতীত কখনই প্রমিতি হয় না। প্রমাণ দ্বারা প্রমিতি হইলে সেখানে প্রমাতা এবং প্রমেয়ও থাকিবে। তাহা হইলে প্রমাণ পদার্থের অব্যভিচারী বলিয়াই “প্রমাতা,” “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি”ও পূর্বোক্তরূপে পদার্থের অব্যভিচারী এবং ঐ চারিটি প্রকারে এইরূপ বলিয়াই তত্ত্ববোধ হইতেছে। নচেৎ তত্ত্ববোধ কোনরূপে হইত না। যে পদার্থ বোঝে এবং যে প্রকার, তাহাকে ঠিক সেইরূপে এবং সেই প্রকার বুঝিলেই তত্ত্ব বুঝা হয় এবং শেষে গ্রহণ অথবা তাগ অথবা উপেক্ষার দ্বারাই সেই তত্ত্বের পর্যাবসান হয়। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া হয় গ্রহণ করে, না হয় তাগ করে, না হয় উপেক্ষা করে। জগতে এই পর্যাবসানই তত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণের কার্য চলিতেছে।

উপসর্গ। ভাষ্যকার আদিভাষ্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারের গুক্তি অনুসারে “প্রমাতা,” “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি” এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“অর্থবত্তি চ প্রমাণে” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণ

অর্থের অবাভিচারী বলিরাই প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি ইহারাও অর্থের অবাভিচারী হয়; কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের বর্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা বর্থার্থ বোধ হইলেই সেখানে "প্রমাতা", "প্রমেয়" এবং "প্রমিতি" থাকে। এ জন্ত তাহারাও অর্থের অবাভিচারী হয়। সুতরাং উহাদিগের মতো প্রমাণই প্রধান, তাই তাহাকেই আদিভাষ্যে অর্থের অবাভিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই "প্রমাতা", "প্রমেয়" ও "প্রমিতি"কে প্রমাণের জ্ঞায় অর্থের অবাভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "অর্থবস্তি" এই স্থলেও পূর্বের জ্ঞায় নিত্যযোগে অর্থ মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন, ঐ স্থলে প্রাণস্বার্থে "মতুপ্" প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি অর্থবান্ হয়, কি না—নবীচানার্থ হয়। ইহাতেও ফলে অর্থের অবাভিচারী হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ হইবে। আদিভাষ্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা হইয়াছে, সে পক্ষেও এখানে "অর্থবস্তি" এই স্থলেও "অর্থ" শব্দের প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে এবং অতিশায়নার্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। সে পক্ষের ভাষ্যার্থও "পক্ষান্তরে" বলিয়া অত্ববাদে বলা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ তত্ত্বজ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা জীবের প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতে প্রমাতা প্রভৃতিও নিরতিশয়-প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতিও প্রয়োজন বিষয়ে প্রমাণের জ্ঞায়ই সমর্থ।

ভাষ্যে "অন্ততমাপরে" এই স্থলে "অন্ততম" শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রমাণাদি চারিটিকেই বুঝা বাইতে পারে। কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণানুসারে এখানে উহার দ্বারা প্রথমোক্ত "অন্ততম" প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। প্রমাণের প্রাধান্ত সমর্থনের জন্তই ভাষ্যকার ঐ হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং "অন্ততম" শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত "প্রমাণ"রূপ বিশেষ অর্থই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিষ্ণু।

প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুদ্ধিয়া তাহা যদি স্মৃৎসাধন বলিয়া বুকে, তবে গ্রহণ করে; কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ গ্রহণ করিতে না পারিলেও গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। হৃৎসাধন বলিয়া মনে হইলে তাহা ত্যাগ করে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাতে ত্যাগের যোগ্যতা থাকে এবং স্মৃৎসাধনও নহে, হৃৎসাধনও নহে, ইহা বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুদ্ধিয়া তত্ত্বের এই পর্য্যাপ্তই হয়। সুতরাং গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্যতা এবং ত্যাগ বা ত্যাগযোগ্যতা এবং উপেক্ষাই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি, উহাই তত্ত্বের পর্য্যবসান। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম বোধ হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রহণাদি হয় বটে, কিন্তু সে গ্রহণাদি তত্ত্বের পর্য্যবসান নহে। প্রমাণাভাসের দ্বারা তত্ত্বের বোধ হয় না; সুতরাং সেখানে তত্ত্বের গ্রহণাদি হয় না। তত্ত্বের গ্রহণাদিতে "প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি" আবশ্যক। ঐ চারিটি থাকতেই পূর্বোক্ত প্রকার তত্ত্ব পরিসমাপ্তি হইতেছে। জীব-জগতে প্রমাণাভাসের আধিপত্য প্রচুর হইলেও প্রমাণ একেবারে নির্দীপিত হয় নাই। প্রমাণের দ্বারা চিরকালই বহু বহু তত্ত্ববোধ এবং ঐ তত্ত্বের পূর্বোক্ত



পরিসমাপ্তি হইতেছে এবং হইবে। অনেক ভাষ্য-পুত্রকেই “অর্থতত্ত্বং পরিসমাপাতে” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ভাষ্যকারের পরবর্তী প্রশ্নভাষ্য দেখিয়া এবং বার্তিকাদি দেখিয়া এখানে “তত্ত্বং পরিসমাপাতে” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। কোন পুত্রকে ঐরূপ পাঠই আছে। জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতেও “তত্ত্বং পরিসমাপাতে” এইরূপ কথাই দেখা যায়। ভাষ্যে “অর্থবতি চ” এই স্থলে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “অর্থবতি চ” এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা “অর্থবতোব”। অবধারণ অর্থ এবং হেতু অর্থে “চ” শব্দের প্রয়োগ বহু স্থানে দেখা যায়। এই ভাষ্যেও বহু স্থানে ঐরূপ প্রয়োগ আছে। সেগুলি লক্ষ্য করা আবশ্যিক।

ভাষ্য। কিং পুনস্তত্ত্বং ? সতশ্চ সদ্ভাবোহসতশ্চাসদ্ভাবঃ। সৎ সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তত্ত্ব কি ? অর্থাৎ পূর্বে যে তত্ত্ব পরিসমাপ্তির কথা বলা হইল, সে তত্ত্বটি কি ? (উত্তর) সৎ পদার্থের অর্থাৎ ভাব পদার্থের সম্ভাব এবং অসৎ পদার্থের অর্থাৎ অভাব পদার্থের অসম্ভাব। বিশদার্থ এই যে, “সৎ” অর্থাৎ ভাব পদার্থ “সৎ” এইরূপে অর্থাৎ “ভাব” এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়। এবং ‘অসৎ’ অর্থাৎ অভাব পদার্থ অসৎ এইরূপে অর্থাৎ অভাব এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়।

বিবৃতি। যে পদার্থ যাহা এবং যে প্রকার, ঠিক সেইরূপে সেই প্রকারে জ্ঞায়মান সেই পদার্থকে “তত্ত্ব” বলে। পদার্থ বিবিধ, ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থকে অভাব বলিয়া এবং অভাব পদার্থকে ভাব বলিয়া বুঝিলে সেখানে তাহা তত্ত্ব হইবে না। সুতরাং সেখানে তত্ত্ব বুঝাও হইবে না। ফলতঃ কোন পদার্থই তাহার বিপরীত ভাবে বুঝিলে তাহা সেখানে তত্ত্ব হয় না।

টীকানী। শ্রোতৃবর্ণের অবধান এবং বিশদবোধের জন্ত স্বয়ং প্রশ্নপূর্বক উত্তর দেওয়ারই প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বকথিত তত্ত্ব কি, ইহা বলিবার জন্ত নিজেই এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন।

“তস্য ভাবঃ” এই অর্থে “তত্ত্ব” শব্দটি নিম্নরূপ। ঐ তত্ত্ব শব্দের অন্তর্গত “তৎ” শব্দটির প্রতিপাদ্য “সৎ” ও “অসৎ” পদার্থ। “সৎ” বলিতে ভাব পদার্থ, “অসৎ” বলিতে সৎ ভিন্ন অর্থাৎ ভাব ভিন্ন পদার্থ। ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বলে। “নাস্তি” এইরূপে বোধের বিষয় হয় বলিয়াই অভাব পদার্থকে “অসৎ” পদার্থ বলা হয়। “অসৎ” বলিতে এখানে অলৌক নহে। যাহার কোন সত্তাই নাই, যাহা অলৌক, তাহা পদার্থ হইতে পারে না। যাহা প্রমাণ-

সিদ্ধ, তাহাই পদার্থ। তাহা "ভাব" ও "অভাব" এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রমাণ বাহ্যকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই ভাব পদার্থ। বাহ্যকে অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহা অভাব পদার্থ। ভাব পদার্থে যে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয় আছে, তাহাই উহার "সম্ভাব" বা ভাবত্ব। অভাব পদার্থে যে অভাবসাধক প্রমাণের বিষয় আছে, তাহাই উহার "অসম্ভাব" বা অভাবত্ব। ঐ "সম্ভাব"ই সংপদার্থের তত্ত্ব এবং ঐ "অসম্ভাব"ই অসং পদার্থের তত্ত্ব এবং উহাই যথাক্রমে ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ। উহার বিপরীত-রূপে ভাব ও অভাব বুলিলে সেখানে ভাব ও অভাবের তত্ত্ব বুঝা হয় না। ভাষ্যে "সং ইতি" এবং "অসং ইতি" এই দুই স্থলে "ইতি" শব্দের প্রকার অর্থ। অর্থাৎ সং পদার্থকে "সং" এই প্রকারে এবং অসং পদার্থকে "অসং" এই প্রকারে বুলিলেই তত্ত্ব বুঝা হয়। ফল কথা, যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম, তাহাই তাহার তত্ত্ব, সেইরূপে সেই পদার্থ জায়মান হইলে সেই পদার্থকেও তত্ত্ব বলা হয়; প্রাচীনগণ তাহাও বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার প্রথমতঃ ভাব ও অভাব পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ত্ব বলিয়া শেষে ঐ ভাব ও অভাব পদার্থকেও "তত্ত্ব" বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত ভাবত্ব ও অভাবত্ব রূপ প্রকৃত ধর্মরূপে জায়মান হইলেই ভাব ও অভাব সেখানে তত্ত্ব হইবে। অভাবত্বরূপে ভাব পদার্থ জায়মান হইলে অথবা ভাবত্বরূপে অভাব পদার্থ জায়মান হইলে সেখানে উহা তত্ত্ব হইবে না, এই কথা বলিবার জন্যই প্রথমতঃ ভাষ্যকার ভাব ও অভাবের প্রকৃত ধর্মরূপ তত্ত্বটি বলিয়াছেন। ঐরূপ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ভাব পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ অভাব পদার্থেরও বাহার যেটি প্রমাণসিদ্ধ প্রকৃত ধর্ম, সেইরূপে তাহারা জায়মান হইলেই তত্ত্ব হইবে, ইহা ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। ফলকথা, যে পদার্থের যেটি তত্ত্ব, সেইরূপে জায়মান সেই পদার্থকেও ভাষ্যকার এখানে "তত্ত্ব" বলিয়াছেন। ভাষ্যে "সত্তত্চ" এবং "অসত্তত্চ" এই দুই স্থলে দুইটি "চ" শব্দের দ্বারা পদার্থস্বরূপে ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থই প্রধান, ইহা সূচিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ অপ্রধান নহে। ভাব পদার্থের ন্যায় অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। পরে ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

"যথাত্তমবিপরীতং" এই স্থলে "অবিপরীতং" এই কথাটি "যথাত্তমং" এই পূর্ব-কথারই ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থে এইরূপ স্বপদবর্ণন এবং অনুব্যাখ্যা আছে। স্বপদবর্ণন ভাষ্যের একটি লক্ষণ। বিশদ বোধের জন্যই প্রাচীনগণ ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই ন্যায়ভাষ্যে বহু স্থানেই এইরূপ ভাষা আছে। সূত্ররং অনুবাদের ভাষাও সেখানে ঐ প্রণালীতে হইবে। এ কথাটা মনে রাখিলে আর গুনকঙ্কি-দোষের কথা মনে আসিবে না।

ভাষ্য। কথমুত্তরশ্চ প্রমাণেনোপলব্ধিরিতি,—সত্বপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপবৎ। যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্তো গৃহমাণে তদিব যন্ন গৃহতে তন্মাস্তি, যন্তত্ববিষ্যদিদমিব ব্যজাস্তত্ব বিজানাভাবান্নাস্তীতি। এবং প্রমাণেন নতি গৃহমাণে তদিব যন্ন গৃহতে তন্মাস্তি, যন্তত্ববিষ্যদিদমিব



ব্যক্তাস্তত বিজ্ঞানভাবান্ধীতি । তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তীতি । সচ্চ খলু ষোড়শবা ব্যুৎসুপদেক্যতে ।

অনুবাদ । ( প্রশ্ন ) উত্তরটির অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে যে দ্বিবিধ তত্ত্ব বলা হইল, তন্মধ্যে পরবর্ত্তী অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে ? ( উত্তর ) যে হেতু যেমন প্রদীপের দ্বারা সৎ পদার্থ অর্থাৎ কোন ভাব পদার্থ উপলভ্যমান হইলে তাহার অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থটি সেখানে নাই, সেই পদার্থটির উপলব্ধি হয় না । বিশদার্থ এই যে—যেমন কোন দর্শক কর্তৃক প্রদীপের দ্বারা দৃশ্য পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার ন্যায় বাহ্য অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থ জ্ঞায়মান হইতেছে না, তাহা নাই, যদি থাকিত, ( তাহা হইলে ) ইহার ন্যায় অর্থাৎ এই দৃশ্যমান পদার্থের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত, তদ্বিমুখে জ্ঞান না হওয়াতে ( তাহা ) নাই, অর্থাৎ দর্শক ব্যক্তি প্রদীপের সাহায্যে এইরূপে অভাবের উপলব্ধি করে । এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার ন্যায় যে পদার্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, তাহা নাই । যদি থাকিত, ( তাহা হইলে ) ইহার ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞায়মান ভাব পদার্থটির ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত, জ্ঞান না হওয়াতে ( তাহা ) নাই, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণের দ্বারা অভাবেরও উপলব্ধি করে । অতএব এইরূপে ( প্রদীপের ন্যায় ) ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণ অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে । ভাবপদার্থও ( মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রে ) ষোড়শ প্রকারেই সংক্ষেপে বলিবেন ।

টিপ্পনী । যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাকে পদার্থ বা তত্ত্ব বলা যায় না । অভাবকে তত্ত্ব বলিলে তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে হইবে । কিন্তু অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হইবে কিরূপে ? যাহা অভাব, তাহার কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে ? অনেক সম্প্রদায় তাহা মানেন নাই । এ জন্য ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্নপূর্বক প্রমাণের দ্বারা যে অভাবেরও উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন । ভাষ্যকারের কথা এই যে, অভাব প্রমাণসিদ্ধ । যে প্রমাণ ভাব পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রমাণ বা তজ্জাতীয় প্রমাণই অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে । অভাব বুঝিতে আর কোন উপায়ান্তর আবশ্যক হয় না । অভাব সকলেই বুঝে । ভাবিয়া দেখিলে এবং তর্কের অন্তরোধে সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে প্রদীপকে প্রমাণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ, প্রদীপ সর্বলোকসিদ্ধ । সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ন্যায় অভাবেরও নির্ণয় করে ; গৃহ হইতে তত্তর বহির্গত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোনটি আছে এবং কোনটি নাই, ইহা বুঝিয়া থাকে । যাহা থাকে, তাহাই দেখে, বাহা থাকে না, তাহা

দেখে না, তখন তাহা “নাই” বলিয়াই বুঝে। এই “নাই” বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের বোধ। এ বোধ সকলেরই হইতেছে। সুতরাং এই বোধের অবশ্য বিষয় আছে। ঐ বোধের বাহ্য বিষয়, তাহারই নাম অভাব পদার্থ। বাহ্য বার্থ বোধের বিষয়, তাহাকে পদার্থ বলিতেই হইবে। প্রমাণসিদ্ধ বলিতেই হইবে। “নাই” বলিয়া বৃত্ত বোধ হয়, সবগুলিই ভ্রম থালা বাইবে না। বাসগৃহে “সর্প নাই,” শয্যায় “বিষ্ঠা নাই” ইত্যাদি প্রকার অভাব বোধগুলি কি সর্বত্রই ভ্রম? বস্তুতঃ ভাবের ন্যায় অভাবেরও বোধ হইতেছে। তবে অভাব ভাবপরতন্ত্র, সুতরাং ভাষ্যোক্ত প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা ঘটাদি ভাব পদার্থ দেখিয়া সেখানে তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমাদেরই একরূপ পরিচিত অন্য পদার্থ না দেখিলেই বুঝি, এখানে তাহা নাই, থাকিলে অবশ্যই দেখিতাম। কারণ, দেখিবার অন্য কোন কারণের এখানে অভাব নাই। কলকথা, প্রদীপের ন্যায় ভাব, পদার্থের প্রকাশক প্রমাণই সেখানে অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে।—অভাব প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং অভাবকে “তব” বলিতেই হইবে।

অভাব প্রমাণসিদ্ধ তব হইলে পদার্থ-গণনায় মহাবি গৌতম কেন তাহার উল্লেখ করেন নাই, তাহার প্রথম সূত্রোক্ত বোধন পদার্থের মধ্যে ত “অভাব” নাই? এই আশঙ্কা হইতে পারে। এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—“সচ্চ খলু বোধশা ব্যুৎপাদেন্যতে”। ভাষ্যকারের কথার প্রস্তুত তাৎপর্য্য এই যে, মহাবি গৌতম মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থগুলিকে সংক্ষেপে বোধন প্রকারে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার বক্তব্য; তাহার মধ্যে অর্থাৎ ঐ ভাব পদার্থগুলি বলিতে গাইয়া তিনি মোক্ষোপযোগী অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে গাইয়া উদ্যোতকর এখানে প্রথমে বলিয়াছেন যে, “তত্র স্বাতন্ত্র্যোপাসদ্ভেদা ন প্রকাশন্তে ইতি নোচ্যন্তে”। অর্থাৎ অভাবের স্বতন্ত্র ভাবে (ভাব ব্যতিরেকে) জ্ঞান হইতে পারে না। বাহার অভাব এবং যে অধিকরণে অভাব, তাহার জ্ঞান ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে অভাবের জ্ঞান হয় না, এই জন্ত মহাবি অভাবকে পৃথকভাবে বলেন নাই। ভাব পদার্থ থালাতেই তাহার অভাব পদার্থ থালা হইয়াছে। এ পক্ষে তাহা “সচ্চ খলু” এই স্থলে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “খলু” শব্দের দ্বারা আবার ঐ অবধারণ স্পষ্ট করা হইয়াছে। “সচ্চ খলু” এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা “সদেব খলু”। অর্থাৎ ভাবপদার্থই বলিয়াছেন।

ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য সংগত হয় না বুঝিয়া উদ্যোতকর পরে বাহ্য বলিয়াছেন, তাৎপর্য্য-টীকাকার তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন—“অথবা কথিতা এব মেঘাং তদ্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপযোগি, যে তু ন তথা ন তেবাং প্রপঞ্চোহল্পপূজ্জ্ঞানপ্রপঞ্চ ইব বক্তব্যঃ”। অর্থাৎ মহাবি অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। যে সকল পদার্থের তদ্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই সকল পদার্থই তিনি বলিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সের অল্পপযোগী অনেক ভাবপদার্থও তিনি যেমন বলেন নাই, তদ্রূপ নিঃশ্রেয়সের অল্পপযোগী অভাব পদার্থও তিনি বলেন নাই। এ পক্ষে “সচ্চ খলু বোধশা” এই ভাষ্যে “চ” শব্দের অর্থ সমুচ্চয়, “খলু” শব্দের অর্থ অবধারণ।



“সচ্চ” সদপি “যোড়শা থলু” যোড়শাধৈব—এইরূপে ভাষা ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায়, সংপদার্থও অর্থাৎ ভাবপদার্থও সংক্ষেপে যোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন। “সচ্চ” এই স্থলে “চ” শব্দের দ্বারা অভাবেরও সমুচ্চ হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহর্ষি ভাবপদার্থ বলিতে যাইয়া অভাব পদার্থও বলিয়াছেন, ভাবপদার্থও সেই সেই ব্যক্তিরূপে বলা অসম্ভব। সবগুলি মোক্ষোপযোগীও নহে, এ জন্ত যোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সেই যোড়শ পদার্থের বিশেষ বিভাগে নিঃশেষের উপযোগী অভাব পদার্থগুলিও তিনি বলিয়াছেন। যেমন প্রমেদের মধ্যে “অপবর্গ” অভাবপদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে হুঃখাভাব অভাব পদার্থ। এইরূপ আরও অনেক অভাব পদার্থ বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য “তাৎপর্য্য-পরিভূক্তি”তে তাহা বিশদ বুঝাইয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রাচীনদিগের এখানে মীমাংসা এই যে, মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলিই বলিয়াছেন, মোক্ষের অনুপযোগী ভাবপদার্থগুলির দ্বারা ঐরূপ অভাব পদার্থগুলিও তাহার বক্তব্য নহে, তাই তিনি সেগুলি বলেন নাই। সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থও সংক্ষেপে যোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন, তাহার কোন কোন পদার্থের বিশেষ বিভাগে মোক্ষোপযোগী অভাব পদার্থেরও উল্লেখ হইয়াছে। যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মোক্ষলাভে আবশ্যিক, সেই সকল পদার্থকেই প্রাচীনগণ মোক্ষোপযোগী বলিয়াছেন। কণাদোক্ত পদার্থগুলি মহর্ষি গোতমের সম্মত হইলেও শুদ্ধাধো যেগুলি অতি পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, মহর্ষি গোতম সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। কণাদোক্ত প্রমেয়গুলিও যে গোতমের সম্মত, ইহা ভাষ্যকার ও উল্লেখকরও বলিয়াছেন (৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ অভাব পদার্থ মহর্ষি গোতমের সম্মত, ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে তাহার নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। মহর্ষি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অভাব পদার্থকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী পদার্থের উল্লেখ করিলে ঈশ্বর প্রভৃতি মোক্ষোপযোগী পদার্থের যোড়শ পদার্থের মধ্যে কেন উল্লেখ করেন নাই? প্রাচীনগণ এ সকল কথাই কোন অবতারণা করেন নাই। গোতমোক্ত পদার্থগুলির পরিচয়ের পরে এ সকল কথা বুঝিতে হইবে। তবে এখানে এইটুকু বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, মহর্ষি গোতম তাহার দ্বায়বিজ্ঞায় জগতের সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ করিবেন, ইহার কোন কারণ নাই। তিনি যে ভাবে যে সকল অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষোপায়ের যে সকল অংশের বর্ণন করিয়াছেন, তাহার দ্বায়বিদ্যার “প্রস্থান” অনুসারে সেই ভাবে যে সকল পদার্থ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, তিনি সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ করিবেন। সুতরাং তিনি তাহাই করিয়াছেন। যথাস্থানে ক্রমে ইহা পরিষ্কৃত হইবে। (দ্বিতীয় সূত্রভাষ্য-টীকানী দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যে “বুঢ়ং” এই কথার ব্যাখ্যা “সংক্ষেপতঃ”।

ভাষ্য । তাসাং খন্ডাসাং সন্নিধানাং

সূত্র । প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-  
সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-  
চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধি-  
গমঃ । ১ ।

অনুবাদ । সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব পদার্থেরই প্রকার—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান, ইহাদিগের অর্থাৎ এই বোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয় ।

টিপ্পনী । যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাফাৎ অথবা পরস্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই ভাবপদার্থের ঐকটি প্রকার মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন । ভাষ্যকারও পূর্ক-  
ভাষ্যে এই বোড়শ প্রকার ভাব পদার্থের উপদেশের কথাই বলিয়াছেন । এখন মহর্ষিসূত্রের উল্লেখপূর্বক তাহা দেখাইবার জন্য “তাসাং খন্ডাসাং সন্নিধানাং” এই সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রস্থ ষষ্ঠী বিতজ্যস্ত বাক্যের বোঝনা করিতে হইবে । তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত । এইরূপ বহু স্থলেই ভাষ্যসন্দর্ভের সহিত সূত্রের বোঝনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত আছে । সূত্রস্থ প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত বোড়শ পদার্থ “সন্নিধানাং” অর্থাৎ ভাব পদার্থের প্রকার । এবং ঐ প্রকারগুলি সকলেই সাফাৎ বা পরস্পরায় মোক্ষোপযোগী । “তাসাং খন্ডু” এই কথার দ্বারা ইহাই স্থচনা করিয়াছেন । “তাসাং খন্ডু” এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা “তাসামেব” । অর্থাৎ পূর্ক যে মোক্ষোপযোগী ভাব-  
পদার্থ বোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবেন বলিয়াছি, সেই মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থের প্রকারগুলিই এই । এখানেই সূত্রের উল্লেখপূর্বক সেইগুলি দেখাইয়াছেন, তাই আবার বলিয়াছেন—“আসাং” । ফল কথা, এইগুলির তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, ইহাই মহর্ষি প্রথম সূত্রে বলিয়াছেন ; কেন হয়, কেমন করিয়া হয়, তাহা ক্রমে বাক্ত হইবে । এবং এই বোড়শ পদার্থের সামান্ত ও বিশেষ পরিচয় মহর্ষি নিজেই বলিবেন ।

ভাষ্য । নির্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ । সর্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ ।  
প্রমাণাদিনাং তত্ত্বমিতি শৈবিকৌ ষষ্ঠী । তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্ত্রাধিগম  
ইতি কৰ্ম্মণি ষষ্ঠ্যো । ত এতাবস্তো বিদ্যমানার্থাঃ । এবামবিপরীত-  
জ্ঞানার্থমিহোপদেশঃ । সোহয়মনবয়বেন তত্ত্বার্থ উদ্দিষ্টো বেদিতব্যঃ ।



অনুবাদ। নির্দেশে অর্থাৎ পরবর্তী প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ সূত্র ও বিভাগ-সূত্রে বৈরূপ বচন ( একবচন, বহুবচন ) আছে, তদনুসারে ( এই সূত্রে ) বিগ্রহ অর্থাৎ ব্হ সমাসের বাসবাক্য করিতে হইবে। (এং) সর্ব পদার্থপ্রধান ব্হ সমাস। প্রমাণাদির তত্ত্ব এই স্থলে শৈথিল্য বস্তি অর্থাৎ সম্বন্ধে বস্তি। তত্ত্বের জ্ঞান, নিঃশেষের অধিগম, এই দুই স্থলে দুই বস্তি কথ্যে বিহিত। সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থ এতগুলি অর্থাৎ ঘোড়ণ প্রকার, ইহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞানের জন্য এই শাস্ত্রে উপদেশ হইয়াছে। সেই এই তত্ত্বার্থ অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রপ্রতি-পাদ্য মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলি এই সূত্রে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিক্ত অর্থাৎ নামোন্মেষে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে জানিবে।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রের অর্থ বুঝিতে প্রথমতঃ কি সমাস, তাহা বুঝিতে হইবে। “প্রমাণের যে প্রমেয়, তাহার যে প্রয়োজন,” ইত্যাদিরূপে দ্বীতৎপুরুষ সমাস বুঝিব? অথবা “প্রমাণ হইয়াছে প্রমেয় যাহার” ইত্যাদিরূপে বহুব্রীহি বা অস্ত কোন সমাস বুঝিব? ভাষ্যকার বলিয়াছেন—ব্হ সমাস বুঝিবে, অস্ত সমাস বুঝিলে প্রকৃতার্থ বোধ হইবে না। এবং ব্হ সমাস সকল সমাস হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কেন, তাই বলিয়াছেন—“সর্বপদার্থপ্রধানঃ”। ব্হ সমাস স্থলে সকল পদার্থই প্রধান থাকে। অর্থাৎ পূর্ণ পূর্ণ ভাবে সবগুলি পদার্থই প্রধানরূপে বুঝির বিষয় হয়। এখানে বহুব্রীহি বা কর্মধারয় হইলে অর্থসিদ্ধি হয় না। দ্বীতৎপুরুষ হইলেও হয় না। পরন্তু তাহাতে সর্বশেষবর্তী “নিগ্রহস্থানে”রই প্রাধান্য হয়; সূত্রগত ব্হ সমাসই এখানে বুঝিতে হইবে।

ব্হ সমাস হইলে তাহার বাসবাক্য কিরূপ হইবে? “প্রমাণানি চ প্রমেয়ানি চ” ইত্যাদি প্রকারে হইবে, অথবা “প্রমাণক প্রমেয়ক” ইত্যাদি প্রকারে হইবে, এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার বলিয়া-ছেন যে, প্রমাণাদি পদার্থের নির্দেশহুত্রে অর্থাৎ যে সকল সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ অথবা বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সূত্রে বৈরূপ বচন প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ করিয়াই বাসবাক্য করিতে হইবে। প্রমাণ-বিভাগহুত্রে ( তৃতীয় সূত্রে ) “প্রমাণানি” এইরূপ প্রয়োগ আছে, সূত্রগত এই সূত্রে ব্হ সমাসের বাসবাক্য “প্রমাণানি” এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং প্রমেয়-বিভাগহুত্রে ( নবম সূত্রে ) “প্রমেয়ঃ” এইরূপ প্রয়োগ থাকায় বাসবাক্য এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ “সংশয়হুত্রে” প্রকৃতি লক্ষণহুত্রে যেখানে একবচন আছে, বাসবাক্য সেই সব স্থলে একবচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। অস্তত্রও এইরূপ বচনই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাষ্যকারের কথায় ইহাই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু উদয়নাচাৰ্য্য প্রকৃতি এইরূপ বুঝেন নাই। তাৎপর্য্য-পরিভুক্তিতে উদয়ন বলিয়াছেন যে, “নির্দেশ” বলিতে কেবল বিভাগ। কোন পদার্থ কত প্রকার, ইহার নাম “নির্দেশ”। কোন সূত্রে তাহা সংখ্যাবোধক শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। কোন সূত্রে তাহা না বলিলেও অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা ঐ বিভাগ বুঝা গিয়াছে। সেইগুলি “অর্থনির্দেশ”। তদনুসারে দেখানে

বচন গ্রহণপূর্বক বাসবাক্যে সেই বচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সংশয়স্বত্বের অর্থ পর্যালোচনা করিয়া সংশয় ত্রিবিধ বা পঞ্চবিধ, ইহা বুঝা গিয়াছে, সুতরাং সেখানে স্বত্রে “সংশয়ঃ” এইরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ থাকিলেও বাসবাক্যে “সংশয়াঃ” এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগই করিতে হইবে। এবং “দৃষ্টান্তঃ” লক্ষণস্বত্রে “দৃষ্টান্তঃ” এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, দৃষ্টান্ত ত্রিবিধ বলিয়া বাসবাক্যে “দৃষ্টান্তো” এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে “নির্দেশ্য নাই”, সেখানে লক্ষণস্বত্রে যে বচন প্রযুক্ত আছে, তদনুসারেই বাসবাক্য করিতে হইবে। উদয়ন তাঁহার মতের যুক্তিও বলিয়াছেন। মবীন বৃত্তিকার বিধনাথ প্রাচীনদিগের এই বচন কলহে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসবাক্যে বচন লইয়া মারামারি কেন? যাঁ বাকের বচনের দ্বারা কি গম্যবাদি পদার্থের বহুত্বাদি নির্ণয় হইবে? এখানে সৰ্ব্বত্র প্রথম উপস্থিত একবচনের প্রয়োগ করিয়াই দ্বন্দ্ব সমাসের বাসবাক্য করিতে হইবে, তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহা বৃত্তিকার বিধনাথের স্বাদীন মত—মবীন মত।

প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত যোলটি পদার্থের যে তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এইরূপই স্বত্বার্থ। সুতরাং “প্রমাণ.....নিগ্রহস্থানানাং” এই স্থলের যজ্ঞী বিভক্তির অর্থ সধক। তত্ত্বের সহিত উহার অর্থ। এই সধকার্থ যজ্ঞীকেই “শৈথিকী যজ্ঞী” বলে। “উক্তাদন্ত্যং শেষঃ” ইহাই শেষের লক্ষণ। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, কৰ্ম্মত্ব প্রভৃতি কারকার্থ ভিন্ন সধক অর্থকেই বাকরণে “শেষ” বলা হইয়াছে। এই শেষার্থে বিহিত যজ্ঞীকে “শৈথিকী” বলা যায়। ঐ যজ্ঞার্থ সধকের সহিত সমাসের একদেশার্থের অবয়ব হইতে পারে। যেমন “চৈত্রস্ত দাসভাগ্যা”, “রামস্ত নামমহিমা” ইত্যাদি। “তত্ত্বজ্ঞান” এবং “নিঃশ্রেয়সাধিগম” এই দুইটি বাক্য যজ্ঞীতৎপুরুষ সমাস। সুতরাং উহার বাসবাক্যে দুই স্থলেই যজ্ঞী বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐ যজ্ঞী “কৃত্বপ্রত্যয়” যোগে কর্ত্ত্বার্থে বিহিত হইবে। উহার অর্থ কর্ত্ত্বত্ব, সুতরাং উহা “শেষ” নহে, এ জন্ত উহা “শৈথিকী যজ্ঞী” নহে। তত্ত্বকে জানাই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সকে লাভ করাই “নিঃশ্রেয়সাধিগম”। সুতরাং জ্ঞানের কর্ত্ত্বকারক “তত্ত্ব”। “অধিগম” অর্থাৎ লাভের কর্ত্ত্বকারক “নিঃশ্রেয়স”। নিঃশ্রেয়স জন্মিলে তাহা লাভ করিতে আর প্রযত্নস্তর আবশ্যক হয় না। বাক্যে নিঃশ্রেয়সের সাধন, তাহাই নিঃশ্রেয়স লাভের সাধন, ইহা স্থচনা করিবার জন্তই মহর্ষি কেবল নিঃশ্রেয়স না বলিয়া “নিঃশ্রেয়সাধিগম” বলিয়াছেন। এই কথাটি বৃত্তিকার বিধনাথের কথা।

প্রচলিত বাংলায়নভাষ্য পুস্তকে “চাৰ্ঘ্যে দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু পরম-প্রাচীন উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র “সৰ্ব্বপদার্থপ্রদানঃ” এইরূপ পাঠের উল্লেখ করায় মূলে সেই পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। “চাৰ্ঘ্যে” অর্থাৎ চকারের অৰ্ঘ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, ইহাই পূৰ্ব্বোক্ত পাঠের অর্থ। চকারের অর্থ ভেদ। এখানে প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থবর্গের মধ্যে অনেকগুলি ফলতঃ অভিন্ন পদার্থ থাকিলেও প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি দ্বয়ের ভেদ থাকায় দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। ঐরূপ দ্বন্দ্বের ভেদ না থাকিলেও দ্বন্দ্বের ভেদ থাকিলে দ্বন্দ্ব



সমান হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। যেমন “হরিহরৌ”। হরি ও হরে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও হরিত্ব ও হরত্ব-ধর্মের ভেদ থাকাতেই ঐরূপ দ্বন্দ্ব সমান হইয়াছে। ভাষ্যে “অনবয়বেন” এই স্থলে “অবয়ব” শব্দের অর্থ অংশ। “অনবয়বেন” ইহার ব্যাখ্যা “সাকলোন”।

ভাষ্য। আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানামিঃশ্রেয়সাধিগমঃ, তচ্চৈত-  
দ্ব্ত্তরনুত্রেণানুত্বত ইতি। হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং, হানমাত্যস্তিকং,  
তন্ত্রোপায়োহধিগম্য ইত্যেতানি চত্বার্ব্যর্থপদানি সম্যক্ বুজ্জা নিঃশ্রেয়স-  
মধিগচ্ছতি।

অনুবাদ। আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়েরই তত্ত্বজ্ঞান জন্ম মোক্ষ লাভ হয় অর্থাৎ মহাবি গোতম আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত যে বাদশ প্রকার পদার্থকে “প্রমেয়” বলিয়াছেন, তাহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ (চরম কারণ)। সেই এই কথাও পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা (মহাবি) পশ্চাৎ বলিয়াছেন। (১) “হেয়” অর্থাৎ দুঃখ, সেই দুঃখের নিষ্পাদক অর্থাৎ হেতু অবিজ্ঞা, তৃষ্ণা, দর্শ্য, অদর্শ্য, প্রভৃতি, (২) “আত্মাস্তিক” হান অর্থাৎ সেই দুঃখের আত্মাস্তিক নিবৃত্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান, (৩) তাহার “উপায়” অর্থাৎ ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শাস্ত্র, (৪) “অধিগম্য” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লভ্য মোক্ষ, এই চারিটি (হেয়, হান, উপায়, অধিগম্য) “অর্থপদ” অর্থাৎ পুরুষার্থস্থান সম্যক্ বুঝিয়া মোক্ষ লাভ করে।

টিপ্পনী। অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাবি যে বোড়শ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির তত্ত্বজ্ঞানই কি মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ? তাহা কিরূপে হয়? “জন্ম,” “বিতণ্ডা,” “জল” প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার এই প্রশ্ন মনে করিয়া মহাবির প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মা প্রভৃতি যে বাদশ প্রকার পদার্থকে মহাবি “প্রমেয়” নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বোড়শ পদার্থের মধ্যে ঐগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। অন্তঃগুলির তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নিষ্পাদক, এ জন্ম তাহা মোক্ষের পরম্পরা কারণ, অর্থাৎ কোন কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ, কোন কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরায় মোক্ষলাভে আবশ্যক এবং পরোক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতে কতকগুলি পদার্থের সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত মোক্ষলাভে আবশ্যক, এ জন্ম মহাবি প্রথম সূত্রে এক কথায় প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে “প্রমেয়” নামক পদার্থগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ। কারণ, তাহাই মোক্ষপ্রতিবন্ধক মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ সাধন করে। মহাবি

গোতমের এই সিদ্ধান্ত বা এই তাৎপর্য্য কিরূপে বুঝা যায়? প্রথম সূত্রে ত একরূপ কথা কিছু নাই? এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ইহা অনুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদ করিয়াছেন অর্থাৎ পশ্চাৎ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং তাৎপর্য্যটীকাকার “তচ্চৈতৎ” ইত্যাদি ভাষ্যের অবতারণায় বলিয়াছেন যে, আত্মাদি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানের কি কোন অদৃষ্ট শক্তি আছে? বাহ্যের দ্বারা তাহা যোগ জন্মাইবে? এইরূপ প্রশ্ন নিরাসের জন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রে পশ্চাৎ বলিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মাদি প্রেমের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার কেমন করিয়া মোক্ষ সাধন করে, ইহার যুক্তি দ্বিতীয় সূত্রে স্থচিত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যোক্ত “অনুত্তে” এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার কেবল পশ্চাৎকথন বলিলেও মহর্ষি কিন্তু দ্বিতীয়াধায়ে সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে “অনুবাদ” বলিয়াছেন। ঐরূপ শব্দ পুনরুক্তি ও অর্থ পুনরুক্তি—এই উভয়েই “অনুবাদ”। ঐরূপ সপ্রয়োজন পুনরুক্তি দোষ নহে, পরন্তু উহা আবশ্যক হইয়া থাকে। মনে হয়, ভাষ্যকার এই অনুবাদের কথাই এখানে বলিয়াছেন। প্রথম সূত্রের দ্বারা যখন আত্মাদি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানকেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় বলা হইয়াছে, তখন দ্বিতীয় সূত্রে আবার তাহার সূচনা কেন? এতদ্বারা ভাষ্যকার পূর্বেকৃত সপ্রয়োজন পুনরুক্তিরূপ অনুবাদের কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ মহর্ষি প্রয়োজনবশতই ঐরূপ পুনরুক্তি করিয়াছেন, উহা তাহার অনুবাদ। যোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মা প্রভৃতি “প্রমেয়” পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা বলাই সেখানে মহাবির প্রয়োজন। উহা বলা নিতান্ত আবশ্যক; এ জন্তই পুনরায় প্রকারান্তরে বিশেষ করিয়া উহা বলিয়াছেন।

মহর্ষি যে দ্বিতীয় সূত্রে আত্মা প্রভৃতি ছাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণরূপে সূচনা করিয়াছেন, উহা কেবল মহর্ষি গোতমেরই কথা নহে, মোক্ষবাদী আচার্য্য মাত্রেরই উহা সম্মত, এই কথা বলিবার জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—“হেয়ং” ইত্যাদি। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথাগুলির ঐরূপই মূল তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। আত্মাত্মিক হুঃখ নিবৃত্তিই সকল অধ্যাত্ম-বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন। সর্বমতে হুঃখই “হেয়”। হুঃখরূপ যেগুলি ঐ হুঃখের হেতু, তাহাও “হেয়”। হুঃখের হেতু পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হুঃখকে কখনই ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং সেগুলিও হেয় এবং হুঃখের হেতু বলিয়া সেগুলিকেও বিবেচক জ্ঞানিগণ হুঃখমধ্যেই গণ্য করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই হুঃখের হেতুগুলিকে হুঃখ বলিয়া ধরিয়া লইয়া একবিংশতি প্রকার হুঃখ বলিয়াছেন। ঐ একবিংশতি প্রকার হুঃখের আত্মাত্মিক নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হইল। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম যে আত্মা প্রভৃতি ছাদশ প্রকার “প্রমেয়” পদার্থ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শরীর হইতে হুঃখ পর্য্যন্ত দশটিই হেয়। তন্মধ্যে শরীরাদি নয়টি হুঃখের হেতু বলিয়া হেয়। যাহা হেয়, দুমুজুর তাহা সম্যক বুঝিতে হইবে, এ কথা মোক্ষবাদী সকল আচার্য্যই স্বীকার করেন। হেয়কে বার্থরূপে না বুঝিলে তাহার পরিত্যাগ অসম্ভব। যদি কেহ হেয়কে গ্রাহ্য বলিয়া



বুকে, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে কি তাহার প্রবৃত্তি হয়? ঐরূপ হেয়কে উপাদেয় বলিয়া বুঝিতেই ত বস অনর্থ ঘটিতেছে। ফল কথা, “হেয়” পদার্থগুলিকে যথার্থরূপে না বুঝিলে মোক্ষের আশা নাই। মহর্ষি তাহাদিগকে শরীর প্রভৃতি দশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তাহার পরে সুসুকুর “অধিগন্তব্য” অর্থাৎ লভ্য মোক্ষ। আত্মা উহা লাভ করিবেন। মহর্ষি-কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রেমের মধ্যে এই দুইটি উপাদেয়। আত্মার উচ্ছেদ কাহারই কামা নহে। সেক্ষেপ মুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না এবং তাহা সম্ভবও নহে এবং মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, এই জন্ত আত্মা ও মোক্ষ এই দুইটি উপাদেয় পদার্থ। ফলতঃ “হেয়” এবং “উপাদেয়” ভেদে মহর্ষি দ্বাদশপ্রকার প্রেমের পদার্থ বলিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব সাংকায়িকার ব্যতীত মোক্ষ অসম্ভব, মোক্ষবাদী কোন আচার্য্যেরই ইহাতে বিবাদ নাই। শ্রুতিযুক্তিনিষ্ঠ ঐ সিদ্ধান্তে পশ্চিমতের বিবাদ থাকিতেই পারে না। ঐরূপ “অধিগন্তব্য” মোক্ষ এবং হেয় শরীরাদি দশ প্রকার প্রেমেরকেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে সম্যক্ বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের তত্ত্বসাংকায়িকার করিতে হইবে। মোক্ষ বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা সূদূর-পরহিত। এবং পূর্বোক্ত ছুঃখের কিসের দ্বারা নিবৃত্তি হয়, আত্মাস্থিক নিবৃত্তি হয়, তাহাকেও সম্যক্ বুঝিতে হইবে, তাহাকেই বলিয়াছেন “আত্মাস্থিক হান”। “হীয়াতেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যাহার দ্বারা ছুঃখাদি ত্যাগ করা যায়, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে বলা হইয়াছে “হান”। আত্মাস্থিক ছুঃখ নিবৃত্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে বলিবার জন্তই বলা হইয়াছে “আত্মাস্থিক হান”। সেই তত্ত্বজ্ঞানের “উপায়” শাস্ত্র। তাহাকেও সম্যক্ বুঝিতে হইবে। যাহা মোক্ষের সাধন, সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা করা যায় না। ফল কথা, নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইলে “হেয়”, “হান”, “উপায়” ও “অধিগন্তব্য” বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহা সকল আচার্য্যেরই স্বীকার্য্য। এবং অন্ত্যস্ত বিদ্যাসাধ্য দুই নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইলেও “হেয়”, “হান”, “উপায়” ও “অধিগন্তব্য” এই চারিটিকে সম্যক্ বুঝিতে হয়। উহা সকল বিদ্যাতেই আছে। ভাষ্যকার এখানে পূর্বোক্ত চারিটিকে “অর্থপদ” বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অর্থপদানি পুরুষার্থহানানি”<sup>১</sup> পুরুষের যাহা প্রয়োজন, তাহা পুরুষার্থ, তাহা পূর্বোক্ত ঐ চারিটিতেই অবস্থিত। ঐ চারিটিকে সম্যক্ না বুঝিলে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। ফল কথা, ঐ কথাগুলির দ্বারা ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রের মর্ম্মার্থই সূচনা করিয়াছেন। “হেয়”, “হান”, “উপায়” ও “অধিগন্তব্য” এই চারিটি “অর্থপদ”কে সম্যক্ বুঝিলে মহর্ষি-কথিত প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানই হইবে। তাহাদিগের ব্যাখ্যা উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা-ভাস্যেরই গিথিত হইল।

মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে

১। অনুসন্ধিৎসু এমিরাটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত “জায়বাস্তিক-ভাৎপটীকানিবৃত্তি” দেখিবেন। প্রচলিত ভাৎপটীকাক্রমে এখানে অনেক অংশ যুক্তিত হই নাই।

এবং এ স্থানের অগ্রান্ত কথা বিতীয় সূত্রবাখ্যাতেই দৃষ্টব্য। এখন এই সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের অর্থ কি, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উল্লেখ-করের তাৎপর্য-বাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যদিও “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা ইষ্টে মাত্রই বুঝা যায় এবং প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞান সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সেরই সাধন হয়, তথাপি মহর্ষিহুত্রে যখন আত্ম প্রকৃতি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানের কথা বহিরাছে, তখন অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্গই এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত। দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স তাঁহার অভিপ্রেত হইলে তিনি অগ্রান্ত সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথাও বলিতেন। কারণ, সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই কোন না কোন দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের সাধন হইয়াই থাকে। ফলকথা, তাৎপর্যটীকাকার উল্লেখকরের এইরূপ তাৎপর্যই বর্ণন করিয়াছেন। তাৎপর্য-পরিভুক্তিতে উল্লহনাচাৰ্য্যও বাচস্পতি মিশ্রের বাখ্যা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন উল্লেখকরের যথাক্রম বার্তিকের দ্বারা কিন্তু এখানে এইরূপ তাৎপর্য নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, নিঃশ্রেয়স বিবিধ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। আত্মাদি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞান-জন্তই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্গ লাভ হয়। প্রমাণাদি অল্প পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান-জন্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। অবশ্য প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞানের ফলে আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞান হইবে, ইহা তিনিও বলিয়াছেন। এবং অপবর্গ ভিন্ন ইষ্টে মাত্রই তাঁহার মতে দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স, সূত্রায় অপবর্গ-সাধন তত্ত্বজ্ঞানাদিকেও কেবল তিনি দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলিয়া এখানে বলিতে পারেন। মহর্ষি সর্ববিধ এবং সমস্ত নিঃশ্রেয়সই প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন, এ কথা উল্লেখকরও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তাৎপর্যটীকাকার উল্লেখকরের তাৎপর্য বর্ণন করিতে বাইয়া বরং ইহার বিরুদ্ধ কথাই বলিয়াছেন। প্রাচীন গুরুপাদগণ বাহাই বলুন, আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, মহর্ষি গোতম তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞান প্রথম সূত্রে সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সকেই “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাঠে “অচতুরাদি” সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দটি ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এই “নিঃশ্রেয়স” শব্দের অপবর্গ অর্থে ভূরি প্রয়োগ থাকিলেও কল্যাণ মাত্র অর্থেও<sup>১</sup> মহাভারতাদি গ্রন্থে অনেক প্রয়োগ দেখা যায়। “নিঃশ্রেয়স” শব্দ অভীষ্ট মাত্রেরই বোধক, এ কথা তাৎপর্যটীকাকারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিঃশ্রেয়সের কথা বলিয়া অপবর্গ ভিন্ন অগ্রান্ত কল্যাণকেও “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। “জরী”, “বার্তা” ও “দণ্ডনীতি” বিজ্ঞায় নিঃশ্রেয়স কি, তাহা উল্লেখকর সেখানে বলিয়াছেন। এখন “নিঃশ্রেয়স” শব্দ যদি অভীষ্ট মাত্রের বোধক হয় এবং বিশেষতঃ অপবর্গের বোধক হয়, তাহা হইলে মহর্ষি-সূত্রস্থ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা পরম-প্রয়োজন অপবর্গও বুঝিব, আবার গৌণ প্রয়োজন কল্যাণমাত্রও বুঝিব, তাহা হইলে প্রমাণাদি



ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গ-লাভের উপায় এবং অন্যান্য সর্ববিধ অতীষ্ট লাভেরও উপায়, ইহাই মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্রের তাৎপর্যার্থ বৃত্তিতে পারি। অন্যান্য বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়সলাভে যে ন্যায়বিজ্ঞা আবশ্যক, প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে সকল বিজ্ঞার ফল-লাভেই আবশ্যক, এ কথা ভাষ্যকার প্রকৃতিও বলিয়াছেন। ন্যায়বিজ্ঞা সর্ববিজ্ঞার প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায়, সর্বধর্মের আশ্রয়, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার প্রমাণাদি পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে সর্ববিধ নিঃশ্রেয়স-লাভেই উপায় বলেন নাই কি? তবে যে দেখানে ভাষ্যকার ন্যায়বিজ্ঞার অপবর্গকেই “নিঃশ্রেয়স” বলিয়াছেন, তাহা এই ন্যায়বিজ্ঞার অধ্যাত্ম অংশ ধরিয়া; এ জনাই দেখানে ন্যায়বিজ্ঞাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞা বলিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বিজ্ঞা অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইলেও উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে, এ কথাও ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকারের মতেও ন্যায়বিজ্ঞার দুইটি অংশ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তন্মধ্যে অধ্যাত্ম অংশ ধরিলে তাহার ফল অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স। অন্য অংশ ধরিলে অন্যান্য সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিজ্ঞার ফল। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, তজ্জনা ঐ প্রমেয় পদার্থগুলির যথাশাস্ত্র মনন করিতে হইবে এবং সেই অপরিপক্ক তত্ত্বনিষ্ঠার রক্ষা করিতে হইবে। এ জন্য প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান তাহাতে আবশ্যক। তাহা হইলে বলা যায়, সাক্ষাৎ ও পরস্পরায় প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মহর্ষি অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বলিয়াছেন। আবার প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সর্ববিজ্ঞা-সাধ্য, সর্বকর্মসাধ্য, সর্ববিধ দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বা অতীষ্ট লাভের উপায়, এ কথাও মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন, নচেৎ ন্যায়বিজ্ঞা সর্ব-বিজ্ঞার প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায়, এ কথা ভাষ্যকার কোথায় পাইলেন? এবং তিনি উহা বলেন কিরূপে? কলকথা, মহর্ষি নানার্থ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার বিভি-ন্নার্থের সূচনা করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। আরও মনে হয়, মহর্ষির “নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” এই স্থলে “অধিগম” শব্দের “লাভ” অর্থের ন্যায় “জ্ঞান” অর্থও এক পক্ষে মহর্ষির বিবক্ষিত। “অধিগম” শব্দের লাভ অর্থের ন্যায় জ্ঞানও অর্থ আছে,<sup>১</sup> সে অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায়, প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নিজের এবং দেশের ও দশের “নিঃশ্রেয়স” অর্থাৎ কল্যাণকে বুদ্ধি লাভ করা যায়। সেও ত ঠিক কথা। মহর্ষি যে এক পক্ষে তাহাও বলেন নাই, ইহাই বা কি করিয়া বুদ্ধিব?

যদি তিনি এখানে কেবল অপবর্গের কথাই বলিতেন, তাহা হইলে “অপবর্গ” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই কেন? এবং “অধিগম” শব্দেরই বা প্রয়োজন কি? মহর্ষি অপবর্গ বুঝাইতে অস্ত্রান্ত্র সকল সূত্রেই “অপবর্গ” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, “নিঃশ্রেয়স” শব্দটি আর কোথাও প্রয়োগ করেন নাই এবং অপবর্গের কথাই আর কোথাও অপবর্গের অধিগম বলেন নাই,

১। দার্শনিক অধিগম জ্ঞান অর্থও “অধিগম” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—“ততঃ প্রত্যক্চেতনাদি-গমোপায়াভাবাৎ”।—বৌদ্ধপুত্র ১২২।

কেবল অপবর্ণ শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” বলিয়া পরেই আবার দ্বিতীয় সূত্রেই বলিয়াছেন “অপবর্ণঃ”; ইহার কি কোন গূঢ় অভিগন্ধি নাই? যদি বলা যায়, প্রথম সূত্রে সৰ্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সের কথা এবং নিঃশ্রেয়সজ্ঞানের কথা, আর দ্বিতীয় সূত্রে কেবল অপবর্ণেরই কথা, তাহা হইলে ঐরূপ প্রয়োগ যথার্থ সার্থক হইতে পারে। কারণ, ঐরূপ নানার্থ প্রকাশ করিতে হইলে “নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” এইরূপ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই। কেবল অপবর্ণ বুঝাইতে মহর্ষি মুক্তি প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। ফলতঃ ভাষাকার যেমন আদিভালোর দ্বারা নানার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সূত্রকারও প্রথম সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার নানার্থ সূচনা করিয়াছেন, ইহা বলিতে কোন বাধক দেখি না, বরং সাধকই দেখিতে পাই। সূত্রে নানার্থের সূচনা থাকে, এ কথা প্রাচীনগণও বলিয়া গিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি গুরুবর্গ নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা যে অপবর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, সেই অংশেই প্রথম সূত্রের সহিত দ্বিতীয় সূত্রের সম্বন্ধ এবং অপবর্ণই জ্ঞানবিজ্ঞার মুখ্য প্রয়োজন এবং তাহাতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান সাফাৎ ও পরম্পরার আবশ্যক, ইহাও মহর্ষির কথা। পরন্তু অজ্ঞাত নিঃশ্রেয়সের লাভে এবং তাহার জ্ঞানেও প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এইটিও মহর্ষির প্রথম সূত্রে নিজের কথা, ইহাই বলিতে চাই।

তাৎপর্য্যটীকাকার যে বলিয়াছেন, মহর্ষি সূত্রে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থগুলির উল্লেখ করায় এবং আরও অন্যান্য সকল পদার্থের উল্লেখ না করায় মহর্ষিসূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা কেবল অপবর্ণই বুঝিতে হইবে, এ কথাটা বুলি নাই। কারণ, কেবল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিজ্ঞার ফল বলিতেছি না, অপবর্ণই ইহার মুখ্য প্রয়োজন। ইহা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিজ্ঞা, এ কথা ভাষাকারও বলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং মোক্ষ ইহার মুখ্য প্রয়োজন হইবেই, ইহাতে মোক্ষোপযোগী পদার্থেরই উল্লেখ করিতে হইবে, দৃষ্টমাত্র নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অর্থাৎ মোক্ষের অনুপযোগী পদার্থের উল্লেখ ইহাতে করা হইবে না, সুতরাং মহর্ষি মোক্ষোপযোগী পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এ কথা ত পূর্বে তাৎপর্য্যটীকাকারও বলিয়াছেন। সেই মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে সৰ্ব্ববিধ দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হয়, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। কারণ, সৰ্ব্ববিজ্ঞাসাধ্য নিঃশ্রেয়সলাভেই এই ন্যায়বিজ্ঞা নিতান্ত আবশ্যক, সুতরাং সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথা না বলাতে মহর্ষি “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সকে লক্ষ্য করেন নাই, অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্ণই তাহার অভিপ্রেত, ইহা কি করিয়া বুঝা যায়? আর আত্মা প্রভৃতি পদার্থের উল্লেখ থাকতেই যে আর ইহার মোক্ষ ভিন্ন কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই বা কি করিয়া বুঝা যায়? অবশ্য মুখ্য প্রয়োজন আর কিছু নাই, অধ্যাত্মবিজ্ঞার অপবর্ণ ভিন্ন আর কোন মুখ্য প্রয়োজন হইতেই পারে না, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞা ত উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে? মূল কথা, প্রমাণাদি পদার্থের যথাসম্ভব জ্ঞান সংসারীর সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র যথাসম্ভব ইষ্ট সাধন করিতেছে এবং অনিষ্ট নিবারণ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যে



সূত্রিকাল হইতে (১) প্রমাণের দ্বারা সর্বদা সর্বদেশে (২) প্রমেয় বুঝা হইতেছে এবং অভিলষিত প্রমেয় সাধনের জন্য প্রমাণের অথেষ্টে ছুটাছুটি হইতেছে, (৩) “সংশয়” হওয়ায় বিচারের (৪) “প্রয়োজন” হইতেছে, আবার কোনটি প্রয়োজন, কোনটি প্রয়োজন নহে, ইহা বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা হইতেছে, (৫) দৃষ্টান্ত দেখিয়া (৬) সিদ্ধান্ত বুঝা হইতেছে এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কত সিদ্ধান্ত সমর্থন করা হইতেছে, প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রভৃতি (৭) (অবয়ব) প্রয়োগ পূর্বক পরের নিকটে প্রকৃত বক্তব্যটির প্রকাশ ও সমর্থন হইতেছে, অনেকে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির নাম না জানিয়াও উহার প্রয়োগ করিতেছেন, বিস্তৃত (৮) তর্কের সাহায্যে (৯) নির্ণয় হইতেছে, সভা-সমিতি রাজধান্যাদিকরণ প্রভৃতিতে, কোথায়ও কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ( ১০ ) বাদ এবং অনেক স্থানে জিগীষাবশতঃ ( ১১ ) জন্ম ও (১২) বিতণ্ডা করা হইতেছে, অপর পক্ষের বুক্তি খণ্ডনকালে “এ হেতু হেতুই নহে, ইহা দৃষ্ট হেতু,” অথবা “এই হেতুতে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না” ইত্যাদি কথা বলিয়া ( ১৩ ) “হেতুভাঙ্গ” প্রদর্শন করিতেছে, প্রকৃত কথা প্রকাশের জন্য অথবা দ্রবতিসন্ধিযুক্ত বাদীকে নিরস্ত করিয়া আশ্বর্য্যকার জন্ম কত ( ১৪ ) ছল করা হইতেছে, বাদিনিরাস প্রয়োজন হওয়ায় আরও কত অসহস্তর ( ১৫ ) (জাতি) করা হইতেছে, আবার অসহস্তর জানিয়া তাহার উপেক্ষাও করা হইতেছে, ( ১৬ ) নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিয়া পরাজয় ঘোষণা হইতেছে, পরাজয়ে অনেক সময়ে তত্ত্ব নিশ্চয়ও হইতেছে। এ সবগুলি কি গোতমোক্ত প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের প্রকাণ্ড গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই হইতেছে না? কোন বুদ্ধিজীবী বা ক্তি কি এই বোড়শ পদার্থের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া এক দিনও জীবন যাপন করিতে পারেন? এবং উহাদিগের দ্বারা কি সমাজের কোন কার্য্যই হইতেছে না? ভাবিয়া বুঝিলে এবং সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে, উহারা লোকবাক্তা নির্লীহ করিতেছে। প্রমাণাদি পদার্থের যথাসম্ভব তত্ত্বজ্ঞান তত্ত্বাধেবী ব্যক্তির সর্বদাই যথাসম্ভব উপকার করিতেছে, তাঁহার মুক্তি কামনা নাই, মুক্তির কথা যিনি ভাবিতেও পারেন না, তাঁহারও অভিলষিত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের জন্য ঐ জ্ঞান সর্বদাই আবশ্যক হয়। ভগবান্ মনু এই জন্মই অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সর্ববিধ কল্যাণ-লাভেই আবশ্যক এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত কল্যাণ কি, দেশের ও দেশের কল্যাণ কি এবং তাহা কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লওয়া যায় এবং বুঝিয়া তদনুসারে কাণ্য করা যায়, এই জন্য রাজাকে আবৌক্ষিকী বিদ্যা শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, রাজার যে বিচার করিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া, তদনুসারে বিধান করিতে হইবে, দেশের ও দেশের কল্যাণ বুঝিতে হইবে, তাহার উপায় বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। কলকথা, গোতমোক্ত প্রমাণাদি পদার্থবর্গের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তদ্বারা বহু বহু দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ করে এবং উহার সাহায্যে শ্রতিবোধিত আত্মাদি পদার্থের মনন সম্পাদন করিয়া মোক্ষ-মন্দিরের তৃতীয় সোপান নিদিধ্যাসনে বসিয়া আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারপূর্বক অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স পরম প্রয়োজন অপবর্ণ লাভ করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে—করিতে পারে।

ভাষ্য । তত্র সংশয়াদীনাং পৃথগ্‌বচনমনর্থকং ? সংশয়াদয়ো হি যথা-  
সম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তত্বস্তো ন ব্যতিরচ্যন্ত ইতি । সত্যমেতৎ,  
ইমান্ত চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ প্রাণভূতানন্তু গ্রহায়োপদিষ্টান্তে,  
বাসাং চতুর্থীমাদ্বীক্ষিকী বিদ্যা, তস্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ,  
তেষাং পৃথগ্‌বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিজ্ঞানামাত্রমিয়ং স্ম্যৎ যথোপনিষদঃ ।  
তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্‌ প্রস্থাপ্যতে ।

অনুবাদ । ( পূর্ববচক ) তন্মধ্যে অথবা সেই পূর্বোক্ত সূত্রে সংশয় প্রভৃতি  
পদার্থের অর্থাৎ “সংশয়” হইতে “নিগ্রহস্থান” পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থের পৃথক্  
উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া উল্লেখ নিরর্থক ? কারণ, সংশয় প্রভৃতি ( সূত্রোক্ত  
চতুর্দশ পদার্থ ) যথাসম্ভব “প্রমাণ”সমূহ এবং “প্রমেয়”সমূহে অন্তর্ভুক্ত থাকায়  
( প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে ) অতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ নহে । ( উত্তর ) এ কথা  
সত্য, কিন্তু “পৃথক্‌প্রস্থান” অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট এই চারিটি বিদ্যা  
( “ত্রয়ো,” “দণ্ডনীতি,” “বান্ধা,” “আদ্বীক্ষিকী” ) প্রাণীদিগকে অনুগ্রহ করিবার  
জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, যে চারিটি বিজ্ঞার মধ্যে এই “আদ্বীক্ষিকী” ( জ্ঞায়বিজ্ঞা )  
চতুর্থা । সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত “সংশয়” প্রভৃতি “নিগ্রহস্থান”  
পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ সেই জ্ঞায়বিজ্ঞার “পৃথক্‌প্রস্থান” অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাত্ত ।  
তাহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ বাতীত এই জ্ঞায়বিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞায় কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা  
হইয়া পড়ে । সেই জন্ত ( মহর্ষি গৌতম ) সংশয় প্রভৃতি পদার্থবর্গের দ্বারা ( এই  
জ্ঞায়বিজ্ঞাকে ) পৃথক্‌ প্রস্থাপিত অর্থাৎ অস্ত্র বিজ্ঞা হইতে বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট  
করিয়াছেন ।

টিপ্পনী । পূর্ববচকের তাৎপৰ্য্য এই যে, “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে “প্রমাণ” পদার্থ থাকিলেও  
প্রমাণত্বরূপে প্রমাণের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, প্রমাণত্বজ্ঞান বাতীত প্রমেয় ত্বজ্ঞান হইতেই  
পারে না, এ জন্ত প্রমাণের পৃথক্‌ উল্লেখ আবশ্যক, কিন্তু সংশয় প্রভৃতি সূত্রোক্ত চতুর্দশ পদার্থের  
পৃথক্‌ উল্লেখের প্রয়োজন কি ? মহর্ষি “প্রমাণ” এবং “প্রমেয়” পদার্থ বলিয়াছেন, তাহার  
পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার “প্রমেয়” ভিন্ন আরও অনেক প্রমেয় আছে, সে সমস্ত প্রমেয়ও তিনি  
মানেন, সুতরাং সংশয়াদি পদার্থগুলি ঐ সকল প্রমাণ ও প্রমেয়েই অন্তর্ভুক্ত থাকায় অর্থাৎ  
তাহারাও যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ হওয়াতে ঐ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে কোন  
অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ নহে, তবে আবার তাহাদিগের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন ? অবশ্য  
সংশয়াদি পদার্থকে কেবল “প্রমেয়ে” অন্তর্ভুক্ত বলিলেও প্রকৃত স্থলে কোন ক্ষতি ছিল



না। ভাষ্যকার পরে আর প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলেনও নাই, কিন্তু এখানে এক সম্ভে সংশয়াদি সকল পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলিতে বাইরা নিজ বাক্যের নূনতা পরিহারের জন্য প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন। উহাদিগের মধ্যে কোন পদার্থ যদি প্রমাণেও অন্তর্ভূত থাকে, তবে তাহা না বলিলে নিজ বাক্যের নূনতা হয়। কোন পদার্থ প্রমাণেও অন্তর্ভূত আছে, প্রাচীনগণ ইহার বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে উদ্যোতকর “নির্ণয়” পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের কারণ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—“অস্তান্তর্ভাবঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েষু বা”। ভাষ্যকারের মতেও “নির্ণয়” পদার্থ যেমন “প্রমেয়,” তদ্রূপ “প্রমিত,” তদ্রূপ “প্রমাণ”ও হয় (তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভাষ্যকার “নির্ণয়” পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াও প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলিতে পারেন। “অবয়ব” শব্দপ্রমাণ হইলে তাহাকেও প্রমেয়ের ন্যায় প্রমাণেও বথাসম্ভব অন্তর্ভূত বলা যায়। কিন্তু উদ্যোতকর প্রকৃতি কেহই তাহা বলেন নাই। সংশয়াদি পদার্থগুলি প্রত্যেকেই মহর্ষি-কথিত প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তর্ভূত নহে, তাই বলিয়াছেন—“বথাসম্ভবং”। বথাস্থানে এই অন্তর্ভাবের কথা বুঝিতে হইবে।

উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, এক কথা সত্য; কিন্তু ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্তা ও আদীক্ষিকী এই চারিটি বিজ্ঞা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ মহু রাজার শিক্ষণীয় বলিয়াও এই চারিটি বিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন।

“দ্বৈবিজ্ঞেভ্যস্ত্রয়ীং বিজ্ঞাৎ দণ্ডনীতিক শাখতীং।

আদীক্ষিকীকায়বিজ্ঞাং বার্তারস্তাংশ্চ লোকতঃ ॥” ১৭।৪৩।

মনুক্ এই চারিটি বিদ্যার পৃথক্ পৃথক্ “প্রস্থান” আছে। তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন—“প্রস্থানং ব্যাপারঃ,” অর্থাৎ এখানে প্রস্থান শব্দের অর্থ ব্যাপার। প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যুৎপাদন বা বোধ-সম্পাদনই বিজ্ঞার ব্যাপার, তাহাকে বলে বিদ্যার প্রস্থান। আবার প্রস্থান শব্দটি কণ্ঠপ্রত্যয়ে নিম্পন্ন হইলে অর্থাৎ বিদ্যা বাহাকে প্রস্থিত বা বোধিত করে, এই অর্থে নিম্পন্ন হইলে, ঐ প্রস্থান শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—বিদ্যার—সেই অসাধারণ প্রতিপাদ্য। কারণ, বিদ্যা সেই প্রতিপাদ্যেরই ব্যুৎপাদন বা বোধ সম্পাদন করে। “পৃথক্ প্রস্থানবিজ্ঞা” বলিলে সেখানে “প্রস্থান” শব্দের দ্বারা পূর্কোক্ত ব্যাপার বুঝিতে হইবে। কোন পদার্থকে “প্রস্থান” বলিলে সেখানে “প্রস্থান” শব্দের দ্বারা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। পূর্কোক্ত চারিটি বিজ্ঞার এই প্রস্থান-ভেদেই ভেদ হইয়াছে। তন্মধ্যে “ত্রয়ী”র প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য অগ্নিহোত্র হোমানি। “দণ্ডনীতি”র প্রস্থান স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি। “বার্তা”র প্রস্থান হলশকটাদি। “আদীক্ষিকী”র প্রস্থান সংশয়াদি পদার্থ। যদি এই আদীক্ষিকীতে সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিজ্ঞা হইতে পারে না। ইহাকে “ত্রয়ী”র মধ্যে গণ্য করিতে হয়, “বার্তা” বা “দণ্ডনীতি”র মধ্যে গণ্য করা অসম্ভব। সুতরাং পূর্কোক্ত বিজ্ঞা চারিটি হয় না, উহারা তিনটি হইয়া পড়ে। তাই

বলিয়াছেন—“অধ্যাত্মবিজ্ঞানমাত্রমিহ সাং”। জ্ঞানবিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইয়া পড়ে। পূর্বোক্ত মহাবচনে “আত্মবিজ্ঞা” “আত্মিকিকী”রই বিশেষণ। প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি চরমকরে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বাংস্যায়নও তাহাই বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে, ইহা ভাষ্যকার বাংস্যায়ন না বলিয়া পারেন না। ফলতঃ “ত্রয়ো” প্রকৃতি অস্ত্র বিজ্ঞার প্রস্থান হইতে জ্ঞানবিজ্ঞার প্রস্থান-ভেদ থাকায় ইহা ঐ অস্ত্র বিজ্ঞা হইতে ভিন্ন, ইহা ত্রয়ো নহে, ইহা চতুর্থী বিজ্ঞা, ইহা জানাইবার জ্ঞান এবং ঐ সংশয়াদি পৃথক্ প্রস্থানগুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জ্ঞান মহর্ষি উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থগুলির পৃথক্ উল্লেখ না করিলে তাহার পৃথক্ভাবে ব্যুৎপাদন কিরূপে হইবে? জ্ঞানসংশয়াদি পদার্থের ব্যুৎপাদনই যে জ্ঞানবিজ্ঞার ব্যাপার; এই ব্যাপার-ভেদেই জ্ঞানবিজ্ঞার অস্ত্র বিজ্ঞা হইতে ভেদ হইয়াছে এবং ভেদ বুঝা গিয়াছে। সুতরাং মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থবর্ণের দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞাকে পৃথক্ ব্যাপারবিশিষ্ট করায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, ইহা অনর্থক হয় নাই। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। তত্র নানুপলক্ষে ন নির্ণাতেহর্থৈ জ্ঞায়ঃ প্রবর্ততে, কিং তর্হি? সংশয়িতেহর্থৈ। যথোক্তং “বিমৃশ” পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়” ইতি। বিমর্শঃ সংশয়ঃ, পক্ষপ্রতিপক্ষৌ জ্ঞায়প্রবৃত্তিঃ, অর্থাবধারণং নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানমিতি। স চায়ং কিং সিদ্ধিতি বস্তুবিমর্শমাত্রমনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ প্রমেয়েহস্তর্ভবমেবমর্থং পৃথগুচ্যতে।

অনুবাদ। তন্মধ্যে—অজ্ঞাত পদার্থে জ্ঞায় প্রবৃত্ত হয় না, নিশ্চিত পদার্থে জ্ঞায় প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) সন্দিগ্ধ পদার্থে জ্ঞায় প্রবৃত্ত হয়। যথা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন—“সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণ নির্ণয়”। (১ অঃ, ৪১ সূত্র)। “বিমর্শ” বলিতে সংশয়, (সেই সূত্রে) পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে জ্ঞায়প্রবৃত্তি। অর্থাবধারণ বলিতে নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান। ইহাই কি? অথবা ইহা নহে? এইরূপে পদার্থের বিমর্শ মাত্র কি না—অনিশ্চয়াজ্ঞান জ্ঞানরূপ সেই এই (জ্ঞায়াজ্ঞ) সংশয় “প্রমেয়ে” অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানপদার্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াও এই জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি। যে পদার্থে কাহারও কোনরূপ সংশয় হয় নাই, তাহা লইয়া কাহারও বিবাদ হয় না। তাহা লইয়া বিবাদ করিলে মধ্যস্থ ব্যক্তির তাহা শুনে ন। নিরর্থক পাণ্ডিত্য প্রকাশ নিরপেক্ষ মধ্যস্থ-সমাজে কখনও আবৃত্ত হয় না। বিভিন্নবাদীর কথা শুনিয়া মধ্যস্থ-



গণের সংশয় হইলে তাঁহারা কোন পক্ষেরই অনুমোদন করিতে পারেন না, সুতরাং মতাস্থগণের সংশয় নিরাসের উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষ-সাধনের যত্নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ ইহাকেই বলে জ্ঞায়প্রবৃত্তি। সংশয় ব্যতীত ইহা ঘটে না। সুতরাং সংশয় ইহাও মূল, এ জন্ত জ্ঞায়বিদ্যার সংশয় পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, সংশয় প্রভৃতি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ জ্ঞায়বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান, অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। এ জন্ত জ্ঞায়বিদ্যায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক, নচেৎ জ্ঞায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ সংশয়াদি পদার্থ জ্ঞায়বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য কেন হইয়াছে, জ্ঞায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাই কেন নহে, ইহা বুঝাইতে হইবে। এ জন্ত ভাষ্যকার এগন হইতে ঐ সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের বথাক্রমে প্রত্যেকটিকে ধরিয়া এবং প্রকৃত বক্তব্য সমর্থনের জন্ত উহাদিগের অনেকের স্বরূপ বর্ণন করিয়া জ্ঞায়বিদ্যার উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংশয়ের কথাই প্রথম বক্তব্য। কারণ, সংশয়ই উহাদিগের মধ্যে প্রথম। তাই “তত্র” এই কথার দ্বারা সংশয়কেই নির্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ তন্মধ্যে সংশয় এইরূপ। পরবর্ত্তী “সংশয়” শব্দের সহিত উহার যোগ করিতে হইবে।

যে পদার্থ একবারে অজ্ঞাত, তাহাতেও জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয় না, বাহা নির্ণীত, তাহাতেও জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয় না। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, বাহা সামান্ত্রতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত, তাহাতেই জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয়। পূর্বতকে জানি, কিন্তু তাহাতে বলি আছে কি না, এইরূপ সংশয় হইতেছে, সুতরাং সামান্ত্রতঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে। বেঙ্গপে যাহা অনির্ণীত, সেইরূপেই তাহাতে সংশয় হয়। সেইরূপে সন্নিহিত সেই পদার্থেই জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয়, সংশয় না হইলে তাহা হয় না, সুতরাং সংশয় জ্ঞায়ের অঙ্গ। এ কথা মহর্ষি নিজেও বলিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্ত ভাষ্যকার মহর্ষির নির্ণয়লক্ষণ সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সূত্রে “নিমৃশ” এই কথার দ্বারা সংশয় পাওয়া গিয়াছে। কারণ, সংশয়কেই মহর্ষি “বিমর্শ” বলিয়াছেন এবং ঐ সূত্রে যে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দ আছে, উহার দ্বারা সেখানে জ্ঞায়প্রবৃত্তিই বুঝিতে হইবে, উহাই সেখানে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দের লাক্ষণিক অর্থ (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ মহর্ষির নির্ণয়সূত্রের দ্বারাও সংশয় জ্ঞায়প্রবৃত্তির মূল, ইহা প্রকটিত আছে, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল তাৎপৰ্য্য। সংশয়ের পরে জ্ঞায়প্রবৃত্তি, তাহার দ্বারা পদার্থের অবধারণ, ইহাই সূত্রার্থ। বিপরীতভাবে পদার্থবিধারণ মহর্ষির “নির্ণয়” পদার্থ নহে, তাই ভাষ্যকার ঐ নির্ণয়ের পুনর্কীর্ষণ করিয়াছেন “তত্ত্বজ্ঞান”। এগন মূল কথা এই যে, সংশয় জ্ঞানপদার্থ, মহর্ষিকথিত দ্বাদশবিধ ধর্মের পদার্থের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ থাকায় জ্ঞানরূপে সংশয়েরও উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সংশয়ের বিশেষ জ্ঞান হয় না। সংশয় জ্ঞায়প্রবৃত্তির মূল, সুতরাং জ্ঞায়্যঙ্গ, জ্ঞানে উহার বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, সেই জন্তই আবার বিশেষ করিয়া, পৃথক্ করিয়া জ্ঞায়বিদ্যার সংশয় পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য নির্ণয় মাত্রই সংশয়পূর্ণক নহে, মতাস্থহীন “বাদ”

বিচারেও নির্ণয় হয়, সেখানে কাহারও পূর্বে সংশয় নাই, মহাবির নির্ণয়সূত্রেও নির্ণয় মাঝে পূর্বে সংশয়ের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু নির্ণয়মাত্র সংশয়পূর্বক না হইলেও বিচার সংশয়পূর্বকই। ভাষ্যকারও এখানে সেই তাৎপর্য্যে সংশয়কে জ্ঞানপ্রবৃত্তির মূল বলিয়াছেন। যথাস্থানে এ সকল কথার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। অথ প্রয়োজনং, যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনং, যমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা কর্ম্মারভতে। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ। তদাশ্রয়শ্চ জ্ঞায়ঃ প্রবর্ততে।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সংশয়ের পরে প্রয়োজন (পৃথক্ উক্ত হইয়াছে) যাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ কর্ম্ম আরম্ভ করে (তাহাই প্রয়োজন)। সেই এই প্রয়োজন কর্তৃক সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বকর্ম্ম এবং সর্ব্ববিজ্ঞা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনশূন্য কিছুই নাই। এবং “তদাশ্রয়” হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজনের আশ্রিত হইয়া “জ্ঞায়” প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ প্রয়োজন ‘জ্ঞান’ ব্যতীত কোথায়ও জ্ঞানপ্রবৃত্তি হয় না।

টীকানী। “সংশয়ের” পরে “প্রয়োজন” পৃথক্ উক্ত হইয়াছে কেন, এতদন্তরে ভাষ্যকার “প্রয়োজনে”র স্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সনত্তই প্রয়োজনবাপ্ত, প্রয়োজনশূন্য কিছুই নাই; সর্ব্ববিদ্যা এবং সর্ব্ব কর্ম্ম যখন প্রয়োজনবাপ্ত, তখন সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্ব কর্ম্মের উপায় এই জ্ঞানবিদ্যার “প্রয়োজন” বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য। পরন্তু “প্রয়োজন”ও সংশয়ের ন্যায় “ন্যারে”র অঙ্গ। প্রয়োজন না বৃথিলে জ্ঞানপ্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং জ্ঞানবিজ্ঞান প্রয়োজন বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য, তাই তাহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। ভাষ্যে “তদাশ্রয়শ্চ” এখানে “তৎপ্রয়োজনং আশ্রয়ো যন্ত” এইরূপে বহুব্রীহি সমাসে উহার অর্থ “তদাশ্রিত”। উদ্যোক্তকর বলিয়াছেন—“যেমন পণ্ডিত রাজাশ্রিত, তদ্রূপ জ্ঞান প্রয়োজনের আশ্রিত। প্রয়োজনের আশ্রয় বলিয়াছেন—উপকারকত্ব। প্রয়োজনজ্ঞানের আশ্রয় অর্থাৎ উপকারক কেন? এতদন্তরে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা বস্তু পরীক্ষার মূলই প্রয়োজন। “প্রযুক্তাতেহনেন”, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বুঝা যায়, বাহ্য জীবের প্রবৃত্তির প্রযোজক, তাহাই প্রয়োজন। ভাষ্যকার গ্রন্থমতে: “প্রয়োজন” শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি সূচনার সহিত প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহারই ফলিতার্থ বর্ণন করিয়া পুনর্জ্যোত্স্না করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে প্রাণ্য পদার্থের জ্ঞান তাক্স্য পদার্থও “প্রয়োজন”। কারণ, তাক্স্য পদার্থকে ত্যাগ করিবার জন্তও জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, সুতরাং প্রাণ্য পদার্থের জ্ঞান তাক্স্য পদার্থও কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রযোজক। এইরূপ প্রবৃত্তির প্রযোজককেই তিনি প্রয়োজন বলিয়াছেন। কারণ, “প্রয়োজন” শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। এই



জন্তই ভাষ্যকার আদিভাষ্যে তাজ্য পদার্থকেও “অর্থ” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। তাজ্য পদার্থও “ত্যাগ” করিবার জন্ত অর্থমান হয়, সুতরাং তাহাও “অর্থ”।

মহর্ষি-কথিত আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার “প্রমেয়ে”র মধ্যে অনেক “প্রয়োজন” পদার্থ বলা হইয়াছে, পরম প্রয়োজন “অপবর্গ”ও তাহার মধ্যে বলা হইয়াছে। সুখ প্রভৃতি প্রয়োজন পদার্থ বিশেষ কারণে তাহার মধ্যে বলা না হইলেও সেগুলিও প্রয়োজন বলিয়া মহর্ষির স্বীকৃত। সুতরাং সামান্ত প্রমেয়ের মধ্যে সেগুলি থাকার সামান্ততঃ প্রয়োজন পদার্থ প্রমেয়ে অন্তর্ভূত, ইহা বলা হইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে ঐ অন্তর্ভাব ও পৃথক্ উক্তিবোধক কোন সন্দর্ভ না বলিলেও তাহার বক্তব্য চিন্তা করিয়া তাহা এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, এখানে ভাষ্যকারের অজ্ঞাত হানের দ্বায় পৃথক্ উক্তিবোধক সন্দর্ভ ছিল। সে পাঠ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুধীগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন।

ভাষ্য। কঃ পুনরয়ং শ্রায়ঃ ? প্রমানেণরর্থপরীক্ষণং শ্রায়ঃ, প্রত্যক্ষা-  
গমাপ্রিতমশ্রুমানং, সাহস্রীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাত্মানীক্ষিতস্যাহস্রীক্ষণমস্বীক্ষা,  
তয়া প্রবর্তত ইত্যাহস্রীক্ষিকী, শ্রায়বিজ্ঞা শ্রায়শাস্ত্রং। যৎ পুনরশ্রুমানং  
প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং শ্রায়াত্মাসঃ স ইতি।

অনুবাদ। ( প্রশ্ন ) এই শ্রায় কি ? অর্থাৎ পূর্বের সংশয় ও প্রয়োজনকে যে  
শ্রায়ের অঙ্গ বলা হইয়াছে, সে শ্রায় কাহাকে বলে ? ( উত্তর ) সমস্ত প্রমাণের দ্বারা  
অর্থাৎ সর্বপ্রমাণমূলক প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের অর্থাৎ সাধা  
সাধন হেতুপদার্থের পরীক্ষা শ্রায়। কলিতার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী  
অনুমান প্রমাণ, অর্থাৎ ঐরূপ অনুমান প্রমাণই পূর্বের “শ্রায়” নামে কথিত হইয়াছে।  
তাহা “অস্বীক্ষা,” অর্থাৎ ঐরূপ অনুমানকেই অস্বীক্ষা বলে। প্রত্যক্ষ ও আগম-  
প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের অস্বীক্ষণ অস্বীক্ষা, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা  
কোন পদার্থকে বুঝিয়া পরে যে অনুমানের দ্বারা আবার তাহাকে বুঝা হয়, সেই  
অনুমানপ্রমাণকে “অস্বীক্ষা” বলা যায়। সেই অস্বীক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধে  
সমস্ত জ্ঞাতব্য বর্ণনার জন্ত প্রবৃত্ত ( প্রকাশিত ) হইয়াছে, এ জন্ত “আস্বীক্ষিকী”  
“শ্রায়বিজ্ঞা,” “শ্রায়শাস্ত্র,” অর্থাৎ পূর্বোক্ত অস্বীক্ষা বা শ্রায়ের নিমিত্ত প্রকাশিত  
হইয়াছে বলিয়াই এই বিজ্ঞাকে “আস্বীক্ষিকা” বলে, “শ্রায়বিজ্ঞা” বলে, “শ্রায়শাস্ত্র”  
বলে। যাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ অথবা শব্দপ্রমাণের বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা শ্রায়াত্মস  
( অর্থাৎ তাহা শ্রায় নহে )।

টিপ্পনী। অনুমান প্রমাণ সামান্ততঃ দ্বিবিধ; স্বার্থ এবং পরার্থ;—যেখানে নিজে বুঝিবার  
জন্য অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, সেই অনুমান স্বার্থ; যেখানে প্রতিবাদীকে নিজের মতটি

বুঝাইবার জন্য অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, সেই অনুমান পরার্থ। এই পরার্থানুসারে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা নিজের মতের প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে। যেমন কোন বাদী পক্ষতে বহি আছে, ইহা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিবাদীকে বুঝাইতে গেলে প্রথমে বলিবেন—(১) “পক্ষতো বহিমান্” অর্থাৎ পক্ষতে বহি আছে, বাদীর এই বাক্যের নাম “প্রতিজ্ঞা”। তাহার পরে ঐ বাক্যার্থ সমর্থনের জন্য হেতুবাক্য বলিবেন (২) “ধূমাৎ” অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূম ইহার হেতু। বাদীর এই বাক্যের নাম “হেতু”। তাহার পরে বিশিষ্ট ধূম থাকিলেই যে সেখানে বহি থাকে, ইহা বুঝাইতে তৃতীয় বাক্য বলিবেন (৩) “যো নো ধূমান্ স বহিমান্ বথা মহানসং” অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি থাকে, যেমন পাকগৃহ। বাদীর এই বাক্যটির নাম “উদাহরণ”। তাহার পরে ঐরূপ ধূম যে পক্ষতে আছে, ইহা বুঝাইবার জন্য বাদী চতুর্থ বাক্য বলিবেন (৪) “তথাচ ধূমান্ পক্ষতঃ” অর্থাৎ পক্ষতে সেই প্রকার ধূমবিশিষ্ট। বাদীর এই বাক্যটির নাম “উপনয়ন”। তাহার পরে উপসংহারের দ্বারা পূর্বোক্ত সকল বাক্যের কলিতার্থ বুঝাইবার জন্য বাদী পঞ্চম বাক্য বলিবেন—(৫) “তন্মাত্ৰং ধূমাৎ পক্ষতো বহিমান্” অর্থাৎ অন্তঃপ্রবৃত্ত ধূম হেতুক পক্ষতে বহি আছে ;—বাদীর এই বাক্যের নাম “নিগমন”। ( অবয়ব প্রকরণে ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য )।

স্বার্থানুসারে প্রতিজ্ঞাদি বাক্য-প্রয়োগ নাই। এবং গুরুশিষ্য প্রভৃতির ‘বাদ’-বিচারেও সর্বত্র উহাদিগের প্রয়োগ নাই। ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হইতে পারে ( বাদসূত্র দ্রষ্টব্য )। যথাক্রমে প্রযুক্ত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যসমষ্টিকেও “ন্যায়” বলা হইয়াছে। পরে ভাষ্যকারও তাহা বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য ঐ ত্রায়বাক্যের এক একটি অংশ, এ জন্য উহাদিগকে ন্যায়ের ‘অবয়ব’ বলা হইয়াছে। মহর্ষি গোতম এই ন্যায়ের পাঁচটি ‘অবয়ব’ বলিয়াছেন, এ জন্য গোতমোক্ত ন্যায়কে “পঞ্চাবয়ব” ন্যায় বলে। ভাষ্যকার পূর্বে সংশয় ও প্রয়োজনকে ন্যায়ের অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ ত্রায় বলিতে কি বুঝিব? এইরূপ প্রশ্ন হইবেই ;—এ জন্য ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা হেতু-পরীক্ষাই এখানে ন্যায়। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য নিজে প্রমাণ না হইলেও উহাদিগের মূলে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ আছে। কেন আছে, কিরূপে আছে, ইহা যথাস্থানে ( নিগমনসূত্র-ভাষ্যে ) দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার এখানে “প্রমাণৈঃ” এইরূপ বহুবচনান্ত প্রমাণ শব্দের দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া যে অনুমান প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, তাহাই হেতুর পরীক্ষা। যে হেতুর দ্বারা কোন সাধা সাধন করা হয়, সেই হেতুটি পরীক্ষিত হইলেই তাহার দ্বারা সেখানে সাধাসিদ্ধি হইয়া যায়। পঞ্চাবয়বের দ্বারা সাধার পরীক্ষা অর্থাৎ সাধাসিদ্ধিকে ন্যায় বলিলে কলকেই ন্যায় বলা হয়, তাহাতে সাধা-সিদ্ধি ন্যায়ের ফল হয় না। বস্তুতঃ উহা ন্যায়েরই ফল হইবে, এ জন্য তাৎপর্যটীকাকার এখানে ভাষ্যোক্ত ‘অর্থ’ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন হেতু। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের, কি না—হেতু পদার্থের পরীক্ষাই ন্যায়। সাধাসিদ্ধি তাহার ফল। কোন সাধা সাধনের জন্য



কোন হেতু পরার্থ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত অহুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলে ঐ হেতু পরীক্ষিত হয়। সুতরাং ঐ অহুমান-প্রমাণই হেতুপরীক্ষা এবং উহাই এখানে ন্যায় অর্থাৎ অহুমান প্রমাণরূপ জ্ঞানই পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহাই ভাব্যকারের উক্তরের তাৎপর্যার্থ। সে কিরূপ অহুমান-প্রমাণ ? ইহা বলিতে বহুবচনাত্ম “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়বের কথা বলিয়া ভাব্যকার জানাইয়াছেন যে, যে অহুমান-প্রমাণ বাধিত হয় না, এমন অহুমানই ন্যায়। প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়ব দ্বারা অহুমান প্রদর্শন করিলে সে অহুমান কখনও বাধিত হয় না। কারণ, ঐ পক্ষাবয়বের মূলে সর্বপ্রমাণ থাকে, সুতরাং সেই স্থলীর অহুমান-প্রমাণ অজ্ঞাত প্রমাণের অবিরুদ্ধ হইবেই। তাহা হইলে ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে অহুমান অন্য প্রমাণের অবিরুদ্ধ, তাহাই ন্যায়। যে অহুমানে পক্ষাবয়ব প্রযুক্ত হয়, তাহাই ন্যায়, ইহা বুঝিতে হইবে না, তাহা হইলে গুরুশিষ্যাদির বাদবিচারে যেখানে পক্ষাবয়ব-প্রয়োগ হয় নাই, সেই স্থলীয় অহুমান ন্যায় হইতে পারে না। ভাব্যকার পরেই তাঁহার পূর্বকথার এই কলিতার্থ বা তাৎপর্যার্থ নিজেই বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অহুমান ন্যায়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতুপরীক্ষা বলিতে অহুমান-প্রমাণ বুঝিবে এবং “পক্ষাবয়বের” দ্বারা এই কথা হইতে প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত, এইরূপ তাৎপর্যার্থ বুঝিবে। “প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত” ইহার অর্থ—প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী। উদ্যোতকবও ঐ কথার ঐ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাব্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত জ্ঞানকে “অবীক্ষা”ও বলে। “অহু” শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। বাহার দ্বারা পশ্চাৎ ঈক্ষণ কি না—জ্ঞান হয়, তাহাকে “অবীক্ষা” বলা যায়। যেখানে প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া শেষে বিশেষ জ্ঞানের জন্ত অথবা দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্ত অথবা প্রতিবাদীকে বানাইতে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্তির জন্য অহুমান-প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়, সেখানে ঐ অহুমানকে “অবীক্ষা” বলা যায়। বস্তুতঃ ভাব্যকার “অবীক্ষা” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে, “অবীক্ষা” হইলে তাহা প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অহুমানই হইবে, সুতরাং “অবীক্ষা” শব্দের অর্থও “জ্ঞান”। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সর্বত্র থাকে না; কিন্তু তাহার ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনার দ্বারা প্রকৃতার্থ নির্ণয় করা যায় এবং করিতে হয়। পরন্তু প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়বের মূলে সর্ব প্রমাণ থাকে, ভাব্যকারের এই সিদ্ধান্তানুসারেও ভাব্যকার এখানে “অবীক্ষা” শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে পারেন এবং তদনুসারে তাঁহার পূর্বোক্ত “জ্ঞান”কে “অবীক্ষা” বলিতে পারেন। সর্বত্র অহুমানের পরার্থটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণ দ্বারা পূর্বে বুঝিতে হইবে; নচেৎ সেখানে অহুমান “অবীক্ষা” হইবে না, ইহা কিন্তু ভাব্যকারের তাৎপর্য নহে। ঐ কথার দ্বারাও তাৎপর্যার্থ বুঝিতে হইবে যে, বাহ্য প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অহুমান, অর্থাৎ বাহ্যকে পূর্বে “জ্ঞান” বলিয়াছি, তাহাকেই “অবীক্ষা” বলে। ভাব্যকার “আবীক্ষিকী” শব্দের দ্বারা যে এই জ্ঞান-বিদ্যাকে বুঝা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে, ইহা বলিবার জন্তই শেষে “অবীক্ষার” কথা তুলিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত জ্ঞানকেই “অবীক্ষা” বলিয়াছেন, ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা

করিয়া “অবীক্ষা” শব্দের পূর্বোক্ত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং পূর্বোক্ত “জ্ঞান”ই ভাষাকারের মতে “অবীক্ষা” শব্দের প্রকৃতার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা “জ্ঞান”, তাহাই “অবীক্ষা” এবং তাহাই “পরীক্ষা” বা হেতুপরীক্ষা, এখানে এ সবগুলিই একার্থ, ইহাই ভাষাকারের কথা। পূর্বোক্ত অহুমানরূপ নামকেই “অবীক্ষা” বলে এবং ঐ অবীক্ষার নির্বাহক শার বলিয়াই জ্ঞানশাস্ত্রকে “আবীক্ষিকী” বলে, “ন্যায়বিদ্যা” বলে। কোষকার অমর সিংহও বলিয়াছেন—“আবীক্ষিকী তর্কবিদ্যা”। “তর্ক” শব্দও পূর্বোক্ত “ন্যায়” অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাষাকার যে প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণের অবিরুদ্ধ অহুমানকেই পূর্বে “ন্যায়” বলিয়াছেন, “অবীক্ষা” বলিয়াছেন, ইহা তিনি শেষে সুস্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ভাষাকারের শেষ কথাটি এই যে, যে অহুমান প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ, তাহা “ন্যায়ভাস”। যাহা “ন্যায়” নহে, কিন্তু ন্যায়সদৃশ, ন্যায়ের মত প্রতীত হয়, তাহাই “ন্যায়ভাস” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষাকার তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অহুমানই “জ্ঞানভাস”। সেখানেও ভ্রম অহুমিতি হয়, এ জ্ঞান তাহাতেও “অহুমান” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বার্থ অহুমিতি জন্মায় না, এ জন্য তাহা প্রমাণ নহে, সুতরাং তাহা “ন্যায়”ও হইবে না, তাহার নাম “ন্যায়ভাস”। ভাষাকারের এই শেষ কথার দ্বারা তিনি যে প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অহুমানকেই পূর্বে “ন্যায়” বলিয়াছেন, ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরোধ নিজে বুঝিলে বা কেহ বুঝাইয়া দিলে “ন্যায়ভাস” স্থলে আর অহুমিতিই জন্মে না, কিন্তু তৎপূর্বে ভ্রম অহুমিতি হইয়া থাকে, তখনও সেই অহুমান “ন্যায়ভাস”। বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অহুমান, তাহা সকল অবস্থাতেই “ন্যায়ভাস”। বাদী ও প্রতিবাদীর অহুমানদ্বয়ের মধ্যে একটি হইবে “ন্যায়”, অপরটি হইবে “ন্যায়ভাস”। দুইটি অহুমানই কখনও প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ হইয়া একেবারে নির্দোষ হইতে পারে না। কারণ, দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম কখনও একাধারে প্রমাণসিদ্ধ হইবে না, সুতরাং উভয় পক্ষের অহুমানের মধ্যে একটি বস্তুতঃ “ন্যায়ভাস”ই হইবে, একটি ন্যায় হইবে; প্রকৃত মতান্তর তাহা বুঝাইয়া দিবেন। মতান্তরের মতান্তরসারেই সেখানে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে। বাদ-বিচারে মতান্তর আবশ্যক হয় না। সেখানে গুরুপ্রভৃতি বিচারকই উহা বুঝাইয়া দিবেন। মূল কথা, কেহ বুঝাইয়া না দিলেও এবং নিজে বুঝিতে না পারিলেও বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অহুমান, তাহা কোন দিনই “ন্যায়” হইবে না, তাহা “ন্যায়ভাস”। এখন এই “জ্ঞানভাসের” উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কেহ অগ্নিকে অহুক্ষ বলিয়া বুঝাইবার জন্ত যদি বলেন—“বহিরহুক্ষঃ কার্যদ্ব্যং” অর্থাৎ অগ্নি যখন কার্য্য, তখন তাহা উষ্ণ নহে, যাহা যাহা কার্য্য অর্থাৎ জন্ত পদার্থ, সে সমস্তই অহুক্ষ, যেমন জ্বলাদি, সুতরাং অগ্নিও কার্য্য বলিয়া উষ্ণ নহে—অহুক্ষ। এখানে এই অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলিয়া “জ্ঞানভাস”। অগ্নির উষ্ণতা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে সমস্ত কারণে ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই দূরত্বাদি কোন দোষ ঐ স্থলে নাই। সুতরাং ঐ স্থলে অগ্নিস্থিরের দ্বারা অগ্নির উষ্ণতা-বিষয়ে বার্থ প্রত্যক্ষই জন্মে, প্রতিবাদীও ইহা



অস্বীকার করিতে পারেন না, অধ্বিন্শর্শে হস্তদাহ তাঁহারও হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ। সুতরাং উহা “জ্ঞান” নহে—উহা “জ্ঞানভান”। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অহুমান হইতে প্রবল বলিয়া অহুমানকে বাহ্যত করে। আপত্তি হইতে পারে যে, কোন স্থলে অহুমান-প্রমাণের দ্বারাও ত প্রত্যক্ষ বাধিত হয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অহুমান হইতে প্রবল বলা যায় কিরূপে? যেমন আমরা আকাশে চন্দ্ৰের যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ করি, গণিতের সাহায্যে অহুমান প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, চন্দ্ৰের পরিমাণ ঐরূপ নহে, চন্দ্ৰের পরিমাণ উহা হইতে অনেক বড়; সুতরাং ঐ স্থলে প্রত্যক্ষই অহুমানের দ্বারা বাধিত হয়, প্রাচীনগণও গ্রন্থান্তরে ঐরূপ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, দূরত্ব-দোষবশতঃ চন্দ্ৰের পরিমাণ-বিষয়ে আমাদের যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অহুমান-প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না। চন্দ্ৰের একটা পরিমাণ আছে, এই প্রত্যক্ষ যথার্থই হয়, কিন্তু আমরা তাহা দূরত্ববশতঃ যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভ্রমই করি। দূরত্বাদি দোষবশতঃ প্রত্যক্ষ ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা সর্বসম্মত। সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায়—অহুমান প্রবল হইবেই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকটে অহুমান চিরকালই হুর্দ্বল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অহুমানকে চিরকালই বাহ্যত করে, সর্বত্রই বাহ্যত করে, এই কথাই বলা হইয়াছে। আমরা দেখকে আত্মা বলিয়া যে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভ্রম। কেন ভ্রম, তাহা বুঝিবার অনেক উপায় আছে, সুতরাং ঐ স্থলে অহুমানাদি প্রমাণ প্রবল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলে তাহা অহুমানাদি হইতে প্রবল। বহুিতে উচ্চতার প্রত্যক্ষ উভয় মতেই যথার্থ, সুতরাং ঐ স্থলে অহুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ার “জ্ঞানভান” হইবে। এখানে আর একটি আপত্তি এই যে, বাদী অগ্নিতে অহুক্ষতার অহুমান করিতে হেতু বলিয়াছেন—কার্য্যত্ব। কার্য্যত্ব অহুক্ষতার ব্যভিচারী অর্থাৎ কাণ্ডাত্মক থাকিলেই তাহা অহুক্ষ হইবে, এমন নিয়ম নাই; সুতরাং বাদী ঐরূপ অহুমান বলিতেই পারেন না, উহাতে প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষ প্রদর্শন অনাবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রকৃতি এই কথা লইয়া বহু বিচার করিয়াছেন। ত্রাহাদিগের শেষ কথা এই যে, যদিও এখানে কার্য্যত্ব হেতু ব্যভিচারী, কারণ, অগ্নি বা ঐরূপ তেজঃপদার্থে কার্য্যত্ব থাকিলেও অহুক্ষতা নাই—ইহা সত্য; কিন্তু যত বেলা ঐ প্রত্যক্ষ-বিরোধ প্রদর্শন না করা যাইবে, তত বেলা বাদীকে ঐ ব্যভিচার মানান যাইবে না। বাদী বলিবেন—আমি অগ্নি ও ঐরূপ তেজঃপদার্থে অহুক্ষতা স্বীকারই করি, ব্যভিচার কোথায়? সুতরাং প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষই প্রথমে দেখাইতে হইবে। অর্থাৎ ঐ কার্য্যত্ব হেতু ঐ স্থলে হেতু নহে, উহা “বাধিত” নামক হেতুভান, ইহাই প্রথমে বলিতে হইবে, তাহার দ্বারা ঐ অহুমান দূষিত হইলে আর শেষে ব্যভিচার প্রদর্শন করা অনাবশ্যক, এ জ্ঞান তাহা আর করা হয় না, প্রত্যক্ষ-বিরোধই দেখান হয়। উদয়নাচার্য্য এই সকল কথা উপসংহারে “তাৎপর্য্যপরিভুক্তি”তে বলিয়াছেন—“নহি মূর্ত্যোপি মার্য্যতে”। প্রত্যক্ষ বিরোধের দ্বারা ঐ অহুমান বাহ্যত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার ব্যভিচার প্রদর্শন অনাবশ্যক। মৃতকেও আবার কে মারিতে যায়?

সুবিধাভ্যন্ত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিগ্‌নাগ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অহুমানের পূর্বোক্ত উদাহরণ ঠিক হয় না বলিয়া অন্ত একটা উদাহরণ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“অশ্রাবণঃ শব্দঃ কার্যাব্যং ঘটাদিবৎ” অর্থাৎ কেহ যদি অহুমান করেন যে, শব্দ অশ্রাব্য, যেহেতু শব্দ কার্য, যেমন ঘটাদি, তাহা হইলে ঐ স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। দিগ্‌নাগের অভিপ্রায় এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; যিনি ঐরূপ অহুমান করিবেন, তিনিও শব্দ শ্রবণ করেন, তিনিও প্রতিবাদীর কথা এবং নিজের কথাগুলি তখনও গুণিতেছেন, সুতরাং শব্দকে অশ্রাব্য বলিয়া অহুমান করিতে তিনি পারেন না, ঐ স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। “স্তায়বাবৃত্তিকে” উদ্যোতকর এবং “লৌকবাবৃত্তিকে” ভট্ট কুমারিণ দিগ্‌নাগের প্রদর্শিত এই উদাহরণকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার বলিয়াছেন যে, শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও তাহার শ্রাব্যতা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে? শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধবিশেষই শব্দের শ্রাব্যতা, ঐ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ শ্রাব্যতার প্রত্যক্ষ হয় না। শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ না হইলে অশ্রাব্যতার অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাকে অহুমান করা হইবে, তাহারই অভাব যদি সেখানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয়, তবেই সেই স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলা যায়। দিগ্‌নাগের প্রদর্শিত স্থলে শব্দের অভাব অহুমানের নহে। সুতরাং শব্দ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও শব্দের অশ্রাব্যতার অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না, উহা অন্ত প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইবে। বহিতে উক্ষয় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং তাহাতে উক্ষয়ের অভাব অহুমান করিতে গেলে, তাহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অহুমান হইবে। অতএব পূর্বোক্ত সেই স্থলীয় অহুমানই প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অহুমানের উদাহরণ; ঐরূপ অন্ত স্থলেও উহার উদাহরণ দেখিবে। দিগ্‌নাগের প্রদর্শিত উদাহরণ ভ্রম-কল্পিত, উহা ঠিক নহে।

মনে হয়, দিগ্‌নাগ শ্রাব্যতাকে প্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়াই ঐরূপ উদাহরণ বলিয়াছিলেন। শব্দগত “জ্ঞাতি”বিশেষই শ্রাব্যতা, অথবা ঐরূপ জ্ঞাতি না মানিলে শ্রবণেন্দ্রিয়-জ্ঞাত প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রবণই শ্রাব্যতা, “শব্দকে শ্রবণ করিতেছি” এইরূপে ঐ শ্রবণ মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ নহে। কিন্তু তাৎপর্যটাকাকার কাত্যায়নের হত্র উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, “শ্রাব্যতা” বলিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয়, তখন তাহার সম্বন্ধও অতীন্দ্রিয় হইবে, সুতরাং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধরূপ শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে,—এই অভিপ্রায়েই উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতীন্দ্রিয়, অতএব ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে। এখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দরূপ বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষকেই উদ্যোতকর ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলিয়াছেন।

শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অহুমান, যথা—

কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন—“নরশিরঃ কাপালং তুটি, প্রাণাঙ্গভাৎ, শব্দাবৎ”, অর্থাৎ মরা



মানুষের মাথার খুলি পবিত্র, যেহেতু তাহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শব্দ। কাপালিকের তাৎপর্য এই যে, শব্দ যেমন মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইয়াও সর্বমতেই শুচি, তজ্জপ মরা মানুষের মাথার খুলিও শুচি। কারণ, তাহাও প্রাণীর অঙ্গ। উদ্যোতকের পূর্ব হইতেই কাপালিক সম্প্রদায় এইরূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন, তাহারাও নিজ মতানুসারে প্রমাণাদি অবলম্বনে বিচারপটু ছিলেন, ইহা উদ্যোতকের কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

দৃশ্যশ্রুত কাপালিকের মরা মানুষের মাথার খুলিকে শুচি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এত আগ্রহ কেন? তাহার শুচিত্ব-বিষয়ে এত দৃঢ় বিশ্বাসই বা কেন? এতজ্ঞের কাপালিকগণ বাহা বলিতেন, তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কাপালিকগণ বৈদিক সম্প্রদায়কে বলিতেন যে, কেবল শাস্ত্র হইতেই ধর্মাদি নির্ণয় হয় না, অনিন্দিত আচার হইতেও ধর্মাদি নির্ণয় হয়, ইহা তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক। তোমাদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যদিগের যেমন “আত্মনৈবুক” প্রভৃতি কথ্য অনিন্দিত আচার বলিয়া শ্রেয়স্কররূপে অহুষ্ঠিত হয়, উহা তাহাদিগের অনিন্দিত আচার বলিয়াই ধর্ম বলা হয়, তজ্জপ আমাদিগেরও মরা মানুষের মাথার খুলিতে পান-ভোজনাদি ব্যবহার-পরম্পরা অনিন্দিত আচার বলিয়া উহাতে আমরা প্রত্যবার মনে করি না, পরন্তু উহা আমাদিগের ধর্ম। উদয়নাচার্য্য “তাৎপর্য্যপরিভূক্তি”তে এখানে বলিয়াছেন যে, যদি বৈদিক সম্প্রদায় বলেন যে, বাহা সার্বজনিক ব্যবহার, তাহা প্রমাণ হইতে পারে—যেমন কন্ডাবিবাহে পুরস্বীকরণের আচার। কিন্তু দেশবিশেষে তোমাদিগের অহুষ্ঠিত আচার প্রমাণ হইবে কেন? এই জন্তই কাপালিকগণ দাক্ষিণাত্যদিগের আচারকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচার যেমন সার্বজনিক না হইয়াও অনিন্দিত আচার বলিয়া ধর্ম, তজ্জপ আমাদিগের ঐ আচারও অনিন্দিত বলিয়া ধর্ম। আমাদিগের আচারকে নিন্দিত বলিলে দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচারকেও আমরা নিন্দিত বলিব, উহা নিন্দিত বলে, এমন লোক আরও খুঁজিলে মিলিবে, সুতরাং আমাদিগের আচারকে নিন্দিত বলিতে বাইরা লাভ হইবে না। দাক্ষিণাত্যদিগের “আত্মনৈবুক” কথ্য কি? এ সম্বন্ধে “তাৎপর্য্যপরিভূক্তি”র “প্রকাশ” টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—“কেহ বলেন, গোময়ময়ী দেবতা গঠন করিয়া দুর্গাদির দ্বারা অর্চনা পূর্বক তাহাতে জাতিভেদ কল্পনাই দাক্ষিণাত্যদিগের “আত্মনৈবুক”। কেহ বলেন,—মঙ্গল বারে দধি মছনা কেহ বলেন,—এক মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া ততুল কোন ভাণ্ডে তুলিয়া রাখিয়া মাসান্তে তদ্বারা দ্রুতযোগে একখানা পিষ্টক নির্মাণ করিয়া তদ্বারা দেবতার পূজা করাই দাক্ষিণাত্যদিগের “আত্মনৈবুক”। ফল কথা, মৈথিল বর্দ্ধমানও দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচারটা কি, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া বাইতে পারেন নাই। “জৈমিনীয় ঞ্জায়মালাবিস্তরে” “হোলাকাধিকরণে” পাওয়া যায় যে, করজক প্রভৃতি স্বাবর দেবতার পূজাই “আত্মনৈবুক”। এই সব কথাগুলি চিন্তাশীল অমুসন্ধি-ভ্রর ভাবিবার বিষয় বলিয়াই লিখিত হইল।

এবন প্রকৃত কথা এই যে, কাপালিকগণের পূর্বোক্ত অহুমান শ্রুতিমূলক মবাদিশ্রুতি<sup>১</sup>রূপ শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া “ত্ৰাহাভাস”। মরা মাহুকের মাথার খুলির অস্তচিহ্নই শাস্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারাই তাহার শুচিহ্নের অহুমান হইবে না। কেহ উহাতে অহুমান প্রদর্শন করিলে তাহা হইবে “ত্ৰাহাভাস”। কাপালিকগণ বলিতেন যে, আমরা শ্রুতিশ্রুতি প্রভৃতি কোন প্রমাণ মানি না, আমরা আনাদিগের শাস্ত্রকেই প্রমাণ বলিয়া মানি। এতদ্বত্ত্বের বৈদিক সম্প্রদায় কাপালিকদিগের শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থন এবং শ্রুতিশ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতেন। উত্তোতকর এখানে শেষে বলিয়াছেন যে, মরা মাহুকের মাথার খুলিকে যদি তোমরা শুচি বল, তবে অস্তচি বলিবে কাহাকে? বিষ্ঠা প্রভৃতির অস্তচিহ্ন ত আমাদিগের শ্রুতি শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধ, তোমরা ত সে সকল শাস্ত্র মানি না। যদি বল, অস্তচি কিছুই নাই, আমরা সবই শুচি বলি, তাহা হইলে তদ্বিবরে প্রমাণ কি বলিবে? যদি অহুমান-প্রমাণের দ্বারাই সমস্ত পদার্থের শুচিহ্ন সাধন কর, তবে দৃষ্টান্ত বলিবে কাহাকে? গোময়, শম্ব প্রভৃতিকে দৃষ্টান্ত বলিতে পার না, কারণ, তাহাদিগের শুচিহ্ন বিবরে প্রমাণ দিতে হইবে। তদ্বিবরে শ্রুতিশ্রুতি প্রভৃতি বাহ্য প্রমাণ আছে, তাহা ত তোমরা মানি না। কলকথা, সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া অহুমান করিতে গেলে তৎপূর্বে কোন পদার্থ শুচি বলিয়া উভয় পক্ষের সিদ্ধ থাকে না; কারণ, তুমি যাহা শুচি বলিবে, আমি তাহা অস্তচি বলিয়া বলিব। দৃষ্টান্তট অহুমানের পূর্বে উভয়বাদীর নির্বিবাদ সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ প্রতিবাদীর নিকটে অহুমান প্রদর্শন করা যায় না। কাপালিকগণ যেমন শ্রুতি-শ্রুতি মানেন না, বৈদিক সম্প্রদায় সেইরূপ কাপালিকের শাস্ত্র মানেন না; সুতরাং অহুমানের দ্বারা সমস্ত পদার্থের শুচিহ্ন সাধন করিতে গেলে তৎপূর্বে কোন পদার্থই শুচি বলিয়া উভয়বাদীর নির্বিবাদ সিদ্ধ না থাকায়, কাপালিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন না; সুতরাং তাহার অহুমান প্রদর্শন অসম্ভব।

গল্পেশ্বর “তদ্বচিহ্নামণি”র হেত্ৰাহাভাস-সামাজ-নিরুক্তির “দীধিতি”তে রঘুনাথ শিরোমণি পূর্বোক্ত অহুমানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে ঐরূপ অহুমান হইতেই পারে না। কারণ, ঐ স্থলে ঐ অহুমান অপেক্ষায় বিরোধী শাস্ত্র-প্রমাণ বলবত্তর। বলবত্তর কেন? ইহা বুঝাইতে সেখানে দীধিতির টীকাকার জগদীশ বলিয়াছেন যে, ঐ অহুমানে শুচিহ্নরূপ সাধ্য-প্রসিদ্ধি প্রভৃতি একমাত্র শাস্ত্রের অধীন। সুতরাং ঐ অহুমানটি শাস্ত্রাধীন। তাহা হইলে ঐ অহুমান হইতে শাস্ত্রই সেখানে বলবৎ প্রমাণ। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, অহুমানকারী যে শম্বকে শুচি বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রকেই তিনি প্রথমে আশ্রয় করিয়াছেন। শম্বের শুচিহ্ন তিনি প্রতিবাদীকে শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝাইবেন? প্রতিবাদী যদি বলিয়া বলেন যে, শম্বও মৃত প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া অস্তচি, তাহা হইলে অহুমানকারী শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হইবেন। তাহা হইলে শাস্ত্রই তাহার ঐ অহুমানের মূলভূত। সুতরাং তিনি

১। “নারং শৃঙ্খলার সযেৎ দ্রাঘা বিপ্রো বিস্তৃতি।

আচর্য্যে তু নিঃস্রেহঃ ধারালভ্যাকীকর বা।—মহাসংহিতা, ৭৭।



ঐ স্থলে শাস্ত্রকে বলবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। যদিও অহুমান অপেক্ষার আশ্রয়াকার-  
রূপ শব্দ-প্রমাণ সর্বত্রই প্রবল, কারণ, তাহাতে ভ্রমের সম্ভাবনাই নাই, অহুমানে ভ্রমের সম্ভাবনা  
আছে, তথাপি যিনি তাহা মানেন না, তিনিও পূর্বোক্ত অহুমানে শব্দকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন  
করিতে যখন শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিবেন, তখন তজ্জাতীয় শাস্ত্রান্তরকেও তিনি উপেক্ষা করিতে  
পারেন না। সুতরাং তাহার ঐ অহুমানের মূলভূত শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া মরা মানুষের মাথার  
খুলির অন্তর্ভুক্তবোধক শাস্ত্র তাহার মতেও বলবত্তর, সুতরাং সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ অহুমান  
হইতেই পারে না। এইরূপ অল্পপ্রকার শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ অহুমানও ভ্রাতাভাস হইবে।  
প্রত্যক্ষের দ্বারা শব্দ-প্রমাণও অহুমান অপেক্ষার প্রবল বলিয়া তদ্বিরুদ্ধ অহুমান কখনও ভ্রাস  
হইবে না।

অহুমান-বিরুদ্ধ অহুমানকে ভ্রাতাভাস বলেন নাই কেন? এতদ্ব্যতীত উদ্বোধ-  
ক বলিয়াছেন যে, একত্র দুইটি বিরুদ্ধ অহুমানের সমাবেশ হইতে পারে না, এজ্ঞ অহুমান  
অহুমানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্যাটীকাকার ইহার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে,  
একই সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি বিরুদ্ধ অহুমান হইতে পারে না। কারণ, দুইটি অহুমানই  
যদি তুল্যশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহার কোনটিই অহুমিতি জন্মাইতে পারে না,  
সেখানে উভয় পক্ষের সাধ্য ধর্ম বিষয়ে সংশয়ই জন্মে। সেখানে দুইটি অহুমানই তুল্যশক্তি  
বলিয়া একটি অপরটিকে বাধা দিয়া অহুমিতি জন্মাইতে পারে না। একটি দুর্বল এবং অপরটি  
প্রবল হইলেই প্রবলটি দুর্বলটিকে বাধা দিতে পারে। যেমন প্রত্যাক ও শব্দ-প্রমাণ অহুমান  
অপেক্ষার প্রবল বলিয়া অহুমানকে ব্যাহত করে, সুতরাং সেই স্থলেই অহুমানকে ভ্রাতাভাস  
বলা হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্বোধকরের এইরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়া শেষে  
বলিয়াছেন যে, যদি কোন অহুমান পূর্ববর্তী অল্প অহুমানকে অপেক্ষা করিয়াই উপস্থিত হয়,  
তাহা হইলে সেই স্থলে অহুমান বিরুদ্ধ হইয়াও ভ্রাতাভাস হইতে পারে। যেমন কেহ ঈশ্বরে  
কর্তৃত্বাভাবের অহুমান করিতে গেলে পূর্বে তাহাকে ঈশ্বর-সাধক অহুমান-প্রমাণকে আশ্রয়  
করিতে হইবে, নচেৎ ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অহুমান বলা গাইবে না। যে ধর্ম্মীতে কোন  
ধর্ম্মের অহুমান করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মী অসিদ্ধ হইলে তাহাতে অহুমান হইতে পারে না।  
কেহ আকাশ-কুহুমে গন্ধের অহুমান করিতে পারেন কি? সুতরাং ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের  
অহুমানকারীকে বলিতে হইবে যে, আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন, ইহাই আমার  
সাধ্য। তাহা হইলে ঐ অহুমান অহুমানবিরুদ্ধ বলিয়া ভ্রাতাভাস হইবে। কারণ, ঐ  
অহুমানকারী ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অহুমান করিতে পূর্বে ঈশ্বর-সাধক যে অহুমানকে আশ্রয়  
করিয়াছেন, সেই অহুমান ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছে। ঈশ্বরসাধক অহুমানের  
দ্বারা ঈশ্বরের কর্ত্ত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং ঈশ্বর মানিয়া তাহাতে কর্ত্ত্বাভাবের অহুমানে সেই  
কর্ত্ত্বসাধক অহুমান অপেক্ষিত হওয়ায়, সেই পূর্ববর্তী অহুমান প্রবল, সুতরাং পরবর্তী  
কর্ত্ত্বাভাবের অহুমান তাহার দ্বারা ব্যাহত হইবে। উহা অহুমানবিরুদ্ধ অহুমান হইয়া

জ্ঞানভাস হইবে। ভাষ্যকার কিন্তু ইহা বলেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় ইহাই বলা যায় যে, যদিও ত্রৈকণ কোন স্থল হয়, তাহা হইলে সেখানে শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়াই জ্ঞানভাস হইবে, অমুমান-বিরুদ্ধ বলিয়া আবার অন্য প্রকার জ্ঞানভাস বলিবার কোন প্রয়োজনই নাই। যেমন তাৎপর্যটাকাকারের প্রদর্শিত ঈশ্বরে কর্তৃত্বভাবের অমুমান শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়াতেই জ্ঞানভাস হইতে পারিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—“বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তা,” সুতরাং ঈশ্বরে কর্তৃত্বভাব শ্রুতি-বাধিত। উহার অমুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ।

উপমান প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়াও জ্ঞানভাস হইতে পারে, তবে সেখানে উপমান প্রমাণের মূলীভূত শব্দ-প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতেই জ্ঞানভাস হইবে। উপমান-বিরুদ্ধ বলিয়া আর পৃথক কোন জ্ঞানভাস বলিবার প্রয়োজন না থাকায় ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। উদ্বোতকর প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। জ্ঞানভাস হইলেই হেতুভাস সেখানে হইবেই, এ জন্য মহাবি হেতুভাসের কথাই কেবল বলিয়াছেন, ন্যায়ভাস নাম করিয়া কিছু বলেন নাই। (হেতুভাস-প্রকরণ সষ্টব্য)।

ভাষ্য। তত্র বাদজল্পৌ সপ্রয়োজনৌ বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে। বিতণ্ডয়া প্রবর্তমানো বৈতণ্ডিকঃ। স প্রয়োজনমনুযুক্তো যদি প্রতিপত্ততে, সৌহৃদ্য পক্ষঃ সৌহৃদ্য সিদ্ধান্ত ইতি বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপত্ততে নায়ং লৌকিকো ন পরীক্ষক ইত্যাপত্ততে।

অনুবাদ। সেই (পূর্বোক্ত) জ্ঞানভাসে বাদ ও জল্প (বাদ নামক এবং জল্প নামক বক্ষ্যমাণলক্ষণ বিবিধ বিচার) সপ্রয়োজন, অর্থাৎ বাদ ও জল্পের প্রয়োজন সর্বসিদ্ধ। কিন্তু বিতণ্ডাকে (বিতণ্ডা নামক বক্ষ্যমাণলক্ষণ-বিচারকে) পরীক্ষা করিতেছি;—অর্থাৎ বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকায় বিতণ্ডা সপ্রয়োজন, কি নিস্প্রয়োজন, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করিতেছি।

বিতণ্ডার দ্বারা প্রবর্তমান ব্যক্তি বৈতণ্ডিক, অর্থাৎ যিনি বিতণ্ডা নামক বিচার করেন, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলে। সেই বৈতণ্ডিক যদি (তাঁহার বিতণ্ডার) প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইটি ইহার পক্ষ, সেইটি ইহার সিদ্ধান্ত, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে (নিস্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর মতে) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ ঘাঁহারা বলেন, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ নাই, সুতরাং বিতণ্ডায় স্বপক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, বিতণ্ডা কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডনমাত্র, তাঁহাদিগের মতে যে বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের পক্ষ স্বীকার করেন অর্থাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা নিজেই বলেন, তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না।



আর যদি স্বীকার না করেন অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়াও তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইনি লৌকিকও নহেন, পরীক্ষকও নহেন অর্থাৎ বোদ্ধাও নহেন, বোধয়িতাও নহেন, ইহা আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ বাঁহার স্বপক্ষ নাই, সূত্রাং স্বপক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলিলে সভ্য-সমাজে উন্মত্তের মত উপেক্ষিত হইয়া পড়েন।

উল্লানী। সংশয়ের পরে প্রয়োজনের কথাই চলিতেছে। প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যত্নোক্ত পদার্থগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাষ্যকার বাদ, জয় ও বিতণ্ডার কথা তুলিলেন কেন? ভ্রমবশতঃ এখানে এইরূপ একটা গোল উপস্থিত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। ভাষ্যকার প্রয়োজন ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়াছেন যে, সর্ব সন্দেহ, সর্ব বিজ্ঞা প্রয়োজনবাস্তব, অর্থাৎ নিশ্চয়োজন কিছুই নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের পূর্বে বা সমকালে এক সম্প্রদায় বিতণ্ডাকে নিশ্চয়োজন বলিতেন। যদি বিতণ্ডা বস্তুতঃ নিশ্চয়োজনই হয়, তাহা হইলে সমস্তই সপ্রয়োজন—ভাষ্যকারের এই পূর্বকথা মিথ্যা হয়। এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে বিতণ্ডার নিশ্চয়োজনহ পক্ষের অসম্ভব দেখাইয়া তাহার সপ্রয়োজনহ পক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। কলকথা, “তত্ত্ব বাদজরো” ইত্যাদি ভাষ্য পূর্বোক্ত “প্রয়োজন” ব্যাখ্যারই অঙ্গ। বাদ ও জয়ের প্রয়োজন পরীক্ষা না করিয়া বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা কেন? এই প্রশ্ন নিরাসের জন্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, বাদ ও জয়ের সপ্রয়োজনহ সর্বসম্মত, তাহা বিবাদের কোন বিবাদ নাই। কিন্তু বিতণ্ডার সপ্রয়োজনহ বিষয়ে বিবাদ আছে, সূত্রাং মধ্যস্থগণের সংশয় নিবৃত্তির জন্ত তাহার পরীক্ষা করিতেছি। কেবল তৎ জিজ্ঞাসাবশতঃ গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, তাহার নাম বাদ। জিজ্ঞাসাবশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপনাদি করিয়া যে বিচার করেন, তাহার নাম জয়। জিজ্ঞাসু আত্মপক্ষের সংস্থাপন না করিয়া কেবল পরপক্ষ সংস্থাপনের খণ্ডন করিলে, সেই বিচারের নাম বিতণ্ডা। যথাস্থানে ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিতণ্ডার যখন বৈতণ্ডিকের আত্মপক্ষের সংস্থাপন নাই, তখন বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষই নাই, পক্ষ থাকিলে বৈতণ্ডিক অবশ্য তাহার স্থাপনা করিতেন। তাহার স্থাপন করা হয় না, তাহাকে পক্ষ বলা যায় না। সূত্রাং বলিতে হইবে, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই, বিতণ্ডা কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন মাত্র। বৈতণ্ডিকের যদি স্বপক্ষ না থাকে, তাহা হইলে বিতণ্ডার স্বপক্ষ-সিদ্ধিরূপ প্রয়োজন অসম্ভব। তৎ-নির্ণয় বিতণ্ডার প্রয়োজন হইতে পারে না। কারণ, তৎ নির্ণয় উদ্দেশ্যে বিতণ্ডা করা হয় না, ইহা সর্বসম্মত। বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ না থাকিলে পর-পরাজয় বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, স্বপক্ষ রক্ষার জন্তই পর-পরাজয় আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তাহা করিতে হয়; নিরর্থক বিবেচ-বশতঃ পরপরাজয় বিচারকের প্রয়োজন বলিয়া সভ্য-সমাজ কোন দিনই অহুমোদন করেন না। কেহ নিজের কোন মতসিদ্ধি উদ্দেশ্য না রাখিয়া কেবল পর-পরাজয় বা তর্ক-কণ্ঠন নিবৃত্তি বা প্রতিভা প্রদর্শনের জন্ত বিচার করিলে মধ্যস্থগণ “এ নিরর্থক বিচার,” এই কথাই বলিয়া

থাকেন। সুতরাং যিনি বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষই নাই বলেন, তিনি বাধা হইয়া বিতণ্ডাকে নিশ্চর্যোজন বলিবেন, প্রাচীন কালে এক সম্প্রদায় তাহাই বলিতেন, এ কথা উল্লেখকরও লিখিয়া গিয়াছেন।

আবার বিতণ্ডা শব্দের ( “বিতণ্ডাতে ব্যাহৃত্তে পরপক্ষসাধনমনসা” এইরূপ ) ব্যুৎপত্তি চিত্তা করিলে বিতণ্ডা শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, পরপক্ষ সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বৈতণ্ডিকের বিতণ্ডার প্রয়োজন। এইরূপ অস্ত্রান্ত যুক্তিতে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা অত্র সম্প্রদায় বলিতেন। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবশতঃ বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব সন্দিহ্ব। এ অত্র ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“বিতণ্ডা তু পরীক্ষাতে”। বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব কোন বিবাদ নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। সংশয় বাতীত পরীক্ষার আবশ্যকতা হয় না। বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশয় বুঝিয়া ভাষ্যকার এখানে তাহার পরীক্ষা করিয়া সপ্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এখানে তাহা না করিলে অর্থাৎ বিতণ্ডা নিশ্চর্যোজন নহে, ইহা প্রতিপন্ন না করিলে, সৰ্ব্বকথ্য, সৰ্ব্ববিজ্ঞা সপ্রয়োজন, নিশ্চর্যোজন কিছুই নাই, তাহার এই পূর্বকথায় আপত্তি থাকিয়া যায়—মধ্যস্থগণের সংশয় থাকিয়া যায়।

ভাষ্যের প্রথমে “তত্র” এই কথার ব্যাখ্যায় উল্লেখকর বলিয়াছেন,—“তন্মিন্‌ জ্ঞায়াভাসে”। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অব্যবহিত পূর্বে জ্ঞায়াভাসের কথা থাকাতেই বাস্তবিককার ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞায়েও বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন। বাদ ও জল্প স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর একজনের জ্ঞায়াভাস হইবেই। কারণ, পরস্পর-বিকল্প দুইটি পদার্থ একই আধারে কখনই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং উভয় বাদীর স্থাপনার মধ্যে একটি হইবে জ্ঞায়, একটি হইবে জ্ঞায়াভাস; সুতরাং জ্ঞায়াভাসে বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন, ইহা বলিলে, জ্ঞায়েও বাদ ও জল্পকে সপ্রয়োজন বলা হয়। তাহা হইলে উল্লেখকরের ঐ ব্যাখ্যায় ফলতঃ কোন দোষও হয় নাই।

যাহারা বিতণ্ডাকে নিশ্চর্যোজন বলিতেন, তাহারা বলিতেন যে, বিতণ্ডা শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারাও স্বপক্ষসিদ্ধি বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিলেই স্বপক্ষসিদ্ধি হয় না। কেহ ধূম হেতুর দ্বারা পক্ষান্তে বহি সাধন করিতে গেলে যদি প্রতিবাদী পক্ষতে ধূম নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষ অর্থাৎ পক্ষান্তে বহির অভাব তাহাতে সিদ্ধ হয় না। কারণ, ধূম না থাকিলেও পক্ষান্তে বহি থাকিতে পারে। এইরূপ এবং পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তির দ্বারা যাহারা বিতণ্ডার নিশ্চর্যোজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিতেন, তাৎপর্যটীকাকার তাহাদিগকে “নিশ্চর্যোজন বিতণ্ডাবাদী”—এইরূপ আখ্যায় দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত আছে, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিশ্চর্যোজন বিতণ্ডাবাদীর মতে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। কারণ, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই; সুতরাং বিতণ্ডার স্বপক্ষ-



সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই ত তাঁহাদিগের মত। বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষহীন বিচারকেই তাঁহারা বিতণ্ডা বলেন, সুতরাং যে বৈতণ্ডিক স্বপক্ষ স্বীকার করেন, তিনি আর তাঁহাদিগের মতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিবেন না। যদি বল, তিনি ত অবশ্যই বৈতণ্ডিক হইবেন না, স্বপক্ষ থাকিলে কি আর তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলা যায়? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বৈতণ্ডিক হইবেন কে? যিনি স্বপক্ষ স্বীকার করেন না, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহার স্বপক্ষ না থাকিলে তিনি নিরর্থক বাক্যবিত্তাস করিবেন কেন? যিনি তাহা করেন, তাঁহাকে বোদ্ধা বা বোধবিত্তা কিছুই বলা যায় না। যিনি নিশ্চয়োজনে কথা বলেন, তাঁহাকে কোন বিচারকের সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে না, তিনি সভ্য-সমাজে উন্নতের দ্বারা উপেক্ষিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৈতণ্ডিকগণ যখন ঐক্যে উপেক্ষিত নহেন, তাঁহারা বিচারকের আসনে বসিয়া সম্মানে বিচার করিয়া থাকেন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়োজনে কথা বলেন না, তাঁহাদিগের গৃহভাবে স্বপক্ষ আছেই, ঐ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন এবং সেই স্বপক্ষ রক্ষার জন্তই তাঁহাদিগের পরপরাজয় প্রয়োজন। স্বপক্ষ-সিদ্ধি হউক বা না হউক, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই বৈতণ্ডিক কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডনই করেন, স্বপক্ষের নাশন অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা নিজসিদ্ধান্তটির সংস্থাপন করেন না। সংস্থাপন না করিলে তাহাকে স্বপক্ষ বলা যায় না—এ কথা নিবৃত্তিক; সংস্থাপন না করিলেও যাহা সংস্থাপনের যোগ্য, তাহা স্বপক্ষ হইতে পারে। সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে কি কোন বাদীর পক্ষটিকে তাঁহার স্বপক্ষ বলা হয় না? মূল কথা, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, স্বপক্ষ-সিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, বিতণ্ডা নিশ্চয়োজন নহে। যাহারা বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই বলিতেন, উদ্যোতকরও তাঁহাদিগের মতের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—

“ন দুষণরাজং বিতণ্ডা, কিন্তু অভ্যুপেতা পক্ষং যো ন স্থাপয়তি স বৈতণ্ডিক উচ্যতে”।

ভাবো “সোহস্ত সিদ্ধান্তঃ” এই অংশ “সোহস্ত পক্ষঃ” এই পূর্বকথারই বিবরণ। অর্থাৎ ঐ স্থলে “পক্ষ” শব্দের দ্বারা সিদ্ধান্তই অভিপ্রেত।

ভাষ্য। অথাপি পরপক্ষপ্রতিবেদজ্ঞাপনং প্রয়োজনং ব্রবীতি, এতদপি তাদৃগ্বেব। যো জ্ঞাপয়তি যো জানাতি, যেন জ্ঞাপ্যতে যচ্চ, প্রতিপদ্যতে যদি, তদা বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপদ্যতে, পরপক্ষপ্রতিবেদ-জ্ঞাপনং প্রয়োজনমিত্যেতদস্য বাক্যমনর্থকং ভবতি।

বাক্যসমূহশ্চ স্থাপনাহীনো বিতণ্ডা, তস্য যদ্যভিধেয়ং প্রতিপদ্যতে সোহস্য পক্ষঃ স্থাপনীয়ো ভবতি, অথ ন প্রতিপদ্যতে প্রলাপমাত্রমনর্থকং ভবতি বিতণ্ডাৎ নিবর্ত্তত ইতি।

অনুবাদ। আর যদি ( বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ) পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনকে অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের দোষ প্রদর্শনকে প্রয়োজন বলেন, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ-পক্ষেও পূর্বোক্ত প্রকার দোষ অপরিহার্য। ( কেন, তাহা বুঝাইতেছেন ) যিনি বুঝাইবেন, যিনি বুঝিবেন, বাহার দ্বারা বুঝাইবেন ( এবং ) যাহা বুঝাইবেন অর্থাৎ জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি যদি স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে ( সেই শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক ) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ ঐগুলি স্বীকার করিলে তিনি স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া বসিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজ মতানুসারে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে আর বৈতণ্ডিক বলা গেল না।

আর যদি ( তিনি পূর্বোক্ত চারিটি ) স্বীকার না করেন, ( তাহা হইলে ) ইহার অর্থাৎ শূন্যবাদী বৈতণ্ডিকের ‘পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপন প্রয়োজন,’ এই কথা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ শূন্যবাদী যদি কিছুই না মানেন, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপন করিবেন কিরূপে ? তিনি যে ‘প্রতিষেধ’ বলিয়া কোন পদার্থও মানেন না, তবে তিনি কিসের জ্ঞাপন করিবেন ? যাহা নাই, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শূন্যবাদীর ঐ কথা কেবল কথামাত্র, তাঁহার নিজ মতে ঐ কথা কোন অর্থ হয় না—উহা অনর্থক।

পরন্তু স্থাপনাত্মক অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপনশূন্য বাক্যসমূহ “বিতণ্ডা”। ( শূন্যবাদী ) যদি সেই বিতণ্ডা-বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করেন, ( তাহা হইলে ) সেই প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহার ( শূন্যবাদীর ) “পক্ষ” অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হওয়ায় স্থাপনীয় হয়। অর্থাৎ বিতণ্ডাবাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ বা নিজ সিদ্ধান্ত বলিতেই হইবে। প্রতিবাদী তাহা না মানিলে বৈতণ্ডিককে তাহার সংস্থাপনও করিতে হইবে, সুতরাং শূন্যবাদী তাঁহার বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করিলে স্বপক্ষ স্বীকার করায় তাঁহার নিজের মতে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না।

আর যদি ( তিনি বিতণ্ডা-বাক্যের প্রতিপাদ্য ) স্বীকার না করেন, ( তাহা হইলে তাঁহার কথা ) প্রলাপমাত্র অনর্থক হয়, ( তাঁহার কথাগুলির ) বিতণ্ডাও নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাহার কোন প্রতিপাদ্য নাই, তাহা বাক্যই হয় না, বাক্য না হইলেও তাহা বিতণ্ডা হইতে পারে না, প্রতিপাদ্যহীন কথা প্রলাপমাত্র, তাহার কোন অর্থ নাই



টিপ্পনী। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শূন্যবাদী নামে এক সম্প্রদায় ছিলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে মাধ্যমিক শূন্যবাদের উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং উহাই বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত বলিয়া পরবর্তী অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। বুদ্ধদেবের শূন্যবাদের প্রকৃত মর্ম বাহাই হউক, ভট্ট কুমারিল, বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধমতবিশ্বংসী আচার্য্য-গণ মাধ্যমিকের শূন্যবাদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাহাকে প্রমেয় বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ নাই। কারণ, কোন পদার্থকেই সং বলা যায় না। কারণ, যদি সং হইত, তাহা হইলে চিরকালই থাকিত, একরূপই থাকিত। আবার অসংও বলা যায় না, কারণ, প্রতীতি হইতেছে, অসত্তের প্রতীতি হইতে পারে না। আবার সংও বটে, অসংও বটে—ইহাও অর্থাৎ সং ও অসং এই উভয় প্রকারও বলা যায় না। কারণ, ঐ উভয় রূপ বিরুদ্ধ। সং হইলে তাহা অসং হইতে পারে না, অসং হইলেও সং হইতে পারে না। আবার সংও নহে, অসংও নহে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার, ইহাও বলা যায় না। কারণ, সং না হইলে অসং হইবে, অসং না হইলে সং হইবে। সংও নহে, অসংও নহে—এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রতীতিও হইতে পারিত না। ফলতঃ এই চতুর্নিধ প্রকারই বিচারসহ নহে। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকারও নাই। সুতরাং বখন অপর সম্প্রদায়-সম্মত প্রমেয় সর্বপ্রকারেই বিচারসহ নহে অর্থাৎ বিচারে টিকে না, তখন প্রমেয় নাই। এতাদৃশ শূন্যবাদীর কোন পক্ষও নাই, স্থাপনাও নাই। কারণ, তিনি কিছুই মানেন নাই, তিনি পরপক্ষ প্রতিবেদ জ্ঞাপনের জন্তই বিচার করিয়াছেন। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা ভিন্ন আর কোনরূপ বিচার অন্য সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। কেহ বিচার করিতে আসিলে এই ত্রিবিধ বিচারের কোন বিচারই করিতে হইবে, নচেৎ প্রাচীন কালে বিচার গ্রাহ্য হইত না। সুতরাং শূন্যবাদী নিজেকে বৈতণ্ডিক বলিয়া পরিচয় দিয়াই বিচার করিতে আসিতেন এবং স্বপক্ষহীন বিচারকেই বিতণ্ডা বলিতেন। বিতণ্ডার স্বপক্ষ থাকা প্রয়োজন হইলে, শূন্যবাদীর বিচার বিতণ্ডা হইতে পারে না, বাদ ও জল্প হওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। এ জন্ত শূন্যবাদী অন্য সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতণ্ডিকরূপে গৃহীত হইবার জন্ত বিতণ্ডার লক্ষণ ঐরূপই প্রতিপন্ন করিতেন। মহর্ষি গোতমের বিতণ্ডা-লক্ষণস্থলেও স্থাপনা শব্দ নিরর্থক বলিতেন। ( ১ অং, ২ অং, ৩ সূত্র দ্রষ্টব্য )।

ফলকথা, শূন্যবাদী বলিতেন যে, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই, সুতরাং স্বপক্ষ-সিদ্ধি বিতণ্ডার প্রয়োজন হইতেই পারে না। তবে নিপ্রয়োজন কিছুই নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করি; পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন। পরের পক্ষটি প্রতিবদ্ধ, পরপক্ষের সাধন দূষিত, ইহা পরকে এবং মধ্যস্থদিগকে বুঝানই বৈতণ্ডিকের উদ্দেশ্য।

ভাষ্যকার এই শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ কথা ঠিক পূর্বের কথা না হইলেও সেইরূপই হইয়াছে। কারণ, শূন্যবাদী যদি পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনের জন্ত বিতণ্ডা করেন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি

এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি মানিবেন কি না ? তাহা মানিলে ঐগুলি তাঁহার স্বপক্ষ বা স্বসিদ্ধান্ত-রূপে গণ্য হইল, পরপক্ষ-প্রতিবেদ বাহা তাঁহার জ্ঞাপ্য, তাহা জানাইতে আর বাহা আবশ্যক, তাহাও স্বসিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত হওয়ার পক্ষমধ্যে গণ্য হইল ; সুতরাং তিনি তাঁহার নিজস্বত্বে বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন । “বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন” বলিতে তাহাতে তাঁহার নিজস্বত্বত বৈতণ্ডিকের লক্ষণ থাকিল না ; কারণ, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ থাকিলে শূন্যবাদী তাহাকে ত বৈতণ্ডিক বলেন না, তিনি নিজে স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া বসিলে আর বৈতণ্ডিক হইবেন কিরূপে ? এবং তাঁহার শূন্যবাদই বা থাকিবে কিরূপে ?

আর যদি শূন্যবাদী পূর্বোক্ত দোষ-ভয়ে বলেন যে, আমি জ্ঞাপক প্রভৃতি স্বীকার করি না, আমি কিছুই মানি না, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনই তাঁহার প্রয়োজন, এ কথা তিনি বলিতে পারেন না, ঐ কথা উন্নতপ্রলাপ হইয়া পড়ে । কারণ, প্রথমতঃ কোন বাদী বৈতণ্ডিকের নিকটে ‘এই সাধ্য, এই পক্ষাবয়ব বাক্যের দ্বারা আমি জ্ঞাপন করিতেছি,’ এই ভাবে জ্ঞাপন করিলে, বৈতণ্ডিক সেই জ্ঞাপক ব্যক্তি এবং তাঁহার জ্ঞাপ্য পদার্থ এবং জ্ঞাপনের সাধন পক্ষাবয়ব প্রভৃতি বুঝিয়াই তাহার খণ্ডন করিয়া থাকেন । বৈতণ্ডিক সেখানে ঐগুলি না বুঝিলে অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা না হইলে পরপক্ষ প্রতিবেদ জ্ঞাপন তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে না । আবার তাঁহার নিজের জ্ঞাপ্য যে পরপক্ষ-প্রতিবেদ, তাহাও যদি তিনি না মানেন, তবে তিনি কিসের জ্ঞাপন করিবেন ? বাহা নাই, তাহার কি জ্ঞাপন হইতে পারে ? এবং জ্ঞাপক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাপনের সাধন না থাকিলে কি কিছুর জ্ঞাপন হইতে পারে ? ফলতঃ যিনি ঐ সমস্ত কিছুই মানেন না, তিনি পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপন আমার প্রয়োজন, ইহা কখনই বলিতে পারেন না, তাঁহার ঐ কথার কোন অর্থ নাই—উহা অনর্থক । বিপক্ষের সম্বন্ধ জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্থ অবলম্বন করিয়া বিপক্ষের মতানুসারেও তিনি বিপক্ষকে কিছু জ্ঞাপন করিতে পারেন না । কারণ, বিপক্ষ যাহাকে প্রমাণ বলেন, শূন্যবাদী তাহা অবলম্বন করেন না । তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া বিপক্ষের নিকটে উল্লেখ করেন, বিপক্ষ তাহা প্রমাণ বলেন না, তাহা মানেন না, তিনি নিজেও তাহা মানেন না । অন্ততঃ পরপক্ষ-প্রতিবেদ—বাহা তাঁহার জ্ঞাপনীয়, বাহা জ্ঞাপন তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার বিপক্ষের অসম্বন্ধ পদার্থ, তিনিও তাহাকে একটা পদার্থ বলিয়া মানেন না, তিনি যে শূন্যবাদী, তিনি যে কোন পদার্থই মানেন না, সুতরাং বাহা বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয় পক্ষেরই অসম্বন্ধ অর্থাৎ বাহা কেহই মানেন না, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে পারে না । সুতরাং পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এ কথা শূন্যবাদী কিছুতেই বলিতে পারেন না ; তিনি ঐরূপ বলিলে উন্নতের দ্বারা উপেক্ষিত হইবেন ; সুতরাং তাঁহার স্বপক্ষ স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, নীরব থাকিতে হইবে ।

ফলতঃ শূন্যবাদীর বিচার করিতে হইলে তাঁহার জ্ঞাপনীয় পদার্থ তাঁহাকে মানিতেই হইবে, সুতরাং ঐটি তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে এবং জ্ঞাপনের জন্য জ্ঞাপক প্রভৃতি



পদার্থও বাহ্য বাহ্য আবদ্ধক, সেগুলিও তাঁহার সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইবে। তাহা হইলে বিতণ্ডার স্বপক্ষ স্বীকার করিতে হইল এবং ঐ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই পরিশেষে বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহাও আসিয়া পড়িল। সুতরাং শূন্যবাদীর নিজ মত টিকিল না, তিনি তাঁহার মতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না। তাহা হইলে শূন্যবাদীর কথাও পূর্বের ভায়ই হইল, শূন্যবাদী বিতণ্ডার প্রয়োজন স্বীকার করায় পূর্বোক্ত “নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী”র মন্তের সহিত তাঁহার মত ঠিক এক না হইলেও ফলে উহা একরূপই হইল। কারণ, তাঁহার মতেও পূর্বোক্ত দোষ অপরিহার্য, তাই ভাব্যাকার বলিয়াছেন—“এতদপি তাদৃগেব”।

শূন্যবাদী বৈতণ্ডিককে লক্ষ্য করিয়া ভাব্যাকার আরও একটি দোষ বলিয়াছেন যে, শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক তাঁহার বিতণ্ডা নামক বাক্যসমূহের অবশ্য প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। কারণ, প্রতিপাদ্যহীন উক্তি প্রলাপমাত্র, উহা বাক্যই হয় না, সুতরাং বিতণ্ডা হইতে পারে না। যে উক্তির কোন প্রতিপাদ্যই নাই, তাহা প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইবে? উহা অনর্থক, শূন্যবাদী ঐরূপ প্রলাপ বলিলে তাহা কেহ শুনিবে না, সভ্য-সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে না। সুতরাং শূন্যবাদী তাঁহার বিতণ্ডাবাক্যের অবশ্য প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। শূন্যবাদী বিতণ্ডাবাক্যের দ্বারা তাঁহার বিপক্ষের হেতুকে অসিদ্ধ, অব্যভিচারী, অথবা বিরুদ্ধ—ইত্যাদিরূপে চূড়ান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, সুতরাং বিপক্ষের হেতুর অসিদ্ধত্ব প্রত্নতি দোষই শূন্যবাদীর বাক্যের প্রতিপাদ্য। তিনি ঐ প্রতিপাদ্য স্বীকার করিলে ঐগুলি তাঁহার স্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে, এবং বিতণ্ডা-বাক্যের দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিলে ফলতঃ উহার সংস্থাপন করাই হইবে, এবং অসিদ্ধই প্রত্নতি যে হেতুর দোষ, ইহাও তাঁহাকে মানিতে হইবে, এবং তাহাও প্রমাণাদির দ্বারা সাধন করিতে হইলে স্বপক্ষের স্থাপনা আসিয়া পড়িবে। ফলতঃ যে ভাবেই হউক, স্বপক্ষের স্বীকার এবং সংস্থাপন আসিয়া পড়ায় শূন্যবাদীর বিচার বিতণ্ডা হইতে পারে না, শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না; সুতরাং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বিতণ্ডার বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ-স্বীকার আছে। কিন্তু বৈতণ্ডিক বিচারস্থলে প্রমাণাদির দ্বারা তাহার সংস্থাপন করেন না, তিনি কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডনই করেন। ফলে স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক বা না হউক, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই তিনি কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করেন। পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই ঐ বিতণ্ডার প্রয়োজন। মূলকথা, বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন নহে, সুতরাং সৰ্ব্বকৰ্ম্ম, সৰ্ব্ববিজ্ঞা প্রয়োজন-ব্যাধ, এই পূর্বকথা ঠিকই বলা হইয়াছে।

বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষায় স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য শেষে ভাব্যাকার শূন্যবাদীর কথাও তুলিয়াছেন। কারণ, শূন্যবাদী স্বপক্ষ-সিদ্ধিকে বিতণ্ডার প্রয়োজন বলেন নাই, তাঁহার মত খণ্ডন না করিলে ভাব্যাকারের বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, স্বপক্ষসিদ্ধিই যে বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তে শূন্যবাদীর প্রতিবাদ থাকিয়া যায়, তাই পরে শূন্যবাদীর মতানুসারে তাঁহার বিচারের বিতণ্ডাও খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বে

প্রমাণাদিপদার্থবাদীদিগের মধ্যে বাহ্যিক নিষ্প্রয়োজন-বিতণ্ডাবাদী ছিলেন, তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। “তাৎপর্যপরিভুক্তি”র প্রকাশ-টীকাকার বর্দ্ধমান এই কথা স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাতেও সেই ভাবই পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের ভাবেও ইহা বুঝা যায়। উল্লেখ্যতরু এবং উদয়নের সন্দর্ভের দ্বারা একই শূন্তবাদীকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার সব কথা বলিয়াছেন, ইহাও মনে আসে। সুদীপণ ঐ সকল গ্রন্থের সর্বাংশ দেখিয়া ইহার সমালোচনা করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, ভাষ্যকার বাংস্যায়নের সন্দর্ভের দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থ-সন্দর্ভও অতি দ্রুত ভাবগর্ভ, বহু পরিশ্রম ও বহু চিন্তা করিয়া তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে।

ভাষ্যে ‘যেন জ্ঞাপ্যতে যচ্চ’—এই স্থলে ‘যচ্চ’ এই কথার ‘জ্ঞাপ্যতে’ এই কথার সহিতই যোজনা বুঝিতে হইবে। সর্বত্র “যৎ” শব্দের প্রয়োগ থাকায় শেষে “তৎ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া “তানি প্রতিপত্ততে যদি” এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে। “প্রতি”পূর্বক “পদ” ধাতুর অর্থ এখানে স্বীকার। এখানে অনেক পাঠান্তরও দেখা যায়। অনেক পুস্তকে ‘যচ্চ জ্ঞাপ্যতে, এতচ্চ প্রতিপত্ততে যদি’, এইরূপ পাঠ আছে। এ পাঠে সহজেই অর্থ বোধ হয়। ভাষ্যের শেষ-বর্ত্তী ‘ইতি’ শব্দটি ‘প্রয়োজন’ পদার্থ ব্যাখ্যার সমাপ্তিসূচক। এইরূপ বাক্যসমাপ্তি স্থচনার জন্যও ভাষ্যকার প্রায় সর্বত্র ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এগুলি অল্পবাদে গৃহীত হইবে না।

ভাষ্য। অথ দৃষ্টান্তঃ, প্রত্যক্ষবিষয়োহর্থো দৃষ্টান্তঃ, যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাণাং দর্শনং ন ব্যাহন্ততে। স চ প্রমেয়ঃ, তস্য পৃথগ্বেচনঞ্চ—তদা-শ্রয়াবনুমানাগমো, তস্মিন্ সতি স্মাতামনুমানাগমাবসতি চ ন স্মাতাং। তদাশ্রয়া চ স্মায়প্রবৃত্তিঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন চ পরপক্ষপ্রতিমেধো বচনীয়ো ভবতি, দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষঃ সাধনীয়ো ভবতি। নাস্তিকশ্চ দৃষ্টান্ত-মভ্যুপগচ্ছন্নাস্তিকত্বং জহাতি, অনভ্যুপগচ্ছন্ কিং সাধনং পরমুপালভে-তেতি। নিরুক্তেন চ দৃষ্টান্তেন শক্যমভিধাতুং ‘সাধ্যসাধন্যাত্তদ্ব্যবহারী দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ,’ ‘তদ্বিপৰ্য্যয়ান্না বিপরীত’মিতি।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্ত, প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে—যে পদার্থে লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের জ্ঞান অব্যাহত হয় অর্থাৎ যে পদার্থে বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, ( তাহা দৃষ্টান্ত )। তাহাও প্রমেয়, সেই দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, অনুমান-প্রমাণ ও শব্দ-প্রমাণ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত



তাহাদিগের নিমিত্ত। বিশদার্থ এই যে—সেই দৃষ্টান্ত থাকিলে অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ থাকিতে পারে, না থাকিলে থাকিতে পারে না, এবং জ্ঞায়প্রযুক্তি অর্থাৎ পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ জ্ঞায়ের প্রকাশ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত তাহার মূল। এবং দৃষ্টান্তের বিরোধের দ্বারা পরপক্ষ-প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের প্রতিষেধ বচনায় হয় অর্থাৎ বলিতে পারা যায় অথবা দূষিত করিতে পারা যায়, এবং দৃষ্টান্তের সমাধির দ্বারা অর্থাৎ অবিরোধের দ্বারা স্বপক্ষ সাধনীয় হয়, (সাধন করা যায়) এবং নাস্তিক অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় যাহারা পদার্থ-মাত্রকেই যে ক্ষণে উৎপন্ন, তাহার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয় বলেন, তাহারা দৃষ্টান্ত স্বীকার করিলেই নাস্তিকত্ব ত্যাগ করেন অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট কোন পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলেই এবং সে ক্ষণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই তাহাদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ ত্যাগ করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বীকার না করিলে (নাস্তিক) কোন সাধনবিশিষ্ট হইয়া পরকে অর্থাৎ পরপক্ষের সাধনকে প্রতিষেধ করিবেন ?

এবং নিরুক্ত অর্থাৎ পূর্বে যাহার লক্ষণ বলিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা (মহর্ষি) “সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ব্যবহাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ,” “তদ্বিপর্য়য়াবা বিপরীতঃ” (এই দুইটি সূত্র ১অং, ৩৬৩৭) বলিতে পারিবেন, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলে মহর্ষি পরে যে উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, দৃষ্টান্ত না বুঝিলে সে লক্ষণ বুঝা যায় না।

উল্লম্বী। ভাব্যকার প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহার পৃথক উল্লেখের কারণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ-দৃষ্টান্ত—ভাব্যকারের এই প্রথম কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, দৃষ্টান্তবিষয়ে মূল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ, দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক, এই জন্তই উহার নাম দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষ পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহা উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে না। কারণ, অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থকেও মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও শেষে বলিয়াছেন যে, ‘প্রত্যক্ষমূলত্বাৎ প্রত্যক্ষো দৃষ্টান্তঃ’। দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যক্ষ স্থলে যেমন দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ দৃষ্টান্তেরও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা নির্বিশদ; সেক্ষণ না হইলে তাহা দৃষ্টান্তই হয় না; এই সকল কথা সূচনার জন্যই ভাব্যকার প্রথমে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন এবং উহারই ফলিতার্থ বর্ণনপূর্বক শেষে মহর্ষি স্বত্রদ্বারা দৃষ্টান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ নহেন, প্রাচীনগণ তাহাকে সেই বিষয়ে বলিতেন ‘লৌকিক’। যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ, তাহাকে সেই

বিষয়ে বলিতেন ‘পরীক্ষক’। যিনি বস্তু বিচারপূর্বক অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনিই ত পরীক্ষক। আর যিনি পরীক্ষকের নিকট হইতে বুঝেন, তিনিই লৌকিক। ফলকথা, লৌকিক বলিতে বোঝা, পরীক্ষক বলিতে বোধগিতা। এক পক্ষ লৌকিক, অপর পক্ষ পরীক্ষক—এই উভয় ব্যক্তির যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হইবে, তাহাই দৃষ্টান্ত পদার্থ, ইহাই স্বজ্ঞকারের তাৎপর্য্যার্থ নহে। কারণ, অনেক পণ্ডিতমাত্র-বেদ্য পদার্থকেও (মন্ত্র ও আত্মর্কেদের প্রামাণ্য, পরমাণুর শ্রামরূপের অনিত্যতা প্রভৃতি) স্বজ্ঞকার মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল পদার্থ যিনি বুঝেন, তাহাতে বাহ্যর বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে লৌকিক বলা যায় না। ঐ সকল পদার্থ কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য। স্মরণ্যে বুঝিতে হইবে যে, কোন স্থলে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের এবং কোন স্থলে কেবল লৌকিকদিগের এবং কোন স্থলে পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থ বোঝা ও বোধগিতার বুদ্ধির অবিরোধের হেতু অর্থাৎ যে পদার্থের উল্লেখ করিলে উভয় পক্ষের মত-বৈবক্ষ্য বাইরা মতের সাম্যই উপস্থিত হইতে পারে, এইরূপ পদার্থ ‘দৃষ্টান্ত’। এইরূপ পদার্থমাত্রই দৃষ্টান্ত—ইহা বুঝিতে হইবে না, দৃষ্টান্ত হইলে তাহা এইরূপই হইবে, ঐরূপ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। (দৃষ্টান্ত-স্বজ্ঞ দ্রষ্টব্য)।

এই দৃষ্টান্ত পদার্থকে ভাষ্যকার প্রমের বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত প্রমের কিরূপে? মহর্ষি-কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা যায় না? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। মনে হয়, উদ্যোতকর ইহা মনে করিয়াই এখানে বলিয়াছেন—‘সোহং দৃষ্টান্তঃ প্রমেয়মুপলব্ধি-বিষয়ত্বাৎ’। উদ্যোতকরের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর্ষি গোতম তাঁহার পরিভাষিত আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয়ের মধ্যে বস্তু বা উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ বুদ্ধির বিষয় পদার্থমাত্রই সামান্য প্রমের বলিয়া তাঁহারও সম্মত। যাহা প্রমাণ-জনা উপলব্ধির বিষয়, সামান্যতঃ তাহাকেই প্রমের বলা হয়। মহর্ষি বিশেষ কারণে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিলেও সামান্য প্রমের আরও অসংখ্য আছে, সেগুলিকে তিনিও প্রমেয় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। উদ্যোতকর ‘নবম-স্বজ্ঞভাষ্য-বার্ত্তিকে’ এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারও মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয় ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রমেয় পদার্থ আছে, এ কথা বলিয়াছেন (নবম স্বজ্ঞভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখন যদি উপলব্ধির বিষয় পদার্থ বলিয়া দৃষ্টান্ত পদার্থও মহর্ষি-সম্মত প্রমেয় হয় এবং মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যেও অনেক দৃষ্টান্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত পদার্থের আর পৃথক্ উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন? এতদ্বত্তরেই ভাষ্যকার দৃষ্টান্তরূপে দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন। সমস্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ মহর্ষির পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যেই আছে; স্মরণ্যে উহা প্রমেয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নহে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও তাহা বুঝা যায় না। তাহা



হইলে উদ্যোতকর দৃষ্টান্তের প্রমেরত্ববিষয়ে উপলব্ধিবিষয়কে হেতু বলিতে হইবে কেন ? বস্তুতঃ সুবাদি 'প্রয়োজন' এবং অনেক 'দৃষ্টান্ত', 'সিদ্ধান্ত' ও 'হেতুভাস' মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেরের মধ্যে নাই, সুতরাং মহর্ষি-কথিত বিশেষ প্রমেরগুলিতেই সংশয়াদি সকল পদার্থ অন্তর্ভূত আছে, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যেই সে সকল পদার্থ আছে, উহাদিগকে বলাতেই সংশয়াদি সমস্ত পদার্থ বলা হইয়াছে, এ কথা ভাষ্যকার বলিতে পারেন না। কিন্তু ভাষ্যকার প্রথমে পূর্বপক্ষ প্রদর্শনকালে বলিয়া আসিয়াছেন যে, 'সংশয়াদি পদার্থগুলি যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমের-সমূহে অন্তর্ভূত থাকায় উহারা অতিরিক্ত পদার্থ নহে,' সুতরাং বুঝিতে হইবে, ভাষ্যকার সেখানে মহর্ষি-কথিত বিশেষ প্রমেরগুলিকেই কেবল লক্ষ্য করেন নাই, মহর্ষির সমস্ত উপলব্ধির বিষয় সামান্য প্রমেরগুলিকেও তিনি সেখানে প্রমের শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়, সেই জন্তই ভাষ্যকার সেখানে 'প্রমেরেবু' এইরূপ বহুবচনান্ত "প্রমের" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষির পরিভাষিত বিশেষ প্রমেরগুলিই তাঁহার ঐ প্রমের শব্দের প্রতিপাদ্য হইলে তিনি একবচনান্ত প্রমের শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন। মহর্ষি প্রমেরত্বের (নবম পুত্রে) একবচনান্ত প্রমের শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, তদনুসারে ভাষ্যকারও সেইরূপ করেন নাই কেন ? ইহাও ভাবিতে হইবে। ভাষ্যকার মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেরবিশেষে অন্তর্ভাবের কথা বলিতে অজ্ঞাত একবচনান্ত প্রমের শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তকে প্রমের বলিতে একবচনান্ত প্রমের শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সে সব স্থলে তাহাই করিতে হইবে। সামান্য প্রমের বলিয়া বুঝাইতেও ক্রীতবলি একবচনান্ত প্রমের শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হয়। অবশ্য একবচন বহুবচনাদি প্রয়োগের দ্বারা সর্বত্র বক্তার তাৎপর্য নির্ণয় না হইলেও ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত 'প্রমেরেবু' এই স্থলে বহুবচনের দ্বারা সামান্য, বিশেষ সর্ববিধ প্রমেরই ভাষ্যকারের ঐ স্থলে প্রমের শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহা বুঝিতে পারি; তাহাতে বহুবচনের প্রকৃত সাধকতাও হয়। তবে ঐরূপ বুঝিবার পক্ষে প্রকৃত কারণ এই যে, সংশয়াদি পদার্থগুলি প্রত্যেকেই মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেরের মধ্যে নাই; সুতরাং ভাষ্যকার তাহা বলিতে পারেন না। যেগুলি ঐ প্রমেরে অন্তর্ভূত হয় নাই, তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ কর্তব্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞ কারণ প্রদর্শন সম্ভব হয় না। আর যদি পূর্বপক্ষ ভাষ্যে বহুবচনান্ত প্রমের শব্দের দ্বারা মহর্ষির কঠোক্ত বিশেষ প্রমেরগুলি এবং বুদ্ধিরূপ প্রমেরের বিষয় বলিয়া সূচিত স্বীকৃত সামান্য প্রমেরগুলিকে ভাষ্যকার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সংশয়াদি পদার্থগুলি সমস্তই যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেরে অন্তর্ভূত, এ কথা বলিতে পারেন, অর্থাৎ তাহা হইলে সংশয়াদি পদার্থের কতকগুলি বিশেষ প্রমেরে এবং কতকগুলি সামান্য প্রমেরে অন্তর্ভূত হওয়ার উহারা প্রমেরসমূহে অন্তর্ভূত, এ কথা বলা যায়। মনে হয়, এই তাৎপর্য্যও ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন—"যথাসম্ভবম্"। অর্থাৎ যে প্রকারে অন্তর্ভাব সম্ভব হয়, সেই প্রকারেই অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। এবং সামান্য প্রমেরে

অন্তর্ভূত দৃষ্টান্তাদির পক্ষে পৃথক্ উল্লেখ বলিতে বৃদ্ধিতে হইবে—বিশেষ করিয়া উল্লেখ। অর্থাৎ সেগুলিও যখন সামান্য প্রেমের মধ্যে স্বীকৃত এবং সূচিত, তখন আবার তাহাদিগের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন? আরও কত কত সামান্য প্রেমের আছে, মহর্ষি ত তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই? ইহাই তাৎপর্য।

আরও দেখিতে হইবে, ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তকে কেবল প্রেমের বলিয়াছেন, প্রেমের অন্তর্ভূত,এরূপ কথা এখানে বলেন নাই। কিন্তু “সংশয়”, “অবয়ব”, “তর্ক” প্রভৃতির কথায় সেখানে বলিয়াছেন—প্রেমে অস্তর্ভূত। কারণ, সেগুলি মহর্ষি-কথিত প্রেমেরপদার্থের মধ্যেই আছে, পূর্বে সামান্য প্রেমের ধরিয়া দৃষ্টান্ত প্রভৃতিকেও প্রেমের অন্তর্ভূত বলিলেও এখানে তত দূর বলেন নাই। দৃষ্টান্তের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রেমের, কতকগুলি সামান্য প্রেমের, এই তাৎপর্যো দৃষ্টান্তকে কেবল প্রেমের বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার বক্তব্য প্রকাশ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পদার্থ সংশয়, তর্ক, অবয়ব প্রভৃতির জায় মহর্ষি-কথিত প্রেমের “পদার্থে” অন্তর্ভূত বলিয়া বুলিলে ভাষ্যকার সংশয় প্রভৃতির জায় দৃষ্টান্তকে প্রেমের অন্তর্ভূত, এইরূপ বলেন নাই কেন? উদ্যোতকরই বা দৃষ্টান্ত, প্রেমের কেন—ইহা বুঝাইতে ‘উপলব্ধিবিরহাৎ’ এইরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? সুদীপণ এই সকল কথাগুলি ভাবিয়া ইহার সমালোচনা করিবেন।

দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ উল্লেখ কেন হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার কতকগুলি কারণ বলিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য এই যে, দৃষ্টান্ত অহুমান-প্রমাণের একটা নিমিত্ত, দৃষ্টান্ত বাতীত অহুমান-প্রমাণ থাকিতেই পারে না। যে হেতুর দ্বারা যে পদার্থের অহুমান করিতে হইবে, সেই হেতুতে সেই অহুমানের পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্ত অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই অহুমানের পদার্থটি থাকে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার জন্ত দৃষ্টান্ত আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হওয়ায় অহুমান হইতে পারে না। এইরূপ শব্দ-প্রমাণেও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয়। কারণ, সর্বপ্রথম কোন শব্দ প্রবণ করিলেও শব্দ বোধ হয় না। শব্দ বোধে শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে দৃষ্টান্ত আবশ্যক। কারণ, লোক সমস্ত পূর্জ্ঞাত পদার্থকেই অপর ব্যক্তিকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে; সুতরাং পূর্ক বোধাত্মক দৃষ্টান্তের সাহায্যেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, নচেৎ প্রথম শব্দ শুনিয়াই শব্দ বোধ হইত। যে শব্দের যে অর্থ যে কোন উপায়ে পূর্কে বুঝিয়াছি, তদনুসারেই আমরা শব্দ প্রয়োগ করি এবং পূর্কদৃষ্টান্তে পূর্কবৎ তাহার অর্থবোধ করি; সুতরাং দৃষ্টান্ত না থাকিলে শব্দপ্রমাণও থাকিতে পারে না এবং প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়বায়ক জায় দৃষ্টান্তমূলক, দৃষ্টান্ত বাতীত ঐ জায় প্রয়োগ হইতেই পারে না, জায়ের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বাক্য দৃষ্টান্ত বাতীত বলা যায় না। ভাষ্যকার প্রথমে অহুমান-প্রমাণকে দৃষ্টান্তমূলক বলিয়াছেন; সুতরাং পরবর্তী জায় শব্দের দ্বারা পক্ষাবয়বায়ক বাক্য-রূপ জায়ই বৃদ্ধিতে হইবে। অহুমানরূপ জায়কে পুনরায় দৃষ্টান্তমূলক বলিলে পুনরুক্তি-বোধ ঘটে, সুতরাং পরবর্তী জায় শব্দ পক্ষাবয়বায়ক বাক্যরূপ জায় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধিতে হইবে। তাৎপর্যটিকারও তাহাই বলিয়াছেন। এবং স্বপক্ষ সমর্থন এবং পরপক্ষ সাধনের



প্রতিবেদে অর্থাৎ খণ্ডনে দৃষ্টান্ত নিতান্ত আবশ্যক। এবং দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ক্ষণভঙ্গবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করা যায়। কারণ, ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বস্তু-মাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ এক ক্ষণের অধিক কাল কোন পদার্থই স্থায়ী নহে, সুতরাং তিনি কোন বস্তুকেই দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিতে পারেন না। তিনি যাহাকে দৃষ্টান্ত বলিবেন, তাহা তাহার বলিবার পূর্বে বিনষ্ট হওয়ার, সে পদার্থ তখন আর থাকে না। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলিয়া বুঝান যায় না। দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিলেও ক্ষণভঙ্গবাদী পরমক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত দেখাইতে গেলেও আস্তিকের স্থিরবাদ স্বীকার করিয়া নাস্তিককে তাগ করিতে হয় (১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)। কল কথা, দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিতে পারা যায়। তাহাকে নিরস্ত করাও আস্তিকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের আরও একটি হেতু আছে, তাহা অস্ত্র প্রকার; এ অস্ত্র সেই হেতুটিকে শেষে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই শেবোক্ত হেতুটি এই যে, মহর্ষি জ্ঞানের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্যের যে দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, ঐ লক্ষণ দৃষ্টান্ত-বাচ্য, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত না বুঝিলে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত কি, তাহা মহর্ষির পূর্বে বলিতে হয়, তাহা বলিতে হইলেই দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ করিতে হয়। কারণ, উদ্দেশ্য বাচীত লক্ষণ বলা যায় না, সুতরাং দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ পূর্বক তাহার লক্ষণ বলিয়া মহর্ষি উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং বলিতে পারিয়াছেন। ঐ দুইটি লক্ষণ-সূত্র ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদাহরণের অর্থ যথাস্থানেই বিবৃত হইবে। কোন পুস্তকে ‘নিরুক্তে চ দৃষ্টান্তে’, এইরূপ পাঠ আছে। দৃষ্টান্ত নিরুক্ত অর্থাৎ নিরূপিত হইলেই মহর্ষি উক্ত সূত্রদ্বয় বলিতে পারেন, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে ভাষ্যার্থ।

ভাষ্যে ‘তত্ত্ব পৃথগ্‌বচনক্’,—এই স্থলে ‘চ’ শব্দের অর্থ হেতু। পৃথগ্‌বচনের হেতুগুলি উহার পরেই বলা হইয়াছে। উদয়নের “কুশুনাঞ্জলিকারিকা” প্রকৃতি অনেক গ্রন্থেই হেতু অর্থে ‘চ’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অনেক প্রবীণ টীকাকার “চো হেতো” এইরূপ কথা অনেক স্থলে লিখিয়াছেন। এই ভাষ্যে অনেক স্থলে ‘চ’ শব্দ এবং ‘যলু’ শব্দ হেতু অর্থে প্রযুক্ত আছে। আবার অবধারণ অর্থেও ‘চ’ শব্দ, ‘যলু’ শব্দ অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অব্যয়ের দ্বারা অনেক স্থলে অনেক গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়, সে অর্থগুলি না বুঝিলে বাক্যার্থবোধ ঠিক হয় না। এজ্জ্ঞা ঐ সকল শব্দের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখানে দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের হেতু উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার শেষে যে ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐ ইতি শব্দের দ্বারাও হেতু অর্থ বুঝা যাইতে পারে, তাহা বুঝিলেও এখানে ক্ষতি নাই। ‘ইতি’ শব্দের ‘হেতু’ অর্থ কোথায় কথিত আছে। এবং অনেক স্থানে এই ভাবেও হেতু অর্থে “ইতি” শব্দের প্রয়োগ আছে। তবে শেষবর্তী “ইতি” শব্দ সমাপ্তিচ্যুতকই প্রায় দেখা যায়।

ভাষ্য। অন্ত্যয়মিত্যনুজ্ঞায়মানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চ প্রমেয়ঃ, তস্য পৃথগ্বচনং সংস্কৃত্য সিদ্ধান্তভেদেষু বাদজল্পবিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে নাতোহ-  
ন্থথেতি।

অনুবাদ। “এই পদার্থ আছে” এই প্রকারে অর্থাৎ “ইহা” এবং “এইপ্রকার” এইরূপে যে পদার্থ স্বীকার করা হয়, সেই স্বীকৃত্যমান পদার্থ “সিদ্ধান্ত”। সেই সিদ্ধান্তও প্রমেয়। সিদ্ধান্তের ভেদগুলি (মহর্ষি-কথিত চতুর্বিধ সিদ্ধান্ত) থাকিলে “বাদ”, “জল্প” ও “বিতণ্ডা” প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্ত্যায় অর্থাৎ সিদ্ধান্তের ভেদগুলি না থাকিলে প্রবৃত্ত হয় না, এই জন্ত সেই সিদ্ধান্তের পৃথক উল্লেখ করা হইয়াছে।

টিপ্পনী। নিশ্চিত শাস্ত্রার্থকে “সিদ্ধান্ত” বলে। উক্তোক্তকর শাস্ত্রার্থনিষ্ঠকে “সিদ্ধান্ত” বলায় উহা “বুদ্ধি” পদার্থ বলিয়া মহর্ষি-পরিভাষিত “প্রমেয়ে”ই উহার অন্তর্ভাব হইয়াছে, এ জন্ত উক্তোক্তকর এখানে সিদ্ধান্তকে “প্রমেয়ে অন্তর্ভূত” এই কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার-স্বীকৃত পদার্থকে সিদ্ধান্ত বলায় তিনি এখানে দৃষ্টান্ত পদার্থের স্থায় “সিদ্ধান্তকে”ও কেবল “প্রমেয়” ইহাই বলিয়াছেন। “দৃষ্টান্ত” পদার্থকে যে ভাবে ভাষ্যকার পূর্ণপক্ষ প্রদর্শনকালে প্রমেয়ে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, “সিদ্ধান্ত” পদার্থকেও সেই ভাবে প্রমেয়ে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তমাত্রই যেমন মহর্ষি-পরিভাষিত “প্রমেয়ে”র মধ্যে নাই, সিদ্ধান্ত মাত্রও তরুণ মহর্ষি-পরিভাষিত “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে নাই। ঐশ্বর সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, কিন্তু তিনি গোতম-পরিভাষিত “প্রমেয়” পদার্থগুলির মধ্যে নাই। ঐরূপ আরও বহু বহু সিদ্ধান্ত ঐ প্রমেয়ের মধ্যে নাই, সুতরাং “দৃষ্টান্ত” পদার্থের স্থায় “সিদ্ধান্ত” পদার্থও সামান্ত প্রমেয় ও বিশেষ প্রমেয়ে বখাসম্ভব অন্তর্ভূত আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা দৃষ্টান্তের স্থলেই বলা হইয়াছে।

মহর্ষি “সিদ্ধান্ত”কে চতুর্বিধ বলিয়াছেন। সেই চতুর্বিধ সিদ্ধান্ত না থাকিলে কোন বিচারই হইতে পারে না। তন্মধ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, মহর্ষি যাহাকে “সর্বসম্মতসিদ্ধান্ত” বলিয়াছেন, তাহা না থাকিলে অর্থাৎ তাহা একেবারেই না মানিলে কিরূপে বিচার হইবে? যদি ধর্ম্মীতে কোন বিবাদ না থাকে, তবে তাহা নিত্য, কি অনিত্য, দ্রব্য, কি গুণ, “পরিণাম”, কি “বিবর্ত্ত,” এইরূপে তাহার ধর্ম্মবিচার হইতে পারে। এবং যাহা কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, মহর্ষি যাহাকে “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত” বলিয়াছেন, তাহা না থাকিলে এবং তাহা না জানিলে কিরূপে বিচার হইবে? সকলেই একমত হইলে অথবা কেহ বিরুদ্ধ মত না জানিলে বিচার হইতে পারে না। এইরূপ বিচারে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তেরই বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, তজ্জন্ত মহর্ষি সিদ্ধান্তের বিশেষ করিয়া উল্লেখ এবং তাহার প্রকার-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন।



এবং বিশেষরূপে না হইলেও সিদ্ধান্তরূপে দ্বৈত প্রভৃতি পদার্থেরও তাহাতে উল্লেখ হইয়া গিয়াছে। অতীত কথা “সিদ্ধান্ত” প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। সাধনীয়ার্থস্ত যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে তস্ত পক্ষাবয়বাঃ প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তেষু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা, হেতুরনুমানঃ, উদাহরণং প্রত্যক্ষং, উপমানমূপনয়ঃ, সর্বেষামেকার্থসমবায়ো সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি। সোহয়ং পরমো ন্যায় ইতি। এতেন বাদজল্পবিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে, নাতোহন্তথেনি। তদাশ্রয়া চ তদ্ব্যবস্থা। তে চৈতে-  
হবয়বাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্তুঃ প্রমেয়েহন্তভূতা এবমর্থং পৃথগুচ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। যতগুলি শব্দসমূহে (বাক্যসমূহে) সাধনীয় পদার্থের সিদ্ধি অর্থাৎ বাস্তব ধর্ম পরিসমাপ্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, সেই বাক্য-সমষ্টির প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদাহরণ”, “উপনয়”, “নিগমন”,—এই পাঁচটি অবয়ব, “সমূহ”কে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া “অবয়ব” বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ পক্ষ বাক্যসমষ্টির এক একটি অংশ বা ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য, এ জ্ঞাত তাহাদিগকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে।

সেই পক্ষাবয়বে প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণেরই মেলন আছে। (কিছুপে আছে, তাহা বলিতেছেন) “প্রতিজ্ঞা” শব্দ-প্রমাণ, “হেতু” অনুমান-প্রমাণ, “উদাহরণ” প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, “উপনয়” উপমান-প্রমাণ,—সকলের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি অবয়বের এবং তাহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের একার্থসমবায়ো অর্থাৎ একটি প্রতিপদের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে অথবা উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধিতে সামর্থ্য প্রদর্শন অর্থাৎ পরস্পর সাক্ষাৎকার প্রদর্শক বাক্য “নিগমন”। ইহা সেই পরম “ন্যায়”, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি সর্বপ্রমাণমূলক বলিয়া ইহাকে পরম অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধবাদীর প্রতিপাদক “ন্যায়” বলে। এই ন্যায়ের দ্বারা বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা (ত্রিবিধ বিচার) প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্তর্গত হয় না, অর্থাৎ আর কোনও প্রকারে ঐ বিচার হয় না, কদাচিৎ বাদ-বিচার হইলেও জল্প ও বিতণ্ডা কখনই হয় না এবং তত্ত্বের বাবস্থা অর্থাৎ ইহাই তত্ত্ব, অতীত তত্ত্ব নহে, এইরূপ নিয়ম বা নির্ণয় সেই ন্যায়ের আশ্রিত (ন্যায়ের অধীন)।

সেই এই অবয়বগুলি (প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব) শব্দবিশেষ বলিয়া প্রমেয়ে (মহর্ষি-কথিত প্রমেয় পদার্থে) অন্তর্ভূত হইয়াও এই নিমিত্ত অর্থাৎ ইচ্ছাদিগের মূলে সমস্ত প্রমাণ আছে,—ইহারা একবাক্য ভাবে মিলিত হইয়া বিরুদ্ধবাদীকে তত্ত্বপ্রতিপাদন করে, তত্ত্বব্যবস্থা ইচ্ছাদিগের অধীন, ইত্যাদি কারণে পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। যেমন পরার্থানুমানকে “জ্ঞান” বলে, ভাষ্যকার পূর্বে তাহাই বলিয়া আসিয়াছেন, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমানকে “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি “নিগমন”-পর্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, বাক্যক্রমে প্রযুক্ত ঐ বাক্য-সমষ্টিকেও “জ্ঞান” বলে। ভাষ্যকারও এখানে তাহাকে “পরম জ্ঞান” বলিয়া সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের লক্ষণ মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। পরার্থানুমান স্থলে ঐ “জ্ঞান” নামক বাক্যসমূহে সাধাসিদ্ধি পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারই এক একটি অংশ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা সাধনীয় পদার্থের বাস্তব ধর্মবিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়া যায়। ভাষ্যে “সিদ্ধি” শব্দের দ্বারা বাস্তব ধর্ম এবং “পরিসমাপ্তি” বলিতে তাহার নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। উক্তোক্তকর ও বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। যে ধর্মটি সাধন করিতে ইচ্ছা হইবে, ঐ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই এখানে সাধনীয় পদার্থ, ঐ ধর্মীতে ঐ ধর্মটি বস্তুতঃ থাকিলেই তাহা ঐ ধর্মীর বাস্তব ধর্ম হয়; ঐ বাস্তব ধর্মের নিশ্চয় অর্থাৎ ধর্মীকে সেই ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়ই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি বা চরম ফল।

সমষ্টি থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাটি থাকে; ব্যাটি ব্যতীত সমষ্টি হয় না। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত “জ্ঞান” নামক বাক্য-সমষ্টির অপেক্ষায় ব্যাটি। তাই ঐ সমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতিকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি, ঐ পঞ্চ বাক্য-সমষ্টির এক একটি ব্যাটি বা অংশ, এ জন্ম উচ্ছাদিগকে ঐ বাক্যসমষ্টিরূপ জ্ঞানেরই অবয়ব বলা হইয়াছে। “অবয়ব” শব্দের দ্বারা একদেশ বা অংশ বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভ্রব্যের উপাদান-কারণকেই “অবয়ব” বলে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য জ্ঞান-বাক্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, কিন্তু উপাদান-কারণ অবয়বগুলি মিলিত হইয়া যেমন একটি অবয়বী ভ্রব্যকে ধারণ করে, তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য মিলিত হইয়া “জ্ঞান” বাক্যের প্রতিপাদ, একটি বিবক্ষিতার্থের প্রতিপাদন করে, তাই উহার অবয়ব সদৃশ বলিয়া “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐগুলি অবয়ব সদৃশ বলিয়াই উহাতে “অবয়ব” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বে সকল প্রমাণ আছে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার “প্রতিজ্ঞা”কে শব্দ-প্রমাণ, “হেতু”-বাক্যকে অনুমান-প্রমাণ, “উদাহরণ”-বাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এবং “উপনয়ন”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি বাক্যচতুষ্টয়ই যে প্রমাণ, তাহা নহে, ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের মূলে চারিটি প্রমাণ আছে, সেই মূলীভূত প্রমাণ-



চতুষ্ঠয়ে প্রকাশ করিয়াই, ঐ প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বস্তুপরীক্ষার উপযোগী হয়, উহারা সাক্ষ্যে সত্ত্বে বস্তু-পরীক্ষার উপযোগী হয় না, হইতে পারে না; কারণ, ঐরূপ কতকগুলি বাক্যাত্মক কোন তত্ত্বনির্ণয় জন্মাইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে, ঐ বাক্যচতুষ্ঠয় উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্ঠয়েরই ব্যাপার, সেই প্রমাণগুলিই ঐরূপ বাক্যের উৎপাদক হইয়া তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদন করে এবং সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যকে “পরম ন্যায়” বলা হয়। ফলতঃ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলিই যে প্রমাণ, তাহা নহে। উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াই উহাদিগকে প্রমাণ বলা হইয়াছে। এবং ঐ পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যসমষ্টিকেই বহুবচনাত্মক ‘প্রমাণ’ শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়া পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছেন—“প্রমানৈরর্থপরীক্ষণং জ্ঞায়ঃ।” মূলকথা, ‘প্রতিজ্ঞা’ প্রভৃতি বাক্যে ‘আগম’ প্রভৃতি প্রমাণবোধক শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াই ভাষ্যকার ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্যচতুষ্ঠয়ের মূলে যখন প্রমাণচতুষ্ঠয় আছে, তখন পঞ্চাবয়ব থাকিলেই সেখানে প্রমাণচতুষ্ঠয় বা সর্বপ্রমাণ থাকিল, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। এইরূপ গৌণ প্রয়োগ চিরকাল হইতেই আছে। ভাষ্যকারও গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞাদি বাক্যই বস্তুতঃ চারিটা প্রমাণ নহে, ইহা ভাষ্যকারের পূর্বকথ্যেও ব্যক্ত আছে। কারণ, প্রথমতঃ তিনিও “তেষু প্রমাণসমবায়ঃ” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। ‘প্রতিজ্ঞা’ প্রভৃতির মূলে ‘আগম’ প্রভৃতি প্রমাণ আছে কিরূপে? যে জন্ত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্য বস্তুতঃ আগম প্রভৃতি প্রমাণ না হইলেও একেবারে তাহাদিগকে আগম প্রভৃতি প্রমাণই বলা হইয়াছে? ভাষ্যকার এ প্রশ্নের কোন উত্তর এখানে দেন নাই। নিগমনস্থলে (৩৯ স্থলে) ইহার হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই ইহার বিস্তৃত প্রকাশ দ্রষ্টব্য। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটা অবয়ব (তাহাদিগকে সর্বপ্রমাণরূপে ধরা হইয়াছে) একবাক্য না হইলে তাহাদিগের একার্থপ্রতিপাদকতা হয় না, তাই উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধি চাই। পরস্পর সাকাক্ষ্যতাই একবাক্যতা এবং ঐ সাকাক্ষ্যতাই প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-চতুষ্ঠয়ের এবং তাহার মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্ঠয়ের ‘সামর্থ্য’ বলিয়া ভাষ্যে কথিত হইয়াছে। ঐ ‘সামর্থ্য’ বা সাকাক্ষ্যতার বোধের জন্ত ‘নিগমন’-বাক্যকে পঞ্চম ‘অবয়ব’রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নিগমনস্থলে এ কথারও বিশদ প্রকাশ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ ‘জ্ঞায়’কে ভাষ্যকার ‘পরম’ বলিয়াছেন। উল্লেখ্যতকর ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কোন একটি প্রমাণ সর্বত্র বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, তাহাকে মানাইতে পারে না, কিন্তু বাক্য-তাবাপন্ন হইয়া সর্বপ্রমাণ মিলিত হইলে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকেও মানাইতে পারে, সুতরাং ‘জ্ঞায়’র দ্বারা বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপাদন করা যায়, এ জন্ত জ্ঞায় পরম। পরম—কি না বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তির প্রতিপাদক। তাৎপর্যটাকাঙ্কার এই কথার সমর্থনে বলিয়াছেন যে, যদিও লৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কোন একটি প্রমাণও বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে মানাইতে

পারে, কিন্তু আত্মনিষ্ঠা, বেদপ্রামাণ্য প্রভৃতি হ্রস্ব বিষয়ে পারে না; এ জন্য তাহা মানাইতে সৰ্বপ্রমাণমূলক জ্ঞায়কেই আশ্রয় করিতে হয় এবং সেইগুলি প্রতিপাদন করাই জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং জ্ঞায়কে 'পরম' বলা ঠিকই হইয়াছে।

অবয়বগুলি বাক্য, সুতরাং শব্দ। মহর্ষি-কথিত প্রমেয়ের মধ্যে 'অর্থ' বা ইজিয়ার্থ আছে, তাহার মধ্যে শব্দ আছে, সুতরাং 'অবয়ব' মহর্ষি-কথিত প্রমেয়েই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তবুও তাহার পৃথক উল্লেখ কেন? তাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যে "শব্দবিশেষাঃ সন্তাঃ" এখানে হেতুর্থে শব্দ প্রত্যয় বৃদ্ধিতে হইবে।

ভাষ্য। তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণান্তরং, প্রমাণানামনু-  
গ্রাহকস্তদ্বজ্ঞানায় কল্পতে। তস্মাদাহরণং, কিমিদং জন্ম কৃতকেন  
হেতুনা নির্বর্ত্যতে? আহোষ্বিদকৃতকেন? অথাকস্মিকমিতি। এব-  
মবিজ্ঞাততদ্বৈত্বার্থে কারণোপপত্ত্যা উহঃ প্রবর্ততে, যদি কৃতকেন হেতুনা  
নির্বর্ত্যতে হেতুচ্ছেদাদুপপন্নোহয়ং জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকৃতকেন হেতুনা,  
ততো হেতুচ্ছেদশাসক্যাদনুপপন্নো জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকস্মিক-  
মতোহকস্মিনির্বর্ত্যমানং ন পুনর্নিস্যৎবতীতি নিবৃত্তিকারণং নোপপদ্যতে,  
তেন জন্মানুচ্ছেদ ইতি। এতস্মিন্তর্কবিষয়ে কস্মিনিমিত্তং জন্মেতি  
প্রমাণানি প্রবর্তমানানি তর্কেনানুগৃহ্যন্তে। তদ্বজ্ঞানবিষয়স্তা বিভাগাৎ  
তদ্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্ক ইতি। সোহয়মিথস্তূতস্তর্কঃ প্রমাণসহিতো  
বাদে সাধনায়োপালভ্যায় চার্হস্তা ভবতীত্যেবমর্থং পৃথগ্ভ্যতে প্রমেয়াস্ত-  
র্ভূতোহপীতি।

অনুবাদ। তর্ক প্রমাণসংগৃহীত অর্থাৎ কথিত চারিটী প্রমাণের অন্ততম নহে,  
প্রমাণান্তরও নহে, প্রমাণগুলির অনুগ্রাহক (সহকারী) হইয়া তদ্বজ্ঞানের নিমিত্ত  
সমর্থ হয়। সেই তর্কের উদাহরণ—এই জন্ম কি অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন  
হইতেছে? অথবা নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে? অথবা আকস্মিক  
অর্থাৎ বিনা কারণে আপনা আপনিই হইতেছে? এইরূপে অনিশ্চিততত্ত্বপদার্থে  
কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবহেতুক তর্ক প্রবৃত্ত হয়। (সে বিরূপ  
তর্ক, তাহা দেখাইতেছেন) যদি (এই জন্ম) অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া  
থাকে, (তাহা হইলে) হেতুর অর্থাৎ সেই নশ্বর হেতুর উচ্ছেদবশতঃ এই  
জন্মোচ্ছেদ উপপন্ন হয়। আর যদি নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে থাকে,



তাহা হইলে হেতুর ( সেই নিত্য কারণের ) উচ্ছেদ অশক্য বলিয়া জন্মের উচ্ছেদ উপপন্ন হয় না। আর যদি ( জন্ম ) আকস্মিক হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ ( বিনা কারণে ) উৎপত্তমান জন্ম আর নিবৃত্ত হইবে না। নিবৃত্তির কারণ উপপন্ন হয় না, সুতরাং জন্মের উচ্ছেদ নাই। এই তর্ক বিষয়ে—জন্ম কৰ্ম্ম-নিমিত্তক অর্থাৎ পূর্বকৃত কৰ্ম্মের ফল ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জন্ম; এইরূপে প্রবর্তমান প্রমাণগুলি তর্ক কর্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ অযুক্ত নিষেধের দ্বারা যুক্ত বিষয়ে অনুজ্ঞাত হয়। তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ের বিভাগ অর্থাৎ যুক্তায়ুক্ত বিচার করে বলিয়া, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়। সেই এই এবস্তৃত তর্ক, প্রমাণ সহিত হইয়া ‘বাদে’ পদার্থের সাধন এবং উপালম্ব অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনের নিমিত্ত হয়। এই জন্ম প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও পূর্ক উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। ‘প্রমাণ’ শব্দের দ্বারা যে চারিটা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, ‘তর্ক’ তাহার মধ্যে কেহ নহে, নূতন কোন প্রমাণও নহে। কারণ, ‘তর্ক’ তত্ত্বনিষ্ঠারক নহে; তত্ত্বনিষ্ঠাযের জন্ম প্রমাণই প্রযুক্ত হয়। ঐ প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইলে তর্ক, যুক্ততবে প্রবর্তমান প্রমাণকে অনুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করে। এই তথ্যেই প্রমাণ সম্ভব, ইহাই যুক্ত—এইরূপে প্রমাণ-সম্ভব-প্রযুক্ত তত্ত্ব-বিশেষের অনুমোদনই তর্কের অনুগ্রহ। এইরূপে তর্কানুগৃহীত হইয়া প্রমাণই তত্ত্ব-নিষ্ঠা জন্মায়; সুতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী, অথবা কোন প্রমাণ নহে; প্রমাণের সহকারী হইয়াই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায়।

জন্মের কারণ অনিত্য হইলে ঐ কারণের বিনাশ হইতে পারে; সুতরাং মুক্তির আশা আছে। জন্মের কারণ নিত্য হইলে তাহার বিনাশ অসম্ভব; সুতরাং জন্মের উচ্ছেদ অসম্ভব। কারণ, জন্মের কারণ চিরকালই থাকিবে, জন্ম-প্রবাহও চিরকাল চলিবে, মুক্তির আশা নাই। জন্ম আকস্মিক হইলেও তাহার আত্যাত্মিক নিবৃত্তির কারণ না থাকায় মুক্তির আশা থাকে না।—এই তর্ক বিষয়ে “জন্ম-কৰ্ম্ম-নিমিত্তকং বৈচিত্র্যং” ইত্যাদি প্রকারে প্রমাণগুলি প্রবৃত্ত হইলে তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। প্রমাণের দ্বারা বুঝা গেল, জন্ম কৰ্ম্মজন্ম অর্থাৎ পূর্বকৃত কৰ্ম্মফল—ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-নিমিত্তক,—কারণ, জন্ম বিচিত্র। ইহাতে সংশয় হইলে তর্ক তাহা নিবৃত্তি করে। তর্ক বুঝাইয়া দেয়—জন্ম কৰ্ম্ম-নিমিত্তক, ইহাই যুক্ত। ইহাতেই প্রমাণ সম্ভব। কারণ, উত্তম মন্যম অধম, দ্বীপুরুষ, সকল বিকল প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা-বিশিষ্ট জন্ম একরূপ কোন কারণজন্ম অথবা কাহারও স্বেচ্ছাকৃত হইতে পারে না, বিনা কারণেও হইতে পারে না। কার্য বিচিত্র হইলে তাহার কারণও বিচিত্র হইবে। সুতরাং পূর্বজন্মের কৰ্ম্মফল, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম এই বিচিত্র জন্মপ্রবাহের কারণ। বিভিন্ন বিজাতীয় কৰ্ম্মফলেই এই বিচিত্র জন্মপ্রবাহ নিম্ন হইতেছে। ঐ কৰ্ম্মফল জন্ম, উহার নাশ আছে। তত্ত্বজ্ঞানাদির দ্বারা উহার একেবারে উচ্ছেদ হইলে জন্মের উচ্ছেদ হইবেই। সুতরাং মুক্তির

আশা সকলেরই আছে। এইরূপে তর্ক, যুক্ত তত্ত্বে প্রবর্তমান পূর্বোক্ত প্রমাণকে অনুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করিল, তখন ঐ তর্কানুগৃহীত ঐ প্রমাণই জন্মকর্ণনিমিত্তক এই তত্ত্বনিশ্চয় সম্পাদন করিল। আর সংশয় থাকিল না। মহর্ষির দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, সুতরাং তর্ক তাহাতেই অন্তর্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য অনেক সময়ে প্রমাণের সহকারী তর্কের বড় প্রয়োজন হয়,—তাহার বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। তাই বিশেষ করিয়া তাহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। (তর্কসূত্র দ্রষ্টব্য)

ভাষ্য। নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণানাং ফলং, তদবসানো বাদঃ। তস্মাৎ পালনার্থং জল্পবিতণ্ডে। তাবতো তর্কনির্ণয়ো লোকযাত্রাং বহত ইতি। সোহয়ং নির্ণয়ঃ প্রমেয়ান্তর্ভূত এবমর্থং পৃথগুদ্दिष्ट ইতি।

অনুবাদ। প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের ফল তত্ত্বজ্ঞানকে ‘নির্ণয়’ বলে। বাদ (তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা) সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ নির্ণয় পর্য্যন্ত। সেই নির্ণয়ের রক্ষার জন্য ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ (আবশ্যক হয়)। সেই এই তর্ক ও নির্ণয় (মহর্ষি-কতি পদার্থবয়) লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। সেই এই নির্ণয় প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও এই জ্ঞান পৃথক্ উদ্दिष्ट হইয়াছে।

টিপ্পনী। তত্ত্বজ্ঞানমাত্রকে নির্ণয় বলিলে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞানও নির্ণয় হইয়া পড়ে। তাই বলিয়াছেন—“প্রমাণানাং ফলম্”। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “প্রমাণানাং” এই বহুবচনান্ত বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যই লক্ষিত হইয়াছে;— কারণ, তাহাতেই তর্কযুক্ত প্রমাণসমূহের মেলন আছে। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্ব্বক তত্ত্বনিশ্চয়ই “নির্ণয়” পদার্থ। তর্ক সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ফলও নির্ণয় হইবে। মূল কথা—তর্কপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান না হইলে তাহা নির্ণয় পদার্থ নহে, ইহাই “প্রমাণানাং ফলং” এই কথার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। মহর্ষিও তর্কের পরই নির্ণয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য)। বাদি-নিরাস হইলেই “জল্প” ও “বিতণ্ডা”র নিবৃত্তি হয়। কিন্তু নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত “বাদ”-বিচারের নিবৃত্তি নাই। কারণ, “নির্ণয়”ই বাদের উদ্দেশ্য। “জল্প” ও “বিতণ্ডা” এই নির্ণয়কে রক্ষা করিবার জন্যই আবশ্যক হয়। পূর্ব্বোক্ত “তর্ক” ও “নির্ণয়” লোকযাত্রার নির্বাহক। কারণ, লোক সমস্ত বুঝিয়া বুঝিয়া প্রবর্তমান হইয়া তর্ক ও নির্ণয়ের দ্বারা ত্যাগা ত্যাগ করে, গ্রাহ্য গ্রহণ করে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই “লোক” বলিতে পরীক্ষা-সমর্থ লোকই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরীক্ষক ভিন্ন সাধারণ লোক তর্ক করিতে পারে না। এই নির্ণয় জ্ঞান-পদার্থ। সুতরাং প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞান-পদার্থ উল্লিখিত হওয়ার উহা প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইয়াছে। জ্ঞানবার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, উহা প্রমাণেও অন্তর্ভূত হইয়াছে। কারণ, ঐ নির্ণয় যখন কোন পদার্থ-বিশেষের নিশ্চায়করূপে



উপস্থিত হইবে, তখন উহা প্রমাণ হইবে; তাহা না হইলে উহা প্রমাণের ফলই থাকিবে। প্রমাণক ও প্রমাণ-কন, এবং প্রমাণক ও প্রমেয়ক অবস্থা-ভেদে এক পদার্থে থাকিতে পারে, ইহা পরে (দ্বিতীয়াধ্যায়ে) মহর্ষিহুত্রেই ব্যক্ত হইবে। নির্ণয়ের পৃথক্ উদ্দেশ্যের কারণ ভাষ্যেই পরিষ্কৃত রহিয়াছে।

ভাষ্য। বাদঃ খলু নানাপ্রবক্তৃকঃ প্রত্যাদিকরণসাধনোহন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানো বাক্যসমূহঃ পৃথগুদ্ভিষ্ট উপলক্ষণার্থং। উপলক্ষিতেন ব্যবহারস্তত্ত্বজ্ঞানায় ভবতীতি। তদ্বিশেষমৌ জল্পবিতণ্ডে তত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থমিত্যুক্তম্।

অনুবাদ। অনেক-বক্তৃক অর্থাৎ যাহাতে বক্তা একের অধিক, প্রত্যেক সাধ্যে সাধনবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে উভয় পক্ষই স্ব স্ব সাধ্যে হেতু প্রয়োগ করেন, একতর সাধ্যের নির্ণয়াবসান অর্থাৎ বাদো ও প্রতিবাদীর সাধ্যের মধ্যে যে কোন সাধ্য নির্ণয়ই যাহার শেষফল, এমন বাক্যসমূহরূপ বাদ উপলক্ষণের জন্ত অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের জন্ত পৃথক্ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। উপলক্ষিতের দ্বারা অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত সেই বাদের দ্বারা ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হয়। তদ্বিশেষ অর্থাৎ সেই বাদ হইতে বিশিষ্ট (কোন কোন অংশে ভিন্ন) জল্প ও বিতণ্ডা তদ্বনিশ্চয়-সংরক্ষণের জন্য পৃথক্ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে, ইহা উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। এক জন বক্তার অথবা শাস্ত্রকর্তার পূর্বপক্ষ, উত্তর-পক্ষ, দ্বন্দ্ব-সমাধান, প্রতিপাদক বাক্যসমূহ "বাদ" নহে; তাই বলিয়াছেন—"নানাপ্রবক্তৃকঃ"। বিতণ্ডার প্রতিবাদী স্বসাধ্যে হেতু-প্রয়োগ করেন না; সুতরাং তাহা "বাদ" হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন—"প্রত্যাদিকরণসাধনঃ"। যে কোনরূপে এক পক্ষ নিরস্ত হইলেই "জল্প" কথার সমাপ্তি হয়; কিন্তু একতর সাধ্যের নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত "বাদ" কথার সমাপ্তি হয় না। তাই বলিয়াছেন—"অন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানঃ"। সাধ্যকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ উদ্দেশ্য করিয়া হেতু প্রয়োগ করা হয়; এ জন্ত "অধিকরণ" শব্দের দ্বারা ("অধিক্রিয়তে উদ্ভিষ্টতে যৎ" এইরূপ বুৎপত্তিতে) সাধ্য বুঝা যায়। তাই পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে সাধ্য বুঝাইবার জন্য "অধিকরণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্য-সমূহরূপ "বাদ" শব্দপদার্থ বলিয়া মহর্ষি কথিত "প্রমেয়" পদার্থেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বাদের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় বলিয়া বাদের বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন; তাই মহর্ষি তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার "বাদে"র পরে এক সঙ্গেই "জল্প" ও "বিতণ্ডার" কথা বলিয়াছেন। "বিশিষ্টোক্তে ভিত্তিতে" এইরূপ বুৎপত্তিতে এখানে "বিশেষ" শব্দের অর্থ বিশিষ্ট। "জল্প" ও "বিতণ্ডা,"

সংশয় প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞায় বাদ হইতে সর্বথা ভিন্ন নহে। কিন্তু বাদ হইতে বিশিষ্ট। কারণ, উহার “কথা”রই দুইটা বিশিষ্ট প্রকার মাত্র। “কথাত্ত্ব”রূপে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার অভেদই আছে, ইহা সূচনা করিবার জন্তই “তদ্বিমো” না বলিয়া বলিয়াছেন,—“তদ্বিশেষৌ”। জল্প ও বিতণ্ডার বাদ হইতে বিশেষ কি? এতদ্বস্তরে জ্ঞায়বাস্তবিককার বলিয়াছেন,—“অঙ্গাধিকামঙ্গহানিশ্চ”। “বাদে” ছল, জ্ঞাতি ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, কিন্তু জল্পে তাহা আছে; সূত্ররং বাদ হইতে জল্পে অঙ্গাধিক্য আছে। জল্পের জ্ঞায় বাদেও উভয় পক্ষের স্থাপনা আছে; কিন্তু বিতণ্ডায় স্বপক্ষ-স্থাপনা না থাকায়, বাদ হইতে অঙ্গহানি আছে। জল্প ও বিতণ্ডা শুধুনিশ্চয় রকার জন্ত আবশ্যক, ইহা চতুর্থার্থ্যায়ের শেষে মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। সূত্ররং জল্প ও বিতণ্ডার পৃথক্ উল্লেখের কারণ তাহাতেই উক্ত হইয়াছে; তাই বলিয়াছেন—“ইত্যুক্তং” অর্থাৎ এ কথা মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। কেহ বলেন—নির্ণয় পদার্থ-ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গতঃ ভাব্যাকারই এ কথা বলিয়া আসিয়াছেন; তাই বলিয়াছেন—“ইত্যুক্তম্”। ‘জল্পবিতণ্ডে’ এই স্থলে ‘পৃথগুদ্ভিষ্টে’ এইরূপে পূর্বোক্ত বাক্যের লিঙ্গ বচন পরিবর্তন পূর্বক অঙ্গমঙ্গ করিয়া বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। নিগ্রহস্থানেভ্যঃ পৃথগুদ্ভিষ্টো হেত্বাভাসা বাদে চোদনীয় ভবিষ্যন্তীতি। জল্পবিতণ্ডয়োস্ত নিগ্রহস্থানানীতি।

অনুবাদ। হেত্বাভাসগুলি বাদে অর্থাৎ বাদ নামক বিচারে উদ্ভাবনীয় হইলে, এ জন্য ( নিগ্রহস্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইলেও ) নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক্ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। জল্প ও বিতণ্ডাতে কিন্তু ( যথাসম্ভব ) সকল নিগ্রহস্থানই উদ্ভাবনীয় হইবে।

টিপ্পনী। যাহা ব্যভিচার প্রকৃতি কোন দোষযুক্ত বলিয়া প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর জ্ঞায় প্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। মহর্ষি গৌতমের মতে এই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। জ্ঞায়ের দ্বারা তত্ত্ববির্নয় করিতে এই হেত্বাভাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সূত্ররং জ্ঞায়বিজ্ঞায় হেত্বাভাস অবশ্য উল্লেখ্য। কিন্তু মহর্ষি যখন তাঁহার দোড়শ পদার্থ নিগ্রহস্থানের বিভাগে হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আর হেত্বাভাসের পৃথক্ উদ্দেশের প্রয়োজন কি? এতদ্বস্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাব্যতা সূচনার জন্তই হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। জল্প ও বিতণ্ডার পরাজয়-সূচনার জন্ত সম্ভব হইলে, সর্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায় এবং করিতে হয়। কিন্তু বাদবিচারে সর্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নির্দিষ্ট। তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরু প্রকৃতির সহিত তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশে বাদবিচার করেন। জিজ্ঞাসা না থাকায় তিনি গুরু প্রকৃতি বক্তার অপ্রতিভাদি দোষের উদ্ভাবন করেন না, করিলে সে বিচারের বাদত্ব থাকে না। কিন্তু গুরু প্রকৃতি বক্তা ভ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ দুষ্ট হেতুর দ্বারা সাদ্য সাধন করিলে, অথবা কোন অপসিদ্ধান্ত বলিলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য অবশ্য তাহার উদ্ভাবন করিবেন। যাহা সেই



হলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রতিকূল, তদ্বিজ্ঞান শিখা কখনই তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। (বাদহজ্র দ্রষ্টব্য)। আগন্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহ-স্থানেরও পৃথক্ উল্লেখ করা উচিত? কারণ, তাহারও হেতুভাসের দ্বারা বাদবিচারে উদ্ভাব্য। এতদ্বত্তরে তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, হেতুভাসের পৃথক্ উল্লেখে বাদ বিচারে কেবল হেতুভাসরূপ নিগ্রহ-স্থানই উদ্ভাব্য, ইহা সূচিত হয় নাই। উহার দ্বারা অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহ-স্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, যে বৃত্তিতে হেতুভাসের বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝা যায়, সেই বৃত্তিতে অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝা যায়। সুতরাং সেগুলির আর পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। হেতুভাসের পৃথক্ উল্লেখই সেগুলির পৃথক্ উল্লেখের ফল সিদ্ধ হইয়াছে। মূলতঃ, যে সমস্ত নিগ্রহ-স্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারে তত্ত্বনির্ণয়েরই বাধাত হত, বাদবিচারে তাহারাই উদ্ভাব্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান হেতুভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া মহর্ষি ইহাই সূচনা করিয়াছেন। প্রথম সূত্রেই ইহা সূচনা করিবার ফল কি? ন্যায়-বাস্তবিকার বলিয়াছেন—“বিজ্ঞাপ্রস্থান-ভেদজ্ঞাপনার্থত্বাৎ।” তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরম্পরায় নিগ্রহের উপযোগী বলিয়া বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডাও বিদ্যা; তাহাদিগের প্রস্থানের অর্থাৎ ব্যাপারের ভেদ বুঝাইবার জন্য ঐরূপ সূচনা আবশ্যিক। এই জল্পই “জল্পবিতণ্ডয়ন্ত নিগ্রহস্থানানি” এই অংশের দ্বারা ভাব্যকার জল্প ও বিতণ্ডাদিগের বাদবিজ্ঞার বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছেন। জল্প ও বিতণ্ডার ভেদ সূত্রকার নিজেই দেখাইবেন। অহঙ্কারী জিগীষু অপ্রতিভা প্রভৃতি যে কোন প্রকার নিগ্রহ-স্থানের দ্বারা পরাপ্ত হইলে অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া তদ্বিজ্ঞান হইবে; তখন তাহাকে বাদবিচারের দ্বারা তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। সুতরাং জল্প ও বিতণ্ডার সর্ববিধ নিগ্রহ-স্থানই উদ্ভাব্য।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাব্য ও বাস্তবিকের উল্লেখপূর্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ‘হেতুভাস’ নিগ্রহস্থান নহে, হেতুভাস প্রয়োগই নিগ্রহস্থান, এইরূপ নিজ মত প্রকাশ করিয়া সমাপন করিয়াছেন, কিন্তু উল্লেখ্যতকর ও ভাব্যকারের তাৎপর্য বাচস্পতি মিশ্র দেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাগতে বৃত্তিকারের প্রতিবাদ হইতেই পারে না।

ভাষ্য। ছলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানানাং পৃথগুপদেশ উপলক্ষণার্থ ইতি। উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবর্জনং ছলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানানাং পরবাক্যে পর্য্যায়যোগঃ। জাতেশ্চ পরেণ প্রযুক্ত্যনানার্যাঃ শ্লভঃ সমাধিঃ। স্বয়ংকৃৎ প্রয়োগ ইতি।

অনুবাদ। ছল, জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থানের পৃথক্ উল্লেখ উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত। (পরিজ্ঞানের ফল দেখাইতেছেন) উপলক্ষিত অর্থাৎ

পরিজ্ঞাত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিজের বাক্যে পরিবর্তন ( অপ্রয়োগ ), পরবাক্যে পর্যায়যোগ অর্থাৎ উদ্ভাবন হয়। এবং পরকর্তৃক প্রযুক্ত্যমান জাতির ( জাতি নামক অসম্ভবের ) সমাধি ( সমাক্ উত্তর ) স্থূলভ হয় এবং স্বয়ংপ্রয়োগ স্থকর হয়।

টিপ্পনী। ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের পরিজ্ঞান অর্থাৎ সর্বতোভাবে জ্ঞান প্রয়োজন। এ জন্য তাহারা প্রমের পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের লক্ষণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। উহাদিগের পরিজ্ঞান বাস্তবিক ঐগুলি নিজের বাক্যে প্রয়োগ করিবেন না, পরের বাক্যে উদ্ভাবন করিবে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। এবং ‘জাতি’নামক অসম্ভবের পরিজ্ঞান থাকিলেই পরপ্রযুক্ত ‘জাত্যন্তর’র সমাক্ উত্তর করিতে পারা যায় এবং স্বয়ং ঐ জাতির প্রয়োগ স্থকর হয়। যদিও স্ববাক্যে জাতির প্রয়োগ নাই, ইহা পূর্বে বলিয়াছেন, তাহা হইলেও যেখানে প্রতিবাদী জাত্যন্তর করিতেছে, বাদী সভ্যদিগকে সেই কথা বলিলেন, সভ্যগণ প্রশ্ন করিলেন—“কেন? কি প্রকারে ইহা জাত্যন্তর হইল? চতুর্দশশতিকা প্রকার জাতির মধ্যে ইহা কোন্ট?” সংশয়ের এই প্রশ্ন নিরাকরণের জন্য তখন বাদী ঐ ‘জাতি’র প্রয়োগ করিলেন। জাতির পরিজ্ঞান থাকিলেই ঐ স্থলে তাহার জাতি প্রয়োগ স্থকর হয়। তিনি নিজ বাক্যে জাতি প্রয়োগ করিলেন না, ইহা স্থিরই আছে। সুতরাং পূর্বাঙ্গের বিরোধ হয় নাই। ফলতঃ জাত্যভিজ্ঞ ব্যক্তিই সভ্যদিগের ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রতিবাদী অসম্ভব করিতেছেন, ইহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং জাতিরও পরিজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। মূলকথা, সংশয় প্রভৃতি পূর্বোক্ত পদার্থগুলির জায় ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানও জায়বিজ্ঞা সাদ্য তত্ত্বজ্ঞানে উপযোগী। সুতরাং ইহারও সংশয়াদির জায় জায়বিজ্ঞার অসাধারণ প্রতিপাদ্য। ভাষ্যকার সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থের জায়বিদ্যায় উপযোগিতা বর্ণন করিয়া, ইহার জায়বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য, ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। এখন এই অসাধারণ প্রতিপাদ্যরূপ গ্রহণভেদ জ্ঞাপনের জন্য সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেরে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ভাষ্যকারের এই প্রথম কথা স্মরণ করিতে হইবে। কারণ, তাহাই মূলকথা। পরের কথাগুলি তাহারই সমর্থনের জন্য বিশেষ করিয়া অভিহিত হইয়াছে। ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের কথা যথাস্থানেই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। সেয়মায়ীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থেবিভজ্যমানা—প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্বধর্মণাং বিজ্ঞানেন্দ্রেণ প্রকীর্ণিতা ॥ তদ্বিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যং। ইহ তথ্যাত্মবিজ্ঞায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোহপবর্গপ্রাপ্তিরিতি। ১।



অনুবাদ। প্রমাণাদি পদার্থ কর্তৃক বিভজ্যমান (পৃথক্, ক্রিয়মান) অর্থাৎ প্রমাণাদি পূর্বোক্ত ঘোড়শ পদার্থ যে বিভক্তকে অস্ত্র বিভক্ত হইতে পৃথক্ করিয়াছে, সেই এই আদৌক্ষিকী (জ্ঞায়বিজ্ঞা) বিভক্তার উদ্দেশে অর্থাৎ বিভক্তার পরিগণনাস্থলে সর্ববিজ্ঞার প্রদীপরূপে, সর্বকর্মের উপায়রূপে, সর্বধর্মের আশ্রয়রূপে প্রকৌর্ভিত হইয়াছে।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সলাভ বিজ্ঞানুসারে বৃত্তিতে হইবে। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞাতে কিন্তু আত্মাদিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়সলাভ অপবর্গপ্রাপ্তি, অর্থাৎ অস্ত্র বিভক্ত হইতে এই জ্ঞায়বিজ্ঞায় তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সে বিশেষ আছে। ইতি।

টীকণী। উপসংহারে ভাষ্যকার জ্ঞায়বিজ্ঞার শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্ত বলিয়াছেন যে, এমন কোন পুরুষার্থ নাই, যাহাতে এই জ্ঞায়বিজ্ঞা আবশ্যক নহে। এই জ্ঞায়বিজ্ঞা-ব্যাংপাদিত প্রমাণাদিকে অবলম্বন করিয়াই অস্ত্রাস্ত্র বিভক্তা স্ব স্ব প্রতিপাক্ত তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যেই সর্ববিজ্ঞাগর্ভস্থ গুহ তত্ত্ব দর্শন করা যায়। তাই সর্ববিজ্ঞার প্রকাশক বলিয়া ইহা সর্ববিজ্ঞার প্রদীপরূপ। ইহা সর্বকর্মের উপায়; কারণ, এই জ্ঞায়বিজ্ঞা-পরিণোদিত প্রমাণাদির দ্বারা ইহা সর্ববিজ্ঞার প্রতিপাক্ত কর্মগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। সাম-দানাদি, কৃষিবাণিজ্যাদি কর্মে এই জ্ঞায়বিজ্ঞাই মূল। ইহা সর্বধর্মের আশ্রয়। তাৎপর্যা-টীকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ-প্রবর্তনা অর্থাৎ লোককে কর্মে প্রবৃত্ত করা সর্ববিজ্ঞার ধর্ম। সেগুলিও এই জ্ঞায়বিজ্ঞার অধীন। এই বিজ্ঞার সাহায্য লইয়াই অস্ত্র বিভক্তা পুরুষ-প্রবর্তনা করেন। বিমূশ্কারী চিন্তাশীল পুরুষগণ এই জ্ঞায়বিজ্ঞার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিয়াই ক্রেশলাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার বেরূপ বলিয়াছেন, বিজ্ঞার পরিগণনাস্থলে জ্ঞায়বিজ্ঞা এইরূপেই কৌর্ভিত হইয়াছে। জ্ঞায়বিজ্ঞা বেদের উপাঙ্গ বলিয়া পুরাণে কৌর্ভিত। “মোক্ধর্মে” ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়া গিয়াছেন যে, “গরীক্ষনী আদৌক্ষিকীকে আশ্রয় করিয়া আমি উপনিষদের সারোচ্চার করিতেছি”। ভাষ্যকারোক্ত শ্লোকটির চতুর্থ পাদে “বিন্যোক্ষেণে গরীক্ষনী” এবং “বিন্যোক্ষেণে পরীক্ষিতা” এইরূপ পাঠভেদও দৃষ্ট হয়। মহামতি চাণক্য-প্রণীত “অর্থশাস্ত্র” গ্রন্থেও এই শ্লোকটা দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে চতুর্থ পাদে “শব্দদৌক্ষিকী মতা” এইরূপ পাঠ আছে। চাণক্যই এই জ্ঞায়ভাষ্যের কর্তা, ব্যাংসায়ন তাঁহারই নামান্তর—এই মত সমর্থনে চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের ঐ শ্লোকটাও উল্লিখিত হইয়া থাকে।

যদি সর্ববিজ্ঞার উপযোগী “প্রমাণ” প্রভৃতি পদার্থগুলি এই শাস্ত্রের ব্যাংগাঙ্গ হইল, তাহা হইলে সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা মোক্ষকে এই শাস্ত্রের ফল বলিয়া বুঝা যায় না; কারণ, ব্যাংগাঙ্গ প্রমাণাদি পদার্থের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া বুঝা যায়, ইহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানে ভিন্ন

ভিন্ন বিজ্ঞানসাধ্য সৰ্ববিধ নিঃশ্রেয়সই লাভ করা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়সের অত্র বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়স হইতে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কা মনে করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সকল বিজ্ঞাতেই “তত্ত্বজ্ঞান” এবং “নিঃশ্রেয়স” আছে। অত্র বিজ্ঞানসাধ্য সেই সমস্ত নিঃশ্রেয়স হইতে জ্ঞানবিজ্ঞার মুখ্য ফল নিঃশ্রেয়স যে বিভিন্ন হইবে, ইহা সেই সমস্ত বিজ্ঞা ও তাহার ফল তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। মনুজ্ঞ তরী, বার্তা, দণ্ডনীতি এবং আত্মিকী, এই চতুর্বিধ বিজ্ঞার মধ্যে বেদবিজ্ঞার নাম “জরী,” বাগাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, সর্গপ্রাপ্তিই সেখানে নিঃশ্রেয়স। কৃষাদি জীবিকা-শাস্ত্রের নাম বার্তা, ভূমাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, কৃষি-বাণিজ্যাদি লাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সাম, দান, ভেদ দণ্ডাদি প্রয়োগ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, রাজ্যাদিলাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। এই সমস্ত বিজ্ঞার প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বভাব পর্যালোচনা করিলেই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়াছেন—“বধ্যবিজ্ঞাং বেদিতবাম্।” এবং যদিও প্রমাণাদি পদার্থগুলি সৰ্ববিজ্ঞার উপযোগী বলিয়া সৰ্ববিজ্ঞা-সাধারণ, কিন্তু আত্মা প্রভৃতি “প্রমেয়”রূপ অসাধারণ পদার্থের উল্লেখ থাকায়, জ্ঞানবিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা না হইলেও অধ্যাত্মবিজ্ঞা। তাই বলিয়াছেন—“ইহ ত্বধ্যাত্মবিজ্ঞায়ান্” ইত্যাদি। অর্থাৎ সৰ্ববিজ্ঞা(সাধারণ প্রমাণাদি পদার্থের ব্যুৎপাদক বলিয়া, সৰ্ববিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভের সহায় হইলেও এবং সংশয়াদি প্রহান-ভেদবশতঃ উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা না হইলেও, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া এবং আত্মনিরূপণরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বলিয়া, এই জ্ঞানবিজ্ঞা যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞা, তখন ইহাতে আত্মাদি বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেয়স লাভ বুঝিতে হইবে।

এখানে স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার জ্ঞানবিজ্ঞা কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে, এ কথা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন এবং এখানেও প্রথমে জ্ঞানবিজ্ঞাকে সৰ্ববিজ্ঞার প্রদীপ এবং সৰ্বকর্মের উপায় এবং সৰ্বকর্মের আশ্রয় বলিয়াছেন। সৰ্বকর্মের আশ্রয় বলিতে আমরা সৰ্বকর্মের রক্ষক বুঝি; উত্তোতকর ও বাচস্পতি অন্তরূপ বুঝিয়াছেন। সে বাহ্য হউক, ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তিনি যে সৰ্ববিধ নিঃশ্রেয়সই জ্ঞানবিজ্ঞার প্রয়োজন বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের ঐ কথার অবতারণায় বলিয়াছেন যে, হৃত্তকার মোক্ষকে জ্ঞানবিজ্ঞার প্রয়োজন বলিয়াছেন, কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এমন কোন প্রয়োজন নাই, বাহাতে জ্ঞানবিজ্ঞা নিমিত্ত নহে—আবশ্যক নহে। সেখানে তাৎপর্য্যপরিণতিতে উদয়ন বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারোক্ত অত্র প্রয়োজনগুলি হৃত্তকারোক্ত প্রয়োজনের বিরোধী নহে, পরস্পর অনুরূপ। ইহা দেখাইতেই বাচস্পতি হৃত্তকারোক্ত প্রয়োজনের অস্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ভাষ্যকার অন্ত্যস্ত বিজ্ঞার ফল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলিকে ও জ্ঞানবিজ্ঞার ফল বলিয়াছেন এবং তাহা সত্য, এ কথা তাৎপর্য্যটীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। উদয়নও



এই বিষয়ের উপসংহারে বাচস্পতির তাৎপর্যব্যাখ্যায় মোক্ষকে প্রধান বলিয়া অত্র বিজ্ঞার দৃষ্ট ফলগুলিকে জ্ঞানবিজ্ঞার গৌণ ফল বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কেহ না বলিয়া পারেন না। তবে অত্র বিজ্ঞাসাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলিই কেবল ন্যায়বিজ্ঞার ফল নহে, জ্ঞানবিজ্ঞা যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞা, তখন তাহার অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স ফল রহিয়াছে এবং তাহাই প্রধান ফল; সুতরাং ফলাংশেও অত্র বিজ্ঞা হইতে ন্যায়বিজ্ঞার ভেদ আছে। পরন্তু যে বিদ্যার বাহ্য মুখ্য প্রয়োজন, তাহাকেই সেই বিদ্যার “নিঃশ্রেয়স” বলা হয় এবং তাহার সাফাৎ সাধনকেই সেই বিদ্যার “তত্ত্বজ্ঞান” বলা হয়। জ্ঞানবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া তাহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং তাহার সাফাৎ সাধন আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞান, সুতরাং ভাব্যকার অপবর্গকে জ্ঞানবিজ্ঞার “নিঃশ্রেয়স” বলিয়াছেন এবং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাতে অজ্ঞাত নিঃশ্রেয়স জ্ঞানবিজ্ঞার ফলই নহে, এ কথা বলা হয় নাই। অধ্যাত্ম অংশ লইয়া জ্ঞানবিজ্ঞার বাহ্য মুখ্য ফল, সেই ফলাংশে অজ্ঞাত দৃষ্টফলক বিজ্ঞা হইতে জ্ঞানবিজ্ঞার ভেদ দেখাইতেই ভাব্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। উপনিষদের জ্ঞান “জ্ঞানবিজ্ঞা” যদি কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইত এবং মোক্ষ ভিন্ন আর কোন ফল তাহার না থাকিত, তাহা হইলে ভাব্যকারের ঐ কথার কোন প্রয়োজনও ছিল না। অত্র বিজ্ঞার ফল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলি জ্ঞানবিজ্ঞার ফল বলিয়াই সেই সকল বিজ্ঞার ফলের সহিত জ্ঞানবিজ্ঞার ফলের সম্পূর্ণ অভেদের আপত্তি হয়। এজন্তই ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানবিজ্ঞা যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞা, তখন অপবর্গরূপ মুখ্য ফল থাকার সে আপত্তি হইবে না; কারণ, সে ফলটুকু আর দৃষ্টফলক অত্র বিজ্ঞার নাই? তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, “জ্ঞানবিদ্যা” বেদের কর্মকাণ্ড, বার্তা এবং দণ্ডনৈতি-বিদ্যার ন্যায় কেবল দৃষ্ট-ফলক বিদ্যাও নহে, আবার উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞাও নহে; কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা, অপবর্গই ইহার মুখ্য প্রয়োজন, অন্যত্র সমস্ত নিঃশ্রেয়স ইহার গৌণ প্রয়োজন; কারণ, তাহা লাভ করিতেও এই জ্ঞানবিদ্যা আবশ্যক। তাহা হইলে জ্ঞানবিদ্যা অত্র সমস্ত বিদ্যা হইতে বিশিষ্ট, এই বিশিষ্ট বিশেষটুকু আর কোন বিদ্যাতেই নাই। মহর্ষি প্রথম হুত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই হুচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। জ্ঞানবিজ্ঞা মুখ্য ও গৌণ সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই সম্পাদন করে—ইহা যখন সত্যকথা, সর্বস্বীকৃত কথা, তখন মহর্ষি নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা তাহা না বলিবেন কেন? তাহা বলিলে এবং তাহা বুঝিলে অত্র কোন অসুপপত্তিও দেখা যায় না এবং ভাব্যকারও যে হুত্রে অত্র নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই গ্রহণ করেন নাই, ইহাও বুঝা যায় না। পরন্তু তিনি যখন সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই জ্ঞানবিজ্ঞা আবশ্যক বলিয়াছেন, তখন হুত্রে কারের কথার দ্বারাও তিনি ইহা সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝা যায়—ইহা বলা যায়। তবে তিনি অনেক স্থলে যে ‘অপবর্গ’ অর্থেই নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হুত্রে অত্র নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রতিপাত্ত মুখ্য নিঃশ্রেয়স অপবর্গের কথা বলিবার জন্ত, তাহাতে হুত্রে অত্র নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা তিনি কেবল অপবর্গই বুঝিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাৎপর্যটাকার

হুজুর নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা কেবল অপবর্ণের ব্যাখ্যা করিলেও এবং উদয়ন প্রভৃতি তাহার সমর্থন করিলেও ভাষ্যকার যে সৰ্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সেই জ্ঞায়বিজ্ঞা আবশ্যক বলিয়াছেন এবং অজ্ঞাত বিজ্ঞার নিঃশ্রেয়সগুলিও জ্ঞায়বিজ্ঞার ফল বলিয়াছেন এবং তাহা সত্যই বলিয়াছেন—এ কথা ত তাৎপর্যটীকাকার প্রভৃতিও বলিয়াছেন; তবে আর তাহাদিগের হুজুর নিঃশ্রেয়সের ব্যাখ্যায় অজ্ঞাত সকল নিঃশ্রেয়সকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অদৃষ্ট-নিঃশ্রেয়স অপবর্ণের প্রতি এত পক্ষপাত কেন? সুধীগণ উপেক্ষা না করিয়া ইহার মীমাংসা করিবেন এবং মহর্ষি অজ্ঞাত অপবর্ণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াও কেবল প্রথম হুত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তা করিবেন। মোক্ষ শব্দের বা অপবর্ণ শব্দের প্রয়োগ করিলেও জীবমুক্তি ও পরা মুক্তি তাহার দ্বারা বুঝা যাইত। কেবল জীবমুক্তিও যদি প্রথম হুত্রে মহর্ষির বক্তব্য হয়, তাহা হইলেও নিঃশ্রেয়স শব্দপ্রয়োগ সার্থক হয় না; কারণ, উহার দ্বারা পরা মুক্তিও বুঝা যায়। তাৎপর্য-কল্পনার দ্বারা জীবমুক্তিমাত্রই যদি বুঝিতে হয়, তবে তাহা মোক্ষ প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে। কণাদহুত্রেও প্রথমে নিঃশ্রেয়স শব্দই দেখা যায়।<sup>১</sup> টীকাকারগণ তাহার মোক্ষমাত্র অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও হুত্কার স্বাক্ষর মোক্ষ প্রভৃতি কোন শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; কেন, তাহা ভাবা উচিত। স্বাক্ষর শব্দ প্রয়োগই হুত্রে করিতে হয়, ইহা হুত্রে লক্ষণে পাওয়ার<sup>২</sup> সুধীগণ এ সকল কথাও চিন্তা করিয়া মহর্ষির তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন। এখন একবার স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার ভাষ্যরস্তু হইতে এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমেই সামান্ততঃ প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের অল্পমান দেখাইয়াছেন। তাহার পরে প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি—এই চারিটির স্বরূপ বলিয়া ঐ চারিটি থাকাতাই তত্ত্বপরিসমাপ্তি হইতেছে, এই কথা বলিয়াছেন। শেষে ঐ তত্ত্ব কি, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাব ও অভাবরূপ দুইটা তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং অভাবরূপ তত্ত্বও যে প্রমাণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা বলিয়াছেন। শেষে মহর্ষি ভাব পদার্থের ঘোঁলটা প্রকার সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এই কথা বলিয়া মহর্ষির কথিত সেই বোড়শ পদার্থ প্রদর্শনের জন্ত মহর্ষির প্রথম হুত্রে অবতারণা করিয়া তাহার সমাস ও বিগ্রহবাক্য এ৭ং বস্তু বিভক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশপূর্বক সংক্ষেপে হুত্রে বক্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়াছেন।

শেষে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাফাং সাধন, ইহা বলিয়া, তাহা কিরূপে বুঝা যায়, ইহা বলিবার জন্ত দ্বিতীয় হুত্রে কথা বলিয়াছেন এবং তাহা বলিবার জন্তই হয়, হান, উপায় ও অধিগম্য—এই চারিটিকে ‘অর্থপদ’ বলিয়া তাহাদিগের সম্যক্ জ্ঞানে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়, এ কথা বলিয়াছেন।

তাহার পরে হুত্রে সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন হইয়াছে,

১। স্বাক্ষরমসলিঙ্গঃ সারবদ্বিতোবুখম্।

২. অন্তোভবনবদ্যাক হুত্রে প্রতিক্রিয়া বিভক্তঃ—পর্যায়োপপুরাণ, ১৮ অঃ।



এই বিষয়ে পূর্বপক্ষ প্রদর্শনপূর্বক সংশয় প্রভৃতি পদার্থ জ্ঞানবিজ্ঞান পৃথক্ 'প্রস্থান' অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য উদ্ভাদিগের ব্যুৎপাদন বা বিশেষরূপে বোধ সম্পাদন করাই জ্ঞানবিজ্ঞান অসাধারণ ব্যাপার, তাহা না করিলে জ্ঞানবিজ্ঞান উপনিবন্ধের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইয়া পড়ে; সুতরাং সংশয়াদি পদার্থগুলির বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে ইত্যাদি কথার দ্বারা সামান্যতঃ পূর্বপক্ষের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে বিশেষ করিয়া সংশয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অসাধারণ প্রতিপাদ্য কেন, এ বিষয়ে কারণ প্রদর্শনপূর্বক সংশয়ের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে প্রয়োজন পদার্থের স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহারও পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে 'জ্ঞান' কি, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহাতে জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন, জ্ঞানকেই অবীক্ষা বলে, এই কথা বলিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানকেই আত্মিকী বলে, ইহা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞানের কথায় জ্ঞানভাস কাহাকে বলে, তাহা বলিয়াছেন। তাহার পরে বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা করিয়া বিতণ্ডা নিস্প্রয়োজন নহে এবং স্বপক্ষসিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইয়াছেন, নিস্প্রয়োজন-বিতণ্ডাবাদী ও শূন্যবাদীর মত খণ্ডন করিয়া বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে যথাক্রমে দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডার সংক্ষেপে স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে নিগ্রহস্থানের মধ্যে হেতুভাসের উল্লেখ থাকিলেও আবার পৃথক্ করিয়া হেতুভাসের উল্লেখের দ্বারা মহাবি কি সূচনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন। তাহার পরে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়া শেষে আত্মিকী জ্ঞান প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন এবং যদিও সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই আত্মিকী জ্ঞান প্রয়োজন,—আত্মিকীর সাহায্য বাতীত অন্তান্ত বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় না, তথাপি আত্মিকী—অধ্যাত্মবিজ্ঞা বলিয়া ইহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্ণ এবং আত্মা দিব্যজ্ঞানই ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান। ঐ তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐ অপবর্ণরূপ নিঃশ্রেয়স ইহার মুখ্য ফল বলিয়া ফলাংশেও অন্ত বিজ্ঞা হইতে এই জ্ঞানবিজ্ঞা বিশিষ্ট এবং অন্যান্য বিজ্ঞা-সাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সও এই জ্ঞানবিজ্ঞার গোণ ফল বলিয়া ইহা কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইতেও বিশিষ্ট। ভাষ্যকার এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রথম হস্ত-ভাষ্যের সমাপ্তি করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষে সমাপ্তিসূচক - 'ইতি' শব্দ কোন পুস্তকে দেখা না গেলেও ভাষ্যকার নিশ্চয়ই ইতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। তিনি বাক্যসমাপ্তি সূচনার জন্যও প্রায় সর্বত্র 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রথম হস্তভাষ্য-বার্তিকের শেষে ইতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; সেখানে ভাষ্যপট্টাকার লিখিয়াছেন—“ইতি হস্তগম্যাপ্তৌ।” এখানে উদ্যোতকরের পাঠানুসারে ভাষ্যকারের পাঠ স্থির করিয়া প্রচলিত কোন কোন পাঠ পরিত্যক্ত হইয়াছে। উদ্যোতকর অনেক স্থলে ভাষ্যকারের পাঠও উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং স্থলবিশেষে উদ্যোতকরের পাঠকেও প্রকৃত ভাষ্যপাঠ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়,—ইরূপ প্রাচীন সংবাদ বাতীত ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের উপায়ই বা কি আছে ?



মহর্ষি গৌতমের প্রথম সূত্রার্থ না বুঝিয়া প্রাচীন কালে কোন বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, গৌতমোক্ত “বাদ” হইতে “নিগ্রহস্থান” পর্যন্ত পদার্থগুলির জ্ঞান মোক্ষের কারণ হইতেই পারে না। যাহা পর-পরাত্তরের উপায়, যাহাতে অপরকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহা অহঙ্কারাদির কারণ ইহা মোক্ষের প্রতিবন্ধকই হয়। যাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহাকে কি মোক্ষের কারণ বলা যায়? সুতরাং গৌতমের প্রথম সূত্রে যখন “বাদ,” “জন্ম,” “বিতণ্ডা” প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের কারণরূপে বলা হইয়াছে, তখন ঐ সূত্রার্থ নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ। এইরূপ মত প্রকাশ এখনও অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা পুরাতন কথা। উদ্যোতকর মহর্ষি গৌতমের প্রথম সূত্র ব্যাখ্যার উপসংহারে পূর্বোক্ত প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, সূত্রার্থ না বুঝিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা আত্মাদি “প্রমেয়” তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে এবং প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরস্পরায় তাহাতে আবশ্যক, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটোকার বলিয়াছেন যে, “জন্ম,” “বিতণ্ডা” প্রভৃতির জ্ঞানে মুমুকুর অহঙ্কার জন্মে না। কিন্তু উহার দ্বারা মোক্ষ-লাভনের প্রতিবন্ধক অত্র ব্যক্তির অহঙ্কার নিবৃত্তি করা যায়, তজ্জন্ত অনেক অবস্থায় মুমুকুর উহা আবশ্যক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের পরিপন্থী নহে, পরন্তু উহা মোক্ষের অহঙ্কল।

উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী “বাদ,” “জন্ম,” “বিতণ্ডা” প্রভৃতির জ্ঞানকে যে অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়াছেন, তাহাও ঠিক বলা হয় নাই। কারণ, যাহাদিগের ঐ সকল পদার্থের কোনই জ্ঞান নাই, তাহাদিগেরও অহঙ্কারাদির উদ্ভব দেখা যায়, আবার তত্ত্বজ্ঞানী প্রকৃত পণ্ডিতের ঐ সকল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অহঙ্কারাদির উদ্ভব দেখা যায় না, তবে আর ঐ সকল জ্ঞানকে অহঙ্কারাদির কারণ বলা যায় কিরূপে?

বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধির উপায়ের অধ্যয়ন থাকিলে বিদ্যা বা তর্ক-কুশলতা প্রভৃতির কলে কাহারও অহঙ্কারাদি বাড়ে না, উহার কলে যাহার অহঙ্কারাদি বাড়ে, বিবাদপ্রিয়তা জন্মে, জিরীবার বরণা উপস্থিত হয়, সে ত মুমুকুই নহে, প্রকৃত মুমুকু ব্যক্তির উহা দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না, পরন্তু ইষ্টই হয়। আমরা কি কোন তর্ক-কুশল ব্যক্তিকেই ধীর, স্থির, শান্ত দেখিতে পাই না? তর্ক-কুশল হইলেই কি তাহার আর কোন উপায়েই চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না? অস্বীকার করিলে ন্যস্তের অপলাপ করা হইবে। বস্তুতঃ বিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই অহঙ্কারের বীজ বপন করেন না, সকলকে লক্ষ্য করিয়াই “বিদ্যা বিবাদার” বলা হয় নাই, তাহা হইলে মহাজনগণ, মুমুকুগণ, ভক্তগণ কোন দিনই বিদ্যার আলোচনা করিতেন না। ভক্তের গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতও আমরা উত্তমাধিকারীর মধ্যে “শাস্ত্রযুক্তিনিপুণ”<sup>১</sup> ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। কল কথা, শাস্ত্রযুক্তিনিপুণতা প্রকৃত অধিকারীর কোন অনিষ্ট ত করেই না, পরন্তু তাহার অধিকারের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া

১। শাস্ত্রযুক্তিনিপুণ বুঢ় অর্থাৎ বীর।

উক্ত অধিকারী ত্রিহী ভারতে সংসার।—১৫ চঃ, মহাভাষা, ২২ পঃ। মহাপ্রভুর নিজের উক্তি।



তাহাকে সর্বদা সর্বতোভাবে রক্ষা করে, তাহার লক্ষ্যের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখে, তাহার অন্ধাকে সর্বদা দূত করিয়া রাখে, সূতরাং প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নানা ভাবেই মোক্ষের সহায় হয়। তন্মধ্যে আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ এবং আত্মাদি পদার্থের শ্রবণমননাদিরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান তাহাতে পূর্বে আবশ্যক, তাহাতে আবার প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এই ভাবে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মহর্ষি এক সঙ্গে নিঃশ্রেয়সের উপায় বলিয়াছেন। উহার দ্বারা প্রমাণাদি সমস্ত পদার্থের যে কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা স্বত্বেই বুঝিতে হইবে না। বাহ্য পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের সাধন, তাহাও ঋষিগণ নিঃশ্রেয়সকর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। গীতার আছে,—

“সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরবৃত্তৌ” ॥ ৫।২।

এখানে “সন্ন্যাস” ও “কৰ্ম্মযোগ” কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মোক্ষসাধন বলা হইয়াছে? তাহা কি হইতে পারে? সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদন করে বলিয়াই তাহাকে নিঃশ্রেয়সকর বলা হইয়াছে। ঐরূপ অতি পরম্পরায়ও বাহ্য মোক্ষে সহায়তা করে, এমন অনেক কৰ্ম্মের উল্লেখ করিয়া “ইহা করিলে আর ভবদর্শন হয় না, ইহা করিলে আর জননী-অঁঠরে আসিতে হয় না,” এইরূপ কথা বলিতে ব্রহ্মবাদী বাদরায়ণও বিরত হন নাই। ফলকথা, প্রথম সূত্রে “বাদ,” “জ্ঞান” প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন বলা হয় নাই। বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কি ভাবে কেন মোক্ষসাধন, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। দৈর্ঘ্য ধরিয়া দ্বিতীয় সূত্রে কিছু দেখুন। ১।

ভাষ্য। তচ্চ খলু বৈ নিঃশ্রেয়সং কিং তত্ত্বজ্ঞানানন্তরমেব ভবতি? নেতুচ্যতে, কিং তর্হি? তত্ত্বজ্ঞানাৎ।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) সেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পূর্বোক্ত তায়বিদ্যার মুখ্য ফল অপবর্গ কি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয়? (উত্তর) ইহা বলা হয় নাই, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরেই মুখ্য ফল নির্বাপন লাভ হয়, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞান হইতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত (দ্বিতীয় সূত্রোক্তক্রমে নির্বাপন লাভ হয়)।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা তাহার স্তায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, প্রয়োজন এবং তাহা-  
দিগের পরস্পর সম্বন্ধের সূচনা করতঃ প্রমাণাদি পদার্থের নাম কীর্তন করিয়াছেন, ইহারই নাম  
“উদ্দেশ্য”। ঐ পদার্থগুলির “লক্ষণ” বলিয়া শেবে “পরীক্ষা” করিবেন। কারণ, পদার্থের  
পরীক্ষা ব্যতীত তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব নহে। কিন্তু পদার্থের “প্রয়োজন” ও সম্বন্ধের নির্ণয় না হইলেও  
তাহার লক্ষণ ও পরীক্ষার অবসর উপস্থিত হয় না। “পরীক্ষা” ব্যতীত আবার ঐ প্রয়োজন ও  
সম্বন্ধের নির্ণয় হইতে পারে না, এ জন্ত মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ঐ প্রয়োজন ও সম্বন্ধের পরীক্ষা  
করিয়াছেন। দ্বিতীয় সূত্রটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। পূর্বপক্ষ ব্যতীত সিদ্ধান্ত কখন সম্ভব হয় না,  
এ জন্ত ভাষ্যকার একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াই দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।



পূর্বপক্ষের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, প্রথম স্তরে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্মাণরূপ অপবর্গই মুখ্য নিঃশ্রেয়স। তাহা তাহার কারণ তত্ত্বজ্ঞান-বিশেষের পরেই জন্মিবে। ইহা অস্বীকার করিলে মহর্ষির প্রথম স্তরের ঐ কথা মিথ্যা হইয়া যায়। মহর্ষি প্রথম স্তরে যে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে মুখ্য নিঃশ্রেয়স অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণরূপে সূচনা করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরেই যদি তাহার কার্য্য অপবর্গ না হয়, তাহা হইলে মহর্ষি তাহাকে সাক্ষাৎ কারণ বলিতে পারেন না, সাক্ষাৎ কারণের পরেই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। মহর্ষি প্রথম স্তরে অবশ্য কোন তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ বলিয়া সূচনা করিয়াছেন, ঐ চরম কারণ তত্ত্বজ্ঞানবিশেষ জন্মিলে অপবর্গ লাভে আর বিলম্ব হইবে কেন? যদি তাহাই হইল, যদি তত্ত্বদর্শনের পরক্ষণেই নির্মাণ লাভ হইয়া গেল, তাহা হইলে তত্ত্বদর্শীর নিকটে তাহার দৃষ্ট তত্ত্ববিষয়ে কোন উপদেশ পাওয়া সম্ভব হইল না, তিনি তত্ত্ব দর্শনের পরক্ষণেই নির্মাণ লাভ করায়, আর কাহাকেও কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না। সুতরাং শাস্ত্র-বাক্যগুলি তত্ত্বদর্শীর বাক্য হওয়া অসম্ভব। তত্ত্বদর্শী ব্যতীত আর সকলেই ভ্রান্ত, আর কাহারও উপদেশ শাস্ত্র বলিয়া মানা যায় না, সুতরাং শাস্ত্র নামে প্রচলিত বাক্যগুলি ভ্রান্তের বাক্য বলিয়া বক্তব্য: শাস্ত্র নহে, তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের আশা করা অসম্ভব। যিনি তত্ত্বদর্শী, অথচ জীবিত থাকিয়া তত্ত্বের উপদেশ করিবেন, এমন ব্যক্তি কোথায় মিলিবে? তত্ত্বদর্শনের পরক্ষণেই যে নির্মাণলাভ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় স্তরের দ্বারা এই পূর্বপক্ষের উত্তর সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার “তত্ত্বজ্ঞানং” এই কথার বোঝ করিয়া, দ্বিতীয় স্তরের অবতারণার দ্বারা তাহার উৎপাদিত পূর্বপক্ষের উত্তর জানাইয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ কথার সহিত দ্বিতীয় স্তরের বোঝনা বুঝিতে হইবে।

উত্তরপক্ষের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, মুক্তি দ্বিবিধ,—পর্য্য ও অপর্য্য; নির্মাণ মুক্তিকেই পর্য্য মুক্তি বলে। তাহা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেই হয় না, তাহা যে ক্রমে হয়, মহর্ষি দ্বিতীয় স্তরের দ্বারা সেই ক্রম বলিয়াছেন। অপর্য্য মুক্তি তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেই জন্মে, তাহাকেই বলে “জীবনমুক্তি”। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের মহিমার মুমুকুর পূর্বসংকীর্ণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু “প্রারব্ধ” ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম থাকে, ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয় নাই। সুতরাং জীবনমুক্ত ব্যক্তি প্রারব্ধ ভোগের জন্ত বত দিন দেহ ভোগ করেন, তত দিন তাহার নির্মাণ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—“তাবদেবাণ্ড চিরং দাবর বিমোক্ষ্যে অথ সম্পংক্তে”। মুমুকু আত্মাদি বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট করিবার জন্ত প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্র হইতে আত্মাদির প্রকৃত স্বরূপের শাস্ত্র বোধ করেন, ইহারই নাম শ্রবণ। তাহার পরে যুক্তির দ্বারা সেই শ্রুত তত্ত্বের পরীক্ষা করেন, ইহারই নাম মনন; ইহা এই জ্ঞানবিদ্যার অধীন, এই জ্ঞানবিদ্যা “প্রমাণের” তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্ত “মংশয়” প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। গ্রাহ ও ত্যাগ্য-ভেদে ব্যবহৃত “প্রমেয়” পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞাপনের জন্তই আবার প্রমাণের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। প্রমাণের দ্বারা বিচার করিলে বুঝা যাইবে—আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে “আত্মা”—ও



“অপবর্গই” গ্রাহ, আর দশটি ত্যাজ্য, ঐ দশটি হুংখের হেতু এবং হুংখ, এ জন্ত “হেয়”। ভায়-বিন্যাস সাহায্যে মননের দ্বারা আত্মাদি “প্রমোদের” তত্ত্বাবধারণ হইলেও মিথ্যা জ্ঞানজন্ত সংস্কার থাকায়, আবারও পূর্বের ভায় ভ্রম সাক্ষাৎকার করে। নিঃসৃত ব্যক্তির সহস্র অহুমানের দ্বারাও পূর্বসংস্কার যায় না। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই মিথ্যা সাক্ষাৎকার বা বিপরীত সাক্ষাৎকার নিবৃত্ত হইতে পারে এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকারজন্ত সংস্কারই বিপরীত সংস্কারকে দূর করিতে পারে, ইহা লোকসিদ্ধ, অর্থাৎ লৌকিক ভ্রম স্বলেও এইরূপ দেখা যায়। যে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার রজ্জুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভ্রম একেবারে যায় না, অতঃকোন আশু ব্যক্তি “ইহা সর্প নহে” বলিয়া দিলেও এবং উপযুক্ত হেতুর সাহায্যে “ইহা সর্প নহে” এরূপ অহুমান হইলেও, আবার অনেক পরে নিকটে গেলে সেই সর্পবুদ্ধি তখনই উপস্থিত হয়; কিন্তু রজ্জুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া গেলে আর সে ভ্রম হয় না। সেইরূপ আত্মাদি বিষয়ে জীবের ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক, বৈদান্তিক সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত কোন মহাবাক্যজন্ত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানে উহা যাইতে পারে না, উহা নাশ করিতে হইলে ঐ আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে, হুতরাং তাহার জন্ত মননের পরে ঐ আত্মা প্রভৃতির ঐতিহ্যবুদ্ধিসিদ্ধ স্বরূপের ধ্যান-ধারণাদি করিতে হইবে, তাহাতে যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় আশ্রয় করিতে হইবে, তাহাতে ঈশ্বর-প্রদানও আবশ্যক হইবে। ঐ ধ্যান-ধারণাদি জন্ত যে দ্ব্যর্থ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিবে, তাহাই পরে কালবিশেষে আত্মাদির তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মাইবে, উহাই আত্মাদি বিষয়ে চতুর্থ বিশেষ জ্ঞান। উহা হইলে আর তখন মিথ্যা জ্ঞানজন্ত সংস্কারের লেশ মাত্র থাকিবে না। ঐ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মিয়া গেলে আর তাঁহাকে বদ্ধ বলা যায় না, তিনি তখন মুক্ত, তবে সহসা তিনি তখন দেহাদিবিযুক্ত হন না, প্রারম্ভ কর্তৃকল ভ্রোগের জন্ত তিনি জীবিত থাকেন। সেই তত্ত্বদর্শী জীবমুক্ত ব্যক্তিরাই শাস্ত্রবক্তা, তাহাদিগের উপদেশই শাস্ত্র। তাহাদিগের উপদেশই শাস্ত্র-সম্প্রদায় রক্ষা ও লোকশিক্ষা অব্যাহত আছে। ফলতঃ নির্বীণ মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয় না, জীবমুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হইয়া থাকে, হুতরাং কোন দিকেই বিরোধ নাই এবং তত্ত্বদর্শী মুক্ত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্বের উপদেশ পাওয়াও অসম্ভব হইল না। শাস্ত্র এবং এই সকল মুক্তির দ্বারাই মুক্তির পূর্বোক্ত বৈবিস্য বুঝা গিয়াছে। দ্বিতীয় হুংখের দ্বারা পরা মুক্তির ভ্রম বলিয়াছেন, তাহাতে এবং প্রথম হুংখের কথাতে অপরা মুক্তির কথাও পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মা প্রভৃতি প্রমের পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও দ্বিতীয় হুংখ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

**সূত্র।** হুংখ-জন্ম - প্রবৃত্তিদোষ - মিথ্যাজ্ঞানানা-  
মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। হুংখ, জন্ম, প্রবৃত্তি ( ধর্ম ও অধর্ম ), দোষ ( রাগ ও ঘেয ) এবং মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজ্ঞান, ইহাদিগের পরপরটির বিনাশে ( কারণনাশে কার্যনাশক্রমে ) “তদনন্তর”গুলির অর্থাৎ ঐ



মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পরপরটির অব্যবহিত পূর্ববগুলির অভাব প্রযুক্ত অপবর্গ হয় (নির্বাক লাভ হয়) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়, মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে রাগ ও দেবরূপ দোষের নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিতে ধর্ম ও অধর্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়, জন্মের নিবৃত্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, ইহাই নির্বাক মুক্তি।

বিবৃতি। বদ্ধ জীবদ্বারাই দুঃখনিবৃত্তির জন্ত ইচ্ছা স্বাভাবিক, একেবারে সংসার ছাড়িয়া দুঃখমুক্ত হইতে সকলের ইচ্ছা না হইলেও দুঃখ কেহ চায় না, আমার দুঃখ না হউক, আমি কষ্ট না পাই, এজুপ ইচ্ছা সকলেরই স্বাভাবিক এবং সে জন্ত সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও কৃতি অনুসারে দুঃখ নিবৃত্তির জন্ত চেষ্টা করিতেছে। দুঃখ কাহারই ভাল লাগে না। যাহা প্রতিকূল ভাবে অর্থাৎ স্বভাবতঃই অপ্রিয় ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা দুঃখ। দুঃখের সহিত সকলেরই স্মৃতিরকাল হইতে পরিচয় আছে, সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, ভাবায় তাহার পরিচয় দেওয়াও সহজ নহে। দুঃখের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা দুঃখ এবং তাহার ভোগ অতি সহজ। অনাদি কাল হইতে সকলেই দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং তাহার শাস্তির জন্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে। মূলের খবর গাইলে কাহারই প্রাণে শাস্তি নাই। দুঃখনিবৃত্তির জন্ত সকলেরই ইচ্ছা, সকলেরই চেষ্টা, ইহা অস্বীকার করিলে জোর করিয়া সত্যের অপলাপ করা হয়। দুঃখ বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে তাহার সহিত অনাদি কাল হইতে নিরন্তর জীবকুলের কখনই এত সংগ্রাম চলিত না। কিন্তু নিরন্তর নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও, দুঃখের সহিত বহু বহু সংগ্রাম করিয়াও যত দিন জন্ম আছে, তত দিন কেহই দুঃখের হস্ত হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে পারিতেছে না। জন্মিলেই দুঃখ, জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি যত বড়ই হউন না কেন, দুঃখকে কেহই একেবারে ত্যাগিয়া দিতে পারেন না। দুঃখভোগ সকলকেই করিতে হয়, এ সত্য চিন্তাশীলের অজ্ঞাত নহে। জন্ম হইলে দুঃখভোগ কেন অনিবার্য, সংসারী সর্বদাই দুঃখের গৃহে কেন বাস করেন, ইহাও চিন্তাশীলদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কল কথা, বদ্ধ জীব দুঃখের কারাগারে নিয়ত বাস করিতেছে, জন্মই তাহাকে দুঃখের সহিত দুঃখের বন্ধনে বাঁধিয়াছে, ইহা ভাবিয়া বুঝিলে অবশ্যই বুঝা যাইবে। মূলকথা, জন্ম দুঃখের কারণ। এই জন্মের কারণ ধর্ম ও অধর্ম। কারণ, ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখভোগ ও দুঃখভোগ করিবার জন্তই জীবকে বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কর্মফলানুসারে বিশিষ্ট শরীরাদি-সদ্ব্যক্তি জন্ম। শরীরাদি ব্যতীত ধর্মাদর্শের ফলভোগ হওয়া একেবারে অসম্ভব, সুতরাং ধর্ম ও অধর্ম (যাহা শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি-(কর্ম) সাধ্য বলিয়া ‘প্রবৃত্তি’ শব্দের দ্বারাও কথিত হইয়াছে) জীবের শরীরাদি সদ্ব্যক্তি জন্ম সম্পাদন করিয়াই সুখভোগ ও দুঃখভোগ জন্মায়। এই ‘প্রবৃত্তি’র অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মের কারণ “দোষ”। দোষ বলিতে এখানে “রাগ” অর্থাৎ বিদ্বেষে অভিলাষ বা আনন্দি এবং “দেব”। এই রাগ ও দেববশতঃই জীব শুভ ও অশুভ



কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যিনি রাগ-দেহ-বর্জিত, তাহার ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই তুল্য, যিনি গীতার ভাষায় “নাভিনশক্তি ন ঘোট,” তিনি ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিহারের জন্ত কোন কর্ম করেন না, তিনি আনন্দের প্রেরণায় কোন সং বা অসং কর্মে লিপ্ত হন না, তিনি বিদেহ-বিবেক জাগায় কাহারও কোন অনিষ্ট সাধন করিতে বান না। এক কথায় তিনি কারিক, বাচিক, নান্দিক কোন শুভ বা অশুভ কর্মে আসক্ত নহেন, রাগ ও দেহ না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে ঐক্যপ ঘটিতেই পারে না এবং তিনি কোন কর্ম করিলেও তজ্জন্ত তাঁহার ধর্ম ও অধর্ম হয় না। মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যার অবিকারে থাকা পর্য্যন্তই কর্ম দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের সঞ্চার হয়। এই রাগ ও দেহের কারণ “মিথ্যাজ্ঞান”। অনাদিকাল হইতে আত্মা ও শরীরাদি বিষয়ে জীবকুলের যে নানাপ্রকার ভ্রম জ্ঞান আছে, তাহার ফলেই তাহাদিগের রাগ ও দেহ জন্মে। তাহার ঐ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়াছে, যিনি প্রকৃত সত্যের সেবা পাইয়াছেন, তাঁহার আর রাগ ও দেহ জন্মিতে পারে না, কারণ ব্যতীত কার্য হইতে পারে না, মিথ্যাজ্ঞান তাহার কারণ, তাহা মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে কিরূপে হইবে? অনাদিকাল হইতে জীবের নিজ শরীরাদি বিষয়ে অহংকাররূপ মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। ঐ শরীরাদি বিষয়ে আনিদ-বুদ্ধিরূপ অহংকারের ফলেই তাহার ইষ্ট বিষয়ে আসক্তি এবং অনিষ্ট বিষয়ে বিবেক জন্মিতেছে এবং আরও বহু বহু প্রকার মিথ্যাজ্ঞান জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে বদ্ধ করিতেছে। এই সকল সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের মহিমায় জীবের রাগ ও দেহ জন্মে। রাগ ও দেহবশতাই শুভ ও অশুভ কর্ম করিয়া জীব ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করে, তাহার ফলভোগের জন্ত আবার জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিলেই হুঃখ অনিবার্য। সুতরাং বুঝা যায়, যে হুঃখের তাবী আক্রমণ নিবারণ জন্ত জীবগণের এত ইচ্ছা, এত চেষ্টা, এত সংগ্রাম, তাহার মূলই “মিথ্যাজ্ঞান”। সত্যজ্ঞান ব্যতীত এ মিথ্যাজ্ঞান কখনই বাইতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সংস্কার ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের কুসংস্কার আর কিছুতেই বাইতে পারে না। রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন উপায়েই তাহাতে স্পর্শজন্য বিনষ্ট হয় না—হইতে পারে না। সুতরাং হুঃখনিবৃত্তি করিতে হইলে, চিরকালের জন্ত হুঃখভর হইতে মুক্ত হইতে হইলে তাহার মূল “মিথ্যাজ্ঞান”কে একেবারে বিনষ্ট করিতে হইবে। রোগের নিদান একেবারে উচ্ছিন্ন না হইলে রোগের আক্রমণ একেবারে বন্ধ হয় না, সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে।—সুতরাং সত্যজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। যে বিষয়ে যেকোন মিথ্যাজ্ঞান আছে, সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত জ্ঞানই “তত্ত্বজ্ঞান”। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে উহা লাভ করিলে পরফলেই মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইবে। তত্ত্বজ্ঞানজন্ত সংস্কারে মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সংস্কারের উচ্ছেদ হইলেই কারণের অভাবে রাগ ও দেহ আর জন্মিল না। রাগ ও দেহ না থাকায় আর ধর্মাদি জন্মিল না, তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় পূর্বসঞ্চিত ধর্মাদি বিনষ্ট হইয়া গেল, ধর্মাদিধর্মের অভাবে আর জন্ম হইতে পারিল না, জন্ম না হইলে আর হুঃখের সম্ভাবনাই থাকিল না, প্রারম্ভ কর্মভোগান্তে বর্তমান জন্মটা নষ্ট হইয়া গেলেই সব গেল, তখনই নির্লিপ্ত, তখনই সর্ব হুঃখের চিরশান্তি।



ভাষ্য। তত্র আত্মাদ্যপবর্গপর্যন্তপ্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারকং  
বর্ততে। আত্মনি তাবমান্তীতি। অনাত্মত্বাভ্যেতি, দুঃখে সূখমিতি, অনিত্যে  
নিত্যমিতি, অত্রাণে ত্রাণমিতি, সভয়ে নির্ভয়মিতি, জুগুপ্সিতেহভিমত-  
মিতি, হাতব্যোহপ্রতিহাতব্যমিতি। প্রবৃত্তৌ—নাস্তি কৰ্ম্ম, নাস্তি কৰ্ম্মফল-  
মিতি। দোষেষু—নায়াং দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে—  
নাস্তি জন্তুজ্জীবো বা সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেয়াং প্রেত্য চ ভবেদिति।  
অনিমিত্তং জন্ম, অনিমিত্তো জন্মোপরম ইত্যাদিমান্ প্রেত্যভাবোহনন্ত-  
শ্চেতি। নৈমিত্তিকঃ সমকৰ্ম্মনিমিত্তঃ প্রেত্যভাব ইতি। দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধি-  
বেদনা-সন্তানোচ্ছেদ-প্রতিসন্ধানাভ্যাং নিরাস্তকঃ প্রেত্যভাব ইতি।  
অপবর্গে—ভীষ্মঃ ধনুৰ্যং সৰ্ব্বকার্যোপরমঃ সৰ্ব্ববিপ্রয়োগেহপবর্গে বহু  
ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সৰ্ব্বহুখোচ্ছেদমচৈতন্যমমুমপবর্গং  
রোচয়েদिति।

অনুবাদ। ৩ সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্যন্ত “প্রমেয়” বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান  
অনেক প্রকার আছে। (তন্মধ্যে কতকগুলি দেখাইতেছেন।) আত্মবিষয়ে “নাই”  
অর্থাৎ আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে) “আত্মা” এইরূপ  
জ্ঞান। (এখন শরীর হইতে মনঃ পর্যন্ত “প্রমেয়” বিষয়ে সামান্যতঃ কতকগুলি  
মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতেছেন।)—দুঃখে—সুখ, এইরূপ জ্ঞান। অনিত্যে—নিত্য, এইরূপ  
জ্ঞান। অত্রাণে—ত্রাণ, এইরূপ জ্ঞান। সভয়ে—নির্ভয়, এইরূপ জ্ঞান। নিন্দিতে—  
অভিमत, এইরূপ জ্ঞান। ত্যাজ্যে—অত্যাজ্য, এইরূপ জ্ঞান। (এখন “প্রবৃত্তি”  
প্রভৃতি “অপবর্গ” পর্যন্ত প্রমেয়ে বিশেষ করিয়া কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতে-  
ছেন।)—প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে—কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, এইরূপ জ্ঞান।  
দোষ অর্থাৎ রাগদ্বेषাদি বিষয়ে—এই সংসার-দোষ নিমিত্তক অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-জন্ম  
নহে, এইরূপ জ্ঞান। “প্রেত্যভাব” বিষয়ে (পুনর্জন্ম বিষয়ে)—যিনি মরিবেন  
এবং মরিয়া উন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব নাই, সত্ত্ব বা আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান।

\* আত্মা, শরীর, ব্রহ্মাদি বহিঃস্থিতির, রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্ণ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ, এই ষাটবিধ পরার্থকে মহাদি প্রমেয় নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। এই প্রমেয় বিষয়ে বহুবিধ মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিবান এবং এই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান। ভাষ্যকার সেই মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা করিয়াছেন।



জন্ম কারণশূন্য,—জন্মের নিবৃত্তি কারণশূন্য ; অতএব প্রেত্যভাব সাদি এবং অনন্ত, এইরূপ জ্ঞান । প্রেত্যভাব নিমিত্ত-জ্ঞাত হইলেও কৰ্ম্মনিমিত্তক নহে, এইরূপ জ্ঞান । \* 'দেহ', 'ইন্দ্রিয়', 'বুদ্ধি', 'বেদনা' অর্থাৎ স্থখ-দুঃখ, ইহাদিগের যে সমস্তান অর্থাৎ সম্ভাব্য বা সমষ্টি, তাহার উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান বশতঃ অর্থাৎ ঐ দেহাদির এক সমষ্টির নাশের পরে তত্ত্বজাতীয় অতঃ এক সমষ্টির উৎপত্তি হয় বলিয়া, “প্রেত্যভাব” নিরাশ্রয় অর্থাৎ তাহাতে আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান । অপবর্গ-বিষয়ে—সর্বকারণোপরতি অর্থাৎ যাহাতে সর্বকারণের নিবৃত্তি হয়, এমন, এই অপবর্গ ভয়ানক । সর্ববিপ্রয়োগ অর্থাৎ যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিচ্ছেদ হয়, এমন অপবর্গে বহু শুভ নষ্ট হয়, সুতরাং কেমন করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহাতে সকল স্থখের উচ্ছেদ হয় এবং যাহাতে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, এমন, এই অপবর্গকে ভালবাসিবে ? এইরূপ জ্ঞান ( মিথ্যাজ্ঞান ) ।

ভাব্য । এতস্মান্মিথ্যাজ্ঞানাদনুকূলেষু রাগঃ প্রতিকূলেষু হ্বেষঃ । রাগদ্বৈষাদিকারাত্মনাত্যেৰ্য্যামার্নালোভাদয়ো দোষা ভবন্তি । দোষৈঃ প্রযুক্তঃ শরীরেণ প্রবর্তমানো হিংসান্তেরপ্রতিষিদ্ধমৈধুনাচ্যচরতি । বাচাহনৃতপরুশসূচনাসম্বন্ধানি । মনসা পরজোহং পরদ্রব্যভীপ্সাং নাস্তিক্য-ক্ষেতি । সেয়ং পাপাত্মিকা প্রবৃত্তিরধর্ম্মায় । অথ শুভা—শরীরেণ দানং পরিত্রাণং পরিচরণঞ্চ । বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ক্ষেতি । মনসা দয়ামম্পৃহাং শ্রদ্ধাক্ষেতি । সেয়ং ধর্ম্মায় । অত্র প্রবৃত্তিসাধনৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ “প্রবৃত্তি”শব্দেনোক্তৌ । যথা অন্নসাধনাঃ প্রাণাঃ—“অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ” ইতি । সেয়ং প্রবৃত্তিঃ কুৎসিতস্তাভিপূজিতস্ত চ জন্মানঃ কারণং । জন্ম পুনঃ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধীনাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাজুর্ভাবঃ । তস্মিন্ সতি দুঃখং । তৎ পুনঃ প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধনা পীড়া তাপ ইতি । ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধর্ম্মা অবিচ্ছেদেনৈব প্রবর্তমানাঃ সংসার ইতি । যদা তু তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে

\* দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং স্থখ-দুঃখ, ইহাদিগের সমষ্টি-বিশেষই জীব । ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই, ইহা বাহ্যেরা বলেন, তাহাদিগকে নৈরাশ্র-বাদী বলে । তাহাদিগের জ্ঞান এই যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও স্থখ-দুঃখের এক সমষ্টির উচ্ছেদ হইলে, আর একটি পূর্ণোক্ত দেহাদি-সমষ্টির উৎপত্তি হয়, এই ভাবেই সংসার হইতেছে—ইহার মধ্যে নিত্য আত্মা কেহ নাই । কোন নিত্য আত্মাই যে এরূপ দেহাদি সমষ্টি লাভ করিতেছেন, তাহা নহে, সুতরাং প্রেত্যভাব নিরাশ্রয়ক । ভাষ্যকার এই জ্ঞানকে প্রেত্যভাব বিষয়ে এক প্রকার মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াছেন ।



দোষা অপযন্তি । দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি । প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি ।  
জন্মাপায়ে দুঃখমপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোহপবর্গো নিঃশ্রেয়স-  
মিতি ।

অনুবাদ । ( ভাষ্যকার সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া এখন  
সূত্রোক্ত “মিথ্যাজ্ঞান,” “দোষ,” “প্রবৃত্তি,” “জন্ম,” “দুঃখ,” এই কয়েকটি পদার্থের  
কার্য্য-কারণ-ভাব এবং ঐ “দোষ,” “প্রবৃত্তি,” “জন্ম” এবং “দুঃখের” স্বরূপ প্রকাশ  
করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন । ) এই মিথ্যাজ্ঞান ( পূর্ববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞান )  
বশতঃ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে ঘেঘ জন্মে । রাগ ও ঘেঘের  
অধিকারবশতঃ অসত্য, ঈর্ষ্যা, কপটতা, লোভ প্রভৃতি দোষ জন্মে । দোষকর্তৃক  
প্রেরিত জীব প্রবর্তমান হইয়া শরীরের দ্বারা হিংসা, চোঁধ্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ  
করে । বাক্যের দ্বারা মিথ্যা, পরুষ ( কটুক্তি ), সূচনা ( পর-দোষ-প্রকাশ ), অসম্বন্ধ  
( প্রলাপাদি ) আচরণ করে । মনের দ্বারা পরদ্রোহ, পর-দ্রব্যের প্রাপ্তি কামনা এবং  
নাস্তিকতা আচরণ করে । সেই এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি অধর্ম্মের নিমিত্ত হয় । অনন্তর  
শুভা প্রবৃত্তি ( বলিতেছি ) । শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ এবং পরিচর্যা আচরণ করে ।  
বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় এবং স্বাধ্যায় ( বেদ-পাঠাদি ) আচরণ করে । মনের  
দ্বারা দয়া নিস্পৃহতা এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে । সেই এই শুভা প্রবৃত্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত  
হয় । এই সূত্রে প্রবৃত্তি-সাধন অর্থাৎ প্রবৃত্তি বাহাদিগের সাধন, এমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম  
“প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । যেমন প্রাণ অন্ন-সাধন অর্থাৎ অন্ন-সাধ্য ।  
( বেদ বলিয়াছেন ) “অন্ন প্রাণীর প্রাণ” ( অর্থাৎ যেমন প্রাণের সাধন অন্নকে অন্ন  
প্রাণ বলিয়াছেন, তদ্রূপ মহর্ষি এই সূত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মের সাধন প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মাধর্ম্ম  
বলিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থে প্রবৃত্তি শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন । ) সেই  
এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ । “জন্ম” বলিতে,  
শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির নিকারবিশিষ্ট প্রাচুর্য্যব অর্থাৎ উহাদিগের সংঘাতভাবে  
( মিলিত ভাবে ) উৎপত্তি । সেই জন্ম থাকিলে দুঃখ থাকে । সেই “দুঃখ”  
বলিতে প্রতিকূল-বেদনীয় \* বাধনা, পীড়া, তাপ । অবিচ্ছেদেই প্রবর্তমান অর্থাৎ  
অনাদি কাল হইতে যাহা কার্য্য-কারণ-ভাবেই উৎপন্ন হইতেছে, এমন সেই এই

\* “প্রতিকূল-বেদনীয়”—অর্থাৎ যাহা প্রতিকূল ভাবে, অর্থাৎ ভাল লাগে না—এই ভাবে জন্মের বিষয় হয় ।  
“বাধনা”, “পীড়া”, “তাপ”, এই তিনটি দুঃখবোধক পদার্থ শব্দ । ভাষ্যকার “দুঃখ”কে বিশ্লিষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য ঐ  
তিনটি পদার্থ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ যাহাকে “বাধনা”, “পীড়া” ও “তাপ” বলে, তাহাই দুঃখ ।



মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি (পূর্বোক্ত) দুঃখ-পর্যন্ত ধর্মই সংসার। যে সময়ে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-হেতুক মিথ্যাজ্ঞান অপগত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে (তাহার কার্য) দোষগুলি অপগত হয়। দোষের নিবৃত্তি হইলে “প্রবৃত্তি” (ধর্মাদর্শ) অপগত হয়। প্রবৃত্তির অপায় হইলে “জন্ম” অপগত হয়। জন্মের নিবৃত্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্ত হয়। দুঃখের নিবৃত্তি (আত্মান্তিক অভাব) হইলে, আত্মান্তিক অপবর্গরূপ অর্থাৎ পরা মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয়।

ভাষ্য। তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্যয়ায়ৈ ব্যাখ্যাতে। আত্মনির্ভরত্বম্ভীতি অনাস্বাদ্যনাস্বাদ্যেতি। এবং দুঃখে নিত্যে ত্রাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যম্। প্রবৃত্তৌ—অস্তি কর্ম, অস্তি কর্মফলমিতি। দোষেষু—দোষনিমিত্তোহয়ং সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে খলু জন্তুর্জীবঃ সহ আত্মা বা যঃ প্রেত্য ভবেদিতি। নিমিত্তবজ্জন্ম, নিমিত্তবান্ জন্মোপম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোহপবর্গান্ত ইতি। নৈমিত্তিকঃ সন্ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত্ত ইতি। সাত্মকঃ সন্ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনা-সন্তানোচ্ছেদপ্রতিসঙ্কানাভ্যাং প্রবর্তত ইতি। অপবর্গে—শাস্তঃ খলুয়ং সর্ববিপ্রয়োগঃ সর্বোপারমোহপবর্গঃ, বহু চ কৃচ্ছ্রং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্বদুঃখোচ্ছেদং সর্বদুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি। তদুপা—মধুবিষ-সম্পৃক্তামমনাদেয়মিতি, এবং সুখং দুঃখানুযুক্তমনাদেয়মিতি। ২।

অনুবাদ। তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (সে কিরূপ, তাহা নিজেই স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেছেন।) আত্মবিষয়ে “আছে” অর্থাৎ আত্মা আছে, এইরূপ জ্ঞান। অনাস্বাদ্যে (দেহাদিতে) অনাস্বাদ্য (আত্মা নহে), এইরূপ জ্ঞান। এইরূপ (পূর্বোক্ত) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণে, সভয়ে, নিদ্রিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিষয়ানুসারে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিবে। (দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি)। প্রবৃত্তি বিষয়ে—কর্ম আছে, কর্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান। দোষ বিষয়ে—এই সংসার দোষজন্য, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব বিষয়ে—যিনি মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব আছে, সব বা \* আত্মা আছে, এইরূপ

\* “বহু” বলিয়া পেনে আবার জীব বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। “সব” বলিয়া পেনে আবার “আত্মা” বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। ঐ সকল পদ প্রাচীন কালে এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বিশদ



জ্ঞান। জন্ম কারণজ্ঞ, জন্মের নিবৃত্তি কারণজ্ঞ; স্তূতরাং প্রেত্যভাব অনাদি মোক্ষ-পর্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব কারণ-জ্ঞ হইয়া প্রবৃত্তি-জ্ঞ অর্থাৎ ধর্মাদর্শ-জ্ঞ, এইরূপ জ্ঞান। “সাত্বিক” হইয়াই অর্থাৎ প্রেত্যভাব দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-স্বপ্ন-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ বিষয়ে—বাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিরোধ হয়, বাহাতে সর্বকর্ম্যের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ শাস্ত ( ভয়ানক নহে ) এবং ( ইহাতে ) বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়; স্তূতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসিবেন না, এইরূপ জ্ঞান। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ্য, তদ্রূপ দুঃখানুযুক্ত স্বপ্ন অগ্রাহ্য, \* এইরূপ জ্ঞান ( তত্ত্বজ্ঞান )।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম হৃদয়ের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এই কথা বলিয়া নিঃশ্রেয়সই তাঁহার জ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রয়োজন-জ্ঞান ব্যতীত তাঁহার চর্চার কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, এ জ্ঞান শাস্ত্রকারগণ প্রথমেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হুচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রয়োজন কিরূপে সেই শাস্ত্র-সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ কোন্ বৃত্তিতে সেই প্রয়োজনটি সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহা না বলিলে সেই প্রয়োজন হুচনার কোন কল হয় না। স্তূতরাং শাস্ত্রকারের যুক্তির দ্বারা প্রয়োজন পরীক্ষা করা কর্তব্য। যে যুক্তিতে শাস্ত্রকারোক্ত প্রয়োজনটি তাঁহার শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায়, সেই যুক্তির হুচনাই প্রয়োজনের পরীক্ষা।

অপবর্গ ভিন্ন অস্তান্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন হইলেও, সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। সেগুলি জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন কিরূপে হয়, তাহাতে জ্ঞানবিদ্যার আবশ্যকতা কি, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকারও জ্ঞানবিদ্যা সর্গবিদ্যার প্রদীপ, সর্গকর্মের উপায় এবং সর্গধর্মের আশ্রয়রূপে বিদ্যার পরিগণনাগুলে কীর্তিত আছে, এই কথা বলিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু অন্যায়বিদ্যারূপ জ্ঞানবিদ্যার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, প্রথম হৃদে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা মহর্ষি

বোধের ভিত্তি প্রাচীনগণ ইচ্ছা একাধি শব্দের দ্বারা বিবরণ করিয়াছেন। এই ভাষ্যে বহু স্থলেই ইচ্ছা বিবরণ আছে। বসবসবনও ভাষ্যের একটি লক্ষণ।

\* হৃদ হৃৎবাণুযুক্ত অর্থাৎ হৃদয়ের অনুবন্ধযুক্ত। এই অনুবন্ধবাণ্য খাতিঁককার গারি প্রকার বলিয়াছেন।

১। অনুবন্ধ অর্থাৎ অবিনাশ্য সধক। যেখানে হৃৎ, সেখানে হৃৎ এবং যেখানে হৃৎ, সেখানে হৃৎ। ইহাই হৃৎ-হৃদয়ের অবিনাশ্য। ২। অথবা সমান-নিবৃত্ততাই অনুবন্ধ। যাহা বাহা হৃদয়ের সাধন, তাহাই হৃদয়ের সাধন। ৩। অথবা সমানধারতাই অনুবন্ধ; যে আধারে হৃৎ আছে, সেই আধারেই হৃৎ আছে। ৪। অথবা সমানোপ-লভ্যতাই অনুবন্ধ। যিনি হৃদয়ের উপলব্ধি করেন, তিনি হৃদয়ের উপলব্ধি করেন। ভাষ্যের সর্গশেবদ্ব্য ইতি শব্দটি হৃদয়ের সমাপ্তিবোধক।



বাহাকে মুখ্য প্রয়োজনরূপে সূচনা করিয়াছেন, তাহা কিরূপে এই জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন হয়, বোধশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কেমন করিয়া অপবর্গরূপ অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের লাভন হয়, ইহা সহজে বুঝা যায় না; ইহা বুঝাইয়া না দিলে ঐ অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজন কেহ বুঝিয়া লইতে পারে না, তাহা না বুঝিলেও উহা জ্ঞানবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন, এ কথা বলিয়াও কোন ফল হয় না। এই জ্ঞান মহাবি দ্বিতীয় স্তরের দ্বারা তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম স্ত্রোক্ত জ্ঞানবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা করিয়াছেন। অপবর্গরূপ প্রাধান প্রয়োজনই মহাবির প্রাধান লক্ষ্য, সুতরাং দ্বিতীয় স্তরেই সেই কথা বলিয়াছেন, তাহাতে পরা মুক্তির ক্রম প্রতিপাদন হইয়াছে এবং আত্মাদি প্রমের পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যে অপবর্গের সাধন কারণ, ইহা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় স্তরের দ্বারা এইরূপ অনেক তত্ত্বই সূচিত হইয়াছে। সূচনার জন্যই সূত্র। এক স্তরের দ্বারা অনেক স্থলে বহু তত্ত্বই সূচিত হইয়াছে। সূত্রগ্রন্থের উহা একটি বিশেষত্ব। মহাবির দ্বিতীয় স্তরে সূচিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই মোক্ষসাধন নহে, মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই উহা মোক্ষসাধন হয়। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আর কিছুতেই থাকিতে পারে না, ইহা সর্বসিদ্ধ। সুতরাং এই সর্বসিদ্ধ যুক্তিতে বুঝা যায়, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নাশক। তাহা হইলে যে সকল মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেগুলি বিনষ্ট হইলে অবশ্য মোক্ষ হইবে। সংসারের নিদান উচ্ছিন্ন হইলে আর সংসার হইতে পারে না, সুতরাং সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেই তত্ত্বজ্ঞানে যখন ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক, তখন অপবর্গকে ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বলা বাহিতে পারে। ফলতঃ এই ভাবে দ্বিতীয় স্তরে প্রথম স্ত্রোক্ত মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা হইয়াছে।

এই সূত্রে “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দ না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির কথা থাকার তত্ত্বজ্ঞানের কথা পাওয়া গিয়াছে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি আর কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহা সর্বসিদ্ধ।\* মিথ্যাজ্ঞান বলিতে অসত্য জ্ঞান, বাহা “তাহা” নয়, তাহাকে “তাহা” বলিয়া জ্ঞান; তাহা হইলে বুঝা গেল, বিপরীত ভ্রম জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞান কোন বিষয়ে কি প্রকার, তাহা বুঝিতে হইবে। দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞানই এই সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে দোষের নিবৃত্তি হয়, এ কথা এই সূত্রে বলা হইয়াছে। কারণের নিবৃত্তিতেই কার্যের নিবৃত্তি বলা যায়, মহাবিও এই সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। মহাবি তাহার “প্রমের” পদার্থের মধ্যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং চতুর্থাধ্যায়ে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে “দোষ” বলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে মোহই সকলের মূল, মোহই সকল অনর্গলের নিদান বলিয়া দোষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর; কারণ, মোহ ব্যতীত রাগ ও দ্বেষ জন্মে না, এ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং সেই মোহই এই সূত্রে “মিথ্যাজ্ঞান,” ইহা বুঝা যায় এবং মিথ্যাজ্ঞানের পৃথক উল্লেখ থাকার তাহার কার্য রাগ ও দ্বেষই এই সূত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা

\* পরে মহাবিসূত্রেও এ কথা পাওয়া যায়—“মিথ্যাপলঙ্ঘনবিনাশতত্ত্বজ্ঞানঃ”—ইত্যাদি হয় (৩ অং ৩ অং)।



উক্ত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়; ভাষ্যকার প্রভৃতিও তাহাই বুঝিয়াছেন। অবশ্য মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন “সংশয়” প্রভৃতি আরও মোহ আছে, মোহের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারও তাহা বলিয়াছেন, সেগুলিও রাগ ও হেব জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেগুলিরও নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এখানে বিপরীত নিশ্চয়রূপ মিথ্যা জ্ঞানই মহর্ষির বক্তব্য; কারণ, তাহাই সংসারের নিদান। এখানে মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান মহর্ষির বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বনিশ্চয়। নিশ্চয়ত্বক মোহের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে। সুতরাং “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত নিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞানের নাশকরূপে সূচিত করিবার জন্য মহর্ষি অন্যত্র স্বাক্ষর “মোহ” শব্দের প্রয়োগ করিলেও এই সূত্রে “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও “বিপর্যয়” বৃত্তির ব্যাখ্যায় “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (“বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা”—যোগসূত্র। ৮) ভাষ্যকার অন্যত্র মিথ্যাজ্ঞান অর্থে “মোহ” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও করা বাইতে পারে। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানও মোহ এবং মোহের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানরূপ নিশ্চয়ত্বক মোহই প্রধান।

সূত্রে বর্ণন “মিথ্যাজ্ঞানে”র নিবৃত্তিতে রাগ ও হেব প্রভৃতি দোষের নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষলাভের কথা বলা হইয়াছে, তখন যে সকল বিষয়ে দেহরূপ মিথ্যাজ্ঞান অনাদিকাল হইতে জীবের রাগ-দোষাদির নিদান হইয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত মিথ্যাজ্ঞান, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন—“দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাহঙ্কার-নিবৃত্তিঃ” (৪।২।১)। অর্থাৎ যে সকল পদার্থ পূর্বোক্ত দোষের নিমিত্ত, তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। শরীরাদি পদার্থে জীবের যে আত্মবোধ বা আত্মবুদ্ধি আছে, তাহাই অহঙ্কার। জীব মাত্রেরই উহা আজন্মসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমের মতে উহাই উপনিষদ্রূপ “হৃদয়গ্রহি”। উহার নিবৃত্তি করিতে হইলে আত্মা শরীরাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার আবশ্যক। আর কিছুতেই ঐ অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে না। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান হইয়াছে, সেই বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত ঐ মিথ্যাজ্ঞান আর কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না, ইহা লোকসিদ্ধ—সর্বসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমোক্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেষের মধ্যে শরীরাদি দশ প্রকার পদার্থ পূর্বোক্ত দোষের নিমিত্ত; এ দশ উহাদিগকে “হেয়” বলা হয়। হুংখই হেয় এবং হুংখের নিমিত্তগুলিও হেয়। শরীরাদি দশ প্রকার প্রমেষের মধ্যে একটি হুংখ এবং আর নয়টি হুংখের হেতু; সুতরাং ঐ দশটি হেয় এবং মোক্ষটি আত্মার “অধিগম্য” অর্থাৎ লভ্য, জীবাত্মা উহা লাভ করিবেন। এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই মহর্ষি গোতম “প্রমেষ” নামে পরিচািত করিয়াছেন। ইহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। কারণ, এই সকল পদার্থ-বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত জীবের রাগদোষ থাকিবেই। তন্মধ্যে শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান বাহা সকল জীবের আজন্মসিদ্ধ এবং বাহা সকল মিথ্যাজ্ঞানের মূল, সেই অহঙ্কাররূপ মিথ্যা জ্ঞানবশতঃ জীব নিজের শরীরাদির উচ্ছেদকেই নিজের আত্মার উচ্ছেদ মনে করে। সুখে যিনি বাসাই বলা, আত্মার উচ্ছেদ কাহারই



কাম্য নহে। পরন্তু জীব মাত্রই আত্মার উচ্ছেদভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার অহুকূল বিষয়ে অমুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিধেব করে। এইরূপ নানাবিধ রাগ-দেবের কলে জীব নানাবিধ কৰ্ম করিয়া আবারও শরীর গ্রহণ করে। এইরূপ ভাবে অনাদি কাল হইতে জীবের জন্ম-মরণ-প্রবাহ চলিতেছে। ঐ প্রবাহ একেবারে রুদ্ধ করা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। উহা রুদ্ধ করিতে হইলেও উহার মূল অহঙ্কারকে একেবারে রুদ্ধ করিতে, বিনষ্ট করিতে হইবে এবং জীবের আরও কতকগুলি মিথ্যা জ্ঞান আছে, তাহা আত্মসিদ্ধি না হইলেও সময়ে উপস্থিত হইয়া জীবের মোক্ষ-লাভনারুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয়। পুনর্জন্ম নাই, মোক্ষ নাই, ইত্যাদি প্রকার অনেক মিথ্যা জ্ঞান জীবকে মোক্ষসাধনে অনেক পশ্চাৎ-পদ করিয়া এবং আরও বিবিধ রাগদেবের উৎপাদন করিয়া সংসারের নিদান হয়। সুতরাং সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। এ জন্ত মহর্ষি গোতম যে সকল পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান, সেই সকল পদার্থকেই দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া “প্রমের” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। এই সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষের কথা বলার, সেই প্রাচীন “প্রমের” বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই তাহার বুদ্ধিস্ত, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং ঐ প্রমের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। আত্মাদি প্রমের পদার্থ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই যখন সংসারের নিদান, তখন প্রমাণ প্রকৃতি পদার্থ সাক্ষাৎকার তাহা নিবৃত্ত করিতে পারে না। এক বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান অজ্ঞ বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কখনই নষ্ট হয় না। সুতরাং মহর্ষি-কথিত ছোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বুঝা গেল। “হেয়,” “হান,” “উপায়,” “অবিগম্যব্য”—এই চারিটিকে “অর্থপদ” বলে। ইহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকার মোক্ষে আবশ্যক এবং দ্বিতীয় সূত্রে তাহা ব্যক্ত আছে, এ কথা ভাষ্যকারও পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন। হেয় কি, তাহা সম্যক্ না বুঝিলে, তাহার একেবারে ত্যাগ হইতে পারে না এবং তাহা “অবিগম্যব্য”, তাবিধে মিথ্যা জ্ঞান থাকিলেও তাহা পাওয়া যায় না। সকল মিথ্যাজ্ঞানের মূল অহঙ্কার নিবৃত্তি করিতে না পারিলেও শরীরাদি হেয় পদার্থকে ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যোক্ত চারিটি “অর্থপদকে” সম্যক্ বুঝিতে গেলে আত্মাদি দ্বাদশ “প্রমের” সাক্ষাৎকারই করিতে হইবে, ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, মহাবির সকল কথা (চতুর্থাধ্যায় ব্রহ্মব্য) পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি আত্মাদি “প্রমের” বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকেই সংসারের নিদান বলিয়া ঐ “প্রমের” তত্ত্বসাক্ষাৎকারকেই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীন আচার্যগণও তাহাই বুঝিয়া গিয়াছেন। এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-কথিত আত্মাদি দ্বাদশ “প্রমের” বিষয়েই মিথ্যাজ্ঞানের প্রকার বর্ণনা করিয়া সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানগুলির প্রকার দেখাইয়া প্রমের তত্ত্বজ্ঞানের আকার দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।



এখানে একটি বিশেষ প্রশ্ন এই যে, মহাবি গোতম যে প্রেমের তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কেন? ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান কি মোক্ষের কারণ নহে? ঈশ্বর কি মুমুকুর প্রেমের নহেন? কেবল গোতমোক্ত প্রেমের পদার্থের মধ্যেই নহে, প্রমাণাদি বোদ্ধ পদার্থের মধ্যেই ঈশ্বর নাই, ইহার গূঢ় কারণ কি? মহাবি গোতম কি নিরীশ্বরবাদী? অথবা ঈশ্বর মানিয়াও মোক্ষে ঈশ্বরজ্ঞানের কোন আবশ্যকীয়তা স্বীকার করেন না? ভাষ্যকার প্রভৃতি ভাষ্যচার্য্যগণ এ প্রশ্নের কোন অবতারণাই করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বর প্রদত্তে (৪১।১৯।২০।২১সূত্রে) ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঈশ্বর সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু গোতমোক্ত বোদ্ধ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই কেন, ইত্যাদি কথার কোন অবতারণাই করেন নাই।

ভাষ্যবিদ্যার যথামতি পর্যালোচনার দ্বারা আমার বাহা বোধ হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার কিছু আভাস দিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহাবি “হেয়”, “অবিগন্তব্য” এবং “অবিগন্তা” এইগুলি ধরিয়াই দ্বাদশপ্রকার প্রেমের বলিয়াছেন। তন্মধ্যে মোক্ষ “অবিগন্তব্য”, জীবাশ্ম তাহার “অবিগন্তা”, অর্থাৎ জীবাশ্মই মোক্ষলাভ করেন। শরীরাদি আর দশটি “হেয়”। বাহা চঃখ, তাহাই ত মুমুকুর হেয় (ত্যাগ্য)। চঃখের হেতুগুলিও সেই জন্ত হেয়। ঈশ্বর হেয় নহেন, ইহা সর্বসম্মত। গোতম মতে ঈশ্বর মুমুকুর “অবিগন্তব্য”ও নহেন, মোক্ষের “অবিগন্তা” অর্থাৎ জীবাশ্মও নহেন। বাহ্যার জীবাশ্ম ও পরমাত্মার অবৈত সিদ্ধান্তের বর্ণনার জন্ত এবং সেই সিদ্ধান্তানুসারে মোক্ষের উপায় বর্ণনার জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই মুমুকুর “অবিগন্তব্য” বলিয়াছেন এবং বলিতে পারেন। শুদ্ধাধিত মতে মোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, জীবাশ্ম ও ব্রহ্মে বাস্তব কোন ভেদ নাই, সুতরাং সে মতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবাশ্মসাক্ষাৎকার। সে মতে ব্রহ্মের কথা আর জীবাশ্মের কথা ফলে একই কথা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই সে মতে জীবাশ্মসাক্ষাৎকার হইল, সর্বসাক্ষাৎকারই হইল। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে ব্রহ্মের কথাই প্রাধান্যরূপে—বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই সেই সকল শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য। কারণ, সে মতে ব্রহ্মের প্রতিপাদনেই জীবাশ্ম ও মোক্ষের স্বরূপ প্রতিপাদন হয়। সে মতেও জীবাশ্ম-সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, তবে ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকারই চরম কর্তব্য, এ জন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারই মোক্ষের চরম কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যার পরমাত্মা হইতে জীবাশ্মের বাস্তব অস্তিত্ব ভেদ পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ বলিতে পারেন না। তাহানিগের মতে মোক্ষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং ব্রহ্ম মুমুকুর অবিগন্তব্য নহেন। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মোক্ষই মুমুকুর অবিগন্তব্য অর্থাৎ লভ্য এবং তাহানিগের মতে ব্রহ্ম সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া অবিগন্তব্য হইতেও পারেন না। কারণ, সিদ্ধ পদার্থে ইচ্ছা হয় না। বাহা অসিদ্ধ, উপায়লভ্য, তাহাই ইচ্ছার বিষয় হইয়া অবিগন্তব্য হইতে পারে। আত্মসিক হঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অসিদ্ধ বলিয়া, উপায়লভ্য বলিয়া অবিগন্তব্য হইতে পারে। ঐ মোক্ষপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হয়। বস্তুর উহা ছাড়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর কিছু নাই—বাহা নিত্য-সিদ্ধ, বিশ্বব্যাপী পদার্থ,



তাঁহার অপ্রাপ্তি অসম্ভব, এ জন্য ব্রহ্মকে “অবিগন্তব্য” বা প্রাপ্য বলা যায় না। মোক্ষবাদী সকল সম্প্রদায়ই মোক্ষকেই জীবের “অবিগন্তব্য” বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈতবাদী সম্প্রদায় মোক্ষকে ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই “অবিগন্তব্য” বলিয়াছেন। সেই মোক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্ম উপাস্ত, ব্রহ্ম ধ্যেয়, ব্রহ্ম জ্ঞেয়, কিন্তু ব্রহ্ম “অবিগন্তব্য” নহেন। ব্রহ্ম অদিক্ত নহেন বলিয়াও মোক্ষের উপায়ের দ্বারা লাভ্য নহেন। মহর্ষি গোতম বৈত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বলিয়াছেন এবং ন্যায়বিদ্যার “প্রহানা” হুসারে মোক্ষোপায়ের কোন অংশবিশেষই বিশেষরূপে বলিয়াছেন, এ জন্ত তিনি “প্রমের” মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। জীবাত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই তিনি “প্রমের” বলিয়াছেন অর্থাৎ “হের”, “অবিগন্তব্য” এবং “অবিগন্তা” অর্থাৎ যিনি মোক্ষলাভ করিবেন, এই গুলিকেই তিনি “প্রমের” বলিয়াছেন। উহাদিগের মিথ্যাজ্ঞানই তাঁহার মতে সংসারের নিদান। তাঁহার মতে জীবাত্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান আর ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান একই পদার্থ নহে। কারণ, জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানকে তিনি অদ্বৈতবাদীর ভ্রায় সংসারের নিদান বলিতে পারেন না। ব্রহ্মবিষয়ে আনিত্ত্ব-বুদ্ধিরূপ অহঙ্কারও জীবের আজন্ম-দিক্ত নহে। পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে ভেদবুদ্ধিই অসংখ্য জীবের বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু শরীরাদি পদার্থে আনিত্ত্ব-বুদ্ধি সকল জীবেরই আজন্মদিক্ত। যে সকল জীবের ঈশ্বর বিষয়ে কোন জ্ঞানই নাই, তাহাদিগেরও জন্মাবধি শরীরাদি পদার্থে আনিত্ত্ব-বুদ্ধি বা ঐরূপ সংস্কার বদ্ধমূল বলিয়া সর্ব-সম্মত। সুতরাং ঐরূপ অহঙ্কারই প্রধানতঃ সংসারের নিদান এবং ভাষ্যাক্ত আরও কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞানও জীবের মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হইয়া সংসারের নিদান হইয়া পড়ে। ঈশ্বর-বিষয়ে ঐরূপ কোন মিথ্যাজ্ঞান কাহারও হইলেও যদি তাহার গোতমোক্ত দ্বাদশ প্রকার “প্রমের” পদার্থে মিথ্যাজ্ঞান প্রবল না থাকে, তবে উহা মোক্ষসাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয় না। ঈশ্বর না মানিয়াও আন্ত্রিক হওয়া যায়, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য প্রকৃতি আন্ত্রিক সম্প্রদায়ও মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অনুষ্ঠানের কালে শেষে তাহাদিগেরও কোন কালে ঐ মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হওয়ার তাহারও ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া ঐ মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়াছেন, ইহা কিন্তু আমার বিশ্বাস। ইহারা শুভ অনুষ্ঠান করেন, ভগবান্ রূপা করিয়া তাহাদিগের ভ্রম দূর করিয়া থাকেন। ফলকথা, ঈশ্বর বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানকে সংসারের নিদান বলা অনাবশ্যক এবং পূর্বেক্ত প্রকারে উহা সংসারের নিদান হইতেও পারে না। এ জন্ত মহর্ষি গোতম ঈশ্বরকে “প্রমের” পদার্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। জীবাত্মাকেই প্রমের পদার্থের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। জীবাত্মারই মোক্ষ হইবে এবং শরীরাদি পদার্থে জীবাত্মার অহঙ্কার বা আনিত্ত্ব-বুদ্ধিই মুস্কুর চরমে বিনষ্ট করিতে হইবে। আমি আমার ঐ অহঙ্কার বিনষ্ট করিতে না পারিলে কিছুতেই সংসারমুক্ত হইতে পারিব না। জীবাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবাত্মসাক্ষাৎকার নহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জীবাত্মসাক্ষাৎকারের জন্ত পূর্বে আবশ্যক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নহে। জীবাত্মসাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, এ জন্ত মহর্ষি গোতম তাঁহার “প্রমের”-পদার্থের মধ্যে জীবাত্মারই উল্লেখ



করিয়াছেন, ঈশ্বর বা পরমান্বার উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, ঐহিক পক্ষে যে আত্মার তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, মহর্ষি গোতম সেই জীবাত্মাকেই “প্রমেয়” মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। গোতমের পরিভাষিত “প্রমেয়” ভিন্ন আরও অনেক প্রমেয় আছে, সে সকল প্রমেয়ও মহর্ষি গোতমের সম্বন্ধ। ঈশ্বরও তাঁহার সম্বন্ধ। তবে তিনি যে ভাবে মোক্ষোপযোগী পদার্থের গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর প্রকৃতি পদার্থ মোক্ষোপযোগী হইলেও সে ভাবে সে দিক্ দিয়া মোক্ষোপযোগী নহে। মহর্ষি গোতমোক্ত “প্রমেয়”-পদার্থগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত মানস প্রত্যক্ষায়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইতে পারে না। জীব মনের দ্বারাই শরীরাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া বুঝিতেছে, সুতরাং মনের দ্বারাই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে (“মননৈবানুদ্রষ্টব্যং”)। সুতরাং মনকে সাধনের দ্বারা ঐ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের যোগ্য করিতে হইবে, ঈশ্বর-প্রাণিদানাদি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; সে সবগুলি জ্ঞানবিদ্যার “প্রস্থান” নহে; কারণ, জ্ঞানবিদ্যা উপনিষদের দ্বারা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, ইহা গীতার দ্বারা “ব্রহ্মবিদ্যা” বা “যোগশাস্ত্র” নহে। “প্রস্থান”-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ। এক শাস্ত্রের “প্রস্থান” অন্য শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইলে শাস্ত্রভেদ হইতে পারে না। গীতা প্রকৃতি শাস্ত্রেও ন্যায়বিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিদ্যার “প্রস্থান” গুলি বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই, তাহাতে সেই সকল শাস্ত্রের কোন অসম্পূর্ণতাও হয় নাই। যে শাস্ত্রের যেগুলি “প্রস্থান”, সেইগুলিই তাহার বিশেষ প্রতিপাদ্য, অসাধারণ প্রতিপাদ্য। তাহাতে শাস্ত্রান্তরের “প্রস্থান” গুলি বিশেষরূপে বলা হয় নাই, তাহা বলাই উচিত নহে। অন্য শাস্ত্র হইতেই সেগুলি জানিতে হইবে। ঋষিগণ এই প্রণালীতেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াছেন। প্রস্থানভেদে এবং অধিকার-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে, উপদেশের ভেদ হইয়াছে। মহর্ষি গোতমোক্ত “প্রমেয়”-তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য পূর্বে ঐ প্রমেয়গুলির শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। সেই প্রমেয় মননের জন্য মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞান করিয়াছেন। ঐ পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে মুমুক্শু প্রমেয় পদার্থগুলির মনন করিবেন। মহর্ষি প্রমেয়-পরীকার দ্বারা (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে) সেই মননের প্রণালী দেখাইয়াছেন। মুমুক্শু ঐ প্রণালীতে আত্মাদি পদার্থের মনন করিবেন এবং যত দিন পর্যন্ত লোকসঙ্গ অপরিহার্য থাকিবে, তত দিন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক প্রকৃতির সহিত বাধ্য হইয়া বিচার করিয়া নিজের শ্রবণ-মনন-সকল তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিবেন। অল্প কোন উদ্দেশ্যে কখনও ঐরূপ জর বিতণ্ডা করিবেন না। গুরু প্রকৃতির সহিত “বাদ” পর্যন্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থগুলি প্রমেয়-বিচারের অঙ্গ, উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে প্রমেয়গুলির মনন এবং নিজের যথার্থ বিশ্বাস রক্ষা করাই মুমুক্শুর কার্য। বিরুদ্ধবাদীদিগের দৌরাত্ম্যে বৈদিক দিক্ দিক্ হুতির কাল হইতেই আঘাত পড়িতেছে, অনেক বিচারশক্তিশূন্য ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট হইতেছে, নাস্তিকতা উপস্থিত হইতেছে এবং ঐ দৌরাত্ম্যের আশঙ্কা চিরকালই আছে ও থাকিবে। এ জন্য ন্যায়বিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি বিচারাদি “প্রমাণা”দি পদার্থের তত্ত্ব জানিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং আত্মরক্ষার



জনা, ধর্ম রক্ষার জন্য, আত্মিকতা রক্ষার জন্য “জন্ম”, “বিতণ্ডা”, “ছন্দ”, “জাতি” প্রভৃতিরও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। শেষে তিনি \* স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, যেমন কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রক্ষার জন্য লোকে কটকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ করিয়া রাখে, তদ্রূপ নিজের আত্মসংলগ্ন তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”ও করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রমাণাদি পদার্থের দ্বারা “প্রমের”-মননোপযোগী বিচার্য্য পদার্থ নহেন, এ জন্য প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের মধ্যেও বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তবে বিচারে সিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরের যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহা মহর্ষি-কথিত “সিদ্ধান্ত” পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেই হইবে। ঈশ্বর যখন সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, তখন সিদ্ধান্তের তত্ত্ব বুঝিতে বলাতেই ঈশ্বরকে সিদ্ধান্তরূপে বুঝিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু প্রমের-মননের জন্য অথবা বাদিনির্গত করিয়া নিজের আত্মসংলগ্ন তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিবার জন্য প্রমাণাদি পদার্থের ন্যায় এবং জন্ম-বিতণ্ডা প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক হয় না, তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক হয় না। তজ্জন্যই মহর্ষি ঐ সকল পদার্থের মধ্যেও ঈশ্বরের বিশেষ উল্লেখ বা সংশ্লিষ্ট পদার্থের ন্যায় পৃথক উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, পূর্বোক্ত প্রকারে যে সকল পদার্থ মোক্ষোপযোগী, মহর্ষি তাহাদিগেরই বোড়শ প্রকারে বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ভাবে যাহারা মোক্ষের উপযোগী নহে, তাহারা অন্য ভাবে মোক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও মহর্ষি সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। কারণ, সেগুলি তাহায় ন্যায়বিদ্যায় বক্তব্য নহে। মোক্ষে কত পদার্থ, কত কর্ম উপযোগী অর্থাৎ আবশ্যক আছে, মোক্ষবাদী সকলেই কি তাহার সবগুলির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন? নিজ শাস্ত্রের প্রস্থানান্তর্য্যেই সকলে প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমের দ্বারশাস্ত্রে অধ্যায় অংশে মনন-শাস্ত্র। শ্রুতির “মন্তব্যঃ” এই অংশে তিন্তি স্থাপন করিয়াই এই ন্যায়শাস্ত্রের গঠন। ইহার সাহায্যে মুমুকু “প্রমের” মনন করিবেন এবং সেই অপরিস্কৃত তত্ত্বনিশ্চয়কে বিরুদ্ধবাদীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন, এই পর্য্যন্তই অধ্যায় অংশে এই দ্বারশাস্ত্রের মুখ্য ব্যাপার। শেষে মুমুকুর আর যাহা বাহ্য কর্তব্য, তাহার বিশেষ বিবরণ অন্য শাস্ত্রে আছে। মহর্ষি গোতমও আবশ্যক বোধে সেগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চতুর্থাদ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে, মোক্ষলাভের জন্য এই পর্য্যন্তই চরম অনুষ্ঠান নহে, ইহার জন্য বোগাভ্যাগ করিতে হইবে; যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হতরাং মহর্ষি গোতম ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সহিত ন্যায়দর্শনের মূক্তির কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, এ কথাও জোর করিয়া সিদ্ধান্তরূপে বলা যায় না।

মূলকথা, এই ন্যায়বিদ্যা মুমুকুকে আত্মাদি প্রমের পদার্থের মনন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে—“যাও, তুমি এখন নিদিধ্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়া বসিয়া পড়, এখন তোমার

\* “তদ্বাচ্যবসায়সংরক্ষণার্থঃ জন্মবিতণ্ডা বীজশ্রোত্রসংরক্ষণার্থঃ কটকশাখাবরণং” —ভাষ্যত্ব, ৪২/১০।



সে অধিকার জন্মিয়াছে। প্রেমের তত্ত্বসাক্ষ্যকারের জন্ত তোমাকে এখন ঐ “প্রেমের” পদার্থের ধ্যান, ধারণা ও সমাধি করিতে হইবে। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা প্রথম হইতেই করিতেছ, এখন প্রেমের তত্ত্ব সাক্ষ্যকারের জন্য ঈশ্বরে তোমার প্রেমলক্ষণী ভক্তির আবশ্যক হইবে। তাহার পরে ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাহারও তত্ত্ব-সাক্ষ্যকার করিতে হইবে। ভক্তির পরিপাকে ঈশ্বরসাক্ষ্যকার হইবে। তাহার পরে তোমার নিজের আত্মসাক্ষ্যকার হইবে,—প্রেমের তত্ত্বসাক্ষ্যকার হইবে। সেই প্রেমের তত্ত্ব-সাক্ষ্যকারই তোমার মোক্ষের চরম কারণ, তাহার জন্যই ঈশ্বরসাক্ষ্যকার পর্য্যন্ত আর সমস্ত সাধন আবশ্যক। আমি তোমাকে “প্রেমের” পদার্থের “মনন” পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলাম, এখন তোমার আর যাঁহা যাঁহা আবশ্যক, তাহার জন্ত অব্যাক্ষর, বোগশাস্ত্র, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু আছেন, তুমি সেখানে যাও। আমি এত দিনে তোমার যে বিশ্বাস জন্মাইয়াছি, তাহা রক্ষা করিব, তুমি যাঁহাতে যে কোন ব্যক্তির নিকটে প্রভাবিত না হও, প্রভাবিত হইয়া যাঁহাতে অভীষ্ট-লাভে আবার অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া না পড়, তোমার হিরীকৃত সাধনপ্রণালী হইতে, সিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট না হও, তোমার গুরুপদটি তব পদে পদে সন্নিহান হইয়া, পুনঃ পুনঃ গুরুর অমূল্যজ্ঞানেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত না কর, আমি সে বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিব। তুমি আমাকে ভুলিও না, আমাকে তোমার অনেক সময়েই আবশ্যক হইবে, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার অনেক অন্তরায় দূর করিব, বোগশাস্ত্রোক্ত অনেক “অন্তরায়” দূর করিতে তুমি আমাকে আশ্রয় করিও। যাও, এখন তুমি নিদিধ্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়া বসিয়া পড়। চতুর্থধ্যায়ে দেখানো এ সকল কথা বিশেষ আলোচনা প্রাপ্য। এখানে আর বেশী বলা যায় না। সকল কথা বিশদ করাও এখানে সম্ভব নহে।

কেহ বলেন, আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই হুত্রে ‘মিথ্যাজ্ঞান’ শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। উহা ছাড়া আর যে সকল মিথ্যাজ্ঞান আছে, পূর্বোক্ত আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নামেই সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, হুতরাং হুত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন সমস্ত “মোহ” এবং “রাগ” ও “দ্বेष” বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মহর্ষিও পরে চতুর্থধ্যায়ে অহঙ্কারনিবৃত্তির কথাই বলিয়াছেন। শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিই অহঙ্কার। আত্মবিষয়ক ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞান-বিশেষকেই মহর্ষি “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের দ্বারা এখানে লক্ষ্য করিতে পারেন এবং এ জন্য তিনি স্বরাক্ষর “মোহ” শব্দ ত্যাগ করিয়াও “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নামে অর্থাৎ আত্মার তত্ত্বজ্ঞানে অন্যবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নাম হইতে পারে না। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করিতে হইবে, সেই বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞান হওরা আবশ্যক। তবে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ঐ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের নিষ্পাদক হয় বটে, কিন্তু যে মিথ্যাজ্ঞানটি নষ্ট হইবে, ঠিক তাহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানটি জন্মিলেই তাহা নষ্ট হইবে, এ জন্তই ভাব্যকার আত্মা প্রভৃতি সকল “প্রমেরে”ই মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, তাহাদিগের সকলেরই তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা করিয়াছেন।



এখন আর একটি কথা এই যে, মিথ্যাজ্ঞান পূর্বজাত এবং তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে কি করিয়া বাধা দিবে? যেমন তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্মিতেই পারিবে না বলা হইতেছে, তজ্জপ মিথ্যাজ্ঞান বাহা পূর্বেই জন্মিয়াছে এবং বাহা তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের বাধক, তাহা থাকিতে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে না বলিতে পারি? যে ছোট জ্ঞান পরস্পর বিরোধী, তাহাদিগের মধ্যে যেটি প্রথমে জন্মিয়াছে, সেইটাই প্রবল হয়; যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান পরস্পর বিরোধী হইলে, সেখানে পূর্বজাত প্রত্যক্ষই প্রবল, এ জন্য সেখানে প্রত্যক্ষের বিরোধিতাবশতঃ অনুমান হইতেই পারে না। উদ্যোতকর এই প্রণেয় অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সহায়শূন্য বলিয়া দুর্বল, তত্ত্বজ্ঞান সহায়যুক্ত বলিয়া প্রবল, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বাধা দিবে। তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত তত্ত্বকে বিদ্যর করিয়া জন্মে, তাহা বার্থ জ্ঞান, সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ব বা প্রকৃত অর্থই তত্ত্বজ্ঞানের সহায়। প্রকৃত পদার্থটি তত্ত্বজ্ঞানের বিদ্যর হইয়া তাহাকে প্রবল করে। মিথ্যাজ্ঞান সেরূপ না হওয়ায় তদপেক্ষা দুর্বল; সুতরাং তাহা পূর্বজাত হইলেও পরজাত প্রবলের দ্বারা বাধিত হইতে পারে এবং তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষ বিশেষ প্রমাণের সাহায্য রহিয়াছে। প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান করিতে হইলে শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা প্রথমে প্রমেয়বিষয়ক “শ্রবণ” করিতে হইবে। তাহার পরে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ বিষয়ে “মনন” করিতে হইবে। শেষে ঐ বিষয়ে দ্যান, ধারণা, সমাধি করিতে হইবে। তাহার পরে প্রমেয়-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে। সুতরাং এই প্রমেয়-তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান আগমাদি প্রমাণের দ্বারা দমর্ষিত হইয়া দৃঢ়মূল হওয়ায়, ইহা পরজাত হইলেও পূর্বজাত দুর্বল মিথ্যাজ্ঞানকে বাধা দিয়া থাকে এবং দিতে পারে এবং মিথ্যাজ্ঞান পূর্বে জন্মিলেও এবং বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেও প্রবল তত্ত্বজ্ঞান পরে জন্মিতে পারে। প্রবল হইলে সে পূর্বে বদ্ধমূল দুর্বলকে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থল অধিকার করিতে পারে ও করিয়া থাকে। এ কথারও বার্থস্থানে পুনরাবলোচনা দ্রষ্টব্য। পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞানের মধ্যে পরজাত জ্ঞানের প্রাবল্য বিষয়ে তটু সূমারিলও “তত্ত্ববার্ত্তিকে” অনেক কথা বলিয়াছেন।

সূত্রে ‘জ্ঞঃ’ প্রভৃতি শব্দ যে ক্রমে পঠিত, তদনুসারে “জ্ঞঃ”ই সর্বপ্রথম। ‘জ্ঞঃ’, ‘প্রবৃতি’, ‘শেব’, ‘মিথ্যাজ্ঞান’, এই চারিটি উত্তর। কলে ঐ চারিটি কারণ উহাদিগের প্রত্যেকের পূর্বটি প্রত্যেকের কার্য্য। ‘উত্তরোত্তরাপায়ে’ ইহার অর্থ কারণগুলির অপায়ে। ‘তদনন্তরাপায়াং’ ইহার অর্থ তাহাদিগের কার্য্যগুলির অপায়বশতঃ। কারণের অনন্তরই কার্য্য হয়, এ জন্ত প্রাচীনগণ কার্য্য অর্থে ‘শেব’ শব্দ এবং ‘অনন্তর’ শব্দের প্রয়োগ করিতেন। আবার বাহার অন্তর নাই অর্থাৎ ব্যবধান নাই, অর্থাৎ বাহা অব্যবহিত, তাহাও অনন্তর শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। বাহা অব্যবহিত পূর্ব, তাহাকেও ঐ অর্থে ‘অনন্তর’ বলা যায়। মহাবি দেই অর্থেই এখানে অনন্তর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহা বাহার বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে “তদনন্তরাপায়াং” ইহার অর্থ “তাহাদিগের পূর্ব পূর্ব পদার্থের অপায়বশতঃ”। এ পক্ষেও



কলে 'কার্যগুলির অপারবশতঃ' এই অর্থই বলা হয়। কারণ, হ্রের পাঠক্রমহুসারে কার্যগুলিই পরপরটির পূর্ব। এখন দেখুন,—

(পূর্ব) হ্রঃখ,	(উত্তর) জন্ম।
(পূর্ব) জন্ম,	(উত্তর) প্রবৃতি।
(পূর্ব) প্রবৃতি,	(উত্তর) দোষ।
(পূর্ব) দোষ,	(উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান।

উত্তরগুলি কারণ, পূর্বগুলি তাহার কার্য; কারণের অপারে কার্যের অপায় হইয়া থাকে, যেমন কফনিমিত্তক জ্বর হইলে সেখানে কফের অপারে জ্বরের অপায় হয়। এখানেও হ্রোক্ত হ্রঃখাদি পদার্থগুলির ঐক্য নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি উত্তরের অপারে তৎপূর্বটির অর্থাৎ তাহার কার্য পূর্বটির অপায় হইবে। 'মিথ্যাজ্ঞানে'র অপারে তাহার কার্য দোষের অপায় হইবে। দোষের অপায় হইলে তাহার কার্য প্রবৃতির অপায় হইবে। প্রবৃতির অপায় হইলে জন্মের অপায় হইবে। জন্মের অপায় হইলে হ্রঃখের অপায় হইবে। জন্ম না হইলে আর হ্রঃখের সম্ভাবনাই নাই। তখন আর হ্রঃখের হেতু কিছুই থাকে না। হ্রঃখ, জন্ম, প্রবৃতি, দোষ, ইহার মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আবার হ্রঃখাদিপূর্বক। পূর্বে হ্রঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, অথবা পূর্বে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, পরে হ্রঃখাদি, ইহা বলা বাইবে না। উহার অনাদি। অনাদি কাল হইতে ঐ পদার্থগুলির কার্য-কারণ ভাবই সংসার। উহাদিগের অনাদিত্ব হ্রঃখের অন্যই স্বাকার হ্রঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও জ্ঞান্যকার স্বাকারের ক্রম লব্ধন করিয়া বলিয়াছেন,—“ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।” ন্যায়বাস্তবিকতার আবার ঐ অনাদিত্বকে বিশেষ করিয়া স্বরণ করাইবার জন্য ভাব্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ত ইমে হ্রঃখাদয়ঃ।”

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হ্রের “তদনন্তরাপারায়ং” এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“তদনন্তরন্ত তৎসম্মিহিতন্ত পূর্বপূর্বস্তাপারায়ং।” শেষে বলিয়াছেন যে, হ্রঃখের অপায়ই বখন অপবর্গ, তখন অপবর্গকে হ্রঃখের অপায় প্রযুক্ত বলা যায় না, সুতরাং হ্রঃ পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, ইহা মনে করিয়া আবার শেষে বলিয়াছেন যে, হ্রঃ অপবর্গ শব্দের দ্বারা অপবর্গব্যবহার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ হ্রঃখের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ ব্যবহার অর্থাৎ অন্য লোকে যে ‘অমকের অপবর্গ হইয়াছে’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগাদি করে, তাহা হ্রঃখের অপায়প্রযুক্ত। কেহ বলিয়াছেন, হ্রঃ ‘অপবর্গ’ শব্দের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবক্ষিত। সুতরাং পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি নাই। মনে হয়, এই পঞ্চমী বিভক্তির গোলাযোগ মনে করিয়াই শারীরক ভাষ্যের “ব্রহ্মপ্রভা” টীকাকার ত্রিগোবিন্দ এই স্বত্র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“তন্ত প্রবৃতি-রূপহেতোরনন্তরন্ত জন্মনোহপারায়ং হ্রঃখঃস্বরূপোহপবর্গো ভবতীত্যর্থঃ।”—(বেদান্তদর্শন, চতুর্থ স্বত্র, শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ তিনি হ্রঃ “তৎ” শব্দের দ্বারা কেবল “প্রবৃতি”কে



ধরিয়া “তদনন্তর” অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তির কার্য এবং প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত “জন্মের” অপায়বশতঃ হুংখের ধ্বংসরূপ অপবর্গ হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সূত্র “তৎ” শব্দের দ্বারা তাহার পূর্বে একযোগে কথিত “জন্ম”, “প্রবৃত্তি,” “দোষ” ও “মিথ্যাজ্ঞান” এই চারিটিই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ঐ চারিটিই “উত্তরোত্তর” শব্দের প্রতিপাদ্য। সুতরাং মহর্ষি ঐ চারিটিকেই “তৎ” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। উহার মধ্যে একমাত্র “প্রবৃত্তি”ই “তৎ” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা কিছুতেই মনে আসে না। তাহার পরে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থও সম্ভব হয় না। এক হুংখাপায়ের সহিত অপবর্গের অভেদ খাটিলেও জন্মের অপায় প্রবৃত্তির সহিত খাটে না। কারণ, সেগুলি অপবর্গ-স্বরূপ নহে। একই পঞ্চমী বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে মহর্ষি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। বৃত্তিকার তাহাই মনে করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছেন। শেষে তিনিও ঐ পক্ষ ত্যাগ করিয়া “অপবর্গ” শব্দে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি অপবর্গ-ব্যবহারের প্রয়োজক বলেন নাই। পরা মুক্তির ক্রম প্রদর্শনের অস্ত্র অপবর্গেরই প্রয়োজক বলিয়াছেন। কল কথা, মহর্ষি অপবর্গ ব্যবহার বুঝাইতেই “অপবর্গ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে আসে না। মহর্ষি-সূত্রের “অপবর্গ” শব্দে ঐরূপ আধুনিক লক্ষণা অনুমোদন করা যায় না।

বস্তুতঃ সূত্র “তদনন্তরপায়” শব্দের প্রতিপাদ্য কেবল হুংখের অপায় নহে, কেবল জন্মের অপায়ও নহে; দোষের অপায়, প্রবৃত্তির অপায়, জন্মের অপায় এবং হুংখের অপায়, এই চারিটি অপায়ই উহার প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে হুংখের অপায় স্বয়ং অপবর্গ-স্বরূপ হইলেও আর তিনটি অপায় ঐ অপবর্গের প্রয়োজক। উহাদিগের ঐ প্রয়োজকত্ব পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে। অথচ হুংখাপায়ের কথাটাও উহার মধ্যে বলিতে হইবে। কারণ-নাশক্রমে কার্যনাশ হইয়া শেষে হুংখ পর্য্যন্ত নষ্ট হইলেই পরা মুক্তি হয়, এই ক্রম প্রদর্শনও করিতে হইবে। ‘তদনন্তর’ শব্দের দ্বারা হুংখও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু হুংখের অপায় অপবর্গ প্রয়োজক নহে, এ জন্য ঐ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাটে না। কিন্তু আর তিনটি অপায়ে অপবর্গের প্রয়োজকত্ব থাকায় সেই তিন স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাটে এবং পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। একের কোনো না খাটিলেও বহুর অনুরোধে সর্বত্র একরূপ ব্যবস্থা অবগণ করিয়াছেন; তাই মনে হয়, এখানেও মহর্ষি গোতম বহুর অনুরোধে একবারে “তদনন্তরপায়ানাং” এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তিবৃত্ত ব্যাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার মধ্যে হুংখাপায়ের সহিত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থের কোন সম্বন্ধ বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ হেতুত্ব বা প্রয়োজকত্ব এখানে সম্ভব হয় না। আর তিনটি অপায়ে সম্ভব হয় এবং তাহাদিগকেই প্রয়োজক বলিতে হইবে, মহর্ষির তাহাই বিবক্ষিত। এ অস্ত্র মহর্ষি ঐরূপে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কলতঃ “হুংখাপায়াদপবর্গঃ” এইরূপ প্রয়োগ নাথু না হইলেও “তদনন্তরপায়াদপবর্গঃ” এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ, উহার মধ্যে হুংখের অপায় অপবর্গ প্রয়োজক না হইলেও আর তিনটি অপায় অপবর্গের প্রয়োজক, সেই তিনটিকেই অপবর্গের প্রয়োজক বলিবার জন্য বহুর অনুরোধে মহর্ষি একবারে



“তদনন্তরাগায়াং” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋষিগণ এইরূপ প্রয়োগ করিতে আশাশ্রিত ন্যায় সঙ্কলিত হইতেন না। মহর্ষি গোতমের অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। তাই মনে হয়, মহর্ষি এখানেও বহুর অধুরোধে একরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই যেন প্রকৃত কথা। অধীগণ এখানে বৃত্তিকার প্রভৃতির পঞ্চমী বিভক্তির সঙ্গতি ব্যাখ্যার সংগতি চিন্তা করিয়া এবং অন্ত কোনরূপ সংগতির চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত সমাধানের সমালোচনা করিবেন। আর চিন্তা করিবেন, বৃত্তিকারের ন্যায় প্রাচীনগণ এখানে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি দেখাইতে যান নাই কেন ?

কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাগ ও দেব ধর্ম ও অধর্মের কারণ নহে। ইচ্ছা ব্যতীতও গঙ্গা-দানাদি কার্যের দ্বারা কর্মশক্তিতে যখন ধর্ম হয় এবং দেব ব্যতীতও হিংসাদি ঘটনা গেলে যখন তজ্জন্য অধর্ম হয়, আবার জীবন্ত ব্যক্তির রাগ ও দেব থাকিলেও যখন ধর্মাদর্শ জন্মে না, তখন রাগ ও দেব ধর্ম অধর্মের কারণ বলা যায় না। সুত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংস্কারই বিবক্ষিত। উহাই ধর্মাদর্শের কারণ। জীবন্ত ব্যক্তির উহা না থাকাতাই রাগ ও দেববশতঃ কর্ম করিলেও ধর্ম ও অধর্ম হয় না।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমের পরিভাষানুসারে “দোষ” শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংস্কার বুঝা যায় না। মহর্ষি ঐরূপ অর্থে কোথায়ও দোষ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। পরন্তু এখানে মিথ্যাজ্ঞানের নাশে যখন দোষের নাশ বলিয়াছেন, তখন এখানে দোষ বলিতে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বুঝাও যায় না। কারণ, জ্ঞানের নাশে ঐ জ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হয়, এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলেও তজ্জন্য সংস্কার থাকিয়া যায়। জ্ঞানের নাশ ঐ জ্ঞানজন্য সংস্কারের নাশক হয় না; তাহা হইলে ঐ সংস্কার কোন দিনই স্থায়ী হইতে পারিত না। অবশ্য তদ্বিজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মহর্ষি তাহা বলেন নাই। মহর্ষির সুত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে, মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তদ্বিজ্ঞান উপস্থিত হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, তজ্জন্য দোষের অপায় হয়। তদ্বিজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, এ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মিতে পারে না এবং তদ্বিজ্ঞান যে সংস্কার উৎপন্ন করে, ঐ সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করে। সুতরাং তদ্বিজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে ঐরূপে বিনষ্ট করে বলা যায়। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হইয়া গেলে সেই সংস্কারজন্য স্রবণরূপ মিথ্যাজ্ঞানও আর জন্মিতে পারে না। তদ্বিজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকার জীবন্তের আর উৎকট রাগদেবও জন্মিতে পারে না। যেসকল দেব কর্মে আসক্ত করিয়া ধর্ম ও অধর্মের কারণ হয়, জীবন্তের তাহা জন্মিতে পারে না। সুতরাং তাহার ধর্ম ও অধর্ম জন্মে না। সুত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা ধর্মাদর্শের কারণরূপে সেইরূপ রাগ-দেবই উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, ঐরূপ দোষই ধর্ম ও অধর্মের কারণ। জীবন্তের রাগ-দেব সেসকল নহে। আর ঋষিগণের স্থলবিশেষে নিজের রাগ বা দেব না থাকিলেও ধর্ম ও অধর্ম জন্মিতেছে, তাহার কারণ জীবন্তের দ্বারা ঐ সকল কার্য করিতেছেন না। তাহাদিগের কর্মে আসক্তি আছে,



ধর্মজন্য হুধে আকাজ্ঞা আছে, অধর্মজন্য হুধে বিবেক আছে। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকার তাঁহাদিগের সেখানেও রাগ ও দ্বেষের বোগ্যতা আছে এবং সেই কর্মে না হইলেও কর্মান্তরে তখনও রাগ বা দ্বেষ আছে। তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারসহিত রাগ ও দ্বেষ বাহ্য ধর্ম ও অধর্মের প্রতি কারণরূপে মহর্ষি বলিয়াছেন, তাহা অসংগত হয় নাই। অবশ্য মহর্ষি রাগ ও দ্বেষকে ধর্মাদ্বয়ের সাক্ষাৎ কারণ বলেন নাই। শুভাশুভ কর্ম দ্বারা উহার ধর্ম ও অধর্মের কারণ। ঐ সঙ্গে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার প্রভৃতিও তাহার কারণ। ফল কথা, মহর্ষিসূত্র “দোষ” শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করার কারণ নাই। তবে ভাষ্যকার যে এখানে মহর্ষি-সূত্র “প্রবৃত্তি” শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। মহর্ষি তাঁহার “প্রমের” পদার্থের অন্তর্গত “প্রবৃত্তিকে” কারিক, বাচিক এবং মানসিক শুভাশুভ কর্ম বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সেখানে “প্রবৃত্তিকে” প্রথমবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি তাহা বলেন নাই। বস্তুতঃ “প্রবৃত্তির্কাগবুজ্জিশরীরারম্ভঃ” ( ১।১।১৭ ) এই সূত্রে “আরম্ভ” শব্দের দ্বারা কর্মকেই মহর্ষি-কথিত প্রবৃত্তি বলিয়া বুঝা যায়। এই কর্মরূপ “প্রবৃত্তিকে” কারণরূপ “প্রবৃত্তি” বলা হইয়া থাকে। এই কর্মফল ধর্ম ও অধর্মকেও ঐ কর্মরূপ প্রবৃত্তিসাধ্য বলিয়া “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মহর্ষিও কোন কোন স্থলে তাহা করিয়াছেন। এই ধর্মাদ্বর্মরূপ “প্রবৃত্তিকে” কার্যরূপ প্রবৃত্তি বলা হয়। অবশ্য ইহা “প্রবৃত্তি” শব্দের দু্যর্থ্য নহে, মহর্ষির প্রবৃত্তির লক্ষণোক্ত কর্মরূপ প্রবৃত্তিও নহে। কিন্তু এই ধর্ম ও অধর্মরূপ প্রবৃত্তিই জন্মের সাক্ষাৎ কারণ। কর্ম জন্মের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। কারণ, কর্ম জন্মের অব্যবহিত পূর্বে থাকে না, কর্মফল ধর্ম ও অধর্ম থাকে। সূত্রে প্রবৃত্তির অপায়ে জন্মের অপায় বলা হইয়াছে, সুতরাং জন্মের সাক্ষাৎ কারণ ধর্মাদ্বর্মরূপ “প্রবৃত্তিই” মহর্ষির এখানে বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে পূর্বসঞ্চিত ধর্ম ও অধর্মই নষ্ট হইয়া যায়। “জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্মানি ভগ্নস্যং কুরুতে” এই ভগবদগীতাবাক্যেও কর্মের ফল ধর্মাদ্বর্ম অর্থেই “কর্মন্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, যাগ, দান, হিংসা প্রভৃতি অহুজ্জিত কর্ম চিরস্থায়ী নহে, তাহা কর্মান্তেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাহার নাশ বলা যায় না। সেই কর্মের ফল সঞ্চিত ধর্মাদ্বর্মই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। এইরূপ শাস্ত্রে “কর্মন্” শব্দ ও “প্রবৃত্তি” শব্দ কর্মফল ধর্মাদ্বর্ম অর্থেও প্রযুক্ত আছে। ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ বেদেও আছে। যেমন প্রাণ অন্ন না হইলেও বেদ প্রাণকে “অন্ন” বলিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ন ব্যতীত প্রাণিদিগের প্রাণ থাকে না, অন্ন প্রাণের সাধন, অন্ন থাকিলেই প্রাণ থাকে, সুতরাং প্রাণকে অন্ন বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে “অন্ন” শব্দে লক্ষণার দ্বারা বুদ্ধিতে হইবে—অন্নসাধ্য। ঐরূপ কর্মরূপ প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্মাদ্বর্মকে “প্রবৃত্তি” বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা করা বাইতে পারে ; কারণ, ঐ প্রকার লাক্ষণিক প্রয়োগ পূর্ব হইতেই হইয়া আসিতেছে ; উহা আধুনিক প্রয়োগ নহে। ভাষ্যে “প্রবৃত্তিসাধন” এই কথার দ্বারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম বাহার সাধন, এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাস বুদ্ধিতে হইবে।



ভাষ্যকার এই সূত্রভাষ্যে শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির নিকায়বিশিষ্ট প্রাণত্ববশত জন্ম বলিয়াছেন। কিন্তু প্রেত্যভাব-সূত্রে (১৯ সূত্রে) দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত আত্মার পুনঃসম্বন্ধকে পুনর্জন্ম বলিয়াছেন। এখানেও প্রেত্যভাব বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বুদ্ধির পরে বেদনারও উল্লেখ করিয়াছেন। আরও অনেক স্থলে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানবাস্তবিকে উদ্যোতকরও (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে) অপূর্ব দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত সম্বন্ধবিশেষকে জন্ম বলিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্রও (ঈশ্বরব্রহ্মের অষ্টাদশ-কারিকায়) জন্মের ব্যাখ্যায় বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয়, ভাষ্যকার এখানে জন্মের ব্যাখ্যায় বুদ্ধির পরে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বেদনা শব্দটি এখানে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে উহা পাওয়া যায় না। দেহাদির নিকায়-বিশিষ্ট প্রাণত্ববশত ভাষ্যকার এখানে জন্ম বলিয়াছেন। নিকায় শব্দের অর্থ সমানবর্ম্মী প্রাপিবমূহ। (সমর্থাৎ জ্ঞানিকারঃ ইত্যমরঃ)। ভাষ্যকার (১৯ সূত্রে) প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যায় এই অর্থেই নিকায় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিতে হয়। কারণ, “নিকায়” শব্দের ঐ অর্থ সেখানে সংগত হইতে পারে। কিন্তু এখানে দেহাদির “নিকায়বিশিষ্ট” প্রাণত্ববশত জন্ম বলিয়াছেন। প্রচলিত পাঠে তাহাই পাওয়া যায়। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে জন্মের ব্যাখ্যায় দেহাদিকেই “নিকায়বিশিষ্ট” বলা হইয়াছে। মিলিত পদার্থের সমুচ্চয় অর্থেও “নিকায়” শব্দের প্রয়োগ করা যায়। কারণ, সে অর্থও অভিধানে পাওয়া যায় (শব্দকল্পদ্রুম ত্রুট্য)। সুতরাং “নিকায়বিশিষ্ট” বলিতে পরস্পর মিলিত বা মিলিত-ভাবাপন্ন, এইরূপ অর্থও বুঝা যায়। এখানে অনুবাদে ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মিলিত দেহাদির সহিত সম্বন্ধবিশেষই আত্মার জন্ম। আত্মা নিত্য, তাহার উৎপত্তিরূপ জন্ম হইতে পারে না। প্রাচীনগণ জন্মের ব্যাখ্যায় জন্মের বিশদ পরিচয়ের জন্যই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনেক পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। জন্মের লক্ষণ বলিতে ঐ সকল পদার্থের উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য, উহার সবগুলিকে না বলিলে জন্মের লক্ষণ নির্দোষ হয় না, ইহা মনে হয় না। প্রাচীনগণ ঐ পদার্থগুলির প্রত্যেকটির উল্লেখের কোন প্রয়োজন বর্ণন করেন নাই। ঐগুলির প্রত্যেকের উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে মনে হয়, তাৎপর্যটীকাকার অবশ্যই তাহা বলিয়া যাইতেন। কারণ, তিনি ঐরূপ প্রয়োজন অনেক স্থলেই বলিয়া গিয়াছেন। আধুনিক টীকাকারগণ প্রাচীন-গণের পরিচায়ক বাক্যকেও লক্ষণ-বাক্য খরিয়া লইয়া, তাহার প্রত্যেক শব্দের প্রয়োজন প্রদর্শনের জন্য নানা কল্পনা, নানা কথা অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও অনেক স্থলে ইষ্টসিদ্ধি হয় নাই, কেবল পুথি বাড়িয়াছে।

ভাষ্যে “বেদনা” শব্দের অর্থ কি? ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। বেদনা শব্দের দুই অর্থ এবং জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকগণ পারিভাষিক অর্থেও বেদনা শব্দের প্রয়োগ করিতেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর “পুণিমা” টীকাকার সেই পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিতে “বেদনা”কে সংস্কার বলিয়াছেন। তিনিই আবার বৈশেষিকের “উপস্কারের” টীকায় জন্মের ব্যাখ্যাত্তেই বেদনাকে “প্রাণসংহতি” বলিয়াছেন। শেষে তাহা সংগত বোধ না হওয়ার পরিশেষে



আবার সেখানে বেদনা শব্দের 'জ্ঞান' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ অজ্ঞান কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাকারও বেদনাকে সংস্কার বলিয়াছেন, কেহ বা "অনুভব" বলিয়াছেন। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে ব্যাখ্যা করিতে তাঁহারা কেহই কোন প্রকৃত প্রমাণ বা প্রাচীন সংবাদ প্রদর্শন করেন নাই।

বৌদ্ধসম্প্রদায় এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ বুঝাইতে বেদনা শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবিতেন, সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া ভাবিতেন। "দুঃখং দুঃখং" ইত্যাদি তাঁহাদিগের মত। মনে হয়, এই জন্তই তাঁহারা দুঃখবোধক বেদনা শব্দের দ্বারা এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ উভয়কেই প্রকাশ করিতেন। ভাব্যকার বাংত্য়ানও সুখকে দুঃখরূপে ভাবিবার কথা বলিয়া, মহাবী গোতম ষাটশপ্রকার প্রেমের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, কেবল দুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়াছেন (নবম সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের "বেদনাকল্প" হইতে "সংস্কারকল্প" পৃথক্। উদ্যোতকরও বৌদ্ধমত খণ্ডনে (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে) "বেদনা" ও "সংস্কার"কে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন এবং (৪।১।৩৩ সূত্রভাষ্য বাস্তিকে) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতখণ্ডনে এক স্থলে বেদনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বেদনা সুখ-দুঃখং"। শারীরকভাষ্যেও জীবের কথায় বেদনার কথা পাওয়া যায়। সেখানে "রত্নপ্রভা"য় ত্রীগোবিন্দ লিখিয়াছেন—"বেদনা হর্ষশোকাদিঃ"। তিনি আবার "আদি" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (দেদান্দর্শন, ১ অধ্যায়, ৩ পাদ, দহরাদিকরণের ১১ সূত্রের শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এই সকল দেখিয়া অনুবাদে বেদনার ব্যাখ্যায় সুখদুঃখরূপ পারিভাষিক অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে। জন্ম হইলেই আশ্চর্য দেহ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান এবং সুখদুঃখাদির সহিত সম্বন্ধ হয়। এই জন্ত ঐরূপ সম্বন্ধবিশেষকে জন্ম বলা যায়। তাছাড়া প্রচলিত পাঠে কোন স্থলে "সুখ" শব্দের উল্লেখ করিয়াও তাহার পরে "বেদনা" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে বেদনা শব্দের কেবল দুঃখরূপ প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝিতে হয়।

"প্রতিসন্ধান" শব্দটি দার্শনিক ভাষায় প্রত্যভিজ্ঞা অর্থেই অধিক প্রযুক্ত দেখা যায়। স্থল-বিশেষে জ্ঞানমাত্র অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়। কিন্তু এখানে "উচ্ছেদ" শব্দের পরবর্তী "প্রতিসন্ধান" শব্দের ঐরূপ অর্থ সংগত হয় না। এখানে উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে উৎপত্তি। দেহাদি একটি সমষ্টির উচ্ছেদ হইলে পুনরায় আর একটি দেহাদিসমষ্টির "প্রতিসন্ধান" বা সংযোজন অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য। মহাবীসূত্রেও পুনরুৎপত্তি অর্থে "প্রতিসন্ধান" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশস্ত" (৪।১।৬৪)। সেখানে ভাব্যকারও সূত্রোক্ত প্রতিসন্ধানকে 'প্রতিসন্ধি' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া, উহার পুনর্জন্ম অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রে "উত্তরোত্তরাপারে" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা প্রয়োজক বুঝিতে হইবে। পরপরটির অপার হইলে অর্থাৎ পরপরটির অপারপ্রযুক্ত। যেমন জল পান করিলে পিপাসার



শাস্তি হয়, এই কথা বলিলে পিপাসার শাস্তি জলপানপ্রযুক্ত—ইহা বুঝা যায়, তরুণ এখানেও ঐরূপ বুঝা যাইবে।

প্রচলিত অনেক ভাষ্য-পুস্তক ও “ন্যায়সূচীনিবন্ধ” প্রভৃতি পুস্তকে দ্বিতীয় সূত্রে “তদনন্তরা-ভাবাৎ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু এখানে “তদনন্তরাপায়াৎ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি দুই স্থলেই “অপার” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দেখিলেও তাহাই মনে আসে। উদ্যোক্তকর, শঙ্করাচার্য্য এবং “ভামতী”তে বাচস্পতি মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতিও “তদনন্তরাপায়াৎ” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। স্মরণ করিতে হইবে, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা কি কি ভবের সূচনা করিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞান স্বতাই মোক্ষসাধন হয় না, উহা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করে বলিয়াই মোক্ষসাধন হয় এবং সেই যুক্তিতেই তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই তত্ত্বজ্ঞানের কল বলিতে, ঐ অংশ ধরিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও (বেদান্তদর্শন, চতুর্থ সূত্রভাষ্যে) স্বনিকাত সমর্থনের জন্ত মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটিকে “আচার্য্য-প্রণীত” এবং “যুক্তিযুক্ত” বলিয়া বিশেষ সন্মান প্রদর্শন পূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের সাধন কেন, ইহার যুক্তি সূচিত হওয়ায় এই সূত্রের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা এবং প্রমাণাদি পদার্থ, তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরীক্ষা হইয়াছে। সূত্রায়ং জ্ঞানবিদ্যার সহিত তাহার পরমপ্রয়োজন অপবর্গের সম্বন্ধও পরীক্ষিত হইয়াছে। মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞানে যখন জ্ঞানবিদ্যা আবশ্যক, তখন মোক্ষের সহিতও জ্ঞানবিদ্যার সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। এবং মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন হয় বলাতে আত্মাদি প্রমেয়তত্ত্বসাক্ষ্যংকারই যে মোক্ষের সাক্ষ্যং কারণ, ইহা সূচিত হইয়াছে। কারণ, তাহাই আত্মাদি “প্রমেয়” বিষয়ে সংসারের নিদান মিথ্যা জ্ঞানগুলিকে নিবৃত্ত করিতে পারে। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানে আবশ্যক হয়, সূত্রায়ং উহা মোক্ষের প্রয়োজক, সাক্ষ্যংকারণ নহে। এবং এই সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে অপবর্গের কথা বলায় এবং প্রথম সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের কারণ বলায় সূচিত হইয়াছে যে, কোন মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরেই জন্মে, কোন মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে কালবিশেষে জন্মে। তাহা হইলে সূচিত হইয়াছে—মুক্তি দ্বিবিধ। অপরা মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই জন্মে, সেই জীবন্ত যুক্তিই শাস্ত্রবক্তা। সূত্রায়ং শাস্ত্রের উপদেশ ব্রাহ্মের উপদেশ নহে। পরা মুক্তি নির্মাণ, উহা তত্ত্বজ্ঞানের পরেই জন্মে না। উহা জীবন্তজ্ঞানের প্রারম্ভ ভোগান্তে গৃহীত জন্মের অর্থাৎ গৃহীত দেহাদির উচ্ছেদ হইলেই জন্মে। এইরূপ বহু তত্ত্বই মহর্ষি-সূত্রে সূচিত হইয়া থাকে। বুঝিয়া লইতে পারিলে ঋষিসূত্রের দ্বারা অনেক বুঝা যায়। অজ্ঞাত কণা চতুর্থাধারে মোক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রসঙ্গে লিখ্য। ২।

অভিধেয়সম্বন্ধপ্রয়োজনপ্রকরণ সমাপ্ত। ১।

দীর্ঘত্বের দিকায় প্রবাহর ভট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন—“সতিদগ্ধাঃ প্রযোজকবসনঃ।” (মূলোক্তকবসন্যায়ান্তে লিখ্য)।



ভাষ্য । ত্রিবিধা চাস্ত্র শাস্ত্রস্ব প্রবৃত্তিরুদ্ধেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি । তত্র নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্বাভিধানমুদ্দেশঃ,—তত্রোদ্দিষ্টস্বাত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্মো লক্ষণং, লক্ষিতস্ত যথালক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি প্রমর্শৈরবধারণং পরীক্ষা । তত্রোদ্দিষ্টস্ব প্রবিভক্তস্ব লক্ষণমুচ্যতে, যথা প্রমাণানাং প্রমেরস্ব চ । উদ্দিষ্টস্ব লক্ষিতস্ব চ বিভাগবচনং, যথা ছলস্ব, “বচনবিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং”—“তৎ ত্রিবিধং”মিতি ।

অনুবাদ । এই শাস্ত্রের ( স্মারদর্শনের ) প্রবৃত্তি অর্থাৎ উপদেশ ব্যাপার ত্রিবিধ, (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ এবং (৩) পরীক্ষা । তন্মধ্যে নামের দ্বারা পদার্থমাত্রের উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থগুলির নামমাত্র কখন “উদ্দেশ” । তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট পদার্থের অর্থাৎ যাহার নাম বলা হইয়াছে, তাহার অতত্ত্বব্যবচ্ছেদক ধর্ম অর্থাৎ সেই পদার্থ যে তত্ত্বিন্ন পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহার বোধক ( ইতরব্যাবর্তক ) অসাধারণ ধর্ম “লক্ষণ”, ( এই লক্ষণকখনই এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় উপদেশ ব্যাপার ) । লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পরে যাহার লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই পদার্থের লক্ষণানুসারে ( ঐ পদার্থ ) উপপন্ন হয় কি না, এ জ্ঞাত্ব অর্থাৎ ঐ সংশয় নিবৃত্তির জ্ঞাত্ব প্রমাণসমূহের দ্বারা ( প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা ) অবধারণ অর্থাৎ ঐ লক্ষিত পদার্থের লক্ষণানুসারে বিচারপূর্বক তত্ত্বনির্ণয়—“পরীক্ষা ।”

তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া বিভক্ত পদার্থের অর্থাৎ যে সকল পদার্থের সামান্য না । কখনরূপ সামান্য উদ্দেশের পরে পৃথক সূত্রের দ্বারা তাহাদিগের লক্ষণ না বলিয়াই বিশেষ বিশেষ নামকখনরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাদিগের লক্ষণ (বিশেষ লক্ষণ) বলা হইয়াছে, যেমন “প্রমাণে”র এবং প্রমেরের । এবং উদ্দিষ্ট হইয়া লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ যে সকল পদার্থের সামান্য নামকখনরূপ উদ্দেশ করিয়া পৃথক সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার বিভাগবচন অর্থাৎ বিভাগসূত্র বলা হইয়াছে । যেমন “ছলে”র—“বচনবিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং” ( এই সামান্য লক্ষণ-সূত্র বলিয়া ) “তৎ ত্রিবিধং” ইত্যাদি ( বিভাগসূত্র ) ১২।১০।১১ ।

টীকণী । প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়, এ কথা প্রথম সূত্রে অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু ঐ বোড়শ পদার্থের নামমাত্র জ্ঞানে তাহাদিগের কোন প্রকার তত্ত্বজ্ঞানই হইতে পারে না । তাহাদিগের লক্ষণকখন এবং পরীক্ষা তাহাতে আবশ্যক, সুতরাং সে জ্ঞাত্ব নহবির পরবর্তী সূত্রসমূহ আবশ্যক । তাই ভাষ্যকার নহবি গোতমের পরবর্তী সূত্রসমূহের প্রয়োজন ব্যাখ্যার জন্ত এখানে বলিয়াছেন যে, এই স্মারদর্শনের উপদেশ-ব্যাপার ত্রিবিধ । প্রথমতঃ



পদার্থগুলির উদ্দেশ্য অর্থাৎ নামকখন, তাহার পরে তাহাদিগের লক্ষণকখন, তাহার পরে বিবিধ বিচারপূর্বক পদার্থের পরীক্ষা, সুতরাং মহর্ষি গোতমের পরবর্তী সূত্রসমূহগুলি আবশ্যক হইয়াছে। ‘উদ্দেশ্য’, ‘লক্ষণ’ এবং ‘পরীক্ষা’ এই ত্রিবিধ ব্যাপারেই জ্ঞানশাস্ত্রের সনাপ্তি হইয়াছে এবং এই প্রণালীতে উপদেশই জ্ঞানদর্শনের বৈশিষ্ট্য। পদার্থের বিভাগও উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য।

পদার্থের বিভাগের পূর্বে তাহার সামান্য লক্ষণ বক্তব্য। কারণ, সামান্য লক্ষণ না বলিলে পদার্থের সামান্য জ্ঞান হয় না। সামান্য জ্ঞান না হইলে বিশেষ জ্ঞানের জন্য পদার্থের বিভাগ করা যায় না। কিন্তু সূত্রকার মহর্ষি অনেক পদার্থের সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগ করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর সূত্রকার জ্ঞান ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—“তদ্বোদ্ধিষ্টস্ত” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য এই যে, মহর্ষি উদ্ধিষ্ট পদার্থের বিভাগ ছই প্রকারে করিয়াছেন।—(১) পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়া বিভাগ এবং (২) পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিভাগ। যেমন “প্রমাণ” ও “প্রমোদ”র পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই, বিভাগ করিয়া, ঐ বিভক্ত বিশেষ “প্রমাণ” ও বিশেষ “প্রমোদ”-গুলির লক্ষণ বলিয়াছেন। আবার “ছলে”র পৃথক্ সূত্রের দ্বারা, সামান্য লক্ষণ বলিয়াই বিভাগ করিয়া শেষে ঐ বিভক্ত ত্রিবিধ “ছলের”ই লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যে “প্রমাণ,” “প্রমোদ” ও “ছলে”র কথা প্রদর্শন মাত্র। ঐরূপ অল্প পদার্থেরও বিভাগাদি বুদ্ধিতে হইবে। যথাস্থানে এ সব কথা বুঝা যাইবে। যে সকল পদার্থের পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগসূত্র বলিয়াছেন, তাহাদিগের ঐ বিভাগ-সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, ইহাও পরে বুঝা যাইবে।

ভাষ্য। অর্থোদ্ধিষ্টস্ত বিভাগবচনং।

অনুবাদ। অনন্তর উদ্ধিষ্টের অর্থাৎ প্রথম উদ্ধিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগবচন (বিভাগ-সূত্র)।

সূত্র। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। ৩।

অনুবাদ। (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শব্দ, (এই চারিটি) প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণ চতুর্বিধ।

টিপ্পনী। মহর্ষির প্রথম উদ্ধিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগের জ্ঞান এই তৃতীয় সূত্রের উল্লেখ। পদার্থের বিশেষ নামের কীর্তনকে বিভাগ বলে, সুতরাং বিভাগও উদ্দেশ্য। অতএব পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষারূপ ত্রিবিধ ব্যাপার হইতে বিভাগ কোন অতিরিক্ত ব্যাপার নহে।

মহর্ষি পরে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের লক্ষণ বলিলেও ইহাদিগের অতিরিক্ত কোন প্রমাণ তাহার স্বীকৃত কি না? আপাততঃ এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কারণ, লক্ষণের দ্বারা কোন পদার্থের সংখ্যা নিরূপণের নিঃসংশয় বুঝা যায় না। লক্ষণের প্রয়োজন অন্তরূপ। সুতরাং ঐ সংশয়



নিবৃত্তির বস্ত্র প্রমাণের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য উচিত বলিয়া মহাবি এই সূত্রের দ্বারা তাহা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রমাণ এই চতুর্বিধই। ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার প্রমাণ নাই। ইহা উদ্যোতকরের কথা।

মহাবি পূর্বক সূত্রের দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলেন নাই। এই বিভাগসূত্রে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। প্রমাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝিলেই “প্রমাণ”ের সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়। (প্রমীয়তেহেনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) প্রমাণ শব্দটি প্র পূর্বক না ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনট্ প্রত্যয়সিদ্ধ। মা ধাতুর অর্থ জ্ঞান। প্র শব্দের অর্থ প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট। যথার্থ জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। সেই জ্ঞান অহুতীরূপ হইলে আরও প্রকৃষ্ট হয়। অহুতীজ্ঞানিত স্বতিরূপ জ্ঞান অহুতীর অধীন বলিয়া অহুতী হইতে নিকৃষ্ট। ফলকথা, যথার্থ অহুতীই এখানে প্র পূর্বক না ধাতুর দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাহার পরে করণার্থ অনট্ প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝা যায় করণ। তাহা হইলে প্রমাণ শব্দের দ্বারা বুঝা গেল, যথার্থ অহুতীর করণ। সুতরাং যথার্থ অহুতীর করণই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। সূত্রে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই তাহা সূচিত হইয়াছে। “প্রমাণের” ফল “প্রমাই” যথার্থ অহুতী। সেই “প্রমার” অর্থাৎ যথার্থ অহুতীর কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা করিলে “প্রমাতা” ও “প্রমের” প্রভৃতিও প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সেগুলি প্রমাণ হইতে ভিন্ন। বাহ্য যথার্থ অহুতীর করণ, তাহাই প্রমাণ। ঐ অহুতীর কর্তা ও কর্ম প্রভৃতি প্রমাণ নহে। তবে প্র পূর্বক “মা” ধাতুর উত্তর করণ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে অনট্ প্রত্যয় করিয়া প্রমাতা প্রভৃতিতেও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সেরূপ প্রয়োগ স্থলবিশেষে দেখাও যায়। প্রমাতা ব্যক্তিকেও প্রমাণ পুরুষ বলা হয়। আবার “প্রমা”কেও অর্থাৎ যথার্থ অহুতীকেও প্রমাণ বলা হয়। প্রমা অর্থে “প্রমাণ” শব্দের প্রয়োগ নব্যগণও করিয়াছেন। প্রাচীন মতে প্রমাও প্রমাণ হয়। অর্থাৎ মহাবি-সূত্রোক্ত প্রমাকরণরূপ প্রমাণও হয়। ক্রমে ইহা পরিষ্কৃত হইবে।

এখন বুঝিতে হইবে, “করণ” কাহাকে বলে। নব্যগণ বলিয়াছেন—কারণের মধ্যে যেটি অসাধারণ কারণ, তাহাই “করণ”। ইহার কলিতার্থ বলিয়াছেন যে, যে কারণটি কোন একটি ব্যাপারের দ্বারা কার্যজনক হয় অর্থাৎ তাহার ব্যাপারের অনন্তরই কার্য হয়, তাহাই করণ। যেমন কুঠারের দ্বারা কাঠ ছেদন করিতে কাঠের সহিত কুঠারের যে বিলক্ষণ সংযোগ আবশ্যক হয়, তাহা কুঠারের ব্যাপার। ঐ ব্যাপার দ্বারাই কুঠার কাঠ ছেদনের কারণ। ঐ ব্যাপারটি না হইলে কুঠার কাঠছেদনকার্য জন্মাইতে পারে না, সুতরাং ঐ ছেদনকার্যে কুঠার করণ। ঐ বিলক্ষণ সংযোগ তাহার ব্যাপার। কুঠার ঐ স্থলে করণ বলিয়াই “কুঠারেন হিনভি” অর্থাৎ কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে পদার্থটি করণ কারক হইবে, ঐ পদার্থ তাহার কার্য সম্পাদন করিতে ঐ কার্যের অহুকুল যে ধর্মটিকে অপেক্ষা করে, সেই ধর্মকেই ঐ করণকারক ব্যাপার বলে। ব্যাপারহীন পদার্থ করণ হইতে পারে না এবং ব্যাপারের দ্বারা বাহ্য কার্যজনক, তাহাই করণ; ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। নব্যমতে করণকে কারক



দলা হইলেও করণ পদার্থ পূরোক্ত প্রকারই বলা হইয়াছে। ব্যাপার দ্বারা কার্যজনক পদার্থই করণ। এই মতে যথার্থ অনুভূতির করণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ই হইবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষরূপ ব্যাপার দ্বারা ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের জনক, সুতরাং প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই করণ। প্রত্যক্ষটি যথার্থ হইলে সেখানে ঐ যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জলে চক্ষুসংযোগ হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় ঐ সংযোগ-সম্বন্ধরূপ ব্যাপার দ্বারা জলের প্রত্যক্ষ জন্মায়, সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয় করণ, ঐ সংযোগ তাহার ব্যাপার। ঐ স্থলে চক্ষুই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইরূপ অনুমানাদি স্থলেও পূরোক্ত প্রকারে বাহ্যি বোধানে যথার্থ অনুভূতির করণ হইবে, তাহাই সেখানে প্রমাণ হইবে। নব্য মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান প্রমাণ। পদজ্ঞান শব্দ প্রমাণ। এ বিষয়ে নব্যগণের মধ্যেও মতভেদ আছে। পরে যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের লক্ষণ যথাক্রমে মহর্ষি-হুজ্জৈই সূচিত হইয়াছে। হুজ্জৈ কেবল সূচনাই থাকে। সূচনা থাকে বলিয়াই তাহার নাম সূচ। ব্যাখ্যার দ্বারা, বিচারের দ্বারা সেই সূচিত অর্থ বুঝিতে হয়। ব্যাখ্যার ভেদে, বুঝির ভেদে সূত্রার্থবোধের ভেদ হওয়ার স্বসিদ্ধান্তে মতভেদ হইয়াছে। তাহা তিরকালই হইবে। ভাষ্যকার বাংলায়ন প্রভৃতি প্রাচীনদিগের কথার বুঝা যায়, তাহারা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকেই মুখ্য করণ পদার্থ বলিতেন। সুতরাং ঐ ব্যাপারই তাহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ। এই জন্তই ভাষ্যকার মহর্ষি-হুজ্জৈ “প্রত্যক্ষ” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে অব্যবহিক সমাসের অর্থ প্রকাশ করতঃ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কলকথা, বাহ্য চরম কারণ, অর্থাৎ বাহ্য উপস্থিত হইলে কার্য অবশ্যসম্ভাবী, সেই ব্যাপারই প্রাচীন মতে মুখ্য করণ পদার্থ। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও চরম কারণ ব্যাপারকে করণ বলিতেন। গঙ্গেশের শব্দচিকিৎসারি প্রারম্ভে টীকাকার মধুরানার কথার ইহা পাওয়া যায়। সেখানে টীকাকার মধুরানা বৌদ্ধমতানুসারে কারণের লক্ষণ বলিয়াছেন। সে লক্ষণানুসারে কেবল চরম কারণ ব্যাপারই করণ হয়। বাংলায়ন ও উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ চরম কারণরূপ ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপারের দ্বারা যে পদার্থ কার্যজনক হইয়া থাকে, তাহাকেও করণ বলিতেন। সুতরাং তাহাদিগের মতে প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ও করণ হওয়ার প্রমাণ হইবে। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ না বলিলে “চক্ষুঃ পশ্যতি” অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে চরম কারণ না হওয়ার মুখ্য করণ নহে। মহর্ষি পাণিনি বলিয়াছেন—“সাধকতমং করণং।” কোষকার অমরসিংহও ঐ কথা লইয়া বলিয়াছেন—“করণং সাধকতমং”। এই সাধকতম কথাকে বলে, ইহা লইয়াই করণ বিষয়ে নানা মত হইয়াছে। বাহ্য সাধক অর্থাৎ কারণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধকতম। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। বাহ্য ব্যাপারকে করণ বলেন নাই, চরম কারণরূপ ব্যাপার ব্যাপারণ্য বলিয়া করণ হইতেই পারে না বলিয়াছেন, তাহারা বলিতেন যে, বাহ্য ব্যাপারের পরেই কার্য হয়, ব্যাপার-বিশিষ্ট হইলেই বাহ্য অবশ্য কার্য জন্মায়, তাহাই কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহাই



করণ। প্রাচীনগণ বলিতেন যে, ঐরূপ পদার্থ ঐ ভাবে সাধকতম হইলেও এবং পাণিনি প্রভৃতি প্রয়োগ সাধনের জন্ত ঐ ভাবে ঐরূপ পদার্থকে সাধকতম বলিলেও বস্তুতঃ ঐ স্থলে উহাদিগের ব্যাপারই চরম কারণ। ঐ ব্যাপার না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা কার্য সাধন করিতে পারে না। সংযোগ না হইলে কুঠার ছেদন জন্মাইতে পারে কি? সুতরাং করণ কারক কার্য সাধন করিতে যে ব্যাপারকে নিরত অপেক্ষা করে, সেই চরম কারণ ব্যাপারই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া বস্তুতঃ তাহাই সাধকতম। সুতরাং তাহা করণ। তবে ঐ ব্যাপারের সাহায্যে যে পদার্থ কার্যজনক, তাহাও অল্প কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঐ ভাবে তাহাকেও “সাধকতম” বলা হইয়াছে। যেমন কুঠার কাঠের সহিত বিলক্ষণ সংযোগরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হইলে ছেদনকার্য অবশ্যস্বাবী। এ জন্ত ঐরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট কুঠারকে কারণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া “সাধকতম” বলা যায়। পাণিনি প্রভৃতি সেই ভাবেই কুঠার প্রভৃতি করণ কারককে সাধকতম বলিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে ব্যাপারটি যে পদার্থজন্ত, সেই পদার্থ না থাকিলেও ব্যাপারের দ্বারা তাহাকেও কার্যজনক বলা হইয়াছে। যেমন পূর্কানুভূতি না থাকিলেও তজ্জন্ত সংস্কাররূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা স্মরণ জন্মাইয়া থাকে। বাগাদি ক্রিয়া না থাকিলেও তজ্জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা স্বর্গাদি জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপারেরই প্রাধান্ত স্বীকার্য এবং ব্যাপারই যে চরম কারণ, এ বিষয়েও কোন বিবাদ নাই। সুতরাং ব্যাপারকেই দূষ্য করণ বলিতে হইবে। উদ্যোতকর হ্রাসবাস্তিকের প্রথমে প্রমাতা প্রভৃতিও প্রমিতির কারণ, প্রমাণও প্রমিতির কারণ, তবে আর প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ কি? এতদ্বত্তরে প্রমাণকে “সাধকতম” বলিয়া প্রমাতা প্রভৃতি হইতে তাহার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রমাণ “সাধকতম” কেন, ইহার অনেক হেতু দেখাইয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি করণ-কারকের ব্যাপারকে “সাধকতম” বলিয়া করণ বলিয়াছেন, নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে তিনি প্রমাণ বলিবেন কিরূপে? এ সকল কথা ক্রমে আরও পরিষ্কৃত হইবে। ফলকথা, প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে করণ বলিয়া প্রমাণ বলিলেও ঐ ব্যাপারজনক ইন্দ্রিয়াদিও তাহাদিগের মতে প্রমাণ। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথাতেও ইহা পাওয়া যায়।<sup>১</sup> তাহা হইলে বুঝা গেল যে, চরম কারণই প্রাচীন মতে প্রমাণ করণ এবং যাহা সেই চরম কারণরূপ ব্যাপারের দ্বারা কার্যজনক হয়, তাহা অপ্রধান করণ। নব্যগণ তাহাকেই করণ বলিয়াছেন এবং বৈয়াকরণগণ প্রয়োগ সাধনের জন্ত এই অপ্রধান করণকেই করণ কারক বলিয়াছেন এবং ঐ করণকারক বস্তুর বিবক্ষাধীন, বস্তুর বিবক্ষানুসারে কর্ত্তা ও অবিকরণ কারক প্রভৃতিও করণ কারকরূপে তাহার ব্যবহৃত হয়, এ কথা স্বীকার করিতে বৈয়াকরণগণও বাধ্য হইয়াছেন।

১। “ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণেন প্রমাণ্যং কলে প্রযুক্তেন তদ্ব্যপায়নামুকুলঃ সন্নিবর্তী জ্ঞানং বা চরমভাবী ধর্ম্ম-ভেরোৎপেক্ষাত ইতি ভবতি ব্যাপারঃ স এব বৃত্তিহিত্যাব্যাহতে।”—তাৎপর্য্যটীকা। “ন ত্রাব্যাদীনামেব করণত্বং অপি তু ব্যাপারভাপি, অন্তথা কর্ত্তনামধেহেতুভিব্যবিশেষে ন করণবিশিষ্টঃ আরেত। উক্তিবা ব্রহ্মেত বর্ণশৌর্ধ-মাসাভ্যাং ব্রহ্মেতভ্যাবি। সম্ভবতি তত্কাপি সিদ্ধন্ত বলভাবনামাং নিমিত্তত্বং” (তাৎপর্য্যটীকা। (অনুবাদ-সূত্র)।



ফলতঃ বৈয়াকরণ-সম্বন্ধ করণের মধ্যেও মুখ্য গৌণ ভেদ আছে। প্রাচীন মতে ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণ হইলেও তাহার মুখ্য প্রমাণকে বলিবার জন্তই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। সুত্রে “প্রত্যক্ষ” শব্দটি অব্যয়ীভাব সমান হইলেই তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার বুঝা যায়, তাই বার্তিকের ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অত্ৰ “প্রত্যক্ষ” শব্দটি “প্রাদি সমাস” হইলেও সুত্রে ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দটি অব্যয়ীভাব সমাস। কারণ, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণই “প্রত্যক্ষ” শব্দের প্রতিপাদ্য। অব্যয়ীভাব সমাস ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার দ্বারা বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বুঝিলে ইন্দ্রিয়কেও সেই সঙ্গে বুঝা যাইবে। কারণ, ইন্দ্রিয় ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, সুতরাং ব্যাপার দ্বারা পরস্পরায় ইন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, ইহাও তাহাতে বুঝা যায়। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই সুত্ৰ “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। আবার শব্দ প্রমাণের ব্যাখ্যায় শব্দকেই প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষি-সুত্রে তাহাই আছে ( ৭৮ সুত্র দ্রষ্টব্য )। সেখানেও শব্দ বোধের চরম কারণরূপ করণই প্রাচীন মতে মুখ্য শব্দ প্রমাণ বুঝিতে হইবে। সেই চরম কারণ যাহার ব্যাপার, সেই জায়মান শব্দকেও প্রাচীনগণ শব্দ বোধের করণ বলিয়া স্বীকার করায় তাহাও শব্দপ্রমাণ হইবে। মহর্ষি সেই অভিপ্রায়েই শব্দবিশেষকেই শব্দ-প্রমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার এই সুত্রে প্রত্যক্ষাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণ বলেন নাই। বার্থ্য প্রত্যক্ষের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ বার্থ্য অহুমিত্তির করণই অহুমানপ্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ বার্থ্য উপমিত্তির করণই উপমান-প্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ বার্থ্য শব্দ বোধের করণই শব্দপ্রমাণের লক্ষণ। মহর্ষি-সুত্রে পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে প্রাচীনগণ চরম কারণকেই মুখ্য করণ বলিয়া প্রাচীন মতে প্রত্যক্ষাদি বার্থ্য অহুভূতির চরম কারণই মুখ্য প্রমাণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

এখানে আর একটি কথা বুঝিয়া মনে রাখিতে হইবে। প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে “প্রমা” এবং “প্রমিতি” বলে। প্রাচীন মতে এই “প্রমিতি”ও প্রমাণ হয়। তাহার ফলকে অর্থাৎ ঐ “প্রমিতি”রূপ প্রমাণজন্ত যে জ্ঞানরূপ ফল হয়, তাহাকে প্রাচীনগণ বলিতেন— “হানাদিবুদ্ধি”। “হানাদিবুদ্ধি” বলিতে—“হানবুদ্ধি”, “উপাদানবুদ্ধি” এবং “উপেক্ষাবুদ্ধি”। “হা” দাত্তর উত্তর করণ অর্থে “অনট্” প্রত্যয় যোগে এই “হান” শব্দটি সিদ্ধ। “হা” দাত্তর অর্থ ত্যাগ। “হীরতেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বাহার দ্বারা ত্যাগ করা হয়, তাহাই এখানে “হান” শব্দের অর্থ। “হান” এমন যে “বুদ্ধি”, তাহাই—“হানবুদ্ধি”। অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা কেহও বোধ করিয়া ত্যাগ করা হয়, তাহাই “হান বুদ্ধি”। এইরূপ যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ হয় এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ঐ স্থলে বর্ধাক্রমে “উপাদান” ও “উপেক্ষা” শব্দটি সিদ্ধ। এখন ইহার উদাহরণ বুঝিতে পারিলেই এ সকল কথা বুঝা যাইবে। জীবের বস্ত্রবোধ হইলে ঐ বস্ত্র গ্রহণ করে, অথবা ত্যাগ করে, অথবা উপেক্ষা



করে। পরিজ্ঞাত বস্তু উপকারী বলিয়া মনে হইলে তাহা গ্রহণ করে, অপকারী বলিয়া বুঝিলে ত্যাগ করে; উপকারীও নহে, অপকারীও নহে, এমন বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। এই পর্য্যন্তই জীবের বস্তুবোধের কার্য্য। এই যে গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষা করে, তাহার পূর্বে জীবের সেই বস্তুতে গ্রাহ্যতা প্রভৃতির বোধ জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। গ্রাহ্য বলিয়া না বুঝিলে জীব কখনই তাহা গ্রহণ করে না। কিন্তু ঐ গ্রাহ্যতা বোধ কিরূপে হইবে? আমি জল দেখিয়া যখন গ্রহণ করি, তখন তৎপূর্বে “এই জল গ্রাহ্য” এইরূপ একটা বোধ আমার অবশ্যই হয় এবং ত্যাগ বা উপেক্ষা করিলেও তৎপূর্বে “এই জল ত্যাজ্য” অথবা “এই জল উপেক্ষ্য” এইরূপ বোধ অবশ্যই জন্মে। কিন্তু ঐ বোধকে সেখানে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। কারণ, সেই জলের গ্রহণ প্রভৃতি তখন হয় নাই। সেই গ্রহণাদি সেখানে ভাবী। ভাবী বিষয়ে লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান বিষয়েই হয়। সুতরাং “এই জল গ্রাহ্য”, এইরূপ বোধ বাহ্য জন্মে, তাহা গ্রহণরূপ ভাবী পদার্থবিষয়ক হওয়ার উহা প্রত্যক্ষ নহে, উহা অহুমিতি। ঐ অহুমিতিরূপ বোধবশতই সেখানে জল গ্রহণ করে। এইরূপ “এই জল হেয়,” অথবা “উপেক্ষ্য,” এইরূপ বোধও অহুমিতি, তাহার ফলে জলের ত্যাগ বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। এখন যদি “এই জল গ্রাহ্য” ইত্যাদি প্রকার বোধকে অহুমিতি বলিতে হইল, তাহা হইলে তৎপূর্বে তাহার কারণও দেখাইতে হইবে। তৎপূর্বে এমন কোন বুদ্ধি জন্মে, বাহার ফলে “এই জল গ্রাহ্য” ইত্যাদি প্রকার অহুমিতি হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীনগণ তাহাকেই বলিয়াছেন “হানাদিবুদ্ধি”। সে কিরূপ বুদ্ধি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বোধ হইলে সেখানে-ইন্দ্রিয়-সংস্করের পরেই যে বোধটি জন্মে, তাহাকে “নির্দিকল্পক” প্রত্যক্ষ বলে। যেমন জলে চক্ষুঃ-সংযোগের পরেই জল ও জলজ-বিষয়ে একটা “আলোচন” হয়। “জলজবিশিষ্ট জল” এইরূপ বোধ না হইয়া কেবল পৃথকভাবে জল ও জলজবিষয়ে যে একটি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই প্রাচীনগণ “আলোচন” জ্ঞান এবং “নির্দিকল্পক” জ্ঞান বলিয়াছেন। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষও বলা হয়। ঐ “নির্দিকল্পক” বা অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষের পরেই “জলজবিশিষ্ট জল” এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের নাম “সবিকল্পক প্রত্যক্ষ”। পদার্থকে বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিলে সে জ্ঞানে “বিকল্প” অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকিল, এ জ্ঞান সেই জ্ঞানকে বলে “সবিকল্পক”। আর যে জ্ঞানে পদার্থবিষয়ের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বোধ হয় না, তাহা নির্দিকল্পক। পূর্বোক্ত প্রকারে যখন “জলজবিশিষ্ট জল” এইরূপ “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন পূর্বাভূত জল বিষয়ে যে সংস্কার থাকে, তাহার উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে একটি বিশিষ্ট স্মৃতি জন্মে। জলদর্শী পূর্বে জল দেখিয়াছিল, সেই জল পান করিয়া তাহার পিপাসা-নিবৃত্তিও হইয়াছিল। সুতরাং সেই জল পিপাসানিবর্তক, এ বিষয়ে তাহার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। এবং “তজ্জাতীয় জল মাত্রই পিপাসানিবর্তক,” এইরূপ একটা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ার তজ্জন্য ঐরূপ সংস্কারও তাহার রহিয়াছে। পুনরায় তজ্জাতীয় জল দেখিলে পরেই তাহার ঐ সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে



পূর্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্বরূপ হয়, তাহার পরেই “এই জল তজ্জাতীয়,” এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মে। উহা দেখানে প্রত্যক্ষাত্মক এবং “পরামর্শ” নামক অহুমানপ্রমাণ এবং ইহাই ঐ স্থলে “উপাদানবুদ্ধি”। কারণ, ঐ বুদ্ধির দ্বারা পরক্ষণেই “এই জল গ্রাহ” এইরূপ অহুমিতি জন্মে, তাহার ফলে সেই জলের উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে। এইরূপ জনদর্শী ব্যক্তি যদি তাহার পরিদৃষ্ট জলে তাহার পূর্বদৃষ্ট এবং পরিত্যক্ত জলের সাদৃশ্য দেখিয়া “এই জল তজ্জাতীয়,” এইরূপ বোধ করে, অথবা পূর্বদৃষ্ট উপেক্ষিত জলের সাদৃশ্য দেখিয়া “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ বোধ করে, তাহা হইলে ঐ দুইটি বুদ্ধি তাহার যথাক্রমে “হানবুদ্ধি” এবং “উপেক্ষাবুদ্ধি” হইবে। উহার দ্বারা “এই জল হের” এবং “এই জল উপেক্ষা,” এইরূপ অহুমান করিয়া সেই জলের তাগ বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত স্থলে পূর্বোক্ত প্রকার “হানাদিবুদ্ধি” প্রত্যক্ষ-প্রমিতি। এই পর্য্যন্তই ঐ স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জলের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধরূপ সন্নিকর্ষজ্ঞতা ঐ পর্য্যন্ত বুদ্ধি হয়। সুতরাং উহাতেও ঐ সন্নিকর্ষ কারণ। তবে ঐ “হানাদিবুদ্ধি”র পূর্বে যে “নির্দিকল্পক” বা “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ-প্রমিতি জন্মে, তাহা ঐ হানাদি বুদ্ধির কারণ হওয়ার, ঐ হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে পূর্বজাত ঐ প্রত্যক্ষ-প্রমিতিকেও প্রাচীনগণ প্রমাণ বলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনগণ চরম কারণ অর্থাৎ যে কারণটি উপস্থিত হইলে কার্য অবশ্যস্বাভাবী, তাহাকেই মুখ্য কারণ বলিতেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমিতি হানাদি বুদ্ধির প্রতি চরম কারণ হওয়ার তাহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ হয়, এ জ্ঞতা তাহারা প্রমিতিবিশেষকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত হানাদি বুদ্ধির প্রতি ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ চরম কারণ না হওয়ার মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্য প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া এবং সেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজ্ঞতা প্রমিতিকেও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বলিয়া হানাদি বুদ্ধির প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু হানাদি বুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না। কারণ, তাহার ফল অহুমিতি।

পূর্বোক্ত স্থলে জলের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ-সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের প্রথম ব্যাপার। তাহার পরেই জল ও জলত্ব বিষয়ে “আলোচন” বা নির্দিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে এবং তাহার পরেই “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ জন্মে। একই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজ্ঞতা যথাক্রমে পূর্বোক্ত বিবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে বলিয়া প্রাচীনগণ ঐ বিবিধ প্রত্যক্ষকেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের ফল বলিয়াছেন এবং ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকেই তাহার প্রতি মুখ্য কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন এবং ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের কারণ ইন্দ্রিয়ও তাহাতে কারণ বলিয়া তাহাকেও ঐ স্থলে প্রমাণ বলিয়াছেন। অতীত অনেক পদার্থ ঐ বিবিধ প্রত্যক্ষের কারণ হইলেও কারণ না হওয়ার সেগুলি ঐ স্থলে প্রমাণ নহে। পূর্বোক্ত বিবিধ প্রত্যক্ষের পরে যে পূর্বোক্ত প্রকার “হানাদিবুদ্ধি” জন্মে, প্রাচীনগণ তাহাকে পূর্বজাত জ্ঞানেরই ফল বলিয়া ঐ জ্ঞানকেই তাহার প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। ঐ জ্ঞানের সাধন পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ এবং ইন্দ্রিয়ও ঐ



হানাদি বুদ্ধির প্রতি পরস্পরায় করণ হওয়ায় তাহাকেও উহার প্রতি প্রমাণ বলিয়াছেন। অজ্ঞাত কারণগুলি করণ না হওয়ায় তাহা এই স্থলে প্রমাণ হইবে না। মুখ্য ও গৌণ করণের লক্ষণ পূর্বেই বলিয়াছি। যাহারা ব্যাপারের দ্বারা কার্যজনক না হইলে করণ বলেন না, অর্থাৎ নির্ক্যাপার চরম কারণকে করণই বলেন না, তাহারা নির্বিকল্পক প্রত্যকে ইন্দ্রিয়কে এবং সবিকল্পক প্রত্যকে ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তকে এবং হানাদি বুদ্ধিতে নির্বিকল্পক প্রত্যকে করণ বলিতে পারেন। তাহা হইলে প্রাচীনদিগের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্ত এবং তজ্জনা প্রত্যক জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিতে হয়; কিন্তু নবগণ তাহা বলেন নাই, কেহ বলিলেও ব্যাখ্যাধারণ তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই; প্রাচীনগণ উহা কেন বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ প্রচুর। স্বরূপ ভেদে ন্যায়মঞ্জরীতে বহু মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমিতির কৰ্ত্তা, কৰ্ম ও সাধারণ কারণ ভিন্ন যে সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমূহ, তাহাই প্রমাণ। ফলকথা, তিনিও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্ত এবং তজ্জনা জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। বাহ্য চরম কারণ অর্থাৎ বাহ্য উপস্থিত হইলে কার্য না হওয়া আর দৃষ্টিবে না, এমন পদার্থই মুখ্য করণ; এই মত জরসভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতেও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বহু মতভেদ ও প্রতিবাদ থাকিলেও প্রাচীন ভাষ্যকার বাস্তবায়ন ও উদ্যোক্তকরের মতে প্রমাণের ফল “প্রমিতি” ও পূর্বোক্ত “হানাদি বুদ্ধি”র প্রতি প্রমাণ। অহমানাদি স্থলেও ঐরূপ হইবে অর্থাৎ অহমিতিক্রম প্রমিতি ও হানাদি বুদ্ধিক্রম অহমিতির প্রতি অহমান প্রমাণ হইবে। এইরূপ অজ্ঞাত ও বুদ্ধিতে হইবে। এই সকল প্রাচীন মতের সকল কথা বুদ্ধিতে হইলে অহমক্লিংহু হুবা “তাপর্ঘ্যটিকা” প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন, কিন্তু বড় সাবধান হইয়া বুদ্ধিতে হইবে।

ভাষ্য। অক্ষশ্রাক্ষ প্রতিবিষয়ঃ বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষঃ। বৃত্তিস্ত সন্নি-  
কৰ্ষো জ্ঞানং বা। যদা সন্নিবর্তিতদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদা জ্ঞানং তদা  
হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং।

অনুবাদ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি (ব্যাপার) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। “বৃত্তি” কিন্তু সন্নিবর্ত (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ), অথবা জ্ঞান (নির্বিকল্পক বা সবিকল্পক জ্ঞান)। যে সময়ে সন্নিবর্ত (ব্যাপার হইবে), তখন জ্ঞানরূপ প্রমিতি (প্রমাণের) ফল হইবে। যে সময়ে জ্ঞান (ব্যাপার হইবে), তখন হানবুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে), উপাদানবুদ্ধি (যে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করে) এবং উপেক্ষা-বুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা করে), (প্রমাণের) ফল হইবে।

টীপনী। ভাষ্যকার এই স্বত্রভাষ্যে স্বত্রোক্ত প্রত্যক প্রভৃতি প্রমাণবোধক চারিটি সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদিগের নিরূপণ লক্ষণ মহাবিশ্বত্রে পরে ব্যক্ত হইবে।



“প্রতিগতনকং” এইরূপ বিগ্রহে প্রাদি সমাস করিলে প্রতিগত অর্থাৎ বিষয়-সমিকৃষ্ট “অক” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা পরিষ্কৃত হয় না এবং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানরূপ বৃত্তিও যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, তাহা বুঝা যায় না। “অক্ষমকং প্রতিবর্ততে” এইরূপ বিগ্রহে অব্যয়ীভাব সমাসদ্বিত “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণত্ব বোধ না হইলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার “অকতাক্ত্য প্রতিবিবরণং বৃত্তিঃ”—এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত অব্যয়ীভাব সমাসের বিগ্রহ-বাক্যের সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্য পূর্বোক্ত বিগ্রহবাক্যের ফলিতার্থকখন নাত্র। উহা অব্যয়ীভাব সমাসের বিগ্রহবাক্য নহে। তাহা হইলে “অক্ষমকং অক্ষমকং” এই স্থলে বস্ত্রী বিভক্তি প্রযুক্ত হইত না।

অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বোক্ত বিগ্রহ-বাক্যের দ্বারা যে “বৃত্তি” অর্থ প্রতীত হইয়াছে, ভাষ্যকার এখানে তাহাকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ, প্রমাণ-বোধক “প্রত্যক্ষ” শব্দের উক্ত ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহাই বুঝা গিয়াছে। “বৃত্তি” বলিতে ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সমিকর্ষ যেমন ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত প্রত্যক্ষের জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, তরূপ ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত চরম ফল হানাদি-বুদ্ধির জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইবে। প্রাচীন ত্রায়াচার্যগণের মতে চরম কারণরূপ ব্যাপারই মুখ্য কারণ। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষ ও তজ্জ্ঞাত জ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রমিতির মুখ্য কারণ বলিয়া মুখ্য প্রমাণ বলা যায়। পরন প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে তাহাই বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষরূপ প্রমাণের ফল নির্লিকল্পক বা সবিকল্পক জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল হানাদি-বুদ্ধি। ত্রায়াচার্য-কারও এখানে এইরূপ নিরুক্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—“উভয়ং পরিচ্ছেদকং সমিকর্ষো জ্ঞানকঃ।” বাহারা কেবল ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর তাহানিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উদাহরণ বুঝিয়া কথাগুলি বুঝিতে হইবে। আমি আমার ঘনঃপূত পানীয় জলের অন্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে আমার জলে চক্ষুঃসংযোগ হইল, এইটাই আমার বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সমিকর্ষ। তাহার পরকণ্ঠেই আমার জল ও জলত্ব বিষয়ে পৃথকভাবে একটি অবিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল। এই জ্ঞানটির নাম “নির্লিকল্পক প্রত্যক্ষ।” তাহার পরকণ্ঠেই “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল; এই জ্ঞানটির নাম “সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।” পূর্বে জলত্ব প্রত্যক্ষ ব্যতীত “জলত্ববিশিষ্ট” এইরূপ প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না,— কারণ, বিশিষ্ট বুদ্ধি মাত্রই পূর্বে বিশেষণ জ্ঞান থাকি চাই। যে সর্প দেখে নাই, তাহার “এই স্থান সর্পবিশিষ্ট”, এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং “জলত্ববিশিষ্ট” এইরূপ প্রত্যক্ষের পূর্বে পৃথকভাবে একটি জলত্ব প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ প্রত্যক্ষের নাম নির্লিকল্পক প্রত্যক্ষ, উহা ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষজ্ঞাত এবং উহার পরজাত “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষটিও পূর্বজাত সেই ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষজ্ঞাত। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ দুই প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষ প্রমাণ। ঐ প্রত্যক্ষের পরে তজ্জাতীয় অজ্ঞ জলের পিপাসা-নিবর্তকত্ব বিষয়ে আমার



যে সংস্কার আছে, ঐ সংস্কার উদ্ভূত হইয়া আমার পূর্বাহুত জলের পিপাসা-নিবর্তকত্বের স্বরণ জন্মাইল, শেষে “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মাইল; ইহারই নাম “উপাদান-বুদ্ধি।” ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহা অনুমিতির কারণ জ্ঞান, এই জ্ঞান জন্ম শেষে আমার “ইহা গ্রাহ” এইরূপ অনুমিতি জন্মিল, আমি তখন পানের জন্য ঐ জল গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যে উপাদানবিষয়ক বুদ্ধিকেই উপাদান-বুদ্ধি বলা হয় নাই। “উপাদায়তেহেনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যে বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করিয়া উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে, তাহাই উপাদান-বুদ্ধি এবং ঐরূপে যে বুদ্ধির দ্বারা তাজ্য বলিয়া অনুমান করিয়া ত্যাগ করে, তাহাই “হানবুদ্ধি” এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা বলিয়া অনুমান করিয়া উপেক্ষা করে, তাহাই “উপেক্ষা-বুদ্ধি।” প্রত্যক্ষ-স্থলে পূর্বোক্ত এই তিনটি বুদ্ধি প্রত্যক্ষাত্মক। ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষের পরে যে নির্ণয়করক বা সবিকরক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইয়া পূর্বোক্ত ঐ “হানাদি বুদ্ধি”রূপ ফল জন্মায়। এ জন্ম ঐ হানাদি বুদ্ধির পক্ষে পূর্বজাত সেই জ্ঞানই প্রমাণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সমিকর্ষের দ্বারা তজ্জন্ম যে প্রত্যক্ষ প্রমিতি জন্মে, তাহাকেও পরতাবী হানাদিবুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতির পক্ষে প্রমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্য। মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থশ্চ পশ্চাশ্চানমনুমানং। উপ-  
মানং সামীপ্যজ্ঞানং যথা—গৌরেবং গবয় ইতি। সামীপ্যন্ত সামান্য-  
যোগঃ। শব্দঃ শব্দ্যতেহেনেনার্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে। উপলব্ধি-  
সাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্যানিব্বচনসামর্থ্যাদুবোদ্ধব্যম্। প্রমীয়তে-  
হেনেনেতি করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ। তদ্বিশেষসমাখ্যায়া অপি  
তথৈব ব্যাখ্যানম্।

অনুবাদ। মিত অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞাত হেতুর দ্বারা লিঙ্গী অর্থের অর্থাৎ যে পদার্থে হেতু আছে, সেই অর্থের (সাধ্যের) পশ্চাৎ জ্ঞান (বাহার দ্বারা হয়, তাহা) অনুমান। “উপমান” বলিতে যেমন গো, এইরূপ গবয়, এইরূপে সামীপ্য জ্ঞান। সামীপ্য কিন্তু সাদৃশ্য-সম্বন্ধ। ইহার দ্বারা পদার্থ শব্দিত হয়, অভিহিত হয়, জ্ঞাপিত হয়, এ জন্ম “শব্দ” (প্রমাণ)। উপলব্ধির সাধনগুলি প্রমাণ, ইহা সমাখ্যার অর্থাৎ “প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নির্বচন-সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিবশতঃ বুঝা যায়। কারণ, “প্রমীয়তেহেনেন” এই ব্যুৎপত্তিতে (অর্থাৎ ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত হয়, এই অর্থে) প্রমাণ শব্দটি করণার্থবোধক; (সুতরাং) সেই প্রমাণের বিশেষ সমাখ্যারও (“প্রত্যক্ষ,” “অনুমান,” “উপমান,” “শব্দ,” এই চারিটি বিশেষ সংজ্ঞারও) সেইরূপই (যেভাবে করণার্থ বুঝা যায়) ব্যাখ্যা (বুঝিতে হইবে)।



টিগনী। অল্প শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, মান শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাহা হইলে অনুমান শব্দের দ্বারা বুঝা যায় পশ্চাৎ জ্ঞান। অনুমানের হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। লিঙ্গ-জ্ঞানের পরে অনুমান হয়, তাই উহার নাম “অনুমান”। সন্ধি বা বিপরীতভাবে জ্ঞাত লিঙ্গের দ্বারা জ্ঞান, প্রকৃত অনুমান নহে; তাই বলিয়াছেন যে, লিঙ্গটি “মিত” অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞাত হওয়া চাই। শব্দ বোধ যথার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা হয়—কিন্তু সেখানে শব্দ লিঙ্গ হয় না, এ জন্ত তাহা অনুমান হইতে পারিবে না। যে ধর্ম্মীতে অনুমান হইবে, সেখানে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু পদার্থ থাকিবে চাই, এ জন্ত বলিয়াছেন—“লিঙ্গী অর্থে পশ্চাৎ জ্ঞান”। ধর্ম্মী লিঙ্গবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে “লিঙ্গী” বলা যায়। কেবল ধর্ম্মীর অনুমান হয় না; কারণ, তাহা সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু একটি অসিদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপেই ধর্ম্মীর অনুমান হয়, এ জন্ত বলিয়াছেন—“লিঙ্গী অর্থে অনুমান”। অর্থ বলিতে এখানে সাধ্য। কেবল ধর্ম্মী সাধ্য নহে। অনুমের ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে ধর্ম্মী সাধ্য হইতে পারে। ভাব্যাক্ত অনুমান ব্যাখ্যা যদিও অনুমিতিক্রম ফলের ব্যাখ্যা, তাহা হইলেও ( “বতঃ” এই কথা অধ্যাহার করিয়া ) বাহার দ্বারা ঐ অনুমিতি জন্মে, তাহাই অনুমান প্রমাণ—এই পর্য্যন্তই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, যখন অনুমিতিক্রম ফলও হানাদি বুদ্ধির পক্ষে প্রমাণ হইবে, তখন “বতঃ” এই কথা অধ্যাহার না করিলেও ভাষ্যার্থের অসংগতি নাই।

“উপ” শব্দের অর্থ সামীপ্য, “মান” শব্দের অর্থ জ্ঞান। সামীপ্য এখানে সাদৃশ্য, ইহা ভাষ্যকারই বলিয়াছেন। স্তত্রাং উপমান শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সাদৃশ্য-জ্ঞান। গবয়-নামক গো-সদৃশ একপ্রকার পশু আছে। “বথা গোরেবং গবয়ঃ” এই কথা যিনি শুনিয়াছেন, তিনি কখনও গো-সদৃশ ঐ পশুকে দেখিলে, গবয়ে গো-সদৃশ দেখিয়া, “গবয় গবয় শব্দের বাচ্য” এইরূপে গবয়মাত্র গবয়-শব্দবাচ্য বুঝিয়া থাকেন। ইহা ঐ সাদৃশ্য-জ্ঞানরূপ উপমান-প্রমাণের ফল। “শব্দ্যতেহেনার্থঃ”—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে “শব্দ” শব্দটি সিদ্ধ। স্তত্রাং জ্ঞানমান পদ অথবা পদজ্ঞানই শব্দপ্রমাণ বলিয়া উহা দ্বারা বুঝা যাইবে। ভাষ্যে “শব্দ্যতে” ইহার বিবরণ অভিধায়তে—তাহার বিবরণ জ্ঞাপ্যতে। লক্ষণাজ্ঞান পূর্বক পদার্থের উপস্থিতি প্রযুক্তও শব্দ বোধ হয়; সেখানে পদার্থ অভিবা-বোধিত না হইলেও জ্ঞাপিত হয়। তাই “জ্ঞাপ্যতে” বলিয়া উহারই পুনরুচ্চারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বাহার দ্বারা পদার্থ জ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ পদার্থবিষয়ক শব্দ বোধ হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ।

“প্রমাণ” বলিতে যথার্থ অনুভূতির সাধন। ইহা প্রমাণ শব্দের ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিতেই বুঝা যায়। প্রমাণ-সামাজ্যবোধক ‘প্রমাণ’ শব্দটি যখন করণার্থবোধক, তখন তাহার বিশেষ নামগুলিও করণার্থবোধক, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। স্তত্রাং সেগুলিরও সেইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। প্রমাণবোধক প্রত্যয়াদি শব্দের ব্যুৎপত্তিমাত্রই এই ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি প্রত্যয়াদি প্রমাণের লক্ষণ নহে। স্তত্রাং প্রমাণভাসে অতিব্যাপ্তি-বোধের আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ প্রমাণভাসে নাই।



ভাষ্য । কিং পুনঃ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংগ্ৰহস্তেহথ প্রতিপ্রমেয়ং ব্যবহীতম্ভ ইতি । উভয়থা দর্শনং । অন্ত্যাত্মোক্ত্যাপোপদেশাৎ প্রতীয়তে । তত্রানুমানং—“ইচ্ছা-দেব প্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গ”মিতি । প্রত্যক্ষং যুজ্ঞানস্ত যোগসমাধিজমাজ্ঞমনসোঃ সংযোগ-বিশেষাদাত্মা প্রত্যক্ষ ইতি । অগ্নিরাপোপদেশাৎ প্রতীয়তে অত্রাগ্নিরিতি । প্রত্যাসীদতা ধূমদর্শনে-  
নানুমীয়তে । প্রত্যাসম্মেন চ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে ।

অনুবাদ । প্রমাণগুলি কি প্রমেয়কে অভিসংগ্ৰহ করে ? অথবা প্রতিপ্রমেয়ে ব্যবহৃত ? ( অর্থাৎ এক একটি প্রমেয়ে কি বহু প্রমাণের ব্যাপার হয় ? অথবা কোন একটি বিশেষ প্রমাণেরই ব্যাপার হয় ? ) । (উত্তর)—দুই প্রকারই দেখা যায় । ( এক প্রমেয়ে বহু প্রমাণের ব্যাপাররূপ প্রমাণসংগ্ৰহের উদাহরণ দেখাইতেছেন ) আত্মা আছে, ইহা শব্দপ্রমাণ হইতে বুঝা যায় । তদ্বিষয়ে ( আত্মবিষয়ে ) অনুমান উক্ত হইয়াছে, “ইচ্ছাদেব প্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গ” এই সূত্র ( ১অং, ১আং, ১০নূত্র ) । তদ্বিষয়ে যুজ্ঞান ব্যক্তির ( যোগিবিশেষের ) যোগসমাধিজাত প্রত্যক্ষ আছে । আত্মা এবং মনের সংযোগ-বিশেষ প্রযুক্ত বথার্থরূপে আত্মা প্রত্যক্ষ হয় । ( লৌকিক বিষয়েও প্রমাণ-সংগ্ৰহের উদাহরণ দেখাইতেছেন ) “এখানে অগ্নি আছে,” এইরূপ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নি প্রত্যত হয় । নিকটবর্তী হইতে থাকিলে তৎকর্তৃক ধূম দর্শনের দ্বারা ( ঐ অগ্নি ) অনুমিত হয় এবং নিকটবর্তী হইলে তৎকর্তৃক ( ঐ অগ্নি ) প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ হয় ।

টিপ্পনী । প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ নাই ; সুতরাং প্রমাণের চতুর্বিধ বিভাগ উপপন্ন হয় না, এ কথা যাহারা বলিবেন, ভাষ্যকার তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রমাণ-সংগ্ৰহ এবং প্রমাণ-ব্যবহার কথা বলিতেছেন । যে বিষয়ে বহু প্রমাণের ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে প্রমাতা তাহার বথার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃ বহু প্রমাণের দ্বারাই তাহাকে বথার্থরূপে বুঝিয়া থাকেন ; সুতরাং এক বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকররূপ প্রমাণ-সংগ্ৰহ আছে এবং উহা ব্যর্থ নহে । বথার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃই সম্ভবত্বলে বহু প্রমাণকে আশ্রয় করা হয় । এই প্রমাণ-সংগ্ৰহের উদাহরণ অলৌকিক আত্মবিষয়ে এবং লৌকিক অগ্নি-বিষয়ে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন । উহা প্রদর্শন মাত্র । ঐরূপ বহু স্থলেই প্রমাণ-সংগ্ৰহ আছে । যেখানে একমাত্র প্রমাণের ব্যাপার অর্থাৎ যে পদার্থ কোন একটি প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণাত্মকতার বিষয়ই নহে, অথবা যেখানে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা বথার্থ জ্ঞান হইলে তাহাতে প্রমাতার আর জিজ্ঞাসা থাকে না, সেখানে প্রমাণের ব্যবস্থা । এই প্রমাণ-ব্যবহার উদাহরণ ভাষ্যকার (অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে) ইহার পরেই দেখাইতেছেন । সেগুলিও প্রদর্শন মাত্র । সেইরূপ বহু স্থলেই প্রমাণের ব্যবস্থা আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে ।



ভাষ্য। ব্যবস্থা পুনঃ “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ” ইতি।  
লৌকিকশ্চ স্বর্গে ন লিঙ্গদর্শনং ন প্রত্যক্ষম্। স্তনয়িত্বশব্দে শ্রয়মাণে  
শব্দহেতোরনুমানম্। তত্র ন প্রত্যক্ষং নাগমঃ। পার্শ্বো প্রত্যক্ষত  
উপলভ্যমানে নানুমানং নাগম ইতি। সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা।  
জিজ্ঞাসিতমর্থমাণোপদেশাৎ প্রতিপদ্যমানো লিঙ্গদর্শনেনাপি বুভুৎসতে,  
লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ্চ প্রত্যক্ষতো দৃঢ়কতে, প্রত্যক্ষত উপলব্ধেক্ষেপে জিজ্ঞাসা  
নিবর্ততে। পূর্বোক্তমুদাহরণং অগ্নিরিতি। প্রমাতুঃ প্রমাতব্যেহর্থে  
প্রমাণানাং সংকরোহভিসংগ্ৰবঃ, অসংকরো ব্যবস্থেতি। ইতি ত্রিনূত্নী-  
ভাষ্যম্। ৩।

অনুবাদ। ব্যবস্থা (অর্থাৎ প্রমাণের অসংকর), কিন্তু “স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র  
হোম করিবে” এই স্থলে। লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গবিষয়ে হেতুদর্শন অর্থাৎ অনুমান  
নাই, প্রত্যক্ষও নাই; (অর্থাৎ যিনি স্বর্গপদার্থ প্রত্যক্ষ করেন নাই, অনুমান-প্রমাণের  
দ্বারাও বুঝিতে পারেন নাই, সেই লৌকিক ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরূপ প্রমেয়ে একমাত্র  
শ্রুতি-প্রমাণই ব্যবহৃত। “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ” এই শ্রুতি-প্রমাণের  
দ্বারাই তাঁহার স্বর্গবিষয়ক প্রমিতি হইয়া থাকে)। (লৌকিক বিষয়েও প্রমাণের  
ব্যবস্থা দেখাইতেছেন) মেঘের শব্দ শ্রয়মাণ হইলে (সেই শব্দের দ্বারা) শব্দহেতুর  
(মেঘের) অনুমান হয়। তদ্বিষয়ে (তখন) প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দ-প্রমাণ নাই।  
প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলভ্যমান (দৃশ্যমান) হস্তে (তখন) অনুমান-প্রমাণ নাই, আগম-  
প্রমাণও নাই। সেই এই প্রমিতি (প্রমাণ-সংগ্ৰব স্থলে প্রমাণের ফল যথার্থ জ্ঞান)  
প্রত্যক্ষপরা অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রধান। (কেন? তাহা বুঝাইতেছেন) জিজ্ঞাসিত  
পদার্থকে শব্দ-প্রমাণ হইতে বোধ করতঃ লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাও বুঝিতে  
ইচ্ছা করে। লিঙ্গদর্শনের দ্বারা অনুমিত পদার্থকে আবার প্রত্যক্ষের দ্বারা দেখিতে  
ইচ্ছা করে। প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ পদার্থে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। (এ বিষয়ে)  
অগ্নি উদাহরণ পূর্বের উক্ত হইয়াছে। প্রমাতার প্রমেয় বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকরকে  
“অভিসংগ্ৰব” বলে, অসংকরকে “ব্যবস্থা” বলে। তিন সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত হইল। ৩।

টীকণী। প্রমাণ-সংগ্ৰবস্থলে যে সমস্ত প্রমিতি হয়, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ,  
প্রত্যক্ষ হইলে আর তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না। “অগ্নিরোপদেশাৎ প্রতীয়তে”, ইত্যাদি  
ভাষ্যের দ্বারা ভাষ্যকার অগ্নিকে ইহার লৌকিক উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।



অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নিকে জানিলেও অনুমানের দ্বারা আবার জানিতে ইচ্ছা হয়। ঐ ইচ্ছাবশতঃ কিছু নিকটে যাইয়া ধূম দর্শনের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করে। তখন তাহার দ্বারা পূর্বজ্ঞান-জন্ত সংস্কার দৃঢ় হয়। কিন্তু তখনও অগ্নিকে প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা থাকে। তাই একেবারে নিকটবর্তী হইয়া ঐ অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করে। তখন আর ঐ অগ্নি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না; কারণ, প্রত্যক্ষের বড় আর কোন প্রশ্ন নাই। তাই ঐ স্থানের প্রমিতির মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ। প্রশ্নানের ব্যবস্থাহলে এই প্রাধিক্ত-বিচার নাই। কারণ, সেখানে একমাত্র প্রশ্নানের দ্বারা একমাত্র প্রমিতিই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বাহ্যকে প্রশ্নানের “অভিলম্ব” বলিয়াছেন, তাহা “প্রমাণসংলম্ব” শব্দের দ্বারাও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম তিন সূত্রের দ্বারা ত্য়ায়দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য এবং তাহার ব্যবস্থাপক প্রশ্নান সূচিত হইয়াছে। তাই বেদান্ত-দর্শনের চতুঃসূত্রীয় ত্য়ায় ত্য়ায়দর্শনের “ত্রিসূত্রী” মহর্ষি গোতমের একটা বিশেষ প্রবন্ধ; ইহা সূচনা করিবার জন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“ইতি ত্রিসূত্রীভাষ্যম্”। ঐ স্থলে “ইতি” শব্দের অর্থ সমাপ্তি। ত্য়ায়বার্ত্তিককার এবং তাৎপর্য্যটীকাকার এবং তাৎপর্য্য-পরিণ্ডিককারও এই ত্রিসূত্রী ব্যাখ্যার পরে স্ব স্ব প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন। ৩।

ভাষ্য। অথ বিভক্তানাং লক্ষণবচনম্।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রশ্নানের বিভাগের পরে বিভক্ত প্রশ্নান-চতুষ্টয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। (তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রশ্নানই সর্বপ্রথম উদ্দিষ্ট হওয়ায় তদনুসারে সর্বপ্রথমে প্রত্যক্ষ প্রশ্নানেরই লক্ষণ বলিয়াছেন)।

সূত্র। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যাপদেশ্য-  
মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। ৪।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গোছ পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং “ব্যাপদেশ্য” অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের সংজ্ঞাবিষয়ক নহে বলিয়া শব্দ নহে এবং “ব্যভিচারী” অর্থাৎ যে জ্ঞান বিপরীত-নিশ্চয়রূপ ভ্রম নহে এবং “ব্যবসায়াত্মক” অর্থাৎ যে জ্ঞান সংশয়াত্মক নহে—নিশ্চয়াত্মক, এমন জ্ঞানবিশেষ যাহার দ্বারা জন্মে, অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞানের বাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রশ্নান।

টীকাদী। মহর্ষি গোতম “উদ্দেশ্য”, “লক্ষণ” এবং “পরীক্ষা”র দ্বারা প্রশ্নানাদি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার প্রথমোক্ত পদার্থ “প্রমাণ”। তাহার সান্নাত উদ্দেশ্য প্রথম সূত্রের দ্বারা করিয়াছেন এবং তৃতীয় সূত্রের দ্বারা তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছেন। তৃতীয় সূত্রে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা প্রশ্নানের সান্নাত লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষাদি বিশেষ প্রশ্নান-চতুষ্টয়ের লক্ষণ বলিতে হইবে, তাই মহর্ষি তন্মধ্যে এই সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত



প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার লক্ষণ বুঝা আবশ্যক। লক্ষণের দ্বারাই পদার্থ তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পদার্থের লক্ষণ না বুঝিলে ঐ বিশিষ্টতা বা বিশেষ বুঝা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিলে তদ্বারা উহা তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যাইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ-জ্ঞান তাহার একপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থের বিশেষ জ্ঞাপনই সর্বত্র লক্ষণের প্রয়োজন। মহর্ষির লক্ষণ-সূত্রগুলিও উহাই প্রয়োজন। প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব জানাইতে তাহাদিগের লক্ষণ বলিতে হয়,—এ জন্ত মহর্ষি তাহাদিগের লক্ষণ-সূত্রগুলি বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইবে, উহা তাহার সজাতীয় অসুমানাদি প্রমাণ এবং তাহার বিজাতীয় প্রত্যক্ষভাস এবং প্রমের প্রকৃতি পদার্থবর্গ নহে, উহা তাহা হইতে বিশিষ্ট, তাহা হইতে ভিন্ন। এইরূপ বোধ উহার একপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ সর্বত্রই লক্ষণের ইহাই প্রয়োজন বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রে “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। “প্রত্যক্ষ” শব্দের অস্তিত্ব অর্থ থাকিলেও এখানে উহার অর্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই এই সূত্রে মহর্ষির বক্তব্য। সূত্রের অন্য অংশের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষির তাৎপর্য এই যে, এইরূপ জ্ঞানবিশেষ বাহার দ্বারা জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থাৎ সূত্রে “কতঃ” এই কথার অধ্যাহার করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যটীকাকারও ইহাই বলিয়াছেন। নচেৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণ বলা হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই যে মহর্ষির এই সূত্রে বক্তব্য। যদিও প্রত্যক্ষ প্রমিতিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় বটে, কিন্তু সেই প্রমিতি মাত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না। হানাদি বুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতি অসুমানিতর করণ হওয়ার অসুমান-প্রমাণই হইবে এবং ইন্দ্রিয় এবং তাহার সন্নিবর্তকবিশেষও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। সুতরাং সূত্রে “কতঃ” এই কথার অধ্যাহার ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণমাত্রের লক্ষণ বলা হয় না। কলকথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য এই সূত্রে বক্তব্য, তখন তাহার তাৎপর্য ঐ পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে এবং সূত্রস্থ “প্রত্যক্ষ” শব্দটি প্রত্যক্ষ প্রমাণবোধক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পরন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে তাহার ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। একই স্থানকর সূত্রের দ্বারা অনেক তত্ত্বসূচনা করাই সূত্রকার মহর্ষিদিগের কৌশল। স্থলবিশেষে অন্য বাক্যের অধ্যাহার করিয়া মহর্ষি-সূত্রের সেই সকল অর্থ বুঝিতে হয়। ঐরূপ অধ্যাহার সূত্রকারদিগের অভিপ্রেতই থাকে। এ জন্তই ভাষ্যকারগণ সূত্রার্থবর্ণনায় অনেক কথার পূরণ করিয়া সূত্রের অবতারণা করেন এবং ঐরূপ করিয়া ব্যাখ্যাও করেন। মূলকথা, বাহার দ্বারা এই সূত্রোক্ত জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এই পর্য্যন্তই এখানে সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। সে কিরূপ জ্ঞান? তাই প্রথমেই বলিয়াছেন, “ইন্দ্রিয়ার্গসন্নিবর্তকোৎপন্ন জ্ঞান।” জ্ঞান, রসনা, চক্ষু, হৃদয়, শ্রোত্র, এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়। ইহা ছাড়া আর একটি ইন্দ্রিয় আছে,



তাহা অন্তরিক্সিত, তাহার নাম মন। এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মিত বিষয় আছে। সকল পদার্থই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। আবার কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না অর্থাৎ শৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, এমনও বহু পদার্থ আছে। সেগুলিকে বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থ। যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, সেই পদার্থের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ-হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাই ই“ন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধবোধোপন্ন জ্ঞান,” তাহাকেই বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ভাব্যকার স্বত্রার্থ-স্বর্ণনার স্বত্রোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতেও এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহার দ্বারা হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই পর্য্যন্তই স্বত্রার্থ বৃদ্ধিতে হইবে। পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষকেই “ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ” বলে। উদ্যোতকর প্রভৃতি ত্রায়াচাৰ্য্যগণ এই “সম্বন্ধ”কে ছয় প্রকার বলিয়াছেন। যথা—(১) “সংযোগ,” (২) “সংযুক্ত সমবায়,” (৩) “সংযুক্তসমবেত সমবায়,” (৪) “সমবায়,” (৫) “সমবেতসমবায়,” (৬) “বিশেষণতা”। ইহাদিগের মধ্যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধই “সম্বন্ধ” এবং ভ্রাবাগত গুণ, ক্রিয়া ও জাতির প্রত্যক্ষে “সংযুক্তসমবায়-সম্বন্ধ”ই “সম্বন্ধ”। যেমন বৃক্ষের গুণ, ক্রিয়া এবং বৃক্ষই প্রভৃতি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে বৃক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে বৃক্ষ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হয়। ঐ বৃক্ষের সহিত তাহার গুণ, ক্রিয়া ও জাতির “সমবায়” নামক সম্বন্ধ থাকায় সেই সকল পদার্থেই ইন্দ্রিয়-সংযুক্তের সমবায় সম্বন্ধ আছে। এই জন্ত সেখানে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধকে “ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধ” বলা হইয়াছে। এইরূপ ভ্রাবাগত গুণ ও ক্রিয়াতে যে জাতি আছে, তাহার প্রত্যক্ষে “সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়” সম্বন্ধই সম্বন্ধ। যেমন গুরু রূপের গুরুত্ব বস্তুটি গুরুরূপগত “জাতি”। ঐ গুরু রূপ গুণসমার্থ। উহা যে দ্রব্যে আছে, তাহাতে চকুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ হইলে সেই দ্রব্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইল। সেই দ্রব্যের সহিত তাহার গুরু রূপের “সমবায়” নামক সম্বন্ধ থাকায় ঐ গুরু রূপ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দ্রব্যে সমবেত অর্থাৎ সমবায় নামক সম্বন্ধে অবস্থিত। সেই গুরু রূপ গুরুত্ব-জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঐ গুরুত্বের সহিত চকুরিন্দ্রিয়ের “সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়” নামক সম্বন্ধ থাকিল। উহাই ঐ গুরুত্ব জাতির সহিত সেখানে চকুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ। আকাশের সহিত শব্দের “সমবায়” নামক সম্বন্ধই ত্রায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত। সুতরাং শব্দপ্রত্যক্ষে “সমবায়”ই “সম্বন্ধ”। শব্দগত শব্দই প্রভৃতি জাতিরও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে “সমবেত-সমবায়” সম্বন্ধই সম্বন্ধ। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত অর্থাৎ “সমবায়”-সম্বন্ধে অবস্থিত, সেই শব্দে শব্দই প্রভৃতি জাতিও সমবায় সম্বন্ধেই অবস্থিত, সুতরাং শব্দই প্রভৃতি জাতির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের “সমবেত-সমবায়” নামক সম্বন্ধ আছে, উহাই সেখানে শব্দই প্রভৃতির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের “সম্বন্ধ”। অনেক অভাব পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, যেখানে ভূতলে চক্ষুঃসংযোগের দ্বারাই “এখানে সর্প নাই” এইরূপ বোধ হয়, সেখানে উহা সর্পীভাবের চাক্ষুঃ প্রত্যক্ষ। সেখানে ভূতল চক্ষুঃসংযুক্ত। ভূতলের সহিত সর্পীভাবের “স্বরূপ-



সদ্বন্ধ" কল্পনা করা হইয়াছে এবং ঐ সম্বন্ধের নাম বলা হইয়াছে "বিশেষণতা"। তাহা হইলে তুলনগত সর্পাভাবের সহিত দেখানে চক্ষুরিস্ত্রিরের "সংযুক্তবিশেষণতা" সম্বন্ধ আছে। এইরূপ অস্ত্ররূপেও অভাবের সহিত ইন্দিয়ের "বিশেষণতা"-সদ্বন্ধ ( "সংযুক্তসমবেত-বিশেষণতা," "সমবেত-বিশেষণতা" প্রভৃতি ) হয়, এ জন্ত অভাব প্রত্যকে "বিশেষণতা" নামে সর্ববিধ বিশেষণতা ধরিয়া এক প্রকারই সন্নিবন্ধ বলা হইয়াছে এবং এই জন্ত লৌকিক প্রত্যকে পূর্বোক্ত "সন্নিবন্ধ" হয় প্রকারেই পরিগণিত হইয়াছে। এবং এই "সন্নিবন্ধ"গুলি লৌকিক প্রত্যকের সাধন বলিয়া ইহাদিগকে "লৌকিক সন্নিবন্ধ" বলা হইয়াছে। এই "সন্নিবন্ধের" কথা এবং দূরত্ব চক্ষুর সহিত দ্রষ্টব্য দ্রব্যের সংযোগ কিরূপে হয়, ইত্যাদি কথা তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দির-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। এই স্বত্রে মহবি "সন্নিবন্ধ" শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সদ্বন্ধবিশেষের সূচনা করিয়াছেন। "সন্নিবন্ধ" না বলিয়া সংযোগ বা অস্ত্র কোন সদ্বন্ধবিশেষের নাম করিলে উহা বুঝা যাইত না। স্বত্রে "উৎপন্ন" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের যে সন্নিবন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক, তাহাই এখানে "ইন্দিয়ার্গ-সন্নিবন্ধ" বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন ভিত্তিতে চক্ষুঃসংযোগ হইলেও ভিত্তির ব্যবহৃত অথচ ভিত্তিসংযুক্ত বস্তাদির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু দেখানেও চক্ষুরিস্ত্রিরের ঐ বস্তুর সহিত "সংযুক্ত-সংযোগ" সদ্বন্ধ আছে; তাহা হইলে কলাম্বুসারে কল্পনা করিয়া বুঝা যায়, ঐরূপ "সংযুক্ত-সংযোগ" সদ্বন্ধ প্রত্যক্ষের উৎপাদক নহে, সুতরাং স্বত্রে ঐরূপ সদ্বন্ধ ইন্দিয়ার্গ-সন্নিবন্ধ শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই এবং স্বত্রে ঐ স্থলে "অর্থ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, যে বস্তু ইন্দিয়ের "অর্থ" অর্থাৎ গ্রাহ ( গ্রহণযোগ্য ), তাহার সহিত ইন্দিয়ের সন্নিবন্ধই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক। আকাশ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সংযোগ হইলেও তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঐরূপ "সন্নিবন্ধ" স্বত্রে গৃহীত হয় নাই। এই জন্তই ইন্দিরসন্নিবন্ধ না বলিয়া মহবি বলিয়াছেন — "ইন্দিয়ার্গসন্নিবন্ধ"। যবাহানে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ের সহিত ইন্দিরের সংযোগাদি সন্নিবন্ধ হেতুক সূক্ষ-দৃষ্ণও উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, সুতরাং কেবল "ইন্দিয়ার্গসন্নিবন্ধোৎপন্ন" বলিলে সূক্ষ-দৃষ্ণবিশেষও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এ জন্ত মহবি "জ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সূক্ষ-দৃষ্ণ জ্ঞান পদার্থ নহে, সুতরাং তাহা কোন স্থলে "ইন্দিয়ার্গসন্নিবন্ধোৎপন্ন" হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইবে না। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র স্বত্রেও "জ্ঞান" শব্দের এইরূপ প্রয়োগই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। "ভায়মঞ্জরী"কার জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে, স্বত্রে যখন "ব্যবসায়িক" শব্দ রহিয়াছে, তখন তাহাতেই "জ্ঞান" পাওয়া গিয়াছে। কারণ, "ব্যব-সায়িক" শব্দের অর্থ নিষ্ঠাশাস্ত্রিক; তাহা হইলে বুঝা গেল, নিষ্ঠুর নামক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং সূক্ষ-দৃষ্ণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইবে কিরূপে? সেগুলি ত আর নিষ্ঠুর নামক জ্ঞানবিশেষ নহে? জয়ন্তভট্ট এ কথা লইয়া বহু বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বত্রে "জ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ না করিলে বিশেষ্যবোধক কোন শব্দপ্রয়োগ হয় না, কেবল বিশেষণবোধক



শব্দগুলিই বলা হয়, তাহাতে স্বত্বব্যাক্যের অসম্পূর্ণতা হয়। এ জন্ত মহর্ষি বিশেষবোধক “জ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা ছাড়া উহার আর কিছু প্রয়োজন নাই। তাৎপর্যটিকার প্রভৃতির মতে স্বত্রে “ব্যাপদেশ্য” এবং “ব্যবসায়্যাক” এই দুইটি কথার দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ, ইহাই স্থচিত হইয়াছে। সুতরাং “ব্যবসায়্যাক” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ বলা হয় নাই। স্বত্ব-স্বত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িলে “জ্ঞান” শব্দের দ্বারা যে দোষ বারণ করা যাইতে পারে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র স্বত্রে “জ্ঞান” শব্দের তাহাই প্রয়োজন বলিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিত্য, সুতরাং উহা প্রমাণের কল নহে। মহর্ষি প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্ত প্রত্যক্ষপ্রমিতির কথাই বলিবেন, তাই স্বত্রে তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্ন না হওয়ার মহর্ষির এই স্বত্রে কোন দোষ হয় নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কোন পূর্বাচরণের ব্যাখ্যান্যারে এই স্বত্রে দ্বারা যাহাতে নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের লক্ষণই বুঝা যায়, সেই ভাবে শেষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি-স্বত্রে দ্বারা সহজে সে অর্থ কিছুতেই বুঝা যায় না। এইরূপ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনও নাই। মহর্ষি এমন কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষের কথা বলিবেন, গ্রাহ্যর সাধন বা করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। ঈশ্বর-প্রত্যক্ষের যখন কিছু সাধন নাই, তাহা নিত্য, তখন মহর্ষি তাহার কথা বলিবেন কেন? তবে ঈশ্বরকে এবং তাহার জ্ঞানকে যে প্রমাণ বলা হয়, সেখানে “প্রমাণ” শব্দের অর্থ অন্তরূপ। যাহা অদ্রাস্ত জ্ঞান, অথবা যিনি অদ্রাস্ত পুরুষ, তাঁহাকে “প্রমাণ” বলা হয়। কিন্তু মহর্ষি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধন। সুতরাং তাহার লক্ষণ বলিতে প্রমাণজন্ত প্রত্যক্ষের কথাই মহর্ষির বক্তব্য। তাই বলিয়াছেন—“ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্ন”<sup>১</sup>। সাংখ্যস্বত্রেও প্রত্যক্ষের লক্ষণে এইরূপে ঈশ্বরের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু প্রমাণজন্ত প্রত্যক্ষের কথাই স্বত্বকার বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষপ্রমাণের কথা বলিতে তাহাই বক্তব্য, এইরূপ কথা বলিলে সেখানে ঈশ্বর লইয়া মারামারি হয় না। তবে অল্প উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের অনির্দিষ্ট সমর্থনের জন্ত স্বত্বকার সেখানে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বুঝিতে হয় এবং বলিতে হয়।

প্রাচীন মতে “নির্বিবর্তক” এবং “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ এবং তাহার পরজাত “হানাদি-বুদ্ধি”রূপ প্রত্যক্ষ—এগুলি সমস্তই ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্ন জ্ঞান; সুতরাং উহাদিগের করণগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। তবে ঐ সকল প্রত্যক্ষ সংশয়াক হইলে তাহার করণ প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্ত বলা হইয়াছে—“ব্যবসায়্যাক” অর্থাৎ নিশ্চয়াক হওয়া চাই। “ব্যবসায়” শব্দের দ্বারা নিশ্চয় অর্থ বুঝা যায়। আবার বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের (যেমন রক্তভেদ সর্পভ্রম, নরীটিকার জলভ্রম প্রভৃতি) করণও প্রমাণ হইতে পারে না, এ জন্ত বলা হইয়াছে

১। উদ্যোতকর্তা ঈশ্বর ও তাহার নিজ জ্ঞানের প্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে মহর্ষি-স্বত্রে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্নরূপ চৌকিকমাত্রবিষয়ঃ”। সেখানে বর্তমান দি দিয়াছেন,—“যদ্ব্যকৃতঃ সূত্রস্ত চৌকিকমাত্রাকবিষয়ঃ তথাহি।”—(তায়দর্শনজলি, ৪ অধ্যায়, ৫ কারিকা)।



“অব্যক্তিরী।” অর্থাৎ প্রত্যকটী বস্তুই হওয়া চাই। এতাদৃশ প্রত্যক জ্ঞানের সাধনই প্রত্যক প্রমাণ।

সূত্রে “অব্যপদেশ” শব্দ কেন এবং উহার অর্থ কি, এ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মতভেদ ছিল। সে মতভেদগুলি এবং তাহার সমর্থন জয়ন্তভট্ট স্মারমঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, নির্ণিকল্পক প্রত্যক অবশ্য স্বীকার্য, ইহা সূচনা করিতেই মহর্ষি সূত্রে “অব্যপদেশ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। “অব্যপদেশ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে “নির্ণিকল্পক।” তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যেরও সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাষ্যকারেরও উহারই তাৎপর্য। তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যাহুসারেই সেখানে অনুবাদে ভাষ্যার্থ বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যা এবং প্রত্যক্ষ-সূত্রের অতীত কথা পরবর্তী ভাষ্য-ব্যাখ্যাতেই দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়স্বার্থেন সন্নিবর্ত্যত্বংপদ্যতে যজ্ঞজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ন তর্হীদানীমিদং ভবতি, আত্মা মনসা সংযুক্ত্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি। নেদং কারণাবধারণমেতাবৎপ্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি। যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টকারণং তদুচ্যতে, যন্তু সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্ত্যত ইতি। মনসন্তর্হীন্দ্রিয়েণ সংযোগো বক্তব্যঃ, ভিদ্‌মানস্য প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য নায়ে ভিদ্‌ম্যত ইতি সমানত্বামোক্ত ইতি।

অনুবাদ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্ত (সংযোগাদি সম্বন্ধ) হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। (পূর্ববপক)—তাহা হইলে (কেবল বিষয়েই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধই প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে) এখন ইহা হইল না—(কি হইল না, তাহা বলিতে-ছেন) আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয় অর্থের (বিষয়ের) সহিত সংযুক্ত হয়। (তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তের দ্বারা আত্মমনঃসংযোগ এবং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগও কারণ; মহর্ষি পরে নিজেও তাহা বলিয়াছেন। এখন বাহা বলিলেন, তাহাতে ত সে কথা হইল না; কারণ, এখানে প্রত্যক্ষে কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তই কারণ বলিলেন)।

(উত্তর)—ইহা (“ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তোৎপন্ন” এই সূত্রবাক্য) এতাবমাত্র প্রত্যক্ষে কারণ, এইরূপে কারণাবধারণ নহে অর্থাৎ কারণান্তর বারণ নহে। কিন্তু বিশিষ্ট কারণ বচন। বিশদার্থ এই যে, যেটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশিষ্ট কারণ (অসাধারণ কারণ), তাহাই উক্ত হইয়াছে। বাহা কিন্তু অনুমানাদি জ্ঞানের সম্বন্ধে সমান



(সাধারণ কারণ), তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। (পূর্ববপক)—তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও (প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে) বলিতে হয় ? (অর্থাৎ অসাধারণ কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ বক্তব্য হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের দ্বারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ বলিয়া তাহাও প্রত্যক্ষলক্ষণে বলিতে হয় ?)

(উত্তর)—ভিদ্ধ্যমান অর্থাৎ রূপজ্ঞান অথবা চাক্ষুষ জ্ঞান এইরূপ সংজ্ঞার দ্বারা জ্ঞানান্তর হইতে বিশিষ্ট্যমান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (রূপ-প্রত্যক্ষের) সম্বন্ধে ইহা (ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ) (আত্মমনঃসংযোগরূপ সাধারণ কারণ হইতে) বিশিষ্ট হয় না; সুতরাং (আত্মমনঃসংযোগের) সমান বলিয়া (প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে এই সূত্রে) উক্ত হয় নাই।

টিপ্পনী। আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতি সাধারণ কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিতে হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধের আধার যে ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়, তাহার দ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষের (রূপজ্ঞান, চাক্ষুষ জ্ঞান ইত্যাদিরূপে) ব্যাপদেশ (নামকরণ) হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের আধার মনের দ্বারা ঐ রূপাদি-প্রত্যক্ষের কোন ব্যাপদেশ হয় না। সুতরাং ঐ অংশে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ (প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ হইলেও) আত্মমনঃসংযোগের সমান। তাই মহর্ষি প্রত্যক্ষলক্ষণে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করেন নাই, ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য।

ভাষ্য। বাবদর্থঃ বৈ নামধেয়শব্দাঃ, তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ, অর্থসম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ। তত্রেদমিন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থাৎপন্নমর্থজ্ঞানং রূপমিতি বা রস ইতোবাং বা ভবতি। রূপরসশব্দাশ্চ বিষয়নামধেয়ম্। তেন ব্যপদিশ্চ্যতে জ্ঞানং রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে। নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্চ্যমানং সংশ্লিষ্টং প্রসজ্যতে অত আহ অব্যাপদেশ্চ্যমিতি।

অনুবাদ। যতগুলি পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে। সেই সংজ্ঞাশব্দগুলির সহিত অর্থের (বিষয়ের) সম্প্রত্যয় (সমধিক প্রতীতি) হয়। অর্থসম্প্রত্যয়বশতঃ (বিষয়ের সম্যক জ্ঞানবশতঃই) ব্যবহার হয়। (প্রকৃতস্থলে ইহার সংগতি করিতেছেন) তাহা হইলে এই ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধ-হেতুক উৎপন্ন বিষয়জ্ঞান “রূপ” এই প্রকারে অথবা “রস” এই প্রকারে (রূপাদি বিষয়ের সহিত রূপাদি সংজ্ঞার অভিন্নরূপে) হয়। (তাহাতে কি হইল, তাহা বুঝাইতেছেন) রূপ, রস প্রভৃতি শব্দগুলি বিষয়ের সংজ্ঞা। (তাহাতেই বা কি হইল, তাহা বলিতে-



ছেন) সেই সংজ্ঞাবারা “রূপ” ইহা জানিতেছে, “রস” ইহা জানিতেছে। (এইরূপে) জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যপদিষ্টমান অর্থাৎ বিশিষ্ট্যমান হইয়া (এই জ্ঞান) শব্দ (শব্দবিষয়ক হওয়ায় শব্দ জ্ঞাত) হইয়া পড়ে, এ জ্ঞাত মহাবি (সূত্রে) “ব্যপদেশঃ” এই কথাটি বলিয়াছেন।

টিগুনী। “নির্লিকল্পক” ও “সবিকল্পক” নামে দ্বিবিধ প্রত্যক মহাবির লক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত হইলেও ঐ প্রকারভেদে বিপ্রতিপত্তি থাকায়, মহাবি “ব্যপদেশঃ” ও “ব্যবসায়স্বকং”—এই দুইটি কথার দ্বারা স্পষ্টরূপে ঐ প্রকারভেদের কীর্তন করিয়াছেন। ঐ দুইটি কথা প্রত্যক্ষের লক্ষণের অন্তর্গত নহে। যে প্রত্যক্ষে বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব নাই, তাহাকে নির্লিকল্পক প্রত্যক বলে। মহাবি “ব্যপদেশঃ” শব্দের দ্বারা এই নির্লিকল্পক প্রত্যক্ষের সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ নির্লিকল্পক প্রত্যক অবশ্য স্বীকার্য। ব্যপদেশ বলিতে বিশেষণ বা উপপদকণ, নাম ও জাতি প্রভৃতি। ঐ নাম, জাতি প্রভৃতি ব্যপদেশ-বৃত্তকেই ব্যপদেশ বলা যায়। ফলতঃ ব্যপদেশ বলিতে বিশেষ্যই বুঝা যায়। যে জানে ব্যপদেশ অর্থাৎ বিশেষ্য নাই, তাহাই “ব্যপদেশঃ” নির্লিকল্পক জানে নাম, জাতি প্রভৃতি কেহ বিশেষণ হয় না; সুতরাং সে জানে কোন বিশেষ্যও হয় না। কেবল পদার্থের স্বরূপমাত্রই তাহাতে বিবরণ হয়। তাই “ব্যপদেশঃ” শব্দের দ্বারা উক্ত নির্লিকল্পক জ্ঞান বুঝা যাইতে পারে। যাহারা এইরূপ প্রত্যক মানেন না, উহা অসম্ভব বলেন, তাহাদিগের মত নিরাকরণের জন্য ভাব্যকার প্রথমতঃ “বাবদর্থং বৈ নামধেশব্দাঃ” ইত্যাদি ভাব্য-সন্দর্ভের দ্বারা তাহাদিগের স্বপক্ষ-সমর্থনের যুক্তি দেখাইতেছেন। সে যুক্তির মর্ম্ম এই যে, পদার্থমাত্রেরই নাম আছে, নামশূন্য কোন পদার্থ নাই; ঐ নাম ও পদার্থ বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণ, “গো এই পদার্থ,” “অথ এই পদার্থ” ইত্যাদিরূপে নাম ও পদার্থ অভিন্নরূপেই প্রতীত হয়। ভাব্যকার “বাবদর্থং বৈ নামধেশব্দাঃ”—এই অংশের দ্বারা বিরুদ্ধবাদি-সম্মত নাম ও পদার্থের পূর্বোক্ত অভিন্নতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে হেতু বলিয়াছেন—“তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ,” অর্থাৎ যেহেতু সংজ্ঞা শব্দের সহিত অভিন্নভাবেই (গো এই পদার্থ, অথ এই পদার্থ ইত্যাদিরূপে) পদার্থের সম্প্রত্যয় হয়, অতএব নাম ও পদার্থ অভিন্ন। পরন্তু সংজ্ঞা শব্দের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ পদার্থ-প্রতীতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, সংজ্ঞাশব্দ ও তৎপ্রতিপাদ্য পদার্থ অভিন্ন। কারণ, জ্ঞাতব্যের উৎকর্ষই জ্ঞানের উৎকর্ষের মূল। সংজ্ঞা শব্দ জ্ঞাতব্য পদার্থ হইতে অভিন্ন না হইলে তাহার উৎকর্ষে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইবে কেন? তাই বলিয়াছেন,—“সম্প্রত্যয়”। উহার অর্থ, সমবিক প্রত্যয়। “সং” শব্দের দ্বারা প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) উৎকর্ষ সূচনাপূর্বক বিরুদ্ধবাদিগণের পূর্বোক্ত বৃত্তান্তরই সূচনা করিয়াছেন। অভিন্নরূপে প্রতীতি হইলেই বা বস্তুতঃ অভিন্ন হইবে কেন?—অনেক স্থলে ভিন্ন পদার্থেও ঐরূপ ভ্রম প্রতীতি হইয়া থাকে। তাই বলিয়াছেন, “অর্থসম্প্রত্যয়চ্চ ব্যবহারঃ”—অর্থাৎ সংজ্ঞা ও পদার্থের ঐরূপ অভিন্নভাবে প্রতীতিবশতঃ বস্তু ব্যবহার চলিতেছে, তখন ঐ প্রতীতিকে ভ্রম বলা যায় না, উহা স্বার্থ। সুতরাং উহা দ্বারা



সংজ্ঞা ও পদার্থ যে অভিন্ন, তাহা বস্তুধর্মরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। পদার্থ ও তাহার নাম অভিন্ন হইলে পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান-মাত্রই নামবিষয়ক হইল। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই নামের দ্বারা ব্যপদিশ্টে অর্থাৎ বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষ জ্ঞানও পূর্বোক্ত যুক্তিতে নাম-বিষয়ক হওয়ায় নামবিশিষ্ট। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামাত্মক শব্দ-বিষয়ক হওয়ায় শব্দজ্ঞ হইয়া পড়িল। কারণ, প্রত্যক্ষে তাহার বিষয়গুলি কারণ। নাম প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে প্রত্যক্ষমাত্রই নামজ্ঞ হইবে। নাম-বিষয়ক হইলে আবার নাম-বিশিষ্ট হইবেই; সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অর্থাৎ নাম-রহিত অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ (যাহাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে) একটা হইতেই পারে না, উহা অসিদ্ধান্ত। ভাষ্যে “যাবদর্থং বৈ” এখানে “বৈ” শব্দটি অবধারণ অর্গে প্রযুক্ত। ‘যাবদর্থং বৈ’—ইহার ব্যাখ্যা যাবদর্থমেব।

ভাষ্য। যদিমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেহর্থজ্ঞানং তন্ন নামধেষশব্দেন ব্যপদিশ্যতে। গৃহীতেহপি চ শব্দার্থসম্বন্ধেহস্থার্থস্থায়ং শব্দো নামধেষ-মিতি। যদা তু সৌহর্ধো গৃহ্যতে তদা তৎপূর্বস্মাদর্থজ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে, তদর্থবিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি। তস্মৈ স্বর্থজ্ঞানস্থান্যঃ সমাখ্যাশব্দো নাস্তি যেন প্রতীয়মানং ব্যবহারায় কল্পেত। ন চাপ্রতীয়মানেন ব্যবহারঃ, তস্মাজ্জ্ঞেয়স্থার্থস্থ সংজ্ঞাশব্দেনৈতিকরণযুক্তেন নির্দিষ্ট্যতে রূপমিতি-জ্ঞানং রস ইতি জ্ঞানমিতি। তদেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো ব্যাপ্রিয়তে ব্যবহারকালে তু ব্যাপ্রিয়তে। তস্মাদশব্দমর্থজ্ঞানমিদ্ভিন্নার্থ-সম্বন্ধকোৎপন্নমিতি।

অনুবাদ। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত অর্থাৎ অগৃহীত হইলে (যখন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান নাই, সেই অবস্থাতে) এই যে অর্থজ্ঞান (বালক ও মূক প্রভৃতির রূপাদিপ্রত্যক্ষ), তাহা সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা বিশিষ্ট হয় না। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও (যখন শব্দার্থ-সম্বন্ধ-জ্ঞান আছে, সেই অবস্থাতেও) এই পদার্থের এই শব্দটি নাম, ইহাই জ্ঞান হয়। কিন্তু যে সময়ে সেই পদার্থ গৃহীত হয় (নামস্মরণের পূর্বেই নির্বিকল্পকের দ্বারা নাম-রহিত সেই পদার্থ জ্ঞাত হয়), তখন সেই জ্ঞান পূর্বতন অর্থজ্ঞান হইতে (অব্যুৎপন্নাবস্থার অর্থজ্ঞান হইতে) বিশিষ্ট হয় না। সুতরাং সেই অর্থজ্ঞান সেইরূপই (পূর্বতন অর্থজ্ঞান সদৃশই) হয়। সেই অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধে কিন্তু অন্য (অর্থ ভিন্ন) সংজ্ঞা শব্দ নাই, যাহার দ্বারা প্রতীয়মান অর্থাৎ পরকর্তৃক জ্ঞায়মান হইয়া (অর্থজ্ঞান) ব্যবহারের নিমিত্ত সমর্থ হইবে। অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারাও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞেয় পদার্থের



ইতিকরণযুক্ত অর্থাৎ ইতিশব্দযুক্ত ( রূপমিতি রস ইতি ) সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা “রূপ” এই জ্ঞান, “রস” এই জ্ঞান এই ভাবে ( অর্থজ্ঞানকে ) নির্দেশ করা হয়। সুতরাং এইরূপ অর্থজ্ঞানকালে সেই সংজ্ঞাশব্দ ( প্রতীয়মান হইয়া ) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যবহারকালে অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার সময়ে ( কারণ হইয়া ) ব্যাপারবিশিষ্ট হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধবোধোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শব্দ নহে—অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ায় শব্দজ্ঞাত নহে।

টিয়নী। মহর্ষি “অব্যাপসেত্ত্বং” এই কথাটির দ্বারা নির্ণিকরক প্রত্যকের অস্তিত্ব সূচনা করিয়াছেন। বাহারা তাহা মানেন না, তাঁহাদিগের যুক্তি ইতঃপূর্বেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। এখন ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, শব্দার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলেও বালকের রূপ প্রত্যক্ষ হয়। আবার শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তিহীন মুক প্রভৃতি ব্যক্তিরও কত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং শব্দরহিত প্রত্যক্ষ নাই, এ কথা বলা যায় না। আবার কেবল যে বালক মুক প্রভৃতিরই শব্দরহিত প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে। বাহারা ব্যুৎপন্ন অর্থাৎ অমুক শব্দ অমুক অর্থের বোধক, ইহা জানেন এবং শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারাও সেই শব্দ ও অর্থকে অভিন্ন বলিয়া বুঝেন না। তাঁহাদিগেরও এই শব্দটি এই পদার্থের নাম, এইরূপই জ্ঞান হয়। সুতরাং তাঁহাদিগেরও নামরহিত প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। প্রথমতঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার পরে ঐ পদার্থ দর্শনজন্য ঐ পদার্থের সংজ্ঞা স্মরণ হয়, সুতরাং বালক মুকাদিভিন্ন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগেরও ঐ সংজ্ঞা স্মরণের জন্য পূর্বে নামরহিত বিষয়-জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। সেই নামরহিত বিষয়জ্ঞান নির্ণিকরক প্রত্যক্ষ। বালক মুকাদির বিষয়জ্ঞান হইতে সে জ্ঞানের কোন বিশেষ নাই। ফলতঃ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সেই নির্ণিকরক প্রত্যক্ষও সেইরূপই হয়, অর্থাৎ তাহাও তখন কোন নামের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তাহাতে শব্দ-সম্বন্ধ নাই। বালক মুকাদির জ্ঞানের দ্বারা সবিবরক প্রত্যকের প্রথমজাত প্রত্যক্ষকে “নির্ণিকরক” প্রত্যক্ষ বলিতেই হইবে। তাহাই পরে “সবিবরক” প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশেষণবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, তখন পরকে বুঝাইবার জন্য জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে গেলে পদার্থের নামের দ্বারা ইহা প্রকাশ করিতে হয়, তখন বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান পদার্থীকার এবং সংজ্ঞাকার। পদার্থ এবং তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন না হইলে ঐ ভাবে জ্ঞান পদার্থীকার হইবে কেন? সুতরাং পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই আশঙ্কানিরাসের জন্য বলিয়াছেন,—“তস্ত তু” ইত্যাদি। সে কথার তাৎপৰ্য্য এই যে, অস্ত প্রকারে পদার্থজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়াই অর্থাৎ তাহার পরিচয় দিতে হয়; সেই পদার্থজ্ঞানে পদার্থের সংজ্ঞাশব্দ বিবর হয় না। পদার্থজ্ঞানকালে সংজ্ঞাশব্দের কোন ব্যাপার নাই। পরকে বুঝাইবার সময়



সংজ্ঞাশব্দ আবশ্যক। সে সময়ে তাহার ব্যাপার আছে—কিন্তু তাহাতে পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। \*

ভাষ্য। ঐশ্বরে মরীচয়ো ভৌমেনোদ্ভায়া সংস্কৃতাঃ স্পন্দমানা দূরস্থস্ত চক্ষুশা সন্নিবৃত্ত্যন্তে তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৃত্তদৃশকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ অব্যভিচারীতি। যদতশ্চিংস্তদিতি তদব্যভিচারি। যন্তু তশ্চিংস্তদিতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি। দূরাস্তচক্ষুশা হয়মর্থং পশ্চান্নাবধারণয়তি ধূম ইতি বা রেণুরিতি বা, তদেতদি-  
ন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবৃত্ত্যেৎপন্নমনবধারণজ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ  
“ব্যবসায়াক্ষক”মিতি।

অনুবাদ। ঐশ্বর্যকালে পার্থিব উদ্ভার সহিত সংস্কৃত স্পন্দমান ( ক্রিয়াবিশিষ্ট ) সৌর-কিরণসমূহ দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষুর সহিত সন্নিবৃত্ত ( সংযুক্ত ) হয়। সেই সূর্য্য-কিরণে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৃত্তজ্ঞান “উদক” এই জ্ঞান জন্মে। তাহাও ( সেই বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্ঞানও ) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এ জ্ঞান মহাবি ( সূত্রে ) “অব্যভিচারি” এই কথাটি বলিয়াছেন। তন্নিম্ন পদার্থে অর্থাৎ যাহা তাহা নহে, এমন পদার্থে যে “তাহা” এরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারী। যাহা কিন্তু সেই পদার্থে “সেই” এইরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। এই ব্যক্তি ( দ্রষ্টা ব্যক্তি ) দূর হইতে ( দূরব-  
দোষবশতঃ ) চক্ষুর দ্বারাই পদার্থ দর্শন করতঃ “ধূম এই” বা “রেণু এই” বা ( এইরূপে ) অবধারণ করিতেছে না, অর্থাৎ অনবধারণ ( সংশয় ) করিতেছে, সেই এই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৃত্ত্যেৎপন্ন অনবধারণ জ্ঞান ( সংশয় ) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এই জ্ঞান মহাবি ( সূত্রে ) “ব্যবসায়াক্ষকং” এই কথাটি বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। ভ্রমপ্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই সূত্রে বর্ণার্থ প্রত্যক্ষই লক্ষ্য। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের অন্তর্গত সূত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ বর্ণার্থ প্রত্যক্ষের করণই প্রত্যক্ষ

\* প্রত্যক্ষবাহ্যই সন্নিবৃত্তক। কারণ, জ্ঞানবাহ্যই জ্ঞের বিবহের সংজ্ঞাবিশিষ্ট পদার্থবিবরণ হইয়া থাকে, যতদূর অবিশিষ্ট নির্দিষ্টক প্রত্যক্ষ হইতেই পায়ে না, এই বস্তুটি বস্তু প্রাচীন শাস্ত্রিক বস্তু। শাস্ত্রিকশিষ্যোনি ভর্তৃহরি এই বস্তুর সন্নিবৃত্ত করিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্য্যটিকাভার এই বস্তুর সন্নিবৃত্ত ও বস্তুর দ্বারাই এখানে তাৎ-  
পর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। এখানে তাৎপর্য্যটিকাভারের ব্যাখ্যাসময়েই ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইল। শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন, ইহা শাস্ত্রিক বস্তু বলিয়া কোন কোন প্রাচীনক এয়ে পাওয়া গেলেও মহাত্ম্যো কিন্তু এই বস্তু পাওয়া যায় না। তাৎপর্য্যটিকাভার নির্দিষ্টক প্রত্যক্ষ নাই, এই বস্তুর উল্লেখ করিয়া এখানে ভর্তৃহরির কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—“ন সোহন্তি প্রত্যক্ষো লোকে যঃ শব্দানুবাদবৃত্তে। অনুবৃত্তবিশ জ্ঞানং সর্বং শব্দেন বসত্যে।”—  
বাক্যপটী।



প্রমাণ। স্বত্রে “বতঃ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া, বাহার দ্বারা এই প্রত্যক হয়, তাহাই প্রত্যক প্রমাণ, ইহাই শেষে সূত্রার্থ বুঝিত হইবে। এখন যদি ভ্রমও মহাবির প্রত্যক-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ভ্রমের করণও প্রত্যক প্রমাণ হইয়া পড়িবে। তাই মহাবির ‘অব্যভিচারি’ শব্দের দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন। “অব্যভিচারী” বলিতে যথার্থ। মরীচিকাতে জলভ্রম হয়, কিন্তু ঐ ভ্রমের বিষয় জল সেখানে নাই; সুতরাং ভ্রম, বিষয়ের ব্যভিচারী। যথার্থ জ্ঞান তাহার বিষয়ের অব্যভিচারী। মরীচিকাতে জলভ্রমহলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ান্নিকৰ্ণবশতঃ যে নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম নহে। পরে চক্ষুর দোষে অথবা দূরত্বানিদোষে তাহাতে যে “ইহা জল” এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক হয়, তাহাই ভ্রম। সেই ভ্রমের করণ প্রমাণ নহে, উহা প্রমাণাত্যাস। সেখানেও জলার্থীর প্রবৃতি হয়; কিন্তু সে প্রবৃতি সফল হয় না। যদিও প্রমাণের সামান্য লক্ষণের দ্বারা ভ্রম-প্রত্যকের করণের প্রামাণ্য নিরস্ত হয়;—কারণ, বিশেষ লক্ষণও সামান্য লক্ষণাক্রান্ত হওয়া চাই,—ভ্রমের করণের প্রমাণত্বই নাই। সুতরাং তাহার প্রত্যক প্রমাণও সম্ভবই নহে। বিশেষ লক্ষণেও ঐরূপ বিশেষণ বলিয়া হইলে অহুমানাদি প্রমাণের লক্ষণস্বত্রেও “অব্যভিচারি”-শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়,—তথাপি সকল জ্ঞানই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় প্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যকের অব্যভিচার বশতঃই অহুমানাদির অব্যভিচার। প্রত্যক ব্যভিচারী হইলে তত্ত্বমূলক অহুমানাদি অব্যভিচারী হইতে পারে না। এই বিশেষবোধের জন্তই মহাবির প্রত্যকস্বত্রে অতিরিক্ত “অব্যভিচারি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার স্বত্রে “অব্যভিচারি” শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিপর্যয় জ্ঞানেরই প্রত্যকতা নিবারণিত হইয়াছে,—সংশয়-জ্ঞানের প্রত্যকতা নিবারণিত হয় নাই; কারণ, সংশয়-জ্ঞান তাহা তাহা নহে, এমন পদার্থে “সেই” এইরূপ “ব্যভিচারি” জ্ঞান নহে। সংশয়-জ্ঞান ব্যভিচারী না হইলে তাহাও স্বত্বোক্ত প্রত্যক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাহা হইলে সংশয়-জ্ঞানের করণও প্রত্যক প্রমাণ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সংশয়জ্ঞানের করণ প্রত্যক প্রমাণ নহে। কারণ, প্রমাণের ফল নিশ্চয়ই হইবে। প্রমাণ কখনও সংশয় জন্মাইবে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয়ের প্রত্যকতা বারণের জন্তই মহাবির-স্বত্রে “ব্যবসারাদ্বয়কং” বলিয়াছেন। “ব্যবসার” শব্দের অর্থ নিশ্চয়। “ব্যবসারাদ্বয়ক” বলিতে নিশ্চয়াদ্বয়ক। সংশয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়ান্নিকৰ্ণবোধেৎপন্ন এবং অব্যভিচারী হইলেও নিশ্চয়াদ্বয়ক নহে। তাই উহা প্রত্যক-লক্ষণাক্রান্ত হইল না।

তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রত্যকস্বত্রে “অব্যপদেশকম্” এবং “ব্যবসারাদ্বয়কম্”—এই দুইটি কথা প্রত্যকলক্ষণের জন্ত নহে। তিনি বলেন,—“অব্যপদেশকং” এই কথার দ্বারা মহাবির, নির্বিকল্পকপ্রত্যক প্রমাণসিদ্ধ, উহা মানিতেই হইবে, এই তত্ত্বটি সূচনা করিয়াছেন। এবং “ব্যবসারাদ্বয়কম্” এই কথাটির দ্বারা সবিকল্পক প্রত্যক অবশ্য-স্বীকার্য্য, এই তত্ত্বটি সূচনা করিয়াছেন। স্বত্রে “অব্যভিচারী” শব্দের অর্থ ভ্রমভিন্ন। সংশয়জ্ঞান ভ্রম। সুতরাং “অব্যভিচারি”



শব্দের দ্বাৰাই সংশয়জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা নিরস্ত হইয়াছে। উহার জন্ত “ব্যবসায়িক” শব্দের প্রয়োগ নিস্তারোজন। “নিশ্চয়,” “বিকল্প,” “ব্যবসায়”—এই তিনটি একার্থবোধক শব্দ। সুতরাং “ব্যবসায়িক” শব্দের দ্বাৰা বিকল্প বা সবিকল্পক জ্ঞান অবশ্য বুঝা যাইতে পারে। “অব্যপদেশ” শব্দের দ্বাৰা বেক্ৰপে নিৰ্বিকল্পক জ্ঞান বুঝা যায়, তাহা পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে।

ফলতঃ বৌদ্ধযুগে এই নিৰ্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ লইয়া বড় বিবাদ ছিল। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বৰ্ণকৌৰ্ণি, দ্বিগুণ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বিজ্ঞে দাঁড়াইয়া এখানে সৰ্বতত্ত্ব-স্বতত্ত্ব শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র বলিতে চাহেন যে, বহু পূৰ্বেই আমাদিগের মহৰ্ষি গোতম এই বিবাদের চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে “ব্যবসায়িক” বলিয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। মিশ্র মহোদয় মহৰ্ষি-হৃদয়ে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ দেখা যায়, আমাদিগের দৰ্শন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার আচাৰ্যগণ দার্শনিক ঋষি-হৃদয়ের দ্বাৰাই পরবৰ্তী বৌদ্ধ প্রভৃতি মত-বিশেষের নিরাকরণে দেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শাস্ত্রীয়ক-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচাৰ্য্যের বৌদ্ধমত-খণ্ডন-প্রণালী দেখিলে ইহা আরও হৃদয়ঙ্গম হইবে। মিশ্র মহোদয় পূৰ্বোক্ত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, হৃদয়ে “ব্যবসায়িক” শব্দের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা বাহা করিলাম, ইহা অতি স্পষ্ট, শিষ্যগণ নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে। এ জন্তই ভাষ্যকার ও বার্তিককার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহার সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণই হৃদয়ে “ব্যবসায়িক” শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। উহা হৃদয়কারের উদ্দেশ্য না হইলেও অসংগত বা অসম্ভব নহে। “ব্যবসায়িক” শব্দের দ্বাৰা সংশয়ের প্রত্যক্ষতা নিবারিত হইতে পারে; তাই ভাষ্যকার ও বার্তিককার এইরূপ বলিয়াছেন। প্রাচীনগণ ইহারই নাম বলিয়াছেন—“অবাচয়”। যেটি প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, তাহার সংগ্রহের নাম অবাচয়। মিশ্র মহোদয় এই ভাবে ভাষ্যকার ও বার্তিককারের কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, “অস্মাভিঃ—

ত্রিলোচনগুরুদ্রীতমার্গাহুগমনোন্মুৈঃ।

যথামানং যথাবস্ত্ব ব্যাখ্যাতমিদমীদৃশম্॥”

অর্থাৎ তিনি ত্রিলোচন গুরুর উপদেশানুসারেই এখানে যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্রিলোচন গুরুর উপদেশ পাইয়াই বাচম্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের বার্তিকের উদ্ধার করেন, এ কথা তৎপৰ্য্য-পরিগৃহীত প্রথমে উদয়নের কথাতোও পায়রা যায়। “ত্রিলোচন” বাচম্পতি মিশ্রের গুরু ছিলেন, ইহা সেখানে প্রকাশ টীকাকার বৰ্দ্ধমানও লিখিয়াছেন।

ভাষ্য। ন চৈতন্যন্তব্যং আত্মমনঃ সম্বন্ধজমেবানবধারণজ্ঞানমিতি। চক্ষুশ্চ হৃদয়মর্থং পশ্চাদ্ভাবধারণতি, যথা চেন্দ্রিয়ৈরণোপলব্ধমর্থং মনসোপলভতে, এবমিন্দ্রিয়ৈরণানবধারণন্ মনসা নাবধারণতি। যচ্চ তদ্বিস্তিরা-নবধারণপূৰ্ব্বকং মনসানবধারণং তদ্বিশেষোপেক্ষং বিমর্শমাত্রং সংশয়ো ন



পূর্বমিতি । সৰ্ব্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিন্দ্রিয়েণ ব্যবসায়ঃ, উপহতেন্দ্রি-  
য়াণামনুব্যবসায়ান্ভাবাদিতি ।

অনুবাদ । অনবধারণ-জ্ঞান অর্থাৎ সংশয় আত্মমনঃ-সম্বন্ধে জন্মই অর্থাৎ  
ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে জন্ম নহে, ইহা মনে করিও না ; যেহেতু এই ব্যক্তি ( দ্রষ্টা ব্যক্তি )  
চক্ষুর দ্বারা পদার্থ-বিশেষকে ( সমান-ধর্মী ধর্মীকে ) দর্শন করতঃ অনবধারণ করে  
অর্থাৎ সেই পদার্থে বিশেষরূপে সংশয় করে । এবং বেরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ  
( ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধে ) পদার্থকে মনের দ্বারা অর্থাৎ নেত্র-সহায় মনের দ্বারা  
উপলব্ধি করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ  
( সংশয় ) করে । সেই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপূর্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে-  
পূর্বক মনের দ্বারা অনবধারণ, সেই বিশেষোপেক্ষ ( যাহাতে বিশেষ-জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা  
থাকে ) বিমর্শ-ই অর্থাৎ একধর্মীতে বিরুদ্ধ ধর্মাবয়ের জ্ঞানই সংশয় অর্থাৎ  
প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় সংশয় । পূর্বটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার  
নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃ-সংযোগ জন্ম যে মানস-সংশয় দৃষ্টান্তরূপে আপত্তি-  
কারীর মনে আছে, সেই সংশয় নহে, ( প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয়  
সংশয় নহে ) । সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাতার ( আত্মার ) ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ব্যবসায়  
( বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান ) হয় ; কারণ, বিন্যেসেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের অনুব্যবসায় অর্থাৎ  
ইন্দ্রিয়জন্ম জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয় না ।

টিপ্পন । আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয়জ্ঞান মানস, উহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে জন্মই নহে ;  
সুতরাং সংশয় মহর্ষির প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হইতেই পারে না । সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণের জন্ম  
হুজ্জে “ব্যবসায়ান্বক” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভাব্যকার কি করিয়া বলেন ? তাই ভাব্যকার  
বলিয়াছেন—“ন চৈতন্যমন্তব্যম্” ইত্যাদি । ভাব্যকারের কথা এই যে, সংশয় মাত্রই মন কারণ  
হইলেও সংশয়মাত্রই মানস নহে । ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল মনোজন্ম হইলেই সেই জ্ঞানকে মানস  
বলে । যেখানে চক্ষুর দ্বারা পদার্থ দর্শন করতঃ সংশয় করে, তাহাকে চাক্ষুষ সংশয় বলিবেই  
হইবে । তাহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও সেই সংশয়-বিষয়ের সম্বন্ধেও কারণ, সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে-  
জন্ম সংশয় জ্ঞান হুজ্জেক প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষতা বারণ  
করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃ-সংযোগ জন্ম যে মানস সংশয় হয়,  
তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া সংশয় মাত্রই মানস, ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না । কারণ, যে সংশয়ে  
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কারণ, তাহা কোন মতেই মানস হইতে পারে না ; তাহাকে ইন্দ্রিয়ার্থ-  
সম্বন্ধে জন্ম বলিতেই হইবে । সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে জন্ম চাক্ষুসাদি সংশয়কে মনে করিয়াই  
অর্থাৎ তাহার হুজ্জেক প্রত্যক্ষতা নিবারণের অভিপ্রায়েই হুজ্জে “ব্যবসায়ান্বক” শব্দের প্রয়োগ করা



হইয়াছে অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধকর্তব্য সংশয়ই এখানে বুদ্ধিহ; পূর্বটি অর্থাৎ আপত্তিকারী বাহ্যকে দৃষ্টান্ত করিয়া সংশয় মাত্রই মানস বলিতে চাহেন, সেই মানস-সংশয় এখানে বুদ্ধিহ নহে। দৃষ্টান্ততাবশতঃ ঐ সংশয়কে ভাষ্যকার “পূর্ব” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তটি পূর্বসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে “পূর্ব” বলা যায়।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয়-মাত্রই মানস। মনই বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া বাহ্য পদার্থে প্রবৃত্ত হয়। অতথা ‘আমি ঘট জানিতেছি’ ইত্যাদি রূপে যে জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ঘটাদি বাহ্য পদার্থ বিষয় হইতে পারে না; সূত্ররূপে বলিতে হইবে, বাহ্য পদার্থেও মনের প্রবৃত্তি হয়। তাহা হইলে সর্বত্র সংশয়কে মানসই বলা যায়। এই জন্ত বলিয়াছেন— সর্বত্র ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়ের প্রত্যক্ষ হলে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান হয়। পরে তাহার অনুব্যবসায় অর্থাৎ ‘আমি চক্ষু দ্বারা ঘট জানিতেছি’ ইত্যাদিরূপে ঐ জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয়। বিনষ্টেক্সির অন্ধ বসির প্রভৃতির মন থাকিলেও ঐরূপ অনুব্যবসায় হয় না; কারণ, তাহাদিগের সেই সেই ইন্দ্রিয় না থাকার তত্বে ইন্দ্রিয়-জন্ত ব্যবসায়ই হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ অনুব্যবসায়ের মূলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে অনুব্যবসায়ের দৃষ্টান্তে সংশয়ে বহিরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনই করণ, ইহা বলা হইবে না। মূল কথা, প্রত্যক্ষের মানস-প্রত্যক্ষে বাহ্য পদার্থ বিষয় হয় বলিয়া সেই দৃষ্টান্তে বাহ্য পদার্থের বহিরিন্দ্রিয়-জন্ত সংশয়কেও মানস বলা যায় না। কারণ, সেখানে বহিরিন্দ্রিয়-জন্ত ব্যবসায়ের বিষয় বাহ্য পদার্থই অনুব্যবসারে বিষয় হইয়া থাকে। ঐরূপ বাহ্য পদার্থের চাক্ষুশাদি সংশয়ও কেবল মনোজ্ঞ নহে। উহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধকর্তব্যপন্ন; সূত্ররূপে উহাকে মানস বলা যায় না।

ভাষ্য। আত্মাদিষু সূখাদিষু চ প্রত্যক্ষলক্ষণং বস্তব্যমনিন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধকর্তব্যং হি তদिति। ইন্দ্রিয়স্ত বৈ সতো মানস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথগুপ-দেশো ধর্ম্মভেদাৎ। ভৌতিকানোন্দ্রিয়ানি নিয়তবিষয়ানি, সগুণানাকৈ-যামিন্দ্রিয়ভাব ইতি। মনস্ত্বেভৌতিকং সর্ববিষয়কং, নাস্ত সগুণস্তেইন্দ্রিয়ভাব ইতি। সতি চেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্তব্যে সন্নিধিমসন্নিধিকাস্ত্র যুগপজ্ঞানানু-পত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি। মনসশ্চেন্দ্রিয়ভাবাম বাচ্যং লক্ষণান্তরমिति। তদ্রাস্তরসমাচারাচ্চৈতৎ প্রত্যেতব্যমिति। পরমতমপ্রতিবিদ্ধমনুমতমिति হি তদ্ব্যবৃতিঃ। ব্যাখ্যাং প্রত্যক্ষম্॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) আত্মা প্রভৃতি এবং সূখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষের লক্ষণ (প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর) বলিতে হয়? কারণ, তাহা (আত্মাদি এবং সূখাদির প্রত্যক্ষ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধকর্তব্য নহে। (উত্তর) ইন্দ্রিয়রূপেই বিদ্যমান



মনের ধর্মভেদবশতঃ (প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধর্ম্যাবশতঃ) ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে পৃথক্ উপদেশ হইয়াছে। (যে ধর্মভেদবশতঃ মনের পৃথক্ উপদেশ হইয়াছে, সেই ধর্মভেদগুলি ক্রমশঃ দেখাইতেছেন)। ইন্দ্রিয়গুলি (ইন্দ্রিয়সূত্রে পঠিত প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়) ভৌতিক, (ভূত-জন্তু বা ভূতাত্মক) নিয়ত বিষয়, (যাহাদিগের বিষয়ের নিয়ম আছে) এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াই ইহাদিগের (প্রাণাদির) ইন্দ্রিয়ত্ব। মন কিন্তু অভৌতিক এবং সর্ববিসয়, গুণবিশিষ্ট হইয়া ইহার ইন্দ্রিয়ত্ব নাই এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ থাকিলে ইহার (মনের) সম্মিতি ও অসম্মিতি অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধই যুগপৎজ্ঞানানুৎপত্তির অর্থাৎ এক সময়ে বিজ্ঞাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ না হওয়ার কারণ (প্রয়োজক) বলিব। ফলকথা, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে বলিয়াই (আত্মাদি ও স্বখাদি প্রত্যক্ষের) লক্ষণান্তর বলিতে হইবে না। তত্ত্বান্তর অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরের সমাচার (সংবাদ) বশতঃও ইহা (গোতম-সম্মত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব) বুঝা যায়। কারণ, অপ্রতিষিদ্ধ (অখণ্ডিত) পরের মত অনুমত অর্থাৎ নিজ সম্মত,—ইহাকে “তদ্ব্যুক্তি” বলে। প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যাত হইল।

টিপ্পনী। পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, মহর্ষি ইঞ্জিরসূত্রে মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয় নহে। আত্মাদি এবং স্বখাদিরও প্রত্যক্ষ হয়, উহা মানব-প্রত্যক্ষ। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব না থাকার ঐ প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধজ্ঞান বলা যায় না। সুতরাং মহর্ষির এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঐ মানব-প্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত হইল। উহাকে এই লক্ষণের লক্ষ্য না বলিলে উহার জ্ঞান আবার পৃথক্ প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিতে হয়। উক্তরের তাৎপর্য এই যে, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষির সম্মত। মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মাদি বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃই আত্মাদির মানব-প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং মহর্ষির এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণই তাহাতে অব্যাহত আছে, তাহার জ্ঞান আর পৃথক্ কোন লক্ষণ বলিবার প্রয়োজন নাই। মন ইন্দ্রিয় হইলেও প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহার উল্লেখ না করিয়া যে পৃথক্ উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ ধর্মভেদ। অর্থাৎ মন প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধর্ম্য বা বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট বলিয়াই প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে মন ইন্দ্রিয় নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। প্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভৌতিক, মন অভৌতিক। মন কিত্যদি কোন ভূতজন্তু নহে, ভূতাত্মকও নহে এবং প্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, রূপাদির গ্রাহক নহে; চকুর্ইন্দ্রিয় রূপের গ্রাহক, গন্ধাদির গ্রাহক নহে, ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিয়ত। মনের বিষয় নিয়ম নাই, সর্ববিসয়ক জ্ঞানেই মন আবশ্যক; সুতরাং সকল পদার্থই মনের বিষয় এবং প্রাণাদি গন্ধাদিগুণবিশিষ্ট হইয়াই ইন্দ্রিয়, মন তদ্রূপ ইন্দ্রিয় নহে। অর্থাৎ প্রাণাদি ইন্দ্রিয় যেমন স্ব স্ব গুণ গন্ধাদির দ্বারা



বাহ্য গন্ধাদির গ্রহণ করায়, তাহারা যে যে গুণের গ্রাহক, সেই সেই গুণ তাহাদিগেরও আছে, মন তজ্জপ নহে। মনে গন্ধ প্রভৃতি কোন বিশেষ গুণ নাই। ভাষ্যকার উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, ভাষ্যোক্ত বৈধর্ম্যগুলির মধ্যে সর্ববিষয় ও অসর্ববিষয়ই মনের পৃথক উপদেশের প্রকৃত হেতু। অস্তগুলি সংগত হয় না। “মনঃ সর্ববিষয়ং স্মৃতিকারণসংযোগা-  
দারত্বাৎ আত্মবৎ স্মৃৎগ্রাহকসংযোগাদিকরণত্বাৎ সমস্তেন্দ্রিয়ার্থিত্বাচ্ছাচ্চ”, এই প্রকারে বার্তিক-  
কার মনের সর্ববিষয় সাধন করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত অস্ত বৈধর্ম্যগুলি তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে,—মনের পৃথক উপদেশই বা কোথায়? মহর্ষি-সূত্রে তাহাও ত দেখি না? এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন—“গতি চ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে” ইত্যাদি। অর্থাৎ “মুগপজ্ঞানাত্মংপতির্মনসো নিদ্রম্” (১।১।১৬) এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি মনের উপদেশ করিয়াছেন। এক সময়ে চাক্ষুষ প্রভৃতি বিজ্ঞাতীর একাবিক প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা অনেকের অহুভব-সিদ্ধ। এই অহুভব মানিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন, মন অতি সূক্ষ্ম। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার সহিত মনের সংযোগ কারণ। এক সময়ে একাবিক ইন্দ্রিয়ার অতি সূক্ষ্ম মনের সংযোগ অসম্ভব, তাই এক সময়ে বিজ্ঞাতীর একাবিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়ার সহিত মন সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রির-জ্ঞাত প্রত্যক্ষই হয়। যে ইন্দ্রিয়ার সহিত তখন মনের সংযোগ থাকে না, সেই ইন্দ্রির-জ্ঞাত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন যে, এক ইন্দ্রিয়ার মনের সন্নিধি এবং অস্ত ইন্দ্রিয়ার অসন্নিধিই ঐ স্থলে ঐরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়ার মূল, তাই ঐ উভয়কেই উহাতে প্রযোজক বলিব। ভাষ্যোক্ত “কারণ” শব্দের অর্থ এখানে প্রযোজক। যথাংগে একথা বিশদরূপে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি গোতম মনের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ত মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কোথায়ও বলেন নাই, তবে আর কি করিয়া তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয়, ইহা ধরিয়া লইব? এতদ্বত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “তত্ত্বান্তর-সম্ভাচার” অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরসংবাদ হইতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বুঝা যায়। মহর্ষি সেই পরমত খণ্ডন করেন নাই, সুতরাং উহা তাঁহার অন্তমত, ইহা বুঝা যায়। পরের মত খণ্ডন না করিলে অন্তমত হয়, ইহাকে “তত্ত্বযুক্তি” বলে।<sup>১</sup> এই তত্ত্বযুক্তির দ্বারাও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি গোতমের সম্মত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যটীকাকার এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং ভাষ্যোক্ত “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ (“তত্ত্ব্যতে ব্যুৎপাদ্যতেহেন্নে” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) বলিয়াছেন শাস্ত্র। কিন্তু কোন্ শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি কথা কিছুই বলেন নাই। গোতম মনি খণ্ডন করিলে তাঁহার পূর্ববর্তী শাস্ত্রমতই খণ্ডন করিতেন, সুতরাং ভাষ্য-  
কারোক্ত “তত্ত্ব” শব্দের দ্বারা গোতমের পূর্ববর্তী “তত্ত্ব”ই বুঝিতে হইবে। মনুস্মৃতিতে আছে,—

১। চক্ষুঃপ্রভৃতির উভয়তঃ তত্ত্বযুক্তি অধ্যায়ে ৩২ প্রকার তত্ত্বযুক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম “অনুভব”। “পরমতমপ্রতিবিন্দনবৃত্তঃ ভবতি যথান্যো তদ্ব্যং সমুদ্রস্য ইতি”।—হুফ্রত। কোটীসৌর অর্থশাস্ত্রের শেষেও ঐরূপ তত্ত্বযুক্তিগুলির উল্লেখ দেখা যায়।



“একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহবানি পূর্বে মনীষিণঃ । একাদশং মনো জ্ঞেয়ম্” । (২অঃ—৮৯।২২ ।) এখানে কর্ষেন্দ্রিয়গুলিকে ধরিয়া মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে । এবং ইহা যে অতি পূর্ববর্তী মত, ইহাও বলা হইয়াছে । “তত্ত্ব” বলিতে কোন দর্শনশাস্ত্র ধরিলেও সাংখ্য-হুত্রে আছে,— “উভয়ায়কং মনঃ” । প্রচলিত সাংখ্যহুত্র কপিল-প্রণীত নহে, এই মত প্রবল হইলেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে কপিল-তত্ত্ব-সম্মত, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই । সাংখ্যের প্রামাণিক গ্রন্থ ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকাতেও পূর্বোক্ত সাংখ্যহুত্রের স্তায় “উভয়ায়কমত্র মনঃ” (২৭) এইরূপ কথাই রহিয়াছে । পূর্বে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ষেন্দ্রিয়ার উল্লেখ করিয়া শেষে বলা হইয়াছে,— “মন উভয়ায়ক” । অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ষেন্দ্রিয়ও বটে । মহর্ষি গোতম কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ারই উল্লেখ করিয়াছেন । “বাক্,” “পাণি,” “পাদ,” “পায়ু,” “উপহু” এই পাঁচটি ( বাহ্যিক কর্ষেন্দ্রিয় নামে শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে ) তিনি বলেন নাই । ভাষ্যকার বেরূপ “তত্ত্বযুক্তির” কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল কর্ষেন্দ্রিয়ও গোতমের অঙ্গমত, ইহা বলিতে হয় । কারণ, গোতম মুনী ঐ মতের খণ্ডনও করেন নাই । আমার মনে হয়, ভাষ্যকার যে “তত্ত্বযুক্তি”র কথা বলিয়াছেন, উহাই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গোতমসম্মতি বিষয়ে তাঁহার মূখ্য যুক্তি নহে । এ জন্ত তিনি “তত্ত্বাস্তব-সমাচারাচ্চ” এই স্থানে “চ” শব্দের দ্বারা ঐ যুক্তির অপ্রাধান্য হুচনা করিয়া গিয়াছেন । অর্থাৎ গোতম মুনী যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ারই উল্লেখ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রান্তরোক্ত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মতকে খণ্ডন করেন নাই, মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, তখন তাহাতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গোতম মত বলিয়া বুঝা যায় । ফলতঃ ইহাই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে গোতম-সম্মতি নির্ণয়ে একমাত্র অথবা মূখ্য যুক্তি নহে । তাহা হইলে যে শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মত কথিত আছে, তাহাতে “বাক্,” “পাণি” প্রভৃতি পূর্বোক্ত পাঁচটিকেও কর্ষেন্দ্রিয় বলিয়া বলা হইয়াছে, সেগুলিকেও গোতমের অঙ্গমত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । যদি তাহা স্বীকৃতই হয়, তবে ভাষ্যকার প্রকৃতি মনের ইন্দ্রিয়ত্বের স্তায় সেগুলির ইন্দ্রিয়ত্ব বলেন নাই কেন ? কোন স্তায়োচাৰ্য্যই ত তাহা বলেন নাই । বস্তুতঃ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি-হুত্রেই হুচিত হইয়াছে । মহর্ষি গোতম মানস প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর বলেন নাই কেন ? মন যখন ইন্দ্রিয় নহে অর্থাৎ তিনি যখন ইন্দ্রিয়ার মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, তখন তাঁহার মতে মানস প্রত্যক্ষকে “ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবোধোৎপন্ন জ্ঞান” বলা যায় না, স্ততরাং মানস প্রত্যক্ষের একটি পৃথক্ লক্ষণ তাঁহার বলা উচিত ছিল । এই পূর্বপক্ষের সমাধানের জন্তই ভাষ্যকার মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গোতমের মত, ইহা বুঝাইয়াছেন । সেখানে বলিতে পারি যে, মহর্ষি যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবোধোৎপন্ন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়াছেন এবং মানস প্রত্যক্ষের আর কোন পৃথক্ লক্ষণ বলেন নাই, তখন মহর্ষির এই হুত্রের দ্বারা ইহা মনও যে তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়, ইহা হুচিত হইয়াছে এবং ঐরূপে উহা বুঝা গিয়াছে । হুত্রে এই ভাবে হুচনা থাকে । তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্বযুক্তি”র কথাটাও শেষে সৌগভাবে বলা যায় । ভাষ্যকার নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে আর সেটুকু বলিতে পারেন, তাহা এখানে বলিতে হাড়িবেন কেন ? মনে হয়, সেই ভাবেই ভাষ্যকার এখানে “তত্ত্বযুক্তি”র কথাটাও শেষে বলিয়াছেন । “তত্ত্বযুক্তি”র



কথাটা মুখ্যরূপে বলিলে অর্থাৎ তত্ত্ববৃত্তির দ্বারাই যদি সর্বত্র গ্রহণকারের মত নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে গোল উপস্থিত হইবে। তাৎপর্য্যটাকাবার প্রভৃতি কেহই এখানে সে সব কথাই কোনই অবতারণা করেন নাই। এবং ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্ব-বৃত্তি” অল্পসারে শাস্ত্রাস্তরোক্ত অন্তরাত্ম মতকেও গোতমের মতের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করেন নাই। সুদীর্ঘ এখানে এ সকল কথার চিন্তা করিবেন। অবশ্য শাস্ত্রাস্তরোক্ত বিভিন্ন মতের অনেকগুলিকেই ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্ববৃত্তি” অল্পসারে গোতমের মতত বলিয়া গ্রহণ করা বাইবে। জায়হুজ অনেক প্রাচীন মতেরই বিরুদ্ধ নহে, ইহা আমরা ভিন্ন স্থানে আলোচনা করিব।

মূল কথা, ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায়, তিনি মনের ইন্দ্রিয়কে সর্বতঃসিদ্ধান্তই বলিতেন। তাহা “ইন্দ্রিয়ত্ব বৈ” এখানে “বৈ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “ইন্দ্রিয়ত্ব বৈ” ইহার ব্যাখ্যা “ইন্দ্রিয়ত্বৈব”। উপনিষদে এবং ঋষিহৃত্রে বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনের বিশেষ প্রদর্শনের জন্যই মনের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ মনের ইন্দ্রিয়ই শ্রুতিমূলক স্মৃতি-প্রমাণসিদ্ধ। উহাতে কাহারও বিবাদ হইতে পারে না—বিবাদ করিলে তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবাদ হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের চরম কথার চরম তাৎপর্য্য। ইহাই ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্ববৃত্তি”র গূঢ় তাৎপর্য্য।

পরবর্তী কালে “বেদান্তপরিভাষা”কার ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র মনের ইন্দ্রিয়কে বিবাদ করিয়াছেন—তিনি উপনিষদে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ দেখাইয়া শেষে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ইন্দ্রিয়ানিবরণে কিন্তু (২ অঃ, ৪ পাদ, ১৭ হুক্ত) মনের ইন্দ্রিয়ত্বের কথা পাওয়া যায়। সেখানে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনের ইন্দ্রিয়ক বিষয়ে পূর্বোক্ত স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক মনকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমহাচম্পতি মিশ্রও সেখানে “ভানতী”তে মনের ইন্দ্রিয়ক বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক শাস্ত্রে অনেক স্থলে যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ আছে, তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের দ্বারাই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। গীতার ভগবদ্‌বাচ্যও রহিয়াছে—“ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চানি”। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন, এ কথা বলিলে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্টই প্রকটিত হয়। বেদান্তপরিভাষাকার গীতার “মনঃ যষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” এই কথাটির উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজ মতের বিরোধ ভঙ্গন করিতে দিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত “ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চানি” এই কথাটির কোন উল্লেখ করেন নাই; কেন করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। কোন আধুনিক টাকাকার “ইন্দ্রিয়াণাং” এই স্থলে সৎকে বঞ্জীর ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ “ইন্দ্রিয়ের সৎকে আমি মন” ইহাই ঐ ভগবদ্‌ব্যাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহণকারের মত রক্ষা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা যে ঐ স্থলে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, ইহা সুদীর্ঘ অবশ্য বুঝিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্করও সেখানে ঐ ভাবের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শারীরকভাবে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এখানে অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাইবেন কেন? বেদান্ত-পরিভাষাকার এই সকল দেখিয়াও বেদান্তগ্রন্থে—শঙ্করের মতসমর্থক গ্রন্থে মনের ইন্দ্রিয়ত্ববাদ খণ্ডনে এত বদ্ধপরিষ্কার হইরাছিলেন কেন, ইহা চিন্তনীয়। ভগবান্ শঙ্কর শ্রুতিমূলক স্মৃতির মতানুসারে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মানিয়া লইয়া উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, আর ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাহা



মানিলেন না, নূতন মতের সৃষ্টি করিলেন, ইহা তাঁহার প্রৌঢ়বাদ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে, স্বাধীপনের ইহা চিন্তা করা উচিত।

ভাষ্যকার বে "তত্ত্বযুক্তি"র কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভাষ্যকারের প্রতিবাদী বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিগ্‌নাগ তাঁহার "প্রমাণনমুদ্রয়" গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—

"ন সুখাদিপ্রমেরং বা মনো বাহন্তীন্দ্রিয়াস্তরম্।

অনিবেদ্যপ্যস্তক্ষেদন্তেন্দ্রিয়রতং বুধা ॥"

দিগ্‌নাগের কথা এই যে, যদি গোতম মনি মনের ইন্দ্রিয়ের নিষেধ না করাতেই উহা তাঁহার মত বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তিনি বে জ্ঞাপাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা না বলিলেও চলিত, তাহা বলিলেন না এবং নিষেধও করিলেন না, এইরূপ করিলেই ত মনের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান জ্ঞান প্রভৃতি পাঁচটিরও ইন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার মত বলিয়া বুঝা যাইত। বে কোনরূপে নিজের মত জ্ঞাপনই ত তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা যদি ঐ রূপেই হইয়া যায়, তাহা হইলে আর জ্ঞাপাদি পাঁচটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা কেন? দিগ্‌নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন যে, দিগ্‌নাগ ভাষ্যকারোক্ত "তত্ত্বযুক্তি" না বুঝিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন। যেখানে নিজের মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেখানে পরের কোন একটি মত যদি ঐ মতের অবিরুদ্ধ হয় এবং গ্রহণকার কৰ্ত্ত্বক খণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে সেখানেই ঐ পরের মতটি অল্পমত হয়। ইহাই ভাষ্যকারোক্ত "তত্ত্বযুক্তি"। গোতম মনি যদি ইন্দ্রিয়ের কথা একেবারেই না বলিতেন, তাহা হইলে এই "তত্ত্বযুক্তি"র কোন স্থলই হইত না। যেখানে নিজের কোন মতই নাই, সেখানে "পরের মত—অল্পমত হইয়াছে" এ কথা বলা যায় না। কোন বিষয়ে একেবারে নীরব থাকিলে তদ্বিষয়ে কোনটি নিজ মত, আর কোনটি পর-মত, তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? সুতরাং নিজের মতটি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজ মত ও পর-মত বুঝিয়া তত্ত্বযুক্তির কথা বুঝা যাইতে পারে। উদ্যোতকর এই ভাবে দিগ্‌নাগের প্রতিবাদ করিয়া শেষে দিগ্‌নাগের প্রত্যক লক্ষণ বিশেষ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে জৈমিনির এবং বার্ষগণ্যের প্রত্যক লক্ষণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যক-সুত্রভাষ্য-বাস্তবিক সমাপ্ত করিয়াছেন। স্বাধীপন স্তারবার্ত্তিকে সে সকল কথা দেখিতে পাইবেন।

ভাষ্যকারের তত্ত্বযুক্তির কথা পূর্বে বাহা বলিয়াছি, তাহাতে দিগ্‌নাগের আপত্তি গ্রাহ্যই হয় না। কারণ, ভাষ্যকারের "তত্ত্বযুক্তি" বুঝা যুক্তি নহে। পরন্তু মর্ধ্বি ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ উল্লেখ না করিলে তাঁহার মতে মুমুক্শু ছাদশ প্রকার "প্রমের"র মধ্যে "ইন্দ্রিয়" একপ্রকার "প্রমের", ইহা বলা হয় না। তন্মধ্যে মন আবার বহিরিন্দ্রিয় হইতে বিশেষরূপে "প্রমের," এই জন্ত মনের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই জন্তই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, প্রমের-মধ্যে মনের পৃথক্ উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়াও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। স্বাধীপন ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ৪।



## সূত্র । অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্বব- চ্ছেদবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ । ৫ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরে ( অনুমান নিরূপণ করিতেছি ) । “তৎপূর্বকং” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষমূলক জ্ঞান—অনুমান-প্রমাণ । ( তাহা ) ত্রিবিধ । (১) “পূর্ববৎ,” (২) “শেষবৎ,” (৩) “সামান্যতো দৃষ্ট” ।

টিয়নী । প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষবিশেষমূলক এক প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে বলে “অনুমিতি” । আবার ইহাকে “অনুমান”ও বলা হয় । “অনু” পূর্বক “না” ধাতুর উত্তর ভাব অর্থে “অনট্” প্রত্যয় যোগে “অনুমান” শব্দটি সিদ্ধ হইলে “অনুমান” বলিতে অনুমিতিই বুঝা যায় । ঐরূপে অনুমিতি অর্থে “অনুমান” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । কিন্তু প্রমাণের বিভাগানুসারে এই সূত্রে যখন অনুমান-প্রমাণের লক্ষণই নহিবার বক্তব্য, তখন এই সূত্রে “অনুমান” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে অনুমান-প্রমাণ । এই অর্থে “অনুমান” শব্দটি “অনু” পূর্বক “না” ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনট্ প্রত্যয়-সিদ্ধ । অর্থাৎ বাহা বার্থ অনুমিতির করণ, তাহাই অনুমান-প্রমাণ । পূর্বোক্ত অনুমিতির জ্ঞান তাহাও প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞান । সে বিরূপ জ্ঞান, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে ।

অনুমান নামেই ছোট পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান আবশ্যক । একটি পদার্থ ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত, আর একটি পদার্থ তাহার ব্যাপক । ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত বলিলে বুঝা যায়—বাহাকে কেহ ব্যাপিয়া থাকে । ব্যাপিয়া থাকে বলিলে বুঝা যায়, সেই পদার্থটির সমস্ত আধারেই সম্বন্ধ যুক্ত থাকে । ব্যাপক বলিলে বুঝা যায়, যে পদার্থটি ব্যাপিয়া থাকে । অর্থাৎ কোন পদার্থের সমস্ত আধারেই বাহ্যার সম্বন্ধ আছে । যেমন বিশিষ্ট ধূম ব্যাপ্য, বহি তাহার ব্যাপক । বহি বিশিষ্ট ধূমকে ব্যাপিয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সকল স্থানেই বহি থাকে,—বহিশূন্য কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধূম থাকে না, থাকিতেই পারে না ; কারণ, বহি ধূমের কারণ, বহি ব্যতীত ধূম জন্মিতেই পারে না । তাহা হইলে বিশিষ্ট ধূমের সকল আধারেই বহির সম্বন্ধ থাকে বলিয়া বিশিষ্ট ধূমকে বহির ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত বলা যায় । এবং বহিকে বিশিষ্ট ধূমের ব্যাপক বলা যায় । বিশিষ্ট ধূমে বহির ঐরূপ সম্বন্ধকে “ব্যাপ্তি” বলা হইয়াছে । সর্বত্র সম্বন্ধের নামই ত “ব্যাপ্তি” । এই অর্থে প্রচলিত ভাষাতেও “ব্যাপ্তি” শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে । উহা নব্য নৈয়ায়িকদিগের আবিষ্কৃত কোন নূতন শব্দ নহে । নব্য নৈয়ায়িকগণ ঐ ব্যাপ্তি পদার্থের স্বরূপ বর্ণনায় সর্কীপেক্ষা সমন্বিত পরিশ্রম করিয়াছেন মাত্র । অনুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্ভারাই এই ব্যাপ্তি পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ( ২ অং,—৫ সূত্র দ্রষ্টব্য ) । মূল কথা, অনুমান নামেই পূর্বোক্ত ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবরূপ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান আবশ্যক । ঐ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান হইলে যেখানে ব্যাপক পদার্থটি প্রত্যক্ষ হইতেছে না, কিন্তু তাহার ব্যাপ্য পদার্থটির প্রত্যক্ষ বা অন্তরূপ জ্ঞান হইল, সেখানে ঐ ব্যাপ্য পদার্থের



জ্ঞানবিশেষ প্রযুক্ত তাহার ব্যাপক পদার্থটির যে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাই অহুমিতি। ব্যাপ্য পদার্থটিই অনুমানে হেতু-পদার্থরূপে গ্রহীত হয়; এ জন্ত ব্যাপ্য পদার্থকে “লিঙ্গ” বলে, ব্যাপক পদার্থটিকে “লিঙ্গী” বলে। “লিঙ্গ” ও “লিঙ্গী”র সম্বন্ধ বলিতে পূর্বোক্ত ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সদৃশ। কোন স্থানে বিশিষ্ট ধুম দেখিলেই এই স্থানে বহি আছে, এইরূপ জ্ঞান অনেকেরই হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আবার ধুমবিশেষ দেখিয়া অথবা শব্দবিশেষ শুনিয়া রেল বা ষ্টামারের শীঘ্র আগমনের অনুমান করিয়া অনেকেই আশঙ্ক ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন এমন হয়? দূর হইতে বৃকের স্পন্দন দেখিয়া অথবা কাহাঃ ও শব্দধ্বনি শুনিয়া রেল বা ষ্টামারের শীঘ্র আগমনের নিশ্চয় করিয়া কোন বিজ্ঞ লোক আশঙ্ক হন না কেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ স্থলে অনুমের ধর্মের ব্যাপ্য পদার্থটির জ্ঞান হয় নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্যাপ্য পদার্থের জ্ঞান-প্রযুক্তই তাহার ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাহাকেই বলে অহুমিতি। আরও বলিতে হইবে, সকল পদার্থই সকল পদার্থের ব্যাপ্য নহে, অর্থাৎ যে কোন পদার্থই যে কোন পদার্থের ব্যাপ্য হয় না এবং কোন পদার্থ কাহার ব্যাপ্য, তাহা না বুঝিলেও অহুমিতি হয় না। অহুমিতি মাত্রেরি লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতুর ও সাধ্য ধর্মের) ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক। বিশিষ্ট ধুম বহির ব্যাপ্য, অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধুম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি থাকে, ইহা বাহারা বুঝিয়াছেন, ঠাণ্ডাদিগের ঐ বিষয়ে একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কোন স্থানে বিশিষ্ট ধুম দেখিলে বা অজ্ঞ প্রমোদের দ্বারা জানিলে সামান্যতঃ বিশিষ্ট ধুমমাত্রেরি ঠাণ্ডাদিগের পূর্বজ্ঞাত যে বহিব্যাপ্যতা বা বহির ব্যাপ্তি, তাহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধুম থাকিলেই সেখানে বহি থাকিবে, ইহা ঠাণ্ডাদিগের মনে পড়ে। তাহার পরে “এই স্থান বহিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধুমযুক্ত,” এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপ জ্ঞানকেই “লিঙ্গ-পরামর্শ” বলা হইয়াছে। ইহার পরেই “এই স্থান বহিযুক্ত” এইরূপ জ্ঞান জন্মে। এইরূপ জ্ঞানই অহুমিতি। পূর্বোক্ত “লিঙ্গপরামর্শ” এই অহুমিতির চরম কারণ, এ জন্ত উদ্যোতকর উহাকেই মুখ্য অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। স্বত্বকার ও ভাষ্যকারের কথাতেও উহা অনুমান-প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায়। অনুমানের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মতভেদ থাকিলেও উদ্যোতকর সেগুলির উল্লেখ করিয়া<sup>১</sup> বলিয়াছেন যে, লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তি স্মরণ এবং চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শ, ইহারা সকলেই অনুমান-প্রমাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শই প্রধান। অনেক স্থলে ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনগণ এই প্রধান প্রমাণকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন—(তৃতীয় স্বত্ব-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

১। “বহুত পক্ষাঃ সর্ববস্থানদহুনিঃসৃত্যস্বীয়কথাং প্রদানোপসর্জনভাববিচারঃ লিঙ্গপরামর্শ ইতি ভাষ্যঃ, কঃ পুনরত্র ভাষ্যঃ? আনুভব্যা প্রতিপত্তিঃ সম্মুখলিঙ্গপরামর্শানুভবঃ শেয়ার্ণপ্রতিপত্তিরিতি তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শে ভাষ্য ইতি শ্রুতির্ন প্রধানম্” ইত্যাদি।—(জাহাঙ্গিরিক, ৫ পৃ. ১।)



ভট্ট কুমারিল ধর্ম, ধর্মজ্ঞান এবং বহি ধর্মের পূর্বোক্ত সঙ্কল্পের স্মরণকে অনুমান-প্রমাণ বলিয়া কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ কুমারিলও একটিনাক্ষকে অনুমান-প্রমাণ বলেন নাই; সুতরাং তাহার মতেও অনুমান-প্রমাণের মুখ্য গোপ ভাব আছে বলিয়াই বুঝিতে হয়। নব্য নৈয়ায়িক একমাত্র ব্যাপ্তিজ্ঞানবিশেষকেই অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। লিঙ্গপরামর্শ তাহার ব্যাপার। লিঙ্গপরামর্শের পরেই অনুমিতি জন্মে; সুতরাং উহা কোন ব্যাপার দ্বারা অনুমিতি জন্মায় না; এ জন্ত অনুমিতির করণ না হওয়ার অনুমান-প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই তাহাদিগের যুক্তি। এ বিষয়ে প্রাচীন মতের যুক্তি (তৃতীয় স্তরে) পূর্বোক্তই বলা হইয়াছে। নব্য ভাষ্যের মূল আচার্য্য গঙ্গেশ কিন্তু “লিঙ্গপরামর্শ” শব্দের দ্বারা অনুমান-প্রমাণের নির্দেশ করিয়াছেন। গঙ্গেশ বহু স্থলেই উদ্যোতকরের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুমানস্ববিধে তাহার মত ও সমর্থন থাকিলেও উদ্যোতকরের মতামুসারে তিনিও “লিঙ্গপরামর্শ”কে প্রধান অনুমান-প্রমাণ বলিতে পারেন। টীকাকারগণ তাহা না বলিলেও গঙ্গেশ প্রথমে “লিঙ্গপরামর্শ”শব্দের দ্বারা অনুমান-প্রমাণের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন কেন? ইহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। পরবর্তী প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “হেতু”কে অনুমান-প্রমাণ বলিলেও ফলতঃ তাহার মতেও পূর্বোক্ত প্রকার “লিঙ্গপরামর্শ”ও অনুমান-প্রমাণ বলিতে হইবে। কারণ, “হেতু” থাকিলেই অনুমিতি জন্মে না। বিশিষ্ট ধর্ম পর্যন্ত থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহাকে বহির ব্যাপ্য বলিয়া জানে না, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্ম থাকিলেই সেখানে বহি থাকিবেই, ইহা যাহার জ্ঞান নাই এবং বহির ব্যাপ্যবিশিষ্ট ধর্ম পর্যন্ত আছে, ইহা যে ব্যক্তি জানিতে পারে নাই, তাহার পর্যন্ত বহির অনুমিতি জন্মে না, এ জন্ত ঐরূপে জ্ঞায়মান বিশিষ্ট ধর্মকেই উদয়ন ঐ স্থলে অনুমিতির করণ বলিয়া অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু চরম কারণকে “করণ” বলিলে ঐ স্থলে যে জ্ঞানটির পরেই অনুমিতি জন্মে, সেই “লিঙ্গপরামর্শ”নামক জ্ঞানকেও অনুমান-প্রমাণ বলিতে হয়। বস্তুতঃ উদয়ন তাহাও বলিতেন। “লিঙ্গপরামর্শের” বিষয় “লিঙ্গ”কে অনুমান-প্রমাণ বলিলে ঐ “লিঙ্গপরামর্শ”কেও ফলতঃ অনুমান-প্রমাণ বলা হয়। উদয়নের “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি”র টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও অনুমানরূপ “জ্ঞান”কে “লিঙ্গপরামর্শ” স্বরূপ বলিয়াছেন। “অর্কিকরকা”কার বরদরাজও লিখিয়াছেন,— “লিঙ্গপরামর্শোহনুমাননিত্যাচার্য্যঃ”। সেখানে প্রখ্যাতনামা টীকাকার মল্লিনাথও লিখিয়াছেন যে, প্রকারান্তরে উদয়নাচার্য্যও “লিঙ্গপরামর্শ”কে অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যেখানে অতীত অথবা ভাবী হেতুর জ্ঞানপূর্বক অনুমিতি জন্মে, সেখানে ঐ হেতুকে অনুমিতির করণ বলা যায় না। যাহা কারণের পূর্বে থাকে না, তাহা কারণই হইতে পারে না। অতীত এবং ভাবী পদার্থ যে কারণই হইতে পারে না, এ কথা উদয়নও তাৎপর্য্যপরিণুক্তিতে অস্ত্র প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন। সুতরাং অতীত ও ভাবী পদার্থ হেতু হইলে সেখানে উদয়নও “লিঙ্গপরামর্শ”কে অথবা তৎপূর্বজ্ঞাত “ব্যাপ্তিস্মরণ”কে অনুমান-প্রমাণ বলিতেন। তাহা হইলে নব্য নৈয়ায়িকগণ যে অতীত ও ভাবী

১। “ধ্বনতঃ জ্ঞানসম্বন্ধস্থিতিপ্রাপ্যাকল্পনে।”—(সৌক্যবৃত্তিক, অনুমান-পরিচ্ছেদ, ১২।)

২। “তৎকরণবস্তুনাং ওচত লিঙ্গপরামর্শো ন তু পরাবৃত্তমানঃ লিঙ্গমিতি বস্তুতে।”—(অনুমানটিলাকা, ১২ পৃঃ।)



হেতুরূপে হেতু পূর্বে না থাকায় অহুমিতির করণ অর্গাৎ অহুমান-প্রমাণ হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া উদয়নের মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দোষও থাকে না। কারণ, উদয়ন সর্বত্র হেতুকেই অহুমান-প্রমাণ বলেন নাই। তবে সাধ্যসাধন হেতুপদার্থ অসিদ্ধ হইলে—যথার্থ অহুমিতির সম্ভাবনাই নাই, প্রকৃত হেতুই—অহুমানকারীর অহুমান-কার্য্যে মূল অবলম্বন, এই অভিপ্রায়ে হেতুকে প্রধানরূপে বিবক্ষা করিয়া তিনি প্রধানতঃ জ্ঞায়মান হেতুকে অহুমান-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীনগণও ঐ অভিপ্রায়েই অহুমান-প্রমাণ অর্থে কোন কোন স্থলে “হেতু” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞায়মান হেতুই অহুমান-প্রমাণ, এই মতটি জৈন ভ্রাতৃ-দ্বয়েও দেখা যায়। জৈন ভ্রাতৃদের “শ্লোকবার্ত্তিক” গ্রন্থে আছে,—“সাধনাং সাধ্যবিজ্ঞানমহুমানং বিজ্ঞানমুদাঃ”। সেখানে ভ্রাতৃদ্বয়পিকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জ্ঞায়মান হেতু হইতে সাধ্যের জ্ঞানই অহুমিতি। অর্গাৎ জ্ঞায়মান হেতুকেই তাঁহারা অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং নৈয়ারিকগণ যে “লিপ্যপরাংশ”কে অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা ভ্রম-কল্পিত, এ কথাও বলিয়াছেন। এই মতাবলম্বিগণ বাহ্যই বলুন, পূর্বোক্ত প্রকার “লিপ্যপরাংশ” না হইলে যখন কোনমতেই অহুমিতি হয় না এবং উহাই অহুমিতির চরম কারণ—প্রধান কারণ এবং হেতু পদার্থ অতীত অথবা ভাবী হইলেও ঐ লিপ্যপরাংশের দ্বারাই যখন অহুমিতি জন্মে, তখন ঐ প্রধান কারণ “লিপ্যপরাংশ”কে প্রধান অহুমান-প্রমাণ বলিতেই হইবে। উহার পূর্বজাত লিপ্যলিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন প্রভৃতিতেও অহুমান-প্রমাণ বলিতে হইবে। মহর্ষি-সূত্র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও তাহাই পাওয়া যায়। উদ্যোতকরও তাহাই মীমাংসা করিয়াছেন। তবে বাহ্যের চরম কারণকে করণই বলেন না, সেই নব্য মতে লিপ্যপরাংশ অহুমান-প্রমাণ হইবে না। তাঁহারিগণের মতে ঐ পরামর্শের জনক তৎপূর্বজাত ব্যাপ্তিজ্ঞানই অহুমান-প্রমাণ।

অহুমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে যেমন বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তরূপ অহুমান-প্রমাণের প্রমের বিষয়েও ততোহধিক মতভেদ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নৈয়ারিক দিও নাগ তাঁহার “প্রমাণসমুচ্চর” গ্রন্থে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মাকেই অহুমের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্গাৎ পর্বতে বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেখিয়া যেখানে অহুমিতি হয়, সেখানে কোন সম্ভাব্য বলিতেন যে, পর্বতে বহিরূপ ধর্ম্মান্তরের অহুমিতি হয়; কোন সম্ভাব্য বলিতেন, পর্বতরূপ ধর্ম্মী এবং বহিরূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধের অহুমিতি হয়। দিও নাগ এই মতদ্বয় খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ স্থলে বহিরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট পর্বতরূপ ধর্ম্মারই অহুমিতি হয়। পর্বতরূপ ধর্ম্মী এবং বহিরূপ

১। কেচিদ্ধর্ম্মান্তরং মেহং লিপ্যস্তাব্যভিচারতঃ।

সম্বন্ধঃ তে চিদ্ধিহস্তি সিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মণোঃ।

লিঙ্গং ধর্ম্মে প্রসিদ্ধকোং তিসম্বৎ তেন দীযতে।

অথ ধর্ম্মিণি তস্মৈব কিমর্থং নানুমেয়তা।

সম্বন্ধেপি যদ্বং নাস্তি বজী শ্রুয়েত তথতি।

অবাত্যোহনুগৃহীতদ্বার চাসৌ লিপ্যপংগতঃ।



ধর্ম পূর্বসিদ্ধ পদার্থ হইলেও বহিঃবিশিষ্ট পূর্বত পূর্বের অসিদ্ধ থাকায় অনুমান-প্রমাণের দ্বারা তাহাই সিদ্ধ করা হয়। বাহ্য সিদ্ধ, তাহা সাধ্য হইতে পারে না। ধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মী অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য হইতে পারে। ভট্ট কুমারিলও শ্লোকবর্তিকের এই বিষয়ে বহু মতের উল্লেখ ও বণ্ডন করিয়া শেষে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকেই অনুমের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন<sup>১</sup>।

দিগ্‌নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর “স্বায়বর্তিক” বহু বিচারপূর্বক দিগ্‌নাগের মত এবং অজ্ঞাত মতের প্রতিবাদ করিয়া গতান্তর নাই বলিয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হেতুকে সাধ্যধর্ম-বিশিষ্ট বলিয়াই অনুমিতি হয়। অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট ধর্ম দেখিয়া যেখানে বহির অনুমিতি হয়, সেখানে “এই ধর্মবিশেষ বহিঃবিশিষ্ট” এইরূপই অনুমিতি হয়। ভট্ট কুমারিলও শেষে উদ্যোতকরের এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই মতে ধর্মবিশেষই অগ্নি-বিশিষ্ট বলিয়া সাধ্যমান হয় এবং ধর্মরূপ সামান্য ধর্মই হেতু হয়, এই কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন (৩৬ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন যে, সাধ্য দ্বিবিধ—(১) ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম এবং (২) ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী। এবং তৃতীয় সূত্রভাষ্যে লিঙ্গী অর্গের অনুমান হয়, এই কথা বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারোক্ত লিঙ্গীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—হেতুবিশিষ্ট ধর্মী। ভাষ্যকার কিন্তু এই সূত্রভাষ্যে সাধ্য ধর্ম অর্থেই “লিঙ্গিন্” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাণ্য হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। ঐ লিঙ্গটি যাহার সাধন হইয়া যাহার “লিঙ্গ” হয়, তাহাকে “লিঙ্গী” বলা যায়। এই “লিঙ্গ” ও “লিঙ্গী”র সম্বন্ধ বলিতে হেতু ও সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব গদ্যক। যাহার সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকেই অনুমের বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে হেতু পদার্থটি অনুমের পদার্থের ব্যাপ্য হয় না। যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধর্ম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহিঃ থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত স্থানেই বহিঃবিশিষ্ট পূর্বত থাকে না, স্তত্রাং বিশিষ্ট ধর্ম বহিঃবিশিষ্ট পূর্বতের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বিশিষ্ট ধর্ম দেখিয়া বহিঃবিশিষ্ট পূর্বতের অনুমিতি হইতে পারে না। পূর্বোক্ত বাদিগণ বিশিষ্ট ধর্ম ও বহির ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-গদ্যক-জ্ঞানের ফলেই বহিঃবিশিষ্ট পূর্বতের অনুমিতি হয় বলিয়াছেন। জৈন স্মারদে এই মত পরিস্ফুট দেখা যায়। জৈন স্মারদ-এই “পরীক্ষা-মুখস্থত্রে” আছে—“ব্যাপ্তৌ তু সাধ্যং ধর্ম এব” (৩২ সূত্র)। অর্থাৎ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের সময়ে ধর্মরূপ সাধ্যই আছে। কারণ, ধর্মীরূপ সাধ্যের ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে না। ফলতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয়কালে ধর্মরূপ সাধ্যই যে গ্রাহ্য, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। নব্যগণ বলিয়াছেন যে, যখন সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় বশতঃই অনুমিতি হয়, তখন সাধ্য ধর্মেরই অনুমিতি হয়। হেতুকে যাহার ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিয়া অনুমিতি হয়, সেই পদার্থই অনুমিতির বিষয় এবং পূর্বত

কিঞ্চিৎস্বাভিচার্য্য ধর্মোপাত্তি দৃষ্টান্তে।

তত্র প্রসিদ্ধঃ তদ্ব্যুৎপত্তিঃ ধর্মঃ গম্যবিধাতি ।—প্রমাণদ্রষ্টব্য, ২য় পরিচ্ছেদ।

১। “তদ্ব্যুৎপত্তিঃ ধর্মঃ গম্যবিধাতি ।—প্রমাণদ্রষ্টব্য, ২য় পরিচ্ছেদ।”

দীবাংসামোক্তবর্তিক, অনুমান পরিচ্ছেদ।

২। “বদ্যাপ্যবর্তিকানন্তরবস্তুমিতি তবৎ এতৎ বিধেয়তাব্যবহার্য্যকারণং”—(পক্ষতাবিচারে প্রামাণ্য)।



বহির্কে অহুমান করিতেছি, এইরূপই শেষে মানন অহুভব হওয়ার পর্তত ধর্ম্মীতে বহির্কপ ধর্ম্মই অহুনের, স্ততরাং উহাই সাধ্য। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেও “সাধ্য” বলিয়াছেন। কারণ, মহাবি-সূত্রে ঐ অর্থেও “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ আছে। এ সকল কথা যথাস্থানে (অবয়ব প্রকরণে) দ্রষ্টব্য। উদ্যোতকর যে হেতুকেই সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অহুনের বলিয়াছেন অর্থাৎ “এই ধর্ম্মবিশেষ বহির্বুদ্ধ” এইরূপই অহুমিতি হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা কিন্তু সূত্রকার ও ভাষ্যকারের কথায় কোথায়ও পাওয়া যায় না। এবং এই মত লোক-বিরুদ্ধ বলিয়া উদ্যোতকরও আপত্তির উত্থাপন পূর্বক তাহারও সমাধান করিতে গিয়াছেন। বস্ততঃ বিশিষ্ট ধূনের দ্বারা পর্ততাদি স্থানে বহির্কেই অহুমিতি হয়, এই নব্য মতই লোকসিদ্ধ ও অহুভব-সিদ্ধ। অহুমিতির পূর্বক বহি অহুত্র সিদ্ধ হইলেও পর্ততাদি ধর্ম্মীতে অসিদ্ধ থাকায় ঐ সকল স্থানে বহি অহুমানের সাধ্য হইতে পারে, ইহাই নব্য নৈয়ায়িকদিগের কথা। ভাষ্যকারও কএক স্থানে সাধ্যধর্ম্মরূপ লিঙ্গীরই অহুমানের কথা বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ অহুমানের মূল; স্ততরাং প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরেই অহুমান নিরূপণ সংগত। এই সংগতি স্তচনার জন্যই সূত্রে “অথ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। “অহুমান-চিন্তামণি”র প্রারম্ভে উপাধ্যায় গবেশ মহাবি-সূচিত এই সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সেখানে দীর্ঘতিকা-র যথানাথ ও তাহার টীকাকার গদাধর এই সংগতির বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই সংগতি বিষয়ে কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সূত্রে “অহুমানং” এই অংশের দ্বারা লক্ষ্যনির্দেশ হইয়াছে। “তৎপূর্বকং” এই অংশের দ্বারা অহুমান প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। অস্ত্র অংশের দ্বারা অহুমান প্রমাণের বিভাগ করা হইয়াছে।

ভাষ্য। তৎপূর্বকমিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গ-দর্শনকামিসম্বধ্যতে। লিঙ্গলিঙ্গনোঃ সম্বন্ধয়োর্দর্শনেন লিঙ্গস্মৃতিরভি-সম্বধ্যতে। স্মৃত্য লিঙ্গদর্শনে চ প্রত্যক্ষোহর্থোহনুসায়তে।

অনুবাদ। “তৎপূর্বক” এই কথার দ্বারা অর্থাৎ সূত্রস্থ “তৎপূর্বকং” এই কথার আদিশিত “তৎ” শব্দটির দ্বারা “লিঙ্গ” ও “লিঙ্গী”র (হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের) সম্বন্ধ দর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গদর্শন (হেতুর প্রত্যক্ষ) অভিসম্বন্ধ অর্থাৎ সূত্রকারের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত হইয়াছে। সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতু ও সাধ্য-ধর্ম্মের) দর্শনের দ্বারা লিঙ্গস্মৃতি অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া হেতুর স্মরণ অভিসম্বন্ধ (সূত্রকারের অভিপ্রেত) হইয়াছে। স্মৃতির দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত লিঙ্গস্মৃতির দ্বারা এবং লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ “এই হেতু এই সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য” এইরূপে হেতু স্মরণের পরে “এই স্থানে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতু আছে”, এইরূপে



যে তৃতীয় লিঙ্গদৰ্শন হয়, সেই “লিঙ্গপৰামৰ্শ” নামক জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অনুমিত হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। পূৰ্ণসূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতিরও স্বরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূৰ্ণসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমিতিকেও গ্রহণ করা হইতে পারে। যেখানে পূৰ্ণে কোন পদার্থ বলিয়া শেষে “তৎ” শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেখানে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূৰ্ণোক্ত পদার্থ বুঝা যায়। কিন্তু পূৰ্ণোক্ত পদার্থমাত্রই “তৎ” শব্দের বাচ্য নহে। যে পদার্থ বক্তার বুদ্ধিস্ত, “তৎ” শব্দের দ্বারা সেখানে সেই পদার্থকেই বুঝিতে হইবে। কোন পদার্থ বক্তার বুদ্ধিস্ত, তাহাও বুঝিয়া লইতে হইবে। বক্তা মহৰ্ষি পূৰ্ণসূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমিতি মাত্রকেই বলিয়াছেন, কিন্তু অহুমানপ্রমাণ যখন প্রত্যক্ষমাত্রপূৰ্ণক নহে, তখন এই সূত্রে “তৎপূৰ্ণকং” এই কথাটির আদিস্থিত “তৎ” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ সামান্যই গ্রহণ করা যায় না। তাহা সম্ভব নহে বলিয়া মহৰ্ষির এখানে বুদ্ধিস্ত নহে। অহুমান প্রমাণ বেদপ্ৰত্যক্ষপূৰ্ণক হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যক্ষবিশেষকেই মহৰ্ষি এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। যে কোন প্রত্যক্ষপূৰ্ণক জ্ঞানকে অহুমানপ্রমাণ বলিলে শব্দ অবগাদিরূপ প্রত্যক্ষপূৰ্ণক শব্দ বোধ প্রভৃতি জ্ঞান ও অহুমান-প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষ প্রত্যক্ষই মহৰ্ষি এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই বিশেষ প্রত্যক্ষ কি? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সৰ্ব্বদৰ্শনং লিঙ্গদৰ্শনক।” শব্দ বোধ প্রভৃতি জ্ঞান ঐ বিশেষ প্রত্যক্ষপূৰ্ণক নহে, তাই অহুমান নহে। ঐ দুইটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞ যে সংস্কার হয়, তাহাও ঐ প্রত্যক্ষ-বিশেষপূৰ্ণক বলিয়া অহুমান-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাই পূৰ্ণসূত্রে হইতে “জ্ঞানং” এই কথাটির অন্তবৃত্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে (“তৎপূৰ্ণকং জ্ঞানং”)। তৎপূৰ্ণক জ্ঞানই অহুমান প্রমাণ। সংস্কার জ্ঞানপদার্থ নহে; সুতরাং তাহা অহুমান-লক্ষণাক্রান্ত হইল না। অহুমাণক হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। তাহা যে পদার্থের “লিঙ্গ”, সেই সাধ্যবস্তুটিকে “লিঙ্গী” বলে। যেমন বহি “লিঙ্গী”, বিশিষ্ট ধুম তাহার “লিঙ্গ”। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যবস্তুের যে ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ, তাহাই অহুমানের অঙ্গ; সুতরাং ভাষ্যে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কথার দ্বারা ঐ সম্বন্ধবিশেষই উক্ত হইয়াছে। সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকিয়া সাধ্যশূন্য স্থানে হেতুর অবর্তমানতা বা না থাকাই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিবিশিষ্টকে “ব্যাপ্য” বলে। সেটি তাহার ব্যাপ্য, তাহাকে “ব্যাপক” বলে। যেমন বিশিষ্ট ধুম (লিঙ্গ) “ব্যাপ্য”,—বহি (লিঙ্গী) তাহার “ব্যাপক।” বহিশূন্য কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধুম অর্থাৎ যে ধুম তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে একেবারে বিচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে যায় নাই, তাহা থাকে না, থাকিতেই পারে না; সুতরাং তাহা বহির ব্যাপ্য, বহি তাহার ব্যাপক। বিশিষ্ট ধুম ও বহির এই ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রথমতঃ রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সঙ্গে বিশিষ্ট ধূমের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রথম লিঙ্গদৰ্শন (হেতু প্রত্যক্ষ)। পরে গৰ্জ্জাদি কোন



স্থানে বিশিষ্ট ধুম দর্শন হইলে তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গ-দর্শন। এই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনই ভাষ্যে “লিঙ্গদর্শনক” এই কথার দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। বিশিষ্ট ধুম ও বহির পূর্কোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সদ্বন্ধ দর্শন এবং পূর্কতাদিতে দ্বিতীয় বিশিষ্ট ধুম দর্শন, এই দুইটি প্রত্যক্ষবস্তুঃ শেষে পূর্কতাদিতে ‘বহিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধুমবান্ পূর্কত’ ইত্যাদি প্রকারে পুনরায় লিঙ্গদর্শন হয়, ইহাই তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। এবং ইহাই “তৃতীয় লিঙ্গপরাংশ”, “লিঙ্গপরাংশ” ও “পরাংশ” নামে অভিহিত হয়। ঐ পরাংশ নামক জ্ঞানের পরেই “পূর্কতো বহিমান্” ইত্যাদি প্রকারে পূর্কতাদি স্থানে বহির অধুমিতি হয়; সুতরাং উহাই ঐ অধুমিতির চরম কারণ। প্রাচীন মতে চরম কারণই মুখ্য কারণ-পদার্থ (তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তাই পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে অধুমিতির চরম-কারণ পরাংশকেই মুখ্য “অনুমান প্রমাণ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্তায়বাস্তবিককারের শেষ সিদ্ধান্তও এই। বস্তুতঃ ঐ তৃতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষরূপ পরাংশ নামক জ্ঞান পূর্কোৎপন্ন পূর্কোক্ত প্রত্যক্ষবস্তু-জনিত। সুতরাং উহাই সূত্রোক্ত “তৎপূর্কক জ্ঞান”, তাই সূত্রানুসারেও উহা অনুমানপ্রমাণ হইবে। পূর্কোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সদ্বন্ধ-দর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন, পূর্কোক্ত তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের পূর্কোই বিনষ্ট হয়; সুতরাং সেই প্রত্যক্ষবস্তু ঐ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের কারণ হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন—“লিঙ্গস্বতিরভিসমধাতে।” অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষবস্তু পূর্কো বিনষ্ট হইলেও তজ্জন্ম যে সংস্কার থাকে, তাহাই উৎকৃষ্ট হইয়া তখন “বহিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধুম” ইত্যাদিরূপে লিঙ্গস্বতি জন্মায়। ঐ লিঙ্গস্বতির সাহায্যে ‘বহিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধুমবান্ পূর্কত’ ইত্যাদি প্রকার তৃতীয় লিঙ্গ প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং ঐ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমান প্রমাণ সূত্রোক্ত “তৎপূর্কক জ্ঞান” হইতে পারে অর্থাৎ এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি তাহাকে “তৎপূর্কক জ্ঞান” বলিয়াছেন। কার্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ক, তাই কারণার্থে “পূর্ক” শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাহ্য পরস্পরায় বা অতি পরস্পরায় আবশ্যক, তাহাকেও কারণের কারণ বলিয়া “পূর্ক” বলা হইয়া থাকে। স্তায়বাস্তবিককার বলিয়াছেন যে, ‘তানি পূর্কানি যন্ত’, ‘তে পূর্কো যন্ত’, ‘তৎ পূর্কং যন্ত’—এই ত্রিবিধ বিগ্রহসিদ্ধ “তৎপূর্কক” শব্দের তিন বার আবৃত্তি করিয়া উহার দ্বারা ত্রিবিধ অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে। ‘তানি পূর্কানি যন্ত’ এই বিগ্রহ পক্ষে “তৎ” শব্দের দ্বারা তৃতীয় সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণই গ্রাহ্য। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি পূর্কক যে কোন প্রমাণ জন্ম লিঙ্গ-পরাংশও অনুমান-প্রমাণ, ইহাও “তৎ পূর্কক” শব্দের দ্বারা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অনুমানাদি পূর্কক অনুমান-প্রমাণেও মহর্ষির এই অনুমান-প্রমাণের লক্ষণ অব্যাহত আছে, তবে পরস্পরায় সকল অনুমান-প্রমাণই প্রত্যক্ষপূর্কক, অনুমানের মূলে প্রত্যক্ষ আছেই, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার কেবল প্রত্যক্ষবিশেষপূর্কক জ্ঞান বলিয়াই অনুমান-প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত-বিকৃত হয় নাই। তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “তে পূর্কো যন্ত”; এই বিগ্রহ পক্ষেও “তৎ” শব্দের দ্বারা অনুমানাদিও বুদ্ধিতে হইবে। স্তায়বাস্তবিক “তে যে প্রত্যক্ষে পূর্কো যন্ত” এই বাক্যে প্রত্যক্ষ শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা যে কোনরূপে যথার্থ লিঙ্গপরাংশ হইলেই তাহা যথার্থ অধুমিতি



জন্মাইরা থাকে ; সুতরাং তাহা অনুমান-প্রমাণ । “তৎপূর্বং যত্র” এই বিগ্রহপক্ষে “তৎ” শব্দের দ্বারা ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষ এবং পূর্বোক্ত প্রকার লিঙ্গস্বৃতি এই তিনটিকে এক সঙ্গে ধরিয়া তজ্জনিত লিঙ্গপরামর্শ ই অনুমান-প্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে । ঐ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইলেও উহাদিগের ভেদ বিবক্ষা না করিয়াই “তৎ” শব্দের দ্বারা এক সঙ্গে ঐ তিনটি গ্রহণ করা হইয়াছে ।

ভাষ্য । পূর্ববদिति যত্র কারণেন কার্যমনুমীয়তে যথা মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি স্থিতিরिति । “শেষবৎ” তৎ যত্র কার্যেণ কারণমনুমীয়তে, পূর্বোদকবিপরীতমুদকং নদ্যাঃ পূর্ণত্বং শীত্ৰত্বঞ্চ দৃষ্ট্বা স্রোতসোহনুমীয়তে ভূতা স্থিতিরिति । “সামান্যতো দৃষ্টং” ত্রজ্যাপূর্বকমন্যত্রদৃষ্টস্থান্যত্র দর্শন-মিতি তথা চাদিত্যস্ত, তস্মাদস্ত্যপ্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যস্ত ত্রজ্যোতি ।

অনুবাদ । যে স্থলে ( যে অনুমানস্থলে ) কারণের দ্বারা ( কারণবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা ) কার্য ( সেই কারণের ব্যাপক কার্য ) অনুমিত হইয়া থাকে, সেই অনুমান “পূর্ববৎ” এই নামে কথিত । ( উদাহরণ ) যেমন মেঘের উন্নতি-বিশেষের দ্বারা ( তাহার জ্ঞানের দ্বারা ) স্থিতি হইবে, ইহা অনুমিত হয় । যে স্থলে কার্যের দ্বারা ( কার্যবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা ) কারণ ( সেই কার্যের ব্যাপক কারণ ) অনুমিত হইয়া থাকে, সেই অনুমান “শেষবৎ” । ( উদাহরণ ) যেমন নদীর পূর্ববিস্তৃত জলের বিপরীত জলরূপ পূর্ণতা এবং স্রোতের প্রধরতা-বিশেষ দেখিয়া স্থিতি হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয় । অন্ত্র দৃষ্ট পদার্থের অন্ত্র অর্থাৎ অপর স্থানে দর্শন ত্রজ্যাপূর্বক, অর্থাৎ তাহার গতিপূর্বক হয় ; সূর্যেরও তদ্রূপ, অর্থাৎ এক স্থানে দৃষ্ট সূর্যের স্থানান্তরে দর্শন হয় । অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও অর্থাৎ সূর্যের গতি প্রত্যক্ষ না হইলেও সূর্যের গতি আছে, এই প্রকার অনুমান “সামান্যতো দৃষ্ট” ।

টিপ্পনী । অনুমান-প্রমাণের “পূর্ববৎ” প্রভৃতি সূত্রোক্ত প্রকারত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন । কারণ ও কার্যের মধ্যে কারণটি “পূর্ব”, কার্যটি “শেষ”, তাই “পূর্ব” শব্দ কারণার্থে এবং “শেষ” শব্দ কার্যার্থে প্রযুক্ত হইরা থাকে । “পূর্ববৎ” ও “শেষবৎ” এই দুই স্থলে অন্ত্যর্গে “নত্বপ্” প্রত্যয় বিহিত হইলে “পূর্ব” অর্থাৎ কারণ বাহ্যতে বিবরণরূপে বিদ্যমান এবং “শেষ” অর্থাৎ কার্য বাহ্যতে বিবরণরূপে বিদ্যমান, এইরূপ অর্থ যথাক্রমে ঐ দুইটি শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে । তাহা হইলে “পূর্ববৎ” বলিতে কারণ-বিবরক জ্ঞান এবং “শেষবৎ” বলিতে কার্য-বিবরক জ্ঞান, ইহা বুঝা যায় । কারণহেতুক অনুমান কারণবিবরক জ্ঞানবিশেষ এবং কার্যহেতুক অনুমান কার্যবিবরক জ্ঞানবিশেষ । সুতরাং এ পক্ষে কারণহেতুক অনুমান ও কার্যহেতুক



অনুমানই যথাক্রমে “পূর্ববৎ” ও “শেষবৎ” এই দুইটি নামের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কার্যমাত্রই কারণের অনুমাপক নহে। ধূমমাত্রই বহির কার্য হইলেও যে কোন ধূমজ্ঞানে বহির অনুমান হয় না। কারণ, বহিঃ ধূমমাত্রের ব্যাপক নহে, বিশিষ্ট ধূমেরই ব্যাপক। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও ‘হেতুভাগসামান্যনিকৃতিদ্বয়াদিতি’ গ্রন্থে বিশিষ্ট ধূমকেই বহির অনুমানে “সৎ হেতু” বলিয়াছেন। ফলতঃ কার্যবিশেষই তাহার ব্যাপক কারণের অনুমাপক এবং কারণ-বিশেষই তাহার ব্যাপক কার্যের অনুমাপক। এবং ঐ কার্যবিশেষ এবং কারণ-বিশেষের জ্ঞানের দ্বারাই অনুমিতি হয়। কার্য ও কারণ পদার্থের দ্বারা অনুমিতি হয় না। সুতরাং—“যত্র কারণেন কার্যমনুমীয়াতে” এবং “যত্র কার্যেণ কারণমনুমীয়াতে,” এই ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা সেইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। মেঘের উন্নতি-বিশেষ বুষ্টির কারণ এবং নদীর পূর্ণতা-বিশেষ ও স্রোতের প্রধরতা-বিশেষ বুষ্টির কার্য। ভাষ্যে “পূর্ববদিতি” এই স্থলের “ইতি” শব্দটি নামব্যঞ্জক। যেখানে প্রকৃতসাধ্য ব্যক্তি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন হেতুতেই তাহার ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়-বশতঃ তাহার অনুমিতি হয়—সেই স্থলীয় অনুমানের নাম “সামান্যতো দৃষ্ট।” সূর্যের গতি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং তাহার ব্যাপ্তিনিশ্চয় কোনও পদার্থেই সম্ভব নহে। কিন্তু সামান্যতঃ দেখা যায়, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের অস্ত্র স্থানে দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না। এক স্থানে দৃষ্ট সূর্যের অস্ত্র স্থানে দর্শন হইতেছে, সুতরাং সূর্য্য গতিমান। এইরূপ অনুমান সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়-জন্ম। জ্ঞানবৃত্তিকার ভাষ্যকারের এই অনুমানে দোষ প্রদর্শন করিয়া প্রকারান্তরে অনুমান-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও ইহার পরেই কঠিনরূপে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাষ্য। অথবা পূর্ববদিতি যত্র যথাপূর্বঃ প্রত্যক্ষভূতয়োঃ স্তর-দর্শনেনানন্তরস্তাপ্রত্যক্ষস্যানুমানং, যথা ধূমেনাগ্নিরিতি।

অনুবাদ। অথবা যে স্থলে (যে অনুমান স্থলে) যথাপূর্ব প্রত্যক্ষ ভূতপদার্থ-দ্বয়ের—অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে যে দুইটি পদার্থ যেক্রমে প্রত্যক্ষ বা প্রমাণ-স্তরের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছিল, ব্যাপ্যব্যাপকভাব-সম্বন্ধযুক্ত সেই দুইটি পদার্থের একতর পদার্থ দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ কোন স্থানে সেই পূর্বজ্ঞাত ব্যাপ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থটির সেইরূপে প্রত্যক্ষ বা যে কোন প্রমাণ-জন্ম জ্ঞানের দ্বারা অপপ্রত্যক্ষ (অনুমিতি স্থানে অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত) অপর পদার্থটির অনুমিতি হয় অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে ব্যাপক পদার্থটি যেক্রমে জ্ঞাত হইয়াছিল, সেইরূপে তাহার সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হয়; সেই অনুমান “পূর্ববৎ” এই নামে কথিত। (উদাহরণ) যেমন ধূমের দ্বারা অর্থাৎ রজনশালা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের



সজাতীয় পর্বতাদিগত বিশিষ্ট-ধূমের বিশিষ্ট ধূমরূপে জ্ঞানের দ্বারা অগ্নি ( রন্ধন-শালা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট অগ্নির সজাতীয় পর্বতাদিস্থিত বহি ) অনুমিত হয় ( অর্থাৎ রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকজ্ঞানকালে বহি যে প্রকারে ব্যাপক বলিয়া নির্গত হইয়াছিল, সেই বহির প্রকারেই তাহা পর্বতাদি স্থানে অনুমিত হয় ) ।

টিপ্পনী । “পূর্ববৎ” শব্দটি অন্ত্যর্থে “মতুপ্” প্রত্যয় ও ক্রিয়ারতুল্যতা অর্থে “বতি” প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে । “বতি” প্রত্যয়পক্ষে “পূর্ববৎ” শব্দের অর্থ পূর্বতুল্য । ভাষ্যকার করাস্তরে সূত্রোক্ত “পূর্ববৎ” শব্দের এই অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।—যে স্থলে পূর্বে অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ জ্ঞানকালে হেতু ও সাধ্য বেক্রমে জ্ঞাত হইয়াছিল, সেইরূপে সেই পূর্বজ্ঞাত হেতুর তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের কোন স্থানে সেইরূপে জ্ঞান হইলে সেই পূর্বজ্ঞাত সাধ্যের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের সেইরূপে অনুমিত হয়, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণ পূর্বতুল্য বলিয়া “পূর্ববৎ” নামে কথিত । রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে যে ধূম ও বে বহি দেখিয়া বিশিষ্ট ধূম মাত্রেই বহির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে, পর্বতের ধূম ও বহি সে ধূম ও সেই বহি নহে । কিন্তু বিশিষ্ট ধূমরূপে পর্বতের ধূম সেই পূর্বদৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের তুল্য বা সজাতীয় । এবং বহিরূপে পর্বতের বহি সেই পূর্বদৃষ্ট বহির তুল্য বা সজাতীয় । সুতরাং পর্বতে পূর্বজ্ঞাত বিশিষ্ট ধূমের সজাতীয় বিশিষ্ট ধূমের জ্ঞানবশতঃ যখন পূর্বজ্ঞাত বহির সজাতীয় বহির সেই বহিরূপেই অনুমিত হয়, তখন সেই স্থলের “লিঙ্গপরামর্শ”রূপ অনুমান “পূর্ববৎ” । রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে ধূমদর্শন এবং পর্বতে ধূমদর্শন, একপদার্থবিষয়ক না হইলেও তুল্য বা সজাতীয় পদার্থবিষয়ক ; সুতরাং ঐ উভয় দর্শন-ক্রিয়াতেও তুল্যতা আছে । এ জন্ত পূর্বোক্ত “পরামর্শ”রূপ অনুমানপ্রমাণ ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে “বতি” প্রত্যয়ান্ত “পূর্ববৎ” শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে । ভাষ্যে “যথাপূর্বং প্রত্যকভূতয়োঃ” এই স্থলে তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, “প্রত্যকভূত” কথাটা প্রদর্শন মাত্র । যে কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের এবং অনুমিতির আশ্রয়ে পূর্বজ্ঞাত ব্যাপ্য পদার্থটির সজাতীয় পদার্থের অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞান হইলেও “পূর্ববৎ” অনুমান হইতে পারে । পূর্বে বেক্রমে ব্যাপ্যতা ও ব্যাপকতার জ্ঞান হইয়াছিল, সেইরূপে ব্যাপ্য পদার্থের সাধারণ পদার্থের জ্ঞানবশতঃ সেইরূপে ব্যাপক পদার্থটির সজাতীয় পদার্থের অনুমিত হইলেই “পূর্ববৎ” অনুমান হয় ।

ভাষ্য । শেষবাক্যম পরিশেষঃ, স চ প্রসক্তপ্রতিষেধেহুত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ—যথা “সদনিত্যমিত্যেবমাদিনা দ্রব্যগুণকর্মণা-মবিশেষেণ সামান্যবিশেষনম্বায়েভ্যো নির্ভুক্তস্ত, শব্দস্ত তস্মিন্ দ্রব্যকর্ম-গুণসংশয়ে ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম, শব্দান্তরহেতুত্বাৎ, যন্ত শিষ্যতে সৌহৃদ্যমিতি শব্দস্ত গুণত্বপ্রতিপত্তিঃ ।



অনুবাদ। “পরিশেষ” অহুমানের নাম “শেষবৎ”। সেই “পরিশেষ” বলিতে প্রসক্তের অর্থাৎ যে পদার্থ কোন স্থানে সন্দেহের বিষয় বা আপত্তির বিষয় হয়, এমন পদার্থের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা সে স্থানে তাহার অভাব নিশ্চয় হইলে অতঃপর অপ্রসঙ্গবশতঃ অর্থাৎ যে পদার্থ প্রসক্ত হয় না, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তিবিষয়তা না থাকায়, শিষ্যমাণ পদার্থে অর্থাৎ প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে যেটি অবশিষ্ট থাকে, প্রতিষিদ্ধ হয় না, এমন পদার্থ বিষয়ে “সম্প্রত্যয়”—অর্থাৎ সম্যক প্রতীতির (যথার্থ অনুমিতির) সাধন। (উদাহরণস্থল দেখাইতেছেন) যেমন—সত্তা ও অনিত্য ইত্যাদি প্রকার দ্রব্য, গুণ ও কর্মের অবিশেষ ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্মনামক কণাদসূত্রোক্ত পদার্থত্রয়ের “সদনিত্য” ইত্যাদি কণাদসূত্র (বৈশেষিক দর্শন, ৮ম সূত্র) বর্ণিত সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি সাধারণ ধর্মজ্ঞানের দ্বারা জাতি, বিশেষ ও সমবায় হইতে (কণাদোক্ত জাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য ভাব-পদার্থ হইতে) “নির্ভুক্ত” অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত শব্দের—(শব্দের কি, তাহা বলিতেছেন) তাহাতে অর্থাৎ শব্দে (পূর্বেবাক্ত সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধারণ ধর্মজ্ঞানবশতঃ) দ্রব্যকর্মগুণ সংশয় হইলে অর্থাৎ শব্দ দ্রব্য কি না? কর্ম কি না? গুণ কি না? এইরূপে শব্দে দ্রব্য, কর্ম ও গুণের সংশয় হইলে শব্দ—একদ্রব্য-হেতুক অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য আকাশের ধর্ম বলিয়া দ্রব্য নহে; শব্দ—শব্দান্তরের কারণ-হেতুক অর্থাৎ সজ্জাতীয়ের উৎপাদক বলিয়া কর্ম নহে; বাহ্য কিন্তু অর্থাৎ দ্রব্য, কর্ম ও গুণের মধ্যে যে পদার্থটি অবশিষ্ট থাকিল, এই শব্দ তাহা অর্থাৎ গুণ, এইরূপে (“শেষবৎ” অনুমানের দ্বারা) শব্দের গুণ প্রতিপত্তি অর্থাৎ গুণই সিদ্ধি হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। ‘শিষ্যতে অবশিষ্ট্যতে’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বাহ্য অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ প্রসক্তের মধ্যে যেটি কোন প্রমাণের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হয় না, এমন পদার্থকে “শেষ” বলা যায়। “শেষঃ অস্তি অস্ত অহুমানস্ত প্রতিপাদ্যতয়া” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পূর্বোক্ত “শেষ” পদার্থটি যে অহুমানের প্রতিপাদ্য, তাহাকে “শেষবৎ” অহুমান বলা যায়। ভাষ্যকার এই কল্পে সূত্রোক্ত “শেষবৎ” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই শেষবৎ অহুমানের আর একটি প্রসিদ্ধ নাম “পরিশেষ”। তাই বলিয়াছেন—“শেষবদান পরিশেষঃ”। ঐ “পরিশেষ” কাহাকে বলে, তাহা বুঝিলেই “শেষবৎ” অহুমানকে বুঝা যাইবে। তাই বলিয়াছেন—“ন চ প্রসক্ত-প্রতিষেধে” ইত্যাদি। “পরিশেষ” অহুমানের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া—“যথা সদনিত্যং” ইত্যাদি “নির্ভুক্ত শব্দ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের গুণ-সাধক অহুমানকে তাহার উদাহরণরূপে সূচনা করিয়াছেন। “তস্মিন্ দ্রব্যকর্মগুণসংশয়ে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই গুণ-সাধক “শেষবৎ” অহুমানের প্রণালী



প্রদর্শন পূর্বক ঐ উদাহরণটি বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, মহাবি কণাদ জব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায়, এই যে ছয়টি ভাব-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাহার মতে শব্দ গুণপদার্থ, ইহা “শেষবৎ” অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, মহাবি কণাদ “সদনিত্যং জব্যবৎ কার্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিত্তি জব্যগুণ-কর্মণামবিশেষঃ” (৬ম সূত্র) এই সূত্রটির দ্বারা সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি ধর্মকে জব্য, গুণ ও কর্মের অবিশেষ অর্থাৎ সাধর্ম্য বলিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ ধর্মগুলি জব্য, গুণ ও কর্মপদার্থেই থাকে, জাতি, বিশেষ, সমবায় এই তিন পদার্থে থাকে না। ঐ ধর্মগুলি ঐ জাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্য। সুতরাং ঐ সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি সাধর্ম্যগুলি যে পদার্থে আছে, ইহা যথার্থরূপে বুঝা যাইবে, সে পদার্থে জাতি, বিশেষ ও সমবায়ের প্রসঙ্গই হইবে না, অর্থাৎ ঐ পদার্থটি জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিতই থাকিবে। শব্দ নানাজাতীয় সংপদার্থ, এবং তাহার অনিত্য প্রভৃতিও কণাদের সমর্থিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্বোক্ত সত্তা অনিত্য প্রভৃতি জব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্যগুলি যখন কণাদের মতে শব্দে আছে, তখন শব্দ জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু শব্দে পূর্বোক্ত সত্তা, অনিত্য প্রভৃতি জব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য থাকায়, তাহাতে জব্য, কর্ম ও গুণ “প্রসক্ত” হইতেছে। অর্থাৎ শব্দে পূর্বোক্ত সত্তা, অনিত্য প্রভৃতি জব্য, গুণ ও কর্মের সাধারণধর্মের জ্ঞানবশতঃ শব্দ জব্য কি না? শব্দ কর্ম কি না? শব্দ গুণ কি না? এইরূপে শব্দে জব্য, কর্ম ও গুণের সংশয় হইতেছে। এখন যদি শব্দ জব্য নহে এবং কর্ম নহে, ইহা যথার্থরূপে বুঝা যায়, তাহা হইলে শব্দ গুণপদার্থ, ইহা নিশ্চিত হইয়া যায়। ফলতঃ তাহাই হইতেছে। কারণ, শব্দ আকাশে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আকাশই শব্দের উপাদান কারণ, ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। আকাশ জব্যপদার্থ এবং এক। সুতরাং শব্দ একমাত্র জব্যসমবেত। অর্থাৎ আকাশনামক একটিমাত্র জব্যই শব্দের উপাদান কারণ; সুতরাং বুঝা গেল, শব্দ জব্যপদার্থ নহে। কারণ, জব্য-পদার্থের উপাদান কারণ একটিমাত্র জব্য হইতে পারে না, একাধিক জব্যেই জন্ত-জব্যগুলি গঠিত হয়। ভাষ্যে “একজব্যত্বাৎ” এই স্থলে “একং জব্যং (সমবাসিতরা) যন্ত” এইরূপ বিগ্রহে “একজব্যত্ব” কথা দ্বারা একমাত্র জব্যসমবেত অর্থই বুঝিতে হইবে। এবং শব্দ কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়াপদার্থও নহে। কারণ, শব্দ শব্দান্তরের উৎপাদক। ভাষ্যে “শব্দান্তরহেতুত্বাৎ” এই কথা দ্বারা সজাতীয় পদার্থের উৎপাদক হেতুই সূচিত হইয়াছে। উদ্যোতক প্রভৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। কারণ, সজাতীয়েত্বপাদক হেতুই শব্দে কর্মস্বভাবের অনুমাপক হয়। প্রথম উৎপন্ন শব্দ তাহার সজাতীয় শব্দান্তর জন্মায়, সেই দ্বিতীয় শব্দটি আবার তাহার সজাতীয় শব্দান্তর জন্মায়, এইরূপে বীজিতরন্ধের দ্বারা শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রোক্ত প্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই প্রতিগোচর হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তানুসারে শব্দ সজাতীয়েত্বপাদক। এই সজাতীয়েত্বপাদক কর্মপদার্থে নাই। কারণ, কণাদের মতে উহা জব্য ও গুণপদার্থেরই সাধর্ম্য। কণাদ বলিয়াছেন,—“জব্যগুণয়োঃ সজাতীয়াবস্তুকত্বং সাধর্ম্যম্”। “জব্যানি জব্যান্তরমরন্তস্তে গুণান্ত গুণান্তরম্”। “কর্ম কর্মসাধ্যং



ন বিন্যাসে"। ৯।১০।১১ সূত্র। কর্মকে কর্মান্তরের উৎপাদক বলা যায় না। কারণ, ক্রিয়া-মাত্রই বিভাগজনক। বিভাগ না জন্মাইলে তাহাকে কর্ম বলা যায় না। যখন প্রথম ক্রিয়াই বিভাগ জন্মাইয়াছে, তখন ক্রিয়াজন্ত দ্বিতীয় ক্রিয়া স্বীকার করিলে তাহা আবার কিসের সহিত বিভাগ জন্মাইবে? সংযুক্ত পদার্থেরই বিভাগ ইহা থাকে, বিভক্তের আবার বিভাগ কি?—এই যুক্তি অনুসারে মহাবি কণাদ বলিয়াছেন,—কর্ম কর্মান্তরের উৎপাদক নহে। সুতরাং সজাতীয়োৎপাদক কর্ম নাই। পূর্বোক্ত যুক্তিতে শব্দে উহা আছে; সুতরাং শব্দ কর্ম নহে। শব্দ কর্ম হইলে সজাতীয় শব্দান্তর জন্মাইত না। এইরূপে অনুমানের দ্বারা শব্দে "প্রসক্ত" দ্রব্য ও কর্মের "প্রতিবেশ" অর্থাৎ অভাব নিশ্চয় হইলে "অন্তর" অর্থাৎ জাতিত্ব; বিশেষত্ব ও সমবায়ত্বে "অপ্রসক্ত"-বশতঃ অর্থাৎ প্রসক্তি না থাকার প্রসক্ত দ্রব্য, কর্ম ও গুণের মধ্যে কেবল গুণত্বই "শিধ্যমান" অর্থাৎ "শেষ" থাকিল। শব্দের গুণত্ব-প্রতিবেশক কোন প্রমাণও নাই, সুতরাং শব্দ গুণপদার্থ, ইহা বথারূপে বুঝা গেল। এইরূপে শব্দে গুণত্বরূপ "শেষ" পদার্থ-বিষয়ক যে অনুমিতি, তাহার করণ লিঙ্গপরামর্শকে "শেষ" পদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া ভাষ্যকার "শেষবৎ" অনুমানের উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, "শেষবৎ" অনুমানের ভাষ্যোক্ত এই উদাহরণ আদরণীয় নহে। কারণ, "শেষবৎ" ও "পরিশেষ" "ব্যতিরেকী" অনুমানেরই নামান্তর। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উদাহরণটি "ব্যতিরেকী" অনুমান নহে; এটি "অযয়-ব্যতিরেকী"। তাৎপর্য-টীকাকার পরে "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"-তেও "শেষবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বাংলায়নের "প্রসক্ত প্রতিবেশে" ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু ভাষ্যকারের এই উদাহরণটি সেখানেও গ্রহণ করেন নাই। "অযয়ী", "ব্যতিরেকী" এবং "অযয়-ব্যতিরেকী" এই ত্রিবিধ নামেও অনুমান ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই ত্রিবিধ নামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেও ঐ তিনটি নাম তাহাদিগেরই আবিস্কৃত নহে। পরমপ্রাচীন উদ্যোতকর "জায়বার্তিকে" সংজ্ঞাক্ত "ত্রিবিধঃ" এই কথাই ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ "অযয়ী ব্যতিরেকী অযয়ব্যতিরেকী চ" এইরূপ বিভাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের ব্যাখ্যা "অযয়" পদার্থের ব্যাখ্যাস্থলে প্রকটিত হইবে। ভাষ্যকার বাংলায়ন এখানে "পরিশেষ" অনুমানকেই "শেষবৎ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে প্রসক্তের মধ্যে যেটি শেষ থাকে, সেই শেষ পদার্থের প্রতিপাদক অনুমানই "পরিশেষ", তাহাই "শেষবৎ"।

ভাষ্য। সামান্যতো দৃষ্টং নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে কেনচিদর্থেন লিঙ্গস্য সামান্যাদপ্রত্যক্ষো লিঙ্গী গম্যতে, যথেষ্টাদিভিরাঙ্গা, ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ, তদ্বদেবাং স্থানং স আয়েতি।

১। "পরিশেষ" শব্দটি বহুবি শব্দভেদে লুপ্ত ও পাওয়া যায়। "পরিশেষাব্যবোক্তহেতুপপত্তে"। ৩২।৪১ সূত্র। এই সূত্রে "পরিশেষ" শব্দের দ্বারা বহুবি যে প্রকার অনুমান-প্রমাণ স্থচনা করিয়াছেন, ভাষ্যকার হস্তানুসারে তাহা লক্ষ্য করিয়া এখানে "শেষবৎ" অনুমানের ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা মনে হয়।



অনুবাদ। যে স্থলে ( যে অনুমানস্থলে ) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( প্রকৃত হেতু ও প্রকৃত সাধ্যের ) সম্বন্ধ ( পূর্ববর্ণিত ব্যাপ্যব্যাপকভাবসম্বন্ধ ) অপ্রত্যক্ষ হইলে ( লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলে ) কোন পদার্থের সহিত ( ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞায়মান যে কোন পদার্থের সহিত ) লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃত হেতুর সমানতা প্রযুক্ত ( সেই লিঙ্গের দ্বারা ) “অপ্রত্যক্ষ” অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য “লিঙ্গী” ( সাধ্য ) অনুমিত হয়, সেই অনুমানের নাম “সামান্যতো দুষ্ট” । ( উদাহরণ ) যেমন ইচ্ছাদির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয় । ( কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন ) ইচ্ছা প্রভৃতি পদার্থ গুণ, ( গুণপদার্থ ), গুণগুলি আবার দ্রব্যাপ্তি ; অতএব ইহাদিগের অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের বাহা আশ্রয়, তাহা আত্মা ।

টীকণী। “পূর্ববৎ” অনুমানের সাধ্য বহিঃ প্রভৃতি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে ; সুতরাং ধুম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্থের সহিত তাহার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও ইহা থাকে । কিন্তু যে পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন পদার্থের সহিতই তাহার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ;— যেমন ইন্দ্রিয় ও আত্মা প্রভৃতি পদার্থ । দেহাদি হইতে বিভিন্ন আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে ; সুতরাং ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও তাহার সহিত ঐ আত্মার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কিন্তু তাহা গুণ-পদার্থ, তাহা দ্রব্যাপ্তি অর্থাৎ কোন দ্রব্য থাকে ; এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থের সহিত দ্রব্যাপ্তিত্বের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । তাহার ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি দ্রব্যাপ্তি, যেহেতু তাহার গুণপদার্থ ; এইরূপে ইচ্ছাদি পদার্থে দ্রব্যাপ্তিত্বের অনুমান হয় । তাহার পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি দেখ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কোন দ্রব্যের আশ্রিত নহে, ইহা বুঝিলে উহাদিগের আশ্রয়রূপে দেহাদি হইতে বিভিন্ন লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য যে দ্রব্য-পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম আত্মা । তাহাই পূর্বোক্তরূপে “সামান্যতো দুষ্ট” অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় । ইহাই ভাব্যকারের তাৎপর্য্য । ভাব্যবৃত্তিক-কার ও তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই স্থলে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রতা অর্থাৎ পরাশ্রিততাই “সামান্যতো দুষ্ট” অনুমানের সাধ্য । আত্মা ঐ অনুমানের সাধ্য নহে । ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রতা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য । কিন্তু সামান্যতঃ তাহা গুণপদার্থ, তাহা পরতন্ত্র ; এই-রূপে গুণপদার্থে পরতন্ত্রতার ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ ইচ্ছা প্রভৃতি পদার্থেও পরতন্ত্রতা সিদ্ধ হইয়া যায় ; কারণ, তাহার গুণপদার্থ । তাহার পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি অল্প কোন দ্রব্যাপ্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ উহার দেহাপ্তি নহে,—ইন্দ্রিয়াপ্তি নহে, ইত্যাদিরূপে অন্তান্ত দ্রব্যগুলির আশ্রিত নহে, ইহা বুঝিলে শেষে অতিরিক্ত কোন দ্রব্যাপ্তি, ইহাই বুঝা যায় । ঐ অতিরিক্ত দ্রব্যই আত্মা । ফলতঃ পূর্বোক্তরূপে ইচ্ছা প্রভৃতির আত্মতন্ত্রতাই শেষে বুঝা যায় । তাৎপর্য্য-টীকাকার ঐ আত্মতন্ত্রতা-সাদক অনুমানকেই পূর্বোক্ত “শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন এবং



ইচ্ছা প্রভৃতির পরতত্ত্ব-সাধক অনুমানই এখানে “নানান্ততো দৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। মহর্ষি কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতিকে আশ্রয়ই লিপ্ত বলিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যথাস্থানে প্রকটিত হইবে। (১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষা। বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে—ত্রিবিধবচনং মহতো মহাবিষয়স্তায়াস্ত লবীয়মা সূত্রে নোপদেশাৎ পরং বাক্যলাঘবং মন্যমানস্তায়াস্মিন্ বাক্যলাঘবেহ্নাদরঃ। তথা চায়মস্তেথস্তুতেন বাক্যবিকল্পেন প্রবৃত্তঃ সিদ্ধান্তে ছলে শব্দাদিষু চ বহুলং সমাচারঃ শাস্ত্রে ইতি।

অনুবাদ। “ত্রিবিধং” এই বিভাগ-বাক্য হইতেই সিদ্ধ হইলেও ( অর্থাৎ পূর্ববৎ প্রভৃতি তিন প্রকার অনুমান মহর্ষির মত, ইহা বুঝা গেলেও ) “ত্রিবিধবচনং” অর্থাৎ “পূর্ববৎ” প্রভৃতি নামোল্লেখ “পূর্ববৎ” প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের উক্তি—মহান্ অর্থাৎ ত্রিবিধ এবং মহা বিষয়—অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাহার বিষয়, এমন আয়ের ( অনুমানের ) অতি লঘু একটি সূত্রের দ্বারা ( “তৎপূর্বকং” ইত্যাদি ক্ষুদ্র একটিমাত্র সূত্রের দ্বারা ) উপদেশ করায়, যিনি অত্যন্ত বাক্যলাঘব মনে করিয়াছেন, তাঁহার ( শিষ্যদিগকে ব্যুৎপন্ন করিতে ইচ্ছুক সূত্রকার মহর্ষি গোতমের ) অন্য বাক্য-লাঘবে অর্থাৎ ইহার অপেক্ষায় আরও বাক্য সংক্ষেপে “অনাদরং”—অর্থাৎ ঐ উক্তি বাক্যসংক্ষেপে অনাদরপ্রযুক্ত। ( এই আয়সূত্রে অগত্যও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন )। “শাস্ত্রে” ( এই আয়দর্শনে ) “সিদ্ধান্তে”, “ছলে” এবং শব্দ-প্রমাণাদিতে ( ঐ সমস্ত পদার্থ-বোধক সূত্রে ) ইহার অর্থাৎ সূত্রকার মহর্ষি গোতমের সেই প্রকার অর্থাৎ এই সূত্রে “ত্রিবিধ” বচনের স্থায় এই সমাচার ( সূত্রে অত্যন্ত বাক্য-সংক্ষেপ না করিয়া বাক্য-প্রয়োগ ) অবশ্যুত বাক্য-বৈচিত্র্যের দ্বারা বহুতর প্রবৃত্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি “অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং” এই পদ্যস্ত সূত্র বলিলেই “ত্রিবিধং” এই বিভাগ-বাক্যের দ্বারা পূর্ববৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমান বুঝা যায়; কারণ, অনুমানের প্রকার-ভেদ বিষয়ে চিন্তা করিলে উদাহরণ পর্যালোচনার দ্বারা “পূর্ববৎ” প্রভৃতি তিনটি প্রকারই বুদ্ধির বিষয় হয়, “পূর্ববৎ শেষবৎ সানান্ততো দৃষ্টকং”—এই অংশের দ্বারা মহর্ষি বাক্যগৌরব করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার “বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে” এই কথার দ্বারা এই প্রশ্নের হুচনা করিয়া তত্ত্বেরে বলিয়াছেন যে, অনুমান মহান্ ও মহাবিষয়, একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র সূত্রের দ্বারা ইহার উপদেশ করিয়া মহর্ষি অত্যন্ত বাক্যলাঘব মনে করিয়াছেন। সেই একটি সূত্রের মধ্যেও যে আরও বাক্যলাঘব করা, তাহা মহর্ষি কর্তব্য মনে করেন নাই। তাহা



হইলে এই দুইই তৎ আরও অতি দুইই হইয়া পড়ে। মহর্ষি ইহার পরেও “সিদ্ধান্ত”, “ছল” ও শব্দ-প্রমাণ প্রভৃতি উপদেশ করিতে এইরূপ অত্যন্ত বাক্য-লাভের আদর করেন নাই। সেই সব স্থলে স্পষ্ট করিয়াই ভাগদিগের প্রকারভেদের কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার সমর্থন করিতেছেন যে, স্বত্রগ্রন্থে বাক্যলাভব কর্তব্য হইলেও ছাত্র-স্বত্রকার মহর্ষি কোন স্থলেই অত্যন্ত বাক্য-লাভের আদর করেন নাই। স্বত্রবাক্যের এইরূপ গৌরব-সমর্থনে ভাষ্যকারের এইরূপ প্রায়শ দেখিয়া কেহ কেহ অসম্মান করেন যে, পূর্বকালে ছাত্র-স্বত্রের প্রকৃত পাঠ অনেক স্থলে লুপ্ত ও বিকৃত হইয়াছিল, ভাষ্যকার তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। অবশ্য এ অসম্মানের অস্ত্র হেতুও আছে। বাচস্পতি মিশ্রের “শ্রাবস্থচী-নিবন্ধ” রচনার প্রয়োজনও ভাবিবার বিষয়। “বিভাগবচনাদেব” ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলে স্বত্রে “ত্রিবিধং” এই কথাটি কেন? ইহাই মূল প্রশ্ন বলিয়া মনে আসে। কিন্তু “ত্রিবিধমিতি” এই “ইতি” শব্দ-যুক্ত বাক্যের দ্বারা স্বত্রে “ত্রিবিধং” এই বিভাগ-বাক্যটির স্বরূপই বুঝা যায়। উহার দ্বারা ত্রিবিধ সহজে বুঝা যায় না। এবং “ত্রিবিধবচনং” এই কথার দ্বারা ত্রিবিধের বচনই সহজে বুঝা যায়, “ত্রিবিধং” এই বাক্যের বচন বুঝা যায় না। মূল কথা, “ত্রিবিধে নিদ্ধে ত্রিবিধমিতি বচনং” এইরূপ ভাষ্য থাকিলেই ঐরূপ অর্থ সহজে গ্রহণ করা যায়। মনে হয়, এই সমস্ত কথা মনে করিয়াই ভাষ্য-প্রবীণ বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন,—“ত্রিবিধমিতি বিভাগবচনাদেব নিদ্ধে”, “পূর্ববদাদৌ নিদ্ধে”, “ত্রিবিধবচনং ত্রিবিধস্ত পূর্ববদাদেকবচনং উক্তিঃ।” অনুবাদে মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। স্বত্রকারের “ত্রিবিধবচন” অত্যন্ত বাক্যলাভবে “অনাদর” প্রযুক্ত। তাই ভাষ্যকার ঐ ত্রিবিধবচনকে বাক্যসংক্ষেপে অনাদর বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। মূৰ্খতাপ্রযুক্ত কোন কার্য হইলে তাহাকে মূৰ্খতা বলিয়াও বলা হয়। ঐ কার্যে মূৰ্খতাই প্রধান হেতু, ইহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে মূৰ্খতার সহিত অভিন্নভাবেই উল্লেখ করা হয়, তজ্জপ মহর্ষির এই স্বত্রে যে পূর্ববৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ বচন, তাহার প্রতিও অস্ত্র কোনও হেতু নাই, অত্যন্ত বাক্য-সংক্ষেপে অনাদরই উহার মূল, ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার উহাকে বাক্যলাভবে অনাদর বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্য। সন্নিবয়ক প্রত্যক্ষং সদসন্নিবয়কানুমানম্। কস্মাৎ? ত্রৈকাল্যগ্রহণাৎ, ত্রিকালযুক্তা অর্থা অনুমানেন গৃহ্যন্তে, ভবিষ্যতীত্যনুমীয়েতে ভবতীতি চাভূদিতি চ। অসচ্চ ব্ধতীতমনাগতক্ষেতি।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ (লৌকিক প্রত্যক্ষ) সন্নিবয় অর্থাৎ বর্তমানবিষয়ক। অনুমান সন্নিবয়ক ও অসন্নিবয়ক অর্থাৎ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎবিষয়ক। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) ত্রৈকাল্য গ্রহণ বশতঃ। বিশদার্থ এই যে,—“অনুমানের দ্বারা ত্রিকালযুক্ত অর্থ (বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ) গৃহীত (জ্ঞাত) হইয়া থাকে।

হইবে ইহা অনুমিত হইয়া থাকে, হইতেছে ইহা এবং হইয়াছে ইহাও অনুমিত হইয়া থাকে। “অসং” বলিতে (অর্থাৎ “সদসম্বিষয়কানুমানং” এই পূর্বোক্ত বাক্যে “অসং” শব্দের অর্থ) অতীত এবং ভবিষ্যৎ।

টিপ্পন। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান ভিন্ন, ইহা লক্ষণ ভেদ করিয়াই হৃদয়কার মহর্ষি দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ দুইটির বিষয়-ভেদপ্রযুক্তও ভেদ বলিতেছেন। এখানে ভাষ্যে “প্রত্যক্ষ” শব্দ ও “অনুমান” শব্দ প্রমিতি অর্থেই প্রযুক্ত। ভাবার্থে অনট্ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ “অনুমান” শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা অনুমিতিই বুঝা যায়। ঐ প্রত্যক্ষ প্রমিতি এবং অনুমিতরূপ প্রমিতি তৃতীয় হৃদয়-ভাষ্য-বর্ণিত হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের প্রতি প্রমাণও হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনুমান-প্রমাণের বিষয়-ভেদ বলিলেও বলা যায়। এবং এই স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষই বুঝিতে হইবে; কারণ, সিদ্ধ যোগিগণের অলৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান বিষয়ক নহে, তাহার সহিত অনুমানের ভাষ্যোক্ত বিষয়-ভেদ নাই। লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান-বিষয়ক। অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু অনুমানক সংস্কেতের সাহায্যে অনুমিতি হইয়া থাকে। ভাষ্যে “ত্রৈকাল্য” শব্দের দ্বারা “ত্রিষু কালেবু হিতাঃ” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে কালত্রয়বর্ষী অর্থই বুঝিতে হইবে।

অনুমান বুঝিতে হইলে পক্ষ, সাধ্য, সংস্কেত, অসংস্কেত, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তিজ্ঞান, লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শ—এই পদার্থগুলি মনে রাখিতে হইবে। যে স্থানে অনুমিতি হয়, তাহাকে “পক্ষ” বা আশ্রয় বলে। সেই পক্ষে যে ধর্মটির অনুমিতি হয়, তাহাকে সাধ্য ধর্ম বলে। এই সাধ্য-ধর্ম-বিশিষ্ট পক্ষরূপ ধর্মীও অনুমানের পূর্বে অসিদ্ধ বলিয়া স্তায়সূত্রে ও ভাষ্যে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। যে হেতুতে কোন দোষ নাই অর্থাৎ হেত্বাভাস নহে, তাহাকে সংস্কেত বলে। যে হেতু ত্রুটি অর্থাৎ হেত্বাভাস, তাহাকে অসংস্কেত বলে। হেত্বাভাসের পরিচয় মহর্ষি নিজেই দিয়াছেন। পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মযুক্ত কোন স্থানে থাকিয়া সাধ্যস্বত্বস্থানমাত্র না থাকাকে সাধ্যের “ব্যাপ্তি” বলে। স্থলবিশেষে “ব্যাপ্তির” অন্তরূপ লক্ষণও বলিতে হইবে। ব্যাপ্তি-বিশিষ্টকে “ব্যাপ্য” বলে। সাধ্যের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পদার্থ সাধ্যের ব্যাপ্য। যাহার ব্যাপ্য, তাহাকে “ব্যাপক” বলে। এই হেতু এই সাধ্যের ব্যাপ্য, এইরূপ জ্ঞানকে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান বলে। এই সাধ্য ব্যাপ্য, এই হেতু এই পক্ষে আছে, এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শ বলে। ইহার পরেই “এই পক্ষ এই সাধ্যযুক্ত”, এইরূপে বর্ণনামাত্র প্রকৃত সাধ্যের অনুমিতি হয়। তাহার পরে সেই অনুমিত পদার্থের গ্রহণ, ভাগ অথবা উপেক্ষা হয়। সুতরাং ঐ অনুমিতির পরেই তৃতীয় হৃদয়-ভাষ্য-বর্ণিত হানাদি বুদ্ধিও জন্মে। ঐ “হানাদিবুদ্ধি”রূপ ফলের প্রতি পূর্বোক্ত অনুমিতিও চরম কারণ বলিয়া প্রমাণ হইবে। ঐ অনুমিতিও সূত্রোক্ত “তৎপূর্বক” জ্ঞান। স্তায়শব্দের অনুমানকাণ্ড অতি ছদ্মহ। বিচার্য্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্ত নাই। অবয়ব-প্রকরণ, হেত্বাভাস-প্রকরণ এবং অনুমান-পদার্থ-প্রকরণে আরও এই বিষয়ে অনেক কথা উল্লেখ্য।



ভাষ্য । অধোপমানম্ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ অনুমান নিরূপণের পরে ( ক্রমপ্রাপ্ত ) উপমান ( নিরূপণ করিতেছেন ) ।

সূত্র । প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ । ৬।

অনুবাদ । প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যা প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থ-বিশেষের সহিত অদৃষ্ট পদার্থের সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য হইতে যে সাধর্ম্যা অর্থাৎ সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, সেই সাদৃশ্য প্রযুক্ত ( সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ বশতঃ ) সাধ্যের অর্থাৎ শব্দ-বিশেষের বাচ্য স্বন্ধের সাধন ( নিশ্চয় ) যাহা দ্বারা হয়, তাহা উপমান প্রমাণ ।

ভাষ্য । প্রজ্ঞাতেন সাংখ্যান্তাৎ প্রজ্ঞাপনীয়স্ত প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি । “যথা গোঁরেবং গবয়” ইতি । কিং পুনরধোপমানেন ক্রিয়তে ? যদা ধন্বয়ং গবা সমানধর্ম্যং প্রতিপদ্যতে তদা প্রত্যক্ষতন্তমর্থং প্রতিপদ্যত ইতি । সমাখ্যাসম্বন্ধপ্রতিপত্তিরূপমানার্থ ইত্যাহ । “যথা গোঁরেবং গবয়” ইত্যুপমানে প্রযুক্তে গবা সমানধর্ম্যাণমর্থমিচ্ছিন্নার্থসম্মিকর্বাছুপলভমানোহস্য গবয়শব্দঃ সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যত ইতি । “যথা মুদগস্তথা মুদগপর্ণী”, “যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী” ইত্যুপমানে প্রযুক্তে উপমানাৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যমানস্তান্মোষধীং ভৈষজ্যায়াহরতি । এব-মন্যোহপ্যুপমানস্ত লোকে বিষয়ো বুভুৎসিতব্য ইতি ।

অনুবাদ । প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত ( প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত পদার্থ-বিশেষের সহিত ) সমানতা-প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য হইতে পরিজ্ঞাত সাদৃশ্য-প্রযুক্ত ( সেই সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষবশতঃ ) প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের ( সংজ্ঞাবিশেষের বাচ্যরূপে প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থ-বিশেষের অথবা অর্থ-বিশেষে শব্দ-বিশেষের বাচ্য স্বন্ধের ) প্রজ্ঞাপন “উপমান” ( উপমিতি ) । ( উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য উপমিতির মূল সাদৃশ্য-বোধক প্রসিদ্ধ আপ্তবাক্যটির উল্লেখ করিতেছেন ) “যেমন গো এইরূপ গবয়” । ( পূর্বপক্ষ ) এই স্থলে উপমান প্রমাণ কি করিতেছে ? যে সময়ে ব্যক্তি-বিশেষ ( গবয় পশুতে ) গোর সমান ধর্ম্য ( সাদৃশ্য ) জানে ( প্রত্যক্ষ করে, ) তখন প্রত্যক্ষের দ্বারাই সেই পদার্থকে ( গবয়কে ) জানে । ( অর্থাৎ ঐ স্থলে গবয়-

পশুজ্ঞানের জন্ম উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন কি ? গবয়ে।  
 সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকালে গবয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। (উত্তর) সমাখ্যার  
 (সংজ্ঞাশব্দবিশেষের) “সম্বন্ধপ্রতিপত্তি” অর্থাৎ অর্থবিশেষে বাচ্যবসম্বন্ধ জ্ঞান  
 (শক্তিজ্ঞান) উপমান প্রমাণের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, ইহা (মহর্ষি গোতম)  
 বলিয়াছেন। (প্রকৃতস্থলে ইহা বিশদ করিয়া বুঝাইতেছেন) “যেমন গো, এইরূপ  
 গবয়” এই উপমান (অর্থাৎ উপমিতির মূল-সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য) “প্রযুক্ত”  
 হইলে অর্থাৎ কোন বোঝা ব্যক্তির নিকটে কথিত হইলে (সে বোঝা ব্যক্তি কোন  
 স্থানে) গোর সমান-ধর্মাবিশিষ্ট পদার্থকে (গো-সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুকে)  
 ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নির্দর্শনতঃ উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতঃ গবয়শব্দ ইহার  
 (এই দৃশ্যমান পশু-বিশেষের) সংজ্ঞা (নাম)—এইরূপে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ  
 অর্থাৎ গবয় ও “গবয়” শব্দের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকে। (উপমানের  
 আরও একটি স্থল দেখাইতেছেন) (২) “যেমন মুদগ, সেইরূপ মুদগপর্ণী” (এবং)  
 “যেমন মাষ, সেইরূপ মাষপর্ণী” এই উপমান (উপমিতির মূল-সাদৃশ্য-বোধক  
 আপ্তবাক্য) প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসু বোঝার নিকটে কথিত হইলে  
 (ঐ ব্যক্তি) উপমান প্রমাণ হইতে (পূর্বেবাক্ত প্রকারে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ অর্থাৎ  
 সেই ওষধিবিশেষ ও মুদগপর্ণী শব্দের এবং সেই ওষধিবিশেষ ও মাষপর্ণী শব্দের  
 বাচ্যবাচকতা-সম্বন্ধ বোধ করতঃ এই ওষধীকে (মুদগপর্ণী নামক এবং মাষপর্ণী  
 নামক ওষধীবিশেষকে) ওষধের জন্ম আহরণ করে। এইরূপ অন্যও অর্থাৎ ইহা  
 ভিন্নও জগতে উপমান প্রমাণের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।

টিপ্পনী। “গবয়” নামে একপ্রকার অরণ্য পশু আছে। যাহাকে দেশবিশেষে “নীলগাই”  
 বলে। নগরবাসী গবয় পশু দেখেন নাই; কিন্তু বিজ্ঞ অরণ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছেন—গবয়  
 পশু দেখিতে গো-পশুর মত। পরে নগরবাসী কোন কারণে অরণ্যে গমন করিয়া এক দিন  
 একটি গবয় পশু দেখিলেন; তখন ঐ অদৃষ্টপূর্ব পশুতে তাহার পূর্ব-প্রজ্ঞাত গো-পশুর সাদৃশ্য  
 প্রত্যক্ষ হইল, তাহার পরেই পূর্বপ্রজ্ঞাত অরণ্যবাসীর সেই বাক্যের অর্থ গ্রহণ হইল। তাহার  
 পরেই নগরবাসী নিশ্চয় করিলেন, ইহার নাম গবয়। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়ব্দ-বিশিষ্ট পশুমাত্রই  
 গবয় শব্দের বাচ্য। এইরূপে তিনি গবয় পশু ও গবয় শব্দের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন।  
 তাহার এই সম্বন্ধ-নির্ণয় পূর্বপ্রজ্ঞাত সাদৃশ্য-প্রত্যাক্রূপ উপমান প্রমাণের ফল। উহারই নাম  
 “উপমিতি।”

ঐ স্থলে গবয় পশুর প্রত্যক্ষ এবং তাহাতে গো-সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাই



হইতেছে; কিন্তু গবয়বিশিষ্ট পশুমাংসে গবয় শব্দের বাচ্য স্বধ্বক নির্ণয় ঐ স্থলে অস্ত্র কোন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না। ঐ স্থলে তদ্বিবয়ে অস্ত্র কোন প্রমাণই উপস্থিত নাই। যে প্রমাণের দ্বারা ঐ স্থলে পূর্বোক্ত স্বধ্বক নির্ণয় হয়, তাহারই নাম উপমান প্রমাণ। পরীক্ষা-প্রকরণে ঐ সব কথা বিশেষরূপে সমর্থিত হইবে। স্বত্রে “প্রসিদ্ধসাধন্যং” এই স্থলে তৃতীয়া-তৎপুংব সমানই ভাষ্যকারের অভিপাত। তাই ভাষ্যকার স্বত্রে ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রজ্ঞাতেন সামান্যং।” স্বত্রে “সাধ্যসাধনং” এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রজ্ঞাপনীরস্ত প্রজ্ঞাপনম্।” প্রমাণ কর্তৃক প্রমাতা প্রজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। স্বতরাং প্রজ্ঞাপন প্রমাণেরই ব্যাপার। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার উপমান প্রমাণের ফল উপমিতিকে “প্রজ্ঞাপন” বলিয়াছেন। পরে সংজ্ঞাসংজ্ঞিস্বধ্বক নির্ণয়ই উপমানের ফল অর্থাৎ “উপমিতি”, ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। সংজ্ঞাসংজ্ঞিস্বধ্বক অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দ-বিশেষের বাচ্য স্বধ্বকই উপমান প্রমাণের সাধ্য, অর্থাৎ সাদৃশ্যবোধক বাক্য বক্তার প্রজ্ঞাপনীয়; তাই স্বত্রে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। সেই সাধ্যের সাধন অর্থাৎ নিশ্চয় বাহার দ্বারা হয়, তাহা উপমান প্রমাণ। তৎপদ্যটীকাকার স্বত্রে “বতঃ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রকাশ করিয়াছেন। “সাধ্যসাধন-মুপমানং” এইমাত্র স্বত্রে বলিলে প্রত্যক্ষাদির সাধন এবং স্বত্বাদির সাধনও উপমান হইয়া পড়ে; তাই বলিয়াছেন—“প্রসিদ্ধসাধন্যং।” অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাধন্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হওয়া চাই। “প্রসিদ্ধসাধন্যমুপমানং” এইরূপ স্বত্রে বলিলে উপমানান্নাসও উপমান-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাই বলিয়াছেন—“সাধ্যসাধনম্।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসাধন হওয়া চাই। প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত পরবর্তী সাদৃশ্য-জ্ঞান (যেমন গবয় পশুতে গো পশুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ) উপমান প্রমাণ। পূর্বোক্ত আগ্রবাক্যের অর্থ স্বরণ তাহার ব্যাপার। ব্যাপারই মুখ্য করণ, এই প্রাচীন মতে ঐ পূর্বোক্ত আগ্রবাক্যের অর্থ স্বরণই মুখ্য উপমান প্রমাণ। ফলতঃ কেবল সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ উপমিতি হয় না। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পরে পূর্বোক্ত সেই সাদৃশ্যবোধক আগ্রবাক্যের অর্থ স্বরণ আবশ্যক। তাহার পরেই পূর্বোক্ত উপমিতি জন্মে।

(২) “মুলাপর্ণী” ও “মাষপর্ণী” নামে একপ্রকার ওষধী-বিশেষ আছে, বাহাকে দেশবিশেষে যথাক্রমে “মুলাপি” ও “মাষপি” বলে। উহা বিষনাশক। যিনি উহা কখনও দেখেন নাই, তিনি দ্রব্য-তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট জ্ঞানিলেন—“মুলাপর্ণী” মুক্তের দ্বারা এবং “মাষপর্ণী” মাষের দ্বারা। পরে অরণ্যাদিতে বাইরা কোন ওষধী-বিশেষে মুক্তের বিলক্ষণ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার পরেই সেই পূর্বোক্ত চিকিৎসক-বাক্যের অর্থ স্বরণ হইল, তাহার পরেই সেই ওষধী-বিশেষে “মুলাপর্ণী” শব্দের বাচ্য স্বধ্বক নির্ণয় হইল। অর্থাৎ তখন তিনি বুঝিলেন, “ইহারই নাম মুলাপর্ণী।” এইরূপে “মাষপর্ণী” শব্দেরও মাষসদৃশ ওষধী-বিশেষে বাচ্য নিশ্চয় হইল। এইরূপে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ এবং সাদৃশ্য-বোধক বাক্যের স্বরণে উদ্ভিদ-বিশেষের সংজ্ঞাসংজ্ঞিস্বধ্বক নির্ণয় অনেক স্থলে অনেকেরই হইয়া থাকে। বাহার হইয়াছে, তিনি স্বরণ করুন। তাহার ঐ জ্ঞান উপমান প্রমাণের ফল “উপমিতি।”



উপমান ব্যাখ্যার তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, সূত্রে “সাধর্ম্য” শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা ধর্ম্যমাত্রই বুঝিতে হইবে। প্রসিদ্ধ বৈধর্ম্য প্রযুক্তও উপমিতি হয়। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তি “করত” শব্দ উষ্ট্র অর্থাৎ বুঝায়, ইহা জানেন না; কিন্তু একজন বিজ্ঞতম ব্যক্তির নিকটে গুলিলেন,—“করত অতি কুশী, তাহার গ্রীবা ও ওষ্ঠ অতি দীর্ঘ, সে অতি কঠোর তীক্ষ্ণ কণ্টক ভঞ্জন করে, সে পশুর মধ্যে অদ্ভুত।” এই কথাগুলির দ্বারা শ্রোতা করিতে অল্প কোন পশুর সাদৃশ্য বুঝিলেন না, কিন্তু করতে অল্প পশুর বৈধর্ম্যই বুঝিলেন। পরে এক দিন কোন স্থানে উষ্ট্র দেখিয়া তাহাতে অতিদীর্ঘ গ্রীবা ও কণ্টক-ভঞ্জন প্রভৃতি অল্প পশুর বৈধর্ম্যগুলির প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পরেই তাঁহার পূর্বশ্রুত বাক্যের স্মরণ হইল, তাহার পরেই তিনি বুঝিলেন, উষ্ট্র, “করত” শব্দের বাচ্য। অর্থাৎ করত শব্দের অর্থ উষ্ট্র। এই বোধ পূর্বজাত বৈধর্ম্য প্রত্যক্ষ এবং পূর্বশ্রুত বাক্যার্থ স্মরণজন্য; সুতরাং ইহা বৈধর্ম্যোপমিতি। ইহাকে উপমিতি না বলিলে ইহার জন্ত অতিরিক্ত পক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ঐ স্থলে ঐরূপে যে উষ্ট্রে “করত” শব্দের বাচ্য নিশ্চয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে হয় না। সাধর্ম্যপ্রযুক্ত ঐরূপ জ্ঞান বধন মর্হর্দ্বি গোত মের মতে অসম্মিতি নহে, তখন বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত ঐরূপ জ্ঞানও তাঁহার মতে অসম্মিতি হইতে পারে না। তাৎপর্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্তই ভগবান্ ভাষ্যকার উপমানের অন্তঃ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াও অর্থাৎ আর উদাহরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন না থাকিলেও শেষে বলিয়াছেন,—“এবমজ্ঞোহপুণ্যমানস্ত লোকে বিবয়ো বুভুৎসিতব্যঃ”। অর্থাৎ ইহা ভিন্নও উপমানের বিষয় আছে। জানিতে ইচ্ছা করিয়া অনুসন্ধান করিলে আরও মিলিবে। তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার কথার দ্বারাও এখানে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের কথাও সূত্রকারের কথার দ্বারা তিনি প্রমাণ মনে করেন এবং ভাষ্যকারও যে শেষে তাঁহার মতেরই সূচনা করিয়া গিয়াছেন ইহাও তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতির দৃঢ় বিশ্বাস। “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজও মর্হর্দ্বি-সূত্রস্থ “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য, এবং ধর্ম্য এই তিনটিকে গ্রহণ করিয়া উপমিতিকে তিন প্রকার বলিয়াছেন এবং তিনিও ভাষ্যকারকে ভগবান্ বলিয়া ভাষ্যকারের এই কথাটির উল্লেখপূর্বক স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ কিন্তু ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখপূর্বক উদাহরণ বলিয়াছেন যে, দুঃশপর্ণীর দ্বারা একরূপ ওষধী আছে, তাহা বিঘ্ননাথক, এই কথা শুনিয়া কোন স্থানে ঐরূপ ওষধী দেখিলে “এই ওষধী বিঘ্ন নাশ করে” এইরূপ নিশ্চয়ও উপমান প্রমাণের ফল। অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধনির্ণয় ভিন্ন ঐরূপ তত্ত্বনির্ণয়ও উপমানের দ্বারা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। বলিয়া বিঘ্ননাথের কথায় বুঝা যায়। কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকই এই মত স্বীকার না করিলেও ভাষ্যকারের উহা মত বলিয়া বৃত্তিকার কারণ আছে। ভাষ্যকারের উহা মত না হইলে তিনি “উপনয়” বাক্যের মূলে অসম্মান প্রমাণ আছে, এ কথা বলেন কিরূপে? (৩৯ সূত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥



ভাষ্য । অথ শব্দঃ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ উপমান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) “শব্দ” (শব্দপ্রমাণ) (নিরূপণ করিতেছেন) ।

সূত্র । আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ । ৭ ।

অনুবাদ । আপ্তের অর্থাৎ প্রতিপাত্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রতারণক ব্যক্তির উপদেশ “শব্দপ্রমাণ” ।

ভাষ্য । আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথা দৃষ্টস্তার্থস্ত চিত্ত্যাপরিব্রা প্রযুক্ত উপদেষ্টা । সাক্ষাৎকরণমর্থস্তাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্তত ইত্যাশ্রিতঃ । স্বব্যার্থ্যল্লেক্ষানাং সমানং লক্ষণম্ । তথা চ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্তন্ত ইতি । এবমেতিঃ প্রমাণৈর্দেবমনুষ্যতিরশ্চাং ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে নাতোহন্তথেন্তি ।

অনুবাদ । “সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা” ( যিনি ধর্ম্ম অর্থাৎ পদার্থকে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সূদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন ) এবং যথাদৃষ্ট পদার্থের ব্যাপনেচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ বাক্য-প্রয়োগে কৃতবত্ত, এইরূপ “উপদেষ্টা” অর্থাৎ উপদেশ-সমর্থ ব্যক্তি,—“আপ্ত” । ( আপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ) অর্থের (পদার্থের) সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সূদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ “আপ্তি” । তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই আপ্তিবশতঃ ( বাক্যপ্রয়োগে ) প্রবৃত্ত হন, এ জন্ত “আপ্ত” । স্ববিগণ, আর্ঘ্যগণ এবং স্নেহগণের সম্বন্ধে “লক্ষণ” (পূর্বেবক্ত আপ্তলক্ষণ) “সমান” । সেইরূপ বলিয়াই ( বিষয়-বিশেষে আপ্ত সকলেরই সমান বলিয়াই ) সকলের ( স্বমি হইতে স্নেহ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তির ) ব্যবহার প্রবৃত্ত হইতেছে । এইরূপ এই প্রমাণগুলির দ্বারা ( ব্যাখ্যাত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের দ্বারা ) দেবতা, মনুষ্য ও পশাদির অর্থাৎ প্রাণিমাাত্রের ব্যবহার চলিতেছে, ইহার অত্থবা অর্থাৎ এই প্রমাণগুলি ব্যতীত ( কাহারও ব্যবহার ) চলে না ।

টীকণী । হুত্রে “আপ্তোপদেশ” এই স্থলে দ্বী-তৎপূর্ব্ব সমাসই ভাষ্যকার প্রবৃতির মত । অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকেই মহর্ষি শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন । এখন “আপ্ত” কাহাকে বলে, তাহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার প্রথমতঃ আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং “আপ্ত” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া প্রদর্শিত লক্ষণের সমর্থন করিয়াছেন । প্রাচীন ভাষায় পদার্থমাত্র বুঝাইতে “ধর্ম্ম” শব্দও প্রযুক্ত দেখা যায় । যিনি পদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি “সাক্ষাৎ-

কৃতধর্ম্য"। স্মার-বাস্তবিককার বলিয়াছেন যে, স্বর্গ, অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতি পদার্থগুলি অশ্রুদাদির লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও সর্বদর্শী সেগুলির অলৌকিক সাক্ষাৎকার করেন; সুতরাং সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বাক্য-বক্তাও সর্বদর্শী বলিয়া "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্য"। তাৎপর্য্যটীকা-কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সুদূত প্রমাণেনাবধারিতাঃ সাক্ষাৎকৃত্যঃ ধর্ম্মাঃ পদার্থা হিতাহিতপ্রাপ্তি-পরিহারার্থী যেন”। অর্থাৎ তিনি বলেন,—পদার্থের সুদূত প্রমাণের দ্বারা অবধারণই এখানে ভাষ্যোক্ত পদার্থ-সাক্ষাৎকার। সুদূত প্রমাণের দ্বারা অবধারণ সাক্ষাৎকারের তুল্য, তাই তাহাকে ভাষ্যকার সাক্ষাৎকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে সুদূত অনুমানের দ্বারা অবধারিত তত্ত্বের প্রতি-পাদক-বাক্য-বক্তাও “সাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম্য”। সুতরাং তিনিও “আপ্ত” হইতে পারিবেন। সাক্ষাৎ-কৃতপদার্থ হইয়াও যিনি উপদেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, অথবা মাৎস্যবশতঃ বিপরীত উপদেশ করেন, তিনি “আপ্ত” নহেন; তাই বলিয়াছেন—“যথাদৃষ্টজ্ঞার্থস্ত চিৎপ্যাপসিধ্যা”। অর্থাৎ নিজে বেক্রপে অবধারণ করিয়াছেন, ঠিক সেই বস্তুধর্ম্মে পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা থাকা চাই। কেবল সেইরূপ খ্যাপনেচ্ছা থাকিলেও আলস্তবশতঃ যদি উপদেশ না করেন, তাহা হইলেও তিনি আপ্ত নহেন। তাই বলিয়াছেন—“প্রযুক্তঃ” অর্থাৎ পূর্বেকৃত প্রকার ইচ্ছাবশতঃ বাক্য প্রয়োগে কৃতবস্ত্র হওয়া চাই। কৃতবস্ত্র হইয়াও ইন্দ্রিয়াদির পটুতা না থাকায় যদি উপদেশসামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তিনি আপ্ত হইবেন না। তাই বলিয়াছেন—“উপদেষ্টা”। অর্থাৎ এই সবগুলি লক্ষণ বাহ্যতে আছে, তিনিই “আপ্ত”। তিনি ঋষি, আর্য্য, যোদ্ধা, বাহাই হউন, তাহার উপদেশই “আপ্তোপদেশ”। তাহাই শব্দ-প্রমাণ। অনাপ্তের উপদেশ শব্দ-প্রমাণ নহে। বিষয়বিশেষে আপ্তত্ব শব্দগুলিরই তুল্যভাবে আছে, নচেৎ কাহারও শব্দ-ব্যবহার এবং তন্মূলক অস্তান্ত ব্যবহার চলিতেই পারিত না। তবে সর্বজ্ঞ ব্যতীত সর্ব বিষয়ে অথবা সাধারণের অচিন্ত্য অলৌকিক তত্ত্ব আর কেহ “আপ্ত” হইতে পারেন না, এই বিশ্বাসে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ব্রহ্ম প্রভৃতি অলৌকিক তত্ত্ব আর্য্যগণ বাহার তাহার কথা বিশ্বাস করেন না। বেদ এবং বেদের অবিকৃত বেদ-মূলক শাস্ত্র-বাক্যই এই সমস্ত তত্ত্ব আপ্তবাক্য বলিয়া আর্য্যগণের চির-বিশ্বাস। বেদ-কর্তা কে? তিনি সর্বজ্ঞ কেন? এ সব কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

## সূত্র। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ । ৮ ।

অনুবাদ। দৃষ্টার্থকত্ব ও অদৃষ্টার্থকত্ব বশতঃ অর্থাৎ দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক-ভেদে তাহা (পূর্ববিস্তৃত প্রমাণশব্দ) দ্বিবিধ।

ভাষ্য। যন্তেহ দৃষ্টতেহর্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্তামৃত্তে প্রতীয়তে সোহ-দৃষ্টার্থঃ। এবমুঘিলৌকিক-বাক্যানাং বিভাগ ইতি। কিমর্থঃ পুনরিদ-মুচ্যতে? স ন মন্তেত দৃষ্টার্থ এবাপ্তোপদেশঃ প্রমাণম্ অর্থস্থাবধারণা-দিতি। অদৃষ্টার্থোহপি প্রমাণমর্থস্থানুমানাদিতি। ইতি প্রমাণভাষ্যম্।



অনুবাদ। ইহলোকে বাহার (যে বাক্যের) অর্থ (প্রতিপাদ্য) দৃষ্ট হয়, তাহা (সেই বাক্য) “দৃষ্টার্থ”। পরলোকে বাহার অর্থ প্রতীত হয় (অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় না) তাহা অর্থাৎ সেই বাক্য “অদৃষ্টার্থ”। এইরূপে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের বিভাগ। (পূর্বপক্ষ) কি জ্ঞা আবায় ইহা (এই সূত্রটি) বলিতেছেন?—(উত্তর) তিনি অর্থাৎ নাস্তিক মনে না করেন—অর্থের (প্রতিপাদ্য পদার্থের) অবধারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় দৃষ্টার্থমাত্র আপ্তবাক্যই প্রমাণ—(পরন্তু) অর্থের (বাক্য প্রতিপাদ্য পদার্থের) অনুমান অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যও প্রমাণ। (অর্থাৎ ইহা বলিবার জন্মই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন)। প্রমাণভাষ্য সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। আপ্তবাক্য বিবিধ। সুতরাং প্রমাণ শব্দও বিবিধ। কেবল অদৃষ্টার্থক শাস্ত্রবাক্যই আপ্তবাক্য নহে। লৌকিক বাক্যের মধ্যেও অসংখ্য আপ্তবাক্য আছে। সত্যবাদী বিজ্ঞতম ব্যক্তি কোন স্থানে সর্প দেখিয়া “অমুক স্থানে সর্প আছে” ইহা বলিলে শ্রোতৃগণ সেই বাক্যার্থ-জ্ঞানবশতঃ সাবধান হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতম সত্যবাদী ব্যক্তির কথা শুনিয়া কত কত সত্য নির্ণয় হইয়া থাকে। নচেৎ লৌকিক বিবাদ স্থলে সত্য নির্ণয়ের জন্য প্রকৃত সাক্ষিবাক্যের এত প্রয়োজন হয় কেন? ফলতঃ লৌকিক বাক্যের একেবারে প্রামাণ্য না থাকিলে মানবের সংসারব্যতী অন্তস্তব হইত, ইহা নির্লিঙ্গবাদ সত্য। যিনি নাস্তিক অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তিনিও লৌকিক আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; নচেৎ তাহারও জীবনব্যতী নির্লিঙ্গ হয় না। কিন্তু নাস্তিক অদৃষ্টার্থক বাক্যের প্রামাণ্য একেবারেই স্বীকার করেন না। তাই নাস্তিককে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। অর্থাৎ “অদৃষ্টার্থক আপ্ত বাক্যও প্রমাণ” আন্তিক-দর্শনের এই মূল সিদ্ধান্তটি প্রমাণ প্রভাবে প্রথমই মহর্ষি বলিয়া গিয়াছেন। অদৃষ্টার্থক বেদাদি বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গ, অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতি যখন বাহারও দৃষ্ট পদার্থ নহে, তখন তাহা প্রমাণ হইবে কেন? এতদ্বত্তরে স্মারবাস্তবিককার বলিয়াছেন যে, যোগপ্রভাবে দেগুলিও মহর্ষিগণের দৃষ্ট পদার্থ। ভাব্য-কার এখানে বলিয়াছেন—“অর্থজ্ঞাতমানাঃ” অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক শাস্ত্রবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ ইহলোকে আমাদের দৃষ্ট পদার্থ না হইলেও অনুমানসিদ্ধ। শাস্ত্রমাত্র-বোধ্য স্বর্গাদি পদার্থ আমাদের অনুমানসিদ্ধ কিরূপে? তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আপ্ত-প্রণীতক হেতুর দ্বারা বেদের প্রামাণ্য অনুমান-সিদ্ধ অর্থাৎ যোগেহু বেদ আপ্ত ব্যক্তির প্রণীত, অন্তঃক বেদ প্রমাণ। মহর্ষি গোতম নিজেও এ কথা বলিয়াছেন। সুতরাং অল্পমানের দ্বারা সিদ্ধপ্রামাণ্য বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গ, দেবতা প্রভৃতিও পরম্পরায় অনুমানসিদ্ধ। অর্থাৎ নাস্তিক যখন অল্পমানপ্রমাণ না মানিয়াই পারিবেন না, তাহা হইলে তাহার বিচার করাই চলিবে না, তখন অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ-প্রামাণ্য বেদাদি অদৃষ্টার্থক বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ তাহাকে মানিতেই হইবে। এই



অভিপ্রায়েই ভাষাকার বলিয়াছেন,—“অপভ্রান্তমানাং ।” ভাষ্যে “স—ন মজ্ঞেত” এই স্থলে তাৎপর্য-  
 টীকাকার বলিয়াছেন যে—যে নাস্তিকের কথা অনেক পূর্বে ভাষ্যে বলা হইয়াছে, যোগ্যতা ও  
 তাৎপর্যবশতঃ সেই নাস্তিকই এখানে “তৎ” শব্দের প্রতিপাদ্য, (স নাস্তিকঃ) । ঋষিবাক্য  
 এবং লৌকিক আগ্রবাক্য—এই দ্বিবিধ শব্দপ্রমাণকেই মহর্ষি দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক-ভেদে দ্বিবিধ  
 বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের মত ; তাই বলিয়াছেন—“এবমুদ্বিনৌকিকবাক্যানাং বিভাগঃ” ।  
 ভাষ্যকার দৃষ্টার্থক বাক্যের এবং অদৃষ্টার্থক বাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে  
 ঋষিবাক্যের মধ্যেও দৃষ্টার্থক বাক্য আছে । লৌকিক আগ্রবাক্যের মধ্যেও অদৃষ্টার্থক বাক্য  
 আছে । কেহ বলেন যে, যে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তদনুলক প্রমাণ ভিন্ন অল্প প্রমাণের  
 দ্বারাও বুঝা যায়, সেই বাক্য দৃষ্টার্থক এবং যে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তদনুলক প্রমাণ-মাত্রগত,  
 তাহা অদৃষ্টার্থক । “শব্দচিন্তামনি”র “তাৎপর্যবাদ” গ্রন্থে উপাধ্যায় পদ্রেশ এবং টীকাকার  
 মধুরানাথ ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এখানে স্মরণ করিতে হইবে, বর্থাৎ শব্দবোধের  
 করণই শব্দপ্রমাণ । কেবল শব্দের দ্বারাই শব্দবোধ জন্মে না, ঐ শব্দের জ্ঞান এবং তাহার  
 অর্গজ্ঞান প্রভৃতিও শব্দবোধে আবশ্যক । শব্দবোধের অব্যবহিত পূর্বে শব্দ থাকেও না, এই  
 সমস্ত কারণে নব্য নৈয়ায়িকগণ বহু বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দজ্ঞানভুক্ত  
 সংস্কারবশতঃ শেষে যে ঐ সকল শব্দবিষয়ক একটা স্মৃতি জন্মে, তাহাই শব্দবোধের করণ এবং  
 তাহার পরে ঐ সকল শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থবিষয়ক যে একটা স্মৃতি জন্মে, তাহাই ঐ করণের  
 ব্যাপার । ঐ ব্যাপারের পরেই ঐ সকল পদার্থের পরস্পর অবয়বোধ বা সম্বন্ধবোধ জন্মে । এই  
 অবয়বোধই “শব্দবোধ” । কেবলমাত্র শব্দজ্ঞান শব্দবোধ নহে । উহা শব্দপ্রমাণের দ্বারাও  
 সর্বত্র হয় না । প্রাচীন মতে চরম কারণরূপ ব্যাপারই মুখ্য করণ পদার্থ । সুতরাং পূর্বোক্ত  
 পদার্থ স্মরণই তাহাদিগের মতে মুখ্য শব্দপ্রমাণ । কিন্তু ঐ পদার্থ স্মরণ বাহার ব্যাপার, তাহাও  
 তাহাদিগের মতে শব্দপ্রমাণ । প্রাচীনগণ চরম কারণ ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিলেও ঐ  
 ব্যাপার দ্বারা বাহ্য কার্যজনক, তাহাকেও করণ বলিতেন, এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে ।  
 প্রকৃত স্থলে অনেক প্রাচীনগণই জায়মান শব্দকে পূর্বোক্ত পদার্থস্মরণরূপ ব্যাপারজনক  
 করণ বলিয়াছেন । অর্থাৎ শব্দজ্ঞানকে করণ না বলিয়া জায়মান শব্দকে করণ বলিয়াছেন ।  
 সুতরাং এই মতে শব্দজ্ঞান শব্দপ্রমাণ হইবে না । জায়মান শব্দ শব্দপ্রমাণ হইবে । নব্য  
 নৈয়ায়িকগণ এই মতের অনেক প্রতিবাদ করিলেও মহর্ষি কিন্তু শব্দজ্ঞানকে শব্দপ্রমাণ বলেন নাই ।  
 তিনি আগ্রবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায়, জায়মান শব্দকেই শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন এবং  
 ঐ প্রমাণ শব্দকে দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক বলাতে উহা যে শব্দই, শব্দজ্ঞান নহে, ইহা নিঃসংশয়ে  
 বুঝা যায় । শব্দই দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক হইতে পারে । ভাষ্যকারও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।  
 তাহাতে মহর্ষি-স্বত্র প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ হয় নাই । কারণ, প্রাচীনগণ শব্দবোধের চরম কারণ  
 পদার্থ স্মরণকে শব্দবোধে মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপারজনক জায়মান শব্দও তাহাদিগের  
 মতে করণ বলিয়া শব্দপ্রমাণ হইবে । জায়মান শব্দের প্রমাণত্ব পক্ষে নব্য নৈয়ায়িকগণের



বহু বিবাদ থাকিলেও নব্য জ্ঞানের মূল আচার্য্য গঙ্গেশ কিন্তু প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হইয়া “শব্দ-চিন্তামণি”র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—“শব্দঃ প্রমাণম্” । সেখানে টীকাকার নথুনাথও<sup>১</sup> জ্ঞানমান শব্দের প্রমাণত্ব পক্ষ অবলম্বন করিয়াই যে গঙ্গেশ ঐ কথা বলিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন । বস্তুতঃ মহর্ষি-সূত্রেও তাহাই আছে এবং “শব্দ প্রমাণ” এইরূপ কথাও প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । নব্যগণও ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন । মনে রাখিতে হইবে, মহর্ষি কিন্তু জ্ঞানমান শব্দমাত্রকেই শব্দপ্রমাণ বলেন নাই, যে শব্দ জ্ঞানমান হইয়া যথার্থ শাকবোধ জন্মায়, তাহাই শব্দপ্রমাণ, শব্দমাত্রই শব্দপ্রমাণ নহে ; তাই বলিয়াছেন,—“আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ” । প্রমাণ-কাণ্ড অতি দুর্বল । ইহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই । “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ গোতমোক্ত এই প্রমাণ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন । মৈথিল পক্ষের মিশ্র প্রভৃতি বহু মহামনীষী গঙ্গেশের “তত্ত্বচিন্তামণি”র টীকা করিয়া এই প্রমাণ ব্যাখ্যার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন । পরে বঙ্গের গৌরবস্বস্ত, প্রতিভার অবতার রঘুনাথ প্রভৃতি নৈরায়িকগণ গঙ্গেশের প্রমাণ ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানবিদ্যার বুগাস্তর আনিয়া গিয়াছেন । যে প্রমাণকাণ্ড নাইয়া এত কাণ্ড, তাহার কত কথা একবারে বলা যাইতে পারে—কিন্তু যে সংক্ষেপে সহজেই বা তাহার সকল কথা বুঝান যাইতে পারে ? তবে প্রমাণপরীক্ষা প্রকরণে এবং অন্ত্যস্ত প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও বহু কথা পাওয়া যাইবে । প্রমাণ সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক । প্রমাণের দ্বারা সকল পদার্থের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, এ জন্তই মহর্ষি সর্বপ্রথমে প্রমাণের উদ্দেশ্য পূর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন । এই প্রমাণের ব্যাখ্যা একটি বিশেষ প্রবন্ধ, তাই ভাষ্যকার মহর্ষির সর্বপ্রথমে কথিত প্রমাণ পদার্থের পরিচয়ের জন্ত মহর্ষির প্রমাণ-প্রকরণের পাঁচটি সূত্রের ভাষ্য করিয়া “প্রমাণভাষ্য” নামের দ্বারা তাহার সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

প্রমাণলক্ষণপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভাষ্য । কিং পুনরনেন প্রমাণেনার্থজাতং প্রমাতব্যমিতি তদুচ্যতে ।

অনুবাদ । এই প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্তং চারিটি প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থসমূহ যথার্থরূপে বুঝিতে হইবে, এ জন্ত অর্থাৎ এই প্রশ্নবশতঃ ( মহর্ষি ) সেই পদার্থগুলি বলিয়াছেন ।

সূত্র । আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধিমনঃপ্রস্বত্তিদোষ-  
প্রেত্যভাবফলদ্রুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ ॥ ৯ ॥

১। “এতচ্চ জ্ঞানমানশব্দস্ত প্রমাণবস্তুকে, শব্দজ্ঞানস্ত প্রমাণবস্তুকে তু তাবুপলব্ধবিষয়জ্ঞানতঃ লক্ষণ-নবোদয়ঃ”—( গঙ্গেশের নথুচিন্তামণি, মাথুনাথ ) এবং যতঃ ।

২। “কিং পুনরনেন প্রমাণেনেতি । জাতাভিপ্রায়নেকবচনং প্রবৃত্তে প্রমেয়ে যথাযথং প্রমাণানামুপবোধোৎপাদ্যং ( ভাষ্যপার্থক্যাকা ) ।

অনুবাদ। (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ, (১২) অপবর্গ—ইহারাই অর্থাৎ এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থই “প্রমেয়” অর্থাৎ “প্রমেয়” নামে প্রথম সূত্রে কথিত “প্রমেয়” পদার্থ।

ভাষ্য। তত্রাত্মা সর্বস্ব দ্রষ্টা, সর্বস্ব ভোক্তা, সর্বজ্ঞঃ, সর্বানুভাবী। তস্ম ভোগায়তনং শরীরম্। ভোগসাধনানীন্দ্রিয়ানি। ভোক্তব্য ইন্দ্রিয়ার্থাঃ। ভোগো বুদ্ধিঃ। সর্বার্থোপলব্ধৌ নেন্দ্রিয়ানি প্রভবন্তীতি সর্ববিষয়মন্তঃকরণং মনঃ। শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিহ্মবেদনানাং নির্বৃত্তিকারণং প্রবৃত্তিদোষাশ্চ। নাস্তেদং শরীরমপূর্বমনুত্তরঞ্চ। পূর্বশরীরানামাদিনাস্তি, উত্তরেবামপবর্গোহস্ত ইতি প্রেত্যভাবঃ। সমাধনহ্মদুঃখোপভোগঃ ফলম্। দুঃখমিতি নেদমনুকূলবেদনায়স্য হ্মস্য প্রতীতেঃ প্রত্যাখ্যানম্। কিং তর্হি? জন্মন এবেদং সমুৎপাদনস্য দুঃখানুসঙ্গাদুঃখেনাবিপ্ৰয়োগাদ-বিবিধবান্ধনাবোগাদুঃখমিতি সমাধিভাবনমুপদিষ্টতে। সমাহিতো ভাবয়তি, ভাবয়ন্ নির্বিদ্যতে, নির্বিদ্যম্য, বৈরাগ্যং, বিরক্তস্যাপবর্গ ইতি। জন্মমরণপ্রবন্ধোচ্ছেদঃ সর্বদুঃখপ্রহাণমপবর্গ ইতি।

অন্ত্যন্তদপি দ্রব্যগুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ং তদভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ম্। অস্ত তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাং সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণেতি।

অনুবাদ। সেই আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে (১) “আত্মা” সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখকারণের দ্রষ্টা (বোদ্ধা), সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখের ভোক্তা, (সুতরাং) “সর্বজ্ঞ” অর্থাৎ সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখের জ্ঞাতা, (সুতরাং) “সর্বানুভাবী” অর্থাৎ সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখপ্রাপ্ত। সেই আত্মার ভোগের স্থান (২) “শরীর”। ভোগের সাধন (৩) “ইন্দ্রিয়” অর্থাৎ গ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ। ভোগ্য (৪) “ইন্দ্রিয়ার্থ”বর্গ, অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়। ভোগ (৫) “বুদ্ধি” অর্থাৎ জ্ঞান। বহিরিন্দ্রিয়গুলি সকল পদার্থের উপলব্ধি-কার্যে সমর্থ হয় না, এ জন্য সর্ববিষয় অর্থাৎ সকল পদার্থই যাহার বিষয় হয়, এমন অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় (৬) “মন”। শরীর, বহিরিন্দ্রিয়, গন্ধাদি



ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, সুখ এবং বেদনার অর্থাৎ দুঃখের উৎপত্তির কারণ (৭) “প্রভৃতি” এবং (৮) “দোষ”বর্গ, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম এবং রাগ, ঘেব ও মোহ। এই আত্মার অর্থাৎ সংসারী জীবাত্মার এই শরীর অপূর্ব নহে, অনন্তরও নহে, অর্থাৎ ইহার পূর্বশরীর নাই, এমন নহে, ইহার উত্তর-শরীর নাই, এমনও নহে। পূর্বশরীরগুলির আদি নাই, (তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায়) পরবর্তী শরীরগুলির মোক্ষ অন্ত অর্থাৎ মোক্ষই শেষ সীমা, মোক্ষ হইলে আত্মার আর শরীর-সম্বন্ধ হয় না, ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনাদি জন্মমরণ-প্রবাহ (৯) “প্রত্যভাব।” সাধন সহিত সুখ-দুঃখের উপভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ এবং তাহার সাধন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি (১০) “ফল।” (১১) “দুঃখ” এই কথাটি অর্থাৎ মহর্ষি প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ না বলিয়া যে দুঃখ বলিয়াছেন, ইহা অনুকূলবেদনীয় অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্বজীবের অনুভব-বিষয় সুখের অনুভূতির অপলাপ নহে অর্থাৎ মহর্ষি এখানে সুখ না বলিয়া সর্বানুভবসিদ্ধ সুখ পদার্থের অস্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি ? অর্থাৎ তবে প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ পদার্থ না বলিয়া কি করিয়াছেন ? (উত্তর) সুখসাধন সহিত জন্মেরই দুঃখানুভববশতঃ, দুঃখের সহিত অবিচ্ছেদবশতঃ, বিবিধ দুঃখসম্বন্ধবশতঃ “ইহা অর্থাৎ সুখ ও সুখের সাধনসম্বিত জন্ম, দুঃখ,” এইরূপে সমাদিভাবনা অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ভাবনা উপদেশ করিয়াছেন। (মুমুকু) সমাহিত হইয়া ভাবিবেন অর্থাৎ জন্মাদি সুখসাধন সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ভাবনা করতঃ নির্বিকল হইবেন, অর্থাৎ সমগ্র জগতে উপেক্ষা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, নির্বিকল মুমুকুর বৈরাগ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুবিষয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে। বিরক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ভাবনার ফলে বৈরাগ্যসম্পন্ন আত্মার মোক্ষ হইবে। জন্মমরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ (অর্থাৎ) সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি (১২) “অপবর্গ।”

অন্যও অর্থাৎ এই আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্নও “দ্রব্য”, “গুণ”, “কর্ম্ম”, “সামান্য”, “বিশেষ”, “সমবায়” (কণাদোক্ত ষট্ পদার্থ) এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ অর্থাৎ ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের অসংখ্য প্রকার-ভেদ থাকায় অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু এই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ অপবর্গ হয়, মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সংসার হয়, এ জন্ম এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থ বিশেষ করিয়া (প্রমেয় বলিয়া) কথিত হইয়াছে।

টিলনী। চতুর্বিধ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই চতুর্বিধ প্রমাণের দ্বারা যে সকল পদার্থকে বর্থাবর্ণপে বুঝিলে মোক্ষ হয়, সেই “প্রমেয়” পদার্থ নিরূপণের জন্য মহর্ষি প্রথমে সেই



প্রমের পদার্থগুলির বিভাগ অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিভাগসূত্রের “প্রমের” শব্দের দ্বারা মহর্ষি-কথিত “প্রমের” পদার্থের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়, তাহাই “প্রমের”। এই প্রমেরবর্ণের বিশেষ লক্ষণগুলি মহর্ষি নিজেই পৃথক্ পৃথক্ সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে মহর্ষি-সূত্রোক্ত প্রমেরগুলির পরিচয় দিয়াছেন।

“প্রমের”বর্ণের প্রথম পদার্থ জীবাশ্ম। ভাষ্যকার তাহাকে বলিয়াছেন—সর্বত্রষ্টা, সর্বভোক্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মভাবী। এখানে “সর্ব” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার সমস্ত স্বধ্বংসনাশন এবং সমস্ত স্বধ্বংসকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে—“প্রমের”বর্ণের মধ্যে জীবাশ্ম অনাদি কাল হইতে সমস্ত স্বধ্বংসনের জ্ঞাতা এবং সমস্ত স্বধ্বংসের ভোক্তা। অর্থাৎ যে জীবাশ্মের সম্বন্ধে বস্তুগুলি স্বধ্বংস ও তাহার কারণ উপস্থিত হয়, সেই জীবাশ্মই সেই সমস্তের জ্ঞাতা, আর কেহ উহার একটিরও জ্ঞাতা নহে। দেখ, ইন্দ্রির প্রভৃতি জড় পদার্থ জ্ঞাতা হইতেই পারে না। পরন্তু বহিরিন্দ্রিয়গুলির বিষয় নিকট বা নিয়মবদ্ধ। উহার জ্ঞাতা হইলে সর্ব-বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা তাহার সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহক সর্ব বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে এবং আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে জীবাশ্মকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন। স্বধ্বংস এবং তাহার সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে তাহার জ্ঞাতা হওয়া যায় না, এ জন্য শেষে বলিয়াছেন—“সর্বাত্মভাবী”। অতু পূর্ব্বক “তু” দ্বাত্ব অর্থ এখানে প্রাপ্তি। ভাষ্যকার অন্তর্জ্ঞও প্রাপ্তি অর্থে “অন্তর্ভব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফল কথা, যে পদার্থ স্বধ্বংসের সমস্ত সাধন ও সমস্ত স্বধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্তের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, সেই পদার্থই জীবাশ্ম। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আত্মাকে এইরূপে বুঝিলে বৈরাগ্য জন্মে, এই জন্যই ভাষ্যকার এখানে আত্মাকে ঐরূপ বলিয়াছেন। আত্মা স্বধ্বংসাদিযুক্তস্বরূপে হয়, কেবল স্বরূপেই গ্রাহ্য। অর্থাৎ প্রমেরবর্ণের মধ্যে “আত্মা” ও “অপবর্গ” উপাদেয়, আরগুলি হের। কিন্তু আত্মাতে বিশেষ এই যে, “আত্মা” ভাষ্যোক্তরূপে হয়, স্বধ্বংসাদি-শূন্য কেবলরূপেই উপাদেয় (বিতীয় সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ মাত্রই প্রমের। মহর্ষি গৌতমের এই সূত্রোক্ত “প্রমের” ভিন্ন কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ এবং তাহাদিগের অসংখ্য ভেদে আরও অসংখ্য প্রমের আছে। প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া সেগুলিও গৌতম-সম্মত প্রমের। তবে মহর্ষি গৌতম আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই “প্রমের” বলিয়াছেন কেন? এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি এবং মিথ্যাজ্ঞানে সংসার, সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলিকেই বিশেষ করিয়া মহর্ষি গৌতম “প্রমের” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ‘সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়’ এই অর্থে মহর্ষি গৌতমের এই “প্রমের” শব্দটি পারিভাষিক। মহর্ষি গৌতম সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলিকেই “প্রমের” নামে পরিভাষিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১। “সর্বস্ত স্বধ্বংসনাশনস্ত ভ্রষ্টা, সর্বস্ত স্বধ্বংসস্ত ভোক্তা, যতঃ স্বধ্বংসনাশনঃ সর্বঃ সর্বক স্বধ্বংসঃ জানাতী অতঃ সর্বজ্ঞঃ, ন চাভ্যাত্মভোক্তানি জানাতীত্যতঃ আত্মা সর্বাত্মভাবী”। অতুভবঃ প্রাপ্তিঃ—তাৎপর্য্যটীকা।



প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি কথাদি যে সকল প্রমের পদার্থ পরম্পরায় এবং অতি পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী হয়, তাহাদিগেরও উল্লেখ করিয়া ত্রব্যাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের উপায় বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতম অপেক্ষাকৃত উচ্চাধিকারী শিষ্যদিগকে উপদেশ করায় যে সকল “প্রমের” পদার্থবিষয়ে নিখ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান বলিয়া তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, সেই “আত্মা” প্রভৃতি “অপবর্গ” পর্যন্ত ষাট প্রকার পদার্থকেই “প্রমের” নামে পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন। এই স্বত্বের দ্বারা অজ্ঞাত সামান্য প্রমেরের নিষেধ করেন নাই। সে জন্তও এই স্বত্বটি বলেন নাই। মহর্ষি গোতম এই স্বত্ব “তু” শব্দের দ্বারা স্থচনা করিয়াছেন যে, “আত্মা” প্রভৃতি এই পদার্থগুলিই সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী বিশেষ প্রমের। এই সকল পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মুমুকুর চরম কর্তব্য, সুতরাং এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই প্রমাণের মুখ্য ফল; এ জন্ত “প্রমাণে”র পরে এই সকল পদার্থগুলিই “প্রমের” নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ফল কথা, এই সকল পদার্থ ভিন্ন আর প্রমের নাই, ইহা স্বত্বার্থ নহে। সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী প্রমের পদার্থ (প্রথম স্বত্ব প্রমাণের পরে উল্লিখিত প্রমের পদার্থ) এইগুলিই, ইহাই স্বত্বার্থ।

উদ্যোতকর এখানে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, স্বত্বোক্ত “তু” শব্দটি স্বত্বোক্ত “প্রমেরং” এই কথার পরে যোগ করিয়া অর্থাৎ “প্রমেরন্ত প্রমেরমেব” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্যন্ত পদার্থগুলি প্রমেরই, অর্থাৎ মুমুকুর যথার্থরূপে জ্ঞাতব্যই, এইরূপ স্বত্বার্থও বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে আত্মাদি পদার্থগুলিই কেবল প্রমের, এইরূপ স্বত্বার্থ না হওয়ার কোন অসম্ভবতা নাই। উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যা স্বত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, স্বত্বকার মহর্ষি এই স্বত্বের দ্বারা তাঁহার প্রথম স্বত্ব উদ্দিষ্ট “প্রমের” পদার্থের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ্যনামগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্বত্ব আত্মাদি পদার্থগুলি মুমুকুর যথার্থরূপে জ্ঞাতব্যই, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য নহে। কোন পদার্থগুলি “প্রমের” নামে উদ্দিষ্ট, অর্থাৎ তাঁহার কথিত প্রমের পদার্থ কি, তাহাই এখানে মহর্ষির বক্তব্য। পরন্তু স্বত্বের “তু” শব্দটির অস্ত্র বোগ মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষির যথাস্থানে “তু” শব্দ প্রয়োগ না করার কোন কারণ নাই। স্বত্বাং উদ্যোতকরের উহা ব্যাখ্যাকৌশলমাত্র। উদ্যোতকর এখানে আরও ব্যাখ্যাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্যটীকাকারও বলিয়াছেন। মূলকথা, আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্যন্ত পদার্থগুলিই “প্রমের”, অর্থাৎ মহর্ষি গোতমের পরিভাষিত সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী প্রমের, ইহাই স্বত্বার্থ। এতদ্বিত্তির সামান্য প্রমের আরও অসংখ্য আছে, সেগুলিও মহর্ষি গোতমের সম্বন্ধ; সেগুলিকেও মহর্ষি গোতম প্রমের বলিতেন। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্ত ইহাও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম “প্রমেয়াচ তুলাপ্রামাণ্যবৎ” (২ অং, ১ ভাঃ, ১৬ স্বত্ব) এই স্বত্ব তুল্যদণ্ডকেও প্রমের বলিয়াছেন। তুল্যদণ্ডের দ্বারা যখন অস্ত্র বস্তুর গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুল্যদণ্ড প্রমাণ, আর যখন সেই তুল্যদণ্ডেরই গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুল্যদণ্ড প্রমের। এইরূপে এক পদার্থও প্রমাণ ও প্রমেরও থাকে, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি ঐরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা এই যে,



মহর্ষি যখন তুলানগুকে প্রেমের বলিয়াছেন, তখন তাঁহার পরিভাষিত আত্মাদি প্রেমের ভিন্ন পদার্থ-গুলিকেও তিনি সামান্যতঃ প্রেমের বলিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়েই বুঝা যায়। তুলানগু যখন মহর্ষির কথিত আত্মাদি প্রেমের পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তখন ঐ তুলানগুকে অন্ততঃ তিনি “প্রেমের” বলিলে আর কি বুঝা বাইতে পারে? যাহাতে পূর্বাঙ্গের বাক্যের বিরোধ না হয়, সেই-রূপেই ত বুঝিতে হইবে?

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, মহর্ষি গোতম তাঁহার পরিভাষিত বিশেষ “প্রেমের”গুলির মধ্যে “স্বথ” পদার্থের উল্লেখ না করিয়া কেবল “দ্বঃখ” পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তবে কি উহার দ্বারা “স্বথ” বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহাই হুচনা করিয়াছেন? এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা নহে। স্বথ পদার্থ সকলেরই অহুতবদিক্ত। মহর্ষি সেই সর্বসিদ্ধ স্বথাহুত্বের অপলাপ করেন নাই। স্বখাদি সমস্ত পদার্থকেই দ্বঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে নির্দেহ ও বৈরাগ্য হয়, তাহার ফলে মোক্ষ হয়; হুতরাং মুমুকু জন্মাদি সমস্তই দ্বঃখ বলিয়া ভাবিবেন। “প্রেমের”-মধ্যে স্বথের উল্লেখ না করিয়া মহর্ষি পুঙ্খানুপুঙ্খকার দ্বঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাধ্য সাধন, সেই সকল পদার্থকেই মহর্ষি গোতম “প্রেমের” বলিয়াছেন। “প্রেমের”র মধ্যে স্বথের উল্লেখ করিলে সেই স্বথেরও তত্ত্বজ্ঞান করিতে হয়। স্বথকে স্বথ বলিয়া না বুঝিয়া অন্তরূপে বুঝিলে স্বথের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কিন্তু স্বথে বৈরাগ্য ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। স্বথ এবং তাহার সাধন জন্মাদিকে দ্বঃখ বলিয়া একাধ্বচিতে ভাবনা বৈরাগ্যের একটি প্রকৃষ্ট উপায়; অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা উহা ঋষিগণের আবিস্কৃত ও পরীক্ষিত বৈরাগ্যের উপায়। মহর্ষি এই হুত্রে স্বথের উল্লেখ না করিয়া বৈরাগ্যের ঐ উপায়টির উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মুমুকু স্বখাদি সমস্তকেই দ্বঃখ বলিয়া সমাহিতচিতে ভাবিবেন। এই হুত্রে “প্রেমের” মধ্যে স্বথের উল্লেখ করিলে সেই স্বথরূপ প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত স্বথকে স্বথ বলিয়াই ভাবিতে হয়। কিন্তু উহা মুমুকুর বৈরাগ্যের বিরোধী। তাই মহর্ষি “প্রেমের” মধ্যে স্বথের উল্লেখ না করিয়া কেবল “দ্বঃখের”ই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি স্বথ পদার্থের অপলাপ করেন নাই। এই হুত্রে পরবর্তী হুত্রে এবং অন্ত্যস্ত হুত্রে মহর্ষি স্বথের কথাও বলিয়াছেন।

হরিভক্ত হরি-বিরচিত “বড় দর্শনসমুচ্চর” নামক গ্রন্থে ভ্রান্তত বর্ণনায় দেখা যায়,—“প্রেমের স্বাভাব্য দেহাদ্যঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়স্বাদি চ”। এখানে গোতমোক্ত “প্রেমের” বর্ণনার স্বথের উল্লেখ থাকায় কোন কোন নবীন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার বাংলায়নের পূর্বে গোতমের প্রেমের বিভাগহুত্রে “স্বথ” শব্দই ছিল, “দ্বঃখ” শব্দ ছিল না। কলকথা, গোতম-সম্প্রদায় সর্লীণভাবাদী ছিলেন না, ইহাই তাঁহাদিগের মূল বক্তব্য। বড় দর্শনসমুচ্চরের বহুজ টীকাকার গুণরত্ন কিন্তু “আন্য” শব্দ ও “আদি” শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত অপর প্রেমেরগুলির সংগ্রহ বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাত পাঠই গ্রাহ্য। তবে প্রেমের বর্ণনার স্বথের উল্লেখ আছে কেন? তাহা টীকাকার বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই।

পুঙ্খানুপুঙ্খ কথায় বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার বাংলায়নের পূর্বে যে সময়ে ভ্রান্তহুত নানা কারণে



বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন হইতেই গোতমের স্বত্র ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নানা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার বাংজ্ঞানের পূর্বে “দশাবয়ববাদী” নৈয়ায়িক ছিলেন, ইহা বাংজ্ঞানের কথা-তেই পাওয়া যায় (৩২ স্বত্র-ভাষ্য টিপনী দ্রষ্টব্য)। অনেক আচার্য্য জ্ঞানস্বত্রের কোন অপেক্ষা না করিয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে জ্ঞানমতের বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে গোতমজ্ঞানমতের কোন কোন সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া নূতন জ্ঞানমতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে পরবর্তী আচার্য্যগণ “জ্ঞানৈকদেশী” বলিয়া গিয়াছেন। যেমন “তর্কিকরক্ষা” ও “মানসোমান” গ্রন্থে প্রমাণত্রয়বাদী নৈয়ায়িকদিগকে “জ্ঞানৈকদেশী” বলা হইয়াছে। “তর্কিকরক্ষা”র টীকার মন্তিনাথ লিখিয়া গিয়াছেন—“জ্ঞানৈকদেশিনো ভূষণাঃ”। “বড়দর্শনসমুচ্চয়”র টীকার গুণরত্ন ভাস্করজ্ঞ-প্রণীত “জ্ঞানসার” নামক গ্রন্থের টীকার মধ্যে “জ্ঞানভূষণ” নামে টীকাপ্রধান এই কথা লিখিয়াছেন। এ জ্ঞান কেহ কেহ অগ্রহণ করেন যে, এই “জ্ঞানভূষণ” ও প্রমাণত্রয়বাদী জ্ঞানৈকদেশী “ভূষণ” অভিন্ন ব্যক্তি। সে বাহা হউক, “ভূষণ”র জ্ঞান-মত বলিয়া যে সকল নূতন মত পাওয়া যায়, তাহা যে প্রচলিত জ্ঞানমতের বিরুদ্ধ এবং জ্ঞানস্বত্রেরও বিরুদ্ধ, এ বিষয়ে সংশয় নাই। “ভূষণের” নূতন জ্ঞানমত “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র টীকা “দিনকরী”তেও পাওয়া যায়। এখন কথা এই যে, যেমন কোন আচার্য্য গোতমোক্ত “উপমান” প্রমাণটিকে ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানমতের প্রচার করিয়াছেন, তদ্রূপ কোন আচার্য্য গোতমোক্ত “প্রমের” পন্থার মধ্যে “জঃখ”কে ছাড়িয়া দিয়া সেই স্থানে “স্বখে”র উল্লেখ পূর্বক স্বাধীন ভাবে নূতন জ্ঞানমতের সৃষ্টি করিতে পারেন। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র হুরি সেই জ্ঞানৈকদেশীর মতকেই তৎকালে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত দেখিয়া “বড়দর্শনসমুচ্চয়” উল্লেখ করিতে পারেন। তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে কোন মতেরই উল্লেখ করেন নাই। বাংজ্ঞানের পূর্বে জ্ঞানস্বত্রের প্রকৃত পাঠ স্থির করিতে না পারিয়া কাল্পনিক পাঠানুসারেও কোন কোন নূতন মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। জৈন দার্শনিকগণ জ্ঞানস্বত্রের পাঠান্তর করনা করিয়াও জ্ঞানস্বত্রের সাহায্যে নিজ মত সমর্থন করিতেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র হুরি নিজ গ্রন্থে সেই কল্পিত জ্ঞান-মতেরও বর্ণন করিতে পারেন। কল কথা, হরিভদ্র হুরির কথার দ্বারা ভাষ্যকার বাংজ্ঞান প্রকৃতির কথাকে উপেক্ষা করিয়া গোতমের প্রমের-স্বত্রে “জঃখ” ছিল না, “স্বখ”ই ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু প্রমেরস্বত্রে যদি “জঃখ”র “উদ্দেশ্য” না থাকে, তবে প্রমেরবর্গের বথাক্রমে লক্ষণ ও পরীক্ষাহলে জঃখের “লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” থাকিবে কেন? এবং প্রমেরবর্গের মধ্যে “স্বখে”র

১। “প্রত্যক্ষদেহং চাক্ষুশং কথ্যবস্তুভেদে” পুনঃ।

অনুমানক তচ্ছাধ সাংখ্যঃ শব্দক তে অপি।

জ্ঞানৈকদেশিনোহণোবৎ”।—তর্কিকরক্ষা (প্রমাণ-প্রকরণ)।

২। “ভাস্করজ্ঞানপ্রণীতে জ্ঞানসারেহাংশটীকাঃ

তাহা দ্বারা টীকা জ্ঞানভূষণা”।—(বড়দর্শনসমুচ্চয়টীকা)।

উদ্দেশ্য থাকিলে যথাস্থানে সুখের লক্ষণ ও পরীক্ষা নাই কেন? দুঃখের লক্ষণ ও পরীক্ষা প্রকরণকে কল্পিত বলিলেও যে সুখের জন্ম এত করনা, এত আকাঙ্ক্ষা, সেই “সুখের” লক্ষণ ও পরীক্ষা জায়গাতে নাই কেন? মহর্ষি গোতম “প্রমাণ” পদার্থের জায় তাহার কথিত “প্রমেয়” পদার্থেরও সবগুলিরই “উদ্দেশ্য,” “লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” করিয়াছেন। প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ পদার্থের “উদ্দেশ্য” করিলে তাহারও “লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” করিতেন। পরন্তু বাহ্যিক জায়-বিদ্যাকে কেবল “হেতুবিদ্যা” বলিয়া জায়গাত্তের অব্যাহত অংশকে কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন, তাহাদিগের মতে এই প্রমেয়-সূত্রটিও কল্পিত হইবে। কারণ, এই সূত্রে “আত্মা” ও “অপবর্গের” কথা থাকায় কেবলমাত্র হেতুবিদ্যার এইরূপ সূত্র থাকিতে পারে না। যদি এই সূত্রটি কল্পিতই হয় অর্থাৎ গোতমের রচিত সূত্রই না হয়, তবে আর গোতমের প্রমেয়-সূত্রে “দুঃখ” ছিল না, “সুখ”ই ছিল, এইরূপ কথা বলা যায় কিরূপে? আর এই সূত্রটি প্রকৃত গোতম সূত্র হইলে দুঃখের লক্ষণ-সূত্র এবং দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণই বা কল্পিত হইবে কেন? এ বিষয়ে অন্তিম কথা চতুর্থধ্যায়ে যথাস্থানে উল্লিখ্য। ১৯

ভাষ্য। তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে, স কিমাপোপদেশ-মাত্রাদেব প্রতিপদ্যতে ইতি? নেতৃত্বাচ্যতে। অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য ইতি। কথম্?

অনুবাদ। তন্মধ্যে আত্মা প্রত্যক্ষ হইতে গৃহীত হয় না অর্থাৎ “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে যে “আত্মা” বলিয়াছেন, তাহাকে লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না। (প্রশ্ন) সেই আত্মা কি কেবল শব্দপ্রমাণ হইতেই গৃহীত হয়? অর্থাৎ পূর্বোক্ত আত্মাকে কি তবে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে? (উত্তর) ইহা বলা হয় নাই অর্থাৎ আত্মাকে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই, অনুমানপ্রমাণ হইতেও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আপ্তবাক্য হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, ঐ বোধকে স্মৃতি করিবার জন্ম অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আত্মার মননও করিতে হইবে। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আত্মাকে বুঝা যাইবে কিরূপে? আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অনুমাপক কি? (এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন)।

সূত্র। ইচ্ছাদৈষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানাত্মানো  
লিঙ্গম্। ১০।

অনুবাদ। ইচ্ছা, দৈষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, এই পদার্থগুলি আত্মার লিঙ্গ, অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক (এবং লক্ষণ)।



বিস্তৃতি। “আমি ইচ্ছা করিতেছি,” “আমি বেধ করিতেছি,” “আমি বস্ত্র করিতেছি,” “আমি ব্রূণিতেছি,” “আমি সুখী,” “আমি দুঃখী,” ইত্যাদিরূপে সকল জীবই ইচ্ছা, বেধ, বস্ত্র, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানকে নিজের আত্মার বর্ধন বলিয়াই মনের দ্বারা বুঝিয়া থাকে। সর্বজীবের তুল্যভাবে জ্ঞানান পূর্ণোক্ত প্রকার অসংখ্য জ্ঞানকে মহর্ষি গোতম ভ্রম না বলিয়া ঐ ইচ্ছা প্রকৃতিতে জীবাত্মার গুণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ ইচ্ছা প্রকৃতি মনোগ্রাহ গুণগুলি জীবাত্মার অসাধারণ বর্ধন বলিয়া জীবাত্মার লক্ষণ। এবং ঐ ইচ্ছা প্রকৃতি গুণগুলি দেহাদি ভিন্ন জীবাত্মার অনুরূপক। দেহ প্রকৃতি কোন অস্থায়ী পদার্থ জীবাত্মা নহে, ইচ্ছা প্রকৃতি গুণের আশ্রয় জীবাত্মা চিরস্থায়ী, ইহা ঐ ইচ্ছা প্রকৃতি গুণের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, আমি বাল্যকালে যে পদার্থকে দেখিয়া সুখভোগ করিয়াছিলাম, বৃদ্ধকালে সেই আমিই সেই পদার্থ বা তজ্জাতীয় পদার্থ দেখিলে পূর্বসংস্কারবশতঃ ঐ পদার্থকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং একই আত্মা দর্শন, সুগ্রাহুত্ব, স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছার কর্তা বা আশ্রয়। একই আত্মা বা আমিই যে সেই পদার্থের বাল্যকালের সেই প্রথম দর্শন হইতে বৃদ্ধকালের পুনর্দর্শন এবং স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত জিয়ার কর্তা বা আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছি, ইহা আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বুঝিতেছি। কারণ, ঐরূপ স্থলে “যে আমি যে জাতীয় সুখজনক পদার্থকে পূর্বে দেখিয়া এখন তাহাকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই সেই জাতীয় পদার্থকে আজ দেখিতেছি এবং তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি”—এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ আমার জন্মিতেছে। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে “প্রত্যক্ষিজ্ঞা” বলে এবং “প্রতিসন্ধান”ও বলে। “প্রতিসন্ধান” বা “প্রত্যক্ষিজ্ঞা” নামক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে পূর্বপ্রত্যক্ষ-পদার্থের স্মৃতি আবশ্যক। একের অহতুত বিষয় অস্ত্রে স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং যে আত্মা পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই আত্মাই দীর্ঘকাল পরে তাহা স্মরণ করিয়া ঐরূপ প্রতিসন্ধান করিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একই আত্মা প্রথম দর্শন, সুখভোগ এবং তাহার পুনর্দর্শন এবং স্মরণ ও গ্রহণের ইচ্ছা করে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য। দেহ প্রকৃতি কোন অকালস্থায়ী পদার্থ আত্মা হইলে পূর্ণোক্ত প্রকার দর্শনাদি এবং “প্রতিসন্ধান” হইতে পারে না। স্মরণ ব্যতীত বধন “প্রতিসন্ধান” অসম্ভব, তখন স্মরণের উপপত্তির জন্ত দর্শন হইতে স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটি আত্মা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ পূর্ণোক্ত প্রকার “প্রতিসন্ধান”রূপ বর্ধন প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হয়। কণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঐরূপ আত্মা মানেন নাই। তাঁহাদিগের মতে “অহং অহং” এইরূপ কণস্থায়ী বিজ্ঞানের সমষ্টি ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু যখন আত্মার পূর্ণোক্ত প্রকার “প্রতিসন্ধান” হইতেছে, তখন আত্মাকে কণকালমাত্র স্থায়ী কোন পদার্থ বলা যায় না। আত্মার প্রত্যক্ষ বিষয়ের আবার বধন স্মরণ হইতেছে, তখন স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী আত্মা অবশ্যই আছে। এইরূপে ইচ্ছার দ্বারা এবং বেধ, বস্ত্র, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের দ্বারা দেহাদি ভিন্ন



চিরস্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব নহে। অতরাং স্বকোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক।

ভাষা। যজ্ঞাতীয়স্বার্থস্ত সন্নিবর্ত্যং স্বখমাত্মোপলব্ধবান্ তজ্জাতীয়-  
মেবার্থং পশ্যমুপাদাতুমিচ্ছতি। সেয়মাদাতুমিচ্ছা একস্থানেকার্থদর্শিনো  
দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্ভবতি লিঙ্গমাত্মনঃ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে  
ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি। এবমেকস্থানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতি-  
সন্ধানাদ্ভুৎথহেতো দ্বেষঃ। যজ্ঞাতীয়োহস্বার্থঃ—স্বখহেতুঃ প্রসিদ্ধ-  
স্তজ্জাতীয়মর্থং পশ্যমাদাতুং প্রযততে সোহয়ং প্রযত্ব একমনেকার্থদর্শিনং  
দর্শনপ্রতিসন্ধাতারমস্তুরেণ ন স্যাৎ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন  
সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি। এতেন ভুৎথহেতো প্রযত্বো ব্যাখ্যাতঃ।  
স্বচ্ছুৎথস্বত্যা চায়ং তৎসাধনমাদদানঃ স্বখমুপলভতে, ভুৎথমুপলভতে,  
স্বচ্ছুৎথে বেদয়তে, পূর্বোক্ত এব হেতুঃ। বুভুৎসমানঃ খল্লয়ং বিমুশতি  
কিং স্বিদিতি। বিমুশংশচ জানীতে ইদমিতি। তদিদং জ্ঞানং বুভুৎসা-  
বিমর্শাভ্যামভিন্নকর্তৃকং গৃহমাণমাত্মলিঙ্গং, পূর্বোক্ত এব হেতুরিতি। তত্র  
দেহান্তরবদিতি বিভজ্যতে। যথা অনাত্মবাদিনো দেহান্তরেণ নিয়তবিষয়া  
বুদ্ধিভেদা ন প্রতিসন্ধীয়ন্তে তথৈকদেহবিষয়া অপি ন প্রতিসন্ধীয়েরন্  
অবিশেষাৎ। সোহয়মেকসত্ত্বস্ত সমাচারঃ স্বয়ং দৃষ্টস্ত অরণং নাত্তদৃষ্টস্ত  
নাদৃষ্টস্ততি। এবং খলু নানাসন্ধানাং সমাচারোহস্তদৃষ্টমন্তো ন  
স্মরতীতি। তদেতচ্ছভয়মশক্যমনাত্মবাদিনা ব্যবস্থাপয়িতুমিতি এবমুপ-  
পন্নমন্ত্যাত্মোতি।

অনুবাদ। যে জাতীয় পদার্থের সন্নিবর্তনশতঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ-  
বশতঃ) আত্মা (অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ) স্বখ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তজ্জাতীয়  
পদার্থকেই দর্শন করতঃ (ঐ আত্মা) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, সেই এই  
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা—অনেকার্থদর্শী অর্থাৎ বিভিন্ন-কালীন নানা পদার্থদর্শী  
এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান হেতুক (অর্থাৎ “যে জাতীয় স্বখজনক পদার্থকে পূর্বের  
দেখিয়া যে আমি এখন তাহাকে স্বখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই  
তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিতেছি,” এইরূপ প্রত্যয়িত্ব হয় বলিয়া) আত্মার  
(পূর্বাপরকালস্থায়ী একটি অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থের) লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক



হয়। “নিয়তবিষয়” অর্থাৎ যাহার বিষয় ব্যবস্থিত বা নির্দিষ্ট, এমন “বুদ্ধিতেদমাত্রে” অর্থাৎ কণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-সম্মত আলয়বিজ্ঞান নামক কণিক-বুদ্ধি-বিশেষ-মাত্রে দেহান্তরের ন্যায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে ভিন্ন দেহে যেমন আলয়-বিজ্ঞানের ঐরূপ প্রতিসন্ধান হয় না, তদ্রূপ (একদেহেও পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না।

( ইচ্ছার পরে ঘেষের আত্ম-লিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন )। এইরূপ ( পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপত্তমান ) দুঃখজনক পদার্থ-বিধয়ে ঘেষ অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির ( পূর্বোক্ত প্রকার ) দর্শনপ্রতিসন্ধান-হেতুক আত্মার লিঙ্গ হয়। ( প্রযত্নের আত্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ) যে জাতীয় পদার্থ এই আত্মার সুখজনক বলিয়া “প্রসিদ্ধ” ( জ্ঞাত ), তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করতঃ ( তিনি ) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, সেই এই প্রযত্ন অনেকার্থদর্শী একটি দর্শন-প্রতিসন্ধানতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ব্যতীত হয় না। নিয়তবিষয়-বুদ্ধিতেদমাত্রে দেহান্তরের ন্যায় ( সেই প্রত্যভিজ্ঞা-বিশেষ ) সম্ভব হয় না। ( সুতরাং পূর্বোক্ত প্রযত্নও পূর্বাপরকালস্থায়ী আত্মার অনুমাপক হয় )। ইহার দ্বারা ( সুখজনক পদার্থের প্রযত্নের ব্যাখ্যার দ্বারা ) দুঃখজনক পদার্থে প্রযত্ন ব্যাখ্যাত হইল। ( অর্থাৎ সুখজনক পদার্থে প্রযত্ন যে ভাবে আত্মার অনুমাপক বলা হইল, দুঃখ-জনক পদার্থে প্রযত্নও সেই ভাবে ( প্রত্যভিজ্ঞার সাহায্যে ) আত্মার অনুমাপক বুঝিতে হইবে )।

( সুখ ও দুঃখের এক সঙ্গে আত্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ) সুখ ও দুঃখের স্মৃতিবশতঃ এই আত্মা তাহার সাধনকে ( সুখ-সাধন পদার্থ ও দুঃখসাধন পদার্থকে ) গ্রহণ করতঃ সুখ উপলব্ধি করেন, দুঃখ উপলব্ধি করেন, সুখ দুঃখ উভয়কে অনুভব করেন; পূর্বোক্তই হেতু ( অর্থাৎ যে আমি পূর্বে সুখ দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই তাহার স্মরণ পূর্বক তাহার সেই সাধন গ্রহণ করতঃ সুখ ও দুঃখ লাভ করিয়া তাহার উপলব্ধি করিতেছি। এইরূপ পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধানই ঐ স্থলে সুখদুঃখের প্রথম অনুভব, তাহার স্মরণ ও পুনরায় সুখ-দুঃখানুভবের এক-কর্তৃকত্ব নিশ্চয়ে হেতু। সুতরাং ঐরূপে জায়মান সুখ ও দুঃখও চিরস্থির আত্মার অনুমাপক )।

( জ্ঞানের আত্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ) বুভুৎসমান হইয়া অর্থাৎ কোন পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ এই আত্মা “ইহা কি ?” এইরূপে সংশয় করেন, সংশয়

করতঃ “ইহা” এইরূপ জ্ঞানেন (নিশ্চয় করেন), সেই এই জ্ঞান (পরবর্তী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) বুঝিবার ইচ্ছা ও সংশয়ের সহিত এককর্ষক বলিয়া জ্ঞায়মান হইয়া অর্থাৎ যে আমি বুঝিবার ইচ্ছা করিয়া সংশয় করিয়াছিলাম, সেই আমি নিশ্চয় করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-নামক মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া আত্মলিঙ্গ অর্থাৎ চিরস্থির আত্মার অনুমাপক হয়। পূর্বোক্তই হেতু (অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাই ঐ স্থলে বুঝিবার ইচ্ছা, সংশয় ও নিশ্চয়ের এক-কর্ষকই নিশ্চয়ে হেতু)।

তন্মধ্যে (পূর্বোক্ত কথার মধ্যে) “দেহাস্তরবৎ” এই কথাটি বিশদরূপে বুঝাইতেছি। যেমন অনাত্মবাদীর অর্থাৎ যাহারা “অহং অহং” এই আকারের ক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ মানেন না, সেই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের (মতে) দেহাস্তর-সমূহে অর্থাৎ নিজ দেহ হইতে ভিন্ন দেহে “নিয়ত বিষয়” (ক্ষণকাল-মাত্র-স্থায়ী বলিয়া বাহাদিগের প্রত্যেকের বিষয় ব্যবস্থিত বা নিয়মবদ্ধ এমন) বুদ্ধি-ভেদগুলি (আলয়-বিজ্ঞান নামক বুদ্ধি-বিশেষ-গুলি) প্রতিসংহিত অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় না, তদ্রূপ একদেহগত (নিজ নিজ দেহগত) বুদ্ধিভেদগুলিও (আলয়-বিজ্ঞান নামক অহংজ্ঞানগুলিও) প্রতিসংহিত (পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাত) হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ নাই। (অর্থাৎ ভিন্নদেহগত বিজ্ঞানগুলি যেমন ভিন্ন, তদ্রূপ নিজ দেহগত বিজ্ঞানগুলিও পরস্পর ভিন্ন। ভিন্ন আত্মার যখন পূর্বোক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, তখন একদেহগত ভিন্ন আত্মারও পূর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। ভিন্ন দেহগত বিজ্ঞান হইতে এক দেহগত বিজ্ঞানগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপযোগী কোন বিশেষ নাই) সেই এই এক আত্মার সমাচার (সিদ্ধান্ত)—স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয়, অগ্ন্যদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (অজ্ঞাত) পদার্থের স্মরণ হয় না। এই রূপই নানা আত্মার সমাচার (সিদ্ধান্ত)—অগ্ন্যদৃষ্ট দৃষ্ট পদার্থ অগ্ন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না (অর্থাৎ প্রতিদেহে এক আত্মাই হউক, আর ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ অসংখ্য আত্মাই হউক, উভয় পক্ষেই স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অগ্ন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ, এই দুইটি সিদ্ধান্ত)। সেই এই উভয় (উভয়-পক্ষ-স্বীকৃত স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অগ্ন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ) অনাত্মবাদী অর্থাৎ যিনি অহং অহং এই আকারের ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন চিরস্থির আত্মা মানেন না, সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। এইরূপে (কবিত প্রকারে) আত্মা (চিরস্থির অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ) আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়।



টিগ্ননী। এই শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাশ্মারই পরমপুরুষার্ণ বলিয়া প্রেমেরবর্গের মধ্যে জীবাশ্মাই প্রধান। তাই মহর্ষি প্রেমেরবর্গের মধ্যে জীবাশ্মারই প্রথম উদ্দেশ্য করিয়া তদনুসারে প্রথমতঃ জীবাশ্মারই লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। মনোব্রাহ্ম ইচ্ছা, দেব, প্রবৃত্ত, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, জীবাশ্মার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ। অর্থাৎ বাহ্যতে মনোব্রাহ্ম ঐ ইচ্ছাদি গুণ জন্মে, তাহাই জীবাশ্মা। পরন্তু জীবাশ্মার যেগুলি লক্ষণ, সেইগুলিই ক্রতিসিদ্ধ জীবাশ্মার সাধক। ইহা বলিবার জন্য মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণেও ইচ্ছাদিকে জীবাশ্মার লিঙ্গ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারও এই সূত্রে মহর্ষির ঐ বিশেষ বক্তব্যটি (ইচ্ছাদির আশ্ম-লিঙ্গত্ব) ব্যাখ্যা করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন।

নিজ-দেহবর্তী জীবাশ্মা সর্বজীবেরই মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমি নাই, ইহা কেহ বুকে না; আমি আছি কি না, এরূপ সংশয়ও কাহারও হয় না। পরন্তু “আমি আছি” ইহা মনের দ্বারা নিঃসংশয়ে সকল জীবই বুঝিয়া থাকে। যিনি ইহা বুঝিয়াও সত্যের অপলাপ করিয়া “আমি নাই” ইহা বলিবেন, তিনি নিজের অস্তিত্বের অপলাপ করিয়া উপহাসাস্পদ হইবেন। শূন্তবাদী, আশ্মার একেবারে নাস্তিত্ব সাধন করিতে বাইয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার আশ্মার নাস্তিত্ব-সাধক প্রমাণই আশ্মার অস্তিত্ব-সাধক হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থে সামান্যতঃ কেহ বিবাদ করিতে পারেন না, বিবাদকারী নিজে না থাকিলে বিবাদ করে কে? কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন;—“আশ্মা প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে”। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, “আমি” বলিয়া আশ্মার যে মানস বোধ, তাহা আশ্মার সামান্য জ্ঞান। ইহা প্রকৃত আশ্মা-সাক্ষ্য-কার নহে। কারণ, উহা দেহাদিতে আশ্মবুদ্ধি। আমি কে? ইহা বথার্থরূপে প্রত্যক্ষ না করিলে আশ্মার বিশেষ জ্ঞান বা প্রকৃত আশ্মাসাক্ষ্য-কার হয় না। ঐ প্রকৃত আশ্মাসাক্ষ্য-কার সমাধি ব্যতীত কাহারই হইতে পারে না। মূলকথা, দেহাদিভিন্নরূপে প্রকৃত আশ্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহেন। তাহা হইলে আশ্মাসাক্ষ্য-কারের জন্য ক্রতিতে আশ্মার শ্রবণ, মনন ও নির্দিষ্টাঙ্গনের বিধি থাকিবে কেন? এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রমাণসংগ্রহের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেও (তৃতীয় স্বত্রভাষ্যে) আশ্মার লৌকিক প্রত্যক্ষের কথা না বলিয়া, যোগসমামি-জাত আলৌকিক প্রত্যক্ষের কথাই বলিয়াছেন এবং অহুমানভাষ্যে ইচ্ছাদির দ্বারা “অপ্রত্যক্ষ” আশ্মার “সামান্যতো দৃষ্ট” অহুমানের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। ফলতঃ আশ্মা দেহাদিভিন্নরূপে লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, ইহাই ভাষ্যার্থ। প্রথমতঃ ক্রতি প্রভৃতি আশ্রয়কা হইতে বথার্থরূপে আশ্মার শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রবোধ করিতে হইবে। পরে ঐ জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য ঐ আশ্মার মনন অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ স্বরূপে অহুমান করিতে হইবে। সে কিরূপে? তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

ভাষ্যে “বজ্রাতীতরূপ” ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি স্বরূপ এবং “তজ্জাতীয়ং পশুন” এই কথার দ্বারা লিঙ্গপরামর্শরূপ অহুমান-প্রমাণই স্থচিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রথমজাত পদার্থদর্শন হইতে পরজাত গ্রহণেচ্ছা পর্য্যন্ত সবগুলিই এক-কর্তৃক। ঐরূপে জারমান ঐ ইচ্ছাই উহাদিগের

সকলের এক-কর্তৃক স্বচনা করিতেছে। একই ব্যক্তি ঐ সবগুলির কর্তা, উহা নিঃসংশয়ে কি করিয়া বুঝিব? তাই হেতু বলিয়াছেন,—“একজ্ঞানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানং”। অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই একই ব্যক্তি ঐ সবগুলির কর্তা, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। কারণ, ঐ স্থলে “যে আমি বে জাতীয় সুখজনক পদার্থকে পূর্বে দেখিয়া এখন তাহাকে সুখজনক বলিয়া স্বরণ করিতেছি, সেই আমিই সেই জাতীয় পদার্থকে দেখিতেছি,” এইরূপ দর্শনবিষয়ক প্রতিসন্ধান অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা ইহা থাকে। উহা সর্ব-সম্মত। ঐ প্রত্যভিজ্ঞাতে পূর্বাভবজনক সংস্কার-বশতঃ স্বরণ আবশ্যক। সুতরাং দর্শন হইতে স্বরণকাল পর্যন্ত স্থায়ী একটা কর্তা আবশ্যক। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাহার স্বরণ করিতে পারেন। দর্শনের কর্তা একজন, স্বরণের কর্তা অল্প, ইহা কখনই হইতে পারে না। মূল কথা, পূর্বোক্ত দর্শনাদির একটি কর্তা না হইলে স্বরণের সম্ভাবনা না থাকায়, পূর্বোক্ত প্রকার মানস-প্রত্যক্ষরূপ সর্বসম্মত প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। সুতরাং বুঝা যায়, যিনি ঐ স্থলে দর্শনের কর্তা, স্বরণের কর্তা, অনুমানের কর্তা এবং ইচ্ছার কর্তা, তিনিই আত্মা। তাহা হইলে পূর্বোক্ত ইচ্ছার দ্বারা চিত্র-স্থির একটি আত্মারই অনুমান হয়, ইহা বলা হইল। শরীর অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে ঐ দর্শন-স্বরণাদির কর্তা বলা যায় না। কারণ, উহারা চিত্র-স্থির নহে। ইহা জন্মেই বাল্যদেহোবনাদি কালভেদে পূর্বদেহের বিনাশ ও দেহান্তর-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাল্যদেহের দৃষ্ট পদার্থ বৃদ্ধদেহে কিরূপে স্বরণ করিবে? নেত্রদৃষ্ট পদার্থ নেত্র নষ্ট হইয়া গেলে অল্প ইন্দ্রিয় কি করিয়া স্বরণ করিবে? মন জ্ঞানাদির করণত্বরূপেই সিদ্ধ, তাহা কর্তা হইতে পারে না। এ সকল কথা তৃতীয়াধ্যায়ে আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যথাস্থানেই তাহা বিশদ প্রকাশিত হইবে।

অনেক ভাষ্যগ্রন্থে “ভবন্তী লিঙ্গমাশ্রয়ঃ”—এইরূপ পাঠ আছে। ভাষ্যোক্ত প্রকারে গ্রহণেচ্ছা অনেকাংশদর্শী এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান-প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়। প্রথম পদার্থদর্শন হইতে তজ্জাতীয় পদার্থের গুনদর্শনাদি কাল পর্যন্ত স্থায়ী একটি আত্মা না থাকিলে ঐরূপে গ্রহণেচ্ছা জন্মিতেই পারে না, সুতরাং ঐ প্রকার ইচ্ছা চিত্র-স্থির আত্মার অনুমাপক, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে তাৎপর্য। “ভবন্তী” ইহার ব্যাখ্যা উৎপাদ্যমান। তাৎপর্যটাকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য গ্রহণ করিলে এ পাঠ ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

ঋণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে “অহং” এই আকারের জ্ঞান ভিন্ন চিত্রস্থির আত্মা নাই। ঐ অহংজ্ঞানের নাম আলয়-বিজ্ঞান। উহা ঋণিক অর্থাৎ ঋণকালমাত্র-স্থায়ী। পূর্ব-জাত “অহংজ্ঞান” পরক্ষণেই আর একটি অহংজ্ঞান জন্মিয়া বিনষ্ট হয়। এইরূপে নদী-প্রবাহের স্তায়, নীপশিখার স্তায়, “অহং অহং অহং” এইরূপ আকারে প্রতিক্ষণ জরিমান আলয়-বিজ্ঞানের প্রবাহই আত্মা। ইহারই নাম বিজ্ঞানস্বক। ইহারই নাম চিত্ত। একদেহগত ঐ বিজ্ঞান-প্রবাহ বা চিত্ত সেই দেহের পক্ষেই আত্মা, উহা অল্প দেহের আত্মা নহে। পূর্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায় পূর্বোক্ত প্রকার বুদ্ধি ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কিছু মনে নাই; তাই তাঁহাদিগকে “বৌদ্ধ”



বলা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত তাঁহার প্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শ্রুতি-সম্মত নিত্য আত্মা নানেন নাই; তাই বেদ-প্রামাণ্য-বিশ্বাসী আত্মিকগণ তাঁহাদিগকে “নাস্তিক” এবং “অনাস্তবাদী” বা “নৈরাশ্র্যবাদী” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বেদবিশ্বাসী আত্মিকগণ কেহ বেদ না মানিলেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেন। মহর্ষি মনুও বেদনিষ্ঠকে নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যিনি পরলোক নানেন না, তিনি “নাস্তিক,” ইহাই কিন্তু নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ। ঐ অর্থে বেদ না মানিয়াও আত্মিক হওয়া যায়। ভাষ্যকার পূর্ববর্ণিত বৌদ্ধসম্মত “আলয়-বিজ্ঞানকে” লক্ষ্য করিয়া এখানে বলিয়াছেন,—“নিয়তবিবরে” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, কণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্মত “অহং-জ্ঞান”গুলি প্রত্যেকেই কণকাল-মাত্র স্থায়ী। সুতরাং উহার নিয়তবিষয় অর্থাৎ উহাদিগের বিষয় নির্দিষ্ট বা ব্যবস্থিত, উহার কোন নির্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না। অতএব ঐ “অহং-জ্ঞানে” পূর্বোক্ত দর্শন প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। “প্রতিসন্ধান” বলিতে এখানে প্রত্যভিজ্ঞা; উহা প্রত্যক-বিশেষ। পূর্বাভূত বিষয়ের স্বরণ ব্যতীত ঐ প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে না। যখন পূর্ববর্ণিত হলে পূর্বোক্ত প্রকারে দর্শনপ্রতিসন্ধান জন্মে, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই, (প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না। মানস-প্রত্যাকরূপ ঐ প্রত্যভিজ্ঞায় মনঃ স্তম্ভঃ প্রমাণ) তখন ঐ স্থলে আত্মা অবশ্য তাহার পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের স্বরণ করিয়া থাকে; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বৌদ্ধসম্মত অহংজ্ঞানরূপ আত্মা যখন কণকাল-স্থায়ী, তখন যে অহংজ্ঞানরূপ আত্মা পূর্বে দর্শন করিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হওয়ায়, সে আত্মা আর পরে তাহা স্বরণ করিতে পারে না। পরজাত অহংজ্ঞানরূপ কোন আত্মাও তাহা স্বরণ করিতে পারে না। কারণ, সেই পরজাত আত্মা পূর্বে সে পদার্থ দেখে নাই, তখন তাহার জন্মই হয় নাই। অন্তের দৃষ্ট পদার্থ অন্তে স্বরণ করিতে পারে না। যিনি ত্রুটী, তাঁহাতেই সংস্কার জন্মে; তজ্জন্ম তিনিই স্বরণ করেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন, নচেৎ তাহাদিগের মতে একদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মা অন্তদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ অন্ত আত্মার দৃষ্ট বিষয় স্বরণ করে না কেন? রামের দৃষ্ট বিষয় জ্ঞান না দেখিলে গ্রাম তাহা স্বরণ করিতে পারে কি? অতএব বৌদ্ধসম্মত একদেহগত কণিক “অহংজ্ঞান”গুলিও পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অন্ত-দেহগত “অহংজ্ঞান”গুলির দ্বারা একে অন্তের অগ্রভূত বিষয় স্বরণ করিতে পারে না। স্বরণের সম্ভাবনা না থাকার তাহাতে পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাও অসম্ভব। সুতরাং বৌদ্ধসম্মত কণিক অহংজ্ঞানগুলি কোনরূপেই “আত্মা” হইতে পারে না। ভাষ্যকার “নিয়তবিবরে” এই কথার দ্বারা বৌদ্ধ-সম্মত আলয়বিজ্ঞানে প্রত্যভিজ্ঞা কেন সম্ভব নহে, তাহার হেতু সূচনা করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, কণিক অহংজ্ঞানগুলির কোনটিই এক কণের অধিক

১। “প্রতি নাস্তি বিহং মতিঃ” (৪৪।১০)।—পাণিনিয়ঃ। অতি পরলোক ইত্যেব মতিবস্ত স নাস্তিকঃ।—নাস্তীতি মতিবস্ত স নাস্তিকঃ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী)।

কাল স্থায়ী না হইলেও নির্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ “অহংজ্ঞানে”র প্রবাহ চলিতেই থাকে। ঐ অহংজ্ঞানের প্রবাহই আত্মা। উহার নাম “অহংজ্ঞান-সত্তান”। উহার মধ্যগত এক একটি “অহংজ্ঞানের” নাম “অহংজ্ঞানসত্তানী”। নির্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মার উদ্বেদ না হওয়ার তাহাতে স্রবণ ও প্রত্যভিজ্ঞার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার এই সমাদানের অসারতা সূচনার জন্তই “বুদ্ধিভেদমাত্রে” এই স্থলে “মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধ-সম্মত অহংজ্ঞানের প্রবাহ বা সত্তান ঐ অহংজ্ঞানসত্তানী হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। ঐ বুদ্ধিপ্রবাহও কতকগুলি বুদ্ধি-বিশেষ মাত্র। কণমাত্র-স্থায়ী বলিয়া যখন কোন বুদ্ধিবিশেষই পূর্কোক্ত প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না, তখন বুদ্ধিপ্রবাহেই বা কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? ঐ বুদ্ধিবিশেষ ভিন্ন বুদ্ধিপ্রবাহ ত কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে? যদি ঐ অহংজ্ঞানের প্রবাহ অতিরিক্ত পদার্থই হয়, তাহা হইলে পূর্কদৃষ্ট পদার্থের স্রবণের জন্ত তাহাকে চিরস্থির পদার্থই বলিতে হইবে—তাহা হইলে চিরস্থির অতিরিক্ত আত্মা মানাই হইল,—নাম মাত্র কোন বিবাদ নাই। যে কোন নামে চিরস্থির আত্মা মানিলেই পূর্কোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিজ সিদ্ধান্ত আগ করিতে হইবে।

এইরূপে ভাষ্যকার পূর্কোক্ত প্রতিসন্ধানের দ্বারাই ইচ্ছাদিকে চিরস্থির আত্মার অমুদ্রাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্য-বর্ণিত ঐ ইচ্ছাদি স্থলে পূর্কদৃষ্ট পদার্থের স্রবণের সহিত পূর্ক-জাত জ্ঞান ও পরজাত জ্ঞানের একবিবহররূপে যে প্রতিসন্ধান হয়, তাহাই চিরস্থির আত্মাসিদ্ধিতে ব্যতিরেকী হেতু, সূত্রোক্ত ইচ্ছাদি গুণই বস্তুতঃ হেতু নহে। “পূর্কোক্ত এব হেতুঃ” এই বখার দ্বারাও পরে দুই স্থলে ভাষ্যকার তাঁহার পূর্কোক্ত প্রতিসন্ধানরূপ হেতুকেই স্রবণ করাইয়াছেন। ভাষ্য-বর্ণিত ইচ্ছাদি স্থলে ঐরূপ প্রতিসন্ধান জন্মে বলিয়াই সূত্রকার ইচ্ছাদিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন। লিঙ্গ বলিতে এখানে অমুদ্রাপক মাত্র।

ইচ্ছাদিকে আত্মার লক্ষণ বলিবার জন্তও ঐরূপ ভাবে সূত্র বলিতে হইয়াছে। অমুদ্রান-ভাষ্যে ভাষ্যকার যে ভাবে আত্মার “সামান্ততো দৃষ্ট” অমুদ্রান বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা এবং সেখানে বার্তিককার প্রভৃতির কথা পূর্কোই বলা হইয়াছে। এখানেও বার্তিককার চরমকল্পে এই সূত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যাস্বর প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্কোক্ত বৌদ্ধসম্মত আত্মাতে ভাষ্যকার বাংলায়ন-প্রদর্শিত অমুদ্রাপতির উদ্ভাসের জন্ত দিগ্-নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ মহামনীষিগণ যেরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, উদ্যোতকর স্রাববার্তিক তাহার উল্লেখ করিয়া থগুন করিয়াছেন। ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার তাহার বিশদ প্রকাশ করিয়াছেন। “শারীরক ভাষ্য”, “ভামতী”, উদয়নের “বৌদ্ধাবিকার” ও “কুহুমাত্তলি” প্রভৃতি গ্রন্থেও পূর্কোক্ত বৌদ্ধমতের বিশদ সমালোচনা ও সমীচীন থগুন হইয়াছে। বাহ্যভাষ্যের সে সব কথা এখানে পরিত্যক্ত হইল। বাংলায়ন এই স্রাব-ভাষ্যে বহু স্থানেই বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

১। “স্বতিঃ পূর্ণাশরপ্রভয়াভ্যাসেককর্কটিকা উভাত্যাং সহ একবিবহরেন প্রতিসন্ধীহমানবাং”—ব্রাহ্মবর্তিক-তাৎপর্য্যটীকা।



ইতঃপূর্বেও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ গিয়াছে। এই সূত্র-ভাষ্যের দ্বারা অন্য সূত্র-ভাষ্যেও স্পষ্ট বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ প্রচুর আছে—তবুও “বিশ্বকোষে” বাংস্ফাদনের অতি-প্রাচীনত্ব সমর্থনের জন্য লিখিত হইয়াছে,—  
“বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যকার প্রসঙ্গপাদি অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়াছেন; কিন্তু বাংস্ফাদন কোথাও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই” ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ, ত্রায় শব্দ—৫০১ পৃষ্ঠা)।

ভাষ্য। তস্মা ভোগাধিষ্ঠানম্।

অনুবাদ। তাহার (পূর্বসূত্রবর্ণিত জীবাঙ্কার) ভোগের অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের অধিষ্ঠান (স্থান)।

সূত্র। চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ॥১১॥

অনুবাদ। চেষ্টার আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এবং অর্থের অর্থাৎ সুখ-দুঃখের আশ্রয় শরীর। (অর্থাৎ চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থ্যশ্রয়ত্ব, এই তিনটি শরীরের লক্ষণ)।

ভাষ্য। কথং চেষ্টাশ্রয়ঃ? ঈপ্সিতং জিহাসিতং বাহর্থমধিকৃত্য ঈপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপায়ানুষ্ঠানলক্ষণা সমীহা চেষ্টা, সা যত্র বর্ততে তচ্ছরীরম্। কথমিন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ? যত্নানুগ্রাহেণানুগৃহীতানি উপঘাতে চোপহতানি স্ববিষয়েষু সাধ্বমাধুযু বর্তন্তে স এষামাশ্রয়ন্তুচ্ছরীরম্। কথমর্থ্যশ্রয়ঃ? যন্নিম্নায়তনে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাৎপন্নয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ প্রতिसংবেদনং প্রবর্ততে স এষামাশ্রয়ন্তুচ্ছরীরমিতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) চেষ্টাশ্রয় কিরূপে? (অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ চেষ্টা শরীর ভিন্ন অন্য পদার্থেও থাকে, আবার কোন শরীর-বিশেষেও নাই; সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) প্রাপ্তির ইচ্ছার বিপরীভূত অথবা পরিত্যাগের ইচ্ছার বিপরীভূত পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাপ্তির ইচ্ছা বা পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্ন ব্যক্তির তাহার (প্রাপ্তি বা পরিত্যাগের) উপায়ানুষ্ঠানরূপ সমীহা ‘চেষ্টা’; তাহা যেখানে থাকে, তাহা “শরীর”। (পূর্বপক্ষ) “ইন্দ্রিয়াশ্রয়” কিরূপে? (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলেই যদি শরীর হয়, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে ইন্দ্রিয় সংযোগকালে ঘটাদি পদার্থও শরীর হইয়া পড়ে; সুতরাং “ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) যাহার অনুগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ বাহার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট হইয়া এবং যাহার বিনাশে অবশ্য বিনষ্ট হইবে, এমন বহিরিন্দ্রিয়বর্গ সাধু ও অসাধু স্ববিষয়সমূহে (গন্ধাদি বিষয়সমূহে)

বর্তমান হয়, তাহা ইহাদিগের ( ইন্দ্রিয়-বর্গের ) আশ্রয়—তাহা শরীর । ( পূর্ববপক্ষ ) অর্থাশ্রয় কিরূপে ? অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত গন্ধাদি “অর্থ” ঘটাদি পদার্থেও আছে ; সুতরাং “অর্থাশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বলা যায় না । ( উত্তর ) যে অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধকর্যহেতুক উৎপন্ন স্বর্থ ও হৃৎখের অনুভূতি হয়, তাহা ইহাদিগের ( স্বর্থ-হৃৎখরূপ অর্থের ) আশ্রয়, তাহা শরীর ।

টিপ্পনী । “তত্ত্ব ভোগাধিষ্ঠানং” এই কথা দ্বারা ভাষ্যকার স্বত্বের অবতারণা করিয়াছেন । স্বত্ব-বাক্যের সহিত ইহার যোগ্যতা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে । ভাষ্যকার প্রথমতঃ ঐ কথার দ্বারা শরীর আত্মার ভোগস্থান, শরীর না থাকিলে আত্মার কোন ভোগ হইতে পারে না ; সুতরাং শরীরই আত্মার সকল অনর্থের পরম নিদান, এই তত্ত্ব জানাইয়া আত্মার পরে শরীরের কথা বলাই সংগত, ইহাই সূচনা করিয়াছেন । ‘চেষ্টাশ্রয়ত্ব’, ‘ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব’, ‘অর্থাশ্রয়ত্ব’—এই তিনটি শরীরের পৃথক পৃথক লক্ষণ । চেষ্টা বলিতে ক্রিয়ামাত্র নহে । হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহারের ইচ্ছাবশতঃ যত্নবান হইয়া তাহার উপায়ানুষ্ঠানরূপ যে শারীরিক ক্রিয়া, তাহাই চেষ্টা । ঘটাদি পদার্থে তাহা নাই । সমাহিত ব্যক্তির শরীরে এবং পান্য-মধ্যবর্তী ভেদাদি-শরীরে তাহা না থাকিলেও তাহার যোগ্যতা আছে । বুক্ষাদিরও চেষ্টা আছে । বুক্ষাদি উদ্ভিদবর্গের জীবন, চৈতন্ত্য ও স্বর্থহৃৎখের দ্বারা মন্বাদি শাস্ত্রে কীৰ্ত্তিত, অনেক দার্শনিক কর্তৃক সমর্থিত এবং কালিদাসাদি কবিগণ কর্তৃক গীত আছে । তাৎপর্য-টীকা-কার বুক্ষাদিকে শরীরের লক্ষণের লক্ষ্য বলেন নাই । ইন্দ্রিয়াশ্রয় বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বা ইন্দ্রিয়ের অবিকরণ নহে । শরীর থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকে, শরীর নষ্ট হইলে ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়, এই অর্থে শরীরকে ইন্দ্রিয়াশ্রয় বলা হইয়াছে । ঐ ভাবে ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ হইতে পারে । ‘অর্থ’ বলিতে এখানে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ নহে । গন্ধাদি প্রত্যক্ষ-জ্ঞাত স্বর্থ ও হৃৎখই এখানে “অর্থ” শব্দের প্রতিপাদ্য । অর্থাৎ গন্ধাদি অর্থ-প্রযুক্ত স্বর্থহৃৎখের আশ্রয় বলিয়াই শরীরকে অর্থাশ্রয় বলা হইয়াছে । শরীর না থাকিলে ঐ স্বর্থ-হৃৎখ হয় না এবং বিশ্বব্যাপী জীবাশ্রয় শরীর-প্রদেশেই ঐ স্বর্থহৃৎখের উৎপত্তি ও অনুভূতি হয় ; সুতরাং পূর্বোক্ত “অর্থাশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ হইতে পারে ।

ভাষ্য । ভোগসাধনানি পুনঃ ।

অনুবাদ । ( পূর্বোক্ত আত্মার ) ভোগসাধন কিন্তু, অর্থাৎ স্বর্থহৃৎখ-ভোগের পরম্পরার সাধন কিন্তু—

সূত্র । আণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রানীন্দ্রিয়ানি  
ভূতেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । ভূতজন্তু অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক আণ, রসন,



চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, ( এই পাঁচটি ) ইন্দ্রিয় । ( অর্থাৎ আশ্রয় প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম, আশ্রয় প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ ) ।

ভাষ্য । জিজ্ঞাত্যেনেনতি আশ্রয়ং, গন্ধং গৃহ্ণাতীতি । রসয়ত্যেনেনতি রসনং, রসং গৃহ্ণাতীতি । চর্কেহেনেনতি চক্ষুঃ, রূপং পশ্যতীতি । ত্বক্স্থান-মিস্রিয়ং ত্বক্, তদুপচারঃ স্থানাদিতি । শৃণোত্যেনেনতি শ্রোত্রং, শব্দং গৃহ্ণাতীতি । এবং সমাখ্যানির্বচনসামর্থ্যাদ্বোধ্যং অবিসয়গ্রহণ-লক্ষণানো-দ্ভিয়াণীতি । ভূতেভ্য ইতি নানাপ্রকৃতিনামেষাং সতাং বিষয়নিয়মো নৈকপ্রকৃতিনাং, সতি চ বিষয়নিয়মে অবিসয়গ্রহণলক্ষণং ভবতীতি ।

অনুবাদ । ইহার দ্বারা আশ্রয় করে, এ জন্ত আশ্রয় । ( আশ্রয় করে, ইহার অর্থ ) গন্ধ গ্রহণ করে । ইহার দ্বারা আস্বাদ করে, এ জন্ত রসন । ( আস্বাদ করে, ইহার অর্থ ) রস গ্রহণ করে । ইহার দ্বারা দেখে, এ জন্ত চক্ষুঃ । ( দেখে, ইহার অর্থ ) রূপ দর্শন করে । ত্বক্স্থান অর্থাৎ চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয় ত্বক্ । স্থান-বশতঃ অর্থাৎ চর্ম্ম ঐ ইন্দ্রিয়ের স্থান বলিয়া তাহাতে ( চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়ে ) উপচার । চর্ম্মবাচক “ত্বক্” শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ ) । ইহার দ্বারা শ্রবণ করে, এ জন্ত শ্রোত্র, ( শ্রবণ করে, ইহার অর্থ ) শব্দ গ্রহণ করে । এইরূপ সমাখ্যানি নির্বচন-সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় প্রভৃতি পাঁচটি সংজ্ঞার যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইল, সেইরূপ অর্থে সামর্থ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি অবিসয়গ্রহণ-লক্ষণ, ইহা বুঝিবে । ( অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি সাধনই আশ্রয়াদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ ) । ইহারা নানাপ্রকৃতি হইলে অর্থাৎ পৃথিব্যাदि ভিন্ন ভিন্ন উপাদান-সম্বৃত হইলে ইহাদিগের ( আশ্রয়াদি ইন্দ্রিয়বর্গের ) বিষয় ব্যবস্থা হয় ; একপ্রকৃতি হইলে অর্থাৎ কোন একটি মাত্র উপাদান-সম্বৃত হইলে ইহাদিগের বিষয় ব্যবস্থা হয় না, বিষয় ব্যবস্থা হইলেই ইহাদিগের অবিসয়-গ্রহণ-লক্ষণ হয়, এ জন্ত ‘ভূতেভ্যঃ’ এই কথাটি বলিয়াছেন ।

টিপ্পনী । ইন্দ্রিয়গ্ৰহণ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পূর্বে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণই বক্তব্য । ঐ ইন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ সূচনার জন্তই ভাষ্যকার প্রথমতঃ “ভোগসাধনানি পুনঃ” এর ভাষ্যের দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । সূত্রবাক্যের সহিত উহার যোজনা বুঝিতে হইবে । সূত্রদ্বয়ের সাক্ষাৎ-কারের নাম ভোগ । মন তাহার সাক্ষাৎ সাধন হইলেও আশ্রয়াদি ইন্দ্রিয় পাঁচটি তাহার পরম্পরায় সাধন । শরীর তাহার প্রতিষ্ঠান, আশ্রয়াদি ইন্দ্রিয়বর্গই কিন্তু তাহার পরম্পরায় সাধন । মর্হর্ষি এই একটি সূত্রের দ্বারাই আশ্রয়াদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন । তাহার দ্বারাও ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন । সূত্রে “ইন্দ্রিয়াণি”

এই অংশ লক্ষ্য-নির্দেশ। উহার ব্যাখ্যা “জ্ঞানাদিনি”। জ্ঞানাদি শব্দের দ্বারা কেবল ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের বিশেষ উদ্দেশ্যরূপ বিভাগ করা হয় নাই, উহার দ্বারাই পাঁচটি লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার ঐ জ্ঞানাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থে ব্যাখ্যার দ্বারা ঐ পাঁচটি লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—গন্ধগ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়। রস-গ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় রসেন্দ্রিয়। রূপ দর্শনের সাধন ইন্দ্রিয় চক্ষুরিন্দ্রিয়। স্পর্শ-গ্রহণের সাধন চর্ম্মস্থিত ইন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয়। শব্দ-গ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় শ্রোত্ৰেন্দ্রিয়। যেমন “মক” শব্দের মক্যস্থ ব্যক্তিতে লাক্ষণিক প্রয়োগ<sup>১</sup> হয়, তদ্রূপ চর্মে অবস্থিত বলিয়া চর্ম্মবাচক “ক্” শব্দের স্পর্শগ্রাহক চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়ে লাক্ষণিক প্রয়োগ বশতঃ উহার দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয়-বিশেষই বুঝিতে হইবে। জ্ঞানাদি সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা গেল, ইহার স্ব স্ব বিষয়েরই গ্রাহক;—সুতরাং উহার দ্বারা স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি-সাধনই জ্ঞানাদি পক্ষেত্রিয়ের সামান্য লক্ষণ, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

সাংখ্যমতে এক “অহঙ্কার” হইতেই সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। কিন্তু তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়-বর্গের বিষয়-ব্যবহা হয় না। অর্থাৎ গন্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই বিষয়, অথ ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই বিষয়, অথ ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, এইরূপে বহিরিন্দ্রিয়গুলির যে বিষয়-নিয়ম আছে, তাহা অব্যক্তিক হইয়া পড়ে। ঐ ইন্দ্রিয়গুলি কিস্তি, জ্ঞান প্রভৃতি বিজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন উপাদানসম্বৃত হইলে ঐ বিষয়-নিয়ম হইতে পারে। মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ে ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কলতঃ বহিরিন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-ব্যবহা রক্ষার জন্তই মহর্ষি হুত্রে “ভূতেভ্যঃ” এই কথার দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে “ভৌতিক” বলিয়া গিয়াছেন। বহিরিন্দ্রিয়-বর্গের বিষয়-নিয়ম থাকাতাই স্ব বিষয় গ্রহণ অর্গৎ স্ববিষয়-গ্রাহক বহিরিন্দ্রিয়-বর্গের সামান্য লক্ষণ হইতে পারে। তাই শেষে বলিয়াছেন,—‘স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণং ভবতি’। বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ নামক নিত্য ভূতস্বরূপ বলিয়া ভূতজন্ত নহে, তথাপি জ্ঞানাদি চারিটি ইন্দ্রিয়কে ভূতজন্ত বলিতে যাইয়া বহুর অনুরোধে মহর্ষি “ভূতেভ্যঃ” এই হুত্রে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কলতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ও সাংখ্য-সম্মত “অহঙ্কার” হইতে সদুদ্ভূত নহে, উহাও জ্ঞানাদির স্থায় ভৌতিক বা ভূতাত্মক, ইহাই হুত্ৰাকার মহর্ষির তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশ এক হইলেও কর্ণগোলকের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ-বিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ-গোলক-সংযোগরূপ উপাধিগুলি জন্ত পদার্থ বলিয়া এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়গুলিও জন্ত ও ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার-নিক। ঐ ব্যবহারিক ভেদ দ্বিরাই মহর্ষি শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষেও “ভূতেভ্যঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশজন্ত নহে, উহা আকাশই। ইন্দ্রিয়-হুত্রে মনের উল্লেখ নাই কেন? ইহা প্রত্যক্ষ-সুত্রভাষ্যেই ভাষ্যকার বলিয়া আসিয়াছেন।

ভাষ্য। কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি ?

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়-কারণ অর্থাৎ জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়ের উপাদান ভূতবর্গ কোন্গুলি ?



## সূত্র । পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥১৩॥

অনুবাদ । ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এইগুলি ( এই পাঁচটি ) ভূতবর্গ ।

ভাষ্য । সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশো ভূতানাং বিভক্তানাং স্বেচং  
কার্য্যং ভবিব্যতীতি ।

অনুবাদ । বিভক্ত ভূতবর্গের কার্য্য স্বেচং হইবে, অর্থাৎ সহজে বলা যাইবে,  
এ জগৎ সংজ্ঞা শব্দগুলির দ্বারা ( ভূতবর্গের ) পৃথক উপদেশ করিয়াছেন ।

টীপনী । পূর্বসূত্রে ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে ভূতবর্গের উপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে  
ভূতবর্গের বিশেষ সংজ্ঞাগুলি বলা হয় নাই । মহর্ষি পরে ভূতবর্গের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বাহ্য  
বলিবেন, তাহা সুখবোধ্য করিবার জন্ত এই প্রমেয়-লক্ষণ-প্রকরণেও ভূতবর্গের সংজ্ঞাগুলি বলিয়া  
গিয়াছেন । স্মারদ-ব্যস্তিকার এই সূত্রের ও ভাষ্যের কোন উল্লেখ না করায় অনেকে বলেন, এইটি  
সূত্র নহে । “কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি” এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার নিজেই তাহার উত্তর-বাক্য  
লিখিয়া গিয়াছেন । অর্থাৎ ঐ অংশ সমস্তই ভাষ্য ।

কিন্তু ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাহার “স্মারদসূচীনিবন্ধ” গ্রন্থে এটিকে সূত্রসম্বোধেই গণ্য করিয়া  
স্মারদ-সূত্রের ৫২৮ সংখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন । সুতরাং ইহা সূত্ররূপেই গৃহীত হইল ।  
“সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশঃ” ইত্যাদি ভাষ্যের ভাবেও ভাষ্যকারের মতে এইটি সূত্র বলিয়াই বুঝা  
যায় । বৃত্তিকার বিদ্যনাথও এইটিকে সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য । ইমে তু খলু ।

অনুবাদ । এইগুলিই কিন্তু—

## সূত্র । গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদি-গুণা- স্তদর্থাঃ ॥১৪॥

অনুবাদ । পৃথিব্যাদির গুণ ( পূর্বেবাক্ত পঞ্চ ভূতের গুণ ) গন্ধ, রস, রূপ,  
স্পর্শ, শব্দ, ( এই পাঁচটি ) “তদর্থাঃ” ( ইন্দ্রিয়ার্হ ) ।

ভাষ্য । পৃথিব্যাদীনাম্ যথাবিনিয়োগং গুণা ইন্দ্রিয়াণাম্ যথাক্রমমর্থী  
বিষয়া ইতি ।

অনুবাদ । পৃথিবী প্রভৃতির ব্যবস্থানুসারে গুণগুলি অর্থাৎ পঞ্চভূতের মধ্যে  
যাহার যে গুণ ব্যবহৃত আছে, সেই গুণগুলি ( গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ )  
যথাক্রমে ইন্দ্রিয়বর্গের অর্থ—কি না বিষয় ।

টিপ্পনী। পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকেই গন্ধাদি সমস্ত গুণ নাই; তাই বলিয়াছেন,—“যথা-  
বিনিয়োগম্”। অর্থাৎ পরে মহর্ষি যে ভূতের যে গুণ ব্যবহা করিয়াছেন, তদনুসারেই এখানে  
“পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। ঐ গন্ধাদি পাঁচটি গুণই “অর্থ” নামক  
প্রমেয়। উহার যথাক্রমে জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়ের অর্গ অর্থাৎ বিবর, ইহা জানাইবার জন্যই স্বত্রে  
বলিয়াছেন,—“তদর্গাঃ।” তদর্গত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্গত্বই ঐ অর্থ নামক প্রমেয়ের লক্ষণ। তাই  
ভাষ্যকার ঐ লক্ষণেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়াণাং যথাক্রমমর্গা বিদ্যাঃ”।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, স্বত্রে “পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই স্থলে বস্তুতঃ পুরুষ সমাসই  
ভাবাদি-সম্বৃত। পৃথিব্যাদি গুণী ও তাহার গুণগুলি অস্তিত্ব পদার্থ নহে; ইহাই ঐ বস্তুতঃ পুরুষ  
সমাসের দ্বারা মহর্ষি জানাইয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান-বার্ত্তিককার বহু বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন  
যে, ঐ স্থলে দ্বন্দ্ব-সমাসই মহর্ষির অভিপ্রেত। পৃথিব্যাদি বলিতে ক্ষিত্তি, জল, তেজঃ, এই তিনটি  
ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্য এবং গুণ বলিতে গন্ধাদি-ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত গুণ-কন্ধ্যাদি বুঝিতে হইবে।  
কারণ, সেগুলিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্গ। কেবল গন্ধাদি পাঁচটি গুণকেই মহর্ষি ইন্দ্রিয়ার্গ  
বলিতে পারেন না। মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম স্বত্রেও দর্শন ও স্পর্শনযোগ্য ঘট-পটাদি পদার্থকে  
“অর্থ” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানবার্ত্তিকব্যাক্য্যার তাৎপর্য্যটাকাঁকার বলিয়াছেন যে,  
“পৃথিব্যাদীনাম্” এই ভাষ্য বস্তুতঃ পুরুষের জ্ঞাপক নহে। উহা অর্থকথন মাত্র। বস্তুতঃ ভাষ্য  
পাঠ করিলে এখানে বিশ্বনাথের কথাই মনে আসে। তাৎপর্য্যটাকাঁকারের নিজের মতেও এখানে  
বস্তুতঃ পুরুষ সমাসই ভাব্যসম্বৃত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, পূর্বোক্ত “ইমে তু খলু” এই ভাষ্য-  
ব্যাক্য্য তাৎপর্য্যটাকাঁকার বলিয়াছেন যে, “তু” শব্দের দ্বারা অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ার্গ হইতে ব্যতীত  
করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্গ আরও অনেক থাকিলেও সেগুলিকে মহর্ষি ইন্দ্রিয়ার্গের মধ্যে উল্লেখ  
করেন নাই। ইন্দ্রিয়ার্গের মধ্যে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্গের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সসাধক এবং উহাদিগেরই  
নিখ্যাঙ্কান সংসারের নিদান; তাই মহর্ষি ঐ পাঁচটিকেই বিশেষ করিয়া প্রদেয়নমধ্যে “অর্থ” নামে  
উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটাকাঁকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিব্যাদি তিনটি এবং  
অন্তান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাদি ইন্দ্রিয়ার্গ হইলেও মহর্ষি তাহা বলেন নাই। সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসের দ্বারা  
তাহাদিগের সংগ্রহ নিস্ত্রয়োজন। পরন্তু তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্রিয়ার্গ-পরীক্ষাহলে গন্ধাদি পাঁচটি  
ইন্দ্রিয়ার্গেরই পরীক্ষা করা হইয়াছে। সেখানে ভাষ্যকারের কথায় “পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই স্থলে  
বস্তুতঃ পুরুষ সমাসই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বার্ত্তিককারের নিজের মত ভাষ্য-ব্যাক্য্য  
গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। অচেতনস্ত করণস্ত বুদ্ধেজ্ঞানং বৃত্তিঃ, চেতনস্তাকর্ত্তুরুপ-  
লক্ষিরিত্তি যুক্তিবিরুদ্ধমর্থং প্রত্যাচক্ষাণক ইবেদমাহ।

অনুবাদ। অচেতন, করণ বুদ্ধির অর্থাৎ জড় অস্ত্রঃকরণের বৃত্তি ( পরিণাম-  
বিশেষ ) জ্ঞান, অকর্ত্তা চেতনের অর্থাৎ পুরুষের উপলক্ষি, অর্থাৎ অস্ত্রঃকরণের জ্ঞান



হয়, পুরুষের উপলব্ধি হয়, জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ, এই যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারীর ত্য়ায় ( মহর্ষি ) এই সূত্রটি বলিয়াছেন।

**সূত্র ।** বুদ্ধিরূপলব্ধিজ্ঞানামিত্যনর্থান্তরম্ ॥১৫॥

অনুবাদ । বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, ইহার অর্থাৎ এই তিনটি শব্দ একার্থবোধক—এ তিনটি একই পদার্থ।

ভাষ্য । নাচেতনস্য করণস্য বুদ্ধেজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি, তচ্চি চেতনং স্যাৎ, একশ্চায়াং চেতনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি । প্রমেয়-লক্ষণার্থস্য বাক্যস্যাত্মার্থপ্রকাশনমূপপত্তিসামর্থ্যাদিতি ।

অনুবাদ । “অচেতন” “করণ” বুদ্ধির অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না । যেহেতু তাহা (অন্তঃকরণ) চেতন হইয়া পড়ে । দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত হইতে অর্থাৎ দেহাদি মিলিত সমষ্টি হইতে ভিন্ন এই চেতন একমাত্র । প্রমেয় লক্ষণার্থ বাক্যের ( অর্থাৎ বুদ্ধি নামক প্রমেয়ের লক্ষণোদ্দেশ্যে কথিত সূত্রের ) অত্মার্থ প্রকাশন ( সাংখ্যমত নিষেধরূপ অত্মার্থের সূচনা ) উপপত্তি সামর্থ্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সূত্রে “বুদ্ধি,” “উপলব্ধি” ও “জ্ঞান” এই তিনটিকে একার্থক পর্যায় শব্দ বলিয়া প্রকাশ করায় উহার দ্বারা সাংখ্যমত নিষেধরূপ অত্মার্থেরও প্রকাশ হইয়া গিয়াছে ।

টিপ্পনী । বুদ্ধির কতিপয় কারণ ( আত্মাদি ) নিরূপণ পূর্বক উদ্দেশ্যস্থানে বুদ্ধির লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন । সূত্রে “বুদ্ধি,” “উপলব্ধি” ও “জ্ঞান” এই তিনটি একার্থক শব্দ—ইহা বলাতেই “বুদ্ধির” লক্ষণ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ বাহাকে “উপলব্ধি” বলে এবং “জ্ঞান” বলে, তাহাই “বুদ্ধি” । বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ । অসিদ্ধ পর্যায় শব্দ অর্থাৎ একার্থক শব্দের দ্বারাও পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতে পারে । মহর্ষি এখানে তাহাই বলিয়াছেন । জ্ঞান পদার্থ সকলেরই অন্তত্ব-সিদ্ধ ; ঐ জ্ঞান ও বুদ্ধি একই পদার্থ—ইহা বলিলে “বুদ্ধি” কাহাকে বলে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন । “জ্ঞা” বাতু ও “বুদ্” বাতুর সর্বত্র এক অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায় । পরন্তু ঐ ভাবে বুদ্ধি পদার্থের লক্ষণ বলায় অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান এই তিনটিকে একই পদার্থ বলায় সাংখ্যের মতও নিরাকৃত হইয়াছে । অবশ্য সাংখ্যমত নিরাকরণোচ্চেষ্টে এই সূত্র বলা হয় নাই, তৃতীয়াধ্যায়ে “বুদ্ধি”পরীক্ষা-প্রকরণেই মহর্ষি সাংখ্যমত নিরাকরণ করিয়াছেন । কিন্তু এখানে বুদ্ধির লক্ষণ বলিতে বাইরা সূত্রকার বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সাংখ্যমত নিরাকরণকারীর ত্য়ায়ই এই সূত্রটি বলা হইয়াছে ; তাই ভাব্যকার পূর্বভাষ্যে “প্রত্যক্ষাণক ইব” এই হলে “ইব” শব্দের দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন । সাংখ্যমতে “বুদ্ধি” বলিতে অন্তঃকরণ । ঐ বুদ্ধির বৃত্তি অর্থাৎ কোন পদার্থাকারে পরিণামবিশেষই “জ্ঞান” । উহা বুদ্ধিরই বস্তু, আত্মার বস্তু নহে । কারণ, আত্মা অপ্রকিাপী । চেতনরূপ আত্মা চেতন ও অকর্তা । চক্ষুরূপের দ্বারা বস্তু অপ্রকাশ

জড় বুদ্ধিতত্ত্ব (অন্তঃকরণ) চৈতন্যরূপ মর্ত্তণ্ডমণ্ডলের ছায়াপাতেই প্রকাশিত হয় এবং পদার্থকে প্রকাশ করে। এই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার সহিত পূর্বোক্ত বুদ্ধিবুদ্ধিরূপ জ্ঞানের যে অব্যক্তব সম্বন্ধ, তাহার নাম “উপলব্ধি।” উহাই অপরিণামী আত্মার বৃত্তি। বুদ্ধির পরিণাম-বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধিরই বৃত্তি। ফলতঃ সাংখ্যমতে “বুদ্ধি”, “জ্ঞান”, “উপলব্ধি”—এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। ভাষ্যকার এই সাংখ্যমতের সামান্ত্র্য উল্লেখ করিয়া সামান্ত্র্যতঃ তাহার অধৌক্তিকতাও সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, জড় অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না। তাহা হইলে তাহা চেতন পদার্থ হইয়া পড়ে। দেহাদি হইতে ভিন্ন চেতন পদার্থ একদেহে একমাত্র, ইহা সাংখ্যেরও সিদ্ধান্ত। অন্তঃকরণকে চেতন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে এক দেহে দুইটি চেতন পদার্থ মানা হয়,—তাহা হইলে অন্তঃকরণের জ্ঞাত পদার্থ আত্মা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ, এক চেতনের জ্ঞাত পদার্থ অল্প চেতন উপলব্ধি করিতে পারে না। জড় অন্তঃকরণে জ্ঞান হইলেও তাহা বস্তুতঃ চেতন পদার্থ হয় না—কিন্তু চন্দ্রনগলে সূর্য্যমণ্ডলের জায় অন্তঃকরণে চেতন আত্মার প্রতিবিম্বপাত হয় বলিয়াই, অন্তঃকরণ চেতনের জায় হইয়া থাকে এবং তজ্জন্মই জড় হইয়াও পদার্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সাংখ্য-সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নহে। কারণ, আত্মা সূর্য্যমণ্ডলের জায় পরিণামী পদার্থ নহে, অন্তঃকরণে তাহার প্রতিবিম্বপাত বাস্তব হইতে পারে না। নিরাকার নির্লিঙ্গকার আত্মার প্রতিবিম্বপাত অসম্ভব। সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞান স্বীকার করিলে তাহার স্বাভাবিক চৈতন্য স্বীকার করিতেই হইবে। আত্মা ও অন্তঃকরণ এই উভয়কে চেতন পদার্থ বলিয়া বলিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এক আত্মাকেই চেতন পদার্থ বলিতে হইবে। জ্ঞান তাহারই ধর্ম্ম; বুদ্ধি ও উপলব্ধি ঐ জ্ঞানেরই নামান্তর। উহার সাংখ্যসম্মত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে। ইহাই ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। স্মৃত্যানুমানাগম-সংশয়-প্রতিভা-স্বপ্নজ্ঞানোহাঃ সূখাদিপ্রত্যক্ষ-মিচ্ছানন্দশচ মনসো লিঙ্গানি তেবু সৎস্ব ইয়মপি।

অনুবাদ। “স্মৃতি”, “অনুমান”, “আগম” (শাস্ত্রবোধ), “সংশয়”, “প্রতিভা” (ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষ মানস জ্ঞানবিশেষ), “স্বপ্নজ্ঞান”, “উহ” (“স্বাপত্তি” নামক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ অথবা সম্ভাবনা-জ্ঞানরূপ তর্ক), সূখাদির প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছাদি, মনের (মন নামক অন্তরিস্থির) “লিঙ্গ” (অনুমাণক)। সেগুলি অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গগুলি থাকিতে ইহাও (অর্থাৎ সূত্রোক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিও মনের লিঙ্গ)।

সূত্র। যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥১৬॥

অনুবাদ। একই সময়ে জ্ঞানের অর্থাৎ বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি, মনের লিঙ্গ (অনুমাণক)।



ভাষ্য। অনিচ্ছিয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হ-  
স্তীতি। যুগপচ্ছলু ত্রাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্মিকর্ষেণ সংস্রু যুগপজ্-  
জ্ঞানানি নোৎপদ্যন্তে। তেনানুমায়েতে অস্তি তত্তদিনিচ্ছিয়সংযোগি সহ-  
কারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি, যস্যাহসন্মিকর্ষনোৎপদ্যতে জ্ঞানং সন্মিকর্ষেণোৎপ-  
দ্যতে ইতি। মনঃ সংযোগানপেক্ষ্য হীন্দ্রিয়ার্থ-সন্মিকর্ষস্ত জ্ঞানহেতুত্বে  
যুগপদুৎপদ্যেরন্ জ্ঞানানীতি।

অনুবাদ। “অনিচ্ছিয় নিমিত্ত” অর্থাৎ ত্রাণাদি বহিরিচ্ছিয় বাহ্যাদিগের নিমিত্ত  
নহে, এমন “স্মৃতি” প্রভৃতি (পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাদি) “করণান্তর-  
নিমিত্ত” অর্থাৎ বহিরিচ্ছিয় ভিন্ন কোন একটি করণনিমিত্তক হইবার যোগ্য। এবং  
একই সময়ে ত্রাণ প্রভৃতির ও গন্ধ প্রভৃতির সন্মিকর্ষ হইলে একই সময়ে নিশ্চয়ই  
অনেক জ্ঞান (অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিজাতীয় অনেক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না;  
তদ্বারা অনুমিত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয় সংযুক্ত, অব্যাপক অর্থাৎ অণুপরিমাণ  
(প্রত্যক্ষের) সহকারী কারণান্তর আছে, বাহার অসন্নিবিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের  
সহিত অসংযোগবশতঃ) “জ্ঞান” (সেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না এবং  
সন্নিবিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই  
ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্মিকর্ষের প্রত্যক্ষ  
হেতু হইলে অর্থাৎ মনঃসংযোগ-শূন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্মিকর্ষ প্রত্যক্ষের  
কারণ হইলে, একই সময়ে অনেক জ্ঞান অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনেক  
বিজাতীয় প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হউক।

উপলব্ধি। বুদ্ধির পরে ক্রমপ্রাপ্ত মনের লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। মনের অনুমাপক বলিতেই  
মনের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার স্মৃতি প্রভৃতি মনের অনুমাপকগুলি বলিয়া “ইয়মপি”  
এই কথাটির দ্বারা স্মৃত্যুক্ত “যুগপৎজ্ঞানাদুৎপত্তি”রূপ মনের অনুমাপককে গ্রহণ করিয়াছেন।  
অর্থাৎ স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গ থাকিলেও এই “যুগপৎজ্ঞানাদুৎপত্তি”ও মনের লিঙ্গ, ইহাই  
সূত্রকারের তাৎপর্য। স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গ কেন? এতদন্তরে উদ্যোতকর-প্রদর্শিত  
অনুমানের দোষ দেখিয়া তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদির প্রত্যক্ষরূপ আত্মবিশেষণ  
ইন্দ্রিয়জ্ঞান, তদুপস্থানে ঐরূপ আত্মবিশেষণ নাই ইন্দ্রিয়জ্ঞান, ইহা অনুমানসিদ্ধ। স্মৃতি প্রভৃতি  
আত্মবিশেষণগুলি যখন বহিরিচ্ছিয়-জ্ঞান হয় না, তখন উহাদিগের করণ একটি অন্তরীচ্ছিয়  
আছেই, তাহার নাম “মন”। স্মৃত্যং (ভাষ্যাক্ত) স্মৃতি প্রভৃতি মনের অনুমাপক।  
বহিরিচ্ছিয় ও অনুমানাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ মনের দ্বারা যে এক প্রকার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার

নাম “প্রতিভা”। উহা “প্রতিভ” নামেও অনেক স্থানে অভিহিত হইয়াছে। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ “পদার্থবর্ননংগ্রহে” “আর্ষ” জ্ঞানকে “প্রতিভ” বলিয়াছেন। সেখানে “ভায়কননী”কার শ্রীমর “প্রতিভা”কেই “প্রতিভ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনভাষ্য প্রকৃতি বহু প্রামাণিক গ্রহে এই “প্রতিভ” জ্ঞানের উল্লেখ আছে। বাংলায়নও পরে “প্রতিভ” জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। প্রশস্তপাদ শেষে বলিয়াছেন যে, এই “প্রতিভ” জ্ঞান বহু পরিমাণে দেবগণ ও ঋষিগণেরই জন্মে, কদাচিৎ লৌকিকদিগেরও জন্মে। যেমন—“কল্পা বলিতেছে, কল্যা ভ্রাতা আসিবে, ইহা আমার মন বলিতেছে।” কল্পার ঐরূপ জ্ঞান ভ্রম না হইলে উহা তাহার “প্রতিভা”। যদি উহা ভ্রম বলিয়া শেবে বুঝা যায়, তাহা হইলে উহা “প্রতিভা” নহে। বাহারা এই “প্রতিভার” দোহাই দিয়া, নিজের মন বাহা বলে অর্থাৎ নিজের বাহা ভাল লাগে, তাহাই অজ্ঞাত মনে করেন, “বিবেকের বিকল্প” বলিয়া বৈদিক মতকেও ভ্রান্ত বলেন, তাহারা এই “প্রতিভার” সহিত পরিচিত হইলে অজ্ঞাত হইতে পারেন। ভাষ্যে “স্বখাদি প্রত্যকং” এই হলে “আদি” শব্দের দ্বারা ইচ্ছা প্রকৃতি মনোগ্রাহ্য গুণগুলি বুঝিতে হইবে। “ইচ্ছাদয়শ্চ” এই হলে “আদি” শব্দের দ্বারা স্বপ্ন-জাগ্রৎ প্রকৃতি গুণগুলি বুঝিতে হইবে।

গন্ধজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রকৃতি নানাজাতীয় প্রত্যক একই সময়ে হয় না। ইহা মহর্ষি গোতমের অনুভবনিক সিদ্ধান্ত। তাই ভাষ্যকার “যুগপচ্চ খলু” এই স্থানে নিশ্চয়ার্থ “খলু” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি যথাস্থানে তাহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ঐ সিদ্ধান্তানুসারে বুঝা যায়, বাহু প্রত্যকে এমন একটি সহকারী কারণান্তর আবশ্যক, বাহুর অভাবে একই সময়ে ঘ্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয়ের গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সহিত সন্নির্কর্ষ হইলেও একই সময়ে গন্ধাদি নানা বিষয়ের নানা প্রত্যক হয় না। এ জন্ত মহর্ষি গোতম পরমাণুর জায় অতি সূক্ষ্ম “মন” নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ মনের সংযোগকে বাহু প্রত্যকে কারণ বলিয়াছেন। মন পরমাণুর জায় সূক্ষ্ম বলিয়া একই সময়ে কোন এক ইন্দ্রিয় ভিন্ন অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারে না; স্বপ্নবিলম্বে ক্রত বেগবশতঃ এক ইন্দ্রিয় হইতে অল্প ইন্দ্রিয়ে বাইতে পারে। এ জন্ত একই সময়ে ঐরূপ নানা প্রত্যক হয় না, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক হইয়া থাকে। এইরূপে এক সময়ে নানা জাতীয় নানা প্রত্যকের অনুভূতিবশতঃ বেক্রপ লক্ষণাক্রান্ত মন নামক পদার্থ সিদ্ধ হয়, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন,—“তত্ত্বদিস্ক্রিয়সংযোগি সহকারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি”। ইন্দ্রিয়গত রূপাদি মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন—“ইন্দ্রিয়দংযোগি”। আকাশাদি মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন—“সহকারি”। আলোক মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন—“নিমিত্তান্তরং” অর্থাৎ আলোক প্রকৃতি প্রত্যকের সাধারণ কারণ হইতে ভিন্ন কারণ। আত্মা মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন,—“অব্যাপি”। আত্মা বিশ্বব্যাপী। মন অণুপরিমাণ। মহর্ষি মনের অনুমাপক বলিয়াই মনের এইরূপ লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন।

ভাষ্য। ক্রমপ্রাপ্তা তু।



অনুবাদ । ক্রমপ্রাপ্ত কিস্ত, অর্থাৎ প্রমেয়সূত্রে উদ্দেশ্যের ক্রমানুসারে মনের পরে প্রাপ্ত “প্রবৃত্তি” কিস্ত—

**সূত্র । প্রবৃত্তির্বাগবুদ্ধিশরীরারম্ভঃ ॥১৭॥**

অনুবাদ । “বাগারম্ভ” ( বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম ও অধর্মজনক কার্য ), “বুদ্ধ্যারম্ভ” ( মনের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম ও অধর্মজনক কার্য ), “শরীরারম্ভ” ( শরীরের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম ও অধর্মজনক কার্য ) “প্রবৃত্তি” ।

ভাষ্য । মনোহত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতম্ । বুদ্ধ্যতেহনেনেতি বুদ্ধিঃ ।  
সোহয়মারম্ভঃ শরীরেণ বাচা মনসা চ পুণ্যঃ পাপশ্চ দশবিধঃ । তদেতৎ  
কৃতভাষ্যং দ্বিতীয়সূত্র ইতি ।

অনুবাদ । এই সূত্রে “বুদ্ধি” এই শব্দের দ্বারা “মন” অভিপ্রেত । ইহার দ্বারা ( মনের দ্বারা ) বুঝা যায়, এ জন্ত “বুদ্ধি” । ( অর্থাৎ ভাবার্থ-নিষ্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের “জ্ঞান” অর্থ হইলেও “বুদ্ধ্যতেহনেন” এই ব্যুৎপত্তিতে করণার্থ-নিষ্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের মন অর্থ হইতে পারে, মহাবির এখানে তাহাই অভিপ্রেত ) । শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা পুণ্য ও পাপ অর্থাৎ ধর্মজনক ও অধর্মজনক সেই এই আরম্ভ ( “প্রবৃত্তি” ) দশ প্রকার । ইহা দ্বিতীয় সূত্রে কৃত-ভাষ্য হইয়াছে ( অর্থাৎ শুভ ও অশুভ দশ প্রকার প্রবৃত্তি দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যেই বলা হইয়াছে ) ।

টীপনী । প্রবৃত্তির লক্ষণ বলিতে মনোজন্ত প্রবৃত্তিও বলিতে হইবে । মন নিরূপিত না হইলে তাহা বলা যায় না,—এ জন্ত মহাবির মনের নিরূপণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত “প্রবৃত্তি”র নিরূপণ করিয়াছেন । ভাব্যকার “ক্রমপ্রাপ্তা তু” এই কথাটির দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়া ইহাই জানাইয়াছেন । ধর্ম ও অধর্মজনক শুভাশুভ কর্মই মহাবির “প্রবৃত্তি” নামক প্রমেয় । তাই সূত্রে “আরম্ভ” শব্দের দ্বারা মহাবির তাহা জানাইয়াছেন । এই প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম ও অধর্মকেও মহাবির “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা স্থলবিশেষে প্রকাশ করিয়াছেন ।

তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “আরম্ভ” অর্থাৎ কর্মই “প্রবৃত্তি” । উহা দ্বিবিধ,— জ্ঞানজনক এবং ক্রিয়াজনক । তন্মধ্যে বাহ্য জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা পুণ্য বা পাপের কারণ, তাহা “বাক্-প্রবৃত্তি” । সূত্রস্থ “বাচ” শব্দের দ্বারা জ্ঞানজনক পদার্থমাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে । হৃদয় মনের দ্বারা ইষ্টদেবতাদির চিন্তা ও চক্ষুরাদির দ্বারা সাধু ও অসাধু পদার্থের জ্ঞান প্রকৃতিও “বাক্-প্রবৃত্তির” মধ্যে গণ্য । ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,—“শরীরজন্ত” এবং “মনোজন্ত” ; শরীরের দ্বারা পরিত্রাণ, পরিচর্যা এবং দান ; বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় । মনের দ্বারা দয়, অশুভা ও শ্রদ্ধা, এই দশ প্রকার পুণ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ পুণ্যজনক প্রবৃত্তি । এইরূপ

ঐগুলির বিপরীত ভাবে পাপ-প্রবৃত্তিও দশ প্রকার। ভাষ্যকার দ্বিতীয় হস্তভাষ্যে দশ প্রকার পুণ্য ও পাপ-প্রবৃত্তির বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। তাই এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করেন নাই। দ্বিতীয় সূত্রে ‘প্রবৃত্তি’ শব্দ প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্ম ও অধর্ম অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, কর্মফল ধর্ম ও অধর্মই জন্মের কারণ। অস্থায়ী কর্ম জন্মের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না। কর্মবোধক শব্দের কর্মফল ধর্মাদ্বারা অর্থেও গোণ প্রয়োগ আছে। যেমন,—“জানামিঃ সর্বকর্মাণি ভ্রম্যন্ত কুরুতে।”—( গীতা )।

প্রচলিত পুস্তকগুলিতে এই সূত্রের শেষে “ইতি” শব্দ আছে। কিন্তু “তাৎপর্যটীকা” ও “জায়হুতীনিবন্ধ” গ্রন্থে ইতি-শব্দযুক্ত সূত্রের উল্লেখ নাই। সুতরাং “ইতি” শব্দ থাকিলে তাহা ভাষ্যকারের প্রযুক্তই বুঝিতে হইবে।

## সূত্র । প্রবর্তনা-লক্ষণা দোষাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । দোষগুলি ( রাগ, দ্বেষ ও মোহ ) “প্রবর্তনালক্ষণ” অর্থাৎ প্রবৃত্তি-জনক তাহাদিগের লক্ষণ এবং অনুমাপক ।

ভাষ্য । প্রবর্তনা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, জাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্তয়ন্তি পুণ্যো পাপে বা, যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি । প্রত্যাক্সবেদনীয়্য হৌমে দোষাঃ কস্মাল্লক্ষণতো নির্দিষ্টান্ত ইতি । কর্মলক্ষণাঃ খলু রক্ত-দিক্টযুতাঃ, রক্তো হি তৎকর্ম কুরুতে যেন কর্মণা স্নংং দুঃংং বা লভতে তথা দ্বিষ্টস্তথা মুঢ় ইতি । রাগদ্বেষমোহা ইত্যাচ্যমানে বহু নোক্তং ভবতীতি ।

অনুবাদ । “প্রবর্তনা” বলিতে “প্রবৃত্তি”জনকত্ব । রাগাদি ( রাগ, দ্বেষ ও মোহ ) আত্মাকে পুণ্য বা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে। যেখানে ( যে আত্মাতে ) মিথ্যাজ্ঞান ( মোহ ) আছে, সেখানে ( সেই আত্মাতে ) রাগ ( বিষয়ে অভিলাষ ) ও দ্বেষ আছে। ( পূর্ববন্ধ ) “প্রত্যাক্সবেদনীয়্য” অর্থাৎ সর্বজীবের মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এই দোষগুলি ( রাগ, দ্বেষ ও মোহ ) লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা কেন নির্দিষ্ট হইতেছে ? ( উত্তর ) যেহেতু “রক্ত” ( অনুরক্ত ), “দিক্ট” ( দ্বেষযুক্ত ) এবং মুঢ় ( ভ্রান্ত ) জীবগণ “কর্মলক্ষণ” অর্থাৎ কর্মই তাহাদিগের সেইরূপে অনুমাপক । রক্ত ব্যক্তিকে সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা স্নং বা দুঃং লাভ করে। সেইরূপ দ্বিষ্ট ব্যক্তিকে সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা স্নং বা দুঃং লাভ করে। তদ্রূপ মুঢ় ব্যক্তিকে সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা স্নং বা দুঃং লাভ করে।



“রাগদ্বৈমোহাঃ” এই কথাটি মাত্র বলিলে অর্থাৎ “প্রবর্তনালক্ষণাঃ” এই কথাটি না বলিয়া “দোষা রাগদ্বৈমোহাঃ” এইরূপ সূত্র বলিলে অধিক বলা হয় না।

টিলনী। “রাগ”, “দ্বৈব” ও “মোহ” এই তিনটির নান “দোষ”। উহা পূর্বোক্ত “প্রবৃত্তি”র প্রয়োজক, এজন্য “প্রবৃত্তি”র পরে “দোষ” নিরূপণ করিয়াছেন। ‘দোষের’ মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহবশতঃই রাগ ও দ্বৈব জন্মে। ঐ রাগ ও দ্বৈবই জীবকে সাধাৎ কর্মে প্রবৃত্ত করে। “মোহ”শূন্য বা সিধ্যাজ্ঞানশূন্য জীবের পুণ্যজনক বা পাপজনক কার্যে প্রবৃত্তি হয় না—অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম ধর্ম বা অধর্ম জন্মায় না। বস্তু দিন মোহ থাকিবে, তত দিন জীব রাগ-দ্বৈবের বশবর্তী হইয়া পুণ্য বা পাপজনক কর্মে প্রবৃত্ত হইবেই। সুতরাং প্রবর্তনাই দোষের লক্ষণ; অর্থাৎ ধর্মাদধর্মজনক কর্মে প্রবৃত্তি বহন দোষ ব্যতীত হয় না, তখন তাদৃশ প্রবৃত্তিজনকই দোষের লক্ষণ। আর ঐ প্রবর্তনাই দোষের অনুমাপক। সুত্রে ‘লক্ষণ’ শব্দের এক পক্ষে লিঙ্গ বা অনুমাপক অর্থ বুঝিতে হইবে। রাগ, দ্বৈব ও মোহ মনোগ্রাহ আত্ম-বিশেষণ, সুতরাং উহার সর্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ বিবরে অসুমান প্রদর্শন কেন? এতদ্বারা ভাষ্যকার তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে “কর্মলক্ষণাঃ খলু” এই স্থলে “খলু” শব্দটি হেতুর্গ।

ভাষ্যকারের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য এই যে, রাগ, দ্বৈব ও মোহ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অন্য আত্মাতে তাহা অসুমেয়। কোন ব্যক্তি সুখ বা দুঃখজনক কার্য করিলে ঐ কর্ম দ্বারাই তাহাকে রক্ত, দ্বিষ্ট ও মুঢ় বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। কারণ, মোহ ব্যতীত কাহারও রাগ বা দ্বৈব হয় না। রাগ, দ্বৈব ব্যতীতও কাহারও সুখ বা দুঃখজনক কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ রাগ, দ্বৈব ও মোহবৃত্ত ব্যক্তিই সুখ বা দুঃখজনক কর্ম করিয়া থাকে এবং যে প্রবর্তনাবশতঃ জীব বাধ্য হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই প্রবর্তনার আশ্রয় “দোষ”গুলিও জীবে আছে, এইরূপে “প্রবর্তনা”ও অন্য জীবে দোষের অনুমাপক হয়। পরন্তু রাগ, দ্বৈব ও মোহ নিজ আত্মাতে সর্ব জীবের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঐগুলি প্রবর্তনাবিশিষ্ট বলিয়া সকলের জ্ঞাত নহে। উহাদিগকে ঐরূপে জানিলে নির্দেহ জন্মিবে, এই অভিপ্রায়েও মহর্ষি ঐ রূপেই উহাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। “দোষা রাগদ্বৈমোহাঃ” এইরূপ সূত্র বলিলে কেবল দোষগুলির স্বরূপমাত্রই বলা হয়, তাহাতে বেশী কিছু বলা হয় না।

**সূত্র। পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ ১৯ ॥**

অনুবাদ। “পুনরুৎপত্তি” অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জন্ম “প্রেত্যভাব”।

ভাষ্য। উৎপন্নস্ত কচিৎসদ্বনিকারে যুত্বা বা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্য-  
ভাবঃ। উৎপন্নস্ত সম্বন্ধস্ত। সম্বন্ধস্ত দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ। পুন-  
রুৎপত্তিঃ পুনর্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। পুনরিত্যভাসাভিধানম্। যত্র কচিৎ

প্রাণভূমিকায় বর্তমানঃ পূর্বোপাত্তান্ দেহাদীন্ জহাতি তৎ প্রৈতি ।  
যত্বান্মত্রে বা দেহাদীনম্ভানুপাদন্তে তদভবতি । প্রৈত্যভাবো মৃত্বা পুন-  
র্জন্ম । সোহয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোহনাদিরপবর্গান্তঃ প্রৈত্যভাবো  
বেদিতব্য ইতি ।

অনুবাদ । কোন প্রাণ-নিকারে অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি কোন এক-  
জাতীয় জীবকুলে উৎপন্নের মরণের পরে যে পুনরুৎপত্তি, তাহা “প্রৈত্যভাব” ।  
উৎপন্নের কি না,—সম্বন্ধ-বিশিষ্টের । সম্বন্ধ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার  
অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত । “পুনরুৎপত্তি” বলিতে পুনর্ব্বার দেহাদির সহিত সম্বন্ধ ।  
“পুনঃ” এই শব্দের দ্বারা অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুন্তের কথন হইয়াছে ।  
যে কোনও প্রাণিনিকারে ( একজাতীয় জীবকুলে ) বর্তমান হইয়া (জীব) পূর্বপরি-  
গৃহীত দেহাদিকে যে ত্যাগ করে, তাহা প্রৈত হয়, অর্থাৎ সেই পূর্বপরিগৃহীত দেহাদির  
ত্যাগই জীবের প্রৈত বা মরণ । সেই প্রাণিনিকারে অথবা অত্র প্রাণিনিকারে  
যে অত্র দেহাদিকে গ্রহণ করে, তাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই অভিনব দেহাদির  
গ্রহণই জীবের উৎপত্তি বা জন্ম । ফলিতার্থ—মরণোত্তর পুনর্জন্মই প্রৈত্যভাব ।  
সেই এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-রূপ প্রৈত্যভাব  
অনাদি ( এবং ) মোক্ষান্ত জানিবে ।

টীকণী । প্রপূর্বক “ইৎ” শব্দের উত্তর ক্রাৎ প্রত্যয় যোগে “প্রৈত্য” শব্দ এবং “হু” থাকে  
হইতে “ভাব” শব্দ নিস্পন্ন । প্রপূর্বক “ইৎ” শব্দের অর্থ এখানে মরণ । তদুত্তর অর্থ  
উৎপত্তি । তাহা হইলে “প্রৈত্য” অর্থাৎ মরিয়া “ভাব” অর্থাৎ উৎপত্তি, ইহাই “প্রৈত্যভাব”  
কথার দ্বারা বুঝা যায় । তাই ভাষ্যকার শেষে ফলিতার্থ বলিয়াছেন—“প্রৈত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম” ।  
“নিকার” শব্দের অর্থ এখানে সমানবস্তু-বিশিষ্ট অর্থাৎ একজাতীয় জীব-সমূহ । ( সম্বন্ধিগণ-  
ত্মনিকারঃ ) । আত্মা নিজের কৰ্ম্মফলে মহত্বাদি কোন একজাতীয় জীবকুলে উৎপন্ন  
হয় । নিত্য আত্মার উৎপত্তি নাই, তাই ভাষ্যকার “উৎপন্নস্ত সম্বন্ধস্ত” এই কথার দ্বারা  
স্বপদ বর্ণন করিয়াছেন । পূর্বপরিগৃহীত দেহাদির পরিত্যাগ অর্থাৎ ঐ দেহাদির সহিত  
আত্মার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের নাম মরণ । পূর্বজাতীয় জীবকুলে অথবা অত্র জাতীয় জীবকুলে  
অভিনব দেহাদির গ্রহণ অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধের নাম উৎপত্তি বা  
জন্ম । উৎপত্তি মাত্র না বলিয়া “পুনরুৎপত্তি” শব্দের দ্বারা মহর্ষি এখানে “প্রৈত্যভাবের”  
অনাদিত্ব সূচনা করিয়া গিয়াছেন । তৃতীয়াধ্যায়ে পরীক্ষা-প্রকরণে ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন  
করিবেন ।



## সূত্র । প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলম্ ॥২০॥

অনুবাদ । “প্রবৃত্তি” ( ধর্ম্মাধর্ম্ম ) এবং “দোষ”-জনিত পদার্থ “ফল” ।

ভাষ্য । সুখদুঃখসংবেদনং ফলম্ । সুখবিপাকং কৰ্ম্ম দুঃখবিপাকঞ্চ । তৎ পুনর্দেহেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধিষু সতীষু ভবতীতি সহ দেহাদিভিঃ ফলমভিপ্রেতম্ । তথাহি প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলমেতৎ সৰ্ব্বং ভবতি । তদেতৎ ফলমুপাত্তমুপাত্তং হেয়ং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদেয়মিতি । নাস্তু হানোপাদানয়োনিষ্ঠা পর্য্যবসানং বাহস্তি । স খল্বয়ং ফলম্ হানোপাদানস্রোতসোহহতে লোক ইতি ।

অনুবাদ । সুখ ও দুঃখের অনুভব ফল । কৰ্ম্ম সুখফলক এবং দুঃখ-ফলক । তাহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সুখ-দুঃখ ভোগ আবার দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি থাকিলে হয়, এজন্য দেহাদির সহিত “ফল” অভিপ্রেত, অর্থাৎ মহর্ষি দেহাদিকেও “ফল” বলিয়াছেন । ফলিতার্থ এই যে, প্রবৃত্তি ও দোষজনিত পদার্থ—এই সমস্ত ( সুখ-দুঃখভোগ এবং তাহার সাধন দেহাদি সমস্ত ) “ফল” হয় । সেই এই ফল গৃহীত হইয়া গৃহীত হইয়া ত্যাজ্য হয়, ত্যক্ত হইয়া ত্যক্ত হইয়া গ্রাহ্য হয় । ইহার অর্থাৎ ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের “নিষ্ঠা” অর্থাৎ সমাপ্তি অথবা “পর্য্যবসান” অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অবসান নাই । ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোত অর্থাৎ ভোগের দ্বারা এক ফলের ত্যাগ এবং কৰ্ম্মের দ্বারা অন্য ফলের গ্রহণ, এই ভাবে অবিশ্রান্ত ফল-ত্যাগ ও ফল-গ্রহণের প্রবাহ সেই এই লোকে ( জীবকুলকে ) বহন করিতেছে । অর্থাৎ জীবকুল ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোতে নিরন্তর ভাসিতেছে ।

টীকানী । ফল দ্বিবিধ,—দুঃখ ও গৌণ । সুখ দুঃখের উপভোগই দুঃখ ফল । দেহ, ইন্দ্রিয় প্রকৃতি তাহার সাধনগুলি গৌণ ফল । দ্বিবিধ ফলই মহর্ষির বিবক্ষিত । হঠাৎ অতিরিক্ত “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি তাহার ঐ অভিপ্রায় সূচনা করিয়াছেন । যদিও “ফল” পদার্থগুলির যথাসম্ভব পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি ফলমাত্রই “প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত”, ইহা জানিলে নির্ভেদ লাভ হয় । তাই মহর্ষি “প্রবৃত্তি-দোষজনিত” বলিয়া ফলের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । প্রবৃত্তি বলিতে এখানে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম । দোষজনিত ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলমাত্রের জনক ; সুতরাং ফলমাত্রই প্রবৃত্তি ও দোষ-জনিত । তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, কেবল প্রবৃত্তির প্রতিই দোষ কারণ নহে, প্রবৃত্তির কার্য্য সুখ ও দুঃখের প্রতিও দোষ কারণ, ইহা জানাইবার জন্যই মহর্ষি “প্রবৃত্তি-জনিত” না বলিয়া “প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত” এইরূপ বলিয়াছেন । দোষরূপ ফলের দ্বারা নিষ্ঠ আত্মভূমিতেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ বীজ সুখ-দুঃখ জন্মায় ।

প্রলয়কালেও ফলের ভাগ ও গ্রহণের সমাপ্তি হয়, তাই আবার বলিয়াছেন,—“পর্যাবসানং বা”। অর্থাৎ প্রলয়কালে ঐ ফলভাগ ও ফলগ্রহণের অবসান-মাত্র হইলেও তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সর্বতোভাবে অবসান হয় না। প্রলয়কালেও জীবের ধর্মাদর্ম প্রভৃতি থাকায় পুনঃ সৃষ্টিতে আবার ঐ ফলের ভাগ ও গ্রহণ হইয়া থাকে।

ভাষ্য। অঐতদেব।

অনুবাদ। অনন্তর ইহাই অর্থাৎ পূর্বেবক্ত সর্ববিধ ফলই—

সূত্র। বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ॥২১॥

অনুবাদ। “বাধনালক্ষণ” অর্থাৎ দুঃখানুযুক্ত বলিয়া “দুঃখ”।

ভাষ্য। বাধনা পীড়া তাপ ইতি। তয়াহনুবিদ্ধমনুষ্যজ্ঞানবিনি-  
ভাগেণ বর্তমানং দুঃখযোগাদুঃখমিতি। সোহয়ং সর্বং দুঃখেনানু-  
বিদ্ধমিতি পশ্যন্ দুঃখং জিহাস্তর্জ্জন্মানি দুঃখদর্শী নির্বিদ্যতে নির্বিধৌ  
বিরজ্যতে বিরক্তো বিমুচ্যতে।

অনুবাদ। “বাধনা” বলিতে পীড়া, তাপ (অর্থাৎ যাহাকে পীড়া বলে, তাপ বলে, তাহাই বাধনা)। তাহার সহিত অর্থাৎ বাধনার সহিত অনুবিদ্ধ অনুযুক্ত (সম্বন্ধবিশিষ্ট) অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান (পূর্বেবক্ত সমস্ত ফল) দুঃখযোগবশতঃ (দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ) দুঃখ। সেই এই আত্মা (দুঃখানুবিদ্ধ জন্ম-বিশিষ্ট আত্মা) সমস্ত অর্থাৎ সুখ ও সুখসাধন দেহাদি দুঃখের সহিত অনুবিদ্ধ (নিয়ত সম্বন্ধ যুক্ত), ইহা দর্শন করতঃ (বোধ করতঃ) দুঃখ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া, জন্মে দুঃখদর্শী হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বিঘ্ন হইয়া বিরক্ত (বৈরাগ্য-সম্পন্ন) হন, বিরক্ত হইয়া বিমুক্ত হন।

টিপ্পনী। দুঃখ না পাইলে, হঃখ না বুঝিলে, পরম পুরুষার্থ অপবর্গ লাভের অবিকারই হয় না এবং শরীরাদি নিরূপণ না করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ বলা যায় না। এ জন্ত অপবর্গের পূর্বেই এবং শরীরাদির পরেই দুঃখের লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন। দুঃখ সকল জীবের সুপরিচিত পদার্থ। “বাধনা”, “পীড়া”, “তাপ”—এগুলি দুঃখ-বোধক পর্যায়শব্দ। সূত্রে “বাধনা” শব্দের প্রয়োগেই দুঃখের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। বাধনা যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ, তাহাই দুঃখ, এইরূপ সূত্রার্থ সহজ-বুদ্ধিগম্য হইলেও ভাষ্যকার সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকারের কথা এই যে, সুখ ও সুখ-সাধন জন্মাদি ফল-মাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ বলিয়া দুঃখ—ইহাই দর্শকের বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “অঐতদেব” এই কথার পূরণ করিয়া দর্শকের সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে।



সূত্রে “লক্ষণ” শব্দের অর্থ অহুবল। অহুবল বলিতে সম্বন্ধ। সুখে দুঃখের “অবিনাশাব” সম্বন্ধ। দেখানে সুখ আছে, দেখানে দুঃখ আছেই। শরীরে দুঃখের নিমিত্ততা সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধিতে দুঃখের সাধনস্থ সম্বন্ধ, উদ্যোতকের “অহুবল” ব্যাখ্যা এখানে এইরূপ। তাহার অস্ত্রবিধ ব্যাখ্যাও দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্য ব্যাখ্যার উক্ত হইয়াছে। তাহা “অহুবল” ইহার ব্যাখ্যা “অহুবলম্”। তাহার ব্যাখ্যা “অবিনির্ভাগেণ বর্তমানম্।” অর্থাৎ দুঃখের সহিত পূর্বক্ ভাবে (বিহুক্তভাবে) বর্তমান কোন সুখাদি নাই। একেবারে দুঃখসম্বন্ধ নাই, এমন সুখ ও সুখ-সাধন শরীরাদি হইতেই পারে না; এই জন্ত সুখাদি ফলে দুঃখ শব্দের গোণ প্ররোপ করিয়া সুখাদি ফলমাত্রকেই গোণ দুঃখ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সূত্রে “বাধনা” শব্দের দ্বারা বাধনাবুদ্ধি অর্থাৎ দুঃখবুদ্ধি পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে হইবে। বাহা দুঃখবুদ্ধি-লক্ষণ, অর্থাৎ তাহাতে দুঃখ বলিয়া বুদ্ধি হয়, তাহাই দুঃখ। তাহা হইলে মুখ্য গোণ উভয়বিধ দুঃখই সূত্রের দ্বারা লক্ষিত হইল। “প্রতিকূলবেদনীয়” অর্থাৎ বাহা প্রতিকূলভাবে (অপ্রিয়ভাবে, ভাল লাগে না—এই ভাবে) বুদ্ধির বিষয় হয়, এমন আত্মবিশেষ শুণই মুখ্য দুঃখ। তাহাতে মুখ্য দুঃখ বুদ্ধি হয়। সেই মুখ্য দুঃখাহুযুক্ত সুখাদি ফলমাত্রই গোণ দুঃখবুদ্ধি হয়। কারণ, সেগুলি সমস্তই দুঃখাহুযুক্ত। সুখাদি ফলমাত্রই দুঃখ, ইহা বুদ্ধিলে, ঐরূপ ভাবনা করিলে নির্বেদ লাভ করতঃ বৈরাগ্য লাভ করিয়া আত্মা মুক্তিলাভ করেন, এ জন্ত সুখ ও সুখসাধন শরীরাদি ফলমাত্রই দুঃখ-ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে।

ঋষিদিগের পরীক্ষিত এই বৈরাগ্যের উপায় কাহারও দুঃখ বাড়াইয়া দিবে না। পরন্তু বৈরাগ্যসাধন করিয়া দুঃখ ভাগই করিবে। বৈরাগ্যের সাধন দুঃখও ভগ্নের সাধন করে না, দুঃখ সহিষ্ণুতার মূলোচ্ছেদও করে না। পরন্তু দুঃখ সহিষ্ণুতার মূল বন্ধনই করিয়া থাকে। দুঃখ স্বভাবতই অপ্রিয় পদার্থ, ইহা সত্য। শ্রুতিও “অপ্রিয়” শব্দের দ্বারা দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন (“প্রিয়াপ্রিয়েন স্পৃশতঃ”)। সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির অভিসন্ধি ব্যতীত দুঃখকে কেহই প্রিয় পদার্থ বলিয়া আলিঙ্গন করে না। ভাবুকতার আবরণে সত্য গোপন করা যায় না। তাই ভারতীয় দর্শনকার ঋষিগণ দুঃখের বীজনাশের উপায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাই “বৈরাগ্য-মেবাভ্যং” বলিয়া ভারতগুরু ভাবুকতা ছাড়িয়া বাস্তবত্বের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। বৈরাগ্য ব্যতীত কে কবে কোন্ বিষয়ে নির্ভর হইতে পারিয়াছেন? কে কবে দুঃখের ভীষণ মূর্তি ভুলিতে পারিয়াছেন? কে কবে বিষয়-সুখের দুঃস্বাদ মমতা-বন্ধন ছেদ করিয়া “অভরণ” লাভের জন্ত উখিত হইতে পারিয়াছেন? বৈরাগ্য বহু সাধনার ফল। বহু দুঃখ না পাইলে—বহু কষ্ট না করিলে বৈরাগ্য সাধন হয় না। দুঃখ ব্যতীত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, তাই ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ভাষ্যরূপে দুঃখকেও “অর্থ” বলিয়া আসিয়াছেন। দুঃখ পরিহারের জন্তই দুঃখ অর্থমান। সুতরাং পূর্বোক্ত বৈরাগ্যের উপদেশ কাহাকেও দুঃখভীত বা অকর্ষণ্য করে না। পরন্তু প্রকৃত বোদ্ধা বৈরাগ্যের তব বুদ্ধিয়া বৈরাগ্য-সাধনের জন্ত বহু ক্লেশসাধ্য কঠোর পুরুষকারেই ব্রতী হইয়া থাকেন।

স্বপ্ন এবং স্বপ্নাবলম্বন জন্মাদি প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধি এখানে নির্বোধ। স্বপ্ন উপহিত সর্ববিধেই বিতৃষ্ণতা বা উৎসেদ-বুদ্ধিই এখানে বৈরাগ্য।

প্রচলিত অনেক পুস্তকেই এই সূত্রের শেষে “ইতি” শব্দ দৃষ্ট হয়। কিন্তু “তাৎপর্যটাকা” ও “জ্ঞানসূত্ৰনিবন্ধে” ইতিশব্দান্ত সূত্রের উল্লেখ নাই; ইতি শব্দের এখানে কোন প্রয়োজনও নাই।

ভাষ্য। যত্র তু নিষ্ঠা। যত্র তু পর্য্যবসানং সৌহর্যং।

অনুবাদ। যেখানে কিন্তু নিষ্ঠা (সমাপ্তি), যেখানে কিন্তু সর্বতোভাবে অবসান, সেই এই—

সূত্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোপবর্গঃ ॥২২॥

অনুবাদ। তাহার সহিত (পূর্বোক্ত মুখ্য গোণ সর্ববিধ দুঃখের সহিত) অত্যন্ত বিয়োগ অপবর্গ।

ভাষ্য। তেন দুঃখেন জন্মানাত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ। কথম্? উপাস্তস্য জন্মনো হানমন্তস্য চানুপাদানম্। এতামবস্থামপর্য্যাস্তামপবর্গং বেদয়ন্তেহপবর্গবিদঃ। তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।

অনুবাদ। সেই জন্মরূপ দুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মান শরীরাদি সর্বদুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ “অপবর্গ”। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ কি প্রকার? (উত্তর) গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মের অগ্রহণ। অবশিষ্ট অর্থাৎ চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে (আত্মার শরীরাদি সর্বদুঃখ-শূন্য কৈবল্যাবস্থাকে) অপবর্গবিদগণ অপবর্গ বলিয়া জানেন। তাহা অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবস্থাই শাস্ত্রে অনেক স্থানে ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে)।

টিপ্পনী। দুঃখের পরে মুক্তি। ইহাই মহাবিকল্পিত চরম প্রেমের। ইহাই জীবের চরম উন্নতি। পূর্বোক্ত কলগ্রহণ ও কলত্যাগের ইহাতেই সমাপ্তি, ইহাতেই পর্য্যবসান। স্বত্রস্থ “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত দুঃখই বোধ্য, তাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“তেন দুঃখেন”। কেবল দুখ্য দুঃখই উহার দ্বারা বিবক্ষিত—এরূপ ভ্রম না হয়, তাই আবার বলিয়াছেন—“জন্মনা”। অর্থাৎ “জন্মতে যৎ” এইরূপ ব্যাংগবিশিষ্ট “জন্মনা” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার এখানে “দুঃখ” শব্দের দ্বারা জায়মান শরীরাদি গোণ দুখ্য সর্ববিধ দুঃখই বুঝিতে হইবে, ইহা হৃদয় করিয়াছেন। জীবগণ অনাদিকাল হইতে জন্মপ্রবাহে আসিয়া নানা দুঃখের বিভিন্ন ভরসে হাবুডুবু থাইতেছে। ঐ জন্মপ্রবাহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। সাময়িক



ৰোগ নিবৃত্তিৰ জ্ঞান প্ৰলম্বকালে জীৱেৰ সাময়িক জংগনিবৃত্তি আত্যন্তিক জংগনিবৃত্তি নহে, তাই উহা মুক্তি নহে; তাই বলিৱাছেন—“অত্যন্তং বিমুক্তিঃ” এবং “অপর্যন্তম্”। কলতঃ চিরকালের জন্ত আত্মার জন্মাদি সৰ্ব্বজংগজ্ঞানবাহাই কৈবল্যাবস্থা। উহাই মুক্তিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। ঐ মুক্তি হইলে আর সংসার-ভয় থাকে না (ন চ পুনরাবর্ততে)। মুক্তি অমৃত। শ্ৰুতিও ব্ৰহ্মকে পুনঃ পুনঃ “অমৃত” বলিয়া কীৰ্তন কৰিয়াছেন—তাই শাস্ত্ৰ অনেক স্থানে মুক্তিকে ব্ৰহ্ম এবং মুক্তিলাভকে ব্ৰহ্মলাভ বলিৱাছেন। একুপ গোণপ্ৰয়োগ ভাৱৰ প্ৰচুৰ পাওৱা যায়।

বাঁহাৰা ব্ৰহ্মপৰিণামবাদী অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মই জগদাকাৰে পৰিণাম প্ৰাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বাঁহাদিগেৰ মত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য কৰিয়া বলিৱাছেন—“অজৱং” অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম নিৰ্জিকার, তাঁহাৰ কোনরূপেই পৰিণাম বা পৰিবৰ্তন হইতে পাৰে না।

ব্ৰহ্মেৰ জ্ঞান মুক্তিৰও কোন দিন কিছুমান পৰিবৰ্তন নাই; তাই মুক্তি অজৱ ব্ৰহ্মসদৃশ। এইরূপ তাৎপৰ্য্যেই শাস্ত্ৰে অনেক স্থানে মুক্তিকে “ব্ৰহ্মভাব” বলা হইয়াছে। “নিরঞ্জনঃ...পরমং নামমুণৈতি” এই শ্ৰুতিতে মুক্ত ব্যক্তিৰ ব্ৰহ্মসাম্যলাভেৰ কথা স্পষ্ট থাকে অজ্ঞাত শ্ৰুতি ও স্মৃতিতে লক্ষণাৰ সাহায্যে সেইরূপ অৰ্থই গ্ৰহণ কৰিতে হইবে। পৰন্ত “ইদং জ্ঞানমুপাশ্ৰিতা নম সাধৰ্ম্মমাগতাঃ। সৰ্গেহপি নোপজায়ন্তে প্ৰলয়ে ন ব্যাধন্তি চ।” এই ভগবদ্গীতাৰাক্যে মুক্ত ব্যক্তিৰ ব্ৰহ্মসদৃশ্যতাই স্পষ্ট প্ৰকটিত আছে। সেই ব্ৰহ্মসদৃশ কি? তাহা বলিৱাৰ জন্তই ঐ শ্লোকেৰ পৰাৰ্দ্ধ বলা হইয়াছে। নচেৎ ঐ পৰাৰ্দ্ধেৰ উত্থাপক কোন আকাঙ্ক্ষা বা প্ৰয়োজন থাকে না। “সাধৰ্ম্ম্য” শব্দেৰও প্ৰসিদ্ধাৰ্থ বা মুখ্যাৰ্থ পৰিত্যাগ কৰিতে হয়। বিশিষ্ট সাধুগ্ৰন্থেৰে জন্ত কাহাকে “ব্ৰহ্ম” বলিলে লক্ষণাৰ দ্বাৰা “ব্ৰহ্মসদৃশ” এই অৰ্থ গ্ৰহণ কৰা যায়। কিন্তু “ব্ৰহ্মসাম্য”, “ব্ৰহ্মসাধৰ্ম্ম্য” প্ৰভৃতি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিলে লক্ষণাৰ দ্বাৰা তাঁহাৰ ব্ৰহ্মৰূপতা অৰ্থ-গ্ৰহণ কৰা যায় না। তাহাতে “নাম্য”, “সাধৰ্ম্ম্য” প্ৰভৃতি শব্দেৰ প্ৰয়োগ নিষ্ফল হয়। বিশিষ্ট সাধুগ্ৰন্থ বোধেৰ জন্ত ৰাজসদৃশ ব্যক্তিকে “ৰাজা” বলা যায়। কিন্তু প্ৰকৃত ৰাজাকে “ৰাজসদৃশ” বলিয়া লক্ষণাৰ দ্বাৰা তাঁহাৰ “ৰাজা” এই অৰ্থেৰে কেহ ব্যাখ্যা কৰে না। এইরূপ লক্ষণা নিশ্চমাণ। উহা অপ্ৰসিদ্ধ ও নিশ্চয়োজন। প্ৰচলিত জ্ঞান-মতানুসারে শ্ৰুতি স্মৃতিৰ ব্যাখ্যা কৰিতে অনেক স্থলে লক্ষণাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিতে হয়, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া অসংগত অপ্ৰসিদ্ধ লক্ষণাৰ আশ্ৰয় কৰা যায় না। “সাম্য”, “সাধৰ্ম্ম্য” প্ৰভৃতি শব্দেৰ অসংগত লক্ষণাৰ আশ্ৰয় না কৰিয়া অন্তান্ত বহু শব্দেৰ সংগত ও প্ৰসিদ্ধ লক্ষণাৰ আশ্ৰয় কৰাই সমীচীন; ইহাই জ্ঞানচাৰ্য্যগণেৰ স্বপক্ষ সমর্থনেৰ মুক্তি।

বুদ্ধদেবেৰ প্ৰকৃত মত বাহাই হউক, বৈশাখিক বৌদ্ধ সম্প্ৰদায় বলিতেন, প্ৰদীপেৰ জ্ঞান চিন্তা বা আত্মাৰ চিৰনিৰ্ব্বাণই মুক্তি। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য কৰিয়া তাঁহাৰ বলিৱাছেন—“অমৃত্যুপদম্”। অৰ্থাৎ পূৰ্ণোক্ত কৈবল্যাবস্থাস্বৰূপ মুক্তিকে “অমৃত্যুপদ” বলে। উহা আত্মাৰ মৃত্যু নহে। আত্মাৰ মৃত্যু অসম্ভৱ। পৰন্ত আত্মাৰ অত্যন্ত বিনাশ কখনও পৰম পূৰ্ব্বাৰ্থ হইতে পাৰে না। কোন বুদ্ধমানই উহা আকাঙ্ক্ষা কৰেন না। আত্মাৰ কৈবল্যাবস্থাস্বৰূপ মুক্তি হইলে, আর মৰিতে হয় না। “তমেব বিদিস্বাহতিমৃত্যুমেতি” (শ্ৰুতি)। “জন্মমৃত্যুজরাঃঐধিৰ্গ্নিমজ্জোহমৃতমধুতে”—

(গীতা) এবং উহাই আত্মার প্রকৃত ক্ষেত্রপ্রাপ্তি বা মঙ্গলপ্রাপ্তি। উহা মরণ নহে, উহা জীবন নহে—উহাই প্রকৃত শান্তি।

ভাষ্য। নিত্যং স্বধমাত্মনো মহত্ত্ববশ্মোক্ষে ব্যজ্যতে, তেনাভি-  
ব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ স্বধী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে। তেষাং প্রমাণা-  
ভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো বা বিদ্যতে নিত্যং  
স্বধমাত্মনো মহত্ত্ববশ্মোক্ষেহ্ণিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। মহত্ত্বের স্থায় অর্থাৎ আত্মার পরম মহৎ-পরিমাণের স্থায় মোক্ষে  
আত্মার নিত্যস্ব স্বভাব্যক্ত (অনুভূত) হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্যস্বের দ্বারা  
বিমুক্ত হইয়া (আত্মা) অত্যন্ত স্বধী হন, ইহা কেহ কেহ মনে করেন অর্থাৎ ইহা  
এক সম্প্রদায়ের মত। প্রমাণাভাববশতঃ তাহাদিগের উপপত্তি নাই। বিশদার্থ  
এই যে, মহত্ত্বের স্থায় মোক্ষে আত্মার নিত্য স্ব স্বভাব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ  
প্রমাণ নাই, অনুমান প্রমাণ নাই, আগম প্রমাণও নাই।

টিপ্পনী। আত্মার মহত্ত্ব অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাণ আত্মাতে নিত্যস্ব থাকিলেও সংসারাবস্থায়  
শরীরাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ যেমন তাহার অনুভূতি হয় না, কিন্তু মোক্ষে শরীরাদি প্রতিবন্ধক না  
থাকায় তাহার অনুভূতি হয়, তদ্রূপ আত্মাতে নিত্যস্ব থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সংসারাবস্থায়  
ঐ নিত্যস্বের অনুভূতি হয় না, মোক্ষে তাহার অনুভূতি হয়। ঐ নিত্যস্বের অভিব্যক্তিই  
মুক্তি। এই মতটি নব্য জ্ঞানগ্রন্থে ভট্টমত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এবং নব্যজ্ঞানচার্য্য  
রঘুনাথ শিরোননি এই ভট্টমতের পরিচয় করিয়াছেন,— ইহাও অনুমতি গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য  
লিখিয়াছেন। মুক্তিবাদগ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য ভট্টমত বলিয়া এই মতের পরিচয় করিয়া শেষে  
কেবল কল্পনাগোরব বলিয়াই এই মত মনোরম নহে, ইহা বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের উল্লিখিত মতটিকে শুদ্ধা-  
বৈতবাদী বেদান্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া সেই মতের বিরুদ্ধেই পরবর্তী ভাব্যদন্দভের তাৎপর্য্য  
বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, “বিজ্ঞানমানদং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম স্বরূপ

১। নব্যনৈয়ায়িক গদাধর প্রভৃতি “নিত্য স্বের অভিব্যক্তি মোক্ষ” ইহা ভট্টমত বলিয়া উল্লেখ করায়, উহা  
ভট্ট ভূবারিলের মত বলিয়াই অনেকের দৃঢ় সংকল্প আছে। কিন্তু ভট্টভূবারিল প্রকৃতপক্ষে “নব্যদ্বৈতপরিহার-  
প্রকরণে” (১০৫ স্তোকে) স্বধমাত্মনো মুক্তি হইতে পারে না, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণ  
ভট্ট বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা অসুসঙ্গত। নিত্যানিরতিশ্বর স্বের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা ভূতাত্ত্বিক ভট্টের  
মত বলিয়া উৎসাহচর্চায়ের কিরণাবলী গ্রন্থে দেখা যায়। উৎসাহ লিখিয়াছেন—“তৌতাত্ত্বিক অর্থানপি ইবংজ্ঞানং  
শরীরবন্ধরোপানিচ্ছন্তঃ কাব্যবেগ স্বধজ্ঞানবপসর্গেহতীতি বদন্তঃ” ইত্যাদি (কিরণাবলী, প্রথম ভাগ)। সেখানে  
প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—“স্বধমাত্মনো মুক্তিরূপে নিত্যানিরতিশ্বর স্বাভিব্যক্তি-মুক্তিরূপিত  
ভাট্ট মতঃ নিরাকরোতি তৌতাত্ত্বিকত্বম্”। বর্দ্ধমানও ঐ মতকে কেবল ভাট্ট মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।



বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্য, সূত্রার্থ ঐ সুখও নিত্য। ঐ নিত্য সুখস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা হইতে অভিন্ন। ভাষ্যে “আত্মনঃ” এই স্থলে “রাহোঃ শিরঃ” এই স্থলের স্থায় অতিবে বটী। ফলিতার্থ এই যে, মোক্ষ আত্মস্বরূপ নিত্যসুখ অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যসুখস্বরূপ। মিশ্র মহোদয়ের উদ্ধৃত ভাষ্যসন্দর্ভে “মহত্ত্বং” এই কথাটি নাই। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যেই “মহত্ত্বং” এই কথাটি আছে। মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যায় মহত্ত্বদৃষ্টান্ত সংগত হয় না। ভাষ্যে “মহত্ত্বং” এই কথাটি না থাকিলেও পূর্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভ এবং পরবর্তী ভাষ্যসমূহের দ্বারা ভাষ্যকার এই মতের যে অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে শুদ্ধবৈতবাদি-সম্মত মুক্তিই এখানে ভাষ্যকারের সমালোচিত, ইহা মনে আসে না। মুক্তিতে নিত্যানন্দের অনুভূতি হয়, তাহার দ্বারা তৎকালে আত্মা অত্যন্ত সুখী হন, ইহাই মতবিশেষ বলিয়া ভাষ্যকার সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। মুক্তি নিত্যানন্দস্বরূপ, ভাষ্যকার এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সরলভাবে বুঝা যায় না। পরবর্তী ভাষ্যসমূহের দ্বারা ভাষ্যকার তাহার উল্লিখিত মতেরই সমালোচনাপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন—সেই কথাগুলির পর্যালোচনা করিয়াই ভাষ্যকার কোন্ মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সুযোগ্য চিন্তা করিয়া স্থির করিবেন।

ভাষ্য। নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং তস্য হেতুবচনম্।  
 নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং জ্ঞানমিতি তস্য হেতুর্বাচ্যো বতন্তুত্বংপদ্যত  
 ইতি। সুখবন্নিত্যমিতি চেৎ সংসারস্থস্য মুক্তেনাবিশেষঃ।  
 বধা মুক্তঃ স্থথেন তৎ সংবেদনে চ সন্ নিত্যেনোপপন্নস্তথা সংসার-  
 স্তোহপি প্রসজ্যত ইতি উভয়স্ত নিত্যত্বাৎ।

অভ্যনুজ্ঞানে চ ধর্মাধর্মফলেন সাহচর্য্যং যৌগপদ্যৎ  
 গৃহ্যেত। যদিদমুৎপত্তিস্থানেষু ধর্মাধর্মফলং স্থং ছং বা সংবেদ্যতে  
 পর্যায়েণ, তস্য চ নিত্যসংবেদনস্ত চ সহভাবো যৌগপদ্যং গৃহ্যেত ন  
 স্খাভাবো নানভিব্যক্তিরস্তি, উভয়স্ত নিত্যত্বাৎ।

অনুবাদ। নিত্যের অর্থাৎ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি কি না সংবেদন ( জ্ঞান ),  
 তাহার হেতু বলিতে হইবে।

বিশদার্থ এই যে,—নিত্যের ( নিত্যসুখের ) অভিব্যক্তি বলিতে ( তাহার )  
 সংবেদন কি না জ্ঞান, তাহার ( সেই নিত্যসুখজ্ঞানের ) হেতু বলিতে হইবে—যাহা  
 হইতে তাহা উৎপন্ন হয়।

সুখের স্থায় ( তাহা ) নিত্য, অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের অভিব্যক্তিও নিত্য পদার্থ,  
 তাহার কোন কারণ নাই, ইহা যদি বল, ( তাহা হইলে ) মুক্ত ব্যক্তির সহিত সংসারীর

অবিশেষ হয়। বিশদার্থ এই যে,—যেমন মুক্ত ব্যক্তি নিত্যসুখ এবং তাহার নিত্যানুভূতির দ্বারা উপপন্ন আছেন—উভয়ের (সুখ ও সুখানুভবের) নিত্যাবশতঃ সংসারী ব্যক্তিও তদ্রূপ (সতত নিত্যসুখ-সম্প্রাপ্ত) হইয়া পড়ে।

স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বমত রক্ষার্থ সংসারী ব্যক্তিও নিত্যসুখ সম্প্রাপ্ত করে, ইহা বলিয়া বসিলে, ধর্ম ও অধর্মের ফলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখের সহিত সহভাব কি না যৌগপদ্য গৃহীত হউক? বিশদার্থ এই যে—উৎপত্তিস্থানসমূহে (চতুর্দশ ভুবনে) এই যে ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে (সাংসারিগণ কর্তৃক) অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থাৎ সেই সাংসারিক সুখদুঃখানুভবের এবং নিত্যসংবেদনের অর্থাৎ নিত্যসুখের নিত্যানুভবের সহভাব কি না যৌগপদ্য বুঝা যায়?—(অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগের সহিত এক সময়েই নিত্যসুখভোগ হউক), উভয়ের (সুখ ও তাহার অভিব্যক্তির) নিত্যাবশতঃ সুখের অভাব নাই, অভিব্যক্তিরও অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের অনুভূতিরও অভাব নাই।

ভাষ্য। অনিত্যত্বে হেতুবচনম্। অথ মোক্ষে নিত্যস্য সুখস্য সংবেদনমনিত্যং যত উৎপদ্যতে স হেতুর্কাচ্যঃ আত্মমনঃসংযোগস্য নিমিত্তান্তরসহিতস্য হেতুত্বম্। আত্মমনঃসংযোগো হেতুরিতি চেৎ এবমপি তস্য সহকারিনিমিত্তান্তরং বচনীয়মিতি।

ধর্মস্য কারণবচনম্। যদি ধর্মো নিমিত্তান্তরং তস্য হেতুর্কাচ্যো যত উৎপদ্যতে ইতি।

যোগসমাধিজস্য কার্যাবসায়বিরোধোৎপ্রক্কে সংবেদন-নিবৃত্তিঃ। যদি যোগসমাধিজো ধর্মো হেতুস্তস্য কার্যাবসায়বিরোধোৎপ্রক্কে সংবেদনমত্যন্তং নিবর্ত্তিত।

অসংবেদনে চাবিদ্যমানেনাবিশেষঃ। যদি ধর্মক্ষয়াৎ সংবেদনো পরমো নিত্যং সুখং ন সংবেদ্যত ইতি কিং বিদ্যমানং ন সংবেদ্যতেহাবিদ্যমানমিতি নানুমানং বিশিষ্টেহস্তীতি।

অনুবাদ। অনিত্যত্ব হইলে হেতু বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে—যদি মোক্ষে নিত্য সুখের অনুভব অনিত্য হয়, (তাহা হইলে) যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, সেই হেতু বলিতে হইবে।

নিমিত্তান্তর সহিত আত্মমনঃসংযোগেরই হেতুত্ব হয়। বিশদার্থ এই যে,



আত্মমনঃসংযোগ ( নিত্য সুখানুভবে ) হেতু, ইহা যদি বল, এইরূপ হইলেও তাহার সহকারী কারণান্তর বলিতে হইবে ।

ধর্মের কারণ বলিতে হইবে । বিশদার্থ এই যে, যদি ধর্ম নিমিত্তান্তর হয় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্মই আত্মমনঃসংযোগের সহকারী কারণ, তখন ঐ দৃষ্টান্তে মোকে নিত্যসুখানুভবেও ধর্মই যদি সহকারী কারণ বল, ( তাহা হইলে ) তাহার ( সেই ধর্মের ) কারণ বলিতে হইবে, বাহা হইতে ( সেই ধর্ম ) উৎপন্ন হয় । যোগসমাধি-জাত ধর্মের কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ বিনাশ হইলে সংবেদনের ( নিত্যসুখানুভূতির ) নিবৃত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি যোগ-সমাধিজাত ধর্ম ( মোকে নিত্যসুখানুভবের ) কারণ হয় অর্থাৎ সহকারী কারণ হয়, তাহা হইলে, তাহার ( ঐ ধর্মের ) কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম মাত্রই তাহার চরম কার্য্য বা চরম ফল নাশ, ধর্মের কার্য্য বা ফলের সমাপ্তি হইলে ধর্ম থাকে না, এ জ্ঞাত্য প্রলয় হইলে অর্থাৎ ঐ ধর্মের বিনাশ হইলে সংবেদন ( নিত্য সুখানুভব ) অত্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া পড়ে ।

সংবেদন না হইলে আবার অবিদ্যমানের সহিত অবিশেষ হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি ধর্ম ক্রয়বশতঃ সংবেদনের ( নিত্যসুখানুভবের ) নিবৃত্তি হয়, নিত্য সুখ অনুভূত না হয়, তাহা হইলে কি বিদ্যমান ( সুখ ) অনুভূত হইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান ( সুখ ) অনুভূত হইতেছে না ? বিশিষ্টে অর্থাৎ একতর বিশেষ পক্ষে অনুমান প্রমাণ ( যুক্তি ) নাই ।

ভাষ্য । অপ্রকরশ্চ ধর্মস্য নিরনুমানমুৎপত্তিধর্মকত্বাৎ । যোগসমাধিজো ধর্মো ন ক্রীয়ত ইতি নান্ত্যানুমানমুৎপত্তিধর্মকমনিত্যমিতি বিপর্য্যয়স্ত্বানুমানম্ । বস্ত তু সংবেদনোপরমো নাস্তি তেন সংবেদন-হেতুর্নিত্য ইত্যনুমেয়ম্ । নিত্যে চ মুক্তসংসারস্থরোরবিশেষ ইত্যুক্তম্ । যথা মুক্তস্ত নিত্যং সুখং তৎসংবেদনহেতুশ্চ, সংবেদনস্ত তুপরমো নাস্তি কারণস্য নিত্যত্বাৎ তথা সংসারস্থস্যাপীতি । এবঞ্চ সতি ধর্মাদধর্মকলেন সুখদুঃখসংবেদনেন সাহচর্য্যং গৃহ্যেতেতি ।

শরীরাদিসম্বন্ধঃ প্রতিবন্ধহেতুরিতি চেৎ, ন, শরীরাদীনা-মুপভোগার্থত্বাৎ বিপর্য্যয়স্য চাননুমানাৎ ।

স্বাভ্যন্তঃ, সংসারাবস্থায় শরীরাদিসম্বন্ধো নিত্যসুখসংবেদনহেতোঃ

প্রতিবন্ধকস্তেনাবিশেষো নাস্তীতি। এতচ্চাযুক্তং, শরীরাদয় উপ-  
ভোগার্থান্তে ভোগপ্রতিবন্ধং করিষ্যন্তীত্যনুপপন্নম্। ন চাস্ত্যনুমানমশরীর-  
স্তাত্ত্বনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি।

অনুবাদ। ধর্মের (পূর্বোক্ত যোগসমাধিজাত ধর্মের) অত্যন্ত বিনাশ নাই,  
(এ বিষয়ে) অনুমান প্রমাণের অভাব। কারণ, ধর্মের উৎপত্তিধর্মকর আছে।  
বিশদার্থ এই যে—যোগসমাধিজাত ধর্ম বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ নিত্য, এই বিষয়ে  
অনুমান প্রমাণ নাই; পরন্তু উৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ উৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই অনিত্য,  
এইরূপে বিপর্যয়ের (নিত্যত্বের বিপর্যয় অনিত্যত্বের) অনুমান আছে।

যাহার (মতে) কিন্তু সংবেদনের (নিত্য সুখানুভবের) নিবৃত্তি নাই, তিনি  
সংবেদনের হেতু নিত্য, ইহা অনুমান করিবেন। নিত্য হইলে অর্থাৎ নিত্য  
সুখানুভবের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে আবার মুক্ত ও সংসারীর অবিশেষ হয়, ইহা  
বলিয়াছি। বিশদার্থ এই যে—যেমন মুক্ত ব্যক্তির সুখ এবং তাহার সংবেদনের  
(অনুভবের) হেতু নিত্য, কারণের নিত্যবশতঃ সংবেদনেরও (নিত্য সুখানুভবেরও)  
নিবৃত্তি নাই, সংসারী ব্যক্তিরও তরুণ হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলে আবার ধর্ম ও  
অধর্মের ফল সুখদুঃখানুভবের সহিত সহভাব (যোগপদ্য) গৃহীত হইয়া পড়ে।

শরীরাদি সম্বন্ধ প্রতিবন্ধের হেতু, ইহা যদি বল, তাহা নহে অর্থাৎ তাহা বলিতে  
পার না। কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ এবং বিপর্যয়ের অর্থাৎ অশরীর আত্মার  
ভোগের অনুমান নাই। বিশদার্থ এই যে—(পূর্ববন্ধ) সংসারীর শরীরাদি সম্বন্ধ  
নিত্যসুখানুভবের কারণের প্রতিবন্ধক, তজ্জন্ম (সংসারীর মুক্ত ব্যক্তির সহিত)  
অবিশেষ নাই, ইহা মত হইবে অর্থাৎ ইহাই সমাধান করিব। (উত্তর) ইহাও  
অযুক্ত। (কারণ), শরীরাদি উপভোগার্থ; তাহার ভোগের প্রতিবন্ধ করিবে, ইহা  
উপপন্ন হয় না এবং অশরীর আত্মার কোন ভোগ আছে, এ বিষয়ে অনুমান নাই।

ভাষ্য। ইষ্টাধিগমার্থা প্রবৃত্তিরিতি চেৎ, ন অনিষ্টো-  
পরমার্থত্বাৎ। ইদমনুমানঃ ইষ্টাধিগমার্থো মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিশ্চ  
মুমুক্শুণাং নোভয়মনর্থকমিতি। এতচ্চাযুক্তং অনিষ্টোপরমার্থো মোক্ষো-  
পদেশঃ প্রবৃত্তিশ্চ মুমুক্শুণামিতি, নেষ্টমনিষ্টেনাননুবিদ্ধং সম্ভবতীতি  
ইষ্টমপ্যনিষ্টং সম্পদ্যতে। অনিষ্টহানায় ঘটমান ইষ্টমপি জহাতি।  
বিবেকহানম্যাশক্যত্বাদিতি।



দৃষ্টান্তক্রমশ্চ দেহাদিষু তুল্যঃ । যথা দৃষ্টমনিত্যং স্বখং পরিত্যজ্য নিত্যস্বখং কাময়তে এবং দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধীরনিত্যা দৃষ্টা অতিক্রম্য মুক্তস্য নিত্যা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ কল্পয়িতব্যঃ, সাধার্যশ্চৈবং মুক্তস্য চৈকাত্ম্যং কল্পিতং ভবতীতি ।

উপপত্তিবিরুদ্ধমিতি চেৎ সমানম্ । দেহাদীনাং নিত্যস্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি সমানং স্বখস্যাপি নিত্যস্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি ।

অনুবাদ । প্রবৃত্তি ইচ্ছালাভার্থ, ইহা যদি বল, তাহা নহে । কারণ, ( প্রবৃত্তির ) অনিষ্ট নিবৃত্ত্যর্থতা আছে । বিশদার্থ এই যে—( পূর্ববপক্ষ ) মোক্ষের উপদেশ ও মুমুকুদিগের প্রবৃত্তি ইচ্ছা লাভার্থ, ( স্বখ লাভের জন্ত ) । উভয় অর্থাৎ মোক্ষের উপদেশ ও মুমুকুদিগের প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, এই অনুমান আছে অর্থাৎ উপদেশ মাত্র এবং প্রবৃত্তি মাত্রই যখন স্বখলাভার্থ, তখন মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুকুদিগের প্রবৃত্তিও স্বখ লাভার্থ; সুতরাং মোক্ষে নিত্যস্বখের অভিব্যক্তি হয়, এ বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার অনুমান-প্রমাণই আছে, উহা নিঃপ্রমাণ হইবে কেন ? ( উত্তর ) ইহাও অযুক্ত । মোক্ষের উপদেশ ও মুমুকুদিগের প্রবৃত্তি অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ ( দুঃখ নিবৃত্তির জন্ত ) । অনিষ্টের সহিত ( দুঃখের সহিত ) অননুবিদ্ধ ( সম্বন্ধহীন ) ইচ্ছা ( স্বখ ) সম্ভব নহে; এ জন্ত ইচ্ছাও ( স্বখও ) অনিষ্ট ( দুঃখ ) হইয়া পড়ে । দুঃখ পরিহারের জন্ত প্রবর্ত্তমান হইয়া স্বখও ত্যাগ করে; কারণ, বিবেক পূর্বক ত্যাগ করা যায় না অর্থাৎ দুঃখ-সংবলিত স্বখের স্বখ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কেবল দুঃখাংশকে ত্যাগ করা যায় না; দুঃখ-পরিহার করিতে হইলে একেবারে স্বখকেও পরিত্যাগ করিতে হয় ।

দৃষ্টের অতিক্রমও দেহাদিবিষয়ে তুল্য । বিশদার্থ এই যে, যেমন দৃষ্ট অনিত্য স্বখ পরিত্যাগ করিয়া ( মুমুকু ) নিত্য স্বখ কামনা করে, এইরূপ দৃষ্ট অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্যক্তির নিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিত্য স্বখভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিত্য দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে । এইরূপ হইলে মুক্ত ব্যক্তির ঐকাত্ম্যও অর্থাৎ কৈবল্যও সাধুতরূপেই কল্পিত হয় । উপপত্তি বিরুদ্ধ ইহা যদি বল ( তাহা ) সমান । বিশদার্থ এই যে, দেহাদির প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্য কল্পনা করা যায় না, স্বখেরও প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্য কল্পনা করা যায় না, ইহা সমান ।

ভাষ্য । আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনাদাগ-  
মেহপি সত্যবিরোধঃ ।

যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্তাৎ মুক্তস্তাত্যন্তিকং সুখমিতি । সুখশব্দ  
আত্যন্তিকে দুঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবমুপপদ্যতে, দৃষ্টো হি দুঃখাভাবে  
সুখশব্দপ্রয়োগো বহুলং লোক ইতি ।

নিত্যসুখরাগস্যাগ্রহাণে মোক্ষাধিগম্যভাবো রাগস্য  
বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ ।

যদ্যয়ং মোক্ষে নিত্যং সুখমভিব্যজ্যতে ইতি নিত্যসুখরাগেণ মোক্ষায়  
ঘটমানো ন মোক্ষমধিগচ্ছেদ্যাধিগন্তুমর্হতীতি বন্ধনসমাজ্ঞাতো হি রাগঃ ।  
ন চ বন্ধনে সত্যপি কশ্চিন্মুক্ত ইত্যুপপদ্যত ইতি । গ্রহীণনিত্যসুখ-  
রাগস্যাপ্রতিকূলত্বম্ । অথাস্ত নিত্যসুখরাগঃ গ্রহীয়তে তস্মিন্  
গ্রহীণে নাস্ত নিত্যসুখরাগঃ প্রতিকূলো ভবতি ।

যদ্যেবং মুক্তস্য নিত্যং সুখং ভবতি অথাপি ন ভবতি নাস্যোভয়োঃ  
পক্ষয়োর্মোক্ষাধিগমো বিকল্পত ইতি ।

অনুবাদ । আত্যন্তিক সংসার-দুঃখাভাবে সুখ-বচন-বশতঃ আগম থাকিলেও  
বিরোধ নাই । বিশদার্থ এই যে, যদিও “মুক্ত ব্যক্তির আত্যন্তিক সুখ” এইরূপ  
অর্থাৎ আপাততঃ ঐরূপ অর্থের প্রতিপাদক কোনও আগম থাকে, ( তাহাতে )  
“সুখ” শব্দ অর্থাৎ সেই আগমস্থ সুখবাচক শব্দ আত্যন্তিক দুঃখাভাবে অর্থাৎ  
আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থে প্রযুক্ত, এই প্রকার উপপন্ন হয় । কারণ, লোকে  
দুঃখাভাবে অর্থাৎ দুঃখাভাব অর্থে সুখ শব্দের প্রয়োগ ( সুখবাচক শব্দের প্রয়োগ )  
বহু দেখা যায় । পরন্তু নিত্য সুখাভিলাষের অপরিভাষ্য মোক্ষ লাভ হয় না ;  
কারণ, রাগের বন্ধন সমাজ্ঞান আছে । বিশদার্থ এই যে, যদি এই ব্যক্তি ( মুমুক্শু  
ব্যক্তি ) মোক্ষে নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ জন্ম নিত্য সুখে অভিলাষবশতঃ মুক্তির  
জন্ম প্রবর্তমান হয়, তাহা হইলে মুক্তি লাভ করে না ; করিতে পারে না । যেহেতু,  
রাগ ( বিষয়ে অভিলাষ বা আসক্তি ) বন্ধন-সমাজ্ঞাত অর্থাৎ বন্ধন বলিয়াই সর্ববিস্মৃত ।  
বন্ধন থাকিলেও কেহ মুক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না ।

পরিত্যক্ত নিত্য-সুখাভিলাষের প্রতিকূলক নাই । বিশদার্থ এই যে—যদি ইহার



( মুমুকুর ) নিত্য সুখে অভিলাষ পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ নিত্য সুখাভিলাষ অয়ংই মুমুকুকে পরিত্যাগ করে, সেই নিত্য-সুখাভিলাষ পরিত্যক্ত হইলে, এই মুমুকুর নিত্য-সুখাভিলাষ ( মোক্ষলাভের ) প্রতিকূল হয় না ।

এইরূপ হইলে, অর্থাৎ সর্ববিধয়ে বৈরাগ্যবশতঃই মুমুকুর মোক্ষ-প্রবৃত্তি হইলে, যদি মুক্ত ব্যক্তির নিত্য সুখ হয় অথবা নাও হয়, উভয় পক্ষেই ইহার ( মুমুকুর ) মোক্ষলাভ সন্নিধি হয় না, ( অর্থাৎ নিত্য সুখের কামনা না থাকায় নিত্য সুখের অনুভূতি না হইলেও তাহাকে নিঃসন্দেহে মুক্ত বলা যাইতে পারে ) ।

টিপনী । ভাব্যকার পূর্বোক্ত মতের নিশ্চয়মাণত্ব সমর্থনের জন্ত বলিয়াছেন যে, নিত্য পদার্থের অভিব্যক্তি তাহার অহুত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে । ঐ অহুত্ব নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী আত্মারও ঐ নিত্য সুখাহুত্ব আছে বলিতে হয় । যদি বল, সংসারীর ঐ নিত্য সুখাহুত্ব থাকিলেও তাহার ছঃখাহুত্বও আছে, সুতরাং মুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার বিশেষ আছে এবং অন্তর্য বিশেষও অনেক আছে । এই কথা মনে করিয়া ভাব্যকার দোষাত্মক প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সংসারীর ধর্ম্মার্থের ফল সুখ ও ছঃখ বথাক্রমেই অহুত্ব হইয়া থাকে । ছঃখভোগের সময়ে সুখভোগ হয় না, ইহা সর্বাত্মক-সিদ্ধ । যদি সংসারী আত্মারও নিত্যসুখাহুত্ব থাকে, তাহা হইলে, উহা তাহার ছঃখাহুত্বের সমকালীন হইয়া পড়ে । একই সময়ে সুখ ও ছঃখের অনুভব সর্বাত্মক-বিবর্তক । যদি বল, নিত্যসুখের অহুত্ব নিত্য পদার্থ হইবে কেন ? উহা পূর্বে থাকে না ; নিত্যসুখ পূর্বে থাকিলেও তাহার অহুত্ব মোক্ষের উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত । এতজ্ঞতরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ অহুত্বের উৎপাদক কারণ বলিতে হইবে । আত্মমনঃসংযোগ না থাকিলে কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না । মুক্তাবস্থায় আত্মাতে মনের সংযোগ থাকে, বলিলে তখন আত্মাকে “কেবল” বলা যায় না । মনঃসংযুক্ত আত্মা “কেবল” আত্মা নহে । যদিও তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ আত্মমনঃসংযোগ সহকারী কারণ ব্যতীত সুখাহুত্বের কারণ হয় না । সংসারাবস্থায় সুখাহুত্ব বধন ধর্ম্মই তাহার সহকারী কারণ, তখন মুক্তাবস্থায় সুখাহুত্বের ধর্ম্মকেই সহকারী কারণ বলিতে হইবে ।

সংসারাবস্থায় কারণগুলি মুক্তাবস্থায় আবশ্যক হয় না বলিলে মুক্তাবস্থায় চক্ষুরাতির অভাবেও রূপদর্শনাদি হইতে পারিত । ধর্ম্মকে সহকারী কারণ বলিলে ঐ ধর্ম্মের কারণ বলিতে হইবে । যদি বল, যোগসমাধিজাত ধর্ম্মই তখন সহকারী কারণ হয়, এতজ্ঞতরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে কারণের অভাবে তখন নিত্যসুখাহুত্বের নিবৃত্তি হইয়া পড়ে । ধর্ম্মমাত্রই কলসাপ্ত, কলসাপ্তি হইলে ধর্ম্ম থাকে না । যদি বল, নিত্যসুখাহুত্বরূপ ফলের বধন সমাপ্তি নাই, তখন তাহার কারণ ধর্ম্মও কোনও দিন বিনষ্ট হয় না ; এতজ্ঞতরে বলিয়াছেন যে, যোগসমাধিজাত ধর্ম্মের ক্ষয় নাই, এ বিষয়ে অতুমান নাই । পরন্তু উৎপন্ন ভাবগদাগমাত্রই বিনাশী, ইহা অতুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ । এই কথা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাদিরূপ কারণও খণ্ডিত হইয়াছে ; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানাদিও বিনাশী ।



তাহাদিগের অভাবে নিত্যসুখাত্মদেরও নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। যদি বল যে, মোক্ষে নিত্য সুখের অহুত্বের কখনও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, ঐ অহুত্বের প্রবাহ চিরকালই থাকে; সুতরাং উহার কারণটি কোন নিত্য পদার্থ, ইহা অসম্ভব। এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, নিত্য সুখাত্মদের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী জীবেরও নিত্য সুখের অহুত্ব হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে জীবের ছুঃখ-ভোগের সহিত এক সঙ্গেই সুখভোগ হইতেছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা অহুত্ব-বিরুদ্ধ অসিদ্ধান্ত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল যে, কারণ থাকিলেও সংসারী জীবের শরীরাদি সধক প্রতিবন্ধক থাকায় নিত্য সুখের অহুত্ব হয় না, এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, শরীরাদি ভোগের সহায়, তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা অসম্ভব। পরন্তু শরীরাদিশূন্য আত্মার কোন ভোগ হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন অসম্ভব (যুক্তি) নাই।

যদি বল যে, প্রবৃত্তি মাত্র এবং উপদেশ মাত্রই সুখভোগার্থ; সুতরাং মোক্ষ উপদেশও মুমুকুর প্রবৃত্তি অবশ্য সুখভোগার্থ, এই অসম্ভব দ্বারাই মোক্ষে নিত্যসুখসম্ভোগ হয়, ইহা নির্ণয় করা যায়, উহা নিশ্চয় হইবে কেন? এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, অনেক প্রবৃত্তি সুখভোগার্থ হইলেও কেবল ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্তও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত বধন মরিতেও প্রবৃত্তি হয়, তখন মোক্ষের উপায়ান্তর নাই বা তাহা হইবে না কেন?—বিরক্ত ব্যক্তির তাহা হইয়া থাকে। ছুঃখ-সম্বন্ধ-শূন্য সুখ অসম্ভব; সুতরাং বিরক্ত ব্যক্তির নিকটে সুখও ছুঃখ হইয়া পড়ে, তিনি ছুঃখ পরিহারের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়া সুখকেও পরিত্যাগ করেন। সুখের মধ্যগত ছুঃখভাগ পরিত্যাগ করিয়া সুখ ভোগ করা যায় না। সুখভোগ করিতে হইলে ঐ ছুঃখভোগও করিতে হয়। আর ছুঃখকে একেবারে পরিহার করিতে হইলে সুখকেও একেবারে পরিহার করিতে হয়। বিরক্ত মুমুকু তাহাই করিয়া থাকেন। ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্তই তিনি মোক্ষের উপায়ান্তর প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যিনি সুখের লাগসা ছাড়িতে পারেন না, তিনি মোক্ষে অনধিকারী,—তাই তিনি এ কথা বুঝিতেও পারেন না।

পরন্তু মুমুকু যদি দৃষ্ট অনিত্য সুখ ত্যাগ করিয়া নিত্য সুখের কামনাই করেন, অর্থাৎ নিত্য সুখভোগই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তরুণ দৃষ্ট অনিত্য দেহাদি ত্যাগ করিয়া তিনি নিত্য দেহাদিও কামনা করিবেন। নিত্য সুখ-সম্ভোগের জন্ত মুক্ত ব্যক্তির নিত্য-দেহাদিও কামনা করিতে হইবে। আত্মার কেবল-ভাবরূপ প্রকৃত কৈবল্য ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখ-সম্ভোগরূপ নূতন কৈবল্যের কামনা করিলে—দেহাদি-শূন্য আত্মার নিত্য-সুখ-সম্ভোগরূপ কল্পিত কৈবল্যের অপেক্ষায়—দেহাদিযুক্ত আত্মার নিত্য-সুখ-সম্ভোগরূপ কল্পিত কৈবল্যই সাধুতর হয়। কারণ, দেহাদিযুক্ত আত্মাতেই সুখসম্ভোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তসারেই কামনা করিতে হয়। দেহাদির নিত্য প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিলে, সুখের নিত্যও প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিতে পারি। দেহাদির জায় সুখও জন্ত ভাব-পদার্থ; সুতরাং সুখমাত্রই দেহাদির জায় বিনাশী, এইরূপ অসম্ভব করা বাইতে পারে।

যদি বল, মুক্ত ব্যক্তির নিত্য-সুখসম্ভোগ কতিসিদ্ধ। “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষ প্রতিষ্ঠিতম্”। “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন”। “রসো বৈ সঃ রসং হেবারং



গব্ধানন্দোভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে নিত্যানন্দ-প্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রুতি-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিবে কিরূপে? এতদ্বন্ধরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে আত্যন্তিক হুংখাভাব অর্পেই আনন্দ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। হুংখাভাব অর্পে আনন্দ ও স্বথ প্রভৃতি শব্দের গোণ প্রয়োগ তিরকালই হইয়া আসিতেছে। লৌকিক ভাষাতেও উহা দেখা যায়। শুদ্ধ ভার নামাইয়া ভারবাহী "বাচিলাম," "সুখী হইলাম" এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। সাময়িক অরবিরাসে রোগী "সুখী হইয়াছি" এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। ফলতঃ ঐরূপ বহু স্থলেই কেবল হুংখ-নিবৃত্তিতেই স্বথবাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যদি বল, শ্রুতির মুখ্যার্থ বাধ না হইলে গোণার্গ ব্যাখ্যা অসম্ভব। পরন্তু কেবল ঐ নিজ সিদ্ধান্ত রক্ষার ওজ্ঞা শ্রুতির অত্যাশ্রয় বহু অংশেই লক্ষণার সাহায্যে কোনরূপে নিজ মতামুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা সমীচীন ব্যাখ্যা নহে,—এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে একটি বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিত্য স্বথের কামনা থাকিলে যুক্তিলাভ হইতে পারে না; কারণ, কামনা বা আশঙ্কি বন্ধন বলিয়াই সর্গদিক। বন্ধন থাকিলে কি তাহাকে মুক্ত বলা যায়? পরন্তু কামনার অসীমতায় কর্ম করিয়াই জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতেছে।

নিত্য স্বথের কামনার নোকে প্রবৃত্ত হইলে, কামনা-পিপাচী উপস্থিত বিষয়-স্বথেরও মুমুক্ষুকে প্রবৃত্ত করাইয়া নোকে অদূর-পরাহত করিবে। অনেক পরমযোগী শেষে ক্ষুদ্র কামনার অধীন হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা "ভটীনাং ত্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে"। অতএব মুমুক্ষু কামনাকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। রাগের স্রাব ঘেবও বন্ধন, ঘেবকেও পরিত্যাগ করিবেন। স্বথের কামনা পরিত্যাগ করিলে স্বথকে ঘেব করা হয় না। হুংখপরিহারের ইচ্ছা হইলেও হুংখকে ঘেব করা হয় না। বৈরাগ্যই মুমুক্ষুতার মূল। মুমুক্ষু হুংখকে বিবেচ করেন না। বৈরাগ্য এবং বিবেচ এক পদার্থ নহে। জন্মান্তরের নিকান সাধনার ফলে ত্যাগপ্রিয় স্বকৃতী মানব ইহা অবিলম্বে বুদ্ধিতে পাবেন। অন্তের এখানে বড় গোল। মূলকথা, নিত্য স্বথের কামনা মোক্ষের প্রতিফল; সুতরাং শ্রুতিতে মোক্ষে নিত্যস্বথানুভব হয়, এ কথা থাকিতে পারে না। মোক্ষে নিত্য-স্বথসম্ভোগ হয়, ইহা জানিয়া মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে, মুমুক্ষু স্বথসম্ভোগের কামনা কখনই ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং মোক্ষে নিত্য-স্বথসম্ভোগ শ্রুতির প্রকৃতার্থ নহে। ফলতঃ শাস্ত্রীয় যুক্তি অমুসারে পুরোক্ত শ্রুতিই "আনন্দ" শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না। আত্যন্তিক হুংখ-নিবৃত্তিরূপ লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষণা-স্বীকার উভয় পক্ষেই আছে। কারণ, "অশরীরং ব্যবদন্তং প্রিয়ারপ্রিয়ে ন শৃশতঃ" এই শ্রুতিতে মোক্ষে স্বথাভাব স্পষ্ট রহিয়াছে। মোক্ষে স্বথ-সম্ভোগবাদিগণ ঐ শ্রুতিতে স্বথমাত্র-বোধক "প্রিয়" শব্দের অনিচ্ছা স্বথে লক্ষণা স্বীকার করিবেন। নচেৎ তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বাহিত হয়। "প্রিয়" শব্দের ঐরূপ লক্ষণার অপেক্ষায় "আনন্দ", "স্বথ" প্রভৃতি শব্দের হুংখাভাবে লক্ষণা প্রসিদ্ধ। লৌকিক ভাষাতেও ঐরূপ প্রয়োগ বহু দেখা যায়। তাই বলিয়াছেন—"বহুলং লোকে।"

যদি বল, প্রথমতঃ নিত্য স্বথের কামনা থাকিলেও পরে সর্গ-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্য

উপস্থিত হওয়ায় মনুষ্য সৰ্ব বিষয়ে নিকাম হইয়া পড়েন। সুতরাং নিত্যসুখাভিলাষ পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহা মোক্ষপাথের প্রতিকূল হয় না। সৰ্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষে প্রবর্তক, ইহা উভয় পক্ষেই স্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত ভাব্যকার সৰ্বশেষে বলিয়াছেন যে, যদি সৰ্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষের প্রকৃত প্রবর্তক, এই প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তবে মুক্ত ব্যক্তির নিত্যসুখ-সন্তোষ না হইলেও তাহাকে মুক্ত বলিবে না কেন? নিত্যসুখ-সন্তোষে যখন তাহার কিছুমাত্র কামনা নাই, তখন উহা না হইলেই বা তাহার ক্ষতি কি? সুখ ও দুঃখ যাহার নিকটে সমান, তাহার সুখভোগ না হইলেও কোন ক্ষতি বুঝা যায় না। মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সৰ্বসম্মত। উহা না হইলে আর কিছুতেই মুক্ত বলা যায় না। কোন সম্প্রদায়ই তাহা বলেন না। ঐ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইলে তাহার নিত্যসুখসন্তোষ হউক বা না হউক, উভয় পক্ষেই মুক্তিব্যক্তির কোন সংশয় নাই। নিত্যসুখ-সন্তোষের যখন কোন কামনা নাই, তখন দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইলে আর তাহার মুক্তিব্যক্তির বাকী থাকিল কি? মোক্ষে নিত্যসুখ-সন্তোষ না হইলেও যদি তাহাকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার কর, তবে আর মোক্ষে নিত্যসুখ-সন্তোষ হয়, উহাই মুক্তি, এই সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না।

পরন্তু নিত্যসুখ-সন্তোষ যখন জ্ঞাত ও ভাবপদার্থ, তখন তাহা অবশ্য বিনাশী। সুতরাং উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না এবং সুখসন্তোষ "মূঢ়" ধাতুর অর্থ নহে; দুঃখ-নিবৃত্তিই উহার অর্থ। সুতরাং উহার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পর্য্যন্ত বুঝা যাইতে পারে। উহা জ্ঞাত হইলেও ভাবপদার্থ নহে। সুতরাং বিনাশের আশঙ্কা নাই। "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" এই শ্রুতিতে উহাই মুক্তিরূপে অভিহিত হইয়াছে। অজ্ঞাত শ্রুতিহ "আনন্দ" প্রভৃতি শব্দেরও উহাই অর্থ। শাস্ত্র কখনও মুখ্য শ্লোককে স্বর্গাদির স্থায়ী একটা অপূৰ্ব সুখ-সন্তোষ বলিতে পারেন না।

মোক্ষে নিত্যসুখসন্তোষবাদী কেহ কেহ বলেন যে, উৎপন্ন ভাবপদার্থ নাইই বিনাশী, এই নিয়ম স্বীকার করি না। নৈসর্গিক বস্তুে ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও চিরস্থায়ী, সেইরূপ মুক্ত ব্যক্তির বিজাতীয় সুখ-সন্তোষ উৎপন্ন হইয়াও চিরস্থায়ী হইতে পারে। সাংসারিক সুখ-সন্তোষের দৃষ্টান্তে ঐ বিজাতীয় নিত্যসুখসন্তোষকে বিনাশী বলিয়া স্থির করা যায় না। কারণ, উহা শ্রুতি-সিদ্ধ চিরস্থায়ী পদার্থ। আত্যন্তিক দুঃখের অভাব প্রস্তরাদিতেও আছে, তাহা কখনও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না এবং নিত্যসুখ-সন্তোষের কামনা না থাকিলেও নিত্যসুখ-সন্তোষ হইতে পারে। যেমন দুঃখভোগের কামনা না থাকিলেও জরাদি পীড়া উপস্থিত হইলে দুঃখ-ভোগ হয়, তজ্জপ নিত্যসুখসন্তোষের কামনা না থাকিলেও তাহার কারণ ঘটিলে অবশ্য তাহা হইবেই। গোপী-প্রেমের ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, গোপীদিগের আত্মদুঃখের কিছুমাত্র কামনা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-সমাগমে তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সুখাশংকায় কোটি গুণ সুখ হইত।

"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।

সুখবাহা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ।"

—চৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪পঃ।



এ সুখ-সন্তোষ কিরূপ, তাহা তাহারাই বুঝিতেন। সকলে ইহা বুঝিতে পারে না। তাই বলিয়া ইহা কবিকল্পিত নহে, ইহা অসম্ভব নহে।

বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম-কথিত মুক্তি-লক্ষণ কোন মতেরই বিরুদ্ধ নহে। আতান্ত্রিক চুৎখ-নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই মুক্তি হয় না। সুতরাং মহর্ষি ঐ সর্বগম্যত অবস্থাকেই মুক্তির লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় আনন্দানুভূতি থাকে কি না, তাহা বর্তমান জ্ঞানসূত্রে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। অন্ততঃ পরম প্রাচীন ভাষ্যকার প্রভৃতি কোন জ্ঞানচার্য্যই তাহা স্বীকার করেন নাই। সকলেই তাহার বিরুদ্ধবাদী। মাদবাচার্য্যের “সংক্ষেপ শঙ্করজয়” গ্রন্থের শেষ-ভাগে পাওয়া যায়, কোন নৈরাগিক গর্গের সহিত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে কণাদের মুক্তি হইতে গোতমের মুক্তির বিশেষ কি, এই ছন্দস্বর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার গুণ-সম্বন্ধের অত্যন্ত বিনাশে আকাশের জায় স্থিতিই মুক্তি। গোতমের মতে উক্ত অবস্থায় “আনন্দ সংবিৎ” থাকে। মনে হয়, অতি প্রাচীন কালে গোতমের মুক্তির উল্লেকই ব্যাখ্যা ছিল; ভাব কার উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যার প্রতিবাদের জন্যই এখানে উক্ত মতের সমধিক সমালোচনা করিয়াছেন। এ সকল অতি গুরুতর কথা। মুক্তি-পরীক্ষা-প্রকরণে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। স্থানবত এব তর্হি সংশয়স্ত লক্ষণং বাচ্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ। তৎকালে অর্থাৎ প্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ-সময়ে ক্রম-প্রাপ্ত সংশয়েরই লক্ষণ (এখন) বক্তব্য, এ জন্য তাহা (সংশয়ের লক্ষণ) বলিতেছেন।

সূত্র। সমানানেকধর্মোপপত্তের্ব্বিপ্রতিপত্তেকুপ-  
লক্যানুপলক্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষা বিমর্শঃ  
সংশয়ঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মের জ্ঞান জন্ম, (২) অসাধারণ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মের জ্ঞান জন্ম, (৩) বিপ্রতিপত্তি জন্ম অর্থাৎ বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্য জন্ম, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থা জন্ম এবং (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্ম,—বিশেষাপেক্ষ (যাহাতে বিশেষজ্ঞানের ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকে না, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি থাকে) “বিমর্শ” অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান—“সংশয়”।

১। ভাস্কর্য্য-প্রণীত “জ্ঞানসার” গ্রন্থে এই মত পাওয়া যায়। “জ্ঞানসূত্রে তু পুনরেক নিত্যসংবেদনানেন অগেন বিশিষ্টাত্ত্বিকী চুৎখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্ত মোক্ষঃ”।—বহুদর্শনসমুদয়ের গুণগুণীক।

টিকনি। প্রথম স্তরে “প্রমেয়” পদার্থের পরেই “সংশয়” পদার্থ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর প্রমেয় লক্ষণের পরে এখন সংশয়ই ক্রমপ্রাপ্ত। এ জন্ত প্রমেয়-লক্ষণের পরে এখন সংশয়েরই লক্ষণ বলিতেছেন। ভাষ্যে “তর্হি” ইহার ব্যাখ্যা—“তদানীং” (উদ্দেশ্যসময়ে)। “হান” শব্দের অর্থ ক্রম। “হানবতঃ” ইহার ব্যাখ্যা “ক্রম-প্রাপ্তস্ত”।

সূত্রে “সংশয়ঃ” এই অংশ লক্ষ্যনির্দেশ। “বিমর্শঃ” এই অংশের দ্বারা সংশয়ের সামান্য লক্ষণ স্থচিত। “বি” শব্দের অর্থ বিরোধ। “ম্শ” ধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাৎপর্য্যানুসারে এখানে “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহাই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। সূত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথা দ্বারা সংশয়মাত্রেরই তৎকালে বিশেষধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু পূর্ব-দৃষ্ট সেই বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকা চাই, ইহাই স্থচিত হইয়াছে। সূত্রের অন্ত্যংশের দ্বারা পাঁচটি বিশেষ কারণের উল্লেখ পঞ্চবিধ বিশেষ সংশয়ের পাঁচটি বিশেষলক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। ঐ পাঁচটি বিশেষ লক্ষণে সূত্রোক্ত “বিমর্শ” শব্দের অহুবৃতি করিতে হইবে এবং ঐ “বিমর্শ” শব্দই পাঁচটি বিশেষ লক্ষণের লক্ষ্য পদ। সে পক্ষে উহার অর্থ বিশিষ্ট সংশয়।

বিসৃতি। সংশয় এক প্রকার জ্ঞানবিশেষ। নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। যে বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান নাই, সে বিষয়েও নিশ্চয়ের অভাব আছে, কিন্তু সংশয় নাই। মহর্ষি “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা এই সংশয় জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন। “বিমর্শ” বলিতে বিরুদ্ধজ্ঞান অর্থাৎ বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। একই কালে একই পদার্থে যে সকল ধর্ম থাকে না, থাকিতেই পারে না, সেই সকল ধর্মকে সেই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ বলে। যেমন একই সময়ে একই মনুষ্যে পরিণীতত্ব, অপরিণীতত্ব, পুত্রবধ, পুত্রহীনতা, এইরূপ ধর্মগুলি থাকে না, থাকিতেই পারে না; অতঃপর ঐ ধর্মগুলি একই সময়ে একই মনুষ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ, একই সময়ে একই মনুষ্যে ইনি পরিণীত, অথবা অপরিণীত, ইনি পুত্রবান্ অথবা অপুত্রক, এই প্রকার কোন জ্ঞান জন্মিলে ঐ জ্ঞান সংশয়। কলতঃ একই ধর্ম্মাতে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্মের জ্ঞানকেই সংশয় বলে। এই সংশয় সর্বত্রই হয় না, হইতে পারে না, জ্ঞানের সামান্য কারণ থাকিয়া যেখানে সংশয়ের কোন বিশেষ কারণ আছে, সেখানেই সংশয় হয়। সংশয়ের বিশেষ কারণের ভেদেই সংশয়ের ভেদ। ভাষ্যকার পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্ত পঞ্চবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ ধর্ম জ্ঞান জন্ত একপ্রকার সংশয় হয়। অধিকাংশ সংশয়ই এই প্রকার, তাই এই প্রকারটিকেই সর্বাগ্রে বলা হইয়াছে।

(১) পথের ধারে একটি শাখাপত্রবশূন্য বৃক্ষ (হাণু) নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালে ক্রমবেগে গৃহাভিমুখে ধাবমান পথিক উহাতে হাণু ও পুরুষের কোন বিশেষ ধর্ম দেখিতে পাইল না, কিন্তু হাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি এবং সেইরূপ দণ্ডায়মান ভাব প্রভৃতি দেখিয়া পথিকের সংশয় হইল, এইট কি হাণু? অর্থাৎ বুড়ো গাছ? অথবা পুরুষ, অর্থাৎ কোন মনুষ্য, এই সংশয় সাধারণ ধর্মজ্ঞান জন্ত। পথিক



সেই সমুখবর্তী পদার্থকে স্থাপু ও পুরুষের সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছে। তাই তাহার ঐরূপ সংশয় হইয়াছে।

(২) এইরূপ কোন স্থলে অসাধারণ ধর্মজ্ঞান-জন্তুও সংশয় জন্মে। যে ধর্ম্মীতে সংশয় হয়, কেবল সেই ধর্ম্মীতেই যে ধর্ম্মটি থাকে, তাহার সজাতীয় এবং বিজাতীয় আর কোন পদার্থে থাকে না, সেই ধর্ম্মটিকে সেই ধর্ম্মীর অসাধারণ ধর্ম্ম বলে। যেমন শব্দের ধর্ম্ম শব্দত্ব, উহা শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না, স্ততরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম। শব্দে যদি নিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম্ম এবং অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম্ম নিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে সেখানে ঐ শব্দরূপ অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্তুও “শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য?” এইরূপ সংশয় জন্মে। অর্থাৎ কোন নিত্য পদার্থেও শব্দক নাই, কোন অনিত্য পদার্থেও শব্দক নাই, এইরূপে জ্ঞায়মান শব্দক ধর্ম্মটির শব্দে জ্ঞান হইলে তাহাতে ঐরূপ সংশয় জন্মে।

(৩) এইরূপ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়-প্রযুক্তও সংশয় জন্মে। একজন বলিলেন—“জগৎ মিথ্যা।” একজন বলিলেন—“জগৎ সত্য।” এই দুইটি বাক্য শুনিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হয়। এই প্রকার সংশয়কে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় বলা হইয়াছে।

(৪) এইরূপ উপলব্ধির অনিয়ম প্রযুক্তও সংশয় জন্মে। পদার্থ থাকিলেও উপলব্ধি হয় এবং না থাকিলেও অনেক স্থলে আছে বলিয়া ভ্রম উপলব্ধি হয়, স্ততরাং উপলব্ধির নিয়ম নাই। এ জন্ত কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে “ইহা বিদ্যমান, কি অবিদ্যমান” এইরূপ সংশয়ও অনেক স্থলে হয়। এইরূপ সংশয়কে উপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্ত সংশয় বলা হইয়াছে।

(৫) এইরূপ অহুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্তও এক প্রকার সংশয় জন্মে। ভূগর্ভে কত পদার্থ থাকিলেও উপলব্ধি হইতেছে না, আবার বাহার উৎপত্তি হয় নাই, অথবা বাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারও উপলব্ধি হয় না, স্ততরাং অহুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, তজ্জন্ত কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে তাহা বিদ্যমান, অথবা অবিদ্যমান, এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। তবে বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় থাকিলে এবং বিশেষ ধর্ম্মের স্ফুটি না থাকিলে কোন স্থলেই কোন প্রকার সংশয় জন্মে না। তাই মহর্ষি সংশয় মাত্রকেই বলিয়াছেন—“বিশেষাপেক্ষ”।

ভাষ্য। সমানধর্ম্মোপপত্তের্বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয় ইতি। স্থাপুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্ম্মমারোহপরিণাহৌ পশ্চান্ পূর্বদৃষ্টঞ্চ তয়ো-  
র্বিশেষং বুভুৎসমানঃ কিং সিদিত্যন্ততরং নাবধারণতি, তদনবধারণং জ্ঞানং  
সংশয়ঃ। সমানমনয়োর্ধর্ম্মমুপলভে, বিশেষমন্ততরস্ত নোপলভে ইত্যেবা  
বুদ্ধিরপেক্ষা সংশয়স্ত প্রবর্তিকা বর্ততে, তেন বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ  
সংশয়ঃ।

অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান জন্ত বিশেষাপেক্ষ অর্থাৎ

যেখানে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকিবেই, এমন “বিমর্শ” অর্থাৎ এতাদৃশ যে একই ধর্মীতে অনেক বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান, তাহা সংশয়, অর্থাৎ তাহাই প্রথম প্রকার সংশয়বিশেষ।

[ উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত পূর্বেবাক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন ]

স্বাণু ও পুরুষের অর্থাৎ শাখা-পল্লবহীন বৃক্ষ এবং মানুষের সমান ধর্ম আরোহ এবং পরিণাহকে অর্থাৎ তুল্যরূপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতিকে দর্শন করতঃ এবং সেই স্বাণু পুরুষের পূর্ববদৃষ্ট বিশেষ ধর্ম বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ অর্থাৎ স্বাণু ও পুরুষের যে বিশেষ ধর্ম পূর্বে দেখিয়াছে, তাহার উপলব্ধি না করিয়া কেবল তাহার স্মরণ করতঃ ইহা কি ? অর্থাৎ ইহা স্বাণু ? অথবা পুরুষ ? এইরূপে একতরকে অর্থাৎ স্বাণু ও পুরুষ অথবা স্বাণু ও পুরুষ-ধর্ম, ইহার মধ্যে কোন একটিকে অবধারণ করে না অর্থাৎ ঐ উভয় বিষয়েই অনবধারণ করে, সেই অনবধারণরূপ জ্ঞান (ঐ স্থলে) সংশয়।

[ সূত্রোক্ত ‘বিশেষাপেক্ষ’ এই কথার এই স্থলে ব্যাখ্যা করিতেছেন ]

এই পদার্থদ্বয়ের অর্থাৎ বুদ্ধি বা স্মৃতিবিষয়ীভূত এই দুইটি পদার্থের সমান ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, একতরের বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি সংশয়ের সম্বন্ধে অপেক্ষা কি না জনিকা আছে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে সংশয়ের পূর্বে ঐরূপ জ্ঞান হয়, ঐরূপ জ্ঞান ঐ প্রকার সংশয়ের পূর্বে আবশ্যিক, সুতরাং “বিশেষাপেক্ষ” হইয়া বিমর্শটি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে অনবধারণ জ্ঞানটি “সংশয়” হইয়াছে।

টিপ্পনী। সূত্রে “সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ” এই অংশের দ্বারা বিবিধ সংশয়ের দুইটি বিশেষ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি সমান ধর্মের উপপত্তিজন্য, দ্বিতীয়টি অনেক ধর্মের উপপত্তিজন্য। সূত্রস্থ একই “ধর্ম” শব্দের উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝিয়া ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে “সমান ধর্ম” বলিতে বুঝিতে হইবে—সাধারণ ধর্ম। “উপপত্তি” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে জ্ঞান। সমান ধর্মের উপপত্তি কি না—সাধারণ ধর্মের জ্ঞান। যে কোন স্থানে সাধারণ ধর্মের জ্ঞান হইলে যে কোন স্থানে সংশয় জন্মে না। যে ধর্মীতে সংশয় হইবে, সেই ধর্মীকেই সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানই ভাষ্যকারোক্ত সমান ধর্মজ্ঞান। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, “সমান হইয়াছে ধর্ম বাহার”, এইরূপে বহুব্রীহি সমাসই সূত্র-কারের অভিপ্রেত, কর্মধারয় সমাস অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে সমান ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানই সূত্রোক্ত “সমানধর্মোপপত্তি”। এইরূপ ব্যাখ্যায় কোন আপত্তি না থাকিলেও ভাষ্যকার এখানে বহুব্রীহি সমাস সম্ভব বোধ করেন নাই। কারণ, সূত্রস্থ একই “ধর্ম” শব্দের উভয়স্থ সম্বন্ধ



মহাবীর অভিপ্রেত রহিয়াছে। ভাষ্যকার সূত্রকারোক্ত “অনেকধর্মোপপত্তি”র সেক্ষেপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এখানে বহুব্রীহি সমান সম্বত হয় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

সংশয় জ্ঞানে যে সকল বিরুদ্ধ বস্তু দুখ্য বিশেষণ হয়, তাহাকে সংশয়ের “কোট” বলে। যেমন “ইহা কি স্বাগু? অথবা পুরুষ?” এইরূপ সংশয়ে স্বাগু অথবা স্বাগুঃ একটি কোটি এবং পুরুষ অথবা পুরুষঃ একটি কোটি। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে ঐ স্থলে ইহা স্বাগু কি না? (স্বাগুর্ন বা) ইত্যাদি প্রকারে সংশয় হয়, তাঁহারা ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধকোটি ভিন্ন কেবল বিরুদ্ধ ভাব পদার্থ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বিরুদ্ধ ভাব পদার্থমাত্রে গইয়াও সংশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতে একই সংশয় দুইটি বিরুদ্ধ কোটির দ্বারা বহু বিরুদ্ধ কোটি লইয়াও হইতে পারে। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন শব্দে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিন কোটি লইয়া সংশয় দেখাইয়াছেন এবং কেবল বিরুদ্ধ ভাব পদার্থ লইয়া সংশয় দেখাইয়াছেন। ইহার দ্বারা ই পূর্বোক্ত মত তাঁহার সম্বত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। বস্তুতঃ “স্বাগুর্ন পুরুষো বা” ইত্যাদি প্রকার বাক্যের দ্বারাও যখন সংশয়কারী তাহার সংশয়কে প্রকাশ করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সর্বত্র “নৎ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াই সকলে সংশয় প্রকাশ করিবে, এইরূপ রাজাজ্ঞাও নাই, তখন কেবল বিরুদ্ধভাব পদার্থ বিষয়েও যে সংশয় জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। “স্বাগুর্ন, পুরুষো বা” ইত্যাদি স্থলে নব্য নৈয়ায়িকগণ “বা” শব্দের অভাব অর্থ বলিতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদিগের “পর্যন্তো বহিমান্ ন বা” এইরূপ বাক্যে “নৎ” শব্দটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহারা “পর্যন্তো বহিমান্ বা” এইরূপ বাক্যের দ্বারা ই সংশয় প্রকাশ করেন নাই কেন? এইরূপ বহু কোটি লইয়াও একটি সংশয় হইতে পারে। ঐরূপ সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কেন উহা হইবে না?১

তাৎপর্যটীকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যে “বিশেষং বুৎসমানঃ” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার বিবরণ করিয়াছেন। “অপেক্ষা” শব্দের ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করিয়া তাৎপর্যবলে উহার দ্বারা জ্ঞানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা সংশয়ের পরেই জন্মে, উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এ জ্ঞান ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “সমানমনরোধর্ধ্বপলভে” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য এই যে, সূত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার দ্বারা সংশয়ের পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু পূর্বদৃষ্ট সেই বিশেষ-

- ১। কিমিন্দুঃ কিং পদ্মঃ কিমু দুল্লববিদ্যাঃ কিমু দুখ্যঃ  
কিমজ্জঃ কিং বীনো কিমু নবনবাবো কিমু দুমো।  
নগো বা শুভ্রো বা কনককলসো বা কিমু কুতো  
তড়িষা তাদা বা কনকলতিকা বা কিমবলা।

বিস্তারিতের নিকটে কতিবাসের কথিত কবিতা বলিয়া বুদ্ধ পণ্ডিতসমাজে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার চারি চরণে চারিটি সংশয় একত্রিত। এই চারিটি সংশয়ের প্রত্যেকটি চতুঃকোটি এবং কেবল ভাবকোটি। ইহার মধ্যে অভাব বুঝিলে কবিতার ভাব বুঝা হইবে না।

ধর্মের স্বত্তি থাকা চাই, ইহাই সূত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত। “অপেক্ষা” শব্দের লক্ষণার দ্বারা ঐরূপ অর্গই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাইবার জন্য ভাষ্যকার সর্বশেষে “বিশেষব্যতাপেক্ষাঃ” এই কথা দ্বারা উহার কলিতার্থ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ সংশয়মাত্রই পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না। কিন্তু তাহার অরণ হওয়া চাই। বিশেষ জ্ঞান থাকিবে না, ইহা বলাতে সামান্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ স্থাণু অথবা পুরুষের বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইলে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হয় না এবং স্থাণু ও পুরুষ এবং তাহার বিশেষ ধর্মের কোন জ্ঞান না থাকিলেও ঐরূপ সংশয় হয় না।

ভাষ্য। অনেকধর্মোপপত্তেরিতি। সমানজাতীয়মসমানজাতীয়ধা-  
নেকম্। তত্থানেকস্ত ধর্মোপপত্তেঃ। বিশেষস্ত উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ।  
সমানজাতীয়েভ্যোঃ সমানজাতীয়েভ্যামর্থ্য। বিশিষ্যন্তে। গন্ধবৎত্বাৎ  
পৃথিব্যাদিভ্যো বিশিষ্যন্তে গুণকর্মভ্যাম্। অস্তি চ শব্দে বিভাগজত্বং  
বিশেষঃ, তস্মিন্ দ্রব্যং গুণঃ কর্ম বেতি সন্দেহঃ। বিশেষস্ত উভয়থা-  
দৃষ্টত্বাৎ কিং দ্রব্যস্ত সতো গুণকর্মভ্যো বিশেষঃ? আহোস্থিৎ গুণস্ত  
সত ইতি অথ কর্মণঃ সত ইতি। বিশেষাপেক্ষা—অন্যতমস্ত ব্যবস্থাপকং  
ধর্মং নোপলভে ইতি বুদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। (২) “অনেকধর্মোপপত্তেঃ” এই কথাটি ( ব্যাখ্যা করিতেছি )  
সমানজাতীয় এবং অসমানজাতীয় “অনেক”। সেই অনেকের ধর্ম জ্ঞান জন্ম,  
অর্থাৎ অনেক হইতে বিশেষক যে ধর্ম ( ব্যাবর্তক অসাধারণ ধর্ম ), তাহার জ্ঞান  
জন্ম। যেহেতু, উভয় প্রকারে বিশেষের দর্শন আছে, অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয়  
হইতে পদার্থের বিশেষ বা ব্যাবৃত্তি দেখা যায়। ( উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত এ  
কথার বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন )—সমানজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে এবং বিজাতীয়  
পদার্থবর্গ হইতে পদার্থসমূহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ( ইহার উদাহরণ ) গন্ধবৎ-  
হেতুক পৃথিবী ( দ্রব্যরূপে সজাতীয় ) জলাদি হইতে এবং ( বিজাতীয় ) গুণ ও  
কর্মসমূহ হইতে বিশিষ্ট হইতেছে। ( অসাধারণ ধর্মজ্ঞান জন্ম দ্বিতীয় প্রকার  
সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন ) শব্দে বিভাগজত্ব অর্থাৎ বিভাগজত্বরূপ  
বিশেষ ( ব্যাবর্তক বা অসাধারণ ধর্ম ) আছে। তাহাতে অর্থাৎ শব্দে ( ঐ বিভাগ-  
জত্বরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্ম ) দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম? এইরূপ সংশয়  
হয়। যেহেতু, উভয় প্রকারে বিশেষের দর্শন আছে। ( প্রকৃত স্থলে ইহার



প্রকার দেখাইতেছেন) কি দ্রব্য হইয়া শব্দের গুণ ও কর্ম হইতে বিশেষ ? অথবা গুণ হইয়া দ্রব্য ও কর্ম হইতে বিশেষ ? অথবা কর্ম হইয়া দ্রব্য ও গুণ হইতে বিশেষ ? অতঃপর অর্থাৎ শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, অথবা কর্মত্বের ব্যবস্থাপক (নিশ্চায়ক) ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি (এখানে) বিশেষাপেক্ষা, অর্থাৎ ঐরূপ বুদ্ধি এখানে থাকিতে ঐ সংশয় বিশেষাপেক্ষ হইয়াছে।

টিপ্পনী। স্বরে “অনেকধর্ম” বলিতে অসাধারণ ধর্ম। সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থই এখানে “অনেক” শব্দের অর্থ। তাহার বিশেষক অর্থাৎ যে ধর্মের দ্বারা ঐ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থগুলি হইতে ধর্মীয় ভেদ বুঝা যায়, তাহাই “অনেকধর্ম”। তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা যায়—অসাধারণ ধর্ম। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, স্বত্রোক্ত “অনেক” শব্দের লক্ষণার দ্বারা অনেক পদার্থ হইতে বিশেষক, এই পর্য্যন্ত অর্থ বুঝিতে হইবে এবং ভাষ্যে “অনেকত্ব” এই স্থলে সম্বন্ধার্থ স্বরূপ দ্বারা বিশেষকস্বরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়া অনেক হইতে বিশেষক বা ভেদক ধর্মই সেখানে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, অসাধারণ ধর্মই “অনেক ধর্ম”। কারণ, অসাধারণ ধর্মই পরার্থকে তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট করে অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। যেমন গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না, এ জন্ত উহা পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম। ঐ গন্ধ পৃথিবীকে তাহার সজাতীয় জল প্রভৃতি হইতে এবং বিজাতীয় গুণাদি পদার্থ হইতে বিশিষ্ট করে। গন্ধ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম, ইহা নিশ্চিত থাকায় অর্থাৎ যে পদার্থে গন্ধ আছে, তাহা পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা নিশ্চিত থাকায় ঐ স্থলে অসাধারণ ধর্মজ্ঞান সংশয় জন্মায় না। কারণ, বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলে সেখানে সংশয় জন্মিতে পারে না। বিশেষ ধর্মের অঙ্গুপলব্ধি সংশয়মাত্রেরই আবশ্যক, ইহা নহিঁ “বিশেষাপেক্ষ” এই কথা দ্বারা সূচনা করিয়াছেন।

অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় কোথায় কিরূপে হইয়া থাকে ? ভাষ্যকার তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দে বিভাগজ্ঞত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম-জ্ঞান হইলে অজ্ঞাত কারণে সবে “শব্দ কি দ্রব্য ? অথবা গুণ ? অথবা কর্ম ?” এইরূপ একটি সংশয় জন্মে। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কোন বংশধরের অগ্রভাগ বিনোদ করিয়া যখন উহার ছুইট অংশকে দুই হস্তের দ্বারা জোরে আকর্ষণ করা যায়, তখন যে শব্দ হয়, তাহা ঐ বংশধরের দুই ভাগের বিভাগ-জ্ঞত্ব এবং ঐ দুই অংশের সহিত আকাশের যে বিভাগ হয়, তজ্জ্ঞত্ব। ঐ স্থলে যে শব্দ জন্মে, তাহার প্রতি আকাশের সহিত পূর্ণোক্ত বিভাগ অসমবাসি কারণ। এইরূপ কোন বস্তুর দুই হস্তের দ্বারা ছিড়িয়া ফেলিবার সময়ে যে শব্দ হয়, তাহাও পূর্ণোক্ত প্রকার বিভাগজ্ঞত্ব। কলতঃ বিভাগ থাকায় অসমবাসি কারণ, তাহাই ভাষ্যোক্ত বিভাগজ্ঞত্ব পদার্থ। এইরূপ বিভাগ-জ্ঞত্বা শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই, সুতরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম। আপত্তি হইতে পারে যে, এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিও



প্রথম বিভাগ অসমবায়ি কারণ, সুতরাং পূর্বেক্ত বিভাগজন্তু যখন বিভাগেও থাকে, তখন উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম হইবে বিরূপে? এতদ্বারা উদ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ জন্মে, ইহা স্বীকার করি না। কোন বিভাগের প্রতি তাহার পূর্বজাত বিভাগ কারণ নহে, পূর্বজাত জিন্মাই বিভাগের কারণ। আর যদি বৈশেষিক মতানুসারে তাহা স্বীকারও করা যায়, অর্থাৎ বিভাগজন্তু বিভাগ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও সেই বিভাগজন্তু যে দ্বিতীয় বিভাগ, তাহা আর কোন বিভাগের অসমবায়ি কারণ নয় বলিয়া উহা কেবল শব্দেরই অসমবায়ি কারণ। অর্থাৎ বিভাগজন্তু যে বিভাগ, তজ্জন্তু ধর্মটি শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে না থাকার উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম। তাহা হইলে ভাব্যকার যে “বিভাগজন্তু”কে শব্দের অসাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন, উহার অর্থ বিভাগজন্তু যে দ্বিতীয় বিভাগ, সেই বিভাগজন্তু বৃত্তিতে হইবে। সুতরাং বৈশেষিক মতেও ভাব্যকারের কথা সংগত হইয়াছে। মহর্ষি কণাদোক্ত “দ্রব্য”, “গুণ” ও “কর্মের” “সত্তা” প্রভৃতি সাধর্ম্য শব্দে নিশ্চিত থাকায় শব্দ “দ্রব্য”, “গুণ” ও “কর্ম” হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত আছে। কিন্তু শব্দে “দ্রব্য”, “গুণ” অথবা “কর্মের” কোন বিশেষ ধর্ম নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে পূর্বেক্ত বিভাগজন্তুরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্তু “শব্দ কি দ্রব্য? অথবা গুণ? অথবা কর্ম?” এইরূপ সংশয় জন্মে। শব্দ দ্রব্য হইয়াও বিভাগজন্তু হইতে পারে, গুণ হইয়া অথবা কর্ম হইয়াও বিভাগজন্তু হইতে পারে। সিদ্ধান্তে যেমন গুণের মধ্যে আর কোন গুণ বিভাগজন্তু না হইয়াও শব্দরূপ গুণবিশেষ বিভাগজন্তু হইয়াছে, তদ্রূপ দ্রব্যের মধ্যে আর কোন দ্রব্য অথবা কর্মের মধ্যে আর কোন কর্ম বিভাগজন্তু না হইলেও শব্দরূপ দ্রব্য অথবা কর্মও বিভাগজন্তু হইতে পারে, তাহাতেও বিভাগজন্তুরূপ অসাধারণ ধর্মটি শব্দকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবিগ্ন হইতে বিশিষ্ট করিতে পারে। সুতরাং পূর্বেক্ত স্থলে বিভাগজন্তুরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান, শব্দবিষয়ে পূর্বেক্ত প্রকার সংশয় জন্মায়। পরিশেষায়ুমানের দ্বারা শব্দের গুণও নিশ্চয় হইলে ঐ সংশয় নিবৃত্ত হয় (পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যটির দ্রষ্টব্য)। পূর্বেক্ত “বিভাগজন্তু” দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধারণ ধর্ম নহে, এ জন্তু পূর্বেক্ত সংশয় সাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্তু নহে। মহর্ষি এই জন্তুই অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্তু দ্বিতীয় প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। সুত্রে “অনেক ধর্ম” বলিতে “অসাধারণ ধর্ম”। প্রথমে “সমান ধর্ম” বলাতেও “অনেক ধর্ম” শব্দের দ্বারা অসাধারণ ধর্মই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়।

ভাষ্য। বিপ্রতিপত্তেরিতি। ব্যাহতমেকার্ধদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ। ব্যাঘাতো বিরোধোহসমভাব ইতি। অন্ত্যাত্মোক্ত্যেকং দর্শনম্, নান্ত্যাত্মোক্ত্যপরম্। ন চ সদৃশবাসম্ভাবৌ সঠৈকত্রে সম্ভবতঃ। ন চান্ততরসাধকৌ হেতুরূপলভ্যতে তত্র তদ্বানবধারণং সংশয় ইতি।

অনুবাদ। (৩) “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই কথাটি ( ব্যাখ্যা করিতেছি )। ব্যাঘাতবৃত্ত “একার্ধদর্শন” অর্থাৎ এক পদার্থে পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয় “বিপ্রতি-



পত্তি”। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ কি না অসহভাব (একাধারে না থাকা)। (‘বিপ্রতি-  
পত্তি’ জল্প সংশয়ের উদাহরণ) আত্মা অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে,  
ইহা এক দর্শন (বাক্য)। আত্মা নাই, ইহা অপর দর্শন (বাক্য)। অস্তিত্ব ও  
নাস্তিত্ব মিলিতভাবে একাধারে সম্ভব হয় না। অতীতের সাক্ষক অর্থাৎ নিত্য আত্মার  
অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের নিশ্চায়ক হেতুও উপলব্ধ হইতেছে না। - সেই স্থলে তত্ত্বের  
অর্থাৎ নিত্য আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের অনবধারণরূপ সংশয় হয়।

উপলব্ধি। “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দু্যর্থ্য বিক্ষুব্ধজ্ঞান। কিন্তু উহা বাদী ও প্রতিবাদীর জ্ঞান;  
সুতরাং অস্ত্বের সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। এ জল্প এখানে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা  
বুঝিতে হইবে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিজল্প বাক্যদ্বয়। তাৎপর্য্য-টীকাকারও পুঙ্খানুপুঙ্খ  
যুক্তির উপলব্ধি করিয়া এখানে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের ঐক্লপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “ব্যাঘাত-  
নেকার্দর্শনঃ” এবং “অন্ত্যায়োক্ত্যেকং দর্শনং” এই ভাষ্যেও “দর্শন” শব্দের বাক্য-অর্থ গ্রহণ  
করিতে হইবে। কারণ, পূর্বোক্ত যুক্তিতে এখানে বাক্যবিশেষকেই “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা  
বুঝিতে হইয়াছে। পরন্তু ভাষ্যকার সংশয়পরীক্ষাফলে (২ অং, ১ অং, ৩ অং) এই স্থলের  
“বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—“সমানৈহমিকরণে ব্যাহতার্থো প্রবাদৌ  
বিপ্রতিপত্তিশব্দভ্রাতঃ”। অর্থাৎ একাধারে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক প্রবাদদ্বয় (বাক্যদ্বয়) এই  
স্থলোক্ত “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ। তাহা হইলে এখানেও “দর্শন” শব্দ—তিনি বাক্য অর্থেই  
প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। “দৃষ্টান্তে জ্ঞানতেনেন” এইরূপ বুৎপত্তি-  
সিদ্ধ “দর্শন” শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্যানুসারে বাক্যও বুঝা যাইতে পারে। জ্ঞানক-সংশয়জনক  
দার্শনিক বিপ্রতিপত্তিগুলিই এখানে স্তব্ধকালের বিবক্ষিত, ইহা হুচনা করিবার জন্তই ভাষ্যকার  
বাক্য শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয়।

সাংখ্যাদি শাস্ত্ররূপ বাক্যবিশেষ অর্থে এবং তজ্জন্ম জ্ঞানবিশেষ অর্থেও বহু কাল হইতে “দর্শন”  
শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতের শাস্তিপর্বেও ঐক্লপ অর্থে “দর্শন” শব্দের  
প্রয়োগ দেখা যায়। “সাংখ্যদর্শন,” “যোগদর্শন” প্রভৃতি শব্দও সেখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্য-  
কার পরমপ্রাচীন বাৎজ্ঞানও চতুর্থাদ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—“অন্তোক্তপ্রত্যানীকানি প্রবাদুকানাং  
দর্শনানি”। এবং “দর্শন” শব্দের প্রকৃতি দৃশ্যবস্তুকে গ্রহণ করিয়া তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াঙ্কি-  
কের প্রথম স্তব্ধভাষ্যে সাংখ্যদর্শন তাৎপর্য্যে “দৃষ্ট” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার  
মনে হয়, “আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রুতিই পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থে “দর্শন” শব্দপ্রয়োগের মূল।  
মোক্ষের চরম কারণ আত্মদর্শন বা আত্মসাক্ষ্যকারই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। বিচার দ্বারা  
উহা প্রতিপন্ন করিবার জন্তই এবং উহার উপায় বর্ণনের জন্তই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সৃষ্টি।  
ফল কথা, যে শাস্ত্র আত্মবিচারের দ্বারা পরম্পরার আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাকে “দর্শনশাস্ত্র”

বলা যাইতে পারে। “দৃশ” ধাতুর দ্বারা পূৰ্ণোক্ত প্রতিপ্রতিপাদিত আত্মদর্শনরূপ বিশেষ অ গ্রহণ করিয়াই পূৰ্ণোক্ত অর্থে “দর্শন” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বাহাতে আত্মদর্শনের কোন কথা নাই, তাহাতেও “দর্শনে”র সাদৃশ্য-প্রযুক্ত পরে “দর্শন” শব্দের গোণ প্রয়োগ হইয়াছে। বাহাতে আত্মবিচার করিয়া, আত্মদর্শনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, পরম্পরায় বাহা পূৰ্ণোক্ত প্রতি-প্রতিপাদিত আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাই মুখ্য “দর্শন”।

সে বাহা হউক, মূলকথা এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যস্থের সংশয় হইয়া থাকে। আত্মিক বলিলেন,—“আত্মা অস্তি”; নাস্তিক বলিলেন,—“আত্মা নাস্তি”। তাঁহাদিগের উভয়েরই একতর নিশ্চয় আছে। কিন্তু যে মধ্যস্থ শ্রোতা আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের সাধক হেতু পাইলেন না, তাঁহার সংশয় হইল—আত্মা অর্থাৎ নিত্য আত্মা আছে কি না? এই সংশয় বিপ্রতিপত্তিজন্ম। জের তত্ত্ব এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি থাকার তত্ত্বনির্মাণদিগের সংশয় হইতেছে। সংশয়ের পরে জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে। জিজ্ঞাসার ফলে বিচারপ্রবৃত্তি হইতেছে। বিচারদ্বারা অনেক স্থলে তত্ত্ব-নির্ণয় হইতেছে এবং বিভিন্ন মতের সমন্বয়বোধও হইতেছে। জিজ্ঞাসা মানবের জ্ঞানের মূল। জিজ্ঞাসার মূল আবার সংশয়। যে মানবের সংশয় হয় না, তিনি জ্ঞানরাজ্যের বহু দূরে আছেন। ফলতঃ সংশয় শাস্তির চিরশত্রু নহে; উহা চিরশাস্তির মূল; উহা জ্ঞানমন্দিরের প্রথম সোপান। সংশয় না হইলে নির্ণয়ের আশা থাকে না। গীতার অর্জুনের সংশয়ে কত তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং দার্শনিক নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি অজ্ঞ মানবের সংশয় জন্মাইয়া এক পক্ষে মজলই করিতেছে। সংশয় যত সূক্ষ্ম হইবে, ততই নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। শেষে প্রকৃত তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই সকল সংশয় ছিন্ন হইবে। (“ছিন্দ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ”)।

পক্ষান্তরে, শাস্ত্রে নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি আছে বলিয়াই শাস্ত্র ও তাহার চর্চা এত দিন টিকিয়া আছে। বিপ্রতিপত্তিমূলক সাম্প্রদায়িকতার দোষ থাকিলেও উহার একটি মহা গুণ আছে—বাহার ফলে এ পর্য্যন্ত অনেক তত্ত্বই একেবারে বিলীন হইয়া যায় নাই।

**ভাষ্য।** উপলক্ষ্যব্যবস্থাতঃ খল্পপি, সচ্ছোদকমুপলভ্যাতে তড়াগাদিষু মরীচিষু চাবিদ্যমানমুদকমিতি। অতঃ কচিৎপলভ্যমানে তত্ত্বব্যবস্থাপকস্ত প্রমাণস্থানুপলব্ধে: কিং সত্বপলভ্যাতে, অধাসদিতি সংশয়ো ভবতি।

**অনুবাদ।** (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। তড়াগাদিতে বিদ্যমান জল উপলব্ধ হয় এবং মরীচিকার অবিদ্যমান জল উপলব্ধ হয়; অতএব উপলভ্যমান কোনও বিষয়ে তত্ত্ব-ব্যবস্থাপক (প্রকৃত-তত্ত্ব-নিশ্চায়ক) প্রমাণের অনুপলব্ধিবশতঃ কি বিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে? অথবা অবিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে? এইরূপ সংশয় হয়।



উপলব্ধি। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, অসদ্য বিদ্যমান পদার্থেরও এমন উপলব্ধি হয়। সর্বত্র বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয় অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এমন নিয়ম নাই। সুতরাং কোন স্থানে কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে তাহার বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে ভাব্যোক্ত প্রকার সংশয় হয়। ইহাকেই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য চতুর্থ প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। তাহা “ধবপি” এই শব্দটী নিপাত। উহার অর্থ উদাহরণ-প্রদর্শন।

ভাষ্য। অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ—সচ্চ নোপলভ্যতে মূলকৌলকোদ-  
কাদি, অসচ্চানুৎপন্নং নিরুদ্ভং বা, ততঃ কচিদনুপলভ্যমানে সংশয়ঃ, কিং  
সমোপলভ্যতে? উতাসমিতি সংশয়ো ভবতি। বিশেষ্যাপেক্ষা পূর্ববৎ।

অনুবাদ। (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্ম সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। বিদ্যমান মূল, কৌলক, জল প্রভৃতি (ভূগর্ভাদিস্থ) উপলব্ধ হয় না এবং অবিদ্যমান, অনুৎপন্ন বা বিনষ্ট বস্তু উপলব্ধ হয় না; তজ্জন্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য অনুপলভ্যমান কোন পদার্থে সংশয় হয়। (সে কিরূপ সংশয়, তাহা বলিতেছেন) কি, বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? এইরূপ সংশয় হয়। বিশেষ্যাপেক্ষা পূর্ববৎ অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ বিশেষ ধর্মনিশ্চায়ক হেতুর অথবা ঐ বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি পূর্বোক্ত সংশয়গুলির দ্বারা এই সংশয়েও আবশ্যক।

উপলব্ধি। উপলব্ধির দ্বারা অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই। ভূগর্ভ প্রভৃতিস্থ বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং সর্বত্র অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং কোন পদার্থ উপলব্ধ না হইলে, তখন তাহাতে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত ভাব্যোক্ত প্রকার সংশয় হয়। মহর্ষি ইহাকেই অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য পঞ্চম প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। তাহা “অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ” এই কথাটির পরে পূর্বোক্ত “ধবপি” এই শব্দের যোগ করিতে হইবে। না করিলেও ব্যাখ্যা হয়।

ভাষ্য। পূর্বঃ সমানোহনেকশ্চ ধর্মো জ্ঞেয়স্থঃ, উপলব্ধ্যনুপলব্ধৌ  
পুনর্জ্ঞাতৃগতে, এতাবতী বিশেষণে পুনর্বচনম্। সমানধর্ম্মাধিগমাৎ  
সমানধর্ম্মোপপত্তেক্ৰিংশেষস্বত্ব্যাপেক্ষো বিমর্শ ইতি।

অনুবাদ। পূর্ব অর্থাৎ সূত্রে পূর্বোক্ত সমান-ধর্ম্ম এবং অনেকধর্ম্ম জ্ঞেয়গত

১। উভয়নের নাটকস্থাজ্ঞতির পঞ্চম স্তবকে “আরোহিতাং ধবপি” এই কথাটির ব্যাখ্যা প্রকাশনিকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—“ধবপীতি নিপাতসমুদায়ঃ উদাহরতে ইত্যর্থঃ বর্ততে ন সমুদায়ার্থঃ”।

অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের ধর্ম, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি কিন্তু জ্ঞাতৃগত অর্থাৎ জ্ঞানকর্তা আত্মার ধর্ম, এইটুকু বিশেষবশতঃ পুনরুক্তি হইয়াছে। সমান ধর্মের উপপত্তি-বশতঃ কি না—সমান-ধর্মের জ্ঞানবশতঃ বিশেষ-স্বত্ব্যপেক্ষ অর্থাৎ যাহাতে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া বিশেষ ধর্মের স্মরণ আবশ্যক, এমন “বিমর্শ” (সংশয়) হয়।

টিপ্পনী। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থানে যে সংশয়, তাহা সাধারণ ধর্মাদি জ্ঞানবশতঃই হইতে পারে, আবার তাহার অন্য পৃথক কারণ বলা কেন? পরবর্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহা বলেন নাই। ভাষ্যকার এই প্রশ্ন মনে করিয়া তত্বতরে বলিয়া গিয়াছেন যে, সাধারণ ধর্ম ও অসাধারণ ধর্ম জ্ঞেয়গত। অব্যবস্থিত উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জ্ঞাতৃগত। এই বিশেষটুকু ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথকভাবে সংশয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ ধর্মাদি জ্ঞান প্রযুক্ত সেখানে সংশয় হইতে পারিলেও, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্তও সেখানে বিশিষ্ট সংশয় হইয়া থাকে, ইহাই মহর্ষির মনের কথা। তজ্জন্ত তিনি পঞ্চবিধ বিশেষ সংশয়ই পঞ্চবিধ বিশেষ কারণের উল্লেখ পূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বত্র “উপপত্তি” শব্দের অর্থভ্রমে অনেক পূর্বপক্ষ হইতে পারে। পরীক্ষাফলে লেগলি দেখাইয়াছেন এবং “বিশেষ্যপেক্ষ” এই কথাটির তাৎপর্য্যার্থ স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। এ জন্ত ভাষ্যকার উপসংহারে আবার স্বত্রোক্ত প্রথম প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইরূপেই অন্ত চতুর্বিধ সংশয়লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাও উহার দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন।

উদ্যোতকর জ্ঞানবার্তিকে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ পূর্বক স্বাধীনভাবে স্বত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সংশয় ত্রিবিধ; পঞ্চবিধ নহে। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা কোন বিশেষ সংশয়ের বিশেষ কারণ নহে; উহা সংশয়মাত্রেরই কারণ। যে দুইটি পদার্থ-বিষয়ে সংশয় হয়, তাহার যে কোন একটির নিশ্চয়ের হেতু না থাকাই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং যে কোন একটির অভাবনিশ্চয়ের হেতু না থাকাই অনুপলব্ধির অব্যবস্থা। সংশয়মাত্রেরই ঐ দুইটি আবশ্যক। নচেৎ স্বাণ্ড বা পুরুষত্বের নিশ্চয় হইলে অথবা উহার কোন একটির অভাব নিশ্চয় হইলে পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্মাদি-জ্ঞান-জন্ত তখনও পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হয় না কেন? সুতরাং ত্রিবিধ সংশয়েরই বিশেষ লক্ষণে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা এই দুইটি সামান্য কারণকেও নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাই স্বত্রকারের অভিপ্রেত। আর যেখানে কিছু বুঝিবার ইচ্ছাই নাই, সেখানে সংশয়ের অন্তান্ত কারণ থাকিলেও সংশয় হয় না; এ জন্ত বলিয়াছেন—“বিশেষ্যপেক্ষঃ” অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা থাকা চাই, তাহাও সংশয়মাত্রের কারণ। উহাও ত্রিবিধ সংশয়লক্ষণে নিবিষ্ট করিতে হইবে। বার্তিকব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও



উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাত বলিয়াছেন,—বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি সংশয়ের প্রয়োজক মাত্র। ঐ সব স্থলে পূৰ্বোক্ত সাধারণ ধৰ্ম্মাদিজ্ঞানজন্তই সংশয় হয়। তাঁহার মতে সংশয় বিবিধ। মহৰ্ষি কণাদ কেবল সাধারণ-ধৰ্ম্মজ্ঞান-জন্ত একবিধ সংশয়ই বলিয়াছেন। কণাদ-সূত্রের উপস্থাপক শব্দর মিশ্র বলিয়াছেন যে, সমান-তর গৌতমদৰ্শনে অসাধারণ ধৰ্ম্মজ্ঞানজন্ত যে সংশয়ের কথা আছে, মহৰ্ষি কণাদ তাহা বলেন নাই। কারণ, কণাদ সংশয়ের জায় “অন্যথাবাদ” নামক এক প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।<sup>১</sup> তাঁহার মতে অসাধারণ ধৰ্ম্মজ্ঞান তাঁহার প্রতিই কারণ। কণাদ-সম্মত ঐ জ্ঞানকে মহৰ্ষি গৌতম সংশয়ই বলেন; এ জন্ত তিনি অসাধারণ-ধৰ্ম্মজ্ঞানকে সংশয়ের কারণের মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন।

পরবর্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের পক্ষবিধ সংশয়ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও সরলভাবে মহৰ্ষির সূত্র পাঠ করিয়া এবং সূত্রের “চ”-কারের প্রতি মনোবোধ্য করিয়া এবং সংশয়-পরীক্ষাফলে এই সূত্রোক্ত পাঁচটি হেতুকেই আশ্রয়পূৰ্ব্বক মহৰ্ষিকৃত ভিন্ন ভিন্ন পূৰ্ব্বপক্ষ সূত্রগুলির পর্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকার পক্ষবিধ বিশেষ কারণজন্ত পক্ষবিধ সংশয়ই মহৰ্ষি গৌতমের সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহৰ্ষি উপলব্ধির অসম্ভবতা ও অহুং-লব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়ের পৃথক কারণ কেন বলিয়াছেন, ভাষ্যকার তাঁহারও একটু কারণ বলিয়া গিয়াছেন। ফল কথা, তিনি মহৰ্ষি-সূত্রের সহজ-বোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া উদ্যোতকর প্রভৃতির জায় এখানে অজ্ঞরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব মনে করেন নাই। সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় হইলে অথবা তাঁহার অভাব নিশ্চয় হইলে তখনও সাধারণ-ধৰ্ম্মাদি-জ্ঞানজন্ত সংশয় হয় না কেন? এ আপত্তি ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত্তেও নাই। কারণ, ভাষ্যকারের মতে সূত্রে “বিশেষাপেক্ষাঃ” এই কথার দ্বারা ঐ আপত্তি নিরাকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে সূত্রোক্ত ঐ কথার কলিতার্থ এই যে, বাহ্যতে বিশেষ ধৰ্ম্মের উপলব্ধি নাই, কিন্তু পূৰ্ব্বোপলব্ধ বিশেষ ধৰ্ম্মের স্মৃতিমাত্র আছে, তাহাই “বিশেষাপেক্ষাঃ”। ফলতঃ ঐ “বিশেষাপেক্ষাঃ” সংশয়বাত্রেই আবদ্ধক। তাহা হইলে সেখানে বিশেষ ধৰ্ম্মের উপলব্ধি হইয়া গিয়াছে, সেখানে ঐ “বিশেষাপেক্ষাঃ” না থাকার সংশয়ের আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার বাস্তবিকতার প্রদত্ত দোষ থাকিবে কেন?<sup>২</sup> সেখানে কিছু বুঝিবার ইচ্ছাই নাই, সেখানেও সংশয়ের সামগ্রী থাকিলে অবশ্য সংশয় হইয়া থাকে। ইচ্ছার অভাবে জ্ঞানের অহুংপত্তি ঘটে না। যদি কোন স্থলে ঐরূপ ঘটে, ইচ্ছা না থাকার সংশয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে সংশয়ের কোন কারণের অভাব হইয়াছে অথবা কোন প্রতিবন্ধক আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ফল কথা, “বিশেষাপেক্ষাঃ” এই কথার দ্বারা সূত্রকার সংশয়ের আপত্তিগুলির নিরাস করিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষাপ্রকরণে এ বিষয়ে

১। কণাদসূত্রে এ কথা স্পষ্ট না থাকিলেও কণাদ-সূত্রব্যাখ্যাতা শব্দর প্রাচীন প্রণয়নকার “পদার্থবিশ্ববংগ্ৰহে” সংশয়ভিত্তি অনন্যবসায় নামক সংশয়সূচক জ্ঞানভবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাগুলিতে উদ্যোতকরের বিশেষ কথা এবং ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য বিতীয়াখ্যায়ের বহু পুত্রকাব্যাব্যাহার উদ্যোতকর।

সকল কথা বিশদ ব্যক্ত হইবে। পরীক্ষা না পাইলে সকল তত্ত্ব ঠিক বুঝা যায় না। সংশয়ের কারণেও সংশয় হয়।

ভাষ্য। স্থানবতাং লক্ষণমিতি সমানম্।

অনুবাদ। ক্রম-প্রাপ্ত পদার্থ-বর্গের লক্ষণ বক্তব্য, ইহা সমান—( অর্থাৎ যেমন প্রেমের-লক্ষণের পরে সংশয়-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সংশয়-লক্ষণের পরে এখন ক্রম-প্রাপ্ত প্রয়োজন-লক্ষণ এবং তাহার পরে যথাক্রমেই দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থ-বর্গের লক্ষণ বলা হইবে )।

সূত্র। যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম্ ॥২৪॥

অনুবাদ। যে পদার্থকে গ্রাহ বা ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া ( জীব ) প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন।

ভাষ্য। যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় তদাপ্তি-হানোপায়মনু-  
ত্তিষ্ঠতি প্রয়োজনং তদেদিতব্যম্। প্রবৃত্তি-হেতুত্বাদিমমর্থমাপ্ত্যামি হাত্যামি  
বেতি ব্যবসায়োহর্থস্বাধিকারঃ। এবং ব্যবসায়মানোহর্থোহধিক্রিয়ত ইতি।

অনুবাদ। যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায় অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা ( সেই পদার্থ ) প্রয়োজন জানিবে। প্রবৃত্তি-হেতুই আছে বলিয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া এই পদার্থ পাইব অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ ব্যবসায় ( নিশ্চয় ) পদার্থের “অধিকার”। এইরূপে ( পূর্বোক্তরূপে ) নিশ্চয়মান পদার্থ অধিকৃত হইয়া থাকে।

টীকনী। প্রয়োজন দ্বিবিধ,—মুখ্য ও গৌণ। দ্বিবিধ প্রয়োজন প্রতিপাদনের জন্যই হুত্রে “অর্থ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নচেৎ উহা না বলিলেও চলিত। হুত্রে প্রাপ্তি এবং ছুত্রে নিবৃত্তিতে জীবের স্বতাই ইচ্ছা হয়, এ জন্য ঐ দুইটিই মুখ্য প্রয়োজন। তাহার সাধনগুলি গৌণ প্রয়োজন। হুত্রে “অধিকৃত্য” এই কথার ব্যাখ্যা ভাষ্যে “ব্যবসায়”। “যমর্থমধিকৃত্য” এই কথার দ্বারা হুত্রে পদার্থের যে অধিকার বলা হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এই পদার্থ পাইব বা ত্যাগ করিব, এইরূপ নিশ্চয়ই পদার্থের অধিকার; অর্থাৎ হুত্রে অবিপূর্বক ক্রমাত্মক অর্থ এখানে ঐরূপ নিশ্চয়। ঐরূপ নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির কারণ। কারণ, প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই জীব প্রাপ্তি বা পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়। প্রয়োজন-পদার্থের অন্ত্যনা কথা পূর্বোক্তই বলা হইয়াছে। ২৪।



সূত্র । লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যাং  
স দৃষ্টান্তঃ ॥২৫॥

অনুবাদ । লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য (অবি-  
রোধ) হয়, তাহা দৃষ্টান্ত ।

ভাষ্য । লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ, নৈসর্গিকং বৈনয়িকং  
বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ । তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাস্তর্কেণ প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতু-  
মর্হন্তীতি । যথা যমর্থং লৌকিকা বুদ্ধ্যন্তে তথা পরীক্ষকা অপি, সৌহর্থো  
দৃষ্টান্তঃ । দৃষ্টান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্ধব্যা ভবন্তীতি ।  
দৃষ্টান্তসমাধিনা চ অপক্ষাঃ স্থাপনীয়া ভবন্তীতি । অবয়বেষু চোদাহরণায়  
কল্পত ইতি ।

অনুবাদ । লোক-সমানতাকে অনতিক্রান্ত ( অর্থাৎ বাঁহারা সাধারণ লোকের  
তুল্যতাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এমন ব্যক্তিগণ ) ‘লৌকিক’ । বিশদার্থ  
এই যে, ( বাহারা ) স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলন-সম্বৃত্ত বুদ্ধি-  
প্রকর্ষকে অপ্রাপ্ত । তদ্বিপরীতগণ অর্থাৎ স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক বুদ্ধিপ্রকর্ষপ্রাপ্ত  
ব্যক্তিগণ পরীক্ষক । ( যেহেতু, তাঁহারা ) তর্কের দ্বারা এবং প্রমাণ-সমূহের দ্বারা  
পদার্থকে পরীক্ষা করিতে পারেন । ( লৌকিক এবং পরীক্ষকের স্বরূপ ব্যাখ্যা  
করিয়া এখন দৃষ্টান্তের সূত্রোক্ত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন ) যে পদার্থকে  
লৌকিকগণ যে প্রকার বুঝেন, পরীক্ষকগণও সেইরূপ বুঝেন, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত ।  
( দৃষ্টান্ত লক্ষণের প্রয়োজন বর্ণন করিতেছেন ) দৃষ্টান্ত-বিরোধের দ্বারা অর্থাৎ  
দৃষ্টান্তের সাম্যশূন্যতা প্রভৃতি দোষের দ্বারা প্রতিপক্ষসমূহ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-সাধন-  
সমূহ খণ্ডনীয় হয় ( খণ্ডন করা যায় ) এবং দৃষ্টান্ত-সমাধির দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের  
অসত্য-দোষারোপের প্রতিষেধের দ্বারা অপক্ষ স্থাপনীয় হয় ( স্থাপন করা যায় )  
এবং অবয়ব-সমূহের মধ্যে ( প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়বের মধ্যে ) উদাহরণের নিমিত্ত  
অর্থাৎ উদাহরণ নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণের নিমিত্ত ( দৃষ্টান্ত পদার্থ )  
সমর্থ হয়<sup>১</sup> ।

১। ভাষ্যে “উদাহরণায় কল্পত” এই বলে বানর্থাবলী “কৃপ” বাহুর প্রয়োগবশতঃ চতুর্থী বিভক্তি অমুক  
ইহাছে। ভাষ্যকার এখন সূত্র-ভাষ্যেও “উদাহরণায় কল্পত তর্কঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তর্ক তত্ত্ব-

চিন্তনো। যিনি বুঝেন, তিনি লৌকিক। যিনি বুঝান, তিনি পরীক্ষক। যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক প্রকৃতার্থে একমত, তাহাই দৃষ্টান্ত হয়। কোন পক্ষের ঐ পদার্থে প্রকৃতার্থের প্রতিকূল বিবাদ থাকিলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। এই তাৎপর্যেই ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন—“যথা বসুধা ইত্যাদি”। বস্তুতঃ বাহ্য লৌকিকবেদ্যই নহে, কেবল পরীক্ষকগণ-বেদ্য, এমন পদার্থও দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। এ সব কথা এবং তদনুসারে স্বত্রের ব্যাখ্যা প্রথম স্বত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য-টীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, “লৌকিক-পরীক্ষকাণং” এই কথার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীই স্বত্রকারের অভিপ্রেত। বাদী ও প্রতিবাদীর যে পদার্থে বুদ্ধিসাম্য হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত। বিচারের বহুভাষিপ্রায়েই স্বত্রে ঐ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। আর স্বত্রোক্ত “অর্থ” শব্দের দ্বারা “উদাহরণবাক্য” প্রতিপাদ্য পদার্থ-বিশেষই অভিপ্রেত। তত্ত্বিন্ন পদার্থ দৃষ্টান্ত নহে। উদাহরণ-স্বত্রের অর্থ-পর্যালোচনার দ্বারা এই বিশেষার্থ বুঝা যায়। তাৎপর্য-টীকাকার তাঁহার “ভ্রামতী” গ্রন্থে (ব্রহ্মস্বত্রের আরম্ভাধিকরণে) উপনিষদ্রুক্ত মৃত্তিকার দৃষ্টান্ততা সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, “লৌকিকপরীক্ষকাণং” ইত্যাদি স্বত্র দ্বারা প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত, ইহাই মহর্ষি গোতমের বিবক্ষিত। দৃষ্টান্তে লোকসিদ্ধত্বও থাকা চাই, ইহা তাঁহার বিবক্ষিত নহে। অন্যথা তাঁহাদিগের পরমাণু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু প্রভৃতি লোকসিদ্ধ নহে। পরমাণু প্রভৃতি লোকসিদ্ধ না হইয়াও তাঁহাদিগের মতে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তের লক্ষণ ব্যতীত তাহার জ্ঞান অসম্ভব। দৃষ্টান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজন, ভাষ্যকার পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছেন। দৃষ্টান্ত না থাকিলে বা না জানিলে জগতে অনেক তত্ত্বই কেহ সকলকে বুঝাইতে পারিতেন না। যদি রজ্জ্বতে সর্পভ্রম না হইত, শুক্লিতে রজত-ভ্রম না হইত, স্বপ্নে নানাবিধ অদ্ভুত ভ্রম না হইত, ঐন্দ্রজালিকের মায়াবৃত্ত অদ্ভুত মিথ্যা-সৃষ্টি কেহ না দেখিত, তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্করও তাঁহার মায়াবাদকে লৌকিকের মনে,—বিরুদ্ধ-সংসারীর মনে উপস্থিত করিতে পারিতেন না। কেবল উপনিষদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে শ্রিত্ব হইতে হইত। আবার উপনিষৎও যদি “বাচ্যরত্নং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং” ইত্যন্ত বাক্যে মৃত্তিকাকে সত্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি উপাদান-কারণ ব্রহ্মের সত্যতা এবং তাহার কার্য জগতের মিথ্যাসিদ্ধান্তই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রতিপক্ষের নিকটে সহজে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না। ফল কথা, দৃষ্টান্ত ব্যতীত প্রতিপক্ষের নিকটে যুক্তির দ্বারা কিছু প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে। স্বপক্ষ-সমর্থন ও পরপক্ষ-খণ্ডনে

জ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়, ইহাই সেখানে ঐ কথার অর্থ। এখানেও দৃষ্টান্ত পদার্থ উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণের জন্য আবশ্যক বলিয়া উহাকে উদাহরণ-বাক্যের নিমিত্ত সমর্থ বলা হইতে পারে। সেবশতঃ—

“কস্মিন্যন্তে হিরণ্যপদপ্রাপ্তে অক্ষধানাঃ”।—পূর্বসেধ, ৫৬।

এই লোকের টীকার মসিনাথ লিখিয়াছেন,—“তুণ্ডে: পর্যাপ্তবচনন্ত অলমর্থবাৎ তদুযোগে নবঃ অস্বীত্যানিবা চতুর্থী, অলমিতি পর্যাপ্তব্রহ্মণমিতি ভাষ্যকারঃ।”



দৃষ্টান্ত একটি প্রধান উপকরণ। নবন রাশিতে হইবে, দৃষ্টান্ত কখনই সর্বোপায়ে সমান হয় না। কোথায়, কেন, কবে, কি ভাবে দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা প্রণয়ন করিয়া বুঝিতে হয়। অন্ত্যস্ত কথ্য পূর্বকই বলা হইয়াছে। ২৫।

ভাষ্য। অথ সিদ্ধান্তঃ, ইদমিচ্ছন্তুতক্ষেত্ৰাত্মকানুজ্ঞায়মানমর্থজাতং সিদ্ধং, সিদ্ধস্ত সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ, সংস্থিতিরিত্তস্তাব্যবস্থা, ধর্মনিয়মঃ। স খল্বয়ম্।

সূত্র। তত্রাদিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। অনন্তর ( দৃষ্টান্ত-নিরূপণের পরে ) সিদ্ধান্ত ( নিরূপণীয় )। “ইহা” এবং “এই প্রকার” এইরূপে স্বীকৃত্যমান পদার্থসমূহ “সিদ্ধ”। সিদ্ধের সংস্থিতি “সিদ্ধান্ত”। “সংস্থিতি” বলিতে ইচ্ছান্তাব্যবস্থা কি না—ধর্মনিয়ম। ( অর্থাৎ এই পদার্থ এই ধর্মবিশিষ্ট, অগ্ন্যধর্মবিশিষ্ট নহে, এইরূপ প্রমাণসিদ্ধ নিয়ম )। সেই-ই এই।

( সূত্রানুবাদ ) “তত্রাদিকরণে”র অর্থাৎ প্রমাণাশ্রিত বা প্রমাণবোধিত পদার্থের “অভ্যুপগমসংস্থিতি” অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইচ্ছান্তাব্যবস্থা ( পূর্বোক্ত ধর্মনিয়ম ) “সিদ্ধান্ত”।

টীকা। দৃষ্টান্তের পরে সিদ্ধান্তই জনপ্রাপ্ত বলিয়া নিরূপণীয়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার হজ-পাঠের পূর্বকই হজ-প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত সামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া “স খল্বয়ম্” এই কথার দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ফল কথা, “অথ সিদ্ধান্তঃ” ইত্যাদি ভাষ্য এই সূত্রেরই ভাষ্য। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐ ভাষ্য দেখিরা নবীনগরের এখানে বিলুপ্ত সূত্রান্তরের অন্তর্ধান অনুলক। ভাষ্যকার “স খল্বয়ম্” এই কথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিদ্ধান্ত বাহ্য ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই এই হজ-প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ মহর্ষি-সূত্রেরও ইহাই তাৎপর্যার্থ। ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত সূত্রের বোঝনা করিতে হইবে। পদার্থমাত্রেরই সামান্য ধর্ম এবং বিশেষ ধর্ম আছে। “ইদম্” বলিয়া সামান্যতঃ এবং “ইচ্ছন্তুতম্” বলিয়া বিশেষতঃ পদার্থনির্ণয় হয়। ঐ সামান্য ধর্ম এবং বিশেষ ধর্মরূপে স্বীকৃত্যমান পদার্থকে “সিদ্ধ” বলে। ঐ সিদ্ধের অন্তকে সিদ্ধান্ত বলে। “অন্ত” বলিতে সমাপ্তি। সামান্যতঃ স্বীকৃত পদার্থের প্রমাণের দ্বারা বিশেষতঃ নিশ্চয় হইলেই উহার স্বীকারের সমাপ্তি হয়। উহারই নাম “সংস্থিতি”। এই পদার্থ এই প্রকারই হইবে, অল্প প্রকার হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা বা নিয়মই “সংস্থিতি”। তাই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ইচ্ছন্তাব্যবস্থা”। উহারই বিবরণ করিয়াছেন—“ধর্মনিয়মঃ”। এই সূত্রটি অবশ্যই উহার পরবর্তী

স্বত্রটি মহর্ষি গোতমের উক্ত নহে। কারণ, এখানে দুইটি স্বত্র নিম্নপ্রয়োজন এবং অর্থ-সঙ্গতিও হয় না—এই পূর্বপক্ষবলয়ন করিয়া উদ্যোক্তকর সমাধান করিয়াছেন যে, দুইটিই ঋষিহৃত। প্রথমটি—সিদ্ধান্তের সামান্তলক্ষণস্বত্র। বিতরটি—সিদ্ধান্তের বিভাগ-স্বত্র। সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়ই আবশ্যক। তাৎপর্যটাকাহারও এই স্বত্রটিকে সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণস্বত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, স্বত্রে “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ এখানে প্রমাণ। “তত্ত্ব”, কি না প্রমাণ বাহার “অধিকরণ” অর্গাৎ আশ্রয়, অর্থাৎ যে পদার্থ কোন মতে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত, তাহাই “তত্ত্বাধিকরণ”। বিভিন্ন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির সমস্তই বস্তুতঃ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, এ জন্ত যিনি যে পদার্থ প্রামাণিক বলিয়া মানেন, তাহার পক্ষে সেইটিই “তত্ত্বাধিকরণ” বা প্রামাণিক পদার্থ। বাদী ও প্রতিবাদীর মতামতসমূহে এখানে প্রামাণিক পদার্থের কথা বলা হইয়াছে। ভাষ্যে যাহাকে “সংস্থিতি” বলা হইয়াছে, স্বত্রে তাহাকেই “অভ্যুপগমসংস্থিতি” বলা হইয়াছে। মূলকথা, এইটি সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণস্বত্র। এই সিদ্ধান্তকে মহর্ষি গোতম চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যে পদার্থ কোন শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধ নহে এবং অন্ততঃ কোন এক শাস্ত্রে কথিত, তাহার নাম (১) “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”। যে পদার্থ সকল শাস্ত্রের সম্মত নহে, কোন শাস্ত্রকারবিশেষেরই সম্মত, তাহার নাম (২) “প্রতি-তত্ত্বসিদ্ধান্ত”। যে পদার্থটি প্রমাণসিদ্ধ করিতে হইলে তাহার আনুযায়িক অল্প পদার্থেরও সিদ্ধি আবশ্যক হয়, সেখানে সেই প্রকৃত পদার্থটিই আনুযায়িক সিদ্ধান্তের অধিকরণ বা আশ্রয় বলিয়া সেইরূপে (৩) “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। যেমন ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইলে সেখানে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি আনুযায়িক পদার্থও সিদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং সেখানে ঐ সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট জগৎকর্তাই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। ইহা ভাষ্যকারের মত। পরবর্তী নব্য-দিগের মতে পূর্বোক্ত স্থলে আনুযায়িক পদার্থগুলিই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। বিচারহলে অন্যের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই যদি তাহার বিশেষ ধর্ম লইয়া বিচার করা হয়, তাহা হইলে সেখানে ঐ ভাবে স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তের নাম (৪) “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ইহাও ভাষ্যকারের মত। পরবর্তী নৈয়ায়িকদিগের মতে যাহা ঋষি স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু ঋষির অল্প কথার দ্বারা তাহা ঋষির মত বলিয়াই বুঝা যায়, তাহার নাম “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। পূর্বোক্ত প্রকার সিদ্ধান্তের ভেদ ও লক্ষণ এবং উদাহরণাদি ইহার পরেই পাওয়া যাইবে। মহর্ষি গোতমোক্ত চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের জ্ঞানই বিচারে আবশ্যক। তাই অবয়বের পূর্বেই মহর্ষি বিচারস্থ সিদ্ধান্ত পদার্থের সর্বশেষ নিরূপণ করিয়াছেন। ২৬।

ভাষ্য। তত্ত্বার্থ-সংস্থিতিঃ তত্ত্বসংস্থিতিঃ। তত্ত্বমিতরেতরাভি-  
সম্বন্ধস্বার্থসমূহস্তোপদেশঃ শাস্ত্রম্। অধিকরণানুসঙ্গার্থা সংস্থিতিরধি-

১। তত্ত্বস্তে বাৎপায়াস্তে প্রমেয়ানেনেতি তত্ত্বং জন্যং তত্ত্বের অর্থঃ জন্যমাত্রয়ো জ্ঞাপকত্বেন যোয্যার্থানাম্।—  
জায়বাঈ কতাংপর্যটিকা।



করণসংস্থিতিঃ । অভ্যুপগমসংস্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ । তদ্বিশেষ-  
পরীক্ষণায়াভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ । তদ্রভেদাত্মকং—

**সূত্র । স চতুর্বিধঃ সর্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধি-  
করণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥ ২৭ ॥**

ভাষ্য । তত্রৈতাদৃশচতুষ্রয়ঃ সংস্থিতয়োহর্থান্তরভূতাঃ ।

অনুবাদ । “তন্ত্রার্থসংস্থিতি” ( অর্থাৎ সাক্ষাৎশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত )  
“তন্ত্রসংস্থিতি” । (১) সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত (২) এবং ( প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত ) ।

তন্ত্র বলিতে ( এখানে ) পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ-সমূহের উপদেশ শাস্ত্র ।  
অধিকরণের অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদার্থের সংস্থিতি “অধিকরণসংস্থিতি”  
( ৩ ) অধিকরণসিদ্ধান্ত ) । অনবধারিত পদার্থের স্বীকার অর্থাৎ বিচারস্থলে অসিদ্ধ  
পদার্থকেও মানিয়া লওয়া “অভ্যুপগমসংস্থিতি” ( ৪ ) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ) । তাহার  
অর্থাৎ বিচার্য পদার্থের বিশেষ পরীক্ষার জন্য অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত হয় । তদ্রভেদ  
প্রযুক্তই অর্থাৎ শাস্ত্রের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই ( সূত্রানুবাদ ) তাহা অর্থাৎ  
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ । কারণ, “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত,” “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত,”  
“অধিকরণসিদ্ধান্ত” এবং “অভ্যুপগমসিদ্ধান্তে”র অর্থান্তরভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ বা  
বৈলক্ষণ্য আছে । ( ভাষ্যানুবাদ ) তন্মধ্যে এই চারিটি সিদ্ধান্ত অর্থান্তরভূত অর্থাৎ  
পরস্পর বিলক্ষণ । ( অর্থাৎ সিদ্ধান্তব্যক্তি অসংখ্য হইলেও তাহাকে এই চারি  
প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে । কারণ, এই চারিটি পরস্পর বিলক্ষণ এবং ইহার  
মধ্যেই সকল সিদ্ধান্ত আছে ) ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার পূর্বসূত্রের জ্ঞান সিদ্ধান্তের এই বিভাগ-সূত্রটিরও পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়া  
পরে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । “তন্ত্রার্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি ভাষ্য পূর্ব-সূত্রের ভাষ্য বলিয়া  
ভ্রম হইয়া থাকে । বস্তুতঃ উহা এই সূত্রেরই ভাষ্য । সূত্রে এবং ভাষ্যে “সংস্থিতি” শব্দ  
সিদ্ধান্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সূত্রে দ্বন্দ্বসমাসের পরবর্তী “সংস্থিতি” শব্দের সহিত প্রত্যেকের  
সম্বন্ধবশতঃ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ সংস্থিতি বা সিদ্ধান্ত বুঝা যায় । ভাষ্যকার চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের  
ব্যাখ্যা করিতে “তন্ত্রসংস্থিতি,” “অধিকরণসংস্থিতি” এবং “অভ্যুপগমসংস্থিতি” এই তিনটিকেই  
বলিয়াছেন, তবে সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ হয় কিরূপে ? এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—  
“তদ্রভেদাত্মকং খলু” । ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত “স চতুর্বিধঃ” এই সূত্রার্থের যোজনা  
বুঝিতে হইবে । তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত “তন্ত্রসংস্থিতি” শব্দের দ্বারা “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত” ও  
“প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত” এই দুইটি সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে । কারণ, তন্ত্রের ভেদ আছে । প্রতিতন্ত্র-

গুলিও “তত্ত্ব”। সুতরাং “তত্ত্বসংস্থিতি” বলিলে “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তে”র স্থায় “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত”ও বলা হইল। ফলতঃ ভাষ্যকার ঐরূপে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। সিদ্ধান্ত চতুর্বিধই বলা হয় কেন? বিবিধ বা ত্রিবিধও বলা যাইতে পারে? স্বত্রকার এতদ্বারা সিদ্ধান্তের চতুর্বিধের হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকার স্বত্রপাঠের পরে “তত্রৈতান্যচতস্রঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা স্বত্রোক্ত ঐ হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ কথিত চারিটি সিদ্ধান্তের পরস্পর ভেদ থাকায় সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ এবং সকল সিদ্ধান্তই এই চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই চারিটির বৈশিষ্ট্য নহে, কমও নহে, এই নিয়মের জন্যই স্বত্রকার সিদ্ধান্তের চতুর্বিধ বিভাগ করিয়াছেন। “স চতুর্বিধঃ” এই অংশ ভাষ্য বলিয়াই অনেকে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা স্বত্রাংশ। ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার “শ্রায়হুচীনিবন্ধ” গ্রন্থে ঐ অংশকে স্বত্রমাধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চম স্বত্র-ভাষ্যের শেষে, ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐ অংশকে মহর্ষিবচন বলিয়া বুঝা যায়।

ভাষ্য। তাসাম্।

অনুবাদ। তাহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ “সংস্থিতি”র (সিদ্ধান্তের)

মধ্যে—

সূত্র। সর্বতত্ত্বাবিরুদ্ধস্তত্ত্বেহধিকৃতোৎতঃ  
সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তঃ ॥২৮॥

অনুবাদ। সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, শাস্ত্রে কথিত পদার্থ “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত।”

ভাষ্য। যথা ত্রাণাদীনৌল্লিয়াগি, গন্ধাদয় ইন্দ্রিয়ার্থাঃ, পৃথিব্যাদীনি  
ভূতানি, প্রমাণৈরর্থস্ত গ্রহণমিতি।

অনুবাদ। যেমন জাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ, ক্রিতি প্রভৃতি ভূত,  
প্রমাণের দ্বারা পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়, ইত্যাদি (সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার “তাসাম্” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত সংস্থিতির অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণ-চতুর্বিধের অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে পদার্থ সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, তাহা “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”। ভাষ্যকার ত্রাণাদির ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। জাণাদির ভৌতিক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয় বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। ভাষ্যের শেষোক্ত “ইতি” শব্দটি আদি অর্থে প্রযুক্তও বলা যায়। “ইতি” শব্দের “আদি” অর্থ কোথেকে কথিত আছে?। “সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ” এই কথা না বলিয়া “সর্বশাস্ত্রে কথিত” এই কথা বলিলে গোতমোক্ত “ছল” ও “জাতির” অসদ্ব্যবহার সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, উহা সর্বশাস্ত্রে কথিত নহে; কেবল জায়শাস্ত্রেই কথিত। তবে উহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, এই জন্য সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতেছে। কেবল সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মহর্ষি সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত



বলেন না, কোন শাস্ত্রেও কথিত হওয়া চাই। তাই আবার বলিয়াছেন—“তত্ত্ববিকৃতঃ”। উদ্যোতকর, বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে মনের ইন্দ্রিয়র অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। উহা সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে, এ জ্ঞান বলিয়াছেন—“তত্ত্ববিকৃতঃ”। অর্থাৎ তাঁহানিগের মতে জ্ঞানতত্ত্ব মনের ইন্দ্রিয়র সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, এ জ্ঞান উহা সর্বতত্ত্বে অবিকৃত হইলেও “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” হইবে না। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের লক্ষণ অজ্ঞবিধ। তাঁহার মতে মনের ইন্দ্রিয়র “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” নহে। এ সব কথা গুরে ব্যক্ত হইবে। পূর্বোক্ত “দৃষ্টান্ত” এবং এই “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” একই পদার্থ, ইহার পৃথক উল্লেখ কেন? এতদ্ব্যতীত উদ্যোতকর বলিয়াছেন—“দৃষ্টান্ত” কেবল বাদী ও প্রতিবাদীরই নিশ্চিত থাকে। সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত তজপ নহে। উহা সকলেরই নিশ্চিত। দৃষ্টান্ত অগ্রহান ও আগমের আশ্রয়, সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত তজপ নহে; স্মরণীয় দুইটির ভেদ আছে। উহার এক পদার্থ নহে।

### সূত্র। সমানতত্ত্বসিদ্ধঃ পরতত্ত্বাসিদ্ধঃ প্রতিতত্ত্ব- সিদ্ধান্তঃ ॥২৯॥

অনুবাদ। একশাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বশাস্ত্রসিদ্ধ, ( কিন্তু ) পরতত্ত্বে ( অন্য শাস্ত্রে ) অসিদ্ধ ( পদার্থ ) “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত”।

ভাষ্য। যথা নামত আত্মলাভঃ, ন সত আত্মহানঃ, নিরতিশয়া-  
চেতনাঃ, দেহেন্দ্রিয়মনঃস্ব বিষয়েষু তত্ত্বৎকারণে চ বিশেষ ইতি  
সাংখ্যানাম্। পুরুষকর্মাধিনিমিত্তো ভূতসর্গঃ, কর্মহেতবো দোষাঃ  
প্রবৃত্তিচ্চ, স্বগুণ-বিশিষ্টাচ্চেতনাঃ, অসংস্পৃগপদ্যতে উৎপন্নঃ নিরুধ্যত ইতি  
যোগানাম্।

অনুবাদ। যেমন অসত্তের উৎপত্তি নাই, সত্তের অত্যন্ত বিনাশ নাই, ( তিরো-  
ভাবমাত্র আছে )। চেতনগণ অর্থাৎ আত্মাগুলি নিরতিশয় ( অপরিণামী নিগুণ )।  
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে, বিষয়-সমূহে এবং তত্ত্বৎকারণে অর্থাৎ “মহৎ”, “অহংকার” এবং  
“পদকতশ্রী”রূপ সূক্ষ্ম ভূতে “বিশেষ” ( পরিণামবিশেষ ) আছে, ইহা সাংখ্যাদিগেরই  
( প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত )। ভূতসৃষ্টি ( দ্ব্যণুকাবিক্রমাদিগের উৎপত্তি ) পুরুষের কর্মাদিজ্ঞাত  
( জীবের অদৃষ্ট এবং পরমাণুর সংযোগাদি কারণজ্ঞাত )। দোষগুলি ( রাগ, দ্বেষ ও  
মোহ ) এবং প্রবৃত্তি, কর্মের ( অদৃষ্টের ) হেতু। আত্মাগুলি স্বগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ  
জ্ঞানাদি-নিজগুণ-বিশিষ্ট। অসংস্পৃগ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যাহার কোনরূপ সত্তা  
থাকে না, তাহাই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন বস্তু অর্থাৎ জ্ঞাত সংপদার্থ নিরুদ্ধ হয়

( অত্যন্ত বিনষ্ট হয়), ইহা যোগদিগেরই অর্থাৎ সাংখ্যের পরিণামবাদের বিপরীতবাদী “আরম্ভবাদী”দিগেরই ( প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত ) ।

টিপ্পনী । ভাংপর্ষটীকাকার বলিয়াছেন,—হুত্রে “সমান” শব্দ একার্থে প্রযুক্ত । যেমন, নৈয়ায়িকদিগের জ্ঞানশাস্ত্র সমানতত্ত্ব, সাংখ্যাদি-শাস্ত্র পরতত্ত্ব ইত্যাদি । ফলতঃ বাহার যেটি নিজ-তত্ত্ব, তাহাই এখানে “সমান-তত্ত্ব” শব্দের প্রতিপাদ্য এবং যে পদার্থ বাহার সমান তত্ত্বসিদ্ধ, কিন্তু পদতত্ত্বে অসিদ্ধ, সেই পদার্থ তাহার “প্রতিতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত” । যেমন দীর্ঘাংসকদিগের শব্দ-নিত্যতা প্রকৃতি । কোন সিদ্ধান্তে একাবিক সম্প্রদায়ের একমত থাকিলে তাহাও তাহাদিগের সকলেরই প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইবে । যেমন ভাষ্যোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তগুলি পাতঞ্জলেরও সিদ্ধান্ত । পাতঞ্জলও সাংখ্য, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যে “সাংখ্যানাং” এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে । উহাতে পাতঞ্জলদিগকেও বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার পরে সাংখ্যের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—“যোগানাম্” । জ্ঞানবাহিককার উদ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—“ভৌতিকানীজিয়াগীতি যোগানামভৌতিকানীতি সাংখ্যানাম্” । বার্তিক ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—“যোগানামেব সাংখ্যানামেবেতি নিয়মঃ” । কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্তিককার “যোগানাং” এই কথার দ্বারা কাহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা কিছু বলেন নাই । “যোগানাং” এই কথা বলিলে যোগাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কথাই সকলে বুঝিয়া থাকেন । “এতেন যোগঃ প্রত্যক্ষঃ” এই ব্রহ্মহুত্রে বখন যোগ-শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থেই “যোগ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তখন ঐ “যোগ” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে “যোগানাং” এই কথার দ্বারা যোগাচার্য্যসম্প্রদায়কে অবস্থা বুঝা যাইতে পারে এবং ঐরূপ প্রয়োগে তাহাই সকলে বুঝিয়া থাকেন । যোগাচার্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন কোন সম্প্রদায় যদি জ্ঞান ও বৈশেষিকের “আরম্ভবাদ” অবলম্বন করিয়া যোগবর্ণন করিয়া থাকেন এবং ভাষ্যকারের সময়ে তাঁহাদিগের মতের প্রসিদ্ধি থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যকার “যোগানাং” এই কথার দ্বারা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন । কিন্তু কেবল “যোগানাং” এই কথা বলিলে নানান্ততঃ যোগাচার্য্য সম্প্রদায়মাত্রই বুঝা যায় । পরন্তু কোন যোগাচার্য্য জ্ঞানবৈশেষিকের আরম্ভবাদ গ্রহণ করিয়া যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায় না । যোগাচার্য্য ভগবান্ বার্ষগণ্য মায়াবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কথায় পাওয়া যায়—( পুষ্কোক্ত ব্রহ্মহুত্রেঃ শরীরক ভাব্য ভ্রমতী দ্রষ্টব্য ) । ফলকথা, ভাষ্যকার যে সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া “যোগানাং” এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, উহা যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপে কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না । উহা বৈশেষিক ও জ্ঞানের সিদ্ধান্তরূপেই স্পষ্টসিদ্ধ আছে । তবে ভাষ্যকার কেন ঐরূপ বলিয়াছেন ? ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন ।

বহু অল্পসংখ্যের ফলে কোন আবিড় মহামনীষীর মুখে শুনিতে পাই যে, এখানে “যোগানাং” এই কথার ব্যাখ্যা “বৈশেষিকানাম্” । মহর্ষি কণাদ যোগবিভূতির দ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করায় তাঁহার ঐ শাস্ত্র তৎকালে যোগশাস্ত্র নামেও অভিহিত হইত । “যোগী” অর্থাৎ যোগবিভূতিসম্পন্ন মহর্ষি কণাদ কর্তৃক প্রোক্ত এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপে



“যোগ” শব্দের অৰ্থ বৈশেষিক শাস্ত্র। তাহার পরে ঐ “যোগ” কি না—বৈশেষিক শাস্ত্রে বাহ্যিক বিজ্ঞ অৰ্থাৎ ঐ শাস্ত্রমতের সম্প্রদায়, এই অৰ্থে তদ্বিত্ত প্রত্যয়ের দ্বারা “যোগ” শব্দের অৰ্থ এখানে বৈশেষিক সম্প্রদায় বুঝা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বৈশেষিকের প্রধান আচার্য্য পরমপ্রাচীন প্রশস্তপাদও তাঁহার “পদার্থদর্শনসংগ্রহে”র শেষে কণাদের যোগবিভূতির পুৰ্ণোক্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন। অত্ৰান্ত টীকাভাষণও কণাদের যোগবিভূতির কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং বায়ুপুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও কণাদের যোগবিভূতি বর্ণিত আছে।

পুৰ্ণোক্ত ব্যাখ্যার বক্তব্য এই যে, কেবল বৈশেষিক সম্প্রদায়কে বুঝাইবার জন্য পুৰ্ণোক্ত প্রকার ব্যুৎপত্তি আশ্রয় করিয়া “যোগ” শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি ত্ৰায়চাৰ্য্যগণ অত্ৰ কোন স্থানে ঐরূপ প্রয়োগ করেনও নাই। উদ্যোতকর “ত্ৰায়বার্ত্তিকে” বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে “বৈশেষিকানাং” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনিও “যোগানাং” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই? আর যদি গতান্তর না থাকায় এখানে “যোগ” শব্দের ঐরূপ একটা অৰ্থ ব্যাখ্যা করিতেই হয় এবং করা যায়, তাহা হইলে এখানে “যোগানাং” এই কথার ব্যাখ্যা “আরম্ভবাদিনাং” ইহাও বলিতে পারি। কারণ, “যোগ” শব্দের সংযোগ অৰ্থ সুপ্রসিদ্ধ আছে। “সৰ্বদৰ্শনসংগ্রহে” যোগ ব্যাখ্যার মহামনীষী মাঘবাচার্য্যও “যোগ” শব্দের সংযোগরূপ অৰ্থই প্রসিদ্ধ, ইহা বলিয়াছেন। এখন তাৎপৰ্য্যানুসারে যদি “যোগিন্” শব্দের দ্বারা কণাদ মহৰ্ষিকেই বুঝিয়া তাঁহার প্রোক্ত শাস্ত্রকে “যোগ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা হইলে তাৎপৰ্য্যানুসারে “যোগ” শব্দের দ্বারা ত্ৰায় ও বৈশেষিকের “আরম্ভবাদে”র মূল যে পরমাণুত্বের সংযোগ এবং ঐরূপ অত্ৰান্ত সংযোগ, তাহাও বুঝিতে পারি। তাহা হইলে ঐরূপে “যোগ” বা সংযোগবিশেষবাদীকেও “যোগী” বলিতে পারি। যেমন বৈতবাদীকে “বৈতী” এবং অদ্বৈতবাদীকে “অদ্বৈতী” বলা হয়, তদ্রূপ পরমাণুত্বের “যোগ”বাদীকে “যোগী” বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে “যোগিন্” শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদীদিগকেও বুঝা যাইতে পারে। “যোগী” অৰ্থাৎ আরম্ভবাদীর প্রোক্ত শাস্ত্রকে “যোগ” বলা যাইতে পারে। সেই “যোগ” শাস্ত্রকে বাহ্যিক জানেন, তাহাদিগকেও “যোগ” বলা যাইতে পারে। অব্যাকার যে তাহাই বলেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তাৎপৰ্য্য কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে অন্তরূপ তাৎপৰ্য্যও কল্পনা করিবার অধিকার আছে। পরমাণুত্বের সংযোগে দ্ব্যণুকাবিক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বাহাদিগের সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে “আরম্ভবাদী” বলে। পরমাণুত্বের সংযোগই আরম্ভবাদীদিগের অসিদ্ধান্তের মূল। উহা খণ্ডিত হইলেই “আরম্ভবাদ”

১। তদ্বিত্তে তদ্বিত্তঃ—পাণিনিমতঃ, ৪.২.৫২। শ্রোতাব্যুৎ—পাণিনিমতঃ, ৪.২.৬৪। শ্রোতাব্যুৎপ্রত্যয়ঃ পরমাত্মবৃত্তবিকৃতপ্রত্যয়ঃ লুক্ ত্ৰাৎ—সিদ্ধান্তভৌমী।

২। যোগচোরবিভূত্যা যজ্ঞোবহিষা মহেশ্বরঃ।

৩। বৈশেষিক শাস্ত্রঃ তদ্বৈ কণভূতঃ ননঃ।—প্রশস্তপাদবাক্য।

৪। যোগিনা আরম্ভবাদিনা প্রোক্তং শাস্ত্রং যোগঃ,—তদ্বিভূতি যে তে যোগাঃ আরম্ভবাদিনাঃ।

খণ্ডিত হয়। এ জন্ত আরম্ভবাদ খণ্ডনে “ব্রহ্মত্ব” ও “শারীরক ভাবো” এই সংযোগই প্রধানতঃ এবং বিশেষতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। পরমাণু বা অল্প অবয়বের সংযোগবিশেষজন্ত অবয়বীর উৎপত্তি হয়, ইহা “আরম্ভবাদী” দিগেরই মত। অম্ভবাদীরা উহা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং “আরম্ভবাদে”র মূল সংযোগকে ধরিয়া ভাব্যকার ও বার্তিককার এখানে “যোগানাং” এই কথার দ্বারা “আরম্ভবাদী” সম্প্রদায়কে প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাতে ঐরূপ প্রয়োগের সার্থকতাও হয়। কারণ, আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কে এক কথায় প্রকাশ করিবার জন্ত ঐরূপ প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। ভাব্যকার যখন “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তে”র উদাহরণ বলিতে “যোগানাং” এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন উহা যোগসম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, অল্প সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। তাৎপর্যটীকাকারও “যোগানাং”মেব এইরূপ কথার দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য ঐগুলি ভাব্যকারের প্রথমোক্ত সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই ঐ ব্যাখ্যার তাৎপর্য বলিয়াই বুঝা যায়, কিন্তু শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি যে কেবল বৈশেষিকের অথবা কেবল নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত নহে, উহা আরম্ভবাদী সকল সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, তদন্তর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বলিতে হইলে এখানে “বৈশেষিকানাংমেব” অথবা “নৈয়ায়িকানাংমেব” এইরূপ কোন প্রয়োগের দ্বারা তাহা বলা হয় না। সুতরাং ভাব্যকার এখানে “যোগানাংমেব” এই কথার দ্বারা তাঁহার শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি “আরম্ভবাদী” মাত্রেরই “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত,” ইহা প্রকাশ করিতে পারেন।

মূলকথা, যে অর্থেই হউক, ভাব্যকার যে এখানে “যোগ” শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদী বৈশেষিক সম্প্রদায় অথবা ঐ মতাবলম্বী সকল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, ভাব্যকারের শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি “আরম্ভবাদী” ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে। বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে “যোগ” শব্দের প্রয়োগ জৈন জ্ঞানের এতদেও পাইয়াছি। জৈন জ্ঞানের গ্রন্থে কোন কোন স্থলে “যোগ” শব্দেরও প্রয়োগ আছে। আবার কোন স্থলে “যোগ” শব্দের দ্বারা প্রমাণ-চতুষ্টয়বাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা

১। যোগজ্ঞান সদকারণবহিতা বিতাসিৎ।

সদকারণবহিতামিতি যোগযতো দধা।—বিদ্যানন্দ ঋষিকৃত “পত্রপত্রিকা” (জৈন জ্ঞান)।

“সদকারণবহিতাং” এইটি বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম সূত্র। এইটিকে উল্লেখ করিয়া ইহাও “যোগ”-বাক্য বলা হইয়াছে।

২। সৌমতসংখ্যায়োগানাং তথাভূতপরিণাম-বিশেষাসিদ্ধোঃ—(বিদ্যানন্দঋষিকৃত পত্রপত্রিকা)।

৩। সৌমত-সংখ্যায়োগ-প্রত্যাকর-জৈমিনীয়াং প্রত্যাকানুমানাগমোপমানার্থপজ্ঞাত্যৈবৈকৈকাবিতৈক্যাস্তিৎ।

—(“পত্রিকাভূত”, ৩ অনুচ্ছেদ, ৭৭ সূত্র)।

এই সূত্রোক্ত প্রত্যাক প্রভৃতি প্রমাণগুলির ব্যাক্রমে এক একটি অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে “যোগ” পক্ষে প্রত্যাকাদি চারিটি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশেষিক যখন প্রত্যাকাদি প্রমাণবহুবাহী, তখন এই সূত্রে “যোগ” শব্দের দ্বারা “প্রত্যাকাদি প্রমাণচতুষ্টয়বাদী নৈয়ায়িককেই গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। বড়দর্পনসমুচ্চয়ের টীকাকার ভণ্ডরত্ন শঙ্করই লিখিয়াছেন—“কথাসৌ নৈয়ায়িকানাং যোগপরাধিধানানাং”।



দায়, প্রাচীন কালে বৈশেষিক সম্প্রদায়কে “যোগ” বা “যোগ” শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইত এবং কোন স্থলে “যোগ” শব্দের দ্বারা কেবল গোতম সম্প্রদায়কেও প্রকাশ করা হইত। কেন হইত, কিরূপ অর্থে ঐরূপ প্রয়োগ হইত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা না গেলেও ঐরূপ প্রয়োগ বিষয়ে সংশয় নাই। সুধীগণের চিন্তা করিবার জন্য জৈন গ্রন্থের গ্রন্থসংবাদও প্রদত্ত হইল। অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধান করিয়া তথ্য নির্ণয় করুন।

## সূত্র । যৎ সিদ্ধাবশ্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সৌধিকরণ- সিদ্ধান্তঃ ॥৩০॥

অনুবাদ। যে পদার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য প্রকরণের অর্থাৎ অন্য আনুষঙ্গিক পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহা ( সেই পদার্থ ) অধিকরণসিদ্ধান্ত।

ভাষ্য। যস্তার্থস্ত সিদ্ধাবশ্যেহর্থী অনুযজ্যন্তে, ন তৈর্বিবনা সৌধর্থঃ সিধ্যতি তেহর্থী যদধিষ্ঠানঃ সৌধিকরণসিদ্ধান্তঃ। যথেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা দর্শন-স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাদিতি। অত্রানুযঙ্গিণৌহর্থী ইন্দ্রিয়-নানাস্থম্; নিয়তবিষয়াবিশ্লিষ্টাণি, স্ববিষয়-গ্রহণলক্ষণানি, জ্ঞাতুজ্ঞান-সাধনানি, গন্ধাদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং গুণাধিকরণং, অনিয়তবিষয়-শ্চেতনং ইতি, পূর্ব্বার্থসিদ্ধাবেতেহর্থীঃ সিধ্যন্তি ন তৈর্বিবনা সৌধর্থঃ সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। যে পদার্থের ( সাধ্যের অথবা হেতুর ) সিদ্ধিবিষয়ে অন্য পদার্থগুলি অনুযুক্ত ( সংবদ্ধ ) হয়, বিশদার্থ এই যে—সেইগুলি অর্থাৎ সেই আনুষঙ্গিক পদার্থ-গুলি ব্যতীত সেই পদার্থ ( পূর্ব্বোক্ত পদার্থ ) সিদ্ধ হয় না,—আরও বিশদার্থ এই যে, সেই পদার্থগুলি ( সেই আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি ) ‘যদধিষ্ঠান’ অর্থাৎ যে পদার্থের আশ্রিত, তাহা অর্থাৎ সেই সাক্ষাৎ উল্লিখ্যমান আশ্রয়-পদার্থটি ‘অধিকরণ সিদ্ধান্ত’। ( উদাহরণ ) যেমন দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুঃ ও হৃদয়াদির দ্বারা এক পদার্থের প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন ( ইহা মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন )।

ইহাতে অর্থাৎ চক্ষুঃ ও হৃদয়াদির দ্বারা আত্মার একার্থ-প্রতিসন্ধান-সিদ্ধিবিষয়ে আনুষঙ্গিক পদার্থ ইন্দ্রিয়নানাস্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বহু ( এবং ) ইন্দ্রিয়গুলি ( বহি-রিন্দ্রিয়গুলি ) নিয়তবিষয়,—স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণ ( এবং ) আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়বর্গের বিষয়নিয়ম এবং স্ব স্ব বিষয়গ্রহণলক্ষণ এবং আত্মার

প্রত্যক্ষসাধন (এবং) দ্রব্য গন্ধাদি গুণ হইতে ভিন্ন (এবং) গুণের আধার, অর্থাৎ দ্রব্যের গন্ধাদিগুণভিন্ন এবং গুণাশ্রয়, (এবং) আত্মাগুলি অনিয়তবিষয় অর্থাৎ আত্মার গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়মের অভাব। (অর্থাৎ মহাশিখিত পূর্বোক্ত একার্থপ্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্ন সিদ্ধিতে এইগুলি আনুষঙ্গিক পদার্থ)। পূর্বোক্তের সিদ্ধিবিষয়ে অর্থাৎ মহাশিখিত সাক্ষ্যে কথিত পূর্বোক্ত একার্থপ্রতিসন্ধানের সিদ্ধিতে অন্তর্গত এই পদার্থগুলি (ইন্দ্রিয়বহুবাদি) সিদ্ধ হয়। (কারণ) সেইগুলি ব্যতীত অর্থাৎ ঐ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই বার অধিকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তচতুষ্টয়ের মধ্যে এইটিই চূর্বোক্ত। সূত্রবাং ইহার ব্যাখ্যাও একরূপ হয় নাই। অনুবাদে তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—ভাষ্যে “বস্তুগত সিদ্ধো” এই স্থলে বিষয়সমুদায়, নিমিত্ত-সমুদায় নহে। শেষে তাৎপর্যার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে পদার্থটি জানিতে হইলে তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি তাহার অন্তর্ভাবেই জানিতে হয়, সাক্ষ্যে উল্লিখ্যমান সেই পদার্থ তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলির আধার; কারণ, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ঐ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি সিদ্ধ হয়; সেই পদার্থ গন্ধই (মাখাই) হউক আর হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত হইবে। যেমন “জগৎ চেতনকর্তৃকং উৎপাদিতম্ভাবং বদ্যং” এইরূপে জগতের চেতনকর্তৃকত্ব সাধন করিলে সর্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিমহাবিশিষ্ট-চেতনকর্তৃকত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, সর্বজ্ঞত্বাদি ব্যতীত জগতের চেতনকর্তৃকত্ব সম্ভব হয় না। এ স্থলে চেতনকর্তৃকত্বরূপ মাখাটি তাহার সিদ্ধির অন্তর্গত আনুষঙ্গিক সর্বজ্ঞত্বাদি পদার্থযুক্ত হইয়াই সিদ্ধ হয়। সূত্রবাং সর্বজ্ঞত্বাদি সহিত চেতনকর্তৃকত্বই ঐ স্থলে অধিকরণসিদ্ধান্ত, এবং আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নসাধনে মহাবি গোতম (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্রে) “আমি বাহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছিলাম, তাহাকে রসিক্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করিতেছি” এই প্রকার একার্থপ্রতিসন্ধানকে হেতু বলিয়াছেন। ঐ হেতুটি সিদ্ধ হইতে গেলে ভাষ্যোক্ত ইন্দ্রিয়-বহুত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পদার্থবর্গসহিত হইয়াই সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ ইন্দ্রিয়বহুত্বাদি ব্যতীত ঐরূপ একার্থপ্রতিসন্ধান সিদ্ধ হয় না (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্রে দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে ঐ প্রতিসন্ধানরূপ হেতু ইন্দ্রিয়বহুত্বাদিসহিত হইয়াই সিদ্ধ হইয়া ঐরূপে “অধিকরণসিদ্ধান্ত” হইয়াছে। এই জন্তই উদ্যোতকর লিখিয়াছেন—“বাক্যার্থসিদ্ধো তদনুযায়ী যো যঃ সোহধিকরণ-সিদ্ধান্তঃ।” ইহাই বাচস্পতিমিশ্রের ব্যাখ্যা। উদয়নের “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থের দীপ্তিতে রঘুনাথ শিরোমণি বার্তিকের পাঠ ও তাৎপর্যটীকাকারের কথার উল্লেখ করিয়া অন্যরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া রঘুনাথের পরবর্তী বিশ্বনাথ কলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না, সেই পূর্বোক্ত পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ নবীন রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে আনুষঙ্গিক পদার্থগুলিই



অধিকরণসিদ্ধান্ত। কারণ, তাহাই প্রকৃত পদার্থসিদ্ধির আশ্রয়। উদ্যোতকরের কথাই দ্বারাও সরলভাবে ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের কথাই দ্বারা ইহা সরলভাবে বুঝা যায় না। তাঁহার মতে প্রকৃত পদার্থটিই আনুযায়িক পদার্থের আশ্রয় বলিয়া তাহাই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। স্বত্রেও ‘বৎ’ শব্দের দ্বারা প্রকৃতপদার্থই মহাবির বুঝিছে। কারণ, পরে ‘অন্ত’ শব্দ আছে। এখন কথা এই যে, প্রকৃত পদার্থই হউক আর আনুযায়িক পদার্থই হউক, তাহা “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” বা “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত” হইলে তাহাকে পুথক্ “অধিকরণসিদ্ধান্ত” বলা নিশ্চয়োজ্ঞ। ইন্দ্রিয়নানাদি সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত এবং প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তই আছে; তাহাকে আবার “অধিকরণসিদ্ধান্ত” বলিবার প্রয়োজন কি? ইহা সকলকেই ভাবিতে হইবে। বাচস্পতির ব্যাখ্যায় এ ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহার মতে কেবল ইন্দ্রিয়নানাদি প্রভৃতি বা কেবল পূর্বোক্ত স্বত্রকারীর প্রতিপক্ষানুপক্ষ হেতুই “অধিকরণসিদ্ধান্ত” নহে। ইন্দ্রিয়নানাদি আনুযায়িক পদার্থ সহিত পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষানুপক্ষ প্রকৃত হেতুই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। তিনি স্বত্রকার ও ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। “পূর্বোক্তসিদ্ধান্তেতৎপার্থঃ” এই ভাষ্যসন্দর্ভের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—“পূর্বোক্তপার্থঃ সাক্ষাদধিকৃতঃ তত্ত্ব সিদ্ধান্তবর্ত্তগত ইতি ভাষ্যার্থঃ”। ফলতঃ বাচস্পতি নিশ্চয় ব্যাখ্যায় অধিকরণসিদ্ধান্তটি সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত ও প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ, ইন্দ্রিয়নানাদি প্রভৃতি অথবা পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষানুপক্ষ পৃথগভাবে শাস্ত্রে কথিত হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রমাণসিদ্ধ ইন্দ্রিয়নানাদি সহিত প্রতিপক্ষানুপক্ষ কোন শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। এই জন্য ঐরূপ সিদ্ধান্তকে “অধিকরণসিদ্ধান্ত” নামে তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। মনে হয়, সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত লক্ষণস্বত্রে মহাবির এই অন্তর্ভুক্তি “তত্ত্ববিশিষ্টতঃ” এই কথাটি বলিয়াছেন। কেবল সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ পদার্থকেই সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত বলিলে সর্বসম্মত অধিকরণসিদ্ধান্তও সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ ব্যাখ্যাত অধিকরণসিদ্ধান্তটি সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতে বিশিষ্ট। সুতরাং মহাবির তাহাকে সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতে পুথক্ করিয়াই বলিয়াছেন।

**সূত্র। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণ-  
মভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥৩১॥**

অনুবাদ। অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা অনবধারিত পদার্থের স্বীকার করিয়া (যে স্থলে) তাহার বিশেষ পরীক্ষা হয়, (সেই স্থলে সেই স্বীকৃত পদার্থটি) “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”।

ভাষ্য। যত্রে কিঞ্চিদর্পজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে—অন্তঃ দ্রব্যং শব্দঃ, স তু নিত্যোহখ্যানিত্য ইতি,—দ্রব্যস্ত সত্যো নিত্যতাহনিত্যতা বা তদ্বিশেষঃ পরীক্ষ্যতে সোহভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ, স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিন্ত্যাপরিষয়া পরবুদ্ধাবজ্ঞানাক্রান্ত প্রবর্ত্ত ইতি।



অনুবাদ। যে স্থলে অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা অনবধারিত কোনও পদার্থ-সামান্য স্বীকৃত হয়, ( উদাহরণের উল্লেখের সহিত সুত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন ) ইউক শব্দ দ্রব্য, কিন্তু তাহা নিত্য অথবা অনিত্য ? ( এইরূপে ) দ্রব্য হইলে তাহার অর্থাৎ দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত শব্দের নিত্যতা অথবা অনিত্যতারূপ “তদ্বিশেষ্য” ( শব্দগত বিশেষ ধর্ম ) পরীক্ষিত হয়, তাহা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত, ( ইহা ) নিজবুদ্ধির প্রকর্ষণ-খ্যাপনেচ্ছা-প্রযুক্ত এবং পরবুদ্ধির অবজ্ঞা প্রযুক্ত প্রবৃত্ত হয়।

টিপ্পনী। “অভ্যুপগম্যতে পরীক্ষাং বিনাশি স্বীকৃত্যেতৎ” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বিনা-বিচারে স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তই “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ভাষ্যকার নিজের মতানুসারে উদাহরণ-প্রদর্শনের সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত উদাহরণের মূল কথা এই যে, মীমাংসক সম্প্রদায়-বিশেষের মতে শব্দ দ্রব্যপদার্থ এবং নিত্য। নৈয়ায়িক মতে শব্দ গুণ-পদার্থ এবং অনিত্য। মীমাংসক শব্দের দ্রব্যত্বসাধন করিতেছেন—নৈয়ায়িক তাহার খণ্ডন করিতে গিয়া মধ্যে বলিলেন, —“আচ্ছা, ইউক শব্দ দ্রব্যপদার্থ, কিন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, তাহা বিচার কর।” এইরূপে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়া তাহার বিশেষধর্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের পরীক্ষা করিয়া নিত্যত্ব খণ্ডন করিলেন। প্রকারান্তরে মীমাংসক পরাস্ত হইলেন। ঐ স্থলে শব্দের দ্রব্যত্ব মীমাংসকের “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত” হইলেও তৎকালে নৈয়ায়িকের পক্ষে উহা “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। নৈয়ায়িক দেখিলেন, মীমাংসক শব্দকে দ্রব্য ও নিত্য পদার্থ বলিতেছেন; তাহার সম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়াও শব্দের নিত্যত্ব খণ্ডন করিতে পারি। শব্দনিত্যতাই মীমাংসকের সূত্র প্রধান সিদ্ধান্ত, সুতরাং স্ববুদ্ধির প্রকর্ষণখ্যাপন ও প্রতিবাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞার জন্ত তাহাই করিব। তাই বিনা বিচারেই মীমাংসকসম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইলেন। বিচারস্থলে তাঁর প্রতিভাসম্পন্ন মনোবী নিজ বুদ্ধির প্রকর্ষণখ্যাপনাদির ইচ্ছায় অনেক স্থলেই এইরূপ করিয়া থাকেন এবং এই ভাবেই “অভ্যুপগমবাদ,” “প্রোচিবাদ” প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

স্মার-বার্তিককার প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, হত্রে “অপরীক্ষিত” বলিতে দ্বারা ঋষিহত্রে সাক্ষাৎ উপনিবদ্ধ হয় নাই, অথচ তাহার বিশেষ ধর্মের এমন ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে, যদ্বারা বুঝা যায়, উহা ঋষির স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। যেমন মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্মারহত্রে সাক্ষাৎ উপবর্ণিত না হইলেও স্মারহত্রে মনের যে বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা আছে, তদ্বারা বুঝা যায়, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্মারহত্রে মনোবীর্য স্বীকৃত। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মনোবীর্য গোতমের “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ফল কথা, যেটি হত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, কিন্তু তাহার বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা তাহাকে সূত্রকারের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায়, উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে তাহারই নাম “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” এবং ঐরূপই সুত্রার্থ। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পক্ষে বলিতে পারি যে,



স্বত্র পাঠ করিয়া ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সহজবুদ্ধিগম্য হয়। “অপরীক্ষিত” শব্দের দ্বারা বাহ্য পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রমাণানির দ্বারা বুঝিয়া লওয়া হয় নাই, এই অর্থই সহজে বুঝা যায়। বাহ্য ঋষিসূত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, এই অর্থ উহার দ্বারা সহজে বুঝা যায় না। উহা বুঝিতে কষ্টকরনা করিতে হয়। পরন্তু বিশেষ পরীক্ষাপ্রযুক্ত অপরীক্ষিতের স্বীকার, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে “তদ্বিশেষপরীক্ষণাদপরীক্ষিতাত্ত্যাপগমঃ” এইরূপ ভাষাই মহর্ষি প্রয়োগ করিতেন। ফল কথা, ঋষি-সূত্রের সহজবোধ্য অর্থ পরিত্যাগ করা ভাষ্যকার সম্ভব মনে করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের ইন্দ্রিয়ের ভাষ্যকারের মতে অভ্যাপগমসিদ্ধান্ত নহে। ভাষ্যকার প্রত্যকলক্ষণ-স্বত্রভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ের সহজ বোধ্য বাহ্য বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, মনের ইন্দ্রিয়ের তাহার মতে “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”। মনু স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং “ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চান্দি” এই ভগবদ্গীতাবাক্যে মনের ইন্দ্রিয়ের স্পষ্ট প্রকটিত থাকার উহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ বলিয়াই ভাষ্যকার মনে করেন। “বেদান্ত-পরিভাষা”-কারের পক্ষ হইয়া ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিলে ভাষ্যকার তাহা নিতান্ত অপব্যাখ্যা মনে করেন। বস্তুতঃ মবাদিশাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়বাদের স্পষ্ট আছে। তবে ঋষিসূত্রে ইন্দ্রিয় হইতে মনের যে পৃথক্ উল্লেখ আছে, ভাষ্যকার তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছেন। ঋষিসূত্রে বহিরিন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যেই ইন্দ্রিয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার দ্বারা মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা জ্ঞানী অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ” ইত্যাদি উপনিষদেও বহিরিন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যেই ইন্দ্রিয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বহিরিন্দ্রিয়বর্গ হইতে অহরিন্দ্রিয় মনের বিশেষ-প্রদর্শনের জন্তই উপনিষদে ঐরূপে বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহা ঐ উপনিষদবাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। তাহা হইলে মনের ইন্দ্রিয়প্রতিপাদক মবাদি শাস্ত্রবাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। মনের ইন্দ্রিয় “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” হইলে তাহা কোনমতে “অভ্যাপগমসিদ্ধান্ত” হইতেও পারে না। কারণ, সর্বসম্মত পদার্থে কোন পক্ষেরই বিবাদ হয় না; এবং ভাষ্যকারের মতে যখন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিতত্ত্ব-সিদ্ধান্তই বিচারস্থলে অন্তের “অভ্যাপগমসিদ্ধান্ত” হইবে, তখন তাহাতে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণও অবশ্য থাকিবে।

ভাষ্যকারের মতে স্বীকৃত পদার্থই সিদ্ধান্ত। কারণ, তিনি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন— “অন্তজ্ঞানানোইহ সিদ্ধান্তঃ।” সুতরাং তাহার মতে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ-সূত্রেরও সেইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণসূত্রের মধ্যেও প্রথম তিনটিতে পদার্থেরই সিদ্ধান্তের স্পষ্ট আছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি পদার্থের অভ্যাপগমকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। উদয়না-চার্য্য “তাৎপর্য্যপরিত্তিক্তি” টীকায় ইহার নীমাংসা করিয়াছেন যে, “অর্থাভ্যাপগমযোগাধুপ্রদানভাবস্ত বিবক্ষাতত্ত্বত্বং।” অর্থাৎ কেহ পদার্থের প্রাধান্য, কেহ তাহার অভ্যাপগমের প্রাধান্য বিবক্ষা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন, ফলে উহা একই কথা। উহাতে কোন বিরোধ হয় নাই। সিদ্ধান্তের ভেদ থাকিলে অথবা সর্ববিষয়ে সকলের ঐকমত্য সম্ভব হইলে বিচারপ্রবৃত্তি অসম্ভব, এ কথা ভাষ্যকার পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছেন।



ভাষ্য । অথাবয়বাঃ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ সিকান্তনিক্রপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) অবয়বগুলি (নিরূপণ করিয়াছেন) ।

**সূত্র । প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়-নিগমনাত্তবয়বাঃ ॥৩২॥**

অনুবাদ । (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, (৫) নিগমন, ইহারা অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচটি বাক্য “অবয়ব” ।

বিস্তৃতি । অনুমান প্রমাণ সামান্যতঃ দ্বিবিধ । স্বার্থ এবং পরার্থ । নিজের তত্ত্ব-নিশ্চয়ের জন্ত যে অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে স্বার্থানুমান । যেখানে নিজের এক পক্ষের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রতিবাদী তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ প্রকাশ করিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় জন্মাইয়াছে, সেখানে মধ্যস্থদিগের নির্ণয়ের জন্ত অথবা প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার জন্ত যে অনুমান-প্রমাণ আশ্রয় করা হয়, তাহাকে পরার্থানুমান বলে । এই “পরার্থ” শব্দের দুই প্রকার অর্থের ব্যাখ্যা আছে । “পরার্থ” বলিলে বুঝা যায়, পরের জন্ত । পরের জন্ত অর্থাৎ মধ্যস্থের জন্ত, মধ্যস্থের নির্ণয়ের জন্ত । অথবা (২) পরের জন্য কি না প্রতিবাদীর জন্ত, অর্থাৎ প্রতিবাদীর পরাজয়ের জন্ত । কিন্তু যে বিচারে মধ্যস্থ নাই, কেবল তত্ত্বনির্ণয় উদ্দেশ্য করিয়া গুরু-শিষ্য প্রভৃতি যে বিচার করেন, সেই “বাদ”বিচারে প্রতিবাদীর পরাজয় উদ্দেশ্য না থাকায় এবং মধ্যস্থ না থাকায় সেই স্থলীয় অনুমান পূর্ণোক্ত দ্বিবিধ ব্যাখ্যাহুসারে “পরার্থ” হইতে পারে না । যদি বলা যায় যে, যে অনুমান প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থকে বুঝাইবার জন্ত, তাহাই “পরার্থানুমান”, তাহা হইলে “বাদ”-বিচারের পরার্থানুমানও ঐ কথার দ্বারা পাওয়া যায় । “বাদ”বিচারে মধ্যস্থ না থাকিলেও প্রতিবাদী অবশ্য থাকিবে । প্রতিবাদী না থাকিলে কোন বিচারই হয় না । তবে “বাদ”বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষা না থাকায় মধ্যস্থের আবশ্যকতা নাই ।

কিন্তু যে বিচারে বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষু, যে কোনরূপে নিজের বিপক্ষকে পরাজিত করার জন্ত যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেখানে বিচার্য বিষয়ে বিজ্ঞতম নিরপেক্ষ এবং উভয় পক্ষের সম্মানিত মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক । সমাপতি সেই মধ্যস্থ নিয়োগ করিবেন । উপযুক্ত মধ্যস্থ না থাকিলে এবং কোন বিশিষ্ট নিয়মের অধীন না থাকিয়া বিচার করিলে, সে বিচারে অনেক প্রকার গোলাবোগ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এবং ঘটয়াই থাকে । এ জন্ত মহর্ষি গোতম সেই বিচারের একটি বিশিষ্ট নিয়মবন্ধনের জন্ত “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য-বিশেষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । যথাক্রমে ঐ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের সমষ্টিকে পরবর্তী ছায়াচাষণ “জায” নামে উল্লেখ করিয়াছেন । “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য ঐ “জায” নামক বাক্যসমষ্টির পাঁচটি অংশ, তাই উহাদিগকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে (প্রথম সূত্র-ভাষ্যে অবয়ব-ব্যাখ্যা প্রদর্শিত) । ফলকথা, বিচারে নিজের পক্ষটি বুঝাইতে এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ



উপস্থিত করিতে যে সকল বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই বাক্যগুলিই “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে বাক্যের দ্বারা পরের হেতুর দোষের উল্লেখ করা হইবে, অথবা প্রতিবাদীর উল্লিখিত দোষের নিরাকরণ করা হইবে, সে সকল বাক্য “অবয়ব” নামে কথিত হয় নাই। মহর্ষির পঞ্চাবয়বের লক্ষণগুলি দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি এই স্বত্বের দ্বারা তাঁহার “অবয়ব” পদার্থের বিভাগ অর্গাৎ বিশেষ নামগুলির উল্লেখ করিলেও এই স্বত্বের দ্বারা “অবয়বের” সামান্য লক্ষণেরও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, পদার্থের সামান্য লক্ষণ ব্যতীত তাহার বিভাগ হইতে পারে না। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ এই “অবয়ব” পদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা প্রচুর বুद्धিমত্তা ও দাঁকুশলতার পরিচয় দিলেও মহর্ষির এই স্বত্বের দ্বারা বুঝা যায় যে, “প্রতিজ্ঞা” প্রকৃতি পক্ষ বাক্যের অন্ততমত্বই “অবয়বের” সামান্য লক্ষণ এবং যথাক্রমে উচ্চারিত “প্রতিজ্ঞা” প্রকৃতি পক্ষবাক্যের সমূহত্বই বাক্যরূপ স্বত্বের সামান্য লক্ষণ। মহর্ষি-স্বত্বে ইহাই যেন সূচিত হইয়াছে। মূলকথা, পরার্থানুমানকে যেমন “জ্ঞায়” বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমান “প্রতিজ্ঞা” প্রকৃতি যে পাঁচটি বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়, ঐ পক্ষ বাক্যের সমষ্টিকেও “ন্যায়” বলা হইয়াছে। যথাক্রমে উচ্চারিত ঐ প্রতিজ্ঞাদি পক্ষ বাক্যের সমষ্টিতেই এই “ন্যায়” শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। উহাদিগের এক একটি বাক্য “ন্যায়” নামে ব্যবহৃত হয় না। প্রতিজ্ঞাদি এক একটি বাক্য ন্যায়ের “অবয়ব” নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরার্থানুমান প্রতিক্সাদি পক্ষ বাক্যের যে ভাবে প্রয়োগ হয়, তাহার একটা উদাহরণ দেবাইতেছি। নৈয়ায়িক শব্দকে অনিত্য বলেন, নীমাংসক শব্দকে নিত্য বলেন। উভয় পক্ষ জিগীষাবশতঃ স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন করিয়া বিচার করিবেন। সভার আহ্বান হইল, উপযুক্ত মধ্যস্থের নিরোধ হইল। বাদী নৈয়ায়িক, নীমাংসক তাঁহার প্রতিবাদী। মধ্যস্থ প্রথমে বাদী নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করিবেন,—“তোমার সাধনীয় কি?” অর্থাৎ তুমি কি প্রতিপন্ন করিতে চাও। তখন বাদী নৈয়ায়িক প্রথমেই বলিবেন—(১) “শব্দ অনিত্য”। এখানে “শব্দ অনিত্য”

১। প্রতিজ্ঞা প্রকৃতি পাঁচটি বাক্য বিলিত হইয়া একবাক্যতা লাভ করতঃ একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে। ঐ বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদক মহাবাক্যকেই “জ্ঞায়” বলে। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য সম্বোধকে ঐ মহাবাক্যের অঙ্গ বা অবয়ব। এই প্রাচীন বক্ত উদ্যোতকতের কথোত্তর পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানপিকার ক্ষেপে এই প্রাচীন বক্তকেই আশ্রয় করিয়া “জ্ঞায়” ও “অবয়বের” লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ রবুনাথ শিখোমণি গঙ্গেশের “জ্ঞায়” ও “অবয়বের” লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে গঙ্গেশের অবলম্বিত চিরপ্রচলিত মতের প্রতিবাদই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“উচিতানুগুণীকপ্রতিজ্ঞাদিপক্ষসম্বন্ধাৎ জ্ঞায়ত্বম্”। অর্থাৎ যথাক্রমে “প্রতিজ্ঞা” প্রকৃতি “নিগমন” পর্যন্ত বাক্যের সমষ্টিকেই “ন্যায়”। উহারা বিলিত হইয়া কোন একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না, ইহা রবুনাথ বুঝাইয়াছেন। রবুনাথ “অবয়বের” প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন—“ন্যায়ান্তর্গতত্ব সতি প্রতিজ্ঞাব্যাপ্যত্বম্”। অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্ততমই “অবয়ব”। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উহাই বলিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, নব্য নৈয়ায়িক রবুনাথ প্রকৃতিও মহর্ষি-স্বত্বের একপ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।



এই বাক্যটির নাম "প্রতিজ্ঞা"। ঐ বাক্যটি নৈয়ায়িকের সাধ্যনির্দেশ; হুতরাং উহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাহার পরে মধ্যস্থ পুনর্বার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি কি হেতুর দ্বারা তোমার মত সংস্থাপন করিবে? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহার হেতু কি? কোন পদার্থ শব্দে অনিত্যত্বের সাধক বা জ্ঞাপক? তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন যে, (২) "উৎপত্তিবর্ধকত্ব জ্ঞাপক"। নৈয়ায়িকের এই বাক্যটির নাম "হেতু" অর্থাৎ "হেতু" নামক দ্বিতীয় অবয়ব। পরে মধ্যস্থ পুনর্বার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, উৎপত্তিবর্ধকত্ব থাকিলেই যে সেখানে অনিত্যত্ব থাকিবে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তিরূপ বর্ধ আছে, তাহারা যে অনিত্যই হইবে, ইহা কিরূপে বুঝিবে? এতদ্বত্তরে তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন,—(৩) "উৎপত্তিবর্ধক বটাদি দ্রব্যকে অনিত্য দেখা যায়" অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তিরূপ বর্ধ আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্যই হইবে, ইহা উৎপত্তিবর্ধক বহু পদার্থ দেখিয়া নিশ্চয় করা গিয়াছে। নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত তৃতীয় বাক্যের নাম "উদাহরণবাক্য"। পরে মধ্যস্থ বাদীকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আচ্ছা, উৎপত্তিবর্ধক বস্তুমানই অনিত্য, ইহা বুঝিলাম, তাহাতে শব্দ অনিত্য হইবে কেন? এতদ্বত্তরে বাদী নৈয়ায়িক তখন বলিবেন—(৪) "শব্দ সেই প্রকার উৎপত্তিবর্ধক"। অর্থাৎ বটাদি পদার্থ যেমন উৎপত্তিবর্ধক, তদ্রূপ শব্দও তাদৃশ উৎপত্তিবর্ধক। নৈয়ায়িকের এই চতুর্থ বাক্যটির নাম "উপনয়"। তাহার পরে মধ্যস্থ বলিবেন যে, তুমি এ পর্য্যন্ত বাহা বলিলে, তাহা এক কথায় উপসংহার করিয়া বল। তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন—(৫) "সেই উৎপত্তিবর্ধকত্বহেতুক শব্দ অনিত্য"। নৈয়ায়িকের এই পঞ্চম বাক্যটির নাম "নিগমন"। এই প্রণালীতে শেষে নীমাংসকও আত্মপক্ষ স্থাপন করিবেন।

এইরূপ বিচারে মধ্যস্থের সংশয়বশতঃ জিজ্ঞাসা জন্মে। ঐ সংশয় নিরাস করিতে তর্ক আবশ্যক হয়। প্রমাণই তব্বনিশ্চয় জন্মায়। প্রমাণের তদ্বিষয়ে সামর্থ্য আছে। তদ্ব নিশ্চয়ই প্রমাণের বল। পূর্বোক্ত সংশয় প্রভৃতি পাঁচটিকেও কোন নৈয়ায়িক সম্ভ্রাদায় অবয়বের মধ্যে গণ্য করিয়া অবয়ব দশটি বলিতেন। কিন্তু "সংশয়", "জিজ্ঞাসা", "তর্ক", "প্রমাণের তব্বনিশ্চয়-সামর্থ্য" এবং "তব্বনিশ্চয়"—এই পাঁচটি বাক্য নহে, হুতরাং উহার জ্ঞানবাক্যের অবয়ব হইতে পারে না। বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে, এ জন্ত মহাবি প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যকেই "অবয়ব" বলিয়াছেন।

ভাষ্য। দশাবয়ববানেকে নৈয়ায়িকা বাক্যে সঞ্চকতে। জিজ্ঞাসা, সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঃ, প্রয়োজনং, সংশয়ব্যাধাস ইতি। তে কস্মামোচ্যন্ত ইতি। তত্রাপ্রতীয়মানেহর্থে প্রত্যয়ার্থস্ত প্রবর্তিকা জিজ্ঞাসা। অপ্রতীয়মানমর্থং কস্মাজিজ্ঞাসতে? তং তত্ত্বতো জ্ঞাতং হাস্তামি বা উপাদাশ্চে, উপেক্ষিষ্যে বেতি। তা এতা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়স্তত্ত্বজ্ঞান-



স্বার্থস্তুদর্থময়ঃ জিজ্ঞাসতে । সা খন্নিয়মসাধনমর্থশ্চেতি । জিজ্ঞাসাধিষ্ঠানং সংশয়শ্চ ব্যাহতধর্মোপসংঘাতাৎ তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্নঃ । ব্যাহতয়োহি ধর্ময়োরন্যতরং তত্ত্বং ভবিতুমর্হতীতি । স পৃথগুপদির্কৌহপ্যসাধনমর্থশ্চেতি । প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগম্যার্থানি, সা শক্যাপ্রাপ্তির্ন সাধকস্য বাক্যস্য ভাগেন যুজাতে প্রতিজ্ঞাদিবদिति । প্রয়োজনং তদ্ব্যবধারণমর্থসাধকস্য বাক্যস্য কলং নৈকদেশ ইতি । সংশয়বৃদ্ধাসঃ প্রতিপক্ষোপবর্জনং, তৎ প্রতিষেধে তদ্ব্যভ্যুজ্ঞানার্থং, ন ত্বয়ং সাধকবাক্যৈকদেশ ইতি । প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থ্য অবধারণীয়ার্থোপকারাৎ । তত্ত্বসাধকভাবাতু প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সাধকবাক্যস্য ভাগা একদেশা অবয়বা ইতি ।

অনুবাদ । অতু নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় বাক্যে ( শ্রায় নামক বাক্যে ) দশটি অবয়ব বলেন । ( তন্মধ্যে গৌতমোক্ত পাঁচটি হইতে অতিরিক্ত পাঁচটি ভাষ্যকার বলিতেছেন ) (১) জিজ্ঞাসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যাপ্রাপ্তি, (৪) প্রয়োজন, (৫) সংশয়বৃদ্ধাস । ( প্রশ্ন ) সেগুলি অর্থাৎ অতু নৈয়ায়িক-সম্মত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটি অবয়ব ( মহাবি গৌতম ) কেন বলেন নাই ?—(জিজ্ঞাসা প্রভৃতির ব্যাখ্যান পূর্বক ইহার কারণ প্রকাশ করিতেছেন) তন্মধ্যে (জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটির মধ্যে) অপ্রতীয়মান (সামান্যতঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষতঃ অজ্ঞায়মান) পদার্থ বিষয়ে প্রত্যয়ার্থের অর্থাৎ ঐ পদার্থের বিশেষ তদ্ব্যবধারণের প্রয়োজন হানাদিবুদ্ধির প্রবর্তিকা (উৎপাদিকা) জিজ্ঞাসা । (প্রশ্নোত্তরমুখে এই কথার বিশদার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন) অজ্ঞায়মান পদার্থকে কেন জিজ্ঞাসা করে ? (উত্তর) যথার্থরূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে—অর্থাৎ ঐ অজ্ঞায়মান পদার্থকে বিশেষরূপে জানিয়া ত্যাগ করিব অথবা গ্রহণ করিব অথবা উপেক্ষা করিব, এই জ্ঞাত । সেই এই হানবুদ্ধি, গ্রহণবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগাদি করে, সেই বুদ্ধি) তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নিশ্চয়ের প্রয়োজন । সেই নিমিত্ত জ্ঞাতা ব্যক্তি (বিশেষতঃ অজ্ঞায়মান পদার্থকে) জিজ্ঞাসা করে । সেই এই “জিজ্ঞাসা” অর্থের সাধক (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের শ্রায় পরপ্রতিপাদক) নহে । (অর্থাৎ এই জ্ঞাতই জিজ্ঞাসা শ্রায়ের অবয়ব হইতে পারে না ।) জিজ্ঞাসার মূল সংশয়ও বিরুদ্ধ ধর্মস্বয়ের সম্বন্ধ প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন (নিকটবর্তী) । যেহেতু, বিরুদ্ধ ধর্মস্বয়ের একটিই তত্ত্ব হইতে পারে । সেই “সংশয়” (মহাবি কর্তৃক) পৃথক্



উপদিষ্ট হইলেও অর্থের সাধক (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা পরপ্রতিপাদক) নহে। (অর্থাৎ এই জন্মই সংশয় দ্বারার অবয়ব হইতে পারে না)।

প্রমাণগুলি প্রমাতার প্রমেয়-বোধার্থ। সেই “শকাপ্রাপ্তি” অর্থাৎ প্রমাতা ও প্রমাণগুলির প্রমেয়-বোধ-জনন-শক্তি প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা সাধক অর্থাৎ পরপ্রতিপাদক বাক্যের অংশের সহিত যুক্ত হয় না (অর্থাৎ এই জন্মই “শকাপ্রাপ্তি” দ্বারার অবয়ব হইতে পারে না)। তত্ত্ব-নিশ্চয়রূপ প্রয়োজন অর্থ-সাধক বাক্যের (পরপ্রতিপাদক দ্বারা-বাক্যের) ফল, একদেশ নহে। (অর্থাৎ এই জন্মই প্রয়োজন দ্বারার অবয়ব হইতে পারে না)। “সংশয়বুদ্ধ্যাস” বলিতে প্রতিপক্ষোপবর্জন, অর্থাৎ প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের কথন, প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের নিষেধ হইলে, তাহা (প্রতিপক্ষোপবর্জন) তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ প্রমাণের অভ্যন্তরীণ নিমিত্ত। ইহা (সংশয়বুদ্ধ্যাস) কিন্তু সাধকবাক্যের (পরপ্রতিপাদক দ্বারা-বাক্যের) একদেশ (অংশ) নহে। (অর্থাৎ এই জন্মই “সংশয়বুদ্ধ্যাস” দ্বারার অবয়ব হইতে পারে না)। প্রকরণে অর্থাৎ বিচার-প্রযুক্তিতে কিন্তু অবধারণীয় পদার্থের উপকারিত্ব প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি (পূর্বোক্ত পাঁচটি) সমর্থ অর্থাৎ আবশ্যিক। পদার্থ-সাধক অর্থাৎ পরপ্রতিপাদক প্রযুক্ত কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি (গোতমোক্ত পাঁচটি) সাধক-বাক্যের অর্থাৎ দ্বারা-বাক্যের ভাগ, একদেশ, অবয়ব।

উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, অবয়বের সংখ্যাবিশেষে অন্তান্ত মতগুলি ভ্রান্ত, ইহা সূচনা করিবার জন্মই অর্থাৎ অবয়বের সংখ্যা-নিয়মের জন্মই জ্ঞানার্চ্য মহর্ষি গোতম এই বিভাগ-সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু ইহা কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল দশাবয়ববাদেই এখানে উল্লেখ করিয়া তাহার অসঙ্গতি দেখাইয়াছেন।

ভাষ্যকারের দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রকৃত পরিচয় এখন নিতান্ত দুর্বল হইয়াছে। উদ্যোতকের প্রভৃতি প্রাচীনগণ তাহাদিগের বিশেষ বাক্য কিছু বলিয়া যান নাই। “তর্কিকরক্ষা”-কার বরদব্রাহ্ম এবং তাহার টীকাকার ময়িনাথ এবং “জ্ঞানদার” গ্রন্থকার প্রভৃতি দশাবয়ববাদী-দিগকে প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রাচীন নৈয়ায়িক কাহারো, ইহা কেহ বলেন নাই। ষষ্ঠ-পূর্ববর্তী “ভাস” কবির “প্রতিমা” নাটকে মেঘাতিথির জ্ঞানশাস্ত্রের সংবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। “চরকসংহিতা”র গোতমের উক্ত ও অন্তত জ্ঞান অনেক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু দশাবয়ববাদ তাহাতেও নাই।

অবশ্য কেহ বলিয়া বলিতে পারেন যে, মহর্ষি গোতমের পূর্ববর্তী জ্ঞানার্চ্যগণ অথবা তন্মধ্যে কোন জ্ঞানার্চ্য “দশাবয়ববাদী” ছিলেন। মহর্ষি গোতম ঐ মতের অসঙ্গতি বুঝিয়া “পঞ্চাবয়ব-



জ্ঞানবিদ্যা"র প্রবর্তন করিয়াছেন। তখন হইতে গৌতমের বিস্তৃত ও সুপ্রণালীবদ্ধ হ্রদগুলিই জ্ঞানবিদ্যার মূলগ্রন্থরূপে প্রচলিত ও সনাদিত হইয়াছে।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, সৰ্ব্ববিদ্যার প্রদীপ "জ্ঞানবিদ্যা" অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিদ্যার গণনায় ঐতিহ্য বলিয়াছেন,—“জ্ঞানো নীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাবি”। ছান্দোগ্যোপনিষদে “বাক্যো বাক্য” অর্গাৎ তত্বশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বৃহদারণ্যকে “হৃত্র” গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অস্বীকার করেন যে, বৈদিক যুগের ঐ সকল হৃত্রই সংকলিত ও পরিবর্তিত হইয়া পরে পাণিনিহৃত্র ও গৃহ্যদিহৃত্র এবং জ্ঞানাদি দর্শনহৃত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। সে বাহা হউক, এখন প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি গৌতমের পূর্বে জ্ঞানবিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্তক কোন আচার্য থাকিলে, মহর্ষি গৌতম অবশ্যই তাঁহার নামাদির উল্লেখ করিতেন। বেনাঙ্কহৃত্র প্রভৃতির জ্ঞান জ্ঞানহৃত্রে বিভিন্নমতবাদী কোন আচার্যের নামাদির উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যায়, মহর্ষি গৌতমই সৰ্ব্বপ্রথম হৃত্রসমূহের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জ্ঞান-তত্বসমূহের গ্রন্থন করেন। তাঁহার পূর্বে হইতে জ্ঞানবিদ্যা থাকিলেও, তিনিই জ্ঞানবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, দর্শনকার ঋষি—ইহাই চির-প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। তাঁহার পূর্বে বা সমকালে দশাবয়ববাদী জ্ঞান্যচার্য কেহ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যদি কল্পনার আশ্রয়েই একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অল্পরূপ কল্পনাও সম্ভব কি না, তাহাও চিন্তা করা উচিত।

আমার মনে হয়, বাৎস্তায়নের পূর্বে বাহার বিস্তৃত, কম্বিত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানহৃত্রের সাহায্যে এবং কল্পনার আশ্রয়ে জ্ঞানবিদ্যার রচনা করিয়া গৌতমীয় জ্ঞানমতের প্রচার করতঃ কোন মতে সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারাই দশাবয়ববাদের উদ্ভাবক। ঐ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সর্বাংশে প্রকৃত গৌতম মত জানিতেন না। অনেক নূতন হৃত্র ও নূতন মতের কল্পনা করিয়া তাহা গৌতম মত বলিয়াই প্রচার করিতেন। তাহারাই গৌতমীয় পঞ্চাবয়বসিদ্ধান্তে ভ্রান্ত ছিলেন, তাই প্রকৃত গৌতম-মতপ্রতিষ্ঠাকামী বাৎস্তায়ন অবরব বিষয়ে এখানে তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। অবরব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইলে, উদ্যোক্ত-করের জ্ঞান তিনি এখানে নীমাংসক মতেরও উল্লেখ করিতেন। ফলতঃ বাৎস্তায়ন এখানে অল্প কোন মতের উল্লেখ না করিয়া, কেবল অপ্রসিদ্ধ দশাবয়বমতের উল্লেখপূর্বক তাহার অল্পপণ্ডিত প্রদর্শন কেন করিয়াছেন? ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অবরব-সংখ্যাবিষয়ে অজ্ঞান মতের জ্ঞান দশাবয়বমতটি প্রসিদ্ধ হইলে, অজ্ঞান প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা বাইত। প্রাচীন ত্রিধরার্গ্যও বৈশেষিক গ্রন্থ “জ্ঞান-কন্দলী”তে প্রশস্তগাদের পঞ্চাবয়বব্যাপ্যার বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াও দশাবয়বমতের উল্লেখ করেন নাই। কারণ, উহা কোন প্রবল ও প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের মত নহে। অপ্রসিদ্ধ এবং দুর্বল মত হইলেও প্রকৃত গৌতম-মত-প্রতিষ্ঠার জন্য ভাব্যকার বাৎস্তায়ন উহার উল্লেখপূর্বক অল্পপণ্ডিত প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনে হয়, “তাকিকরক”-কার বরদরাজ প্রভৃতিও পরে এইরূপ কল্পনার বলেই দশাবয়ববাদীদিগকে প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎস্তায়ন জ্ঞানহৃত্রের উদ্ধার পূর্বক অপূর্ণ ভাষা রচনা করিলে, ঐ প্রাচীন



নৈয়ায়িকদিগের সংগ্রহগ্রন্থগুলি অনাদৃত হইয়া ক্রমে বিলুপ্ত হওয়ায়, উদ্যোতকর প্রভৃতিও তাঁহাদিগের বিশেষ পরিচয় পান নাই। তাঁহারা কোনও প্রসিদ্ধ বা প্রামাণিক গ্রন্থকার হইলে, কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অবশ্যই তাঁহাদিগের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত এবং বাংলায়নও তাঁহাদিগের নামাদির উল্লেখ করিতেন। ভাষাকারের “একে নৈয়ায়িকাঃ” এই কথাটির প্রতি মনোযোগ করিলেও দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকগণ প্রকৃত গৌতম সম্প্রদায় নহেন এবং উল্লেখানানা কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও নহেন, ইহা মনে আসে। ঐ স্থলে “একে” ইহার ব্যাখ্যা “অন্তে”। (“একে মুখ্যান্তকেবলাঃ”)।

ভাষ্যকার বাংলায়নের পূর্বে এক সময়ে গৌতমীয় জ্ঞানসূত্র নানা কারণে কপিল-সূত্রের জ্ঞান বিলুপ্ত, বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী মনীষিগণ নিজ মতানুসারে জ্ঞানসূত্রের পাঠান্তর করনা করিয়া নিজ মতের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ জৈন-ন্যায়গ্রন্থে বিদ্যমান। ভাষ্যকার বাংলায়নের উদ্ধৃত জ্ঞানসূত্র হইতে অতিরিক্ত কয়েকটি সূত্রও বৃত্তিকার বিখ্যাত জ্ঞানসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐগুলিকে তিনি জ্ঞানসূত্র বলিয়া কোথায় পাইলেন, তাহার ঐ ধারণার মূল কি, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাংলায়ন জ্ঞানসূত্রের উদ্ধার পূর্বক অপূর্ণ ভাষা রচনা করিয়া বাহাদিগকে জ্ঞান-তত্ত্ব বুঝাইয়া গিয়াছেন— বাংলায়নই বাহাদিগের জ্ঞানসূত্রার্থ-বোঝে আদিগুরু, তাহারাও অনেক বিষয়ে বাংলায়নের বিরুদ্ধ-মতবাদী হইয়াছেন কেন? ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিখ্যাত পর্য্যন্ত কেহই জ্ঞানসূত্রমণ্ড্যে “তত্ত্বজ্ঞানবাদব্যাখ্যাং” এইরূপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীনের মুখে ঐটি জ্ঞানসূত্র বলিয়া শুনা যায়। কেবল তাহাই নহে— শাস্তিপুরের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, নানা-গ্রন্থকার রাখানোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যরূপ “জ্ঞানসূত্র-বিবরণ” গ্রন্থে ঐ সূত্রটি চতুর্থাধ্যায়ের সর্বশেষে গৌতমসূত্ররূপে গৃহীত ও বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত দেখা যায়। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ঐটিকে জ্ঞানসূত্র বলিয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা ভাবিতে হইবে। তিনি প্রসিদ্ধি অনুসারে ঐটি জ্ঞানসূত্ররূপে গ্রহণ করিলেও, ঐ প্রসিদ্ধির মূল কোথায়? তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

মাধবাচার্য্যের “সংক্ষেপশঙ্করজয়” গ্রন্থের শেষে পাওয়া যায়, কোন দেশবিশেষে কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে গর্বের সহিত প্রশংসা করিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সর্বজ্ঞ হও, তবে কণাদের মুক্তি হইতে গৌতমের মুক্তির বিশেষ কি, ইহা বল; নচেৎ সর্বজ্ঞের পরিত্যাগ কর। তত্ক্ষণে ভগবান শঙ্করাচার্য্য গৌতমের মুক্তিতে আত্মস্তিক হুঃখ-নিবৃত্তির সহিত আনন্দ-সংবিত্ত থাকে, এই কথা বলিয়া সেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের নিকটে তাহার সর্বজ্ঞতায় পরিচয় দিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের ঐ কথার প্রামাণ্য না থাকিলেও, উহার মূল একটা স্বীকার করিতেই হইবে। অল্প বিষয়ে বাহাই হউক, দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে মাধবাচার্য্যের জ্ঞান ব্যক্তি ঐরূপ একটা অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। মনে হয়, বাংলায়নের পূর্বে গৌতম-মুক্তির ঐরূপ ব্যাখ্যাই ছিল। বাংলায়নই প্রথমতঃ মুক্তিবিশয়ে পূর্বপ্রচলিত ঐ গৌতম মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।



পৰবৰ্তী স্তাৰ্গাৰ্গাৰ্গণ গৌতম মুক্তিবিষয়ে বাৎস্তায়নেরই ব্যাখ্যার অনুসরণ করতঃ তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্তায়নের পূৰ্বে গৌতম মুক্তি-বিষয়ে পূৰ্বোক্ত মত বিশেষ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, বাৎস্তায়ন মোক্ষলক্ষণ-ভাব্যে বিস্তৃত বিচারপূৰ্বক এই মতের অনুপপত্তি দেখাইতে যাইতেন না, ইহা মনে হয়। লক্ষণ-প্রকরণে তাহার ঐরূপ বাদ-প্রতিবাদ আর কোন স্থানে নাই। মুক্তির লক্ষণবিষয়ে তিনি দেখানে আর কোন মতেরও উল্লেখপূৰ্বক প্রতিবাদ করেন নাই।

সে যাহা হউক, এখন মূল কথা এই যে, বাৎস্তায়নের পূৰ্ব হইতে তাহার বিকল্প গৌতমমত-ব্যাখ্যাত্ত নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ছিলেন, ইহা বুঝিবার প্রচুর কারণ আছে এবং বাৎস্তায়নের পূৰ্ব হইতেই মূল স্তায়সূত্রের অনেকাংশে বিকৃতি ও বিলোপ ঘটিয়াছিল, ইহাও বেশ বুঝা যায়। উদ্যোতকরের সূত্র-পরিচয় এবং বাচশ্চতি মিশ্রের “স্তায়-সূচীনিবন্ধ” প্রভৃতির প্রয়োজন চিন্তা করিলেও ঐ বুদ্ধি আরও স্পষ্ট হয়। বাৎস্তায়নের পূৰ্ববৰ্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক নৈয়ায়িকদিগের ব্যাখ্যাত্ত মত প্রকৃত গৌতম মত হউক বা না হউক, তাহাদিগের অনেক মত এবং তাহাদিগের সংগৃহীত বা কল্পিত অনেক সূত্র পরস্পরাগত হইয়া ব্যতিকার বিখনাথ প্রভৃতি কর্তৃক ব্যাখ্যাত্ত হইয়াছে। বিখনাথ প্রভৃতি নব্যগণ একেবারে অমূলক নূতন সূত্রের কল্পনা করিতে পারেন না। ফল কথা, বাৎস্তায়নের পূৰ্ববৰ্তী বা সমকালবৰ্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক প্রাচীন নৈয়ায়িকগণই দশাবয়ববাদের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা সম্ভবমান কি না, তাহা বলিতে পারি না। কল্পনার অক্ষকারে থাকিয়া তাহা ঠিক বলাও যায় না। তবে কল্পনা বা আলোচনা তত্ত্বনিৰ্ণায় সাহায্য করে, ইহা বলিতে পারি।

“প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটির স্থায় “জিজ্ঞাসা” প্রভৃতি পাঁচটিও যখন স্তায়সূত্র, তখন যথবি অবয়বের মধ্যে কেন তাহাদিগের উল্লেখ করেন নাই? এ প্রশ্নের উত্তর ভাব্যকারকে দিতে হইবে, তাই ভাব্যকার নিজেই সেই প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটির স্বরূপ-বর্ণন পূৰ্বক তাহারা স্তায়ের অবয়ব হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া গিয়াছেন।

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে সংশয় ও জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। সান্নিহিতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষতঃ অজ্ঞাত পদার্থে বিশেষ ধর্মের সংশয় হইলে, তাহাতে বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞাসা হয়। জিজ্ঞাসার ফলে প্রশ্নের দ্বারা পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তদ্বিষয়ে হানাদি বুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগাদি করে) জন্মে। তাই বলিয়াছেন—“প্রত্যগর্হিত্ত প্রবর্তিকা”। পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই এখানে “প্রত্যয়” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। হানাদি বুদ্ধিই তাহার “অর্গ” অর্গাৎ প্রয়োজন। “জিজ্ঞাসা” পরস্পরার ঐ প্রয়োজনের উৎপাদক। জিজ্ঞাসার মূল আবার “সংশয়”। সংশয়ে যে দুইটি বিকল্প ধর্ম বিষয় হয়, তাহার একটি তব্ব হইতে পারে, এ জ্ঞাত সংশয় তত্ত্বজ্ঞানের নিকটবৰ্তী। “শকাপ্রাপ্তি”র ব্যাখ্যার তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন,—“শকাৎ প্রশ্নেয়ং তত্ত্বিন্ প্রাপ্তিঃ শক্ততা প্রশ্নানান্য প্রশ্নাতুঃ”। অর্গাৎ প্রশ্নাতা ও প্রশ্নানের প্রশ্নের বোধজনন-শক্তিই “শকাপ্রাপ্তি”। “সংশয়বুদ্যাবে”র প্রসিদ্ধ নান “তর্ক”। “সংশয়ো বুদন্ততেহেনেন” ঐরূপ

ব্যুৎপত্তিতে ঐ কথার দ্বারা তর্ক বুঝা যায়। তর্কই সংশয় দূর করে। ভাষ্যকার ইহাকে বলিয়াছেন,—“প্রতিপক্ষোপবর্জন”। তাৎপর্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের বর্ণন। যেমন “যদি শব্দ নিত্য হয়, তবে জ্ঞান পদার্থ না হউক?”—এইরূপে অনিত্যত্বের প্রতিপক্ষ নিত্যত্বে হেতুর অভাব বর্ণন করিলে (অর্থাৎ ঐরূপ তর্কের দ্বারা) শব্দের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণ সমর্থিত হয়। প্রমাণের দ্বারা শব্দে নিত্যত্বের প্রতিবেশ হইলে, পুরোক্ত প্রকার তর্ক শব্দের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণকে সমর্থন করিয়া অনুজ্ঞা করে।

ভাষ্যে “তত্ত্বং জ্ঞায়তেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দের দ্বারা প্রমাণ বুঝিতে হইবে।

দশাবয়ববাদধাণ্ডনে ভাষ্যকারের মূল কথা এই যে, জ্ঞানের দ্বারা সাধ্যসাধন করিতে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা “জিজ্ঞাসা” প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থও নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটিও জ্ঞানের অঙ্গ। কিন্তু উহার যখন বাক্য নহে, পরপ্রতিপাদক নহে, তখন উহার কোন মতেই জ্ঞানের অবয়ব হইতে পারে না। বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে। পরন্তু জিজ্ঞাসা প্রভৃতি স্বরূপতঃই আবশ্যক হয় অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পক্ষবাক্যের দ্বারা উহাদিগের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। সুতরাং জিজ্ঞাসাদি-বোধক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ঐ বাক্যগুলিকে অবয়বরূপে কল্পনা করাও নিস্ত্রয়োজন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য নিজের জ্ঞান দ্বারা পরপ্রতিপাদক হয়; সুতরাং ঐ পাঁচটিই জ্ঞানবাক্যের “ভাগ” অর্থাৎ একদেশ বা অংশ বলিয়া “অবয়ব” নামে অভিহিত হইতে পারে। এ জ্ঞান মহাবি গোতন ঐ পাঁচটিকেই “অবয়ব” বলিয়াছেন। “চিন্তা-মণি”কার গঙ্গেশও “অবয়ব-নিরূপণে”র শেষে সংশয় ও প্রয়োজন প্রভৃতি জ্ঞানের অঙ্গ হইলেও বাক্য নহে বলিয়া অবয়ব নহে, এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, “কণ্টকোদ্ধার” সর্বত্র আবশ্যক হয় না, এ জন্য তাহা বাক্য হইলেও “অবয়ব” নহে। “নাশং হেতুভাসঃ” অর্থাৎ এইটি হেতুভাস নহে, এইরূপ বাক্যকে নবীন স্তায়াচার্যগণ “কণ্টকোদ্ধার” বলিয়াছেন। অজ্ঞাত কথার নিগমমূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগে ঐষ্টব্য (৩২ স্বঃ)।

ভাষ্য। তেবাস্তু যথাবিভক্তানাং।

সূত্র। সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥৩৩॥

অনুবাদ। যথাবিভক্ত সেই প্রতিজ্ঞাদি পূর্বোক্ত পঞ্চাবয়বের মধ্যে “সাধ্য-নির্দেশ” অর্থাৎ যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া কোন ধর্ম্মকে অনুমানের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে বাদী উপস্থিত হইয়াছেন, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম্মমাত্রের বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাপনোয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্ত পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ। অনিত্যঃ শব্দ ইতি।



অনুবাদ। প্রজ্ঞাপনীর ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্মের অর্থাৎ কোন ধর্মেতে যে ধর্মটিকে অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে স্থায় প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধর্মবিশিষ্ট সেই ধর্মের “পরিগ্রহ বচন” অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা যায়, এমন বাক্য, “প্রতিজ্ঞা”। (মহাশি এই অর্থেই বলিয়াছেন) প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশ<sup>১)</sup>। (উদাহরণ) “শব্দ অনিত্য” অর্থাৎ যেমন শব্দকে অনিত্য বলিয়া বুঝাইতে গেলে “শব্দ অনিত্য” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা হইবে।

বিবৃতি। পঞ্চমবয়সের প্রথম অবয়ব “প্রতিজ্ঞা”। বাদীর বক্তব্য কি? বাদী কি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন? ইহা সর্বাঙ্গে তাহাকে বলিতে হইবে। বাদী যে বাক্যের দ্বারা সর্বাঙ্গে তাহাই বলিবেন, সেই বাক্যটির নাম “প্রতিজ্ঞা”। বাদী তাহার ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যথাসক্তি চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাহা করিতেই হইবে এবং “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রকৃতি দোষে বাদী নিগৃহীত হইবেন, এই জন্ত বাদীর ঐ বাক্যের নাম “প্রতিজ্ঞা”। বাদী শব্দকে অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উপস্থিত হইলে সেখানে শব্দরূপ ধর্মেতে অনিত্যত্বরূপ ধর্মটিই তাহার প্রজ্ঞাপনীয়। কারণ, তাহা লইয়াই শব্দ-নিত্যতাবাদী নীমাংসকের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত। শব্দরূপ ধর্মী লইয়া তাহারও কোন বিবাদ নাই। শব্দ নামে একটা পদার্থ আছে, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। শব্দের অনিত্যতাবাদী নৈয়ায়িক মধ্যস্থের প্রপাশ্রমারে “অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দ” এইরূপ অর্থবোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা তাহার সাধ্য নির্দেশ হইবে। সুতরাং “শব্দ অনিত্য” এইরূপ বাক্য ঐ স্থলে “প্রতিজ্ঞা”। ঐ বাক্যের দ্বারা মধ্যস্থ বুঝিতে পারিবেন যে, “শব্দ অনিত্য”, ইহাই এই বাদীর সাধ্য, ইনি শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিতেছেন। এইরূপ পক্ষতে বহির সংস্থাপনে “পক্ষত বহিনান্” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। নহুযমাত্ত্বেরই বিনশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে “নহুযমাত্ত্ব বিনশ্বর” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপনে “আত্মা নিত্য” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। সর্বত্রই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের দ্বারা সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিমাত্ত্বের বোধ জন্মে। অতিরিক্ত আর কোন ধর্ম্মের বোধ হয় না। অতিরিক্ত কোন ধর্ম্মের উল্লেখ করিলে তাহা প্রতিজ্ঞা-বাক্য হইবে না; এই জন্ত “নিগমন-বাক্য” প্রতিজ্ঞা নহে। “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞার্থতির অতিরিক্ত অর্থেরও বোধ জন্মে। এইরূপ “স্ত্রা” প্রয়োগ উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু “শব্দ অনিত্য” এইরূপ বাক্য কেহ বলিলেন, সেখানে সেইরূপ বাক্যও “প্রতিজ্ঞা” হইবে না। জ্ঞানের অন্তর্গত পূর্বোক্তরূপ বাক্যই “প্রতিজ্ঞা”।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সূত্রস্থ “সাধ্য” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“প্রজ্ঞাপনীর ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী”। সূত্রস্থ “নির্দেশ” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“পরিগ্রহবচন”। “পরিগ্রহ” শব্দের অর্থ এখানে

১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই ভাষ্যে প্রতিজ্ঞালব্ধের ব্যাখ্যায় পরে “প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ” এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে বুঝিতে হইবে, ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞা-লব্ধের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে মহাশি যে ঐ অর্থেই “সাধ্যনির্দেশ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া প্রতিজ্ঞার লব্ধ বলিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।



বোধক, “বচন” শব্দের অর্থ বাক্য। “পরিগ্রহ-বচন” কি না—বোধক বাক্য। ইহার দ্বারা নির্দেশ করা অর্থাৎ বুঝান হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে হুত্রে “নির্দেশ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সাধ্যের নির্দেশ কি না—“পরিগ্রহ-বচন” অর্থাৎ সাধ্যের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা। ইহা সিদ্ধ নহে, ইহাকে বাদী সাধন করিবেন, তাহাকে “সাধ্য” বলে। শব্দ সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু তাহাতে অনিত্যতা ধর্মটি সিদ্ধ নহে; কারণ, প্রতিবাদী মায়াসক তাহা মানেন না, হুতরাং শব্দে অনিত্যতা ধর্মটি “সাধ্য”। নৈয়ায়িক তাহা সাধন করিবেন। শব্দ পূর্বসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনিত্যত্বরূপে পূর্বসিদ্ধ না থাকায় অনিত্যত্বরূপে শব্দকেও সেখানে “সাধ্য” বলা যায়। মহর্ষি গোতম এই অর্থেই এখানে এবং আরও অনেক হুত্রে “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত ধর্মরূপ সাধ্য অর্থেও মহর্ষি-হুত্রে “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ আছে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। “উদাহরণ-হুত্রে”—ভাষ্যে ভাব্যকারও “সাধ্য” শব্দের দ্বিবিধ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কল কথা, অহুমেয়-ধর্ম বা সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মকে প্রাচীনগণ “সাধ্যধর্মী” বলিতেন। এই হুত্রে সেই সাধ্যধর্মী অর্থেই মহর্ষি “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মরূপ যে “সাধ্য”, তাহার “নির্দেশ” অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র তাহাই বুঝা যায় এবং ভাব্যবাদী তাহা বুঝিয়া থাকেন, সেই বাক্যই “প্রতিজ্ঞা”। “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধনীয় ধর্মকে বুঝিয়া, সাধ্য ধর্মের নির্দেশকে প্রতিজ্ঞা বুলিলে পূর্বোক্ত হলে কেবল “অনিত্যত্ব” এইরূপ বাক্যও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইরূপ বাক্য “প্রতিজ্ঞা” হইবে না। তব্চিত্তা-মণিকার গঙ্গেশ সর্বত্র সাধ্য ধর্ম অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, হুতরাং সেই অর্থে “সাধ্যের” নির্দেশকে পূর্বোক্ত দোষবশতঃ “প্রতিজ্ঞা” বলিতে পারেন নাই। তিনি “সাধ্যনির্দেশ প্রতিজ্ঞা নহে,” এই কথা বলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে “প্রতিজ্ঞা”র লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘতিকাধর রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে মহর্ষির এই প্রতিজ্ঞার লক্ষণ-হুত্রে উদ্ধারপূর্বক মহর্ষি-হুত্ৰানুসারে “সাধ্য” শব্দের পূর্বোক্ত সাধ্য ধর্মী অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াই মহর্ষিপ্রাপ্ত প্রতিজ্ঞা লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন<sup>১</sup>। শেষে তিনি নিজেও স্বাধীনভাবে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন।

১। পরিগ্রহভেদেনেতি পরিগ্রহঃ স চ বচনকেতি পরিগ্রহবচনম্।—(ভাষ্যটীকা)।

২। “তত্ত্বচিন্তামণি”র অবধা প্রকাশে দীর্ঘতিকাধর রঘুনাথ শিরোমণি মহর্ষি গোতমের প্রতিজ্ঞালক্ষণ-হুত্রে উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করায়, সেখানে দীর্ঘতিকাধর গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, গঙ্গেশ মহর্ষিপ্রাপ্ত প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের গুণন করিয়াছেন। দীর্ঘতিকাধর রঘুনাথ মহর্ষি-হুত্রে “সাধ্য” শব্দের বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিয়া, মহর্ষির প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের নির্দেশের সমর্থন করিয়াছেন। আবার মনে হয়, গঙ্গেশ মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞালক্ষণের সোম প্রদর্শন করিতে যান নাই। তিনি সেখানে এইমাত্র বলিয়াছেন,—“তত্র প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ সাধ্যপদেহতিব্যাপ্তোঃ”। ইহার দ্বারা গঙ্গেশ মহর্ষি-লক্ষণের সোম প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। গঙ্গেশ অহুমেয় ধর্ম অর্থেই সর্বত্র “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার ইরূপ প্রয়োগের কারণও আছে। সাধ্যের ব্যাপ্তিনিরূপণে অহুমেয় ধর্মরূপ সাধ্যই গ্রাহ্য। হুতরাং ঐ অর্থে “সাধ্যনির্দেশ” প্রতিজ্ঞা বলা যায় না, ইহাই গঙ্গেশের ভাষণার্থ। গঙ্গেশ মহর্ষির প্রতিজ্ঞালক্ষণটি উদ্ধৃত করিয়া ইরূপ কথা বলেন নাই। তিনি মহর্ষিপ্রাপ্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণের ব্যাখ্যা করায় আবশ্যক মনে করেন নাই। তবে গঙ্গেশ যে ভাবে, যে ভাষায়



প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ তাঁহার “পদার্থধর্মসংগ্রহে” প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন,— “অনুমেরোদ্যোশেহবিরোধী প্রতিজ্ঞা”। অনুমানের দ্বারা যে ধর্মটি প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই ধর্মবিশিষ্ট ধর্মাই তাঁহার মতে “অনুমের” এবং তাহারই নাম “পক্ষ”। যেমন পর্ত্তে বহির্ঘর্ম প্রতিপাদনের ইচ্ছা হইলে সেখানে “বহির্ঘর্মবিশিষ্ট পর্ত্তেই” অনুমের বা পক্ষ। “অনুমের” কি? এই বিষয়ে প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল। সে সকল মত বখাসম্ভব অনুমান-সূত্র-ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, “পর্ত্তো বহিমান্ ন বা” এইরূপ বিপ্রতি-পত্তি-বাক্য এবং “পর্ত্তো বহিমান্” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বখন অভেদ সম্বন্ধে পর্ত্তে “বহিমান্”কেই বুঝা যায় অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়জ্ঞাত বোধে বখন বহির্ঘর্ম বিশেষণ হয় না, “বহিমান্”ই বিশেষণ হয়, তখন ঐরূপ প্রতিজ্ঞাস্থলে “বহিমান্”ই সাধ্য, বহির্ঘর্ম সাধ্য নহে। অবশ্য ব্যাখ্যায় দীর্ঘত্বিকার রত্ননাথ এই মতের উল্লেখ করিয়া ইহার প্রকরণ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোধী” এই কথাটি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা “প্রত্যক্ষবিকল্প”, “অনুমানবিকল্প”, “স্বপ্নাবিকল্প” এবং “স্ববচনবিকল্প” প্রতিজ্ঞাভাস-গুলি নিরাকৃত হইয়াছে। “জায়কন্দলী”কার শ্রীধর ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, বাদী যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই “সাধ্য” হইবে না। যাহা সাধনের যোগ্য, তাহাই সাধ্য, তাহারই নাম “পক্ষ”, তদ্বতির “পক্ষাভাস”। বাদী যদি নিজের ভ্রমবশতঃ প্রত্যক্ষানি-বিকল্প কোন পদার্থ সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতিজ্ঞার জায় কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য “প্রতিজ্ঞা” হইবে না; উহার নাম “প্রতিজ্ঞাভাস”। তাই প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোধী” এই কথাটি বলিয়াছেন।

“জায়মহরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, “প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম”ই তখন মহাবি-সূত্রোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ এবং তাহার “নির্দেশ”কেই মহাবি প্রতিজ্ঞা বলিয়াছেন, তখন “প্রতিজ্ঞাভাস”গুলিতে প্রতিজ্ঞার লক্ষণই নাই, সুতরাং প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোধী” অথবা ঐরূপ কোন কথা বলা নিপ্রয়োজন, তাই মহাবি গোতম তাহা বলেন নাই।

“অগ্নি অনুক্ষ” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া হেতু প্রকৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে সেখানে ঐ বাক্যটি “প্রত্যক্ষ-বিকল্প প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। প্রথম সূত্র-ভাষ্যে “জায়ভাসের” উদাহরণ ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলা হইয়াছে। সেখানে বোদ্ধ নৈয়ায়িক দিগ্‌নাগের কথাও বলা হইয়াছে।

ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মহাবির প্রতিজ্ঞালক্ষণের স্পষ্টতা জন্ম হইতে পারে, এই জন্ত সেখানে কুরবর্ণী রত্ননাথ পিরোমণি মহাবির প্রতিজ্ঞালক্ষণ-সূত্রটির উল্লেখ করিয়া তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। রত্ননাথ গবেষণের জন্য প্রবর্ত্তন করেন নাই, তিনি অন্তের জন্য লজ্জাবনা বুঝিয়া তাহারই নিরাস করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, গবেষণ মহাবির সূত্রার্থ বা বুঝিয়া, মহাবির জন্য প্রবর্ত্তন করিতে গিয়াছেন, ইং বলাতে ইচ্ছা হয় না, টীকাকার জয়দীপ ও বখুরানিও তাহা বলেন নাই। নৈয়ায়িকগণ এ কথাগুলি চিন্তা করিবেন।

“ভায়কন্দলী”কার প্রশস্তপাদোক্ত “অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাসের” উদাহরণ বলিয়াছেন,—  
 “গগনং নিবিড়ং” অর্থাৎ “গগন নিবিড়” এই বাক্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যে অনুমানের দ্বারা  
 গগন সিদ্ধ হইয়াছে, সেই অনুমানের দ্বারা গগন নিরবরূপ বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায় “গগন নিবিড়” এই  
 বাক্য “অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”। কারণ, নিরবরূপ পদার্থ নিবিড় হইতে পারে না। সাবয়ব  
 পদার্থই নিবিড় হইতে পারে।

কোন বৈশেষিক যদি বলেন,—“কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে”, তাহা হইলে তাহার  
 ঐ বাক্য “স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। কারণ, কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে  
 না, ইহাই বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

যদি কেহ বলেন,—“শব্দ বাচক নহে”, তাহা হইলে ঐ বাক্য “স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”  
 হইবে। কারণ, বাদী নিজেই শব্দের বাচক স্বীকার করিয়া অপরকে শব্দের দ্বারা অর্থ বুঝাইবার  
 ক্ষমতা ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

“স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ” এবং “স্ববচনবিরুদ্ধ” প্রতিজ্ঞাভাস অনুমানবিরুদ্ধই হইবে, ঐ দুইটির আবার  
 পৃথক্ উল্লেখ কেন? এইরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া “ভায়কন্দলী”কার বলিয়াছেন  
 যে, অন্তত তাহা হইলেও সর্বত্র তাহা হয় না। যেমন বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমস্ত পদার্থকেই “অণিক”  
 বলেন। কিন্তু কোন বৌদ্ধ যদি বলেন,—“সমস্ত পদার্থ অণিক”, তাহা হইলে দ্বিরবাদী অত  
 সম্প্রদায় উহাকে প্রমাণবিরুদ্ধ বলিতে পারেন না। সেখানে বৌদ্ধের ঐ বাক্য তাহার “স্বশাস্ত্র-  
 বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”, ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, কিন্তু স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ,  
 এমন প্রতিজ্ঞাভাস আছে। এইরূপ “স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”ও আছে।

কোন বৈশেষিক যদি বলেন, “শব্দ নিত্য,” তাহা হইলে দ্বিগ্‌নাগ বলিয়াছেন, উহা “আগম-  
 বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, বৈশেষিক আগমের  
 দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সাধন করেন না। কারণ, শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা এই উভয়বোধক  
 আগম থাকায় আগমার্থে সন্দেহবশতঃ বৈশেষিক প্রথমতঃ অনুমানকেই আশ্রয় করেন। শেষে  
 সেই অনুমানের দ্বারা শব্দের অনিত্যতা নির্ণয় করিয়া উহাই আগমার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন।  
 সুতরাং “শব্দ নিত্য”, এইরূপ বাক্য বৈশেষিকের পক্ষে “অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”ই হইবে;  
 উহা “আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে না।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্যকেও দ্বিগ্‌নাগ প্রভৃতি এক প্রকার “প্রতিজ্ঞাভাস” বলিয়াছেন, কিন্তু  
 উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্য দেখানে “প্রতিজ্ঞাভাস”  
 হইবে, সেখানে অবশ্য উহা কোন প্রমাণ-বিরুদ্ধই হইবে। সুতরাং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ নামে পৃথক্  
 এক প্রকার “প্রতিজ্ঞাভাস” কেন বলিব, তাহা বুঝি না। উদ্যোতকর এইরূপে দ্বিগ্‌নাগ-প্রদর্শিত  
 অনেক প্রকার “প্রতিজ্ঞাভাসের” উদাহরণ ধণ্ডন করিয়াছেন এবং দ্বিগ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ  
 নৈয়ায়িকগণের প্রতিজ্ঞালক্ষণেরও খণ্ডন করিয়াছেন। “ভায়বাস্তিকে” সেই সকল কথা দ্রষ্টব্য।

দ্বিগ্‌নাগ প্রভৃতির দ্বারা জরত ভট্টও “ভায়মঞ্জরী”তে আরও কতকগুলি “প্রতিজ্ঞাভাস”র



উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম “প্রতিজ্ঞাভাস” নামে পৃথক্ করিয়া আর কিছু বলেন নাই। ভাষাকার বাস্তবায়ন প্রথম স্বত্ব-ভাষ্যে “জ্ঞাভাস” বলিয়াই “প্রতিজ্ঞাভাস” বলিয়াছেন। কারণ, “প্রতিজ্ঞাভাস” হইলেই সেখানে “জ্ঞাভাস” হইবে, “জ্ঞাভাস” হইলেই “প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। পরবর্তী আচার্য্যগণ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যই “প্রতিজ্ঞাভাস”, “পক্ষাভাস” ইত্যাদি নামে “জ্ঞাভাস” বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি গোতম “ন্যাভাস” নাম করিয়াও কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল “হেতুভাস”ই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। “প্রতিজ্ঞাভাস” প্রভৃতির স্থলে সর্বত্র “হেতুভাস” থাকিবেই। সুতরাং “হেতুভাস” বলাতেই মহর্ষির ঐশ্বর্য্য বলা হইয়াছে। তদ্বদর্শী সূত্রকার মহর্ষি গোতম এই জন্যই “প্রতিজ্ঞাভাস” প্রভৃতি বলিয়া ধ্বংসের করেন নাই। অল্পত তট্টও শেষে ইহাই বলিয়াছেন,—

“অতএব চ শাস্ত্রেহগ্নিন্ দূর্নিনা তদ্বদর্শনা।

পক্ষাভাসাদয়ো নোক্তা হেতুভাসান্ত দর্শিতাঃ” ৷—৩৩

## সূত্র। উদাহরণসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ। উদাহরণের সহিত সমান ধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ কেবল দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মের যাহা কেবল সমান ধর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধনীয় পদার্থের সাধনবোধক বাক্যবিশেষ “হেতু” (সাধর্ম্ম্য হেতু নামক দ্বিতীয় অবয়ব)।

ভাষ্য। উদাহরণে সামান্যতাং সাধ্যস্ত ধর্ম্মস্ত সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতুঃ। সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্ম্মমুদাহরণে চ প্রতিসন্ধায় তস্ত সাধনতা-বচনং হেতুঃ। উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদিতি। উৎপত্তি-ধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধন কি না প্রজ্ঞাপন, অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের সাধনতাবোধক বাক্যবিশেষ হেতু (সাধর্ম্ম্যহেতু নামক দ্বিতীয় অবয়ব)। বিশদার্থ এই যে, সাধ্যে অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্ম্যতে ধর্ম্মকে (হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্মবিশেষকে) প্রতিসন্ধান করিয়া এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেও (সেই ধর্ম্মকে) প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ যাহাকে দৃষ্টান্ত পদার্থে দেখিয়াছি, তাহাকে এই সাধ্য ধর্ম্ম্যতেও দেখিতেছি বা জানিতেছি, এইরূপে সেই হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্মটিকে বুঝিয়া, সেই ধর্ম্মের সাধনতাবচন (সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্যবিশেষ) হেতু, অর্থাৎ এইরূপ বাক্যবিশেষই সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। (যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাস্থলে) “উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ” এই বাক্য। অর্থাৎ “উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব (অনিত্যত্বের) জ্ঞাপক” এইরূপ অর্থবোধক বাক্য পূর্ব্বোক্ত স্থলে সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। উৎপত্তি-ধর্ম্মক (বস্তু) অনিত্য দেখা গিয়াছে।



বিবৃতি। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বাদী নিজের সাধ্য ধর্মটিকে প্রকাশ করিয়া মধ্যস্থের প্রশংসা-সারে ঐ সাধ্য ধর্মের সাধন অর্থাৎ হেতু পদার্থকে প্রকাশ করিবেন। মধ্যস্থ প্রশংসা করিবেন,—“তোমার সাধ্য ধর্মের জ্ঞাপক কি?” স্ততরাং বাদী সেখানে হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া প্রকাশ করিবেন। যে বাক্যের দ্বারা বাদী তাহা প্রকাশ করিবেন, তাহাকে বলে “হেতুবাক্য”। এই হেতুবাক্যই “হেতু” নামে দ্বিতীয় অবয়ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন “শব্দ অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞা বলিলে মধ্যস্থের প্রশংসা হইবে—“শব্দ অনিত্যের জ্ঞাপক কি?” তখন বাদী নৈয়ায়িক যদি “উৎপত্তি-ধর্মকল্প”কে ঐ স্থলে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বলিবেন,—“উৎপত্তিধর্মকল্প, জ্ঞাপক”। সংস্কৃত ভাষায় বিচার হইলে বলিবেন,—“উৎপত্তিধর্মকল্পঃ”। ঐ বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা “জ্ঞাপক” বৃত্তিতে হইবে, স্ততরাং ঐ বাক্যের দ্বারা “উৎপত্তিধর্মকল্প জ্ঞাপক” ইহাই বুঝা যাইবে। পূর্বে যখন “শব্দ অনিত্য,” এইরূপ বাক্য বলা হইয়াছে এবং তাহার পরে “শব্দে অনিত্যের জ্ঞাপক কি?” এইরূপ প্রশংসা হইয়াছে, তখন “উৎপত্তি-ধর্মকল্প জ্ঞাপক” এইরূপ বাক্য বলিলে “উৎপত্তি-ধর্মকল্প” পদার্থটি শব্দে অনিত্যের জ্ঞাপক, এইরূপই চরম বোধ হইবে। ফলকথা, যে বাক্যের দ্বারা বাদী তাহার হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া বুঝাইবেন, তাহাই হেতুবাক্য। তাহাকেই বলে—“হেতু” নামক অবয়ব। হেতু পদার্থ বিবিধ; (১) সাধ্যমধ্যস্থেতু এবং (২) বৈধর্ম্য হেতু। স্ততরাং হেতুবাক্যও ঐ নামদ্বয়ে বিভিৎ। মহর্ষি এই স্তত্রের দ্বারা “সাধ্যমধ্যস্থেতু-বাক্য”র লক্ষণ বলিয়াছেন।

যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ উৎপত্তি দ্বাৰা ধর্ম, তাহাকে বলে “উৎপত্তিধর্মক” পদার্থ। গ্রামমতে শব্দ “উৎপত্তিধর্মক” পদার্থ। শব্দ যদি ঘটাদি পদার্থের জ্ঞায় জ্ঞাত পদার্থ না হইয়া আত্মা প্রকৃতি পদার্থের জ্ঞায় নিত্য পদার্থ হইত, তাহা হইলে উচ্চারণ না করিলেও শব্দের শ্রবণ হইত। উচ্চারণের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ শব্দের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না, এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি গোতম বলেন নাই। গোতমের মতে শব্দ পূর্বে থাকে না, শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাহার শ্রবণ হয় না, বাহা শ্রবণের যোগ্যই নহে, কিন্তু বর্তমান আছে, নিত্য সিদ্ধ আছে, তাহাকে শব্দ বলা যাইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তানুসারে শব্দ উৎপত্তিধর্মক। উৎপত্তিধর্মক ঘটাদি পদার্থের জ্ঞায় শব্দেরও ধর্ম। উৎপত্তিধর্মক হইলেই যে, সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এ জ্ঞাত নৈয়ায়িক উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। নৈয়ায়িক যদি ঘটাদি পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত হেতুবাক্য “সাধ্যমধ্যস্থেতুবাক্য” হইবে। ঘটাদি পদার্থরূপ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মক আছে, সেখানে অনিত্যও আছে, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত। এখন উৎপত্তি-ধর্মক ধর্মটি যদি শব্দে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহা শব্দ ও ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম। নৈয়ায়িক ঐ “উৎপত্তিধর্মক”কে শব্দ ও ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম বলিয়া বুঝিয়া যদি পূর্বোক্ত স্থলে “উৎপত্তিধর্মকঃ” এইরূপ হেতুবাক্য বলেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য “সাধ্যমধ্যস্থেতুবাক্য” হইবে। আর যদি ঐ স্থলে আত্মা প্রকৃতি নিত্য পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করেন অর্থাৎ “বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক নহে, তাহা অনিত্য নহে,—যেমন আত্মা প্রকৃতি” এইরূপ কথা বলেন,



তাহা হইলে পূর্বোক্ত “উৎপত্তিদর্শকঃ” এইরূপ হেতুবাচ্যই সেখানে “বৈবশ্ব্যহেতুবাচ্য” হইবে। আত্মা প্রকৃতি নিত্য পদার্থে উৎপত্তিদর্শক না থাকায় উহা শব্দ ও আত্মা প্রকৃতি দৃষ্টান্তের সাধারণ্য বা সমান দর্শন নহে, উহা আত্মা প্রকৃতির বৈবশ্ব্য। উৎপত্তিদর্শকরূপ হেতু পদার্থকে যদি ঐরূপে আত্মাদি দৃষ্টান্তের বৈবশ্ব্যরূপে বুঝিয়া, তাহার জ্ঞাপকবোধক বাচ্য বলা হয়, তাহা হইলে ঐ বাচ্য সেখানে “বৈবশ্ব্যহেতুবাচ্য” হইবে। এই “বৈবশ্ব্যহেতুবাচ্য”র কথা ইহার পরবর্তী সূত্রে বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি-কবিত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব বাচ্যবিশেষ। “প্রতিজ্ঞা”র লক্ষণের পরে “হেতু” নামক অবয়বের লক্ষণই যখন মহর্ষির বক্তব্য, তখন এই সূত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা হেতু পদার্থ না বুঝিয়া হেতুবাচ্যই বুঝিতে হইবে। সূত্রে “সাধ্যসাধনঃ” এই অংশের দ্বারা ঐ হেতু-বাচ্যের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। উহার দ্বারাও সাধ্যসাধন হেতুপদার্থ না বুঝিয়া, সাধ্যের সাধন বা জ্ঞাপকবোধক বাচ্যবিশেষই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও সূত্রস্থ “সাধ্যসাধন” শব্দের ব্যাখ্যার শেষে “তন্ত সাধনতাবচনঃ” এই কথা বলিয়া মহর্ষির ঐ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধ্যের সাধন যে বাচ্যে থাকে অর্থাৎ যে বাচ্যের দ্বারা সাধ্যসাধন পদার্থকে সাধন বলিয়া বুঝা যায়, এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাসসিদ্ধ “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারা এখানে পূর্বোক্তরূপ বাচ্য বুঝা যায়, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐ পথে বান নাই। প্রাচীন মতে সূত্রে “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারাই সাধ্যের সাধনতাবোধক বাচ্য পর্য্যন্তই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও তাহাই প্রকটিত। বস্তুতঃ প্রাচীন ভাষার ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। পরন্তু ঐরূপ প্রয়োগের দ্বারা সাধ্যসাধনবই যে হেতু পদার্থের লক্ষণ, ইহাও মহর্ষি সূচনা করিয়াছেন। সূত্রে এইরূপ সূচনাই থাকে।

মহর্ষি দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। তাহার দ্বারাই দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ বুঝিয়া মহর্ষির উদাহরণ-বাচ্যের লক্ষণ বুঝা যাইবে। কিন্তু হেতু পদার্থের স্বরূপ না বুঝিলে, “হেতুবাচ্য” ও “হেতুভাস” বুঝা যায় না। মনে হয়, সেই জন্তই মহর্ষি “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারাই হেতুবাচ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে হেতু পদার্থের স্বরূপও সূচিত হইয়াছে। তবে হেতু-বাচ্যের লক্ষণই এখানে মহর্ষির মূল বক্তব্য, সেই জন্তই এই সূত্রের উক্তি, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাই ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনগণ হেতু-বাচ্যের লক্ষণ পক্ষেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “জ্ঞানমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টের কথায় পাওয়া যায়, কোন সম্ভাব্য এই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি পরিচায়ক করিয়া, ইহাকে হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেন, শেষে ইহার দ্বারাই হেতুবাচ্যের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এইরূপ কথা বলিতেন। জয়ন্ত ভট্ট সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি রক্ষা করিয়াও ঐ মতের সমর্থন করিতে গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐরূপ বলেন নাই। “অবয়ব” প্রভাবে হেতুবাচ্যের লক্ষণই যখন মহর্ষির এখানে মূল বক্তব্য, তখন হেতু পদার্থের লক্ষণই প্রধানতঃ এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলেন নাই, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। জয়ন্ত ভট্টের অজ্ঞাত কথা ইহার পরবর্তী সূত্রে প্রকটিত হইবে।



মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা “সাধর্ম্যা হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলিলেনও, সূত্রের অর্থ পর্যালোচনা করিলে ইহার দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্ত লক্ষণও বুঝা যায়। বস্তুতঃ হেতুবাক্যের সামান্ত লক্ষণও মহর্ষির বক্তব্য। সামান্ত জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। তাই তাৎপর্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্ত লক্ষণ এবং সাধর্ম্যা হেতুবাক্যের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সামান্ত লক্ষণটি অর্থ এবং বিশেষ লক্ষণটি শব্দ। বিশেষ লক্ষণ পক্ষে সূত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা “সাধর্ম্যা হেতুবাক্য” বুঝিতে হইবে। “উদাহরণসাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং” এই কথাটির দ্বারা ঐ “সাধর্ম্যা হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলা হইয়াছে।

যাহা উদাহৃত হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে সূত্রে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা এখানে “দৃষ্টান্ত” পদার্থই বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত পদার্থ বিবিধ, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। “সাধর্ম্যা হেতুবাক্যের” এই লক্ষণে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা “সাধর্ম্যা দৃষ্টান্তই” বুঝিতে হইবে। “সাধর্ম্যা” বলিতে সমান ধর্ম। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “সাধর্ম্যা” শব্দের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন, “সামান্ত”। “সামান্ত” বলিতে সমানতা বা সমানধর্মই বুঝিতে হইবে। কাহার সহিত সমান ধর্ম? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে, “উদাহরণসাধর্ম্যা”। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ম। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত কাহার সমান ধর্ম, ইহা সূত্রকার না বলিলেনও সাধ্যধর্মীর সমান ধর্মই বুঝা যায়। কারণ, তাহাই প্রকৃত এবং নিষ্কটবর্তী। ফল কথা, “সাধর্ম্যা দৃষ্টান্ত” পদার্থের সহিত “সাধ্য ধর্মীর” বাহা সমান ধর্ম, অর্থাৎ যে ধর্মটি “সাধর্ম্যা দৃষ্টান্তেও” আছে এবং “সাধ্য ধর্মীতে”ও আছে, তাহাই এই সূত্রে “উদাহরণ-সাধর্ম্যা” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ঐরূপ পদার্থকেই “সাধর্ম্যা হেতু” পদার্থ বলে। যে কোন পদার্থের সহিত সমান ধর্ম বলিলে বিরুদ্ধ ও ব্যক্তিতারী অর্থাৎ হেতুভাষ ও হেতু পদার্থ হইয়া পড়ে, তাই বলা হইয়াছে—“উদাহরণ সাধর্ম্যা”। কোন ব্যক্তিতারী পদার্থ উদাহরণেও আছে, আবার বাহা উদাহরণ নহে, সেই পদার্থেও আছে—এমন পদার্থও “উদাহরণ-সাধর্ম্যা” বলিয়া হেতু পদার্থ হইয়া পড়ে, এ জন্ত “উদাহরণ-সাধর্ম্যা” বলিতে এখানে কেবলমাত্র উদাহরণের সহিতই সমান ধর্ম বুঝিতে হইবে। এবং “সাধর্ম্যা” বলিতেও কেবলমাত্র সাধর্ম্যা (বৈধর্ম্যা নহে) বুঝিতে হইবে। ফলকথা, এই সূত্রে “উদাহরণ-সাধর্ম্যা” শব্দের দ্বারা “সাধর্ম্যা হেতু” পদার্থেরও লক্ষণ সূচিত হওয়ার, ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে সূত্রের তাৎপর্যার্থ হইল যে, কেবলমাত্র “সাধর্ম্যা দৃষ্টান্ত” পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্মীর বাহা কেবলমাত্র সমান ধর্ম, ফলিতার্থ এই যে, বাহা দেখানে “সাধর্ম্যা হেতু” পদার্থ, তৎপ্রযুক্ত তাহার সাধ্যসাধনতাবোধক যে বাক্য, তাহাই “সাধর্ম্যা হেতুবাক্য”। যেগুলি হুই হেতু অর্থাৎ হেতুভাষ, সেগুলি সাধ্যসাধনই হয় না, সুতরাং তাহার সাধনবোধক ঐরূপ বাক্য হেতু-বাক্য হইবে না। এবং ভাববাক্যের অন্তর্গত না হইলেও ঐরূপ কোন বাক্য জ্ঞানের অবয়ব হেতু-বাক্য হইবে না। ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞায় হেতুবাক্য বলিয়াছেন—“উৎপত্তি-ধর্ম-কন্ডাং” এই বাক্য। “উৎপত্তি-ধর্ম-কন্ডাং” শব্দে আছে এবং বটানি পদার্থরূপ-সাধর্ম্যা দৃষ্টান্তেও



আছে, সুতরাং উৎপত্তিব্যবস্থার ধর্মটি স্বতন্ত্র "উদাহরণ-সাধন্য"। উহা কেবল ঘটাদি অনিত্য পদার্থরূপ সাধন্য দৃষ্টান্তেই থাকায় এবং শব্দে থাকায় কেবল সাধন্য দৃষ্টান্তের সহিত সাধন্যধর্মী শব্দের সমান ধর্মই হইয়াছে। উহাকে ঐরূপে বুঝিয়া ঐ স্থলে "উৎপত্তিব্যবস্থার" ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ঐ বাক্য "সাধন্য হেতুবাক্য" হইবে। ফল কথা এই যে, হেতু-বাক্য প্রয়োগের পরে বাদী বৈরূপ উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তদনুসারেই ঐ হেতুবাক্যের পূর্বোক্ত ভেদ হইবে। বাদী যদি "সাধন্যোদাহরণ-বাক্যের" দ্বারা পরে সাধন্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্বোক্ত হেতুবাক্যটি "সাধন্য হেতুবাক্য" হইবে। আর যদি "বৈবক্ষ্যোদাহরণ-বাক্যের" দ্বারা বৈবক্ষ্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার হেতুবাক্য "বৈবক্ষ্য হেতুবাক্য" হইবে। ভাষ্যকার যে এখানে সাধন্য হেতুবাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝাইতেই শেষে এখানে "সাধন্যোদাহরণ-বাক্যটির"ও উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহরণস্বত্রে এ সকল কথা পরিষ্কৃত হইবে। ( ৩৬।৩৭ স্বত্র দ্রষ্টব্য )।

স্বত্রের "সাধ্যসাধনং" এই অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“সাধ্যস্ত-ধর্মস্ত সাধনং প্রজ্ঞাপনং।” স্বত্রে “সাধ্য” শব্দটি যে এখানে সাধ্য ধর্ম অর্থেই প্রযুক্ত, ইহা ভাষ্যকারের কথাতোৎ বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কেবল “সাধ্যস্ত” এই কথা বলিলে, যে ধর্মীতে অনুমান হয়, কেবল সেই ধর্মীমাত্রকেই কেহ বুঝিতে পারেন, এ জন্ত ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন—“ধর্মস্ত”। উহার দ্বারা এখানে অনুমের ধর্ম সহিত ধর্মীই স্বতন্ত্র “সাধ্য” শব্দের অর্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে, কেবল ধর্মীমাত্র বুঝিতে হইবে না, ইহাই ভাষ্য-কারের তাৎপর্য। এই জন্তই ভাষ্যকার শেষে “সাধ্যো প্রতিসন্ধায় ধর্মঃ” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত অর্থ সুব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঐ স্থলে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্য ধর্মীকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, সাধ্য ধর্মী এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেই হেতু পদার্থরূপ ধর্মটির প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে।

তাৎপর্যটীকাকারের কথায় বলব্য এই যে, ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মী অর্থই গ্রাহ্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু উহা যে স্বতন্ত্র “সাধ্য” শব্দেরই বিবরণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। ভাষ্যকারের শেষ কথগুলি তাঁহার অন্ত প্রকারে বিশদার্থ ব্যাখ্যাও বলা যায়। পরন্তু ভাষ্যকার প্রথমে কেবল “সাধ্যস্ত” এই কথা বলিলে, উহার দ্বারা কেবল ধর্মী মাত্র বুঝিবে কেন? কেবল ধর্মী “সাধ্য” হইতে পারে না। ভাষ্যকার উদাহরণ স্বত্রভাষ্যে “সাধ্য” শব্দের যে দ্বিবিধ অর্থ বলিয়াছেন, তদনুসারে কেবল “সাধ্য” বলিলে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী বুঝা যাইতে পারে। “সাধ্য” শব্দের দ্বারা যদি এখানে তাহাই ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকার আবার “ধর্মস্ত” এই কথা বলিবেন কেন? ফল কথা, ভাষ্যকার স্বার্থ ব্যাখ্যায় “সাধ্যস্ত-ধর্মস্ত” এই কথা বলিয়া, স্বতন্ত্র “সাধ্য” শব্দের দ্বারা এখানে যে সাধ্য-ধর্মীকে গ্রহণ না করিয়া সাধ্য ধর্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই মনে আসে। ভাষ্যকারের ঐ কথার সরল অর্থ তাগ করিবার কোন কারণও মনে আসে না। পরন্তু হেতু পদার্থটি সাধ্য ধর্মেরই সাধন হয়। হেতুপদার্থ সাধ্য ধর্মীর ব্যাপ্য হয় না, সাধ্য ধর্মেরই ব্যাপ্য হইয়া থাকে। সুতরাং মর্মি



এখানে “সাধ্যসাধনঃ” এই বাক্যে সাধ্য ধর্ম অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই সহজে বুঝা যায়। সুবীণল কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

“সাধ্যস্য হেতুবাচ্য” হলে “সাধ্যস্য দৃষ্টান্ত” পদার্থ এবং সাধ্য ধর্ম্মোক্তে হেতুপদার্থকে প্রতিসন্ধান করিয়া, তাহার সাধকত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, এ জ্ঞাত ঐ হেতুবাচ্য উদাহরণ সাধ্যস্যপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইবার জন্যই পরে ঐ কথা বলিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত পদার্থে যাহা দেখিয়াছি বা জানিয়াছি, এই সাধ্য ধর্ম্মোক্তেও তাহাকে দেখিতেছি বা জানিতেছি, এইরূপে হেতুপদার্থের জ্ঞানই তাহার দৃষ্টান্ত পদার্থ ও সাধ্যধর্ম্মোক্তে প্রতিসন্ধান। “প্রতিসন্ধান” বলিতে “প্রত্যভিজ্ঞা” নামক জ্ঞানবিশেষ। উহা অনেক সময়ে একজাতীয় পদার্থেও পূর্বোক্ত প্রকারে হইয়া থাকে। রন্ধনগৃহে যে ধূম দেখা হয়, পর্কতে ঠিক সেই ধূমই দেখা হয় না, তাহার সজাতীয় অন্ত ধূমই দেখা হইয়া থাকে। তাহা হইলেও ধূমবন্ধুপে অথবা বিশিষ্ট ধূমবন্ধুপে সজাতীয় ধূম দেখিয়াও পূর্বসংস্কারবশতঃ যাহা রন্ধনগৃহে দেখিয়াছি, তাহা পর্কতেও দেখিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে।

বাংলায়নের প্রবল প্রতিবাদী বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ নাগ তাহার “প্রমাণসমূচ্চর” গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, “সাধ্যস্য যদি হেতুঃ স্তাৎ ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী”। দিঙ নাগের কথা এই যে, যদি উদাহরণ-সাধ্যস্যই হেতু হয়, তাহা হইলে উহা বাক্য না হওয়ার স্তায়বাক্যের অংশ বা “অবয়ব” হইতে পারে না। আর যদি হেতু পদার্থেরই লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি সংগত হয় না, প্রথমা বিভক্তিই সম্ভব হয়, অর্থাৎ “উদাহরণসাধ্যস্য সাধ্যসাধনঃ হেতুঃ” এইরূপ সূত্রই বলা উচিত। দিঙ নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর ঐ কথার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকরের প্রতিবাদের মর্ম্ম এই যে, হেতুবাচ্যের লক্ষণই এই সূত্রের দ্বারা মর্হবি বলিয়াছেন। উদাহরণ সাধ্যস্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধনতাবোধক বাক্যই সূত্রার্থ। উদাহরণ-সাধ্যস্য-রূপ হেতুপদার্থ উদাহরণসাধ্যস্যপ্রযুক্ত হইতে না পারিলেও হেতুবাচ্য উদাহরণসাধ্যস্যপ্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, হেতু পদার্থটিকে উদাহরণ-সাধ্যস্য বলিয়া বুঝিয়াই তাহার জ্ঞাপকত্ববোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহাই হেতুবাচ্য। তাহার প্রতি উদাহরণসাধ্যস্য অর্থাৎ হেতু পদার্থ ঐরূপে নিমিত্ত বা প্রযোজক হইবে। সুতরাং সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি সম্ভব এবং আবশ্যক। ফলকথা, হেতুপদার্থের লক্ষণ হইলেই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি হয় এবং তাহা স্তায়বাক্যের অংশ হেতুবাচ্যের লক্ষণ হয় না। বখন পূর্বোক্তরূপে হেতুবাচ্যের লক্ষণই সূত্রার্থ, তখন দিঙ নাগের প্রদর্শিত দোষ এখানে সম্ভবই নহে। দিঙ নাগ সূত্রার্থ না বুঝিয়াই এখানে কায়নিক দোষের আরোপ করিয়াছেন, ইহাই উদ্যোতকরের প্রতিবাদের সার। ৩৪।

ভাষ্য। কিমেতাবন্ধেতুলক্ষণমিতি ? নেতুচ্যতে। কিং তর্হি ?

অনুবাদ। হেতুবাচ্যের লক্ষণ কি এই মাত্র ? অর্থাৎ পূর্বসূত্রে হেতুবাচ্যের লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই কি কেবল হেতুবাচ্যের লক্ষণ ? (উত্তর) ইহা



বলিতেছি না, অর্থাৎ হেতুবাক্যের যে আর কোন প্রকার লক্ষণ নাই, ইহা বলা হয় নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ তাহা হইলে হেতুবাক্যের অন্য প্রকার লক্ষণ কি? (এই প্রশ্নের উত্তররূপে মহর্ষি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন)।

### সূত্র। তথা বৈধর্ম্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ অর্থাৎ উদাহরণবিশেষের বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ সাধ্যসাধনবোধক বাক্যবিশেষ হেতু (বৈধর্ম্যাহেতুবাক্য)।

ভাষ্য। উদাহরণ-বৈধর্ম্যাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ। কথং? অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং যথা আত্মাদি দ্রব্য-মিতি।

অনুবাদ। উদাহরণের বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত অর্থাৎ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত মাত্রের বাহ্য কেবল বৈধর্ম্য তৎপ্রযুক্ত, সাধ্যসাধনও অর্থাৎ ঐরূপ সাধ্যসাধনতাবোধক বাক্যবিশেষও হেতু (বৈধর্ম্য-হেতুবাক্য)। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ এই বৈধর্ম্যাহেতু-বাক্য কি প্রকার? (উত্তর) “শব্দ অনিত্য”, “উৎপত্তিধর্মকত্ব-জ্ঞাপক”, “অনুৎপত্তিধর্মক বস্তু নিত্য, যেমন আত্মাদি দ্রব্য” (অর্থাৎ প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই বাক্যই বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। উৎপত্তিধর্মকত্ব আত্মা প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে না থাকায়, উহা আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য। প্রদর্শিত স্থলে ঐ হেতুবাক্যটি পূর্বোক্ত বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত হওয়ায় উহা বৈধর্ম্য হেতু-বাক্য)।

টীকণী। হেতুবাক্য বিবিধ;—সাধ্যম্য হেতুবাক্য এবং বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। মহর্ষি পূর্ব-সূত্রের দ্বারা “সাধ্যম্যাহেতুবাক্যের” লক্ষণ বলিয়া, এই সূত্রের দ্বারা “বৈধর্ম্য হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলিয়াছেন। এই সূত্রে “তথা” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্র হইতে “উদাহরণ” শব্দের এবং “সাধ্য-সাধনং” এবং “হেতুঃ” এই দুইটি বাক্যের অচর্য্যুতি স্থিতি হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ কথাগুলির যোগ করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। বাহ্য উদাহৃত হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পূর্বসূত্রে দৃষ্টান্ত পদার্থ অর্থেই “উদাহরণ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পদার্থও দ্বিবিধ;—সাধ্যম্য দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত। বেখানে হেতুপদার্থ নাই, সাধ্য ধর্মও নাই, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, ভাষ্যকারের মতে তাহা “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত”। হেতু পদার্থটি তাহাতে থাকে না, হতরাং হেতু পদার্থ বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তেরই বৈধর্ম্য হয়। অতএব এই সূত্রে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত” কেই বুঝিতে হইবে। এবং এই সূত্রে “উদাহরণ-বৈধর্ম্য” কথার দ্বারা বাহ্য বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থমাত্রের কেবল বৈধর্ম্য (সাধ্যম্য নহে), তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই মহর্ষির বিবক্ষিত এবং তাহাকেই বলে “বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ”। যেমন “উৎপত্তিধর্মকত্ব” আত্মা



প্রভৃতি পদার্থে নাই বলিয়া, উহা আত্মাদি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্য। শব্দে অনিত্যত্বের অহুতানে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইলে, উহা সেখানে বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থ। সুতরাং ঐ স্থলে “উৎপত্তিধর্মকর” পদার্থটি কেবল ঐ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য মাত্র হওয়ার “বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ” হইয়াছে। বাহ্য বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের জায় অস্ত পদার্থেরও বৈধর্ম্য, তাহা “বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ” নহে। তাহা হইলে শরীরদ্বয়ে “সাম্যকত্ব”র অহুতানে “প্রাণাদিনব”ও বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা হইবে না। কারণ, “প্রাণাদিনব” যেমন ঐ স্থলে বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত (প্রাণাদিশূন্ত এবং নিরাম্বক) ঘটাদি পদার্থের বৈধর্ম্য, তদ্রূপ মৃত শরীরেরও বৈধর্ম্য। মৃত দেহেও প্রাণাদি নাই। শরীরদ্বয়েই সাম্যকত্বের অহুতান করিতে গেলে সেখানে মৃত শরীর দৃষ্টান্ত হইবে না। ফলকথা, যে পদার্থটি কেবল “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত”র বৈধর্ম্য মাত্র, তাহাই বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ এবং তাহাই এই স্থলে “উদাহরণ-বৈধর্ম্য” কথার দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলে “উৎপত্তিধর্মকর” পদার্থকে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য-রূপে বুঝিয়া “উৎপত্তিধর্মকর” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা “বৈধর্ম্য-হেতুবাক্য” হইবে। ভাষ্যকার এখানে পূর্বে প্রকার ঐ বাক্যটিকেই “বৈধর্ম্য-হেতুবাক্য”র উদাহরণ-রূপে উল্লেখ করিয়া, উহা যে এখানে “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত”র বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য শেষে ঐ স্থলীয় “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য”টিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ যে হেতুবাক্যের পরে “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য”র প্রয়োগ হইবে, তাহাই বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। বৈধর্ম্য হেতুপদার্থকে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হয় এবং বৈধর্ম্য হেতুপদার্থকে পূর্বে উদাহরণ-বৈধর্ম্য বলিয়া বুঝিয়াই ঐরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং “উদাহরণ-বৈধর্ম্য” বা বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ, ঐরূপ হেতুবাক্যের নিমিত্ত বা প্রবোজক, তাহা হইলে বৈধর্ম্য হেতুবাক্যকে উদাহরণ বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত বলা যায়, সুতরাং এই স্থলেও পূর্বস্থলের জায় পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি নাই। হেতু পদার্থ এবং হেতুবাক্য একই পদার্থ নহে। হেতুবাক্যের প্রতি হেতু পদার্থ প্রয়োজক হওয়ার, হেতুবাক্যকে হেতুপদার্থপ্রযুক্ত বলা যাইতে পারে।

এই বৈধর্ম্য হেতুবাক্যের ব্যাখ্যার পরবর্তী কোন নৈসর্গিকই ভাষ্যকারের মত গ্রহণ করেন নাই। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার পূর্বে যাহাকে “সাম্য হেতুবাক্য” বলিয়া আনিয়াছেন, এখানে তাহাকেই অর্থাৎ সেইপ্রকার বাক্যকেই “বৈধর্ম্য হেতুবাক্য” বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্বে “সাম্য হেতুবাক্য” হইতে এই “বৈধর্ম্য হেতুবাক্য”র বাস্তব কোন ভেদ হয় নাই, কেবল প্রয়োগভেদ হইয়াছে মাত্র। তাহাতে হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণের ভেদবশতঃও হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইতে পারে না। যদি তাহাই হয় অর্থাৎ যদি উদাহরণের ভেদবশতঃই হেতুবাক্যের এই ভেদ মহর্ষির বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মহর্ষি “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য”র যে লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাই এই ভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে, মহর্ষির এই সূত্রটির কোন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং ভাষ্যকার-প্রদর্শিত বৈধর্ম্য হেতুবাক্যের উদাহরণ গ্রাহ্য নহে। “জীবৎ শরীরং ন নিরাম্বকং অপ্ৰাণাদিনবপ্রসঙ্গং” অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির



শরীর আত্মশূন্য নহে, যে হেতু তাহা হইলে উহা প্রাণাদিশূন্য হইয়া পড়ে, এইরূপ স্থলেই বৈবৰ্ধ্য হেতুবাক্যের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। “তত্ত্বচিন্তামবি”কার গবেষণে উদ্যোতকরের মতামতানুসারে পূৰ্ণোক্ত স্থলে এবং “পৃথিবী ইত্যরেভ্যো ভিত্যতে গন্ধবহাং” অর্থাৎ পৃথিবী জলাদি সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে গন্ধ আছে। বাহা জলাদি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা গন্ধযুক্ত নহে, এইরূপ স্থলে “গন্ধবহাং” এই বাক্যকে বৈবৰ্ধ্য হেতুবাক্য বা “ব্যতিরেকী হেতুবাক্য” বলিয়াছেন।

উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী গ্রন্থের সকল ক্রায়াচার্য্যগণের মতেই হেতু ও অনুমান ত্রিবিধ। (১) “অবয়ী,” (২) “ব্যতিরেকী,” (৩) “অদ্বয়ব্যতিরেকী”। অনুমানের পূর্বে অনুমের ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া উভয় পক্ষের সমস্ত পদার্থকে “সপক্ষ” বলে। ঐ “সপক্ষ” পদার্থ উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত হইলে তাহাকে “অবয়ী উদাহরণ” বলে। ঐ অবয়ী উদাহরণের সাহায্যে হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহাকে অবয়ব্যাপ্তি বলে। গবেষণ প্রভৃতি প্রধানতঃ এই অবয়ব্যাপ্তির স্বরূপ বলিয়াছেন—“হেতুব্যাপক-সাধ্যসামান্যধিকরণ্য”। অর্থাৎ যেখানে যেখানে হেতুপদার্থ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই যে সাধ্য ধর্ম থাকে, তাহাকে বলে “হেতুব্যাপকসাধ্য”। তাহার সহিত হেতু পদার্থের একাধারে থাকাই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের “অবয়ব্যাপ্তি”। যেখানে অনুমের ধর্মটি সন্নিহিত, অথবা নিশ্চিত হইলেও অনুমানের ইহার বিবরীভূত, তাহাকে “পক্ষ” বলে। এক কথায় যে ধর্ম্মাতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, সেই ধর্ম্মাকেই নব্যগণ “পক্ষ” বলিয়াছেন। যে পদার্থে অনুমের ধর্ম্মটি নাই, ইহা উভয় পক্ষের সমস্ত, সেই পদার্থকে “বিপক্ষ” বলে (হেতুভাস-লক্ষণপ্রকরণে উষ্টব্য)। যেখানে এই বিপক্ষ নাই, কেবল সপক্ষরূপ “অবয়ী উদাহরণ”র সাহায্যে পূৰ্ণোক্ত “অবয়ব্যাপ্তি”র নিশ্চয়পূর্বক অনুমান হয়, সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (১) অবয়ী বা “কেবলানবয়ী”। যেমন “ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাং” এইরূপে বাচ্যধর্ম্মের অনুমানে “বিপক্ষ” নাই। কারণ, এখানে সাধ্য বা অনুমের ধর্ম্ম “বাচ্যত্ব”। বস্ত্ত মাত্রেরই বাচক শব্দ আছে; সুতরাং বস্ত্ত মাত্রই শব্দের বাচ্য অর্থাৎ সকল বস্ত্ততেই বাচ্যস্বরূপ ধর্ম্ম আছে। তাহা হইলে ঐ বাচ্যত্ব-রূপ সাধ্যশূন্য পদার্থ না থাকায়, ঐ স্থলে “বিপক্ষ” নাই অর্থাৎ ঐ স্থলে “বিপক্ষ” অলীক। সুতরাং বিপক্ষরূপ “ব্যতিরেকী উদাহরণ” এখানে অলীক। কিন্তু ঘটাদি বহু বস্ত্তই “বাচ্যত্ব”রূপ সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত থাকায়, যে যে স্থানে জ্ঞেয়ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিষয় আছে, সেই সমস্ত স্থানে বাচ্যত্ব আছে;—যেমন ঘটাদি জ্ঞেয় পদার্থ। এইরূপে “অবয়ী উদাহরণের সাহায্যে এখানে জ্ঞেয়ত্বরূপ হেতু পদার্থে বাচ্যত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্মের “অবয়ব্যাপ্তি” নিশ্চয়পূর্বক অনুমান হয়। এই জন্ত এই স্থলীয় হেতুও অনুমান অবয়ী বা কেবলানবয়ী। গবেষণের মতে ইহার অল্পরূপ ব্যাখ্যাও আছে।

যেখানে পূৰ্ণোক্ত “সপক্ষ” অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মযুক্ত বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ নাই, কিন্তু বিপক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মশূন্য বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ আছে, সেখানে সেই বিপক্ষ পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, তাহাকে ব্যতিরেকী উদাহরণ বলে। সেই ব্যতিরেকী উদাহরণের সাহায্যে “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” নিশ্চয় পূর্বক সেখানে অনুমান হয়; এ জন্ত সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (২) ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী। সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বকেই



নব্যগণ “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” বলিয়াছেন। যে যে স্থানে সাধ্য ধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই যে অভাব থাকে, তাহাকে সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব বলে। সাধ্যশূন্য স্থান মাঝেই হেতুর অভাব থাকিলে, তাহা সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব হয়। সেই হেতুর অভাবের প্রতিযোগী হেতু। কারণ, বাহার অভাব, তাহাকে ঐ অভাবের “প্রতিযোগী” বলে। তাহা হইলে সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে হেতুর অভাব, তাহার প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকে। ফলতঃ এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান স্থলে সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাবের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব জ্ঞান হইয়াই অহুমান হয়, এই জ্ঞান উহাকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান বলা হইয়াছে। “ব্যতিরেক” শব্দের অর্থ অভাব।

যেমন “জীবজরীরং সায়কং প্রাণাদিম্বাং” অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, যেহেতু তাহাতে প্রাণাদি আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীরে সায়কব্ধের অহুমানে “সপক্ষ” নাই। কারণ, জীবিত ব্যক্তির শরীর এখানে “পক্ষ” হইয়াছে। উহা ভিন্ন “সায়ক” বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত কোন পদার্থই নাই। যাহা সাধ্যযুক্ত বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত, তাহাই “সপক্ষ”। তাহা এখানে নাই। কিন্তু সায়কব্ধ শূন্য অর্থাৎ যাহাতে আত্মা নাই—ইহা সর্বসম্মত, এমন ঘটাদি পদার্থরূপ বিপক্ষ আছে। সুতরাং ঐ স্থলে যাহা সায়ক নহে, তাহা প্রাণাদিযুক্ত নহে অর্থাৎ প্রাণাদির কারণ ইচ্ছাদিযুক্ত নহে, যেমন ঘটাদি—এইরূপে ব্যতিরেকী উদাহরণের সাহায্যে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়পূর্বকই অহুমান হয়। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মশূন্য নহে, তাহা হইলে উহা প্রাণাদিশূন্য হইয়া পড়ে; আত্মশূন্য পদার্থমাত্রই প্রাণাদিশূন্য, জীবিত ব্যক্তির শরীরে তখন প্রাণাদি আছে, তখন উহাতে আত্মা আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীরে সায়কব্ধের অহুমান হয়। এখানে জীবিত ব্যক্তির শরীর ভিন্ন প্রাণাদিযুক্ত অথচ সায়ক বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থ নাই, সুতরাং সপক্ষ না থাকায় অপরী উদাহরণের সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু ঘটাদিরূপ “বিপক্ষ” ব্যতিরেকী উদাহরণ আছে। তাহার সাহায্যে ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়পূর্বক অহুমান হওয়ায়, এই স্থলীয় হেতু ও অহুমান ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী।

যেখানে “সপক্ষ”ও আছে, বিপক্ষও আছে, এবং হেতুপদার্থটি “সপক্ষে” আছে, কিন্তু “বিপক্ষে” নাই, সেই স্থলে সপক্ষরূপ অপরী উদাহরণ এবং বিপক্ষরূপ ব্যতিরেকী উদাহরণ, এই দ্বিবিধ উদাহরণের সাহায্যে পূর্বোক্ত অমরব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি—এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তির নিশ্চয়পূর্বকই অহুমান হওয়ায় সেই স্থলীয় হেতু ও অহুমান (৩) অমরব্যতিরেকী। যেমন পক্ষতে বিশিষ্ট ধর্ম যেখান বহির অহুমান স্থলে পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষ আছে এবং জল প্রভৃতি বিপক্ষও আছে। ঐ স্থলে যে স্থানে বিশিষ্ট ধর্ম আছে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি আছে, যেমন পাকশালা—এইরূপে অপরী উদাহরণের সাহায্যে বিশিষ্ট ধর্মে বহির অমরব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। এবং যে যে স্থানে বহি নাই, সেই সমস্ত স্থানে বিশিষ্ট ধর্ম নাই, যেমন জল—এইরূপে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে হেতু ও অহুমান অমরব্যতিরেকী।

উদ্যোতকর মহর্ষি-স্মৃতোক্ত ত্রিবিধ অহুমানের প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অহুমানের এইরূপ প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকদিগেরই উদ্ভাবিত নহে।



“তত্ত্বচিন্তামণি”কার গদ্যে উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই অহুমানকে পূর্বোক্তরূপে ত্রিবিধ বলিয়া তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রদর্শিত “ব্যতিরেকী” অহুমানের উদাহরণস্থলে কোন জীবিত ব্যক্তির শরীরে সাত্ত্বিক নিশ্চয় অবশ্য স্বীকার্য বলিয়া সেই শরীরবিশেষই “সপক” আছে, তাহাই “অবয়ী উদাহরণ” হইবে, তাহার সাহায্যে “অবয়ব্যাপ্তি”র নিশ্চয় করিয়াই অর্থাৎ “বাহ্য বাহ্য প্রাণাদিযুক্ত, সে সমস্তই সাত্ত্বিক, যেমন আমার শরীর” — এইরূপে “প্রাণাদিমব” হেতুতে “সাত্ত্বিক”রূপ সাত্ত্বিক ধর্মের “অবয়ব্যাপ্তি” নিশ্চয় পূর্বকই জীবিত ব্যক্তির শরীরমাঝে সাত্ত্বিকত্বের অহুমান হইতে পারে, সুতরাং “ব্যতিরেকী” বা “কেবলব্যতিরেকী” নামে কোন প্রকার হেতু বা অহুমান নাই, এই কথা বলিয়া অনেকে উহা মানেন নাই। প্রাচীন কাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে উহা লইয়া বহু বিচার হইয়া গিয়াছে। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গদ্যে “ব্যতিরেকাহুমান” গ্রন্থে সেই সমস্ত বিচারের বিস্তৃত প্রকাশ করিয়াছেন। গদ্যে চরম কথা বলিয়াছেন যে, যদিও এইরূপ স্থলে কোনপ্রকারে “অবয়ব্যাপ্তি” নিশ্চয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা বেধানে হয় নাই, কেবলমাত্র “ব্যতিরেকী উদাহরণে”র সাহায্যে “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” নিশ্চয়ই হইয়াছে, সেখানেও অহুমিতি হইয়া থাকে, ইহা অহুভবনিষ্ঠ। অন্ততঃ সেইরূপ স্থলেও “কেবলব্যতিরেকী” অহুমান অবশ্য স্বীকার্য। নীমাংসকগণ এইরূপ স্থলে অহুমিতি স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা এইরূপ স্থলে “অর্থাপত্তি” নামে অতিরিক্ত প্রমাণ ও প্রমিতি স্বীকার করিয়াছেন। গদ্যে তাঁহার “অর্থাপত্তি” গ্রন্থে সেই মতেরও বিশদ বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নীমাংসক-মত-পক্ষপাতী হইয়া নিজে কেবল মাত্র “অবয়ী” অহুমানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বত্র “অবয়ব্যাপ্তি” নিশ্চয়পূর্বকই অহুমান হয়, এ জন্ত অহুমানমাত্রই “অবয়ী”। গদ্যেশের প্রদর্শিত “ব্যতিরেকী” অহুমান স্থলে রঘুনাথ নীমাংসকদিগের দ্বারা “অর্থাপত্তি” নামে অতিরিক্ত জ্ঞানই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথের এই মত প্রকৃত ভ্রাম্যত নহে। উহা গোতম মত-বিরুদ্ধ। কারণ, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয়াধ্যায়ে নীমাংসক-সম্মত “অর্থাপত্তি”র প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করিয়া “অর্থাপত্তি”কে অহুমানের মধ্যেই নিবিষ্ট করিয়াছেন।

গদ্যেশের পূর্ববর্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও হেতু ও অহুমানকে পূর্বোক্ত নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তবে তিনি “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” জ্ঞানকে অহুমিতির কারণরূপে মানেন নাই। “অর্থাপত্তি” নামেও অতিরিক্ত প্রমাণ মানেন নাই। তাঁহার মতে সর্বত্র “অবয়ব্যাপ্তি”র নিশ্চয়-পূর্বকই অহুমিতি হয়। ঐ অবয়ব্যাপ্তিনিশ্চয় বে স্থলে “অবয়বসংহার” মাত্র জ্ঞানজন্ত হয়, সেই স্থলীয় অহুমান “অবয়ী”। এবং বেধানে উহা “ব্যতিরেকসংহার” মাত্র জ্ঞানজন্ত হইবে, সেই স্থলীয় অহুমান “ব্যতিরেকী”। এবং “অবয়বসংহার” ও “ব্যতিরেকসংহার” এই দ্বিবিধ “সংহার” জ্ঞানজন্ত হইলে সেই স্থলীয় অহুমান “অবয়ব্যতিরেকী”। সাব্যস্ত স্থানে হেতু

১। ব্যতিরেকসংহারেণ অবয়ব্যাপ্তিরহণাশ্রয়ণাৎ (অহুমিতিকীর্ণিত)।—এখান ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান হেতুবেদ ন, হৃত্ত্বজ্ঞানবিতাব্যাপ্তিরিত ভাঃ। এবং ব্যতিরেক-পরামর্শজ্ঞ-বুদ্ধেরব্যাপ্তিযোগ্যনামাশ্রয়ণ-বিহীকং। আচার্য্যোক্তাদিত্যে তবর্জঃ (গণকীর্ণ)।



আছে, এইরূপ জ্ঞানের নাম “অদ্বয়সহচারজ্ঞান”। সাধ্যশূন্য স্থানে হেতু নাই, এইরূপ জ্ঞানের নাম “ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান”। এই “সহচারজ্ঞান” ব্যাপ্তিজ্ঞানের অন্ততম কারণ। উদয়নাচার্য্য ঐ ব্যাপ্তিগ্রাহক “সহচারে”র ভেদেই অদ্বয়নামকে পূর্বোক্ত নামকরে জীবন বলিয়াছেন। উদয়নের মতে “ব্যতিরেকসহচার” জ্ঞানের দ্বারা “অদ্বয়ব্যাপ্তি”র নিশ্চয় পূর্বকই অদ্বয়নামিত জানে, ইহা নব্য জ্ঞানের অনেক গ্রন্থে পরিষ্কৃত আছে। উদয়নের “জ্ঞানকুসুমাজলি” গ্রন্থে (তৃতীয় স্তবকে) অর্থাপত্তি বিচারে কিন্তু ইহা পরিষ্কৃত নাই।

উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী জ্ঞানচার্য্যগণ পূর্বোক্ত প্রকারে হেতু ও অনুমান বিষয়ে নানা মতভেদের সৃষ্টি করিলেও ভাব্যকার পূর্বোক্ত জীবন নাম ও তাহানিগের ঐরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাব্যকারের মতে হেতু দ্বিবিধ;—সাধ্যার্থ্য হেতু এবং বৈধর্ম্য হেতু। হেতুবাক্যও পূর্বোক্ত নামকরে দ্বিবিধ। উদাহরণের ভেদেই হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ ইহা থাকে। পূর্ব-প্রদর্শিত “উৎপত্তিদ্বন্দ্বকথা” এই প্রকার হেতুবাক্যটি সাধর্ম্যোদাহরণ স্থলে সাধ্যার্থ্য হেতুবাক্য হইবে এবং বৈধর্ম্যোদাহরণ স্থলে উহা বৈধর্ম্যহেতুবাক্য হইবে। ফলকথা, উদাহরণের ভেদে এক আকারের হেতুবাক্যেরও পূর্বোক্ত প্রকারভেদ হইবে এবং তাহা হইতে পারে। উদ্যোতকর এই কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, উদাহরণের ভেদে হেতুবাক্যের ঐ প্রকার ভেদই মহাবির বিবক্ষিত হইলে, মহাবির পরবর্তী বৈধর্ম্যোদাহরণস্থত্রের দ্বারা এই ভেদ ব্যক্ত হইতে পারে; সুতরাং মহাবির এই সূত্রটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। ভাব্যকার ইহা মনে করেন নাই। কারণ, হেতুবাক্য দ্বিবিধ, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তও মহাবির এখানে এই সূত্রটি বলা আবশ্যক। সুতরাং মহাবি এখানে যথাক্রমে দুইটি সূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। ফলকথা, প্রকৃত স্থলে উদাহরণস্থত্রের দ্বারা হেতুর দ্বিবিধ বৃদ্ধা গেলেও, মহাবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ত অর্থাৎ হেতু দ্বিবিধ নহে, দ্বিবিধ, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্ত এই সূত্রটি বলিয়াছেন। উদ্যোতকরও হেতুভাসের লক্ষণ-সূত্রগুলির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বস্থলে বলিয়াছেন যে, যদিও এই হেতুলক্ষণের দ্বারা হেতুপদার্থের অবধারণ হওরায়, হেতুভাসগুলি নিরাকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ সেগুলি হেতু নহে, সেগুলি “হেতুভাস” ইহা বৃদ্ধা গিয়াছে অর্থাৎ যদিও হেতুপদার্থের লক্ষণ বৃদ্ধিগেই “হেতুভাসে”র স্বরূপ বৃদ্ধা যায়, তথাপি “অনৈকান্তিক” প্রকৃতি নামে এই “হেতুভাস”গুলি পঞ্চবিধ,—এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তই মহাবি যথাস্থানে “হেতুভাসে”র পাঁচটি লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। উদ্যোতকরের এই কথা র্ত্তায় এখানেও ভাব্যকারের পক্ষে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। ফলকথা, মহাবি ব্যাক্যসংক্ষেপ না করিয়া স্তম্ভ স্থলের জ্ঞান এখানেও দুইটি সূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুবাক্যেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং উদাহরণের ভেদেই হেতুবাক্যের এই দ্বিবিধ মহাবির বিবক্ষিত, ইহাই ভাব্যকারের কথা। হেতুপদার্থ এবং হেতুবাক্য যে ভাব্যকারের মতে পূর্বোক্তরূপে দ্বিবিধ এবং একই হেতুপদার্থ উদাহরণের ভেদে “সাধ্যার্থ্য-হেতু” এবং “বৈধর্ম্য হেতু” হইতে পারে, ইহা নিগমন-সূত্র-ভাষ্যেও স্পষ্ট আছে। “সাধ্যার্থ্য বৈধর্ম্য হেতু” বা “অদ্বয়ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু ভাব্যকার মানেন নাই।



একই স্থানে বিবিধ উদাহরণের সাহায্যে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তিনিশ্চয়কে অল্পমিতির কারণ বলিয়া স্বীকার করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। কোন কোন নব্য নৈমার্মিকও তাহা আবশ্যক মনে না করিয়া “অবয়ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু বা অহুমান মানেন নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি বাহ্যকে “অবয়ব্যতিরেকী” হেতু বলিয়াছেন, ভাষ্যকারের মতে তাহা “সাধর্ম্য হেতু”ও হইতে পারে, “বৈবর্ধ্য হেতু”ও হইতে পারে। ভাষ্যকার “শেষবৎ” অহুমানের দ্বারা উদাহরণ দেখাইয়া আসিয়াছেন, উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহা গ্রহণ করেন নাই (পঞ্চম হৃত্তাভ্যাসটিগুনী দ্রষ্টব্য)। সেখানে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি নিশ্চয় বলিয়াছেন যে, “শেষবৎ” অহুমান “ব্যতিরেকী” অহুমানেরই নামান্তর। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত “শেষবৎ”র উদাহরণটি “অবয়ব্যতিরেকী”, সুতরাং উহা গ্রাহ্য নহে। ভাষ্যকার কিন্তু “পরিশেষ” অহুমানকেই “শেষবৎ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই স্থলীয় হেতু উদাহরণানুসারে “সাধর্ম্য হেতু”ও হইতে পারে, “বৈবর্ধ্য হেতু”ও হইতে পারে। কলকথা, “পরিশেষ” অহুমান বা ভাষ্যকার-ব্যাখ্যাত “শেষবৎ” অহুমান সর্বত্র “ব্যতিরেকী” অহুমানই হইবে, অর্থাৎ উহা “ব্যতিরেকী” অহুমানেরই নামান্তর, ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হয় নাই। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে তাহার ঐ উদাহরণ অসংগত হয় নাই।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথও হেতুবাক্যকে “অবয়ব্যী” ও “ব্যতিরেকী” নামে দ্বিবিধ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি হৃত্তের “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা “অবয়ব্যাপ্তি” এবং “বৈবর্ধ্য” শব্দের দ্বারা “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” কলিতার্থ গ্রহণ করিয়া হৃত্তবৃত্তের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির ভেদেই হেতু দ্বিবিধ। এক হেতুতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে, সেই স্থলীয় হেতুবাক্যের নাম “অবয়ব্যতিরেকী”, মহর্ষি-হৃত্তে তাহাও সূচিত হইয়াছে; ইহা নতাস্তর বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বৃত্তিকারের নিজের মত নহে।

“ভারমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট এখানে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয়াই হেতুবাক্যের লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। হেতুপদার্থ কি, তাহা বলা প্রয়োজন এবং হেতুপদার্থের স্বরূপ বুঝিলে, হেতুবাক্যের লক্ষণ সহজেই বুঝা যাইবে এবং “অবয়ব্য” প্রকরণ-বশতঃ শেষে তাহাই বুঝিতে হইবে। হেতুপদার্থের লক্ষণপক্ষে কেহ কেহ হেতুলক্ষণ-হৃত্তদ্বয়ে পঞ্চমী বিভক্তি ত্যাগ করিয়া, ঐ স্থলে সপ্তমী বিভক্তিবৃত্ত হৃত্ত পাঠ করিতেন, এই কথা বলিয়া জয়ন্ত ভট্ট হেতুপদার্থের লক্ষণপক্ষেও হৃত্তে পঞ্চমী বিভক্তির কথঞ্চিৎ সংগতি ও আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন।

জয়ন্তভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম অহুমান-হৃত্তে (পঞ্চম হৃত্তে) “তৎপূর্বকং” এই কথার দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপাদ্যমাত্র স্থচনা করিয়াছেন। এখানে হেতুলক্ষণ-হৃত্তে “সাধ্য-সাধন” শব্দের দ্বারা ঐ “ব্যাপ্তি”র স্বরূপও স্থচনা করিয়াছেন এবং “হেতুভাস”কে পঞ্চবিধ বলিয়া “ব্যাপ্তি” পঞ্চবিধ, ইহাও স্থচনা করিয়াছেন। এক একটি “ব্যাপ্তি”র অভাবেই এক একটি “হেতুভাস” হওয়ায়, “হেতুভাস” পঞ্চবিধ হইয়াছে। “হেতুভাস”ের কোন লক্ষণ না থাকাই “ব্যাপ্তি”। তাহাই হেতুর সাধ্যসাধনতা। বাহ্য সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট,



তাহাই প্রকৃত হেতু। “হেতুভাস” পদার্থে সাধ্যসাধনতা অর্থাৎ সাধের “ব্যাপ্তি” নাই, এ জন্ত সেগুলি হেতু নহে। ফলকথা, মহর্ষি হেতুলক্ষণস্থলে “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারা “ব্যাপ্তি”কেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং হেতু পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ক্স স্থলে “উদাহরণ-সাধ্যসাধ্যাং” এই কথার দ্বারা এবং এই স্থলের দ্বারা বথাক্রমে “অমরব্যতিরেকী” ও “কেবলব্যতিরেকী” হেতুর বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন। “কেবলব্যতিরেকী” নামে কোন হেতু নাই; মহর্ষি তাহা বলেন নাই। কোন সম্প্রদায় একমাত্র “অমরব্যতিরেকী” হেতুই স্বীকার করিয়াছেন। তাহার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম হই স্থলের দ্বারা “অমরব্যতিরেকী” হেতুরই লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, “কেবলব্যতিরেকী” এবং “কেবলব্যতিরেকী” নামে কোন প্রকার হেতু নাই, উহা স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মহর্ষি পূর্ক্সস্থলের দ্বারা “অমর” এবং পরস্থলের দ্বারা “ব্যতিরেক” নিরূপণ করিয়া দুই স্থলে এক বাক্যে “অমরব্যতিরেকী” হেতুরই নিরূপণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কারণ, ভাষ্যকার “কিমেতাবজ্জৈতুলক্ষণমিতি, নেতুচ্যতে” এই কথার দ্বারা এই স্থলের অবতারণা করিয়া পূর্ক্সস্থলের সহিত এই স্থলের একবাক্যভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উভয় স্থলে তিনি হেতুবাক্যের একই প্রকার উদাহরণ বলিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত হেতুবাক্যটি দ্বিবিধ উদাহরণের দোখে “অমরব্যতিরেকী”। সুতরাং বুঝা যায়, ভাষ্যকারও একমাত্র “অমরব্যতিরেকী” হেতুই মহর্ষির সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জয়ন্তভট্ট এই মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, “কেবলব্যতিরেকী” হেতু অবশ্য স্বীকার্য, নচেৎ আত্মা প্রকৃতি পদার্থসাধন সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার পূর্ক্সে (অনুমান-স্থত্র ভাষ্যে) আত্মার অনুমানে “কেবলব্যতিরেকী” হেতুকেই আশ্রয় করিয়াছেন, সুতরাং “কেবলব্যতিরেকী” হেতু ভাষ্যকারেরও সম্মত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা হইলে এই স্থলের দ্বারা ভাষ্যকার সেই “কেবলব্যতিরেকী” হেতুরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতেই হইবে। ফলকথা, জয়ন্তভট্ট “কেবলব্যতিরেকী” হেতুর সমর্থন করিয়া হেতুকে “অমরব্যতিরেকী” এবং “কেবলব্যতিরেকী” এই নামদ্বয়ে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। “কেবলব্যতিরেকী” বা “অমরী” নামে কোন হেতু বা অনুমান মানেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষি দুই স্থলের দ্বারা একযোগে একপ্রকার হেতুর লক্ষণই বলেন নাই। একমাত্র লক্ষণই তাহার বক্তব্য হইলে, তিনি এক স্থলের দ্বারাই তাহা বলিতেন। মহর্ষি অস্ত্রভট্ট দুই স্থলের দ্বারা একমাত্র লক্ষণ বলেন নাই। পরন্তু ভাষ্যকারের মতে হেতু যে দ্বিবিধ, ইহা নিগমন-স্থত্রভাষ্যে স্পষ্ট আছে, সুতরাং ভাষ্যকার হেতুকে একপ্রকার বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা কখনই বলা যায় না। এবং নিগমন-স্থত্রভাষ্যে ভাষ্যকার পৃথকভাবে দ্বিবিধ হেতুবাক্যের প্রয়োগ প্রদর্শন করায়, তিনি যে একই স্থলে “অমরব্যতিরেকী” নামে একপ্রকার হেতুবাক্যই এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। (নিগমনস্থত্র-ভাষ্য জটব্য)। ভাষ্যকার “অমরব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু মানেন নাই, এ কথা পূর্ক্সেই বলা হইয়াছে। জয়ন্তভট্টের স্থত্র ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, হেতুপদার্থের লক্ষণ পক্ষে স্থলে পক্ষমী বিভক্তির সম্যক



সংগতি হয় না। পরন্তু “অবয়ব” প্রকরণবশতঃ এখানে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই মহাবির মুখ্য বক্তব্য, সুতরাং এই দুই স্তরের দ্বারা প্রকরণবাহুসারে হেতুবাক্যের লক্ষণই মুখ্যতঃ বুঝিতে হইবে। তাহাতে হেতুপদার্থের স্বরূপ এবং ভেদও বুঝা যাইবে। প্রাচীন জ্ঞানার্চর্য্য উদ্যোতকরও হেতুবাক্যের লক্ষণ পক্ষেই স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়া ইহার দ্বারাই হেতুপদার্থের স্বরূপও প্রকটিত হইয়াছে, ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। হেতুবাক্যে যে পক্ষমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়, ঐ পক্ষমী বিভক্তির দ্বারাই সেখানে হেতুপদার্থের হেতুত্ব বা জ্ঞাপকত্ব বুঝা যায়। পক্ষমী বিভক্তির ঐরূপ অর্থে “নিরূপকলক্ষণ” স্বাক্য হেতুবাক্যে পক্ষমী বিভক্তিরই প্রয়োগ করিতে হইবে।

“তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ্বর বলিয়াছেন যে, হেতুবাক্যস্থলে সর্বত্র হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে লক্ষণাই বাদীর অভিপ্রেত। কারণ, হেতুপদার্থের জ্ঞানই বস্তুতঃ অন্তর্য্যানে হেতু হইয়া থাকে। হেতুপদার্থ অন্তর্য্যানের হেতু হয় না। সুতরাং পক্ষমী বিভক্তির অর্থ যে হেতুত্ব, তাহাতে হেতুপদার্থের অর্থ সম্ভব নাহে বলিয়া, হেতুবোধক শব্দের দ্বারা লক্ষণার সাহায্যে হেতুজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং পক্ষমী বিভক্তির দ্বারা সেখানে “জ্ঞাপ্যত্ব” বুঝিতে হইবে। যেমন “পক্ষতো বহিমান্” এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে “ধূমাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য বলিলে, সেখানে “ধূম” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—ধূমজ্ঞান। পক্ষমী বিভক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে—জ্ঞাপ্যত্ব, ধূমজ্ঞান বহির জ্ঞান জন্মায়, এ জ্ঞান ধূমজ্ঞানটী জ্ঞাপক, বহি তাহার জ্ঞাপ্য। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের মিলনে উহার দ্বারা বুঝা যাইবে—“ধূমজ্ঞানের জ্ঞাপ্য যে বহি, সেই বহিবিশিষ্ট পক্ষতঃ”। দীর্ঘতিকাির রঘুনাথ শিরোমণি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মিলনে একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ জন্মে, এই প্রাচীন মত স্বীকার না করিলেও “প্রতিজ্ঞা” ও “হেতুবাক্য”র একবাক্যতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি হেতুবাক্যস্থ হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে লক্ষণা স্বীকার করেন নাই। তিনি গঙ্গেশ্বরের ঐ মতের অপরিহার্য্য অল্পপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। রঘুনাথ নব্য মত বলিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন হেতুবাক্যস্থ পক্ষমী বিভক্তিতেও লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে, তখন ঐ পক্ষমী বিভক্তির দ্বারাই লক্ষণার সাহায্যে “জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব”রূপ অর্থ বুঝিয়া “প্রতিজ্ঞা” ও “হেতুবাক্য”র মিলনে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বোধ হইতে পারে। সুতরাং সর্বত্র হেতুবাক্যস্থ পক্ষমী বিভক্তিতেই “জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব”রূপ অর্থে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। হেতুবোধক শব্দের দ্বারা হেতুপদার্থই বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন মতে সর্বত্র হেতুবাক্যস্থ পক্ষমী বিভক্তির অর্থ হেতুত্ব বা সাধনত্ব। উহার ফলিতার্থ—জ্ঞাপকত্ব। ঐ জ্ঞাপকত্বের সহিত হেতুপদার্থ ও সাধ্য বর্ণের সম্বন্ধবিশেষে অর্থ বোধই প্রাচীনদিগের সম্মত। সুতরাং “ধূমাৎ” এইরূপ বাক্যের দ্বারা ধূমরূপ হেতু পদার্থের যে জ্ঞাপকত্ব, তাহা বুঝা যায়, অর্থাৎ “ধূম জ্ঞাপক” ইহা বুঝা যায়। তাহাতেই মধ্যস্থের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয়। জ্ঞাপকত্ব বলিতে এখানে জ্ঞানজনক জ্ঞানের বিবরণ। সুতরাং উহা হেতু পদার্থেই থাকে।

১। হেতুবাক্যে পক্ষমী লক্ষণিক।—অবয়ববীতি। হেতুত্ব জ্ঞাপকত্ব: আদিবা জ্ঞাপ্যত্বত্ব: পরিগ্রহঃ—জ্ঞাপকত্ব।



ভাষাকারের প্রদর্শিত “উৎপত্তিধর্মকল্প” এই বাক্যের দ্বারা উৎপত্তিধর্মকল্প জ্ঞাপক, ইহা বুঝা যায়। ৩৫।

## সূত্র । সাধ্যসাধ্যাত্তদ্ব্যভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । সাধ্যধর্ম্যের সহিত সমানধর্ম্য প্রযুক্ত সেই সাধ্যধর্ম্যের ধর্ম্যটি যেখানে বিদ্যমান থাকে, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ, (সাধ্যম্যোদাহরণ-বাক্য) ।

বিস্তৃতি । যে ধর্ম্যবিশিষ্ট বলিয়া যে ধর্ম্যকে অহুমানের দ্বারা বুঝাইতে হইবে সেই ধর্ম্যবিশিষ্ট সেই ধর্ম্যকে বলে “সাধ্যধর্ম্য” এবং সেই ধর্ম্যতে সেই ধর্ম্যটিকে বলে “সাধ্যধর্ম” । “সাধ্য” বলিলে এই সাধ্য ধর্ম্মী অথবা এই “সাধ্যধর্ম্ম”কে বুঝিতে হইবে । যেমন নৈয়ায়িক শব্দরূপ ধর্ম্মকে অনিত্যরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অহুমানের দ্বারা বুঝাইতে গেলে, সেখানে অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দই নৈয়ায়িকের “সাধ্যধর্ম্মী” এবং ঐ অনিত্যত্ব ধর্ম্মই “সাধ্যধর্ম্ম” । নৈয়ায়িক প্রথমতঃ (১) “শব্দ অনিত্য”, এই কথার দ্বারা ঐ সাধ্যধর্ম্মীকে প্রকাশ করিবেন । উহারই তাহার “সাধ্যনির্দেশ”, উহারই নাম “প্রতিজ্ঞা” । পরে শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহার জ্ঞাপক কি ? এই প্রশ্নাহসারে নৈয়ায়িক বলিবেন,—(২) উৎপত্তিধর্ম্মকল্প জ্ঞাপক, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকল্পরূপ ধর্ম্মটি শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক । নৈয়ায়িকের এই দ্বিতীয় বাক্যই (উৎপত্তিধর্ম্মকল্প জ্ঞাপক) তাহার হেতুবাক্য ।

যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, উৎপত্তি তাহাদিগের ধর্ম্ম । সুতরাং সেই সকল পদার্থকে “উৎপত্তিধর্ম্মক” বলা যায় । তাহা হইলে সেই সকল পদার্থে “উৎপত্তিধর্ম্মকল্প” নামে ধর্ম্ম আছে, এ কথাও বলা যায় । নৈয়ায়িকের বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা অনিত্য পদার্থ । শব্দের বখন উৎপত্তি হয়, তখন শব্দও অনিত্য পদার্থ, শব্দ কখনই নিত্য পদার্থ হইতে পারে না । উৎপত্তি হইলেই যে সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা বুঝিব কিরূপে ? এ জন্ত নৈয়ায়িক শেষে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন । নৈয়ায়িক বলিবেন যে, (৩) “বাহ্য উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা অনিত্য ; যেমন স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য” । নৈয়ায়িকের ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেগুলিকে ত অনিত্যই দেখা যায় । ঐ যে কুস্তকারগণ স্থালী প্রভৃতি (হাড়ী কলস প্রভৃতি) প্রস্তুত করিতেছে, ঐগুলি কি নিত্য পদার্থ ? ঐগুলি ত সর্ব্বলক্ষ্যত অনিত্য পদার্থ । উহাদিগের উৎপত্তি হইতেছে, সুতরাং উহার উৎপত্তিধর্ম্মক । তাহা হইলে ঐ সকল দৃষ্টান্তেই বুঝা গেল যে, উৎপত্তিধর্ম্মক হইলেই সে পদার্থ অনিত্য হইবে । অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকল্প সাধন এবং অনিত্যত্ব তাহার সাধ্যধর্ম্ম, ইহা ঐ সকল দৃষ্টান্তেই বুঝা গিয়াছে । নৈয়ায়িকের ঐ তৃতীয় বাক্যের নাম “উদাহরণ-বাক্য” । এই স্থলে “উৎপত্তিধর্ম্মকল্প” এই ধর্ম্মটি নৈয়ায়িকের সাধ্যধর্ম্মী অনিত্য শব্দ এবং স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত,—এই উভয়েই আছে ;



কোন নিত্য পদার্থে নাই, এ জন্ত ঐ ধর্মটি সাধ্যধর্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের “সাধ্যা” বা সমান ধর্ম। ঐ উৎপত্তিধর্মকল্পরূপ সাধ্যা প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ ধর্মটি আছে বলিয়া, স্থানী প্রকৃতি দৃষ্টান্তে অনিত্য ধর্ম বিদ্যমান আছে। ফলিতার্থ এই যে, ঐ উৎপত্তিধর্মকল্প থাকিলেই যেখানে অনিত্য ধর্ম বিদ্যমান থাকে, ইহা ঐ স্থানী প্রকৃতি দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে; তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তের বোধক পূর্বোক্ত প্রকার তৃতীয় বাক্য নৈয়ায়িকের “উদাহরণ-বাক্য” হইবে। ঐ উদাহরণ-বাক্য পূর্বোক্তরূপ সাধ্যা-প্রযুক্ত বলিয়া উহাকে বলে “সাধ্যোদাহরণ-বাক্য।”

ভাষ্য। সাধ্যেন সাধ্যাঃ সমানধর্মতা, সাধ্যসাধ্যাঃ কারণাৎ তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত ইতি। তস্য ধর্মস্তদ্ধর্মঃ। তস্য, সাধ্যস্য। সাধ্যঞ্চ দ্বিবিধঃ,—ধর্মিঃ বিশিষ্টো বা ধর্মঃ শব্দস্থানিত্যত্বঃ, ধর্মিঃ বিশিষ্টো বা ধর্মী, অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ইহোত্তরং তদগ্রহণেন গৃহ্যত ইতি। কস্মাৎ? পৃথগ্ধর্মবচনাৎ। তদ্ধর্মস্য ভাবস্তদ্ধর্মভাবঃ, স যস্মিন্ দৃষ্টান্তে বর্ততে স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধ্যাঃ উৎপত্তিধর্মকল্পাৎ তদ্ধর্মভাবী ভবতি, স চোদাহরণ-মিষ্যতে। তত্র যদুৎপাদ্যতে তদুৎপত্তিধর্মকং, তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি আত্মনাং জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম্। এবমুৎপত্তিধর্মকল্পঃ সাধন-মনিত্যত্বঃ সাধ্যাঃ, সোহরমেকস্মিন্ দ্বয়োর্ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ সাধ্যসাধ্যাব্যবস্থিত উপলভ্যতে, তং দৃষ্টান্তে উপলভ্যমানঃ শব্দেহ-প্যনুমিনোতি, শব্দোহপ্যুৎপত্তিধর্মকল্পাদনিত্যঃ স্থালাদিবদিতি।

উদাহ্রিয়তে তেন ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাব ইত্যুদাহরণম্।

অনুবাদ। সাধ্যধর্মীর সহিত অর্থাৎ যে ধর্মীকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধর্মীর সহিত সাধ্যা কি না—সমান-ধর্মতা অর্থাৎ সমান ধর্ম। সাধ্যসাধ্যারূপ প্রয়োজকবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর সমান ধর্মটি আছে বলিয়া, সেই সাধ্যধর্মীর ধর্মটি (সাধ্যধর্মটি) যেখানে বিদ্যমান আছে, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। ( “তদ্ধর্মভাবী” এই সূত্রোক্ত বাক্যের পদার্থ বর্ণন-পূর্বক ব্যাখ্যা করিতেছেন )। তাহার ধর্ম “তদ্ধর্ম”। তাহার কি না—সাধ্যের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর। “সাধ্য” কিন্তু দ্বিবিধ, (১) ধর্মিঃ বিশিষ্ট ধর্ম অর্থাৎ কোন ধর্মিগত কোন ধর্ম, (যেমন) শব্দের অনিত্য অর্থাৎ শব্দরূপ ধর্মিগত অনিত্যধর্ম। (২) অথবা ধর্মিঃ বিশিষ্ট ধর্মী (যেমন) অনিত্য শব্দ অর্থাৎ অনিত্যরূপ ধর্মিঃ বিশিষ্ট শব্দরূপ ধর্মী। এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা উত্তরটি



অর্থাৎ শেবোক্ত ধর্মবিশিষ্ট ধর্মরূপ সাধ্য বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) “ধর্ম” শব্দের পৃথক উল্লেখবশতঃ। অর্থাৎ সূত্রে “তদ্ব্যবহারী” এই স্থলে “তৎ” শব্দের দ্বারা যদি সাধ্য ধর্ম বুঝানই মহাবীর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আর “ধর্ম” শব্দ পৃথক বলিতেন না, “তদ্ব্যবহারী” এইরূপই বলিতেন। তদ্ব্যবহারী ভাব “তদ্ব্যবহারী”। তাহা অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্মের ধর্ম যে সাধ্যধর্ম, তাহার ভাব কি না—বিদ্যমানতা যে দৃষ্টান্ত পদার্থে আছে, সেই দৃষ্টান্ত (প্রদর্শিত স্থলে) উৎপত্তি-ধর্মকরূপ সাধ্যসাধ্য প্রযুক্ত “তদ্ব্যবহারী” আছে। (অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকরূপ ধর্ম আছে, উহা সাধ্যধর্ম অনিত্য শব্দেও আছে, সুতরাং ঐ ধর্মটি শব্দ ও স্থানী প্রভৃতির সমান ধর্ম এবং ঐ ধর্মটি থাকিলেই সেখানে অনিত্যধর্ম থাকে, ইহা স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে। এ জন্ত পূর্বোক্ত উৎপত্তিধর্মকরূপ সমান ধর্ম প্রযুক্ত স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত “তদ্ব্যবহারী” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মের ধর্ম যে অনিত্য, তাহার ভাব কি না—বিদ্যমানতা ঐ দৃষ্টান্তে আছে)। তাহাই অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্তবোধক বাক্যবিশেষই উদাহরণ বলিয়া অর্থাৎ “সাধ্যোদাহরণ বাক্য” বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে।

সেই স্থলে অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেও যে কোনরূপে বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না (এবং) আত্মাকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে ত্যাগ করে, নিরূপ্ত হয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না, এজন্য অনিত্য। এইরূপ হইলে উৎপত্তিধর্মক হেতু, অনিত্যই সাধ্যধর্ম। ধর্মবয়ের অর্থাৎ অনিত্য এবং উৎপত্তিধর্মক এই দুইটি ধর্মের সেই এই সাধ্য-সাধন-ভাব সাধ্যপ্রযুক্ত ব্যবস্থিত বলিয়া এক পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে উপলব্ধি করে। তাহাকে অর্থাৎ ঐ দুইটি ধর্মের পূর্বোক্ত সাধ্যসাধন ভাবে দৃষ্টান্ত পদার্থে উপলব্ধিকরতঃ শব্দেও অনুমান করে। (কিরূপ অনুমান করে, তাহা বলিতেছেন) শব্দও উৎপত্তিধর্মক বলিয়া স্থানী প্রভৃতির দ্বারা (হাড়ী কলস প্রভৃতি উৎপত্তি-ধর্মক বস্তুর দ্বারা) অনিত্য।

তাহার দ্বারা অর্থাৎ সেই বাক্যবিশেষের দ্বারা ধর্মবয়ের সাধ্যসাধন-ভাব উদাহৃত (প্রদর্শিত) হয়, এজন্য “উদাহরণ” অর্থাৎ “উদাহরণ” শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তিসম্মত অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে—উদাহরণ-বাক্য এবং উহার দ্বারাই উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে।



টিপ্পনী। “প্রতিজ্ঞা”-বাক্যের পরেই “হেতু”-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া সেই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারণ, যাহা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য বা ব্যতিচারী পদার্থ, তাহা হেতু হয় না। ঐ ব্যাপ্তি প্রদর্শন উদাহরণ-বাক্য ব্যতীত হয় না, এ জ্ঞাত মহর্ষি হেতু-বাক্যের লক্ষণের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত “উদাহরণ-বাক্যের” লক্ষণ বলিয়াছেন। “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থও বুঝা যায়; কিন্তু এখানে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা “উদাহরণ-বাক্য” বুঝিতে হইবে। কারণ, মহর্ষি “উদাহরণ” নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। “অবয়ব” বাক্যবিশেষ, সুতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ “অবয়ব” হইতে পারে না। যে বাক্যের দ্বারা দুইটি ধর্মের সাধাসাধন-ভাব উদাহৃত অর্থাৎ প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা ইহা সূত্রে “উদাহরণ” নামক তৃতীয় অবয়বের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকারও সর্বশেষে সূত্রোক্ত “উদাহরণ” শব্দের পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া, মহর্ষি-সূচিত উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এই উদাহরণ-বাক্য ত্রিবিধ;— “সাধ্যোদাহরণ” এবং “বৈধোদাহরণ”। উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী স্মার্য্যচাৰ্য্যগণ যথাক্রমে ইহাকেই বলিয়াছেন—“অমরী উদাহরণ” এবং “ব্যতিরেকী উদাহরণ”। উদাহরণের বিবিধত্ব বিষয়ে সকলেই একমত। “হেতু”কে ত্রিবিধ বলিলেও “উদাহরণকে” কেহই ত্রিবিধ বলেন নাই। উদাহরণ-বাক্য-বোধ্য দৃষ্টান্ত পদার্থও পূর্বোক্ত প্রকারে ত্রিবিধ। দৃষ্টান্ত পদার্থ কাহাকে বলে, মহর্ষি তাহা পূর্বে বলিয়াছেন। এখানে সেই দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্যবিশেষকেই “উদাহরণ-বাক্য” বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত পদার্থ কখনই উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে না, মহর্ষি তাহা বলিতে পারেন না, সুতরাং সূত্রে “দৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—দৃষ্টান্তবোধক বাক্য। প্রাচীন ভাষার এইরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতিও এখানে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা “সাধ্যোদাহরণ”-বাক্যের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। কিরূপ দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্যবিশেষ “সাধ্যোদাহরণ” হইবে, তাহা বলিবার জ্ঞাত মহর্ষি বলিয়াছেন—“সাধ্যসাধ্যাৎ তদ্ব্যবভাবী দৃষ্টান্তঃ”। ভাষ্যকার “সাধ্যেন সাধ্যাৎ” এই কথার দ্বারা সংক্ষেপে ঐ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে স্বপদ বর্ণনার দ্বারা সূত্রের বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন।

যাহা অন্তর্মানের দ্বারা সাধন করিতে হইবে, তাহাকে বলে “সাধ্য”। শব্দগত অনিত্যত্ব ধর্মও “সাধ্য” হইতে পারে, আবার অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দও সাধ্য হইতে পারে। শব্দ সিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনিত্য বলিয়া সর্বসিদ্ধ নহে। কারণ, বীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নৈয়ায়িক বীমাংসকের সহিত বিচারে শব্দকে অনিত্য বলিয়া সাধন করিতে গেলে, অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দকেও “সাধ্য” বলা যায়। মহর্ষি প্রায় সর্বত্রই এই অভিপ্রায়ে “সাধ্যত্ববিশিষ্ট ধর্মী” অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে “সাধ্য”কে বিবিধ বলিয়া অর্থাৎ কোন ধর্মগত ধর্ম, অথবা সেই ধর্মবিশিষ্ট সেই ধর্মী, এই উক্তর অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া মহর্ষির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সূত্রে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা ধর্মবিশিষ্ট ধর্মরূপ সাধ্যকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, উৎপত্তি-



ধর্মকণ্ড প্রভৃতি হেতু পদার্থ তাহারই সাধর্ম্য হইতে পারে, সাধ্যধর্মের সাধর্ম্য হইতে পারে না ; কোন স্থলে হইলেও সেইরূপ সাধর্ম্য এখানে বিবক্ষিত নহে। যে ধর্মকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধর্মের সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের যেটি সমান ধর্ম, তাহাই এখানে “সাধ্যসাধর্ম্য”। কলিতার্থ এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধর্মের সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের বাহ্য কেবল মাত্র সাধর্ম্য (বৈধর্ম্য নহে), তাহাই এই স্থলে “সাধ্যসাধর্ম্য”। এখানে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা যদি ধর্মরূপ সাধ্যই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে “তদ্ধর্মভাবী” এই স্থলে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত ধর্মরূপ সাধ্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত পদার্থ ই বুঝিতে হয়। উদ্যোতকর প্রভৃতি এইরূপ যুক্তির দ্বারা স্বত্রোক্ত “তৎ” শব্দের অর্থ নির্ধারণ করিলেও যদি কেহ পরবর্তী বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ প্রভৃতির দ্বারা “সাধর্ম্য” শব্দের অন্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মেরই ব্যাখ্যা করেন এবং “তদ্ধর্মভাবী” এই স্থলে “তদ্ধর্ম” শব্দের দ্বারা তাহার ধর্ম না বুঝিয়া, সেই সাধ্যরূপ ধর্মকেই বুঝেন এবং সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে সে ব্যাখ্যা সংগত নহে, এত দূর চিন্তা করিয়া ভাব্যকার একটি বিশেষ যুক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভাব্যকারের সে যুক্তির মর্ম এই যে, যদি স্বত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মই মহাবির বিবক্ষিত হইত এবং পূর্ববর্তী “সাধ্য” শব্দের দ্বারাও সাধ্যধর্মই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে আর “ধর্ম” শব্দের পৃথক উল্লেখ করিতেন না। “তদ্ধর্মভাবী” এইরূপ কথা বলিলেই মহাবির বলব্য বলা হইত। মহাবির যখন “তদ্ধর্মভাবী” না বলিয়া “তদ্ধর্মভাবী” এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়, “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মই তাঁহার বিবক্ষিত। “তদ্ধর্ম” বলিতে সেই সাধ্যধর্মের ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম। “তদ্ধর্ম” বলিতে সেই সাধ্যরূপ ধর্ম বুঝিলে, সে পক্ষে “ধর্ম” শব্দের প্রকৃত সার্থকতা থাকে না, ইহাই ভাব্যকারের গূঢ় তাৎপর্য। এখানে ভাব্যকারের এই কথার দ্বারা মহাবির যে সাধ্যধর্মকেও “সাধ্য” বলেন অর্থাৎ তাঁহার “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম অর্থও কোন স্থলে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহা ভাব্যকারেরও মত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা না হইলে এখানে ভাব্যকার মহাবির-স্বত্রোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা ধর্মরূপ সাধ্যই বুঝিতে হইবে, এই কথা বলিতে এবং তাহার হেতু দেখাইতে গিয়াছেন কেন ? তাহার দ্বারা অর্থ গ্রহণ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে প্রাচীনগণ শব্দ অর্থেও “গ্রহণ” শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ভাব্য “তদগ্রহণ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে তৎ শব্দ।

এখন মূল কথা এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধর্মের সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের বাহ্য কেবলমাত্র সাধর্ম্য (বৈধর্ম্য নহে), তাহাই স্বত্রোক্ত “সাধ্যসাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্মী। স্থানী প্রভৃতি সর্বসম্মত অনিত্য পদার্থগুলি দৃষ্টান্ত। ঐ সকল পদার্থের উৎপত্তি নীমাংসকও মানেন। নৈমারিক শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। নৈমারিক বহু বিচার দ্বারা শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে “উৎপত্তিধর্মকণ্ড”

১। সাধ্যসাধর্ম্যঃ সাধ্যসহচরিত-ধর্মীঃ প্রকৃতসাধনাদিত্যর্থঃ। তৎ সাধ্যরূপং ধর্মং ভাব্যত্বতি, তথাচ সাধন-বস্তাঃপ্রকৃত-সাধ্যবস্তাঃপ্রভাবকোহিব্যবঃ সাধ্যসাধনবাস্তাঃপ্রকৃতসাধনবস্তাঃপ্রভাবতি ইত্যর্থঃ।—নিঘন্যাবৃত্তি।



ধর্মটি প্রদর্শিত হলে সাধ্যধর্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম। স্থানী প্রকৃতি অনিত্য কোন পদার্থে ঐ ধর্মের অভাবও নাই; সুতরাং উৎপত্তিধর্মকর ধর্মটি প্রদর্শিত হলে সূত্রোক্ত “সাধ্যসাধর্ম্য” হইয়াছে। ঐ উৎপত্তিধর্মক বলিয়া স্থানী প্রকৃতি জব্যোও অনিত্যধর্ম বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক হইলেই সেখানে অনিত্যধর্ম বিদ্যমান থাকে, ইহা স্থানী প্রকৃতি জব্যো বুঝা গিয়াছে। তাহা হইলে এখানে ঐ স্থানী প্রকৃতি দৃষ্টান্তকে সূত্রোক্ত “সাধ্যসাধর্ম্যপ্রযুক্ত তদ্ধর্মভাবী” বলা যাইতে পারে। ঐরূপ স্থানী প্রকৃতি দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য-বিশেষই এখানে সূত্রানুসারে “সাধ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে।

তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে বাক্যে সাধ্যসাধর্ম্য প্রযুক্ত “তদ্ধর্মভাবী” প্রদর্শিত হয়, ঐ বাক্যই “সাধ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে, ঐরূপ বাক্য না হইলে হইবে না, ইহাই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা সূচিত হইয়াছে। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা এখানে প্রযোজকর অর্থই বুঝিতে হইবে। “সাধ্যসাধর্ম্য” এই কথার অর্থ সাধ্যসাধর্ম্য প্রযুক্ত। এই প্রযোজকতা কি? তাহা ভাবিয়া বুঝা উচিত। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, উহার কলিতার্থ এখানে ব্যাপ্যতা। তাহা ভিন্ন আর কোন অর্থ এখানে সংগত হয় না। তাহা হইলে বুঝা গেল, সাধ্যসাধর্ম্যটি ব্যাপ্য। প্রকৃত হলে উৎপত্তিধর্মকরই “সাধ্যসাধর্ম্য” বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনিত্যধর্মটি তাহার ব্যাপক। অনিত্যই প্রকৃত হলে সাধ্যধর্মীর ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম। সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য না হইলে তাহা হেতুপদার্থই হয় না। “যাহা যাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনিত্য,—সেমন স্থানী প্রকৃতি”, এইরূপ বাক্যের দ্বারা উৎপত্তিধর্মকর ধর্মটি অনিত্য ধর্মের ব্যাপ্য, অনিত্য ধর্ম তাহার ব্যাপক, ইহা অর্থাৎ ঐ ধর্মবয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব প্রদর্শিত হয়, এ জন্ত ঐরূপ বাক্য “সাধ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে। সূত্রে “সাধ্যসাধর্ম্য” এবং “তদ্ধর্মভাবী” এই দুইটি কথার দ্বারা সাধনশূন্য পদার্থ এবং সাধ্যধর্মশূন্য পদার্থ এবং যেখানে সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহা সূচিত হইয়াছে। সে সকল পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলে, তাহা “দৃষ্টান্তভাস” হইবে, “দৃষ্টান্ত” হইবে না, সুতরাং সেই সকল পদার্থবোধক বাক্যবিশেষ প্রয়োগ করিলে তাহা “উদাহরণভাস” হইবে, “উদাহরণ-বাক্য” হইবে না। এই সূত্রে “তদ্ধর্মভাবী” এই কথার ব্যাখ্যায় প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল।<sup>১)</sup> উদ্যোতকরের চরম ব্যাখ্যানুসারে তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তদ্ধর্মরূপ ভাব পদার্থ যেখানে বিদ্যমান আছে, তাহাই “তদ্ধর্মভাবী”। উদ্যোতকর ঐ স্থলে “ভাব” শব্দের দ্বারা ভাব পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন, তাহারও কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাব্যকার কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তদ্ধর্মের ভাবই “তদ্ধর্মভাব”। “অস” ধাতুনিপ্পন্ন “ভাব” শব্দের অর্থ এখানে বিদ্যমানতা। উদ্যোতকর এখানে ভাবের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“স যদিহ দৃষ্টান্তে ভবতি বিদ্যতে”। উৎপত্তি-

১। “তদ্ধর্ম ভাবিত্বং বোধকং শীলমত্র” অর্থাৎ যাহা সাধ্য সাধর্ম্যরূপ হেতু পদার্থ প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের বোধক, এইরূপ প্রাচীন ব্যাখ্যা উদ্যোতকর যতন করিয়াছেন। নবীন ত্রিকার বিশদাণ কিন্তু ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।



ধর্মকর্ত্ত প্রযুক্ত স্থানী প্রভৃতিতে অনিত্যত্ব ধর্ম উৎপন্ন হয় না। তাই উদ্যোতকর “ভবতি” এই কথা বলিয়া তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন — “বিদ্যতে”। অর্গাৎ উদ্যোতকর “ভবতি” এই স্থলে বিদ্যমানতা অর্থেই “ভূ” ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও শেষে এখানে “তদ্ব্যবস্থাভাবী ভবতি” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন; সুতরাং বিদ্যমানতা অর্থে “ভূ” ধাতুর প্রয়োগ তিনিও করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ঐরূপ প্রয়োগ করিতেন।

উৎপত্তিব্যর্থক কাহাকে বলে এবং তাহা অনিত্য হয় কেন? অনিত্য বলিতে এখানে কি বুঝিতে হইবে? ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে “উৎপত্তিব্যর্থক” বলে। ঐরূপ পদার্থ উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং উৎপত্তির পরে কোন দিন আত্মত্যাগ করে। আত্মত্যাগ করে, এই কথারই পুনরুচ্চাষ্য করিয়াছেন যে, তাহা নিকট হয় অর্গাৎ তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয়। বাহা উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং উৎপন্ন হইয়াও চিরকাল থাকে না, তাহাই এখানে অনিত্য বলিতে বুঝিতে হইবে। শব্দ উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না এবং শব্দের অত্যন্ত বিনাশ হয়, ইহাই শব্দ অনিত্য — এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা নৈয়ায়িক প্রকাশ করিয়াছেন। উৎপত্তিব্যর্থক বস্তুমাত্রই যখন উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং কোন কালে তাহার বিনাশ হইবেই — ইহা নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত, তখন নৈয়ায়িক উৎপত্তিব্যর্থক পদার্থকে অনিত্যত্ব সাধনে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

আপত্তি হইতে পারে যে, “ধ্বংস” নামক অভাবের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহার ধ্বংস হইতে পারে না, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত অনিত্যত্ব “ধ্বংস” পদার্থে না থাকায়, অনিত্যত্বের অল্পমানে ভাষ্যকার “উৎপত্তি-ব্যর্থক”কে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না; কারণ, উহা অনিত্যত্বের ব্যতিকারী। এতদ্বত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, উৎপত্তিব্যর্থক ভাব পদার্থমাত্রই অনিত্য, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। বস্তুতঃ প্রাচীনগণ উৎপত্তি পদার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সেই উৎপত্তি কেবল ভাব পদার্থেরই ধর্ম হয়। বস্তুর প্রথম ক্ষণে তাহার কারণের সহিত সমবায় সম্বন্ধই যদি এখানে “উৎপত্তি” পদার্থ বলিয়া ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উহা ধ্বংসে না থাকায় তাহার হেতু ব্যতিকারী হয় নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, শব্দে অনিত্যত্বের অল্পমানে “উৎপত্তিব্যর্থক”ই চরম হেতু নহে। ঐ হেতুতে পূর্ণোক্ত রূপ ব্যতিকারের আপত্তি করিয়া মহর্ষি গোতমই তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং মহর্ষি অস্ত্র হেতুরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথাগানে তাহা প্রকটিত হইবে। (২ অঃ, ২ অঃ, ১৩।১৪।১৫ স্বত্র জটব্য) ১৩৬।

## সূত্র। তদ্বিপৰ্য্যায়াদ্বাবিপৰীতম্ ॥৩৭॥

অনুবাদ। তাহার বিপর্যায়প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত বিপরীত (অতদ্ব্যবস্থাভাবী) দৃষ্টান্তও অর্থাৎ ঐরূপ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য-বিশেষও উদাহরণ (বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্য)।



বিস্তৃতি। যেখানে যেখানে হেতু আছে, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম আছে, ইহা যে দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, অনুমানস্থলে সেই দৃষ্টান্তকে বলে “সাধ্যদ্যোদাহরণ-বাক্য” এবং “অনুমানদৃষ্টান্ত”। ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ হইবে “সাধ্যদ্যোদাহরণ-বাক্য” এবং যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম নাই অথবা যেখানে যেখানে সাধ্যধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই হেতু নাই, ইহা যে দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, অনুমানস্থলে তাহাকে বলে “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত” ও “ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত”। ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষকে বলে “বৈধর্ম্যদ্যোদাহরণ-বাক্য”। যেমন প্রদর্শিত স্থলে “বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক নহে, সেগুলি অনিত্য নহে—যেমন আত্মা প্রভৃতি” এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা “বৈধর্ম্যদ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে। এই স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্ব” সাধ্যধর্মী শব্দের সাধ্যম্য। তাহার অভাব অর্থাৎ “অনুৎপত্তিধর্মকত্ব” সাধ্যধর্মী শব্দের বৈধর্ম্য। উহা আত্মাদি নিত্য পদার্থে আছে, সেখানে সাধ্যধর্ম অনিত্য নাই, তাহা হইলে ঐ স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্ত সাধ্যধর্মীর বৈধর্ম্য-প্রযুক্ত “বিপরীত” অর্থাৎ “তদ্ধর্মভাবী” নহে, “অতদ্ধর্মভাবী”। সুতরাং ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ ঐ স্থলে “বৈধর্ম্যদ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে।

ভাষ্য। দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং। সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি। অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তি-ধর্মকং নিত্যমাত্মাদি। সোহয়মাত্মাদিদৃষ্টান্তঃ সাধ্যবৈধর্ম্যাদনুৎপত্তি-ধর্মকত্বাদতদ্ধর্মভাবী, যোহসৌ সাধ্যস্য ধর্মোহনিত্যত্বং, স তস্মিন্ ন ভবতীতি। অত্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকত্বস্তাত্ত্বাবাদনিত্যত্বং ন ভবতীতি উপলভ্যমানঃ শব্দে বিপর্যয়মনুমিনোতি উৎপত্তিধর্মকত্বস্ত ভাবা-দনিত্যঃ শব্দ ইতি।

সাধ্যদ্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যসাধ্যম্যাৎ তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। বৈধর্ম্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। পূর্বস্মিন্ দৃষ্টান্তে যৌ তৌ ধর্মৌ সাধ্যসাধনভূতৌ পশ্যতি, সাধ্যোহপি তয়োঃ সাধ্যসাধনভাবমনুমিনোতি। উত্তরস্মিন্ দৃষ্টান্তে যয়োর্ধর্ময়ো-রেকস্তাত্ত্বাবাদিতরস্তাত্ত্বাবং পশ্যতি, তয়োরেকস্য ভাবাদিতরস্ত ভাবং

১। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্য-পুস্তকেই এখানে “তয়োরেকস্তাত্ত্বাবাদিতরস্তাত্ত্বাবং সাধ্যোহনুমিনোতি” এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠ সংলগ্ন হয় না। একের ভাবপ্রযুক্ত অপরকে তাৎপকে অনুমান করে, ইহাই এখানে ভাব্যাকারের বক্তব্য এবং তাহাই প্রকৃত কথা। ভাষ্যকার ইহার পূর্বেও বলিয়াছেন—“শব্দে বিপর্যয়মনুমিনোতি উৎপত্তি-ধর্মকত্বস্ত ভাবানিত্যঃ শব্দ ইতি”। সুতরাং এখানেও “একস্ত ভাবানিত্যস্ত ভাবং সাধ্যোহনুমিনোতি” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইল।

সাধ্যোহুমিনোতীতি । তদেতচ্ছেদাভাসেষু ন সম্ভবতীত্যহেতবো  
হেত্ভাভাসাঃ । তদিনং হেতুদাহরণয়োঃ সামর্থ্যং পরমসূক্ষ্মং দুঃখবোধং  
পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি ।

অনুবাদ । “দৃষ্টান্ত উদাহরণং” এই কথাটি প্রকৃত ( প্রকরণলক্ষ ) অর্থাৎ  
পূর্বসূত্র হইতে ঐ অংশের এই সূত্রে অনুবৃত্তি বুঝিতে হইবে । ( তাহা হইলে  
সূত্রার্থ হইল ) সাধ্যধর্ম্মের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃত হেতু পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত  
“অতন্ধর্ম্মভাবী” অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, এমন যে দৃষ্টান্ত, তাদৃশ  
দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় অর্থাৎ “বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্য” হয় ।  
(যেমন) (১) “শব্দ অনিত্য”, (২) “উৎপত্তিধর্ম্মকল্প জ্ঞাপক”, (৩) “অনুৎপত্তিধর্ম্মক  
অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয় না, এমন আত্মা প্রভৃতি নিত্য” । সেই এই আত্মা  
প্রভৃতি দৃষ্টান্ত ( বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত ) সাধ্যধর্ম্মের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ শব্দে থাকে না—এমন  
যে অনুৎপত্তিধর্ম্মকল্প অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকল্পরূপ হেতুর অভাব, তৎপ্রযুক্ত “অতন্ধর্ম্ম-  
ভাবী”, বিশদার্থ এই যে, সাধ্যধর্ম্মের ধর্ম্ম এই যে অনিত্যত্ব, তাহা সেই আত্মা  
প্রভৃতিতে নাই ।

এই আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তে—উৎপত্তিধর্ম্মকল্পের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তি-  
ধর্ম্মকল্প না থাকিলে অনিত্যত্ব থাকে না, ইহা উপলব্ধি করতঃ শব্দে বিপর্যয় অর্থাৎ  
অনিত্যত্বাভাবের বিপর্যয় অনিত্যত্ব অনুমান করে ( কিরূপে, তাহা বলিতেছেন )  
উৎপত্তিধর্ম্মকল্পের ভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকল্প আছে বলিয়া “শব্দ  
অনিত্য” ।

সাধ্যোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্বোক্ত “সাধ্যো হেতু” বাক্যস্থলে সাধ্য-  
ধর্ম্মের সাধ্যপ্রযুক্ত “তন্ধর্ম্মভাবী” দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পূর্বব্যাখ্যাত ঐরূপ দৃষ্টান্তের  
বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় । বৈধর্ম্ম্যোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্বোক্ত  
“বৈধর্ম্ম্যহেতু” বাক্য স্থলে সাধ্যধর্ম্মের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত “অতন্ধর্ম্মভাবী” দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ  
পূর্বব্যাখ্যাত ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় ।

পূর্বদৃষ্টান্তে অর্থাৎ প্রথমোক্ত সাধ্যদৃষ্টান্তে সেই যে দুইটি সাধ্যসাধন-ভাবাপন্ন  
ধর্ম্ম দর্শন করে অর্থাৎ একটিকে সাধ্য এবং অপরটিকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝে,  
সাধ্যধর্ম্মাতেও সেই দুইটি ধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাব অনুমান করে । ( অর্থাৎ প্রদর্শিত  
স্থলে স্থানী প্রভৃতি সাধ্যদৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকল্প আছে এবং অনিত্যত্বও আছে,



ইহা বুঝিলে অনিত্যতা সাধ্য এবং উৎপত্তিধর্মকর তাহার সাধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্মকর থাকিলেই সেখানে অনিত্যতা থাকে, ইহা বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দেও অনিত্যতাকে সাধ্য বলিয়া এবং উৎপত্তিধর্মকরকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝে অর্থাৎ স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকর ও অনিত্যতা এই দুইটি ধর্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব বুঝিয়া উৎপত্তিধর্মকর হেতুর সাহায্যে শব্দকে অনিত্য বলিয়া অনুমান করে ) ।

শেথোক্ত দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তে যে দুইটি ধর্মের একের অভাব প্রযুক্ত অপরটির অভাব বুঝে, সেই দুইটি ধর্মের একের ভাব প্রযুক্ত অপরটির ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সাধ্যধর্ম্যোতে অনুমান করে । ( যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকরের অভাব প্রযুক্ত অনিত্যতাহে অভাব বুঝিলে অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকর না থাকিলে সেখানে অনিত্যতা থাকে না, ইহা বুঝিলে ঐ উৎপত্তি-ধর্মকরের ভাবপ্রযুক্ত অনিত্যতা ধর্মের ভাব অনুমান করে ) ।

সেই ইহা অর্থাৎ এইরূপে সাধ্যসাধনর হেতুভাসগুলিতে সম্ভব হয় না, এজ্জ হেতুভাসগুলি হেতু নহে । “হেতু” ও “উদাহরণের” সেই এই অতি সূক্ষ্ম দুর্বোধ্য সামর্থ্য প্রশস্ত পণ্ডিতের বোধ্য ( অর্থাৎ ইহা প্রশস্ত পণ্ডিত ভিন্ন সকলে বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াই অনেকে এ বিষয়ে অনেক ভ্রম করে ) ।

টীকনো । হ্রজের “তদ্বিপৰ্য্যায়ঃ” এই কথাটির ব্যাখ্যার ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“সাধ্যবৈধর্ম্যঃ” অর্থাৎ পূর্বহ্রজে যে “সাধ্যসাধর্ম্য” উক্ত হইয়াছে, তাহার বিপর্যয় অর্থাৎ তাহার অভাবকেই ভাষ্যকার “সাধ্যবৈধর্ম্য” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । হ্রজোক্ত “বিপরীতঃ” এই কথাটির ব্যাখ্যার ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“অতদ্ব্যভাবী” । পূর্বহ্রজোক্ত “তদ্ব্যভাবী”র বিপরীত “অতদ্ব্যভাবী” । পূর্বহ্রজোক্ত “দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ” এই অংশের অনুবৃত্তি হ্রজকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়, নচেৎ হ্রজার্থ সংগতি হয় না । তাই ভাষ্যকার প্রথমেই সেই কথাটির উল্লেখপূর্বক সম্পূর্ণ হ্রজার্থ বর্ণন করিয়াছেন । “উদাহরণ” শব্দের ক্লীবলিঙ্গবাহুসারেই হ্রজকার “বিপরীতঃ” এইরূপ ক্লীব-লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । তাৎপর্য্যটীকাকার হ্রজ “বা” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সমুচ্চয় । প্রকৃত কথা এই যে, “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে “উৎপত্তিধর্মকরঃ” এই হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, উৎপত্তিধর্মকররূপ হেতুপদার্থে অনিত্যতাহে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্ত যেমন পূর্বহ্রজোক্ত “সাধ্যোদাহরণ-বাক্যে”র প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ ঐ স্থলে “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”রও প্রয়োগ করা যায় । মহর্ষি এই হ্রজের দ্বারা সেই “বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্যে”র লক্ষণ বলিয়াছেন । এই “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”র দ্বারা কিরূপে ঐ স্থলে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হয়, ভাষ্যকার তাহা বুঝাইয়াছেন । ভাষ্যকারের কথা এই যে, যাহা অতুৎপত্তি-ধর্মক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় না, তুল্য কথা, যাহা চিরদিনই আছে এবং চির-



দিনই থাকিবে, এমন পদার্থগুলি অনিত্য নহে অর্থাৎ সে সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বুঝিলেও বাহ্য বাহ্য উৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, সে সকল পদার্থ অনিত্য, এইরূপে উৎপত্তিধর্মক পদার্থে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। কারণ, উৎপত্তিধর্মক না থাকিলেই অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ না হইলেই যখন সেই পদার্থকে নিত্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে—আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে তাহা নিশ্চয় করা যাইতেছে, তখন উৎপত্তিধর্মক থাকিলে অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ হইলে তাহা অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় উহার দ্বারা হইবেই। ফলতঃ উৎপত্তি-ধর্মক এবং অনিত্য এই দুইটি ধর্ম সমদেশবর্তী। অর্থাৎ বাহ্য উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনিত্য এবং বাহ্য অনিত্য, তাহা উৎপত্তিধর্মক; সুতরাং উৎপত্তিধর্মকের অভাব থাকিলে অনিত্যত্বের অভাব থাকে—ইহা বুঝিলে, উৎপত্তিধর্মকের ভাব থাকিলে অনিত্যত্বের ভাব থাকে,—অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক সেখানে বিদ্যমান থাকে, সেখানে অনিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহাও বুঝা যায়;—তাহার ফলে শব্দধর্মীতে অনিত্যত্ব ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রদর্শিত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্মী। উৎপত্তিধর্মকরূপ হেতু পদার্থটি তাহার সাধ্যধর্মী। ঐ উৎপত্তিধর্মকের অভাব তাহার বৈধর্ম্য; কারণ, জ্ঞান-মতে শব্দের উৎপত্তি হয়, সুতরাং শব্দ উৎপত্তিধর্মক। উৎপত্তি-ধর্মক শব্দের ধর্ম, তাহার অভাব শব্দে থাকে না, এজন্য উৎপত্তিধর্মকের অভাব শব্দের বৈধর্ম্য। বাহ্য যেখানে থাকে না, তাহাকে সেই পদার্থের “বৈধর্ম্য” বলা হয়। পূর্বোক্ত “সাধ্য-বৈধর্ম্য” প্রযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকের অভাব প্রযুক্ত আত্মা প্রভৃতি পদার্থগুলি “অতদ্ধর্ম-ভাবী”। কারণ, আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর ধর্ম যে অনিত্যত্ব, তাহা বিদ্যমান নাই। যে পদার্থে “তদ্ধর্মের” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর ধর্মের “ভাব” কি না—বিদ্যমানতা আছে, তাহাকেই বলা হইয়াছে “তদ্ধর্মভাবী”। আর যে সকল পদার্থে ঐ তদ্ধর্মের “ভাব” নাই, তাহাকে বলা হইয়াছে “অতদ্ধর্মভাবী” অর্থাৎ যে পদার্থ পূর্বোক্ত “তদ্ধর্মভাবী”র বিপরীত, তাহাই “অতদ্ধর্মভাবী” এবং তাহাই “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত”। পূর্বোক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি পদার্থে সাধ্যধর্মীর ধর্ম অনিত্যত্ব বিদ্যমান না থাকায় ঐ সকল পদার্থ পূর্বোক্ত “অতদ্ধর্মভাবী” বলিয়া “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত”। ঐ আত্মাদি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই ঐ স্থলে “বৈধর্ম্যদাহন-বাক্য” হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বিবিধ;—“অবয়ব্যাপ্তিজ্ঞান” এবং “ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান”। (৩৫ সূত্র ভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। যেখানে যেখানে এই হেতু পদার্থ থাকে, সেই সমস্ত স্থানে এই সাধ্যধর্ম থাকে, এইরূপ জ্ঞান অবয়ব্যাপ্তি জ্ঞান। যেখানে যেখানে এই সাধ্যধর্ম নাই, সেই সমস্ত পদার্থে এই হেতু পদার্থ নাই, এইরূপ জ্ঞানকে পরবর্তী ভাষ্যাত্মক “ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান” বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে হেতুপদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব বলায়, তাহার মতে যেখানে যেখানে হেতু পদার্থ নাই, সেই সমস্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম নাই, এইরূপ জ্ঞানও অনেক স্থলে “ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান” হইবে, ইহা বুঝা যায়। এবং বাহ্য বাহ্য ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা অবয়ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়াই অনুমিত হয় বলিয়াছেন, ব্যতিরেক-



ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অহুমিত্তির কারণ বলেন নাই, তাঁহাদিগের ঐ মতের মূল বলিয়া ভাষ্যকারকেও বলা যাইতে পারে। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপত্তিধর্মকল্প নাই, সে সকল পদার্থ নিত্য, এইরূপ বুঝিলে, যে সকল পদার্থে উৎপত্তিধর্মকল্প আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্য—ইহা বুঝা যায়, এইরূপ কথা ভাষ্যকারের কথার এখানে পাওয়া যায়। ফলকথা, “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তে” হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব বুঝিরা যদি সেই হেতু থাকিলে সেই সাধ্যধর্ম থাকিবেই, এইরূপ নিশ্চয় হয় এবং ভাষ্যকারও সেইরূপ কথা বলিয়াছেন—ইহা বলা যায়, তাহা হইলে “যেখানে যেখানে এই হেতু আছে, সেই সমস্ত স্থানেই এই সাধ্যধর্ম আছে”, এইরূপ “অবয়ব্যাপ্তি” নিশ্চয়ই সর্বত্র অহুমিত্তির কারণ। যেখানে যেখানে এই হেতু নাই, সেখানে সেখানে এই সাধ্যধর্ম নাই, এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিনিশ্চয় অহুমিত্তির কারণ নহে, স্থলবিশেষে উহা অবয়ব্যাপ্তিনিশ্চয়েরই কারণ—ইহাই ভাষ্যকারের মত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার এখানে হেতু পদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব বলায়, উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী আচার্যগণ ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যাকে অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। ঠাওয়ারা বলিয়াছেন যে, “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”র দ্বারা সাধ্যধর্মের অভাব প্রযুক্তই হেতুপদার্থের অভাব প্রদর্শিত হয়। যেখানে যেখানে সাধ্য ধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই হেতু পদার্থ নাই, এইরূপ জ্ঞানই “ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান”। কারণ, সাধ্যধর্মের অভাব থাকিলে সেখানে তাহার হেতু পদার্থের অভাব থাকে। হেতু পদার্থ না থাকিলেই সেখানে সাধ্যধর্ম থাকিবে না, এইরূপ কথা বলা যায় না; ঐরূপ নিয়ম সর্বত্র নাই। যেখানে বহিঃ সাধ্যধর্ম, বিশিষ্ট ধুম তাহার হেতু, সেখানে হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব—ইহা কোনমতেই বলা যাইবে না। কারণ, বিশিষ্ট ধুম না থাকিলেও অনেক স্থানে বহিঃ থাকে, কিন্তু বহিঃ না থাকিলে কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধুম থাকে না, থাকিতেই পারে না; সুতরাং সাধ্যধর্মের অভাব প্রযুক্ত হেতুর অভাব থাকে—ইহাই বলিতে হইবে এবং বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যও সেইরূপই বলিতে হইবে। এবং ভাষ্যকার যে স্থলে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ স্থলে হেতু “অবয়ব্যতিরেকী”। ঐরূপ স্থলে সাধ্যধর্মোদাহরণ-বাক্যেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল বৈধর্ম্য হেতু স্থলেই “সাধ্যদৃষ্টান্ত” না থাকায় বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, সুতরাং ভাষ্যকারের উদাহরণ-স্থলও ঠিক হয় নাই। ফলকথা, ভাষ্যকারের মত এখানে গ্রাহ্য নহে; উহা বুদ্ধিবিরুদ্ধ। তবে কিরূপ স্থলে, কিপ্রকারে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য হইবে? উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “জীবৎশরীরং সাত্মকং প্রাণাদিমহাৎ” এই স্থলে অর্থাৎ “জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, প্রাণাদিমহাৎ (ইহার) জ্ঞাপক, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও হেতুস্থলে “বাহ্য বাহ্য সাত্মক নহে, তাহা প্রাণাদিযুক্ত নহে—বেনন ঘটাদি” এইরূপ ঘটাদি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য। যে সকল পদার্থে আত্মা নাই, সে সকল পদার্থে প্রাণাদি নাই, ইহা বুঝিলে প্রাণাদিযুক্ত জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, ইহা বুঝা যায়। পূর্বোক্ত বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত ঘটাদি পদার্থে পূর্বোক্ত প্রকার ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয় রশতঃই ঐরূপ অহুমিত্তি



হয়, ইহাই পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িকের মত। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের পূর্বকথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সাধ্যকস্বরূপে সাধ্যধর্মী যে জীবিত ব্যক্তির শরীর, তাহার সহিত বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত ঘটাদি পদার্থের বৈধর্ম্য যে সাধ্যকস্বের অভাব, তৎপ্রযুক্ত যে পদার্থ “অতদ্ধর্মভাবী” অর্থাৎ সাধ্যধর্মী জীবিত ব্যক্তির শরীরের প্রাণাদিমত্ব ধর্ম যেখানে নাই, এমন যে ঘটাদি পদার্থ, তাহাই বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত। শেষে তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে ঘটাদি পদার্থে সাধ্যধর্মের অভাব প্রযুক্ত হেতু পদার্থের অভাব থাকে, সেই ঘটাদি পদার্থ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত হইবে এবং ঐ বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য হইবে। ফলকথা, উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী আচার্য্যগণের মতে যেখানে যেখানে সাধ্যধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতুপদার্থ নাই, ইহাই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় এবং ঐরূপ ভাবেই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়।

ভাষ্যকার ইহার বিপরীত কথা কেন বলিয়াছেন অর্থাৎ তিনি এখানে হেতুপদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাবের কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা এখানে বিশেষ চিন্তনীয়। তাৎপর্য-টীকাকার প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে যান নাই। তাহার সকলেই ভাষ্যকারের কথা অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আমার মনে হয়, ভাষ্যকার মহাবিশ্বজ্ঞের পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া যেরূপ স্বার্থ সংগত বোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ঐরূপ ভাবে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মহাবিশ্বজ্ঞে “তদ্বিপর্য়ায়” শব্দ আছে। তাহার দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত সাধ্যসাধ্যের বিপর্যয়ই বুঝা যায়। সাধ্যসাধ্যের বিপর্যয় বলিতে সাধ্যসাধ্যের অভাবকে বুঝা যায়। তাহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন সাধ্যবৈধর্ম্য। “পূর্বস্বত্রে “সাধ্যসাধ্য” শব্দের দ্বারা ফলতঃ প্রকৃত হেতু পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এই স্বত্রে “তদ্বিপর্য়ায়” শব্দের দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত “সাধ্যসাধ্য” যে প্রকৃত হেতু, তাহার অভাবকেই বুঝা যায়। এবং এই স্বত্রে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত “তদ্ধর্মভাবী”র বিপরীতই বুঝিতে হইবে। পূর্বস্বত্রে “তদ্ধর্ম” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মের ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মই গৃহীত হইয়াছে। যে কোনরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ফলে উহার দ্বারা সাধ্যধর্মই গৃহীত হইবে, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এই স্বত্রে তদ্ধর্মভাবীর বিপরীত বলিতে যেখানে সাধ্যধর্মটি বিদ্যমান নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত হেতুর অভাব প্রযুক্ত প্রকৃত সাধ্যধর্মের অভাব যেখানে আছে, এমন পদার্থই “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত” এবং সেই বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য, ইহাই মহাবিশ্বজ্ঞের দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে এই স্বত্রে “তদ্বিপর্য়ায়” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সাধ্যধর্মের অভাব এবং “বিপরীত” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—হেতুশূন্য। কিন্তু পূর্বস্বত্রে যে তদ্ধর্মভাবী এই কথাটি আছে, তাহার অর্থ সেখানে সাধ্যধর্মযুক্ত, সুতরাং এই স্বত্রে তাহার বিপরীত অর্থই “বিপরীত” শব্দের দ্বারা বুঝা উচিত। তাহা হইলে এই স্বত্রে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় সাধ্যধর্মশূন্য। যদিও হেতু পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম এই



ছুইটকেই সাধ্যসাধন্যা শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং সাধ্যধর্মের অভাবকেও এই হুক্তে তদ্বিপর্যয় শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা যায়; উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বহুক্তে যখন হেতু পদার্থকেই সাধ্যসাধন্যা শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই হুক্তে “তদ্বিপর্যয়” শব্দের দ্বারা তাহার অর্থাৎ সাধ্যসাধন্যা হেতুপদার্থের অভাবকেই বুঝা উচিত এবং পূর্বহুক্তে “তদ্ব্যবস্থা” শব্দের দ্বারা যখন সর্বপ্রকার ব্যাখ্যাতেই সাধ্যধর্মকেই গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই হুক্তে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, এইরূপ অর্থই বুঝা উচিত। পূর্বহুক্তোক্ত “তদ্ব্যবস্থা”র “বিপরীত” অতদ্ব্যবস্থা। যেখানে তদ্ব্যবস্থা অর্থাৎ সাধ্যধর্ম বিদ্যমান নাই, এমন পদার্থই “অতদ্ব্যবস্থা”। এইরূপে পূর্ব-হুক্তের পদার্থানুসারে এই হুক্তের দ্বারা বাহা বুঝা যায়, তদনুসারে ভাব্যকার এখানে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। পরন্তু উৎপত্তিধর্মক হেতু এবং অনিত্যবস্তু সাধ্যধর্ম, এই দুইটি সমদেশবর্তী। অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক বস্তু মাত্রই অনিত্য এবং অনিত্য বস্তুমাত্রই উৎপত্তিধর্মক, এইরূপ হেতু ও সাধ্যধর্মকে “সমব্যাপ্ত” হেতুসাধ্য বলে। এইরূপ হলে হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব, এ কথাও বলা যায় অর্থাৎ বাহা বাঁহা উৎপত্তিধর্মক নহে, তাহা অনিত্য নহে অর্থাৎ নিত্য; যেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপ কথাও বলা যায়। হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্তই উদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়। প্রকৃত স্থলে সেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন যদি এইরূপ বাক্যের দ্বারাও হয় এবং মহর্ষির হুক্তানুসারেও এইরূপ বাক্যকেই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ভাব্যকার তাহাই কেন বলিবেন না? ভাব্যকার বুঝিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম নাই, ইহা যে পদার্থে বুঝা যায়, তাহাকেই মহর্ষি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত বলিয়াছেন এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে উৎপত্তি-ধর্মক নাই, সেই সমস্ত স্থানেই অনিত্য নাই, ইহার কুত্রাপি ব্যভিচার নাই এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক নহে, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে, ইহা বুঝিলেও বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য, ইহা বুঝা হয়, সুতরাং ভাব্যকার এখানে পূর্ণোক্ত প্রকার বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্যই প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে হেতু ও সাধ্যধর্ম সমদেশবর্তী নহে, যেমন বিশিষ্ট ধূম হেতু, বহি সাধ্য, এইরূপ স্থলে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য ভাব্যকার কিরূপ বলিতেন? সেখানে ত যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই বহি নাই—এইরূপ কথা বলা বাইবে না? কারণ, ধূমশূন্য স্থানেও বহি থাকে। এতদ্বত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, মহর্ষি-হুক্তের ভাব্যকার-সম্বন্ধ অর্থাৎসারে ঐ স্থলে যখন “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য” হইতে পারে না, তখন ঐ স্থলে ভাব্যকার কেবল সাধ্যোদাহরণ-বাক্যই বলিতেন। অর্থাৎ “যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি থাকে, যেমন রজনশালা”, এইরূপ সাধ্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারা

১। বাহার উৎপত্তি এবং বিশেষ উক্তরই হয়, এই অর্থে ভাব্যকার পূর্ণোক্ত স্থলে “অনিত্য” শব্দের প্রয়োগ করার অনিত্য বস্তু মাত্রকেই তিনি উৎপত্তিধর্মক বলিতে পারেন। (৩৯ হুক্ত-ভাষা টীকা জট্টা)।



ঐ স্থলে বিশিষ্ট ধূমে বহির ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। সেখানে বিশিষ্ট ধূম কেবল সাধ্যম্বে হেতুই হইবে, বৈধর্ম্য হেতু না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উৎপত্তিব্যর্থক হেতু স্থলে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যও সম্ভব হওয়ার ঐ হেতু "বৈধর্ম্যহেতু"ও হইবে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, মহর্ষি সমদেশবর্তী হেতু ও সাধ্যধর্মের স্থলেই "বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের" ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, ভাষ্যকারের মতে মহর্ষির ঐ লক্ষণ সেইরূপ স্থলেই সঙ্গত হয়। যেখানে বহিঃ সাধ্য, বিশিষ্ট ধূম হেতু, সেই স্থলে "যেখানে যেখানে বহিঃ নাই, সেই সমস্ত স্থানে বিশিষ্ট ধূম নাই—যেমন জল", এইরূপ বাক্যই "বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে। মহর্ষি-সূত্রে ইহা প্রকটিত না থাকিলেও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া ইহা মহর্ষির সম্মত এবং সূত্রে "বা" শব্দের দ্বারা ইহাও সূচিত। কল কথ্য, হেতুর অভাবপ্রযুক্ত যেখানে সাধ্যধর্মের অভাব, এমন পদার্থকেই ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা "বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত" বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সমদেশবর্তী হেতু ও সাধ্যধর্মের স্থলে তাহা হইতেও পারে, এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে ঐরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পরবর্তী ভাষ্যচর্চায়গণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থটি "সাধ্যম্বে দৃষ্টান্ত" অথবা "বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত" হইবে, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্য প্রয়োগ না করিলেও উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে। যেমন "বাহ্য বাহ্য উৎপত্তিব্যর্থক, সে সমস্ত অনিত্য" এই পর্য্যন্ত বলিলেও উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে। উহার পরে আবার "যেমন স্থানী প্রভৃতি" এই কথাটি না বলিলেও চলে। হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্তই উদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়। তাহা পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারাও হইতে পারে। ভাষ্যকার কিন্তু উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগে দৃষ্টান্তবোধক শব্দেরও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন (নিগমন-সূত্র ভ্রষ্টব্য)। মহর্ষিসূত্রের দ্বারাও দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগের কর্তব্যতা বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত মতের আশ্রয় করিয়া এখানে মহর্ষি-সূত্রোক্ত "দৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তকথনযোগ্য অবয়ব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্তের কথন না হইলেও উদাহরণ-বাক্যে দৃষ্টান্তের কথন-যোগ্যতা আছে, উদাহরণ-বাক্যরূপ তৃতীয় অবয়বে দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ করা যায়, অজ্ঞ কোন অবয়বে তাহা করা যায় না। তদ্বচিস্তামণিকার গবেষণেও দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ সাক্ষাত্তিক নহে, এই কথা বলিয়াছেন। তিনি ইহার হেতু বলিয়াছেন যে—"যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নি আছে" এই পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারাই ধূমে বহির ব্যাপ্তি বোধ হইয়া থাকে। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণের অনেকেই ঐ স্থলে কেবল "বহ্য মহানস্য" অর্থাৎ যেমন রজনশালা, এইরূপ বাক্যকেও উদাহরণ-বাক্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষে "পণ্ডিতৈরুপবেদনীয়ং" এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। "পণ্ডিতরূপবেদনীয়ং" ইহাই প্রকৃত পাঠ। "পণ্ডিত" শব্দের পরে প্রশস্ত বা উৎকৃষ্ট অর্থে "রূপ" প্রত্যয়ের দ্বারা "পণ্ডিতরূপ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "পণ্ডিতরূপ" শব্দের অর্থ প্রশস্ত পণ্ডিত।

ভাষ্যকার এখানে হেতু ও উদাহরণের অতি হৃদয়োপ পরম সূত্র সামর্থ্য প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই



বুঝিতে পারেন, এ কথাটি কেন লিখিয়াছেন? ইহা ভাবিবার বিষয়। ভাষ্যকারের পূর্বেও জ্ঞানস্বত্বের নানারূপ ব্যাখ্যা ছিল, ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের মতে তাহার পূর্বতন কোন কোন পণ্ডিত হেতু ও উদাহরণের ব্যাখ্যায় অনেক ভ্রম করিয়াছিলেন। তাহার প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাও ঐ কথার দ্বারা মনে করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা তাহারই ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন কি না, ইহা এই ভাবের ভাবুকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। ৩৭।

## সূত্র। উদাহরণাপেক্ষন্তথ্যেতু্যপসংহারো ন তথ্যেতি বা সাধ্যশ্চোপনয়ঃ ॥ ৩৮॥

অনুবাদ। সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধে অর্থাৎ যে ধর্ম্মাতে ধর্ম্মবিশেষের অনুমান করিতে হইবে, তাহাতে উদাহরণানুসারী “তথা” অর্থাৎ তদ্রূপ এই প্রকারে, অথবা “ন তথা” অর্থাৎ তদ্রূপ নহে, এই প্রকারে উপসংহার অর্থাৎ হেতুর উপস্থান (হেতুবোধক বাক্য) উপনয়।

বিবৃতি। যে হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অনুমান করিতে হইবে, সেই হেতু সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে আছে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই সাধ্যধর্ম্ম থাকে, ইহা উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝাইয়া, তাহার পরেই সেই হেতু পদার্থটি সাধ্যধর্ম্মাতে আছে অর্থাৎ সেই হেতুর দ্বারা যেখানে সাধ্যধর্ম্মটির অনুমান করিতে হইবে, সেই পদার্থে আছে, ইহা বুঝাইতে হইবে, নচেৎ অনুমান হইতে পারে না। বাহা বাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, সে সমস্তই অনিত্য, ইহা বুঝিলেও ঐ উৎপত্তিধর্ম্মকর হেতুটি শব্দে আছে, ইহা না বুঝিলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান হইতে পারে না। ঐরূপ বুঝার নামই “নিম্নপর্যায়মর্শ”। যে বাক্যের দ্বারা ঐরূপ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে—“উপনয়”। উদাহরণ-বাক্যের পরেই উদাহরণ-বাক্যানুসারে এই “উপনয়-বাক্য” প্রয়োগ করিতে হয়। উদাহরণ-বাক্য দ্বিবিধ, সুতরাং উপনয়-বাক্যও দ্বিবিধ। (১) সাধ্যশ্চোপনয়, (২) বৈধশ্চোপনয়। “উৎপত্তিধর্ম্মক হালী প্রভৃতি জব্য অনিত্য” এইরূপ সাধ্যশ্চোদাহরণ-বাক্যের পরে “শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তিধর্ম্মক”, এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারা বুঝা যায়, অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তিধর্ম্মকর, তাহা শব্দে আছে, শব্দও হালী প্রভৃতি জব্যের দ্বারা উৎপত্তিধর্ম্মক, ঐ স্থলে এইরূপ বাক্যের নাম “সাধ্যশ্চোপনয়”। এবং ঐ স্থলে “অনুৎপত্তিধর্ম্মক আত্মা প্রভৃতি জব্য নিত্য” এইরূপ বৈধশ্চোদাহরণ-বাক্যের পরে “শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে” এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারাও বুঝা যায়, অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তিধর্ম্মকর, তাহা শব্দে আছে। শব্দ আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের দ্বারা অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে, ইহা বলিলে শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকর আছে, ইহা অবগতই বুঝা যায়। ঐ স্থলে ঐরূপ বাক্যের নাম “বৈধশ্চোপনয়”। (নিগমন-সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। উদাহরণাপেক্ষ উদাহরণতন্ত্রঃ উদাহরণবশঃ। বশঃ সামর্থ্যং। সাধ্যসাধ্যশ্চাযুক্তে উদাহরণে স্থালাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্মক-মনিত্যং দৃষ্টং তথা শব্দ উৎপত্তিধর্মক ইতি সাধ্যস্ত শব্দশ্চোৎপত্তি-ধর্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে। সাধ্যবৈধর্ম্যযুক্তে পুনরুদাহরণে আত্মাদিদ্ৰব্য-মুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং দৃষ্টং ন চ তথা শব্দ ইতি অনুৎপত্তিধর্মকত্ব-শ্চোপসংহার-প্রতিষেধেনোৎপত্তিধর্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে। তদিদমুপসংহার-বৈতমুদাহরণবৈতাদভবতি। উপসংহ্রিয়তেহেনেনেতি চোপসংহারো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। উদাহরণাপেক্ষ কি না উদাহরণতন্ত্র,—উদাহরণের বশ, অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্যের বশ। বশ অর্থাৎ বশ্যতা (এখানে) সামর্থ্য। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণ-বাক্যের ফল, উহা উদাহরণ-বাক্যানুসারেই প্রয়োগ করিতে হয়, এ জন্ম উদাহরণাপেক্ষ।

সাধ্যসাধ্যশ্চাযুক্ত উদাহরণে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যশ্চোদাহরণ স্থলে “উৎপত্তি-ধর্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়, শব্দ তত্রূপ উৎপত্তি-ধর্মক” এইরূপে সাধ্যধর্মী শব্দের সম্বন্ধে অর্থাৎ অনিত্যরূপে সাধ্যধর্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্মকত্ব উপসংহৃত (প্রদর্শিত) হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার বাক্যটির দ্বারা অনিত্যত্ব ধর্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তি-ধর্মকত্ব, তাহা শব্দে আছে, ইহা বুঝান হয়; ঐ বাক্যটি সাধ্যশ্চোপনয় বাক্য।

সাধ্যবৈধর্ম্যযুক্ত উদাহরণে কিন্তু অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৈধর্ম্যোদাহরণ স্থলে “অনুৎপত্তি-ধর্মক (যাহার উৎপত্তি নাই) আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখা যায়, কিন্তু শব্দ তত্রূপ নহে” এই বাক্যের দ্বারা ( “শব্দ তত্রূপ নহে” এই শেষোক্ত বাক্যটির দ্বারা ) অনুৎপত্তি-ধর্মকত্বের উপসংহার নিষেধের দ্বারা অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা শব্দে অনুৎপত্তিধর্মকত্ব নাই, ইহা উপসংহার (প্রদর্শন) করিয়া উৎপত্তিধর্মকত্ব উপসংহৃত (প্রদর্শিত) হয়। উপসংহারের অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে হেতু-পদার্থের বোধক পূর্বোক্ত উপনয়-বাক্যের সেই এই (পূর্বোক্ত) দ্বিবিধ উদাহরণের দ্বিবিধ প্রযুক্ত হয়। ইহার দ্বারা উপসংহৃত হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মীতে হেতু-পদার্থের উপসংহার করা হয়; এ জন্ম ইহাকে “উপসংহার” জানিবে (অর্থাৎ এইরূপ অর্থেই উপনয়-বাক্যকে উপসংহার বলা হইয়াছে)।



টিপনো। সুত্রে “উদাহরণপেক্ষঃ সাধ্যস্তোপসংহারঃ” এই অংশের দ্বারা উপনয়-বাক্যের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। “তথা” এবং “ন তথা” এই কথা দ্বারা উপনয়-বাক্যের বিশেষ লক্ষণ বলা হইয়াছে। উপনয়-বাক্য উদাহরণ-বাক্যকে অপেক্ষা করে, উদাহরণ-বাক্যের পরে তদনুসারে উপনয়-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তাই মহাবি বলিয়াছেন—“উদাহরণপেক্ষঃ”। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“উদাহরণ-তত্ত্ব”, আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“উদাহরণ-বশ”। তাৎপর্য-টীকাকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“বস্ততে ইতি বশঃ বশিন উদাহরণস্ত বস্ত ইত্যর্থঃ”। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণবাক্যের বস্ত। শেষে বলিয়াছেন যে, এই বস্ত্তাকেই “বশ” শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার উহার অর্থ বলিয়াছেন “সামর্থ্য”। তাৎপর্যটীকাকার এই “সামর্থ্যে”র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“বস্ত্তেন উদাহরণস্ত ফলেন উপনয়েন অভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ”। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণবাক্যের ফল, এই ফলটির সহিত উদাহরণবাক্যের সম্বন্ধই উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বস্ত্ততা এবং উহাই এখানে উদাহরণের সামর্থ্য। ভাষ্যকার আদি ভাষ্যও ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থে “সামর্থ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মূলকথা, উদাহরণবাক্য ব্যতীত হেতুপদার্থে সাধ্যবর্ণনের ব্যাখ্যা প্রদর্শন হয় না। হেতুপদার্থকে সাধ্যবর্ণনের ব্যাখ্যা বলিয়া না বুঝিয়া সাধ্য-বর্ণনীতে হেতুপদার্থের অবধারণ হইলেও অনুমান হইতে পারে না; সুতরাং হেতুপদার্থকে সাধ্যবর্ণনের ব্যাখ্যা বলিয়া বুঝিয়া সাধ্যবর্ণনীতে সেই হেতুপদার্থের উপসংহার করিতে হইবে, তাহাই “উপনয়-বাক্য” হইবে এবং উদাহরণের ভেদানুসারেই “উপনয়-বাক্যে”র প্রকারভেদ হইবে; সুতরাং “উপনয়” উদাহরণ-পাপেক্ষ।

যে বাক্যের দ্বারা উপসংহার করা হয় অর্থাৎ কোন পদার্থে কোন পদার্থের অবধারণ করা হয়, তাহাকে উপসংহার-বাক্য বলা যায়। মহাবি ঐরূপ বাক্যবিশেষ অর্থেই সুত্রে “উপসংহার” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উপনয় বাক্যবিশেষ। সুতরাং সুত্রোক্ত “উপসংহার” শব্দের অর্থও বাক্যবিশেষ। ভাষ্যকারও শেষে সুত্রোক্ত “উপসংহার” শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন কিরূপ বাক্য-বিশেষ উপনয় হইবে? এ জন্ত সুত্রকার বলিয়াছেন—“উদাহরণপেক্ষঃ” এবং “সাধ্যস্ত”। এখানে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে সাধ্যবর্ণনী। কারণ, উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যবর্ণনের উপসংহার করা হয় না। অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, উপনয়-বাক্যের দ্বারা ত সাধ্যবর্ণনীও উপসংহার করা হয় না, সাধ্যবর্ণনীতে হেতুপদার্থেরই উপসংহার করা হয়। তাৎপর্যটীকাকার এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এই জন্তই এখানে সাধ্যবর্ণনী শব্দের সম্বন্ধে, উপপত্তিবস্তুকত্ব হেতুর উপসংহার হয়, এই কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার শেষে ভাষ্যকারের তাৎপর্য বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধ্যবর্ণনের উপসংহার হয় না, সাধ্যবর্ণনের ব্যাখ্যা যে হেতু, সেই হেতু-যুক্তভাবে সাধ্যবর্ণনের উপসংহার হয়। অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বারা যখন সাধ্যবর্ণনীকে সাধ্যবর্ণনের ব্যাখ্যাহেতু বিশিষ্ট বলিয়াই বুঝান হয়, তখন উপনয়-বাক্যের দ্বারা ঐ ভাবে সাধ্যবর্ণনের উপসংহার হয়, ইহা বলা যাইতে পারে এবং ঐ ভাবে সাধ্যবর্ণনের উপসংহার-বাক্যকে উপনয়-বাক্য বলা যাইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য।



টীকাকারের কথা। ভাষ্যমঞ্জরীকার জরজরতট্ট বলিয়াছেন যে, 'স্বত্রে "সাধ্যস্ত" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে যজ্ঞী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধ্যধর্ম্মোতে হেতুর উপসংহার-বাক্যই উপনয়। স্বত্রে "হেতু" শব্দ না থাকিলেও উহা এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে। জরজরতট্টের ব্যাখ্যা, কোন গোল নাই। ঋষিহৃত্রে এক বিভক্তি স্থানে অত্র বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও যায়। ভাষ্যকারও এখানে সাধ্যধর্ম্মীর সম্বন্ধে হেতুর উপসংহার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বতরাং "হেতু" শব্দ স্বত্রে না থাকিলেও এখানে হেতুর উপসংহারই স্বত্রেকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারও বুঝিয়াছিলেন। "সাধ্যস্ত" এই স্থলে সম্বন্ধ অর্থে যজ্ঞী বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেও উহার দ্বারা "সাধ্যধর্ম্মোতে" এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগস্থলেও সম্বন্ধ অর্থে যজ্ঞী বিভক্তির প্রয়োগ কোন কোন স্থলে দেখাও যায়। জরজরতট্ট তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ফলকথা, জরজরতট্ট বৈরূপ বলিয়াছেন, স্বত্রেকার ও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকা-কারের ভ্রাম্য কষ্টকরনা না করিলেও চলে।

ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে "শব্দ তরুণ উৎপত্তি-ধর্ম্মক" এইরূপ উপনয়বাক্যের দ্বারা যেমন সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকরূপ হেতুপদার্থের উপসংহার হয়, সেইরূপ "শব্দ তরুণ অল্পপত্তি-ধর্ম্মক নহে" এইরূপ উপনয়-বাক্যের দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকরূপ হেতু-পদার্থের উপসংহার হয়। কারণ, শব্দ আত্মা প্রভৃতি পদার্থের ভ্রাম্য অল্পপত্তি-ধর্ম্মক নহে, এই কথা বলিলে শব্দে অল্পপত্তি-ধর্ম্মকত্বের উপসংহার নিষেধ করা হয় অর্থাৎ শব্দে অল্পপত্তি-ধর্ম্মক নাই, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে ফলতঃ শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মক আছে, ইহাই বলা হইল। স্বতরাং ঐরূপ বাক্যের দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মী শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য উৎপত্তি-ধর্ম্মকরূপ হেতুর উপসংহার হওয়ায়, ঐরূপ বাক্যও ঐ স্থলে "উপনয়বাক্য" হইবে। ঐ বাক্য পূর্বোক্ত "বৈধর্ম্মোদাহরণ"-সাপেক্ষ হওয়ার উহা ঐ স্থলে "বৈধর্ম্মোপনয়বাক্য"।

কোন প্রাচীন সম্প্রদায় "নচ নায়ং তথা" এইরূপ বাক্যকেই "বৈধর্ম্মোপনয়" বাক্য বলিতেন। এই মতে পূর্বোক্ত স্থলে "নচ নায়ং তথা" অর্থাৎ "শব্দ উৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে, ইহা নহে," এইরূপ অর্থের বোধক ঐরূপ বাক্যই "বৈধর্ম্মোপনয়"-বাক্য হইবে। কিন্তু মহর্ষি যখন "বৈধর্ম্মোপনয়"-বাক্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে "ন তথা" এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, তখন পূর্বোক্ত প্রাচীন মত মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝা যায় না। ভাষ্যকারও ঐরূপ বলেন নাই।

পূর্বোক্ত সম্প্রদায় সাধ্যধর্ম্মীকে "অয়ং" এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া "তথা চায়ং" এইরূপ বাক্যকে "সাধ্যধর্ম্মোপনয়"-বাক্য বলিতেন। ভাষ্যকার তাহাও বলেন নাই। পরবর্ত্তী নব্য-নৈয়ায়িকগণও ঐরূপ না বলিলেও অবশ্য ব্যাখ্যায় যদুনাথ শিরোমণি প্রাচীনদিগের "তথা চায়ং" এইরূপ উপনয়-বাক্যের সংগতি দেখাইয়াছেন।

বৃত্তিকার বিখ্যাত বলিয়াছেন যে, উপনয়বাক্যে যে "তথা"-শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে, ইহা স্বত্রেকারের তাৎপর্য্য নহে। "বহিমান্ ধুমাং" এইরূপ স্থলে "বহির্ব্যাপ্য ধূমবানয়ং" অথবা

১। সাধ্যভুক্তি সপ্তমার্থে যজ্ঞী বিভক্তি সাধ্যো বর্ণিত হেতোর উপসংহার উপনয়ঃ।—(ভাষ্যমঞ্জরী, উপনয়-স্বত্রে)।



“তথা চায়ং” এই দুই প্রকারই উপনয়বাক্য বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার সর্বত্রই উপনয়-বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্তী নব্যনৈমারিকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই “উপনয়”-বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এবং “অয়ং” এই বাক্যের দ্বারা ই ধর্ম্মীর নির্দেশ করিয়া “বহুব্রীহী ধূমবানয়ং” ইত্যাদি প্রকার বাক্যকেই “উপনয়” বলিয়াছেন এবং “উপনয়-বাক্য” হইবে “অয়ং” এই বাক্যের নিগমন-বাক্যে “অনুদ্বয়” করিলে “তস্মাদ্‌বহিমান্” ইত্যাদি প্রকার বাক্যও “নিগমন” হইতে পারে, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু এইরূপ বলেন নাই। (নিগমন-সূত্র-ভাষ্য ত্রুটব্য) ॥৩৮॥

ভাষ্য। দ্বিবিধস্ত পুনর্হেতোর্দ্বিবিধস্ত চোদাহরণস্থোপসংহারস্বৈতে চ সমানম্।

অনুবাদ। দ্বিবিধ “হেতু”র সম্বন্ধে এবং দ্বিবিধ “উদাহরণে”র সম্বন্ধে এবং উপসংহারদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বিবিধ “উপনয়ে” (পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত “নিগমন”-বাক্য) সমান অর্থাৎ নিগমন-বাক্য সর্বত্রই এক প্রকার।

সূত্র। হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ। হেতুকথনপূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন “নিগমন” (নিগমন নামক পঞ্চম অবয়ব)।

বিশৃতি। উপনয়বাক্যের পরেই যে বাক্যটির প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার নাম “নিগমন”। পূর্বে যে হেতুর উল্লেখ করা হইবে, সেই “হেতু”র পূর্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিয়া সেই সঙ্গে—সকীর্ণে যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উল্লেখ করা হইবে, তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটি “নিগমন-বাক্য” হইবে। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে “তস্মাদ্‌হুংপত্তিবর্ষকস্বাদনিত্যঃ শব্দঃ” অর্থাৎ সেই উৎপত্তি-বর্ষকস্ব হেতুক শব্দ অনিত্য, এইরূপ অর্থের বোধক বাধ্য। ঐ বাক্যের প্রথমে পূর্বোক্ত হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, শেষে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনরুল্লেখ হইয়াছে। এই “নিগমন”-বাক্যই পঞ্চমাবয়বের চরম অবয়ব। ইহার দ্বারা ইচ্ছাবাক্যের উপসংহার বা সমাপ্তি করা হয়। স্থূল কথা ইহাই প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের সারসংকলন। প্রতিজ্ঞাবাক্য, হেতুবাক্য, উদাহরণবাক্য এবং উপনয়বাক্যের দ্বারা পূর্বে পৃথক পৃথক ভাবে বাহা বলা হয়, সেইগুলি সমস্তই শেষে এই “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা একবারে বলা হয়। এই নিগমন বাক্যই পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া উদাহরণকে একই প্রতিপাদ্যের প্রতিপাদক করে, এ জন্ত ইহার নাম “নিগমন”।

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্যোক্তে বা বৈধর্ম্ম্যোক্তে বা যথোদাহরণমুপসংহ্রিয়তে

তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি নিগমনম্ । নিগম্যন্তেহনেনেতি প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনম্ । নিগম্যন্তে সমর্থ্যন্তে সম্বধ্যন্তে । তত্র সাধর্ম্যোক্তে তাবদ্ব্যক্তৌ বাক্যং “অনিত্যঃ শব্দ” ইতি প্রতিজ্ঞা । “উৎপত্তি-ধর্মকত্বা”দিতি হেতুঃ । “উৎপত্তি-ধর্মকং স্থালাদি দ্রব্যমনিত্য”মিত্যুদাহরণম্ । “তথা চোৎপত্তিধর্মকঃ শব্দ” ইতুপনয়ঃ । “তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” ইতি নিগমনম্ । বৈধর্ম্যোক্তেহপি “অনিত্যঃ শব্দঃ” “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ”, “অনুৎপত্তি-ধর্মকমাত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং”, “ন চ তথাহনুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ” “তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” ইতি ।

অনুবাদ । উদাহরণানুসারে হেতুবাক্য সাধর্ম্য প্রযুক্তই উক্ত হউক, আর বৈধর্ম্য প্রযুক্তই উক্ত হউক, অর্থাৎ তাদৃশ হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া “সেই উৎপত্তিধর্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য” এইরূপ নিগমন-বাক্য উপসংহত হয় অর্থাৎ চরম বাক্যরূপে প্রযুক্ত হয় ।

( এই “নিগমন” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ) ইহার দ্বারা “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু,” “উদাহরণ” এবং “উপনয়” এক অর্থে নিগমিত হয়, এ জগৎ ইহাকে “নিগমন” বলিয়াছেন । নিগমিত হয়, কি না, সামর্থ্যযুক্ত হয়, সম্বন্ধযুক্ত হয় । অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়ব মিলিত হইয়া যে একাধের প্রতিপাদন করে, তাহাতে ঐ বাক্য-চতুষ্কয়ের যে সামর্থ্য বা পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক, পক্ষম অবয়ব নিগমন-বাক্যই তাহা সম্পাদন করে ; এ জগৎ ঐ বাক্যের নাম “নিগমন” ।

[ ভাষ্যকার পরিশেষে এখানে “সাধর্ম্য হেতু” ও “বৈধর্ম্য হেতু” স্থলে প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত স্থলে প্রায়বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন ] ।

সেই স্থলে ( শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানস্থলে ) সাধর্ম্যোক্ত হেতু হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত “সাধর্ম্য হেতু” স্থলে (১) “শব্দ অনিত্য” এই বাক্য প্রতিজ্ঞা । (২) “উৎপত্তিধর্মকত্ব জ্ঞাপক,” এই বাক্য হেতু । (৩) “উৎপত্তিধর্মক স্থানী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য,” এই বাক্য উদাহরণ । (৪) “শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তি-ধর্মক,” এই বাক্য উপনয় । (৫) “সেই উৎপত্তি-ধর্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য” এই বাক্য নিগমন । এবং বৈধর্ম্যোক্ত হেতু হইলে অর্থাৎ বৈধর্ম্য হেতু স্থলে (১) “শব্দ অনিত্য”



এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। (২) “উৎপত্তি-ধর্মকল্প জ্ঞাপক”, এই বাক্য হেতু। (৩) “অনুৎপত্তি-ধর্মকল্প আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখা যায়” এই বাক্য উদাহরণ। (৪) “শব্দ তরুণ অনুৎপত্তি-ধর্মকল্প নহে” এই বাক্য উপনয়। এবং (৫) “সেই উৎপত্তি-ধর্মকল্প-হেতুক শব্দ অনিত্য”, এই বাক্য নিগমন।

টিপ্পনী। নিগমন-বাক্য সর্বত্রই একরূপ। ভাষ্যকার প্রথমেই সেই কথা বলিয়া সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ প্রথম ভাষ্যসন্দর্ভের সহিত সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে। সূত্রে “হেতু” শব্দের অর্থ এখানে হেতুবাক্য। অবদব প্রকরণে “হেতু” শব্দের দ্বারা হেতু-পদার্থ না বুঝিয়া হেতু-বাক্যরূপ অবদবই বুঝা উচিত। “অপদেশ” শব্দের অর্থ এখানে কথন। পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ উত্তরবর্তিতা। তাহা হইলে সূত্রের “হেতুপদেশাৎ” এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, হেতু-বাক্য কথনের পরে, অর্থাৎ হেতু-বাক্য কখনপূর্বক। তাহা হইলে সম্পূর্ণ সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়, “হেতুবাক্যের কখন পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কখন নিগমন।” যে কোন বাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থের কখনপূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থের পুনঃ কখনই সূত্রার্থ বলিলে সূত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা হেতু-পদার্থ এবং “প্রতিজ্ঞা” শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বুঝিতে হয়, কিন্তু তাহা সহজে বুঝা যায় না; তাহাতে “প্রতিজ্ঞা” শব্দের দ্বারা প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝা উচিত, তাহা বুঝা হয় না। অবদব প্রকরণে “প্রতিজ্ঞা” শব্দের দ্বারা প্রথম অবদব প্রতিজ্ঞা-বাক্যকেই বুঝা উচিত এবং তাহারই পুনঃ কখন সহজে উপপন্ন হয়। পরবর্তী অনেক নৈসর্গিক পূর্বোক্ত প্রকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াই পূর্বোক্ত স্থলে “তদ্বাদনিত্যঃ শব্দঃ” অথবা “তদ্বাদনিত্যোহয়ং” এইরূপ “নিগমন”-বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকার “হেতুবাক্য”-রই উল্লেখ করিয়া তাহার পরে পূর্বোক্ত প্রকার “প্রতিজ্ঞাবাক্য”-র উল্লেখ করিয়া “নিগমন-বাক্য” প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে হেতুবাক্যের কখন পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃকখনই সূত্রার্থ বলিয়া বুঝা যায়। পূর্বে “উদাহরণ”-বাক্যের দ্বারা যে হেতু-পদার্থকে সাধ্যবর্ধের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হইবে এবং “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা সাধ্যবর্ধের ব্যাপ্য যে হেতু-পদার্থ সাধ্যবর্ধীতে আছে, ইহা বুঝান হইবে, সেই হেতু-পদার্থকেই সেইরূপে “নিগমন”-বাক্যে প্রকাশ করিবার জন্ত—“নিগমন”-বাক্যে হেতু-বাক্যের প্রথমে “তদ্বাদ” এই বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে উৎপত্তি-ধর্মকল্প অনিত্যরূপ সাধ্যবর্ধের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবর্ধী শব্দে বর্তমান, সেই উৎপত্তি-ধর্মকল্প-হেতুক শব্দ অনিত্য, ইহাই “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা ঐ স্থলে বুঝান হইয়া থাকে। কেহ বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের “তদ্বাদ” এই কথার অর্থ অতএব। অর্থাৎ যেহেতু উৎপত্তি-ধর্মকল্প অনিত্যের ব্যাপ্য এবং উহা শব্দে আছে, অতএব উৎপত্তি-ধর্মকল্প-হেতুক শব্দ অনিত্য, ইহাই ভাষ্যকারোক্ত “নিগমন”-বাক্যের অর্থ। ফলতঃ “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের প্রতিপাদ্যই প্রকাশ করা হয়। “নিগমন”-বাক্যে “প্রতিজ্ঞা-বাক্য” ও “হেতু”-বাক্য মিলিত থাকে এবং “তদ্বাদ” এই কথার দ্বারা “উদাহরণ”-বাক্য এবং



“উপনয়ন”-বাক্যের কলিতার্থ প্রকটিত হইয়া থাকে। “তস্মাৎ” এই হলে “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান বলিয়া বোধিত হেতু-পদার্থকেই সেইরূপে বুঝা যায়। পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িক কেবল “তস্মাৎ” এই কথার দ্বারাই পূর্ববোধিত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি হেতু-বাক্যের কখনই স্বত্রকারের অভিमत হয়, “হেতুপদেশ” শব্দের দ্বারা স্বত্রকার তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল “তস্মাৎ” এইরূপ বাক্য বলিলে চলিবে না। প্রকৃত হেতুবাক্য “উৎপত্তিধর্মকস্মাৎ” এইরূপ কথাই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাব্যকার তাহাই করিয়াছেন। ভাব্যকারের “উৎপত্তিধর্মকস্মাৎ” এই কথাটি তাহার পূর্বোক্ত “তস্মাৎ” এই কথারই ব্যাখ্যা বলা যায় না; কারণ, তিনি এখানে “নিগমন-বাক্য”র আকারই দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না। “তস্মাৎ” এই কথাটি পূর্বে না বলিলে, উৎপত্তিধর্মকস্মাৎ হেতুকে অনিত্যস্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মী শব্দে বর্তমান বলিয়া প্রকাশ করা হয় না, এই জন্য পূর্বে “তস্মাৎ” এই কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায়, স্বত্রে যে “হেতুপদেশ” শব্দ আছে, উহার দ্বারা ভাব্যকারোক্ত প্রকারে হেতুবাক্যের কখনই ভাব্যকার বুঝিয়াছিলেন। আর যদি ভাব্যকারের “তস্মাৎ” এই কথার দ্বারা “অতএব” এইরূপ অর্থই বুঝা হয়, তাহা হইলে ঐরূপে হেতুবাক্যের কখনই স্বত্রোক্ত “হেতুপদেশ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয়। যাহারা “নিগমন”-বাক্যে পূর্বোক্ত হেতুবাক্যের উল্লেখ না করিয়া কেবল “তস্মাৎ” এই কথার দ্বারাই পূর্বজ্ঞাত হেতু-পদার্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারাও ঐ “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান হেতুপদার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, “সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান যে হেতুপদার্থ, সেই হেতুপদার্থের জ্ঞাপনীয় যে সাধ্যধর্ম, সেই সাধ্যধর্মবিশিষ্ট সাধ্যধর্মী” এই পর্যন্ত যে বাক্যের দ্বারা বুঝা যাইবে, ত্রায়বাক্যের অন্তর্গত ঐরূপ বাক্যবিশেষই “নিগমন”, ইহাই পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণের সমর্থিত হুল সিদ্ধান্ত। অনেকে সাধ্যধর্ম হেতু হলে “তস্মাদুবা” এবং বৈধন্যাহেতু হলে “তস্মান তথা” এইরূপ নিগমন-বাক্য বলিতেন; কিন্তু ঐরূপ বাক্যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনর্লচন নাই, “তবা” এবং “ন তথা” এইরূপ “প্রতিজ্ঞা” বাক্য হয় না। “প্রতিজ্ঞা”-বাক্য সর্বত্রই একরূপ এবং “নিগমন”ও সর্বত্রই একরূপ, ইহা ভাব্যকারও বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাবাক্যেই পুনর্লচন করিতে হইলে ভিন্ন প্রকার “নিগমন”-বাক্য হইতেও পারে না। তব্চিহ্নানবিকার গদেশও “তস্মাদুবা” এইরূপ “নিগমন”-বাক্য কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহা বিশেষ বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় প্রশ্ন এই যে, “প্রতিজ্ঞা” বাক্য সাধ্যনির্দেশ, “নিগমন”-বাক্য সিদ্ধনির্দেশ, অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগ প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্তই হয় না; সুতরাং মহাবি “নিগমনবাক্য”কে প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্লচন বলিতে পারেন না। যাহার কোন অংশে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ নাই, তাহাকে কি প্রতিজ্ঞার পুনর্লচন বলা যায়? এতদ্বত্তরে তৎপর্যটিকাঙ্কার বলিয়াছেন যে, যদিও “প্রতিজ্ঞা” সাধ্যনির্দেশ এবং “নিগমন” সিদ্ধনির্দেশ, তথাপি “প্রতিজ্ঞাবাক্য”র দ্বারা যে পদার্থটি সাধ্যরূপে বোধিত হয়, “নিগমনবাক্য”র দ্বারা সেই পদার্থটিই সিদ্ধরূপে বোধিত হয়, অর্থাৎ



“প্ৰতিজ্ঞাবাক্যে” যে পদাৰ্থেৰ সাধন ছিল, “নিগমনবাক্যে” তাহাৰই সিদ্ধ হ'ব; ইতৰাং সাধ্য ও সিদ্ধৰূপ অবস্থাবিশিষ্ট একই পদাৰ্থ “প্ৰতিজ্ঞাবাক্য” ও “নিগমনবাক্যে”ৰ প্ৰতিপাদ্য হওয়াৰ “নিগমনবাক্যে” “প্ৰতিজ্ঞা” শব্দেৰ গৌণপ্ৰয়োগ কৰিয়া মহৰি “নিগমন-বাক্য”কে “প্ৰতিজ্ঞা”ৰ পুনৰ্ৰচন বুলিগাছেন। অৰ্থাৎ “নিগমনবাক্য” বস্তুতঃ “প্ৰতিজ্ঞাবাক্য” না হইলেও কোন অংশেৰ দ্বাৰা প্ৰতিজ্ঞাৰ্থেৰ প্ৰতিপাদক হওয়াৰ এবং পৰভাগে “প্ৰতিজ্ঞাবাক্যে”ৰ সমানাকার হওয়াৰ তাহাকে “প্ৰতিজ্ঞাবাক্যে”ৰ পুনৰ্ৰচন বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকাৰ “নিগমন” শব্দেৰ ব্যুৎপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিতে বুলিগাছেন যে, ইহাৰ দ্বাৰা প্ৰতিজ্ঞাদি চাৰিটি বাক্য একাৰ্থে নিগমিত হয়। “নিগমিত হয়” এই কথাৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন—“সমৰ্থিত হয়”। শেষে তাহাৰই আবার ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন—“সদ্ব্যকৃত হয়”। অৰ্থাৎ প্ৰতিজ্ঞাদি চাৰিটি বাক্যেৰ যে পৰস্পৰ সদ্ব্যকৃতি আছে, “নিগমন-বাক্যে”ৰ দ্বাৰা তাহা বুঝা যায়। পৰে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। অবয়বসমুদায়ে চ বাক্যে সমুদয়েতরেতরাভিসম্বন্ধাৎ প্ৰমাণান্যৰ্থঃ সাধয়ন্তীতি। সম্ভবস্তাবৎ, শব্দবিষয়া প্ৰতিজ্ঞা, আশ্রো-পদেশস্ত প্ৰত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্ৰতিসন্ধানাৎ, অনুশেষচ স্বাতন্ত্ৰ্যানুপপত্তেঃ। অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্ৰতিপত্তেঃ, তচ্ছোদাহরণভাষ্যে ব্যাখ্যাতম্। প্ৰত্যক্ষবিষয়মুদাহরণং, দৃষ্টেনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ। উপমান-মুপনয়ঃ, তথৈত্য়পসংহাৰাৎ, ন চ তথৈতি চোপমানধৰ্ম্মপ্ৰতিষেধে বিপৰীত-ধৰ্ম্মোপসংহাৰসিদ্ধেঃ। সৰ্ব্বেষামেকাৰ্থপ্ৰতিপত্তৌ সামৰ্থ্যপ্ৰদৰ্শনং নিগ-মনমিতি।

ইতরেতরাভিসম্বন্ধোহ্যস্যত্যাং প্ৰতিজ্ঞায়ামনাত্ৰয়া হেত্বাদয়ো ন প্ৰবৰ্ত্তেয়ন্। অসতি হেতৌ কস্য সাধনভাবঃ প্ৰদৰ্শ্যেত। উদাহরণে সাধ্যে চ কশ্চোপসংহাৰঃ স্যাৎ, কস্য চাপদেশাৎ প্ৰতিজ্ঞায়াঃ পুনৰ্ৰচনং নিগমনং স্যাদিতি। অসত্যুদাহরণে কেন সাধৰ্ম্ম্যং বৈধৰ্ম্ম্যং বা সাধ্যসাধনমুপাদৌ-য়েত, কস্য বা সাধৰ্ম্ম্যবশাদুপসংহাৰঃ প্ৰবৰ্ত্তেত। উপনয়কান্তরেণ সাধ্যেহনু-পসংহৃতঃ সাধকো ধৰ্ম্মো নাৰ্থং সাধয়েৎ, নিগমনাভাবে চানভিব্যক্তসম্বন্ধানাং প্ৰতিজ্ঞাদীনামেকাৰ্থেন প্ৰবৰ্ত্তনং তথৈতি প্ৰতিপাদনং কশ্চৈতি।

অনুবাদ। অবয়ব সমূহৰূপ বাক্যে অৰ্থাৎ ব্যাখ্যাত প্ৰতিজ্ঞা প্ৰভৃতি নিগমন পৰ্য্যন্ত পকাবয়বাত্মক ত্ৰায়বাক্যে প্ৰমাণগুলি অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভৃতি চাৰিটি প্ৰমাণ

মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অর্থ (সাধ্যপদার্থ) সাধন করে। সম্ভব অর্থাৎ অবয়বসমূহের মূলে প্রমাণ-চতুষ্টয়ের মিলন (দেখাইতেছি)।

প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দবিষয়, অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত কোন বিষয়ের প্রতিপাদক। কারণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা আপ্তবাক্যের (শব্দ-প্রমাণের) প্রতিসন্ধান করিতে হয় অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের দ্বারা বাহ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা-কেই অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হয় এবং বুঝাইতে হয়; সুতরাং যে বিষয়টি প্রতিপাদন করিতে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, ঐ বিষয়টি শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত থাকায় ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকে। এবং ঋষিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ ঋষিভিন্ন ব্যক্তিরা যখন আগমগম্য অলৌকিক তত্ত্বের দর্শন করেন নাই, তখন তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগের সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আগম-প্রমাণ হইতে পারে না। এই জন্তই তাঁহারা ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধনের জন্ত হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করেন এবং তাঁহাদিগের ঐ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের মূলে আগম-প্রমাণ আছে বলিয়াই, ঐ প্রতিজ্ঞাকে আগম বলা হইয়াছে।

হেতুবাক্য অনুমান প্রমাণ। কারণ, উদাহরণে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ হেতু-পদার্থ ও সাধ্যধর্মের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্যক্রূপে বুঝিয়া (হেতুর) জ্ঞান হয়। তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থও সাধ্যধর্মকে দেখিয়াই যে ঐ উভয়ের সাধ্য-সাধনভাব বা ব্যাপক-ব্যাপ্যভাব বুঝা যায়, উহাদিগের মধ্যে একটি সাধন (ব্যাপ্য) এবং অপরটি তাহার সাধ্য (ব্যাপক), ইহা নির্ণয় করা যায়, ইহা উদাহরণ-ভাষ্যে (উদাহরণসূত্র ভাষ্যে) ব্যাখ্যা করিয়াছি।

[তাৎপর্য্য এই যে—দৃষ্টান্ত পদার্থে কোন পদার্থকে ব্যাপ্য এবং কোন পদার্থকে তাহার ব্যাপক বলিয়া বুঝিয়া অর্থাৎ এই পদার্থ যে যে স্থানে আছে, সেই সমস্ত স্থানে এই পদার্থ আছেই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই সেই ব্যাপ্য পদার্থটিকে হেতু বলিয়া বুঝা হয়। তদনুসারেই সেই হেতুর বোধক হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, পূর্ব্বে ঐরূপ নিশ্চয় না হইলে কখনই হেতুবাক্য প্রয়োগ করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হেতুনিশ্চয় অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য; সুতরাং তৎসুলক হেতুবাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে]।

উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষবিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বোধিত পদার্থের বোধক। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু ও সাধ্যধর্মের যে ব্যাপ্য-



ব্যাপকভাব দৃষ্ট হয়, তদ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মোক্তে যে পদার্থ দৃষ্ট নহে—অনুমের, সেই পদার্থের সিদ্ধি হয় ( তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াই যখন উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তখন উদাহরণ-বাক্য প্রত্যক্ষমূলক ; এ জন্য উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে । )

উপনয়-বাক্য উপমান-প্রমাণ ; কারণ, “তথা” এই বাক্যের দ্বারা উপসংহার হইয়া থাকে,—অর্থাৎ উপনয়-বাক্যে “তথা” এই বাক্যের দ্বারা সাদৃশ্য বোধ হওয়ায় সেই সাদৃশ্য-জ্ঞান-মূলক উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে । এবং “ন চ তথা” এইরূপ বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ “তদ্রূপ নহে” এইরূপ বাক্যের দ্বারা উপমানের ধর্ম্মের নিষেধ হইলেও বিপরীত-ধর্ম্মের উপসংহার সিদ্ধি হয়, [ তাৎপর্য্য এই যে, বৈধর্ম্ম্য হেতু স্থলে যে উপনয়-বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহার দ্বারাও সাধ্য-ধর্ম্মোক্তে প্রকৃত হেতুরই উপসংহার সিদ্ধি হয় ; যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে “শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে” এইরূপ উপনয়-বাক্যের দ্বারা আত্মা প্রভৃতি যে উপমান অর্থাৎ দৃষ্টান্ত, তাহার ধর্ম্ম যে অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকহ, তাহা শব্দে নাই, এ কথা বলা হইলেও অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত আত্মাদি পদার্থের সহিত শব্দের সাদৃশ্য বোধ না হইয়া বিন্দুশব্দ-বোধ হইলেও তাহারই ফলে ঐ অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের বিপরীত ধর্ম্ম যে উৎপত্তিধর্ম্মকহ, শব্দে তাহারই উপসংহার ( অবধারণ ) হইয়া পড়ে । ]

সকলগুলির অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদাহরণ” এবং “উপনয়” এই চারিটি বাক্যের এবং তাহাদিগের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয়ের একার্থ-বোধ বিষয়ে সামর্থ্য-প্রদর্শন অর্থাৎ উহারা মিলিত হইয়া যে একটি অর্থের বোধ জন্মাইবে, তাহাতে উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ বা আকাজক্ষা আবশ্যক, তাহার বোধক “নিগমন” ।

পরস্পর সম্বন্ধও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের পরস্পর আকাজক্ষা বা অপেক্ষাও ( দেখাইতেছি ) ।

“প্রতিজ্ঞা” না থাকিলে হেতু প্রভৃতি নিরাশ্রয় হওয়ায় প্রযুক্ত হইতে পারে না । “হেতু” না থাকিলে কাহার সাধনর প্রদর্শিত হইবে ? দৃষ্টান্ত পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মোক্তে কাহার উপসংহার করা হইবে ? কাহারই বা কখন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচন-রূপ “নিগমন” হইবে ?

“উদাহরণ” না থাকিলে কাহার সহিত সাধ্যধর্ম্ম অথবা বৈধর্ম্ম্যকে সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে ? কাহারই বা সাধ্যধর্ম্ম বশতঃ উপসংহার (উপনয়) প্রযুক্ত হইবে ?

এবং “উপনয়ন”-বাক্য ব্যতীত সাধ্যধর্ম্মোতে অনুপসংস্কৃত সাধক ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্য-ধর্ম্মোতে বাহার উপসংহার করা হয় নাই, এমন হেতুপদার্থ অর্থ (সাধ্যপদার্থ) সাধন করিতে পারে না।

এবং “নিগমনবাক্য”র অভাবে অনভিব্যক্তসম্বন্ধ অর্থাৎ নিগমনবাক্য না বলিলে বাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান হয় না, এমন প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের একার্থ বিশিষ্টরূপে প্রবর্তন কি না,—“তথা” এই প্রকারে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য যে একার্থযুক্ত, সেই প্রকারে প্রতিপাদকতা কাহার হইবে? অর্থাৎ নিগমন-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, উহারা যে একই বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত, তাহা বুঝা যায়। নিগমন-বাক্য ব্যতীত তাহা কোন্ বাক্য প্রতিপাদন করিবে অর্থাৎ বুঝাইবে?

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মঞ্চি-কথিত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞানবাক্যে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ মিলিত হইয়া সাধ্যসাধন করে, অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে চারিটি প্রমাণই আছে; সুতরাং এই পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া সাধ্যসাধন করিলে সেই সাধ্যপদার্থটি সর্বপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত বলিয়া, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য, তদ্বিষয়ে আর কাহারও বিরুদ্ধবাদ সম্ভব হইতে পারে না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই প্রথম-সূত্র-ভাষ্যে পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞানকে “প্রথম” বলিয়াছেন। এখন প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-সমূহে যে সর্বপ্রমাণের মিলন আছে, তাহা বুঝাইতে হইবে; তাই ভাষ্যকার প্রথম-সূত্র-ভাষ্যে সংক্ষেপে সেই কথা বলিয়া আসিলেও এখানে হেতুর উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইরাছেন। ভাষ্যে “সম্বন্ধ” এই কথার অর্থ মিলিত হইয়া; সংপূর্ণক ভূতাত্ত্ব মিলন অর্থে প্রয়োগ আছে। তাই ভাষ্যকার শেষে “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারাই সেই মিলনকে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যে “সম্বন্ধ” শব্দের অর্থ এখানে মিলন। ভাষ্যকার তাহার কথিত প্রমাণচতুষ্টয়ের মিলন বুঝাইতে “প্রথম অবয়ব” প্রতিজ্ঞাকে বলিয়াছেন শব্দবিষয়, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দ-প্রমাণ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার দ্বারাই সাধ্যনির্ণয় হইতে পারায় হেতুপ্রত্নুতি প্রয়োগ নিস্করোজন হইয়া পড়ে। তবে ভাষ্যকার

১। অগ্নুঃ পৌরুষঃ ক্রপং ভববান্ মহাবিভিঃ।

সত্ত্বঃ বোদ্ধবলবাক্যে লোকসিত্যকাঃ।

এই লোকের ব্যাখ্যায় বট্‌সন্দর্ভে শ্রীমদ্বৈশিষ্ট্যম্ লিখিয়াছেন,—মহাবিভিঃ সত্ত্বঃ বিলিতঃ। সংপূর্ণো ভবতিঃ সংসর্গার্থে এসিদ্ধ এব, সত্ত্বাভোদ্ধিব্যোতি মহানবা নমাপগেজ্যাবে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের আরম্ভ এইরূপ।

আচীন আচার্য্যবর্ণ সত্তা অর্থেও “সম্বন্ধ” শব্দের প্রয়োগ করিতেন। অন্যের সম্বন্ধ, কি না—প্রমাণের সত্তা, এইরূপও ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বিতীয়ভাবে প্রমাণপরীক্ষারও উক্তি।



“প্রতিজ্ঞাকে” শব্দ-প্রমাণ বলিয়াছেন কিরূপে ? উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে বাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা প্রকৃতি প্রমের পদার্থের প্রতিপাদন করিতেই এই তায়শাস্ত্রের স্রষ্টি। আত্মা প্রকৃতি পদার্থগুলি শাস্ত্রের দ্বারা যেভাবে বুঝা গিয়াছে, সেইগুলিকে অনুমানের দ্বারা সেইরূপে প্রতিপাদন করাই “তায়ের” মুখ্য উদ্দেশ্য। বাহারা শাস্ত্রার্থে বিবাদ করিবে এবং শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত তত্ত্ব মানিবে না, তাহার বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিবে, তাহাদিগকে যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সেই পদার্থকেই মানাইতে হইবে এবং সেই তত্ত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্যও মানাইতে হইবে, তজ্জন্ত “তায়” প্রয়োগ করিয়া বিচার করিতে হইবে। শাস্ত্রের দ্বারা বাহা যেভাবে বুঝা হইয়াছে, তাহাকে সেইরূপে প্রতিপাদন করিতে যে “তায়” প্রয়োগ করা হইবে, তাহাই প্রকৃত তায়। তাহার প্রথম অবয়ব “প্রতিজ্ঞা” শব্দ-প্রমাণ না হইলেও শব্দ-প্রমাণ মূলক অর্থাৎ তাহার মূলে শব্দ-প্রমাণ আছে, কারণ, শব্দ-প্রমাণের দ্বারা বাহা প্রতিপাদিত আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্যে তাহাই বিষয় হইবে। এই জন্ত ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাকে শব্দ-বিষয় বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞার মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকার উহা শব্দ-প্রমাণের তায় ; এ জন্ত ভাষ্যকার পূর্বে প্রতিজ্ঞাকে আগম বলিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা আত্মাদি পদার্থের প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পরস্পরায় ঐ শাস্ত্র-প্রতিপাদিত আত্মাদি পদার্থের প্রতিপাদক হইবে। ফল কথা, বাহা প্রকৃত “তায়”, তাহাতে শব্দ-প্রমাণ-বোধিত বিষয়ই সাক্ষ্য এবং পরস্পরায় প্রতিপাদ্য হয়। সেই তায়ের দ্বারা শাস্ত্র-বোধিত পদার্থেরই নূতনর বোণ জন্মে এবং তাহাই “তায়ের” মুখ্য প্রয়োজন। এবং “প্রতিজ্ঞা”কে আগম বলিয়া আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রকৃত প্রতিজ্ঞা হইবে না, উহা “প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। মূল কথা, শব্দ-প্রমাণ-মূলক প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত প্রতিজ্ঞা, মুখ্য প্রতিজ্ঞা ; তাহাই প্রকৃত তায়ের প্রথম অবয়ব, এ জন্ত ভাষ্যকার তাহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়াই ধরিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা শব্দ-প্রমাণ-মূলক নহে, শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধও নহে, (যেমন “পর্যন্ত বহিমান” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার ঐ কথা বলেন নাই। সেই সকল “তায়” প্রকৃত তায় নহে, অর্থাৎ যে “তায়” ব্যুৎপাদন করা তায়-বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য, সে “তায়” নহে। ভাষ্যকার এখানে “প্রতিজ্ঞা”ক শব্দবিষয় বলিয়া তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা আশ্চর্য্যবাক্যের প্রতিসন্ধান করিতে হয়। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, আশ্চর্য্যবাক্যের দ্বারা বাহা বুঝা হইবে, তাহাকেই অনুমানের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অপরকে বুঝাইতে হইবে। তাহার পরে প্রত্যক্ষের দ্বারা তাহাকে বুঝিলে আর সে বিষয়ে কোন দ্বিগ্ধাশা থাকিবে না। অদৌকিক তত্ত্ব সমাধি জন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে, তখন তৎ-সাক্ষ্যকার জন্মিবে। ফল কথা, প্রথমতঃ শাস্ত্রের দ্বারা প্রবণ-জ্ঞান লাভ করিয়া সেই শাস্ত্র-

১। তায়দর্শন ন তায়নামজর্জিনী প্রতিজ্ঞা আগমত্বাপি প্রকৃততয়াতিপ্রায়েন ত্রষ্টব্যং। তথা চাপনাস-  
স্বাসেন প্রতিজ্ঞারঃ কমিত্যিহাবদবপি নিরাকৃত্যং বেদিতব্যং।—প্রথম সূত্রভাষ্যে তাৎপর্য্যটিকা।



জ্ঞাত তত্ত্বেরই অহুমানের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে যে “প্রতিজ্ঞা”-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাতে শাস্ত্র-বোধিত বিষয়ই প্রতিপাদ্য হইবে; হুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞা শব্দ-প্রমাণ-মূলক বলিয়া উহা শব্দ-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আপত্তি হইতে পারে যে, “প্রতিজ্ঞা”-বাক্যই শব্দ-প্রমাণ কেন হয় না? উহাকে শব্দ-প্রমাণ-মূলক বলিয়া গোণভাবে শব্দ-প্রমাণ বলা হইতেছে কেন? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃত জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্য হইবে, তদ্বিষয়ে ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই, অর্থাৎ বাহ্যারা ঐ সকল অলৌকিক তত্ত্ব দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তদ্বিষয়ের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহা লোকে মানিতে পারে না, এ জন্য তাঁহারা ঐ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া শেষে হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়া সাধ্য পদার্থের সমর্থন করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদিগের ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকায়, তাহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়া বলা হইতেছে। ফল কথা, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির শাস্ত্রগম্য অলৌকিক তত্ত্ব পরত্তর; তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইতে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলে তাঁহাদিগের ঐ বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

প্রতিজ্ঞার পরে “হেতু”-বাক্যকে অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। হেতুবাক্য বস্তুতঃ অহুমান-প্রমাণ না হইলেও হেতুবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্থের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অহুমান-প্রমাণের মন্যে গণ্য করিয়া তাহার সম্পাদক হেতুবাক্যকে ভাষ্যকার অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, হেতুবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্থের যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অহুমান-প্রমাণ নহে। প্রথমতঃ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুজ্ঞান হয়, তাহার পরে যে স্থানে সেই হেতুর দ্বারা কোন দর্শনের অহুমান করা হয়, সেই স্থানে হেতুজ্ঞান হয়; পরার্থীহুমনে ইহাই দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান। হেতুবাক্যের দ্বারা এই দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। শেষে যে স্থানে সেই দর্শনের অহুমান করিতে হইবে, সেই স্থানে সেই অহুমানের দর্শনের ব্যাপ্য হেতুপদার্থটি আছে, এইরূপে হেতুর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই তৃতীয় হেতুজ্ঞান। “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা উহা জন্মিয়া থাকে। ঐ তৃতীয় হেতুজ্ঞানের পরেই অহুমতি জন্মে; এ জন্য উহাই মুখ্য অহুমান-প্রমাণ। উহা হেতুবাক্যের দ্বারা জন্মে না; হুতরাং হেতুবাক্যকে অহুমান-প্রমাণ বলা যায় কিরূপে? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া হেতুবাক্য অহুমান-প্রমাণ কেন, তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, উদাহরণে সম্যক্ দর্শন করিয়া হেতুপদার্থের জ্ঞান হয়। ভাষ্যে এখানে “উদাহরণ” শব্দের অর্থ বাহ্য উদাহৃত হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থ। উদাহরণ বাক্য নহে। “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা উদাহরণ বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থও বুঝা যায়। এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ অর্থেও হুত্রে ও ভাষ্যে “উদাহরণ” শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। অনেক পুস্তকেই এখানে “নাস্ত্রুপপ্রতিপত্তেঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু “নংদ্রুপ প্রতিপত্তেঃ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত। কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই আছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু পদার্থ ও সাধ্যদর্শনের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ সম্যক্ৰূপে দর্শন করিয়া অর্থাৎ এই পদার্থ থাকিলে সেখানে এই পদার্থ থাকিবেই, ইহা কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে



বধারণরূপে বুঝিয়া হেতুর জ্ঞান হয় অর্থাৎ সেই ব্যাখ্যা পদার্থটিকে হেতু বলিয়া বোধ জন্মে। তাৎপর্য-টীকাকার শেষে ইহার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে 'যদিও প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হেতুজ্ঞান এবং হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি স্মরণ, এই সবগুলিই অনুমান-প্রমাণ (পঞ্চম সূত্র টিপ্পনো দ্রষ্টব্য), তাহা হইলেও হেতুব্যাক্যজন্ত যে দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান, তাহাকেই এখানে ঐ সমস্ত বলিয়া বুঝিয়া লইয়া অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ পরার্থানুমানস্থলে ঐ দ্বিতীয় হেতু জ্ঞানের সম্পাদক বলিয়া হেতুব্যাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ফল কথা, হেতুব্যাক্য-জন্ত হেতুজ্ঞানকেও অনুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য করিয়া, উহা বাহ্য হইতে জন্মে, সেই হেতুব্যাক্যকে ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উপনয়-ব্যাক্য জন্ত যে হেতুজ্ঞান জন্মে, তাহা মুখ্য অনুমান-প্রমাণ হইলেও হেতু-ব্যাক্যজন্ত হেতুজ্ঞানও অনুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য। তাৎপর্য-টীকাকার প্রথম সূত্রভাষ্যে এই প্রত্যাবে ব্যক্তিকের তাৎপর্যবর্ণনায় বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ যেখানে হেতুপদার্থের জ্ঞান হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থকে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়াই জ্ঞান হয়। শেষে যখন সেই হেতুর দ্বারা কোন স্থানে সেই সাধ্যধর্মটির অনুমান হয়, তখন সেই স্থানে যে দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান হয়, তাহা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া হেতুর জ্ঞান না হইলেও উহার দ্বারা হেতুপদার্থে পূর্ণীভূত সেই ব্যাপ্তিরূপ সন্ধকের স্মৃতি জন্মে; স্মরণ উহা ব্যাপ্তি সন্ধকের দ্বারক হওয়ার, ঐ ব্যাপ্তি স্মরণরূপ অনুমানের সহকারী কারণ। এই ভাবে অনুমান-প্রমাণের সহকারী কারণ ঐ দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানও অনুমান-প্রমাণ হওয়ার তাহার সম্পাদক হেতুব্যাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ফলতঃ হেতুব্যাক্য যদি অনুমান-প্রমাণ সম্পাদন করিল, তাহা হইলে হেতুব্যাক্যকে ঐ ভাবে অনুমান প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে; ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন, বস্তুতঃ হেতুব্যাক্যটিই যে অনুমান-প্রমাণ, ইহা ভাষ্যকারের কথা নহে। মনে রাখিতে হইবে, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়বে চারিটি প্রমাণের মিলন দেখাইতেই ভাষ্যকার এ সকল কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সাহায্যে যখন অনুমান-প্রমাণকেই মুখ্যরূপে আশ্রয় করা হয়, তখন যেখানে অনুমান-প্রমাণ মুখ্যরূপেই আছে।

হেতুব্যাক্যের পরে উদাহরণ-ব্যাক্যকে প্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। তাৎপর্যটীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে, হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের যে ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহার দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে অনুমান পদার্থের নিদ্ধি (অনুমিতি) হয়। শেষে তাৎপর্য বলিয়াছেন যে, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হইতে গেলে তাহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছেই নচেৎ অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না। অনুমানের দ্বারা তাহার জ্ঞান যেখানে হইবে, সেখানে হেতু আবশ্যক; সেই হেতু থাকিলেই যে সেই

১। এতদ্ব্যতীত ভবতি যদ্যপি ত্রয়াণ্যমসিদ্ধিস্বপ্ননাং নদ্বতীবাধুদাহকঃ তদ্যপি তবৎকেনেদ্যন্যেংপি নিদ্রাবর্ণনে সমুদায়োপচারানুমান ব্যপণেণ ইতি—(তাৎপর্যটীকা)।



পদার্থটি দেখানে থাকিবেই, ইহা বার্থরূপে নিশ্চয় করা আবশ্যক। ইহাকেই বলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়, ইহার জ্ঞাত দৃষ্টান্ত আবশ্যক। অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিলে সেই অনুমানের হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছেই; এই জ্ঞানই নহাৰি অনুমানকে প্রত্যক্ষ-বিশেষমূলক জ্ঞান বলিয়াছেন। কলকথা, কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে, হেতুপদার্থে সাধ্যবর্ণের যে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, তাহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকায় এবং উদাহরণ-বাক্যটি সেই মূলভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উদ্ভিত হওয়ার, উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ উদাহরণ-বাক্যটি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাহা নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথম সূত্র-ভাষ্যে এই প্রস্তাবে বার্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যে প্রত্যক্ষ পদার্থটিতে পূর্বে হেতু-পদার্থে সাধ্যবর্ণের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে, উদাহরণ-বাক্যটি সেই পদার্থের দারক হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থলে যেমন কোন বিবাদ থাকে না, তদ্রূপ উদাহরণ-বাক্য বলিলেও, কোন বিবাদ থাকে না; কারণ, উদাহরণ-বাক্যটি মূলভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উদ্ভিত, সুতরাং উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভূলা; এই জ্ঞাত উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে।

উদাহরণ-বাক্যের পরে “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, উপমান-বাক্যে যে “তথা” শব্দটি থাকে, উপনয়-বাক্যেও সেইরূপ “তথা” শব্দ থাকায় উপনয়বাক্যে উপমান-বাক্যের একাংশ থাকে (যদি সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।) তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, “তথা চারং” অর্থাৎ “ইহা তদ্রূপ” (তৎসদৃশ), এইরূপে প্রবর্তমান উপনয়-বাক্য “তথা” শব্দকে অপেক্ষা করে, সুতরাং উপনয়বাক্যের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত উদাহরণ-বাক্যে যে “যথা” শব্দ থাকে, তাহার সহিত উপনয়বাক্যের “তথা” শব্দের বোণ হওয়ার একটা সাদৃশ্য বোধ জন্মে। যেমন “যথা পাকশালা তথা পর্কত”, “যথা স্থানী তথা শব্দ” ইত্যাদি। উপমান-প্রমাণের মূল উপদেশ-বাক্য এবং তাহার অর্থ স্মরণ এবং সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ, এই সবগুলিই কেহ সাক্ষাৎ ও কেহ পরস্পরায় উপমান-প্রমাণ। তন্মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষরূপ উপমান-প্রমাণের একাংশ সাদৃশ্যে যে “যথা তথা ভাব”টি থাকে, অর্থাৎ যেমন “যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্যের দ্বারা অবগত সাদৃশ্যে যে ভাবটি থাকে, উপনয়-বাক্যেও ঐ “যথা তথা ভাব”টি থাকে বলিয়া তাহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ উপমান-বাক্য বস্তুতঃ উপমান-প্রমাণ না হইলেও উপমান-প্রমাণ সদৃশ বলিয়া ভাষ্যকার তাহাতে “উপমান” শব্দের গোণ প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিষয়ে আরও চিন্তা করা উচিত মনে হয়। প্রথম কথা মনে করিতে হইবে যে, ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাদি অবয়বসমূহে চারিটি প্রমাণ দেখাইবার জ্ঞানই “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহায্যকো চারিটি প্রমাণ সাক্ষাৎ ও পরস্পরায় মিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, ইহাই কিন্তু ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য এবং এই যুক্তিতেই ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকে “পরম সত্য” বলিয়াছেন। এ কথা উদ্যোতকর ও বাচস্পতি



দ্বিশ্রুও সেখানে লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যার প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়ব প্রত্যেকাদি প্রমাণমূলক, এইরূপ কথাও তাৎপর্যটীকাকার এবং তাৎপর্যপরিভূক্তির প্রকাশ-টীকাকার প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। কিন্তু যদি উপনয়-বাক্যে উপমান-প্রমাণের বস্তুতঃ কোন বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যে কোন একটা সাদৃশ্য লইয়া উপনয়বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিলে উপনয়-বাক্যের মূলে উপমান-প্রমাণ আছে, ইহা বলা হয় না। তাহা না বলিতে পারিলেও প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-সমূহে সর্ব-প্রমাণ মিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। উপনয়বাক্য যদি উপমান-প্রমাণের ফল নিষ্পাদন না করে, তাহা হইলে আর কিরূপে উহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়? কেবল উপমান-প্রমাণের যে কোন একটা সাদৃশ্য থাকতেই উপনয়বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমার মনে হয়, ভাষ্যকারের মতে “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা যে সাদৃশ্যবোধ জন্মে, “উপনয়”-বাক্যটি ঐরূপ সাদৃশ্য-জ্ঞানমূলক,—ঐ সাদৃশ্য-জ্ঞানকেই উপমান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উপনয়-বাক্য সাদৃশ্য-জ্ঞানমূলক এবং সাদৃশ্যজ্ঞানরূপ উপমান-প্রমাণের নিষ্পাদক। “বেমন স্থালীঃ তদ্রূপ শব্দ” এইরূপ বাক্যার্থবোধ হইলে অনিত্য স্থালীর সহিত শব্দের একটা সাদৃশ্যবোধ জন্মে। প্রদর্শিত স্থলে উৎপত্তিবর্ধকই সেই সাদৃশ্য। “স্থালী বেমন উৎপত্তিবর্ধক, শব্দও তদ্রূপ উৎপত্তিবর্ধক” ইহাই ঐ স্থলে উপনয়-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উদাহরণ-বাক্যে “বখা” শব্দ না থাকিলেও উপনয়-বাক্যে “তথা” শব্দ থাকায় “বখা” শব্দের জ্ঞানপূর্বক উপনয়-বাক্যের দ্বারাই ঐরূপ সাদৃশ্য বোধ জন্মে। অবশ্য ঐরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানকে এবং তাহার ফল তদ্বজ্ঞানকে কোন নৈরায়িকই উপমান-প্রমাণ ও উপমিতি বলেন নাই। শব্দবিশেষের অর্থবিশেষ নিশ্চয়ই উপমান-প্রমাণের ফল বলিয়া প্রধান স্মার্যভাষ্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপমানের অতিরিক্ত প্রামাণ্য সমর্থনে বাহ্য বলিয়াছেন, তাহাতেও ঐ সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যখন “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন, তখন তিনি উপমানের দ্বারা শব্দার্থ-নিশ্চয় ভিন্ন অস্ত্র প্রকার বোধও জন্মে—এই মতাবলম্বী, ইহা বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু ভাষ্যকার মহর্ষি গোতমের উপমান-লক্ষণ-সূত্রের ( ৬ সূত্র ) ভাষ্যে উপমান-প্রমাণের অসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, “ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বুদ্ধিতে ইচ্ছা করিবে।” তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা সেখানে বৈধর্ম্যোপমিতির সমর্থন করিয়াছেন এবং সেখানে ভাষ্যকারকে “ভগবান্” বলিয়া ভাষ্যকারের মত অবশ্য-গ্রাহ্য এবং উহাও মহর্ষি গোতমের সম্মত, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন ( বর্ষ সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য )।

উপমান-প্রমাণের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নোত্তরে ভাষ্যকার বর্ষ সূত্রভাষ্যে প্রথমে সংজ্ঞাসংজ্ঞা-সম্বন্ধ-নিশ্চয়কে অর্থাৎ এই পদার্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপে শব্দার্থ-নিশ্চয়কে উপমান-প্রমাণের



প্রয়োজন বলিয়াছেন। এবং সেখানে “ইহা (মহাবি) বলিয়াছেন”, এইরূপ কথাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার পরে ভাষ্যকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, “ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বৃদ্ধিতে ইচ্ছা করিবে।” ভাষ্যকার ঐ ভাবে শেষে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? তাহা ভাবিতে হইবে। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, অগতে সংজ্ঞাসংক্রিয়-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্তরূপ তত্ত্বও উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, মহাবি গৌতম ইহা কণ্ঠতঃ না বলিলেও ইহা তাহার মত বলিয়াই বৃদ্ধিতে হইবে। তাহা হইলে শব্দার্থ-নিশ্চয়ের দ্বারা অন্তরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ও উপমান-প্রমাণের দ্বারা অনেক স্থলে হইয়া থাকে, ইহা ভাষ্যকারের মত বলা যাইতে পারে। এবং তাহা হইলে ভাষ্যকার যে উপমান-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহাও সুসংগত হইতে পারে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ<sup>১</sup> ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখ করিয়া যেরূপ উদাহরণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যবোধকার প্রকৃতি ঐরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা না করিলেও এবং শব্দার্থ-নিশ্চয় ভিন্ন অন্তরূপ তত্ত্বের নিশ্চয়ও উপমানের দ্বারা হইয়া থাকে, এই মত কোন প্রধান ছায়াচাৰ্য্য স্বীকার না করিলেও ভাষ্যকারের যে ঐরূপ মত ছিল, ইহা বুঝিবার পক্ষে পূর্বোক্ত কারণগুলি সুদীর্ঘণের চিন্তনীয়।

বস্তুতঃ “গবয়” শব্দ “করত” শব্দ প্রকৃতির অর্থ-নিশ্চয়ই যদি কেবল উপমান-প্রমাণের ফল হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপযোগিতা বিশেষ কিছুই থাকে না। যদি উহার দ্বারা অন্তরূপ তত্ত্ব-নিশ্চয়ও জন্মে, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপযোগিতা থাকিতে পারে। নচেৎ উপমান-প্রমাণ মনুজের কোন বিশেষ কার্য্যে আবশ্যক, এই প্রশ্নের সহজতর দেওয়া যায় না। বেদাদি শাস্ত্রে অনেক স্থানে সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়া অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সকল স্থানের অনেক স্থলে সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা যে স্বল্প তত্ত্ব বুঝা যায়, তাহাকে উপমান-প্রমাণের ফল বলিলে উপমান-প্রমাণ বিশেষরূপে মোক্ষোপযোগী হইতে পারে। মীমাংসকগণ উপমান-প্রমাণের ঐরূপই উপযোগিতা বর্ণন করিয়াছেন। ভট্ট কুমারিলের “শ্লোকবার্ত্তিক”<sup>২</sup>র “উপমান পরিচ্ছেদ” দেখিলে ইহা পাওয়া যাইবে। মীমাংসাবাধ্যকার শবর স্বামীও উপমান-প্রমাণের দ্বারা অন্তবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ের কথা<sup>৩</sup> বলিয়াছেন। অবশ্য বাহার “উপমান” নামে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার করা আবশ্যক মনে করেন নাই, তাহার ঐরূপ বলিতে পারেন না। কিন্তু মহাবি গৌতম যখন মীমাংসকের দ্বারা উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তখন মীমাংসকের দ্বারা “উপমান”-প্রমাণের দ্বারা স্থলবিশেষে অন্তবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ও জন্মে, ইহা গৌতমের মত ছিল বলিতে বাধা কি? তবে শব্দবিশেষের অর্থবিশেষ নিশ্চয় কোন কোন স্থলে “উপমান” প্রমাণের দ্বারা হই, হয়,

১। এবং ভেদোপপাদনস্ত বিষয় ইতি ভাষ্যং বধ্য—মূলপর্বা সপ্তমী ওষধী বিধং ইতীত্যাদিদেশবাক্যার্থে জ্ঞাতে মূলপর্বা সাদৃশ্যজ্ঞানে জ্ঞাতে ইত্যমোষধী বিবহরীত্বপাদিত্যবিধরী ক্রিয়ত ইত্যাদি।—বট্ট পুত্রবৃত্তি।

২। উপমানোক্তোপনিষত্তে বাদৃশং তবান্ পরমাধানঃ পদ্ধতি অনেনোপদানেনাবপচ্ছ অহবশি তাদৃশংবন পদ্ধতীতি ইত্যাদি।—(শবর-ভাষ্য, পক্ষম পূঃ)।



উহা লেখানে অত্র প্রমাণের দ্বারা হইতেই পারে না; সুতরাং “উপমান” নামে অতিরিক্ত প্রমাণ নিক পদার্থ, এইটি গোতমের বিশেষ যুক্তি। এই জন্তই মহর্ষি গোতম “উপমানে”র অতিরিক্ত প্রামাণ্য সমর্থন স্থলে ঐ কথাটিরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারি। তাহাতে “উপমান”-প্রমাণের অস্ত্র কলের নিবেদন করা হয় নাই। পরন্তু নিবেদন না করিলে পরের মত অসম্মত হয়, এ কথা চতুর্থ স্বত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার উপমান-প্রমাণ স্থলেও গোতমের অনিবিদ্ধ মীমাংসক-মত গোতমের অসম্মত বলিবেন না কেন?

পূর্বোক্ত সমস্ত কথাগুলিতে পরবর্তী ভাষ্যচার্য্যগণের সম্মতি না থাকিলেও ভাষ্যকার যখন “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং যষ্ঠ স্বত্রভাষ্যে শেবে “ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় আছে” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তখন ভাষ্যকারের উপমানের বিষয় বিষয়ে মত-কিরূপ, তাহা স্বদীপ্ত চিন্তা করিবেন। এবং উপনয়-বাক্যের মূলে যদি বস্তুতঃ উপমান-প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যকার উপনয়-বাক্যকে কিরূপে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং কিরূপেই বা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বে সর্বপ্রমাণ নিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, এই কথা বলিয়াছেন, ইহাও স্বদীপ্ত চিন্তা করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিবেন। স্বদীপ্তগণের সমালোচনার জন্তই পূর্বোক্ত কথাগুলি লিখিত হইল।

“বৈবৰ্ণ্যোপনয়”-বাক্য স্থলেও ফলে সাধ্যবস্তুতে প্রকৃত হেতুবই উপসংহার হইয়া থাকে। কারণ, ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে “শব্দ তরুণ অনুৎপত্তি-বর্ষক নহে” এইরূপ বাক্যই “বৈবৰ্ণ্যোপনয়।” উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের জ্ঞান অনুৎপত্তিবর্ষক হয় নাই। তাহা হইলে শব্দে উৎপত্তি-বর্ষক আছে, ইহাই বুঝা হয়। তাহা হইলে ঐ স্থলে শব্দরূপ সাধ্যবস্তুতে অনিত্যবস্তুত্বের ব্যাঘাৎ লে উৎপত্তি-বর্ষক হেতু, তাহারই উপসংহার বা নিশ্চয় হয়। শব্দে ঐ উৎপত্তি-বর্ষকত্বের জ্ঞানই শব্দে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের বৈবৰ্ণ্য-জ্ঞান। ঐ উৎপত্তি-বর্ষকত্বকে আত্মা প্রভৃতির বৈবৰ্ণ্যরূপে পূর্বোক্ত “বৈবৰ্ণ্যোপনয়”-বাক্যের দ্বারা বুঝা হয়; সুতরাং “বৈবৰ্ণ্যোপনয়”-বাক্যকে বৈবৰ্ণ্যোপমান বলিয়াই ভাষ্যকার বলিবেন। ফলকথা, পূর্বোক্ত প্রকারে অস্ত্রবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্ত বৈবৰ্ণ্যোপমানও ভাষ্যকারের সম্মত বলিয়া বুঝা যায়; নচেৎ “বৈবৰ্ণ্যোপনয়” স্থলে ভাষ্যকার উপমান বলিয়া ধরিবেন কার্য্যকে? ভাষ্যকার এখানে নিজেই বলিয়াছেন যে, “তরুণ নহে” এই কথার দ্বারা উপমানের ধর্ম নিবেদন করিলেও তদ্বারা বিপরীত ধর্মেরই উপসংহার হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলের “উপনয়”কে যখন “বৈবৰ্ণ্যোপনয়” বলা হইয়াছে, তখন ঐ “উপনয়”কে ভাষ্যকার “বৈবৰ্ণ্যোপমান” বলিয়াই পূর্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিতেন, ইহা বুঝা যায়।

“তাত্পর্য্য পরিভুক্তি”তে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও “নিগমন”-বাক্যও প্রমাণ-বিশেষের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলেও ভাষ্যকার সামান্ততঃ অবয়ব-সমূহে সর্বপ্রমাণের মিলন আছে বলিয়া, শেবে “নিগমনে”র মূল বলিয়া কোন প্রমাণের উল্লেখ না করাতেও কোন দোষ হয় নাই। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যই তাহার সর্বপ্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়া গিয়াছে।



পরন্তু গৌণ-মতে প্রত্যক্ষাদি চারিটি ভিন্ন কোন প্রমাণ নাই। “নিগমন”-বাক্যের মূলে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ না থাকায় উহা বলা নিশ্চয়োজন।

ভাষ্যকার “নিগমন”-বাক্যের প্রয়োজন বুঝিতে শেবে বলিয়াছেন যে, সবগুলির একার্থবোধে সামর্থ্য-প্রদর্শক বাক্যই “নিগমন”। তাৎপর্যগীতাকার এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি উপনয় পর্যন্ত চারিটি বাক্যের একটি অর্থ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য যে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য হেতু, অথবা অমুদেয়ধর্ম, তাহা বুঝিতে ঐ চারিটি বাক্যের যে সামর্থ্য অর্থাৎ পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা আবশ্যক, নিগমনবাক্য তাহারই প্রদর্শক অর্থাৎ বোধক। শেবে বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য যে হেতু, তাহার জ্ঞান নিগমনের গৌণ প্রয়োজন। সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্মের জ্ঞানই নিগমনের মূখ্য প্রয়োজন। নিগমনের প্রয়োজন এইরূপে বিবিধ। তাৎপর্যগীতাকার প্রথম সূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় এই স্থলে বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য মিলিত হইয়া যে একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাতে ঐ চারিটি বাক্যের একবাক্যতা-বুদ্ধি আবশ্যক। ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা না বুঝিলে উহাদিগের একবাক্যতা বুঝা হয় না। প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের এবং উহাদিগের মূলভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের পরস্পর সাক্ষ্যকতাই ভাষ্যে “সামর্থ্য” শব্দের অর্থ। নিগমন-বাক্য উহা বুঝিয়া থাকে, এ জন্য নিগমন-বাক্য আবশ্যক। বিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারিত “অবয়ব”গুলির যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহাকে “আকাঙ্ক্ষা” বলে। ভাষ্যকার শেষে সেই আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষাও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা-বাক্যই সর্বপ্রধান। কারণ, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। “প্রতিজ্ঞা” না থাকিলে হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগই হইতে পারে না; হুতরাং সর্বাগ্রে প্রতিজ্ঞা বলিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে হেতু কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। প্রথমেই হেতুবাক্যের অপেক্ষা থাকে না। হেতুবাক্য না বলিলেও সাধ্যধর্মের সাধন কি, তাহা বলা হয় না, দৃষ্টান্ত এবং সাধ্যবর্ন্তীতে হেতুপদার্থ আছে, ইহাও বলা হয় না,—হেতুকখন পূর্বক প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনর্কচনরূপ নিগমন-বাক্যও বলা যাইতে পারে না। কারণ, এ সমস্তই হেতুসাপেক্ষ। উদাহরণবাক্য না বলিলে দৃষ্টান্ত কি, তাহা বুঝা যায় না; হুতরাং দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম বা বৈধর্ম্মকে

১। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি বাক্য বিচ্ছিন্নরূপেই উচ্চারিত হয়। উহারিণের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা না বুঝিলে উহাদিগের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝা যাইতে পারে না। পৃথক পৃথক বাক্যের দ্বারা পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন চারিটি অর্থই বুঝা যাইতে পারে; হুতরাং উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝা আবশ্যক। উহারিণের পরস্পর সম্বন্ধই এখানে উহাদিগের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা। উহা বুঝিলেই ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের “একবাক্যতা” বুঝা হয় এবং উহারই নাম “বাটগতবাক্যতা।” যদ্বি ভৈমিনি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন,—“এতৈকবাদেকং বাক্যং সাক্ষ্যককি-  
তাপে ত্রাং” (পূর্ববীনাংসো-বর্ণন, ২৯৫, ১পা, ৪৬ সূত্র) অর্থাৎ বিচ্ছিন্নরূপে পঠিত বাক্যগুলি যদি পরস্পর সাক্ষ্যক হয়, তাহা হইলে একাধের প্রতিপাদক হওয়ায় উহারা “একবাক্য” হয়। অমুদিতৌভিত্তির টীকার দ্বাৰায় ভট্টাচার্য্য “একবাক্যতা” বুঝাইতে ভৈমিনির এই সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়া শেষে কলিতার্থ বলিয়াছেন যে, পরস্পর মিলিত হইয়া বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাদকতাই একবাক্যতা।



সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, উদাহরণস্বরূপে উপনয়নবাক্যও বলা যায় না। উপনয়নবাক্য না বলিলেও সাধ্যধর্মীতে হেতু আছে, ইহা বলা হয় না ; স্তূতরাং হেতুরূপে গৃহীত পদার্থ সাধ্যসাধন করিতে পারে না। নিগমন-বাক্য না বলিলে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ অভিযুক্ত হয় না অর্থাৎ উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায় না ; তাহা না বুঝিলেও অর্থাৎ উহাদিগের পরস্পর-সাকাক্ষতা না বুঝিলেও উহাদিগের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ হইতে পারে না। ভাষ্যে “একার্থেন প্রবর্তনং” এই কথাটির দ্বারা বুঝিতে হইবে, একার্থ-বিশিষ্ট-রূপে প্রবর্তকতা। শেষে আবার ঐ কথাটির বিবরণ করিয়াছেন,—“তথেন্টি প্রতিপাদনং”। অর্থাৎ নিগমনবাক্য ব্যতীত আর কেহ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যকে সেই প্রকারে (উদাহরণ যে একাধিক, উদাহরণ যে পরস্পর-সাকাক্ষ, উদাহরণ যে একবাক্য, এই প্রকারে) প্রতিপাদন করিতে পারে না। নিগমন-বাক্যই উহাদিগকে ঐ প্রকার বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। নিগমন-বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, উদাহরণ একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতেই প্রযুক্ত। ভাষ্যে “প্রতিপাদনং” বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে প্রতিপাদকতা।

ভাষ্য। অথাবয়বার্থঃ—সাধ্যস্য ধর্মস্য ধর্মিণা সম্বন্ধোপাদানং প্রতিজ্ঞার্থঃ। উদাহরণেন সমানস্য বিপরীতস্য বা সাধ্যস্য ধর্মস্য সাধক-ভাববচনং হেতুর্থঃ। ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধন-ভাবপ্রদর্শনমেকত্রোদাহরণার্থঃ। সাধনভূতস্য ধর্মস্য সাধ্যেন ধর্মেণ সামান্যাদিকরণ্যোপপাদনমুপনয়নার্থঃ। উদাহরণস্বল্পোক্তিধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবোপপত্তৌ সাধ্যে বিপরীত-প্রসঙ্গ-প্রতিষেধার্থং নিগমনম্।

ন চৈতস্ত্যাং হেতুদাহরণ-পরিশুদ্ধৌ সত্যং সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যভ্যাং প্রত্য-বস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বং প্রক্ৰমতে। অব্যবস্থাপ্য খলু ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবমুদাহরণে জাতিবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে। ব্যবস্থিতে হি খলু ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবে দৃষ্টান্তস্থে গৃহমাণে সাধনভূতস্য ধর্মস্য হেতুত্বেনোপাদানং, ন সাধর্ম্যমাত্রস্য ন বৈধর্ম্যমাত্রস্য বেতি।

অনুবাদ। অনন্তর অবয়বগুলির প্রয়োজন (বলিতেছি)। ধর্মের সহিত অর্থাৎ যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমান করিতে হইবে, সেই ধর্মের সহিত সাধ্য ধর্মের সম্বন্ধের প্রতিপাদন “প্রতিজ্ঞা”র প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান অথবা বিপরীত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ সাধ্যধর্মের সাধকত্ব কখন অর্থাৎ কোন পদার্থ ঐ সাধ্যধর্মের সাধন, তাহা বলা “হেতু”বাক্যের প্রয়োজন। এক পদার্থে (দৃষ্টান্ত নামক কোন এক পদার্থে) দুইটি ধর্মের সাধ্য-



সাধনভাব প্রদর্শন অর্থাৎ এই ধর্মটি সাধ্য, এই ধর্মটি তাহার সাধন, ইহা প্রদর্শন করা “উদাহরণ”-বাক্যের প্রয়োজন। সাধনভূত ধর্মটির অর্থাৎ হেতু-পদার্থটির সাধ্যধর্মের সহিত একত্র অবস্থিতি প্রতিপাদন করা “উপনয়”-বাক্যের প্রয়োজন, অর্থাৎ সাধ্যধর্মের আধার যে সাধ্যধর্মী, তাহাতে হেতুপদার্থ আছে, ইহা বুঝানই উপনয়-বাক্যের প্রয়োজন, উপনয়-বাক্যের দ্বারা উহাই বুঝান হয়। দৃষ্টান্ত পদার্থে অবস্থিত দুইটি ধর্মের সাধ্যসাধনভাবের জ্ঞান হইলে সাধ্যধর্মীতে বিপরীত প্রসঙ্গ নিষেধের জন্য “নিগমন” অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে একটি ধর্মকে সাধ্য এবং একটি ধর্মকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝিলেও যে ধর্মীতে সাধ্যধর্মের সাধন করা উদ্দেশ্য, সেই ধর্মীতে সাধ্যধর্ম নাই, এইরূপ বিপরীত ধর্মের আপত্তি নিরাস করা “নিগমন”-বাক্যের প্রয়োজন।

হেতু ও উদাহরণের এই পরিস্ফুট হইলে সাধ্যম্যা ও বৈধর্ম্যের দ্বারা দোষ প্রদর্শনের নানা-প্রকারতা বশতঃ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র বহুত্ব ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ “হেতু” ও “উদাহরণ” বিশুদ্ধ হইলে বহুবিধ “জাতি” নামক অসদ্বৃত্তর এবং বহুবিধ “নিগ্রহস্থান” হইতে পারে না। কারণ, জাতিবাদী অর্থাৎ জাতি নামক অসদ্বৃত্তরবাদী দৃষ্টান্ত পদার্থে দুইটি ধর্মের সাধ্যসাধন ভাব ব্যবস্থাপন না করিয়া দোষ উল্লেখ করে। কিন্তু দুইটি ধর্মের দৃষ্টান্তস্থিত সাধ্যসাধন ভাবকে ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিশ্চিত বলিয়া জানিলে সাধনভূত ধর্মের হেতুরূপে গ্রহণ হয়, অর্থাৎ যে ধর্মটিকে প্রকৃত সাধ্যধর্মের সাধন বলিয়াই যথার্থরূপে নিশ্চয় করে, সেই ধর্মটিকেই হেতুরূপে গ্রহণ করে, সাধ্যম্যা মাত্রের (হেতুরূপে) গ্রহণ হয় না, অথবা বৈধর্ম্যমাত্রের (হেতুরূপে) গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টান্তে কোন পদার্থকে সাধ্যসাধন বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চয় করিলে, বাহা বস্তুতঃ সাধ্যসাধন নহে, এমন কোন সাধ্যম্যা অথবা বৈধর্ম্য মাত্রকে হেতুরূপে গ্রহণ করে না : সুতরাং বহুবিধ অসদ্বৃত্তর করিতে হয় না, পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইতেও হয় না।

টিপ্পনী। পূর্বভাবে অবয়বগুলির প্রয়োজন একরূপ বলা হইলেও আবার ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার অন্য ভাবে অবয়বগুলির প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে “অবয়বার্থঃ” এখানে অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য স্থলে যথাক্রমে উদাহার কথিত প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ (১) “শব্দ অনিত্য” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দধর্মীর সহিত অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের সম্বন্ধ বুঝান হয় অর্থাৎ শব্দধর্মী অনিত্যত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট, এই প্রতিপাদ্যটি প্রকাশ করা হয়। তাহার পরে শব্দধর্মীতে যে



অনিত্যত্ব ধর্ম আছে, তাহার সাধক কি ? ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। এ জন্ত (২) উৎপত্তিধর্মক জ্ঞাপক, এইরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা উৎপত্তি-ধর্মক অনিত্যত্বের সাধক, ইহা বলা হয়; ইহাই ঐ হেতুবাক্যের প্রয়োজন। তাহার পরে উৎপত্তি-ধর্মক যে অনিত্যত্বের সাধক হয় অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্মক থাকিলেই যে সেখানে অনিত্যত্ব থাকিবেই, ইহা বুঝাইতে হইবে। এই জন্ত (৩) "উৎপত্তিধর্মক স্থানী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়" এইরূপ উদাহরণবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝান হয়। ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনিত্য, স্থানী প্রভৃতি দ্রব্যে ইহা দেখা গিয়াছে। আবার "অনুৎপত্তিধর্মক আত্মা প্রভৃতি নিত্য" এইরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাও বুঝা যায় যে, যাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক, সে সমস্ত অনিত্য। ফলকথা, অনিত্যত্ব সাধ্যধর্ম, উৎপত্তি-ধর্মক তাহার সাধন; ইহা স্থানী প্রভৃতি সাধ্যদৃষ্টান্ত এবং আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তে বুঝিয়া উদাহরণবাক্যের দ্বারা তাহাই বুঝান হয়। তাহা বুঝানই ঐ উদাহরণবাক্যের প্রয়োজন। তাহার পরে উৎপত্তিধর্মককে অনিত্যত্বের সাধন বলিয়া বুঝিলেও ঐ উৎপত্তি-ধর্মক যে শব্দে আছে, ইহা না বুঝিলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান হয় না, এ জন্ত তাহা বুঝাইতে হইবে। তাহা বুঝাইবার জন্তই (৪) "শব্দ তরুণ উৎপত্তিধর্মক" অথবা "শব্দ তরুণ অনুৎপত্তি-ধর্মক নহে" এইরূপ উপনয়-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। ফলতঃ শব্দধর্মীতে যে উৎপত্তিধর্মক আছে, ইহা বুঝানই ঐ উপনয়-বাক্যের প্রয়োজন। উপনয়বাক্যের এই প্রয়োজন অনেক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন নাই। তাহার ইহার প্রচুর প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি স্মার্তচার্যগণ মন্বি গৌতমের মত রক্ষণের জন্ত ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাহারা উপনয়বাক্যের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই, তাহাদিগের কথা এই যে, হেতুবাক্যের দ্বারাই উপনয়বাক্যের কার্য্য হইয়া থাকে। "শব্দ অনিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলিয়া, "উৎপত্তি-ধর্মক জ্ঞাপক" এই কথা বলিলে ঐ উৎপত্তি-ধর্মক শব্দে আছে, ইহা বাদীর অভিপ্রেত বলিয়াই বুঝা যায়। নচেৎ বাদী শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে উৎপত্তি-ধর্মককে হেতু বলিবেন কেন ? যাহাকে বাদী হেতুরূপে উল্লেখ করিবেন, তাহা বাদীর মতে তাহার সাধ্যধর্মীতে নিশ্চয়ই আছে, ইহা বাদীর হেতুবাক্যের দ্বারাই বুঝা যায়। স্মার্তচার্যগণের কথা এই যে, সাধ্যধর্মের হেতু কি ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষানুসারে যে হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তাহার দ্বারা কেবল হেতুরই জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই পদার্থটি জ্ঞাপক, এইমাত্র জ্ঞানই তাহার দ্বারা হয়। ঐ হেতু বা জ্ঞাপক পদার্থটি যে সাধ্যধর্মীতে আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝা যায় না। কারণ, তাহার বোধক কোন শব্দ হেতুবাক্যে থাকে না। প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের কথা এই যে, তাৎপর্য্য চিন্তা করিলেই হেতুবাক্যের দ্বারা উল্লেখ বুঝা যায়। স্মার্তচার্যগণের কথা এই যে, যখন স্মিৎকের সহিত বিচারে মধ্যত্বের নিকটে নিজের বক্তব্যগুলি বুঝাইতে হইবে, তখন স্পষ্ট বাক্যের দ্বারাই তাহা বুঝান উচিত। পরন্তু সকল ব্যক্তিই সর্বত্র বাদীর তাৎপর্য্য চিন্তা করিয়া তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারাই উপযুক্ত মধ্যস্থ বাদীর অভিমত



হেতু প্রভৃতি বুঝিতে পারেন; আর হেতুবাক্য প্রভৃতি সেখানে আবশ্যক কি? এইরূপ হেতুবাক্য প্রভৃতি যে কোন অবস্থার দ্বারা বাদীর তাৎপর্য চিত্তা করিয়া বাদীর প্রতিজ্ঞা বুঝিতে পারিলে আর সেখানে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োজন কি? পরন্তু উপনয়বাক্য না বলিলে সাধ্যবশের ব্যাপ্য হেতুপদার্থ সাধ্যবশীতে আছে, এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ বাহ্যকে লিঙ্গপরামর্শ বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান আর কোন বাক্যের দ্বারা জন্মে না, সুতরাং সেই জ্ঞান জন্মাইতেও উপনয়-বাক্য বলিতে হইবে। তদ্বিচিন্তামণিকার গদ্যেও পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তির উপস্থাপন করিয়া উপনয়-বাক্যের সার্থকতা সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীনগণের মধ্যে সকলেই উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যবশের ব্যাপ্য হেতু-পদার্থ সাধ্যবশীতে আছে, এইরূপ বোধ জন্মে, এই মত স্বীকার করেন নাই। অনেকের মতে উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যবশীতে হেতুমাত্রেরই জ্ঞান হয়। উদাহরণবাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থকে সাধ্যবশের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিলে, শেষে ঐ হেতু সাধ্যবশীতে আছে, ইহাই উপনয়-বাক্যের দ্বারা বুঝে অর্থাৎ উপনয়-বাক্যজন্ত বোধে হেতুপদার্থে সাধ্যবশের ব্যাপ্তি বিদ্য হয় না। এবং এই হেতু এই সাধ্যবশের ব্যাপ্য এবং এই হেতু সাধ্যবশীতে আছে, এইরূপ যথাক্রমে উৎপন্ন দুইটি জ্ঞানের পরেই অল্পমিতি জন্মে; ইহাই অনেক প্রাচীনের সিদ্ধান্ত। অনেকে ভাষ্যকারেরও উহাই মত বলিয়া থাকেন। ভাষ্যকার এখানে উপনয়-বাক্যের বাহ্য প্রয়োজন বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তাহার ঐ মত অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উপনয়বাক্যের অর্থ পর্যালোচনা করিলে এবং মহর্ষির উপনয়বাক্যের “তথা” শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, মহর্ষি ও ভাষ্যকার সাধ্যবশের ব্যাপ্য যে হেতু, তাহা সাধ্যবশীতে আছে, এইরূপ বোধই উপনয়বাক্যের ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উদাহরণবাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থকে সাধ্যবশের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝা যায় এবং সেইরূপ হেতু দৃষ্টান্ত-পদার্থে আছে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং উদাহরণবাক্যের পরে (পূর্বোক্ত স্থলে) “শব্দ তত্রূপ উৎপত্তি-বশ্বক” এইরূপ উপনয়-বাক্য বলিলে শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য উৎপত্তি-বশ্বক আছে, এইরূপ বোধ জন্মিতে পারে। ঐরূপ বোধের নামই লিঙ্গপরামর্শ। নব্য নৈয়ায়িকগণও উপনয়-বাক্যজন্ত ঐরূপ বোধই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও “বহুব্যাপ্য ব্ৰহ্মবানয়ং” এইরূপ উপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে ঐ বাক্যের সমানার্থক-রূপে “তথা চানয়ং” এইরূপ উপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি “তথা” এই শব্দের দ্বারা সাধ্যবশের ব্যাপ্য হেতু-বিশিষ্ট, এইরূপ অর্থ প্রকটিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেন, বলিতেই হইবে।

সে বাহ্য হউক, মূলতথা এই যে, উপনয়বাক্য সর্বত্রই বলিতে হইবে, ইহা জ্ঞায়াচাৰ্য্যগণের সিদ্ধান্ত। তবে উদাহরণ-বাক্যের সার্বভৌমিক প্রয়োগ সকল নৈয়ায়িক স্বীকার করেন নাই। অনেকে বলিয়াছেন যে, যে হেতুতে, যে সাধ্যবশের ব্যাপ্তিবিশয়ে কাহারই কোন বিবাদ নাই, সেখানে ব্যাপ্তি-প্রদর্শনের জন্ত উদাহরণ-বাক্য বলা নিজ্জারোজন। যেমন ব্যভিচারী হেতু হইলেই তাহা সাদক হয় না, ইহা সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং কোন বাদী প্রতিবাদীর ব্যভিচারী হেতুকে



অদ্বৈতবাদীরা বুঝাইতে “ব্যতিক্রমিক” রূপ হেতুর উল্লেখ করিয়া উদাহরণবাক্যের প্রয়োগ না করিলেও কোন কতি নাই। উহা নিশ্চয়োজন। নব্য নৈরাসিক রসুনাথ প্রভৃতি এই মত স্বীকার করেন নাই। বাদীর নিজ কর্তব্য নির্বাহের জন্য পূর্বোক্ত স্থলেও উদাহরণবাক্য বলিতে হইবে, যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়বেরই প্রয়োগ না করিলে তাহা “ছায়া”ই হইবে না, ইহাই রসুনাথ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত<sup>১</sup>। জৈন নৈরাসিকগণ বাদবিচারে প্রতিজ্ঞা ও হেতু এই দুইটি মাত্র অবয়বের প্রয়োগ কর্তব্য বলিলেও স্থলবিশেষে তিনটি এবং চারিটি এবং নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়বেরই প্রয়োগ কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন<sup>২</sup>।

পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যের প্রয়োজনও অনেক সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্বে নিগমনবাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিলেও শেষে উহার আরও একটি প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও শেষে ঐ ভাবেই নিগমনবাক্যের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গবেষণও নিগমনের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় উদ্যোতকরের ঐ কথা গ্রহণ করিয়া নিগমন-বাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। সে কথাটি এই যে, উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা হেতু পদার্থে সাধ্যপদের ব্যাখ্যাবোধ হইলেও এবং উপনয়-বাক্যের দ্বারা ঐ হেতু-পদার্থ সাধ্য-ধর্ম্মান্তে আছে, ইহা বুঝা গেলেও বাদীর সাধ্যধর্ম্ম তাহার সাধ্যধর্ম্মান্তে নাই, এইরূপ বিপরীত প্রশ্ন দ্বিধাবোধের জন্য নিগমন-বাক্য আবশ্যক। শব্দ অনিত্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলেই শব্দে অনিত্যতা আছে, ইহা সিদ্ধ হইয়া যায় না। উহা সিদ্ধ করিতে হেতু, উদাহরণ এবং উপনয়বাক্য বলিতে হয়। কিন্তু উপনয়-বাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও শব্দে যদি বস্ততঃই অনিত্যতা না থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থলীয় হেতু “ব্যথিত” নামক হেত্বাভাস হইবে, উহা হেতু হইবে না। এবং যদি উভয় পক্ষে পরস্পর-প্রতিকূল তুল্যবল দুইটি হেতুর প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ঐ দুই হেতুই “সংপ্রতিপক্ষিত” নামক হেত্বাভাস হইবে, উহা হেতু হইবে না। “অব্যথিত” এবং “অসংপ্রতিপক্ষিত” না হইলে যে পদার্থ সাধ্যসাধন হয় না, অর্থাৎ তাহাতে হেতুর লক্ষণই থাকে না (হেত্বাভাস লক্ষণ-প্রকরণ, প্রথম সূত্র-টীকায় দ্রষ্টব্য)। বাদী ভায়বাক্যের দ্বারা তাহার সাধ্য সাধন করিতে তাহার গৃহীত হেতু যে সাধ্যসাধন, অর্থাৎ তাহাতে যে হেতু পদার্থের সমস্ত লক্ষণই আছে, ইহা প্রকাশ করিবেন। তজ্জন্ত বাদীকে পরিশেষে পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে।

ফলকথা, নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী তাহার প্রযুক্ত হেতুকে “অব্যথিত” এবং “অসংপ্রতিপক্ষিত” বলিয়া প্রকাশ করেন। পূর্বোক্ত স্থলে ছায়াবাদী নিগমন-বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করেন যে, উৎপত্তিধর্ম্মক বস্ত্তমাত্রই অনিত্য এবং সেই উৎপত্তি-ধর্ম্মক শব্দে আছে, সূত্রান্ত শব্দ অনিত্য। অর্থাৎ ঐ নিগমন-বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের বাহা প্রতিপাদ্য, তাহা একবারে

১। শিবোদিশিতে তন্মাপি বাদিনঃ স্বকর্তব্যানির্বাচ্যবুঝণভাবশ্চকরাং অদ্বৈতা সর্গব্রহ্মোপনয়নমাত্ৰ-জোড়ভাবভাপ্তেঃ অনুমিত্যপনুত্বাণ্ডিপনকধর্ম্মভাবান্তত এব লাভসম্ভবাং।—(অবয়বটীকায়তে ভাগবতী)।

২। প্রয়োগপরিপাটী দু প্রতিপাদ্যাসুসারিতাঃ।—(ঐশ্বর্যবদিকাকারিকা, জৈনভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য)।



প্রকাশ করতঃ উপসংহার করিয়া দেখান হয় যে, শব্দ অনিত্য আছে, শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্ব ধর্ম্মের বিপরীত নিত্যত্ব ধর্ম্মের কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইতে পারে না। কারণ, “শব্দ অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম অথবা অনিত্যত্বরূপে শব্দ সাধ্যরূপেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট হয় না। নিগমন-বাক্যের দ্বারা উহা সিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট হওয়ার শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্বই আছে, নিত্যত্ব নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে শব্দধর্ম্মীতে নিত্যত্বের আপত্তি নিরস্ত হইয়া যায়।

বাহারী নিগমন-বাক্যের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের কথা এই যে, নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী বাহ্য বুঝাইবেন, তাহা বাদীর তাৎপর্য্য বুঝিয়াই বুঝা যায়। বাদীর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির দ্বারা তাঁহার তাৎপর্য্যানুসারেই যখন উহা বুঝা যায়, তখন নিগমন-বাক্য নিরর্থক। নিগমনবাদী নৈব্যায়িকগণের কথা এই যে, বাদীর তাৎপর্য্য সকলেই সমান ভাবে বুঝিবে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কে বুঝিবে, কে না বুঝিবে, ইহাও পূর্ব্বে নিশ্চয় করা যায় না। বাদীর তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অনেক প্রতিবাদী অনেক আপত্তি করিয়া থাকে, তাহা বিচারক মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং তাৎপর্য্য বুঝিয়াই সকলে আমার বক্তব্য বুঝিয়া গইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া এই ক্ষেত্রে বাদীর বাক্যসংক্ষেপ কখনই উচিত নহে। বাদী নিজ কর্তব্য নির্দাহের জন্য তাঁহার সকল বক্তব্যই বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিবেন। সুতরাং প্রতিজ্ঞা প্রতীতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যই তাঁহার বক্তব্য। পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্য অবশ্যই বলিতে হইবে।

ভাব্যকার পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন বর্ণন করিয়া, শেষে ঐ পঞ্চাবয়ব বুঝাইতে এত প্রয়াস কেন, তাহার প্রয়োজন বলিয়াছেন। ভাব্যকারের সেই শেষ কথার মর্ম্ম এই যে, কেবল সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-মূলক এবং ঐক্যপ আরও বহুবিধ দোষ প্রদর্শন হইয়া থাকে। উহাকে সহর্ষি জাতি নামক অসম্ভব বলিয়াছেন। আর বহুবিধ নিগ্রহস্থানও আছে, তন্মধ্যে বাদী বা প্রতিবাদী পরাজিত হইয়া থাকেন (প্রথমাদ্যায়ের শেষভাগ এবং পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যদি হেতু ও উদাহরণ পরিত্যক্ত হয়, উহাতে কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদী নানাবিধ অসম্ভব করিতে পারেন না। জাতিবাদী কোন উদাহরণে ধর্ম্মবয়ের সাধ্যসাধন-ভাবে ব্যবহাণন না করিয়াই দোষ-প্রদর্শন করেন এবং করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন উদাহরণে এই ধর্ম্মটি এই ধর্ম্মের সাধন অর্গাৎ এই ধর্ম্ম থাকিলেই এই ধর্ম্ম সেখানে থাকিবেই, এইরূপ বুঝিয়া এবং বুঝিয়াই দোষ প্রদর্শন করিতে আসেন, তাহা হইলে তিনি ঐক্যপ দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না, তাঁহার জাতি নামক অসম্ভবের আর দেখানে অবদর থাকে না। সুতরাং সকলকেই হেতু ও উদাহরণের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তৎকর্ত্ত পঞ্চাবয়বের তত্ত্ব বুঝান নিত্য আবশ্যক। ভাব্যকার পূর্ব্বোক্ত হেতু ও উদাহরণের অতি সূক্ষ্ম, অতি জরুরী সাধর্ম্ম্য সকলে বুঝে না, প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই বুঝেন, এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এই সকল তত্ত্ব যে অতি জরুরী, ইহা পরম প্রাচীন ভাব্যকার বাংলায়নও বলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

নীমাংসক-সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অথবা উদাহরণাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন।



তাহারা<sup>১</sup> পঞ্চাবয়বের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। সর্বতত্ত্বতত্ত্ব ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু তাহার ভানতী গ্রন্থে পরার্থানুমানে অনেক স্থলে পঞ্চাবয়বেরই প্ররোগ করিয়াছেন। ইউরোপীয় নৈয়ায়িকগণও মীমাংসকদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে উদাহরণ এবং উপনয় এই দুইটি মাত্র অবয়ব স্বীকৃত, ইহা তার্কিকরকার দ্বারা অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের কোন কোন গ্রন্থ-সংবাদে বুঝা যায়, প্রতিজ্ঞা এবং হেতুও তাহারা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক দিগ্‌নাগ এবং সুবন্ধুর “প্রতিজ্ঞা-লক্ষণে”র সমালোচনা ও খণ্ডন উদ্যোগকরের গ্রন্থাবলিতেও পাওয়া যায়। সাংখ্যসূত্রে পঞ্চাবয়বের কথাই পাওয়া যায়। বৈশেষিকাচার্য্য পরমপ্রাচীন প্রশস্তপাদ “পদার্থদ্বন্দ্বসংগ্রহে” নিম্ন পূর্বক পঞ্চাবয়বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান এবং প্রত্যাহার এই সকল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ মহর্ষি গোতমোক্ত পঞ্চাবয়ব সর্বদৃশ্য না হইলেও অনেক দৃশ্যদায়ের সম্ভব এবং উহা অতি প্রাচীন মত। মহাভারতেও নারদ মুনির পঞ্চাবয়ব-বিজ্ঞতার সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে মহাভারতের পূর্ব হইতেই পঞ্চাবয়ব জ্ঞান-বিদ্যার গুরু-দৃশ্যদায় এ দেশে ছিলেন, ইহা বুঝা যায়<sup>২</sup> ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য। অত উক্তং তর্কো লক্ষণীয় ইতি অখ্যেদমুচ্যতে।

অনুবাদ। ইহার পরে ( অবয়ব নিরূপণের পরে ) তর্ক লক্ষণীয় অর্থাৎ তর্কের লক্ষণ বলিতে হইবে, এ জ্ঞান অনন্তর এই সূত্র বলিয়াছেন।

সূত্র। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেহর্থে কারণোপপত্তিত-  
স্তত্ত্বজ্ঞানার্থমুহস্তুকঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। অজ্ঞাত-তত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেছে—এমন পদার্থে, তত্ত্বটি জানিবার জ্ঞান প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত যে “উহ” অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষ, তাহা “তর্ক”।

ভাষ্য। অবিজ্ঞায়মানতত্ত্বেহর্থে জিজ্ঞাসা তাবজ্ঞায়তে জানীয় ইম-  
মিতি। অথ জিজ্ঞাসিতস্ত বস্তুনো ব্যাহতো ধর্ম্মৌ বিভাগেন বিমুশতি

১। ত্রীমদ্বাচস্পতি বা যোগেশ্বরাদিকান্।

মীমাংসকাঃ সৌভাষ্য সৌপনীতিমুহুর্তিন্ ॥—( তার্কিকরকা, ৩৫ কারিকা )।

২। পঞ্চাবয়ববোধঃ স্বপদ্যবিত্তিঃ ॥—( সাংখ্যসূত্র, ৪ অং, ২৭ সূত্র )।

৩। পঞ্চাবয়বযুক্তত্ব বাক্যত্ব জ্ঞানদোষবিৎ ॥—মহাভারত, সভাপর্ক, ৪ অং, ৪ দোহ।

কিং স্থিতিত্বেবমাহোস্থিষ্টমবমিতি । বিমুশ্যমানয়োদ্ধিগ্নয়োরেকতরং  
 কারণোপপত্ত্যাহনুজান্নাতি, সম্ভবত্যাগ্নিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি ।  
 কারণোপপত্ত্যা আদেবমেতেন্নেতরদিতি । তত্র নিদর্শনং—যোহয়ং জ্ঞাতা  
 জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীয়েতি জিজ্ঞাসা । স কিমুৎপত্তি-  
 ধর্মকোহধানুৎপত্তিধর্মক ইতি বিমর্শঃ । বিমুশ্যমানেহবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থে  
 যন্ত ধর্মস্তাহভ্যানুজ্ঞাকারণমুপপদ্যতে তমনুজান্নাতি, যদ্যয়মনুৎপত্তিধর্মক-  
 স্ততঃ স্বকৃতস্ত কর্মণঃ ফলমনুভবতি জ্ঞাতা । দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যা-  
 জ্ঞানানামুত্তরমুত্তরং পূর্বস্ত পূর্বস্ত কারণং, উত্তরোত্তরাপারে তদনন্তরা-  
 পায়াদপবর্গ ইতি স্মৃতাং সংসারাপবর্গো' । উৎপত্তিধর্মকে জ্ঞাতরি পুনর্ন  
 স্মৃতাম্ । উৎপন্নঃ খলু জ্ঞাতা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ সম্বধ্যত ইতি,  
 নাস্তেদং স্বকৃতস্ত কর্মণঃ ফলম্ । উৎপন্নশ্চ ভূহা ন ভবতীতি, তস্তাবিদ্যা-  
 মানস্ত নিরুদ্ধস্ত বা স্বকৃতকর্মণঃ ফলোপভোগো নাস্তি, তদেবমেকস্থানেক-  
 শরীরযোগঃ শরীরবিরোগশ্চাত্যন্তং ন স্মৃদিতি, যত্র কারণমুপপদ্যমানং  
 পশ্যতি তমানুজান্নাতি—সোহয়মেবং লক্ষণ উহস্তর্ক ইত্যুচ্যতে ।

অনুবাদ । যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ ধর্মের সংশয়  
 হওয়ায় তবুটি বুঝা যাইতেছে না, এমন পদার্থে—“এই পদার্থকে ( তত্ত্বতঃ ) জানিব”<sup>১</sup>  
 এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে । অনন্তর জিজ্ঞাসিত পদার্থের বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মকে পৃথক্  
 ভাবে ‘ইহা এইরূপ কি ? অথবা এইরূপ নহে ?’ এইরূপ সংশয় করে । সন্দিহা-  
 মান ধর্মদ্বয়ের কোন একটি ধর্মকে কারণের উপপত্তিবশতঃ অনুজ্ঞা করে ।  
 ( কারণের উপপত্তি কি, তাহা বলিতেছেন ) এই পদার্থে অর্থাৎ সন্দিহমান ধর্মদ্বয়ের  
 মধ্যে এই ধর্মটিতে “কারণ” কি না “প্রমাণ”—“হেতু”—সম্ভব হয় । ( অর্থাৎ  
 এইরূপ জ্ঞানই সূত্রোক্ত কারণোপপত্তি ) । ( অনুজ্ঞা কিরূপ, তাহা বলিতেছেন )  
 কারণের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রমাণের সম্ভব প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ  
 হইতে পারে, এতদ্বিধ হইতে পারে না ( অর্থাৎ এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই অনুজ্ঞা  
 এবং উহাই তর্ক ) । তদ্বিষয়ে অর্থাৎ এই তর্ক বিষয়ে উদাহরণ,—এই যে জ্ঞাতা

১। ভাষ্যে “জানীত্ব” এই শব্দটি বিবিধিভেদে আত্মনেগর বিতঞ্জির উত্তম পুরণের একতরনে নিম্পন্ন । বর্ত্তার  
 কসবব্যবিবক্য হলে উপপত্তিহীন জ্ঞাতাত্মর উত্তর আত্মনেগর হয় । “কল্পপদার্থভঃ”—পাদিনিত্ত্ব, ১। ৩। ৩। ৩।  
 জানীতে ( সিদ্ধান্তকৌমুদী ) । ভাষ্যকার পক্ষেও বলিয়াছেন,—“জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীত্ব” ।



জ্ঞাতব্য পদার্থ জানিতেছে, তাহাকে তদন্তঃ জানিব, এইরূপ জিজ্ঞাসা হয়। (পরে) সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তি-ধর্মক অর্থাৎ অনিত্য? অথবা অমুৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ নিত্য? এইরূপ সংশয় হয়। (পরে) সন্দিহমান অজ্ঞাত-তত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ ঐ জ্ঞাতৃপদার্থে যে ধর্মটির অনুজ্ঞার কারণ (প্রমাণ) উপপন্ন হয়, সেই ধর্মটিকে অনুজ্ঞা করে। (সে কিরূপে, তাহা বলিতেছেন) যদি এই জ্ঞাতা অমুৎপত্তিধর্মক হয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-পদার্থ আত্মা যদি অনাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করে (করিতে পারে) এবং দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান, এইগুলির পরপরটি পূর্বপূর্বটির কারণ। পরপরটির অপায় হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্যন্ত (দ্বিতীয় সূত্রোক্ত) পদার্থগুলির পরপরটির অভাব হইলে, তাহাদিগের অনন্তরের অর্থাৎ তাহাদিগের পূর্বপূর্বটির অভাব প্রযুক্ত অপবর্গ হয়, সূতরাং সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে অর্থাৎ আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেই তাহার সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে। কিন্তু আত্মা উৎপত্তি-ধর্মক অর্থাৎ দেহের সহিত উৎপন্ন হইলে (পূর্বোক্ত সংসার ও অপবর্গ) হইতে পারে না। যেহেতু আত্মা উৎপন্ন হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং বেদনা অর্থাৎ সূখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহা অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ এই আত্মার অর্থাৎ উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত আত্মার স্বকৃত কর্মের ফল হয় না। কারণ, উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না। অবিদ্যমান অর্থাৎ এই জন্মের পূর্বে বাহার অস্তিত্বই ছিল না, অথবা নিরূপক অর্থাৎ একেবারে অত্যন্ত বিনষ্ট সেই আত্মার (উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত আত্মার) স্বকৃত কর্মের ফলভোগ নাই; সূতরাং এইরূপ হইলে এক আত্মার অনেক দেহের সহিত বোগ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার এবং শরীরের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ অর্থাৎ মোক্ষ হইতে পারে না। এইরূপে যে পদার্থে অর্থাৎ সন্দিহমান ধর্মদ্বয়ের মধ্যে যে ধর্মটিতে প্রমাণ অনুপপদ্যমান বুকে, তাহাকে অনুজ্ঞা করে না। সেই এই, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত উহ, অর্থাৎ এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এইরূপ হইতে পারে না, এই প্রকার যে অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা নামক জ্ঞানবিশেষ, তাহা তর্ক নামে কথিত হয়।

বিসৃতি। কোন পদার্থের সামান্য জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞান সকলের থাকে না। বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা হইলে সেখানে চাইট ধর্ম হইয়া আদোচনা করে। যেমন আত্মা বলিয়া একটা পদার্থ আছে, ইহা জানিলেও, তাহা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা বুঝা যাইতেছে না, অর্থাৎ আত্মার নিত্যধর্ম বিশেষ তদন্তঃ বুঝিবার ইচ্ছা হইলেও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কারণ, আত্মার



অনিত্য বিষয়ে সেখানে একটা সূক্ষ্ম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে আত্মার নিত্য বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াও তাহা কার্যকারী হইতেছে না। ঐ সূক্ষ্ম সংশয়টী বিনষ্ট করিতে না পারিলে প্রমাণ কিছু করিতেও পারে না; এ জন্ত সেখানে তর্ক আবশ্যক। যাহারা আত্মার সংসার ও অপবর্গ মানেন, তাহারা ঐ স্থলে বুঝেন যে, আত্মা নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে, অনিত্য হইলে তাহা হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মার নিত্য বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব; সুতরাং আত্মা নিত্য হইতে পারে, অনিত্য হইতে পারে না, এইরূপ জ্ঞানই এখানে তর্ক। উহার দ্বারা পূর্বজাত সংশয়ের নিবৃত্তি হইলে আত্মার নিত্যত্বাধিক প্রমাণ আত্মার নিত্য সাধন করে। তর্ক এইরূপ অনেক স্থলে প্রমাণের সাহায্য করে, তর্ক নিজে প্রমাণ নহে, প্রমাণের সহকারী।

টিপ্পনী। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব নিরূপণের পরেই মহর্ষি তর্কের নিরূপণ করিয়াছেন। কারণ, পঞ্চাবয়বের দ্বারা প্রমাণ প্রদর্শন করিলেও অনেক স্থলে প্রমাণ-বিষয়ের অভাব-বিষয়ে সূক্ষ্ম সংশয়বশতঃ প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ জন্ত তর্ক আবশ্যক হয়। তর্ক শব্দের দ্বারা তর্কশাস্ত্র বুঝা যায় এবং আপত্তিবিষয়েরও বুঝা যায়, আবার অনুমানও বুঝা যায়। হেতু, তর্ক, ছায়, অসীকা, এই চারিটি শব্দ প্রাচীনগণ অনুমান অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন, এ কথা উদ্যোতকরের কথ্যতেও পাওয়া যায়।

কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই হুত্রোক্ত তর্ক পদার্থ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত “উহ”। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কারণের উপপত্তিযুক্ত উহ। ভাষ্যকার এখানে কারণ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রমাণ। উপপত্তি শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সম্ভব। এই পদার্থে প্রমাণ সম্ভব হয়, এই কথাই দ্বারা ভাষ্যকার হুত্রকানোক্ত কারণোপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হেতু শব্দের দ্বারা পরে আবার পূর্বোক্ত প্রমাণেরই পুনরুচ্চায়া করিয়াছেন। কারণ এবং হেতু শব্দ প্রাচীন কালে প্রমাণ অর্থেও প্রযুক্ত হইত। ভাষ্যকার এখানে তাহাই দেখাইয়া মহর্ষি-হুত্রোক্ত “কারণ” শব্দের দ্বারা এখানে প্রমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তর্ক, প্রমাণের উপপত্তি-প্রযুক্ত একতর বর্ণকে অহুজ্ঞা করে। এই অহুজ্ঞার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এতদ্বিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। তাৎপর্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই বিষয়টির বিপর্যয় শব্দ অর্থাৎ তাহার অভাব বিষয়ে সংশয় হইলে, যে পর্যন্ত কোন অনিষ্ট আপত্তি ঐ উৎকট সংশয় নিবৃত্ত না করে, সে পর্যন্ত তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইলেই প্রমাণের নিজ বিষয়ে প্রমাণের সম্ভব হয়। ঐ প্রমাণ-সম্ভবকেই বলা হইয়াছে—প্রমাণের উপপত্তি। সেই প্রমাণের উপপত্তি কর্তৃক প্রমাণ অহুজ্ঞাত হইলে প্রমাণের বিপর্যয় পরিশোধিত হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ে পূর্বজাত সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়। তখন প্রমাণের সেই সংশয়রূপ অন্তরায় না থাকায় প্রমাণ তাহার নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার কল সম্পাদন করে অর্থাৎ তখন তদ্বিনিশ্চয় জন্মায়। তাৎপর্য-টীকাকার প্রথম হুত্র-ভাষ্য-বার্তিকের ব্যাখ্যায় “তর্ক” প্রভাবে বলিয়াছেন যে, প্রমাণবিষয়ের



যুক্তাযুক্ত বিচাৰৰূপ “তৰ্ক” যুক্ততত্ত্বে প্ৰবৰ্ত্তমান প্ৰমাণকে অমুজ্ঞা কৰতঃ অমুগ্ৰহ কৰে, তৰ্কানুগৃহীত প্ৰমাণ তৰ্কে নিৰ্ণয়ে সমৰ্থ হয়। সেখানে তাৎপৰ্য্যটীকাকাৰেৰ এই কথার ব্যাখ্যার উদয়নাচাৰ্য্য তাৎপৰ্য্যপরিগুহিত্তে বলিয়াছেন যে, “তৰ্ক প্ৰমাণকে অমুজ্ঞা কৰে” ইহাৰ অৰ্থ এই যে, তৰ্ক প্ৰবৰ্ত্তমান প্ৰমাণেৰ অন্তৰ্ভুক্তভাবে অবস্থান কৰে। “অমুগ্ৰহ কৰে” ইহাৰ অৰ্থ নিৰ্ণয়পাৰ প্ৰমাণকে ব্যাপাৰবিশিষ্ট কৰে অৰ্থাৎ যে উৎকট সংশয় বশতঃ প্ৰমাণ নিজ বিষয়ে ব্যাপাৰশূন্য ছিল, সেই সংশয়ৰূপ অন্তৰায়টিকে নিৰস্ত কৰিয়া প্ৰমাণকে ব্যাপাৰযুক্ত কৰে অৰ্থাৎ নিজ বিষয়ে প্ৰযুক্ত কৰে।

ভাষ্যকাৰ এখানে তৰ্কের স্বৰূপ বৰ্ণনাৰ জন্ত প্ৰথমেই বলিয়াছেন যে, তৰ্কজিজ্ঞাসাৰ পৰে সংশয় জন্মিলে, তৰ্ক সেই সন্দেহমান ধৰ্ম্মস্বয়ৰ একটিকে প্ৰমাণেৰ উপপত্তিপ্ৰযুক্ত অমুজ্ঞা কৰে। তাৎপৰ্য্যটীকাকাৰ এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও সংশয়ৰ পৰেই জিজ্ঞাসা জন্মিয়া থাকে, তথাপি অনেক স্থলে জিজ্ঞাসাৰ পৰেও সংশয় জন্ম, সেই সংশয়ই এখানে ভাষ্যকাৰেৰ বিবক্ষিত। কাৰণ, জিজ্ঞাসাৰ পৰজাত সেই সংশয়ই তৰ্কোপস্থিতির অঙ্গ। তৰ্ক সেই সংশয়ৰ বিষয় দুইটি পক্ষের একটিকে নিষেধেৰ দ্বাৰা অপৰটিকে প্ৰমাণেৰ বিষয়ৰূপে অমুজ্ঞা কৰে; সুতৰাং যে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, সেই বিষয়েই তৰ্ক উপস্থিত হয় অৰ্থাৎ যে বিষয়ে সংশয় হয় নাই, তদ্বিষয়ে তৰ্ক উপস্থিত হয় না। এ জন্ত সংশয়কে তৰ্কোপস্থিতির অঙ্গ বলা হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকাৰ প্ৰমাণেৰ বিষয়েৰ অমুজ্ঞাবেই তৰ্ক বলিয়াছেন। “এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, অন্তৰূপ হইতে পারে না” এইরূপ জ্ঞানবিশেষই ভাষ্যকাৰেৰ মতে প্ৰমাণ-বিষয়েৰ অমুজ্ঞা। প্ৰমাণেৰ বিষয়ে সংশয় নিৰাসই ঐ তৰ্কের ফল। উহাকেই বলা হইয়াছে, তৰ্কের অমুগ্ৰহ। তৰ্ক প্ৰমাণকে অমুগ্ৰহ কৰে অৰ্থাৎ প্ৰমাণেৰ বিষয়ে সংশয় নিৰাস কৰে। উদয়নেৰ ব্যাখ্যা পূৰ্বেই বলিয়াছি। স্বজ্ঞকাৰ যে উহকে তৰ্ক বলিয়াছেন, ভাষ্যকাৰেৰ মতে বাহা প্ৰমাণবিষয়ে পদার্থের অমুজ্ঞা, উদ্যোতকৰ সেই জ্ঞানকে সম্ভাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান বলিয়াছেন। তিনি বহু বিচাৰপূৰ্বক এখানে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, “উহ” বা “তৰ্ক” সংশয়ও নহে, নিৰ্ণয়ও নহে, ইহা এইরূপ হইতে পারে; এই প্ৰকাৰ সম্ভাবনারূপ জ্ঞানই মহৰ্ষি সূত্ৰোক্ত উহ বা তৰ্ক। মহৰ্ষি সংশয়কে এবং নিৰ্ণয়কে পৃথক্ৰূপে বলিয়া তৰ্কের পৃথক্ উল্লেখ কৰিয়াছেন, সুতৰাং মহৰ্ষি গোটমোক্ত তৰ্ক-পদার্থ, সংশয় ও নিৰ্ণয় হইতে ভিন্ন প্ৰকাৰ জ্ঞান। প্ৰাচীন কালে কেহ কেহ এই তৰ্ককে সংশয়বিশেষ বলিতেন, কেহ নিৰ্ণয়বিশেষ বলিতেন, কেহ অমুমান বলিতেন। উদ্যোতকৰ সে সকল মত খণ্ডন কৰিয়াছেন।

উদ্যোতকৰেৰ মতানুসারে প্ৰবৰ্ত্তী জ্ঞানচাৰ্য্যগণ সংশয় ও নিৰ্ণয় ভিন্ন “সম্ভাবনা” নামক কোন জ্ঞান স্বীকাৰ করেন নাই এবং ঐরূপ জ্ঞানকে “তৰ্ক” বলেন নাই। প্ৰবৰ্ত্তিগণের মতে আপত্তি-বিশেষেৰ নাম তৰ্ক। উদয়নাচাৰ্য্য তাৎপৰ্য্যপরিগুহিত্তে বলিয়াছেন যে, অনিষ্টপ্ৰসঙ্গই তৰ্কের স্বৰূপ। তিনি কিংশাবলী গ্ৰন্থে বলিয়াছেন যে, বাহা প্ৰসঙ্গস্বৰূপ এবং বাহাৰ অপৰ নাম “উহ”, তাহাই “তৰ্ক।” তৰ্কের অপৰ নাম “প্ৰসঙ্গ”, এ কথা এখানে তাৎপৰ্য্যটীকাকাৰও লিখিয়াছেন। “প্ৰসঙ্গ” বলিতে এখানে প্ৰসক্তি; তাহাৰ কলিতার্থ আপত্তি। তাত্ত্বিক-

রক্ষাকার এই তর্কের স্বরূপ বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তর্ক বলিতে অনিষ্টপ্রদ। অনিষ্ট দ্বিবিধ;—(১) বাহ্য প্রমাণসিদ্ধ, তাহার পরিভাষা এবং (২) বাহ্য অপ্রমাণিক, তাহার গ্রহণ। ইহার যে কোন অনিষ্টের যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি, তাহাকে তর্ক বলে। যেমন কেহ বলিলেন,—জলপান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। এই কথা শুনিয়া অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, “বদি জল পীত হইয়াও পিপাসার নিবর্তক না হয়, তাহা হইলে পিপাসু ব্যক্তির জল পান না করুক? তাহার জল পান করিয়া থাকে কেন?” এই স্থলে পিপাসু ব্যক্তির যে জল পান করিয়া থাকে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐ প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিভাষারূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি প্রকাশ করার উহা “তর্ক” হইল। এবং কেহ বলিলেন—জল পান করিলে ঐ জল অন্তর্দাহ জন্মায়। তখন অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, “বদি পীত জল অন্তর্দাহ জন্মায়, তাহা হইলে আমারও অন্তর্দাহ উৎপাদন করুক, আমিও ত জল পান করিলাম; আমার অন্তর্দাহ জন্মায় না কেন?” এখানে আপত্তিকারীর অন্তর্দাহ অপ্রমাণিক, তাহার স্বীকারের প্রসঙ্গ বা আপত্তি প্রদর্শন করার উহাও “তর্ক” হইবে। পরবর্তী নব্য নৈরাসিকগণও আপত্তিবিশেষকেই “তর্ক” বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হুজুর্বাখ্যার বলিয়াছেন যে, (স্থলে) কারণ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য, উপপত্তি শব্দের অর্থ আরোপ। ‘কারণোপপত্তি’ বলিতে এখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ। উহা শব্দের অর্থও আরোপ। তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত যে আরোপ, তাহাই “তর্ক”। যে পদার্থ থাকিলেই অপর একটি পদার্থ সেই সঙ্গে সেখানে থাকিবেই, সেই পূর্বেকৃত পদার্থটিকে ব্যাপ্য পদার্থ বলে এবং যে পদার্থটি তাহার সমস্ত আশ্রয়েই থাকে, তাহাকে ঐ পদার্থের ব্যাপক বলে। ব্যাপ্য থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক থাকিবে, সুতরাং ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থেরই আরোপ বা আপত্তি করা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত যে তাহার ব্যাপক পদার্থের আরোপ, তাহাই হুজুর্বারের অভিमत “তর্ক”। যেখানে ব্যাপক পদার্থটি আছে, সেখানে তাহার আরোপ বা আপত্তি হয় না। ঐরূপ আপত্তি প্রকাশ করিলে তাহাকে বলে “ইষ্টাপত্তি”। পর্তুতে ধুম আছে, বহিও আছে, সেখানে যদি কেহ পর্তুতে ধুম আছে বলিলে, অপর ব্যক্তি বলেন যে, “বদি পর্তুতে ধুম থাকে, তাহা হইলে বহি থাকুক,” তাহা হইলে উহা “তর্ক” হইবে না। কারণ, পর্তুতে বহি আছেই; সুতরাং পর্তুতে বহির আপত্তি ইষ্টাপত্তি। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যে স্থান ব্যাপক পদার্থশূন্য বলিয়া নিশ্চিত, সেই স্থানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, তাহাই তর্ক। বৃত্তিকার এইরূপেই হুজুর্বাখ্য বর্ণন করিয়াছেন। “আরোপ” বলিতে ভ্রম জ্ঞান। ঐ ভ্রম জ্ঞান দ্বিবিধ। যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞান সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্বক আরোপ করা হয়, তাহাকে বলে “আহার্য্য

১। তর্কোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ তাদানিষ্টঃ দ্বিবিধঃ নহৎ।

প্রমাণিকপরিভাষাভেদতঃপরিভাষঃ—তর্কিকরকা, ৭০ কারিকা।



ভ্রম"। উহা ইচ্ছাপূর্বক কৃত্রিম ভ্রম বলিয়াই মনে হয়, নৈসর্গিকগণ উহাকে "আহাৰ্য্য" বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় কৃত্রিম অর্থে "আহাৰ্য্য" শব্দের প্রয়োগ আছে<sup>১</sup>। আর যে ভ্রম ইচ্ছাপূর্বক নহে অর্থাৎ বাহ্যর পূর্বে তাহার প্রতিবন্ধক বস্তু থাকি জন্মে নাই, সেই ভ্রমকে বলা হইয়াছে "অন্যাহাৰ্য্য ভ্রম"। তর্কের লক্ষণে বৃত্তিকার যে "আরোপ" বলিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত "আহাৰ্য্য ভ্রম"। জন্মে বহি নাই জানি, ধূম নাই—ইহাও জানি, কিন্তু কেহ যখন জলে ধূম আছে ইহা বলে, সমর্থন করে, তখন আপত্তি প্রকাশ করি যে, যদি জলে ধূম থাকে, তবে বহি থাকুক। এখানে বহির ব্যাপ্য পদার্থ ধূম বা বিশিষ্ট ধূমের জলে আরোপ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সেখানে তাহার ব্যাপক বহির আরোপ করার উহা "তর্ক" হইবে। ঐ স্থলে ঐ দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রযুক্ত। জলে ধূম নাই এবং বহি নাই, ইহা জানিয়াই ঐরূপ আরোপ করার, উহা "আহাৰ্য্য" আরোপ। যে কোন পদার্থের আরোপ করিয়া তৎপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ "তর্ক" নহে। যেমন কেহ "এই গৃহে হস্তী থাকে" এই কথা বলিলে, যদি কেহ বলেন যে, "যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তাহা হইলে অশ্ব থাকুক", এইরূপ আরোপ "তর্ক" হইতে পারে না। কারণ, হস্তী অশ্বের ব্যাপ্য পদার্থ নহে, অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই যে সেখানে অশ্ব থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। "যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তাহা হইলে হস্তীর বন্ধন-তন্তু থাকুক", এইরূপ আরোপ ঐ স্থলে "তর্ক" হইতে পারে। কারণ, হস্তী থাকিলে অর্থাৎ হস্তীর বাসগৃহ হইলে সেখানে তাহার বন্ধন-তন্তু থাকিবেই। অবশ্য যদি সে গৃহে বন্ধন-তন্তু থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ আপত্তি "তর্ক" হইবে না, উহা ইষ্টাপত্তি হইবে। ফলকথা, নব্যমতে ঐরূপ আপত্তিবিষয়েই তর্ক। উহা এক প্রকার মানস প্রত্যক্ষ। তর্কিক, বাক্যের দ্বারা তাহার ঐ আপত্তিরূপ মানস জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। তর্কিকের সেই আপত্তিই "তর্ক", তাহার বাক্য "তর্ক" নহে। আপত্তিহলে "আপাদ্য" ও "আপাদক" এই দুইটি পদার্থ আবশ্যক। বাহ্যর আপত্তি করা হয়, তাহাকে "আপাদ্য" বলে, যে পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত আপত্তি হয়, তাহাকে "আপাদক" বলে। যেমন বিশিষ্ট ধূম আপাদক—বহি আপাদ্য। আপাদ্যটি ব্যাপক হইবে, আপাদকটি তাহার ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপ্য থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক থাকিবেই; সুতরাং ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপকের আপত্তি করা যায়। এ অস্ত্র ব্যাপ্য পদার্থটিই "আপাদক" হয়, ব্যাপক পদার্থটি তাহার "আপাদ্য" হয়। "ব্যাপ্য" পদার্থ থাকিলেই যেমন তাহার "ব্যাপক" পদার্থটি সেখানে থাকে, তরূপ ঐ ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের অভাব থাকে; সুতরাং "তর্ক" হলে "আপাদ্য"রূপ ব্যাপক পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইলে তদ্বারা সেখানে "আপাদক"রূপ ব্যাপ্য পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইয়া যাইবে। ঐরূপ নিশ্চয় অহুমিতি। নব্যমতে তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে ঐরূপ অহুমিতি জন্মে। এইরূপ হেতু পদার্থে সাধ্যবর্ধের ব্যাভিচার সংশয় হইলে তর্কের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। যেমন "ধূম যদি বহির ব্যাভিচারী হয়, তাহা হইলে বহিজন্ম না হউক," এই প্রকার তর্ক উপস্থিত হইলে সেখানে ধূমে বহিজন্ম অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া ঐ

হেতুর দ্বারা “ধূম বহির ব্যভিচারী নহে” এইরূপ অহুমিতি জন্মে। তাহার ফলে “ধূম বহির ব্যভিচারী কি না” এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয়। বাহ্য বহিঃপাত পদার্থ, অর্থাৎ বহিঃ বাস্তবিক বাহ্য উৎপত্তিই হয় না, সেই ধূম বা বিশিষ্ট ধূম যেখানে থাকিবে, সেখানে বহি থাকিবেই; সুতরাং ধূম বা বিশিষ্ট ধূম বহির ব্যভিচারী নহে, পূর্বোক্ত প্রকার তর্কের ফলে এইরূপ অহুমিতি জন্মে। তাহার পরে পূর্বোক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয়। ফলতঃ সংশয় নিবৃত্তিই তর্কের শেষ ফল। এই সংশয় নিবৃত্তি কোনরূপেই হইতে পারে না বলিয়া চার্লস এই সিদ্ধান্তের তাঁর প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য ভায়কুশুমাজলি গ্রন্থে তাহার উত্তর দিয়াছেন। শ্রীহর্ষমিশ্র তাহার “বগুনবগুনা” গ্রন্থে উদয়নের ঐ কথার উপহাসের সহিত উত্তর করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। “বগুনোদ্ধার” গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্র এবং “তত্ত্বচিন্তামণি”র তর্ক প্রকরণে গবেশ শ্রীহর্ষের প্রতিবাদের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। (দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১ আঃ, ৩৮ হৃদভাষ্য টিপনী দ্রষ্টব্য।) পরবর্তী ভায়চাৰ্য্যগণ এই তর্ককে পাঁচ প্রকার বলিয়াছেন এবং এই তর্কের পাঁচটি অঙ্গ বলিয়াছেন। সেই পঞ্চাঙ্গের কোনটি না থাকিলে তাহা তর্ক হইবে না; তাহাকে বলে তর্কভাস। “লাঘব”, “গৌরব” প্রভৃতি আরও কতকগুলি প্রমাণের সহকারী আছে, সেগুলি আপত্তি পদার্থ নহে বলিয়া তর্ক নহে; তবে তর্কের ভায় প্রমাণের সহকারী বলিয়া তর্কের ভায় ব্যবহৃত হয়। এ সকল কথারও বর্ণনায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার তর্কের উদাহরণ বলিতে বর্ণনাক্রমে যে ভাবে তর্কের উদাহরণ হয়, তাহা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ “জ্ঞাতা আছে” এইরূপে জ্ঞাতার সামান্ত জ্ঞান হয়। বখন জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতেছে, তখন এই জ্ঞানের অবশ্য বর্ত্তা আছে, এইরূপে জ্ঞাতা বা জ্ঞাতার সামান্ততঃ জ্ঞান হইলে পরে সেই জ্ঞাতাকে তত্ত্বতঃ জানিব অর্থাৎ জ্ঞাতা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা জানিব, এইরূপ ইচ্ছা জন্মে। তাহার পরে সেই জ্ঞাতা উৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি হয় অথবা জ্ঞাতার উৎপত্তি হয় না, জ্ঞাতা নিত্যনিক পদার্থ, এইরূপ সংশয় জন্মে। তাহার পরে আন্তিকগণের এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে,—বদি জ্ঞাতার উৎপত্তি না হয় অর্থাৎ জ্ঞাতা নিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে দেহাদির উৎপত্তির পূর্বেও জ্ঞাতা থাকে, সুতরাং একই জ্ঞাতার নানা দেহাদি সমুদয়বশতঃ পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের ভোগ এবং পূর্বকৃত কর্মফলে এই বর্ত্তমান দেহাদি পরিগ্রহ হইতে পারে। ফলকথা, তাহা হইলে জ্ঞাতার সংসার হইতে পারে। এইরূপ না হইলে আন্তিকগণের মতে জ্ঞাতার সংসার হয় না। জ্ঞাতা নিত্য হইলে বহু জন্মের কর্মাদির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞাতার মোক্ষলাভও হইতে পারে। জ্ঞাতার উৎপত্তি হইলে তাহার

১। জ্ঞাতাভাবিত্তে তর্কঃ পঞ্চবিধঃ সূত্রঃ।

অতঃপক্ষঃ সম্প্রদায়ভাব্যঃ কল্পতে।

ব্যাপ্তিকর্ম্মভিত্তিকবিশ্বাসঃ বিশেষঃ।

অনিষ্টাননুভূতঃ ইতি তর্কঃ পঞ্চবিধঃ।

অস্বাভাব্যবৈকল্যে তর্কভাসতা ভবেৎ।—তর্কিকরকা, ১১। ১২। ১৩।



সংসার ও মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, আত্মার উৎপত্তি হয় বলিলে যে দেহের সহিত যে আত্মা উৎপন্ন হইবে, সেই দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ বলিতে হইবে; সেই দেহের পূর্বে আর সে আত্মা ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উৎপন্ন বস্তু উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং উৎপন্ন ভাব পদার্থ চিরস্থায়ী হয় না, কোন দিন তাহা অন্ত্যস্ত বিনষ্ট হইবেই (ভ্রান্ত-মতে ইহাই সিদ্ধান্ত)। তাহা হইলে বর্তমান অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ আত্মার পূর্বকৃত কর্মের ফল হইতে পারে না। পূর্বে যে আত্মা নাই, তাহার দেহাদি-সম্বন্ধ তাহারই কর্মফল হইবে কিরূপে? এবং পূর্বাচরিত কর্ম ভিন্ন অভিনব দেহাদি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন বিচিত্র সুখদুঃখ-ভোগও তাহার হইতে পারে না। এবং শরীরের সহিত উৎপন্ন আত্মা শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইবে, সুতরাং আত্মার অপবর্ণও হইতে পারে না। আত্মা চিরকাল থাকিবে, কিন্তু তাহার আর কখনও দেহাদি-সম্বন্ধ হইবে না, এই অবস্থাই আত্মার কৈবল্যাবস্থা। আত্মা নিত্য না হইলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ তর্ক পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় নিবৃত্ত করে, তখন আত্মার নিত্যত্বসাধক প্রমাণ আত্মার নিত্যত্বনিশ্চয় জন্মায়। ভাব্যকারের সম্মত এইরূপ তর্কদ্বলেও কিন্তু ন্যাগণ-সম্মত প্রসঙ্গ বা আপত্তি আছে। যদি আত্মা অনিত্য হয় অর্থাৎ দেহাদির সহিত উৎপন্ন পদার্থ হয়, তাহা হইলে আত্মার সংসার ও অপবর্ণ না হউক, এইরূপ আপত্তিই নব্য-মতে এখানে তর্ক হইবে। ভাব্যকার প্রভৃতি প্রাচীন মতে ঐ দ্বলে আত্মার অমুৎপত্তিধর্মকত্ব বিষয়েই প্রমাণকে উপপদ্যমান দেখিয়া “আত্মা অমুৎপত্তিধর্মক হইতে পারে অর্থাৎ তাহাই সম্ভব, উৎপত্তিধর্মক হইতে পারে না অর্থাৎ তাহা সম্ভব নহে” এই প্রকার অসম্ভাব বা সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষই “তর্ক” হইবে। ভাব্যকার যে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়-তত্ত্বটির অসম্ভাবরূপ জ্ঞানবিশেষকেই তর্কের স্বরূপ বলিতেন, তাহা পরবর্তী ভাষ্যে পরিষ্কৃত আছে।

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে কোন সংশয়ই হয় না, সুতরাং সেই পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ তর্ক হওয়া অসম্ভব। তাই মহর্ষি “অবিজ্ঞাত পদার্থে” এইরূপ কথা না বলিয়া “অবিজ্ঞাতত্ব পদার্থে” এইরূপ কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে না, তাহার তত্ত্ববিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছে, এমন পদার্থেই তর্ক হইবে। যে পদার্থের তত্ত্ববোধ জন্মিয়াছে, ঐ পদার্থে ঐ তত্ত্ববোধ সূদৃঢ় করিবার জন্ত সাংখ্যশাস্ত্রে ভ্রমণা, অবণ, বারণ প্রভৃতি অন্তঃকরণ-ধর্মকে “উহ” বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে সেই সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত “উহ” কেহ না বুঝেন, এই জন্ত মহর্ষি সূত্রে “অবিজ্ঞাততত্ত্বের্থে” এই অংশ বলিয়া-ছেন। যদিও সূত্রে “কারণোপপত্তি” শব্দ থাকাতাই ইহা বুঝা যায়, অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত “উহ” বখন এই সূত্রোক্ত কারণোপপত্তি প্রযুক্ত নহে, তখন এই সূত্রোক্ত “উহ” সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত “উহ” নহে, ইহা বুঝা যায়; তাহা হইলেও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, “অবিজ্ঞাততত্ত্বের্থে” এই কথা না বলিলে সূত্রোক্ত “কারণোপপত্তি” শব্দের যথোক্ত ব্যাখ্যা বুঝা যায় না, এই জন্ত মহর্ষি সূত্রের প্রথমে ঐ অংশ বলিয়াছেন। তাৎপর্যটাকারও এই কথা বলিয়া তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, সহজকার কোন বাক্য বলিলে তাহার একটা প্রয়োজন চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু মনে



রাখিবে, এখানে স্বত্বকারের বাক্যাবলি কোন আশ্রয় ছিল না, তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। “তত্ত্বজ্ঞানার্থঃ” এই অংশের দ্বারা তর্কের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। অজ্ঞাততত্ত্ব পদার্থে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত “উহ”কে “তর্ক” বলিলে প্রমাণও তর্ক হইতে পারে; তাই বলিয়াছেন, “কারণোপপত্তিঃ”। “কারণোপপত্তি”র ব্যাখ্যা পূর্বেই বলা হইয়াছে। “অবিজ্ঞাততত্ত্ব” এইরূপ কথা বলিলে অর্থাৎ ঐ কথার পরে অর্থ শব্দের প্রয়োগ না করিলে “অবিজ্ঞাততত্ত্ব” শব্দের দ্বারা যে ব্যক্তি তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে না, সেই ব্যক্তিকেও বুঝা যাইতে পারে অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের ভ্রম অথবা সংশয় হইতে পারে, তাই উহার পরে অর্থ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থ শব্দের প্রয়োগ থাকায় যে পদার্থের তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, সেই পদার্থকেই ঐ কথার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে। উদ্যোতকর এই সকল কথার দ্বারা এখানে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, স্বত্রে ঐ স্থলে যজ্ঞ বিভক্তির অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, ঐ স্থলে যজ্ঞ বিভক্তির প্রয়োগ হওয়াই উচিত। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্য কণাদের একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ঐবিস্থলে যজ্ঞ বিভক্তির স্থানে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়াছেন।

ভাষ্য। কথং পুনরয়ং তত্ত্বজ্ঞানার্থো ন তত্ত্বজ্ঞানমেবেতি, অনব-  
ধারণাং, অনুজ্ঞানাত্ময়মেকতরং ধর্মং কারণোপপত্ত্যা, ন ত্বধারণয়তি ন  
ব্যবস্রতি ন নিশ্চিনোতি এবমেবেদমিতি। কথং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি,  
তত্ত্বজ্ঞানবিষয়াভ্যনুজ্ঞানক্ষণাদুভাবিতাং প্রসন্নাদনন্তরং প্রমাণস্ত  
সামর্থ্যাং তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যত ইত্যেবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি। সোহয়ং তর্কঃ  
প্রমাণানি প্রতিসন্দধানঃ প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাং প্রমাণসহিতো বাদেহপদিক্ত  
ইতি। অবিজ্ঞাততত্ত্বে ইতি যথা সোহর্থো ভবতি তস্ত তথাভাব-  
স্তত্ত্বমবিপর্যায়ো যাথাতথ্যম্।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ কেন? তত্ত্বজ্ঞানই নয় কেন?  
(উত্তর) যেহেতু অবধারণ করে না। বিশদার্থ এই যে, এই তর্ক প্রমাণের উপপত্তি-  
প্রযুক্ত একতর ধর্মকে অর্থাৎ সন্ধিহুমান ধর্মদ্বয়ের মধ্যে যেটি যুক্ত, যেটি সেখানে  
প্রকৃত তত্ত্ব, তাহাকে অনুজ্ঞা করে। কিন্তু এই পদার্থ এই প্রকারই, এইরূপ  
অবধারণ করে না, ব্যবসায় করে না, নিশ্চয় করে না, অর্থাৎ তর্ক স্বয়ং তত্ত্ব-  
নিশ্চয়স্বরূপ নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্বনিশ্চয়ের সাধনও নহে, প্রমাণের  
দ্বারাই তত্ত্বনিশ্চয় হয়, তর্ক ঐ প্রমাণের সহকারিতা করে।

(প্রশ্ন)। (তর্ক) তত্ত্বজ্ঞানার্থ কিরূপে? অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্বতন্ত্র সাধন  
না হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থই বা হয় কিরূপে? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ের অর্থাৎ



যেটি প্রমাণের বিষয়, প্রকৃত তত্ত্ব তাহার অনুজ্ঞাস্বরূপ ভাবিত অর্থাৎ চিন্তিত, (অতএব) প্রসন্ন অর্থাৎ নির্মূল যে উহ (তর্ক), তাহার অনন্তর অর্থাৎ বিশুদ্ধ তর্কের পরে প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইরূপে (তর্ক) তত্ত্বজ্ঞানার্থ অর্থাৎ প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ প্রমাণের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাতে বিশুদ্ধ তর্ক আবশ্যক হয়, এই জন্যই তর্ককে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা হয়।

সেই এই তর্ক প্রমাণের অনুজ্ঞা করে বলিয়া, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ে প্রবর্তমান প্রমাণের অনুকূলভাবে অবস্থান করে বলিয়া প্রমাণগুলিকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ সংশয়রূপ অন্তরায় নিবৃত্তি করিয়া প্রমাণকে নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, নির্বাপার প্রমাণকে ব্যাপারবৃত্ত করে, এ জন্য বাদসূত্রে প্রমাণ সহিত হইয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ তর্ক প্রমাণের বিশেষ সহায়তা করে, তর্ক ব্যতীত অনেক সময়ে প্রমাণ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মাইতে পারে না, এ জন্য একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশে যে-বাদ বিচার হয়, সেই বাদের লক্ষণে ( ১২।১ সূত্রে ) 'প্রমাণের সহিত মহর্ষি তর্কেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

(সূত্রে) "অবিজ্ঞাততত্ত্বে" এই স্থলে সেই পদার্থটি যে প্রকার হয়, তাহার তথ্যভাব অর্থাৎ তজ্জপতা, তত্ত্ব, অবিপর্ধ্যয়, যাথাতথ্য, অর্থাৎ সূত্রে ঐ স্থলে যে "তত্ত্ব" বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যে পদার্থ যেমন অর্থাৎ যে প্রকার, তাহার তজ্জপতা। অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত ভাবই তাহার তত্ত্ব, তাহাকেই বলে অবিপর্ধ্যয়, তাহাকেই বলে যাথাতথ্য।

টিগনী। মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞান নহে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ এক প্রকার জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ইহাতে প্রশ্ন এই যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানই নয় কেন? তর্ককে তত্ত্বজ্ঞান না বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা হইয়াছে কেন? এতদ্ভিন্ন ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় করে না, তত্ত্বের অনুজ্ঞা করে। "তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় করে না" এই কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে, তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় নহে। ঐ তাৎপর্য্যেই ঐরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অবধারণ, ব্যবসায় এবং নিশ্চয়, এই তিনটি একই পদার্থ। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাব্যকার এখানে তিনটি একার্থবোধক বাক্যের দ্বারা 'তর্ক' তত্ত্বনিশ্চয় হইতে অন্ত্যস্ত ভিন্ন, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাব্যকারের কথা এই যে, তত্ত্বনিশ্চয়কেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। তর্ক যখন তত্ত্বনিশ্চয় নহে, তখন তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। 'এই পদার্থ এই প্রকার হইতে পারে, অত্রপ্রকার হইতে পারে না' এইরূপ অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা জ্ঞানই তর্ক। উহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নহে। 'এই পদার্থ এই প্রকারই' এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তর্ক হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারিত। কিন্তু তর্ক ঐরূপ জ্ঞান নহে। দ্বন্দ্বলক্ষণ, 'সংশয়'ও নহে, 'নিশ্চয়'ও নহে, 'ইহা এইরূপ হইতে পারে, অত্ররূপ' হইতে পারে না' এই প্রকার বিভ্রান্তীয়



জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ভাষ্যকার তাহাকেই বলিয়াছেন—প্রমাণবিষয়ের অভ্যুজ্জা অথবা তত্ত্বের অভ্যুজ্জা। সংশয় ও নিশ্চয় হইতে ভিন্ন অভ্যুজ্জা বা সম্ভাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান উদ্যোতকর সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐরূপ জ্ঞান ভাষ্যকারেরও সম্মত বলিয়া বুঝা যায়, নচেৎ ভাষ্যকারের মতে তর্ক কিরূপ জ্ঞান হইবে? তাৎপর্য্যটীকাকারও এই মতের ব্যাখ্যায় এখানে তর্করূপ জ্ঞানের পূর্কোক্তরূপ আকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

শেষে আবার প্রশ্ন হইয়াছে যে, তর্ক যদি তত্ত্ব নিশ্চয় না জন্মায়, তবে তাহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানার্থই বা বলা যায় কিরূপে? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের বিবরণ সে তত্ত্ব, তাহার অভ্যুজ্জাস্বরূপ। এই তর্ক সূচিস্থিত হইলে বিস্তুত হয়। সেই বিস্তুত তর্কের পরে প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, এই জন্তই তর্ককে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যদিও প্রমাণই তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়, কিন্তু তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। তর্ক কিরূপে সহকারী হয়, তাহা পূর্কোক্তই বলা হইয়াছে। এখানে প্রমাণের সামর্থ্য বলিয়া ভাষ্যকার তর্কের স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই প্রকটিত করিয়াছেন।

ভাষ্যে “উহাদ্ভাবিতাং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—“ভাবিতাচ্ছিত্তিতাং অতএব প্রদর্শনান্নির্মানিতি”। তর্ক সূচিস্থিত হইলে সর্বাদ্ভাসম্পন্ন হয়; সূত্রসাং বিস্তুত হয়। যদি তর্কের প্রতিকূল কোন তর্কান্তর থাকে, তাহা হইলে তর্ক হয় না। ফলকথা, বিস্তুত প্রকৃত তর্কের পরে সংশয় নিরস্ত হওয়ায়ও প্রমাণ নিজ সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। “ভাবিত” এবং “প্রদর্শন”, এই দুইটি বিশেষণবোধক শব্দের দ্বারা যে বিশেষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসামর্থ্যের বিশেষণরূপেই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়া অনেকে বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ভাষ্যকারের সন্দর্ভানুসারে তাহা বুঝা যায় না। সুবীণল ঐ সন্দর্ভে মনোবোগ করিবেন। ভাষ্যে “প্রতিসন্দর্ধানঃ” এই স্থলে হেতুর্থে “শান” প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ তর্ক প্রমাণকে প্রতিসন্দান করে বলিয়াই বাদস্বরে প্রমাণের সহিত কথিত হইয়াছে। প্রমাণকে প্রতিসন্দান করে কেন, এ জন্ত বলিয়াছেন—প্রমাণের অভ্যুজ্জা করে বলিয়া। তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণবিষয়ের অভাববিষয়ে যে সংশয় জন্মে, তর্ক তাহাকে নিরস্ত করিয়া প্রমাণকে প্রতিসন্দান করে অর্থাৎ নিজবিষয়ে প্রেরণ করে, ব্যাপারযুক্ত করে। এখানে প্রমাণের অভ্যুজ্জা বলিতে প্রবর্তমান প্রমাণের অভ্যুজ্জাভাবে থাকা, অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্য করা।

মহাবি গোতম স্তায়াজরূপে তর্কের উল্লেখ করিলেও এই তর্ক সর্বপ্রমাণেরই অভ্যুজ্জাহক অর্থাৎ সহকারী। ভাষ্যকারও প্রথম সূত্রভাবে “প্রমাণানামভ্যুজ্জাহকঃ” এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার প্রত্যক্ষ এবং শব্দপ্রমাণের সহকারী তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসকগণ তর্ককে প্রমাণের ইতিকর্তব্যতা বলিয়াছেন। যাহা কোন কার্য্যে করণ, তাহা কার্য্য সাধন করিতে যাহাকে সহকারিরূপে অপেক্ষা করে, তাহাকে মীমাংসকগণ করণের ইতি-কর্তব্যতা বলিয়াছেন। করণ হইলেই তাহার ইতিকর্তব্যতা আবশ্যক, ইহা-মীমাংসকদিগের সমর্থিত সিদ্ধান্ত। তাৎপর্য্যটীকাকারও প্রমাণের উপপাদ্যিকে ইতিকর্তব্যতা বলিয়াছেন। ফলকথা, তর্ক



কেবল অনুমানপ্রমাণেরই অঙ্গ বা সহকারী নহে, বিচারস্থলে তর্ক সর্বপ্রমাণেরই সহকারী হয় । এই কল্প তাৎপর্যটীকাকার যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই মহাধি গোতমোক্ত নির্ণয় পদার্থ বলিয়াছেন । উদয়নাচার্য্যও আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে তর্ককে সর্বপ্রমাণেরই অন্তর্গাহক বলিয়াছেন । নীমাংসাচার্য্যগণও তর্ককে শব্দপ্রমাণেরও অন্তর্গাহক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ভগবান্ মনুও তর্ককে শব্দপ্রমাণের অন্তর্গাহক বলিয়া গিয়াছেন । তর্ক কেবল অনুমান-প্রমাণেরই সহকারী হয়, অন্ত প্রমাণস্থলে কুত্রাপি তর্ক আবশ্যক হয় না, ইহা কেহই বলেন নাই । তর্কিকরক্ষাকার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, তর্ক প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অন্তর্গাহক\* । এবং এই তর্কনাম্য ‘অন্তর্গাহ’ কি, ইহা বলিতে তিনি অনুমান-প্রমাণের বিষয়ে সংশয়নিবৃত্তিকে তর্কের ‘অন্তর্গাহ’ বলিয়া অন্ত প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিবৃত্তিকেও তর্কের ‘অন্তর্গাহ’ অর্থাৎ তর্কনাম্য ফল বলিয়াছেন । ৪০ ।

ভাষ্য । এতস্মিংস্তর্কবিষয়ে ।

মূত্র । বিদ্যুশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং  
নির্ণয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ । এই তর্কবিষয়ে অর্থাৎ পূর্বোক্ত তর্কস্থলে—সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থার্থ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ “নির্ণয়” ।

ভাষ্য । স্থাপনাসাধনং, প্রতিষেধ উপালভ্যঃ । তৌ সাধনোপালভৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়ো ব্যতিষক্তাবনুবন্ধেন প্রবর্তমানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্য-  
চ্যোতে । তয়োঃ স্ততঃ নিবৃত্তিরেকতঃ স্তাবস্থানমবশ্যং ভাবি, যস্তাবস্থানং  
তস্তাবধারণং নির্ণয়ঃ ।

১। ইতরহপি প্রমাণনুমানচ্ছায়ায়ৈব বিচার্য্যং ভবতীতি তত্র তর্কননুমানাদিত্তিক পুংসু তা  
প্রবর্তত ইতি ।—( আত্মতত্ত্ববিবেক ) ।

২। ধর্ম্মে প্রমীহনাথে হি বেদেন করণাচ্ছনা ।

ইতিকর্তব্যভাভাৎ নীমাংসা পুংস্বিহাতি ।—( ভট্টবার্তিক ) ।

৩। আর্কঃ ধর্ম্মোপদেশক বেদশাস্ত্রাধিরোহিনা ।

বহুবর্কেণানুসন্ধতে স বর্কং বেদ বেত্তব্যঃ ।—( বহুসংহিতা ১২ অঃ, ১০৬ । )

[ এখানে তর্ক পক্ষের অর্থ অনুমান প্রমাণ, ইহা অনেকের মত । কিন্তু ভাষ্যকার বেদান্তিবি পরে তাহা বলেন নাই ]

৪। পক্ষে বিপক্ষলিঙ্গাসা বিচ্ছেদস্তবদুগ্রহঃ ।

উপলক্ষণমেতৎ । প্রমাণবিষয়ে তদ্বিপর্য়্যায়ক্যাবিশটনং তর্কনাম্যোহনুগ্রহ ইত্যর্থঃ ।—

( তর্কিকরক্ষা ) । বিপক্ষলিঙ্গাসা সাধ্যরাহিত্যশব্দেত্যর্থঃ ।—তর্কিকরক্ষার টীকাকার দমিনাথের  
ব্যাখ্যা ।

নেদং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং সম্ভবতীতি, একো হি প্রতিজ্ঞাত-  
মর্থং তং হেতুতঃ স্থাপয়তি দ্বিতীয়স্ত প্রতিষিদ্ধকৌঙ্করতীতি, দ্বিতীয়েন  
স্থাপনাহেতুঃ প্রতিবিধ্যতে, তস্মৈব প্রতিষেধহেতুশ্চোদ্বিগতঃ, স নিবর্ততে,  
তস্ত নিবৃত্তৌ যোহবতিষ্ঠতে তেনার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।

উভাভ্যামেবার্থাবধারণমিত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা? একস্ত সম্ভবো  
দ্বিতীয়স্তাসম্ভবঃ,—তাবেতৌ সম্ভবাসম্ভবৌ বিমর্শঃ সহ নিবর্তয়তঃ,—  
উভয়সম্ভবে উভয়াসম্ভবে বাহনিবৃত্তৌ বিমর্শ ইতি। বিমৃশেতি বিমর্শং  
কুত্বা। সোহয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাববদ্যোত্য ত্রায়ং প্রবর্তয়তীতু্যপা-  
দীয়ত ইতি। এতচ্ বিরুদ্ধয়োরেকধর্মিস্থয়োর্বোদ্ধব্যম্। যত্র তু  
ধর্মিসামান্যগতৌ বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ হেতুতঃ সম্ভবতস্তত্র সমুচ্চয়ঃ, হেতুতো-  
হর্থস্ত তথাভাবোপপত্তেঃ, যথা ক্রিয়াবদ্ভব্যমিতি লক্ষণবচনে যস্ত ভব্যস্ত  
ক্রিয়াযোগো হেতুতঃ সম্ভবতি, তৎ ক্রিয়াবৎ,—যস্ত ন সম্ভবতি তদক্রিয়-  
মিতি। একধর্মিস্থয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োর্ধর্ময়োঃ যুগপদভাবিনোঃ কাল-  
বিকল্পঃ,—যথা তদেব ভব্যং ক্রিয়াযুক্তং ক্রিয়াবৎ, অনুৎপন্নোপরতক্রিয়ং  
পুনরক্রিয়মিতি।

ন চারং নির্ণয়ে নিয়মো বিমৃশ্যৈব পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়  
ইতি। কিন্তুিদ্দিয়ার্থসম্মিকর্ষোৎপন্নপ্রত্যক্ষেহর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি।  
পরীক্ষাবিশয়ে—বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। বাদে  
শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জঃ।

ইতি বাৎস্তায়নীর্যে ত্রায়ভাষ্যে প্রথমাদ্যায়স্ত প্রথমাহিকম্।

অনুবাদ। স্থাপনা অর্থাৎ আত্মপক্ষ সংস্থাপনকে সাধন বলে। প্রতিষেধ  
অর্থাৎ পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনকে উপালম্ব বলে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যাহার  
আশ্রয় অর্থাৎ একাধারে বিবাদের বিষয় দুইটি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা উদ্দেশ্য  
করিয়া যাহা করা হয় (এবং) যাহা ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত (এবং)  
যাহা অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া (প্রকৃতানুবর্তী হইয়া) প্রবর্তমান অর্থাৎ বাহার অবসানে  
একতর পক্ষের নির্ণয় হয়, এমন সেই (পূর্বোক্ত) সাধন ও উপালম্ব (এই নূত্রে)  
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ এই দুই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের



অৰ্থাৎ পূৰ্বেবাক্ত সাধন ও উপালন্ত্ৰেৰ কোন একটিৰ নিবৃত্তি এবং কোন একটিৰ অবস্থান অবশ্যসম্ভাবী, অৰ্থাৎ উপযুক্ত মধ্যস্থেৰ নিকটে বাদী ও প্ৰতিবাদীৰ পৰস্পৰ সাধন ও উপালন্ত্ৰ হইলে সেখানে সাধনেৰ নিবৃত্তি হইয়া উপালন্ত্ৰ থাকিবে অথবা উপালন্ত্ৰেৰ নিবৃত্তি হইয়া সাধনই থাকিবে। তাহাৰ অৰ্থাৎ সাধনেৰই হউক অথবা উপালন্ত্ৰেৰই হউক, অবস্থান হইবে, তাহাৰ অৰ্থাৎ সেই সাধনেৰ অথবা সেই উপালন্ত্ৰেৰ যে অৰ্থ অৰ্থাৎ পক্ষ অথবা প্ৰতিপক্ষৰূপ পদাৰ্থ, তাহাৰ অবধারণ নিৰ্ণয়।

( পূৰ্বপক্ষ ) এই অৰ্থাবধারণ পক্ষ ও প্ৰতিপক্ষৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ পূৰ্বেবাক্ত সাধন ও উপালন্ত্ৰ এই উভয়েৰই দ্বাৰা হয় না। যেহেতু এক ব্যক্তি ( প্ৰথমবাদী ) সেই প্ৰতিজ্ঞাত পদাৰ্থকে অৰ্থাৎ যে পদাৰ্থটি সাধন কৰিতে ঐ বাদী প্ৰতিজ্ঞা বলিয়াছে, সেই পদাৰ্থটি হেতুৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিৰ ( প্ৰতিবাদীৰ ) প্ৰতিষেধকে অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদী বাদীৰ কথিত হেতুৰ যে দোষ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছে, ঐ দোষকে উদ্ধাৰ কৰে, অৰ্থাৎ উহা দোষ হয় নাই, ইহা প্ৰতিপন্ন কৰে। ( পৰে ) দ্বিতীয় ব্যক্তি ( প্ৰতিবাদী ) স্থাপনাৰ হেতুকে অৰ্থাৎ বাদীৰ স্বৰূপ সংস্থাপনেৰ হেতুকে প্ৰতিষেধ কৰে অৰ্থাৎ তাহা ঠিক হেতু হয় নাই, ইহা প্ৰতিপন্ন কৰে এবং তাহাৰই ( বাদীৰই ) প্ৰতিষেধেৰ হেতুকে উদ্ধাৰ কৰে। অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদী পূৰ্বে বাদীৰ কথিত হেতুৰ যে দোষ প্ৰদৰ্শন কৰে, তাহাৰ পৰে বাদী ঐ দোষেৰ যে প্ৰতিষেধ কৰে, সেই প্ৰতিষেধেৰ হেতুকে প্ৰতিবাদীই উদ্ধাৰ কৰে। ( তখন ) তাহা অৰ্থাৎ বাদীৰই হউক আৰু প্ৰতিবাদীৰই হউক, হেতু এবং উপালন্ত্ৰ নিবৃত্ত হয়, তাহাৰ নিবৃত্তি হইলে যাহা অৰ্থাৎ যে একটি মাত্ৰ অবস্থান কৰে, তাহাৰ দ্বাৰাই অৰ্থাবধারণৰূপ নিৰ্ণয় হয় [ অৰ্থাৎ বাদী ও প্ৰতিবাদীৰ বিচাৰে যখন মধ্যস্থেৰ নিৰ্ণয় হয়, তখন বাদী বা প্ৰতিবাদীৰ সাধন ও উপালন্ত্ৰ দুইটিই থাকে না। উহাৰ একটি নিবৃত্ত হয়, একটি থাকে এবং যেটি থাকে, তাহাৰ দ্বাৰাই সেখানে নিৰ্ণয় হয়, তথাপি মহৰি সাধন ও উপালন্ত্ৰ, এই উভয়েকেই নিৰ্ণয়সাধন বলিয়াছেন কেন ? ]

( উত্তৰ ) উভয়েৰ দ্বাৰাই অৰ্থাবধারণ হয়, এই জ্ঞত বলিয়াছেন। ( প্ৰশ্ন ) কোন যুক্তিবশতঃ ? অৰ্থাৎ সাধন ও উপালন্ত্ৰ, এই দুইটিই যে নিৰ্ণয়েৰ সাধন, তাহাৰ যুক্তি কি ? ( উত্তৰ ) একটিৰ সম্ভব, দ্বিতীয়টিৰ অসম্ভব, অৰ্থাৎ বাদীৰ সাধনেৰ সম্ভব, প্ৰতিবাদীৰ উপালন্ত্ৰেৰ অসম্ভব এবং প্ৰতিবাদীৰ সাধনেৰ সম্ভব, বাদীৰ উপালন্ত্ৰেৰ অসম্ভব, সেই অৰ্থাৎ উক্ত প্ৰকাৰ এই সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়া সংশয়কে নিবৃত্ত কৰে। উভয়েৰ সম্ভব হইলে অথবা উভয়েৰ অসম্ভব হইলে

অর্থাৎ যদি পূর্বোক্ত সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত না হয়, কেবল সাধন ও উপালন্তের সম্ভবই হয়, অথবা ঐ উভয়ের অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে সংশয় নিবৃত্ত হয় না। (সূত্রে) “বিমূঢ়া” এই কথার অর্থ সংশয় করিয়া। সেই এই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ এক পদার্থে বিভিন্নবাদের স্বীকৃত দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে নিয়ত বিষয় করিয়া ত্যায়কে (পরার্থানুমানকে) প্রবৃত্ত করে অর্থাৎ উত্থাপিত করে; এ অণ্ড অর্থাৎ সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে ত্যায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া (এই সূত্রে) গৃহীত হইয়াছে।

ইহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংশয়-জ্ঞান কিন্তু একধর্মগত বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কোন একই বিশেষ ধর্ম্মাতে যেখানে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞান হয়, তাহাই সংশয়। যেখানে কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় সামান্য ধর্ম্মগত হইয়া প্রমাণের দ্বারা সম্ভব (উপপন্ন) হয়, সেখানে ‘সমুচ্চয়’ হয় অর্থাৎ সামান্য ধর্ম্মাতে ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞান হইলে, সে জ্ঞান সংশয় নহে, তাহা ‘সমুচ্চয়’ নামক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। কারণ, (সেখানে) প্রমাণের দ্বারা পদার্থের (সামান্যধর্ম্মার) তথ্যভাবে (তদ্রূপতার) অর্থাৎ জায়মান সেই ধর্ম্মদ্বয়যুক্ততার উপপত্তি হয়। যেমন ‘ক্রিয়াযুক্ত পদার্থ দ্রব্য’ এই লক্ষণবাক্যে (কণাদোক্ত দ্রব্যলক্ষণে) যে দ্রব্যের ক্রিয়াযোগ প্রমাণের দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা ক্রিয়াযুক্ত, যে দ্রব্যের সম্ভব হয় না, তাহা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে সক্রিয় দ্রব্যও আছে, নিষ্ক্রিয় দ্রব্যও আছে; সামান্যতঃ দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এইরূপ জ্ঞান সংশয় নহে, উহা ঐ স্থলে সমুচ্চয় জ্ঞান এবং যথার্থ জ্ঞান।

এবং একধর্ম্মগত বিভিন্ন কালভাবী বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের কালবিকল্প হয় অর্থাৎ কালবিশেষ বিষয় করিয়া সেখানে ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের যথার্থ নিশ্চয়ই হয়, সেখানেও ঐ জ্ঞান সংশয় নহে। যেমন সেই দ্রব্যই ক্রিয়াযুক্ত হইয়া সক্রিয় অর্থাৎ যখন তাহাতে ক্রিয়া জন্মিয়াছে, তখন সক্রিয় এবং অনুৎপন্নক্রিয় অথবা বিনষ্টক্রিয় হইলে অর্থাৎ যখন সেই দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মে নাই অথবা ক্রিয়া জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, তখন সেই দ্রব্যই আবার নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ কালভেদে এক দ্রব্যও সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে, উহা কালভেদে বিরুদ্ধ হয় না, সুতরাং কালভেদ বিষয় করিয়া ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের একই ধর্ম্মাতে জ্ঞান হইলেও তাহা সংশয় নহে।

সংশয় করিয়াই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্তের দ্বারা অর্থবধারণ নির্ণয়; ইহাও নির্ণয় মাত্র নিয়ম নহে অর্থাৎ উহাই নির্ণয়মাত্রের



লক্ষণ নহে। কিন্তু ইঙ্গিতের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষ বশতঃ উৎপন্ন প্রত্যকে অর্থের অবধারণ নির্ণয়, অর্থাৎ প্রত্যক স্থলে “অর্থাবধারণ” এই মাত্রই নির্ণয়ের লক্ষণ। পরীক্ষাবিষয়ে অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকটে স্ব স্ব পক্ষ স্থাপনাদি করিয়া বস্তু বিচার করেন, তাদৃশ পরার্থানুমান স্থলে সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়।

বাদবিচারে অর্থাৎ কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, বাহাতে মধ্যস্থ নাই, সেই বাদ নামক কথাতে এবং শাস্ত্রে অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা কর্তব্য তত্ত্বনির্ণয় স্থলে সংশয় বর্জন করিয়া অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ সেখানে বস্তুতঃ কাহারও সংশয়পূর্বক নির্ণয় হয় না।

বাংস্ভায়ন-প্রণীত ত্যাগভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্গিক সমাপ্ত।

বিবৃতি। প্রমাণের দ্বারা বস্তু নিশ্চয়কেই নির্ণয় বলে; তাহা প্রত্যক প্রমাণের দ্বারাও হয়, শাস্ত্রের দ্বারাও হয়, আবার নিজে নিজে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও হয়, আবার দ্বিজ্ঞাত ইহা গুরু প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত বিচার করিয়াও হয়, নীরবে গুরু প্রভৃতির কথা শুনিয়াও হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া আর এক প্রকার নির্ণয় আছে, তাহা উভয় পক্ষের বিচার শুনিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের হয়। যেখানে একই পদার্থে দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ আইরা বাদী ও প্রতিবাদী দুইটি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন, সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিরা সংশয় করেন। তাহার পরে ঐ বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সংস্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন শুনিয়া একতর পক্ষের নির্ণয় করেন। মধ্যস্থ ব্যক্তি-নির্ণয়ের একতর পক্ষের নির্ণয় হইলে তাহারাই সেই পক্ষেরই অনুমোদন করেন, সেই পক্ষের বিরুদ্ধবাদী নিরস্ত হন। মধ্যস্থের সংশয় দূর করিতে না পারিলে মধ্যস্থ একতর পক্ষের অনুমোদন করিতে পারেন না, সুতরাং মধ্যস্থের নির্ণয় সম্পাদনের জন্ত বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিবেন। যেখানে ঐ স্থাপন ও খণ্ডন বর্ণনাবিধি বর্ণনাজ্ঞ চলিবে, সেখানে অবশ্যই উহার একটির নিবৃতি এবং অপরটির স্থিতি হইবে। কারণ, দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ একই পদার্থে কখনও প্রমাণগিষ্ঠ হইতে পারিবে না।

আত্মা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ইহা কখনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আত্মার নিত্যত্ববাদী ও অনিত্যত্ববাদী প্রকৃত মধ্যস্থের নিকটে পঞ্চাষদ্বয় দ্বারা প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিতে থাকিলে সেখানে একটি পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইবে। মধ্যস্থ তাহার নির্ণয় করিবেন। উভয়বাদীর সম্মানিত স্বীকৃত মধ্যস্থ যে পক্ষের নির্ণয় করিবেন, তাহাই সেখানে সিদ্ধান্ত হইবে। বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের নিশ্চয় করিয়াই বিচার করে, তাহাদিগের কোন সংশয় থাকে না। এইরূপ স্থলে মধ্যস্থেরই সংশয় হয়, মধ্যস্থেরই নির্ণয় হয়। মধ্যস্থ না থাকিলে এ নির্ণয়টি হইতে পারে না। কারণ, ফল জন বাদী স্বজ্ঞার নিজের পক্ষ

ভাগ করেন, নিজের ভ্রম স্বীকার করেন? মধ্যস্থের এইরূপ নির্ণয়ে রাজা এবং অজ্ঞাত সভাগণেরও ঐরূপ নির্ণয় হইয়া যায়। এই নির্ণয় জ্ঞান-বিদ্যার একটি মুখ্য ফল। ইহা জ্ঞানবিদ্যাগাধ্য। ইহার মূল মধ্যস্থগণের সংশয়। ঐ সংশয়ই বাদী ও প্রতিবাদীর পরার্থানুমান-প্রবৃত্তির মূল। সন্দেহ পদার্থেই জ্ঞানপ্রবৃত্তি হয় এবং তাহার ফল এই নির্ণয়। ইহাতে প্রশ্নের সাহায্যের জন্ত তর্ক আবশ্যক হয়। তাই জ্ঞানবিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি গৌতম তর্কের পরেই এই নির্ণয়ের উল্লেখ ও স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ইহা নির্ণয়মাত্রের লক্ষণ নহে।

টিকনো। নির্ণয় অনেক প্রকারেই হয়, কিন্তু সকল নির্ণয় তর্কপূর্বক নহে। তর্কবিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি গৌতম তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। এই নির্ণয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞান প্রয়োগ আবশ্যক হয়, মধ্যস্থের সংশয় দূর করিতে তর্কের উদ্ভাবন করিতে হয়; এ জ্ঞান মহর্ষি পঞ্চাবয়ব এবং তর্ক নিরূপণ করিয়া তাহার ফল নির্ণয় নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাবধারণই নির্ণয় মাত্রের সামান্য লক্ষণ। সংশয়পূর্বক পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা যে অর্থাবধারণ, তাহা নির্ণয়বিশেষের লক্ষণ।

একাধারে বিবাদের বিষয় দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মই এই শব্দে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রকৃত অর্থ। মহর্ষি গৌতম বাদসূত্রে এই অর্থেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে ভাব্যকারও মহর্ষি-সূত্রোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের ঐরূপ প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের ঐ অর্থ উপপর হয় না। কারণ, এই সূত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ বলা হইয়াছে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে যখন বিবাদবিষয় দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম, তখন তাহার দ্বারা অবধারণ বলা যায় না; ঐ দুইটি ধর্মেরই একটির অবধারণ হইবে, তাহার দ্বারা অবধারণ হইবে না। বাহ্য অবধারণীয়, বাহ্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, তাহার দ্বারা কি তাহাকে বুঝিয়া লওয়া যায়? অবধারণ করা যায়? তাহা কখনই যায় না। এ জ্ঞান ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে মহর্ষি যে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দ বলিয়াছেন, উহার দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সাধন ও উপালম্ব বুঝিতে হইবে। মহর্ষি এখানে ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধন বলিতে সংস্থাপন, উপালম্ব বলিতে তাহার ধ্বংস। একজন স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে অপর ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদী তাহার ধ্বংস করেন। এই সাধন ও উপালম্ব শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। পরে অনেক স্থলে এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ হইবে। সর্বত্র উহার অর্থ প্রকাশ করা হইবে না। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের মুখ্য অর্থও মনে রাখিতে হইবে। মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধ বিশেষকেই লক্ষণা বলে। মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গার অতি নিকটে বাস করিলে “তিনি গঙ্গাবাস করিতেছেন”, এইরূপ কথা বলা হইয়া থাকে। এখানে গঙ্গা শব্দের মুখ্য অর্থ সেই জল-বিশেষ না বুঝিয়া তাহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধযুক্ত গঙ্গাতীরকেই “গঙ্গা” শব্দের দ্বারা বুঝা হয়। ঐ সম্বন্ধবিশেষই ঐ স্থলে লক্ষণা। ঐ সম্বন্ধরূপ লক্ষণাজ্ঞানবশতঃ ঐ স্থলে ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝা যায়। অনেক স্থলে কোন প্রয়োজনবশতঃই লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ হইয়া



আসিতেছে। এখানে এই স্বত্রে লাক্ষণিক পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ কেন করা হইয়াছে এবং উহার মুখ্যার্থের সহিত পূর্বোক্ত লাক্ষণিক অর্থের সম্বন্ধই বা কি? এই প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। এ জ্ঞাত ভাষ্যকার এখানে ঐ সাধন ও উপালন্তরূপ লাক্ষণিক অর্থকে বলিয়াছেন “পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়” অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বাহার আশ্রয়। পক্ষকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সাধন করিতে হয় এবং প্রতিপক্ষ পদার্থটির উপালন্ত না করিলেও অর্থাৎ তাহা অসম্ভব হইলেও ঐ প্রতিপক্ষ পদার্থকে উদ্বেষ্ট করিয়া তাহার সাধনের (সংস্থাপনের) উপালন্ত (খণ্ডন) করা হয়, এ জ্ঞাত সাধন ও উপালন্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের আশ্রিত। তাহা হইলে সাধন ও উপালন্তের সহিত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পদার্থের ঐরূপ সম্বন্ধ (আশ্রয়াশ্রয়িতাব) থাকায় ঐ সাধন ও উপালন্ত অর্থে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইতে পারে। ফলকথা, মহর্ষি পক্ষ ও প্রতিপক্ষের আশ্রিত সাধন ও উপালন্তকেই এই স্বত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সাধন ও উপালন্তের দ্বারা অর্থবিধারণ হইয়া থাকে, সুতরাং মহর্ষির ঐ কথা অব্যোধ্য হয় নাই। মহর্ষি এই স্বত্রে সাধন ও উপালন্ত শব্দের প্রয়োগ করিলেই তাহার স্বত্র স্পষ্টার্থ হইত। তিনি তাহা না করিয়া এবং মুখ্য শব্দ পরিভাগ করিয়া লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার ইহার উত্তর সূচনার জন্ত আবার বলিয়াছেন,—“ব্যতিবক্তো”। ব্যতিবক্ত বলিতে এখানে পরস্পর মিলিত অথবা উভয় পক্ষে লক্ষ্যযুক্ত (বাদ-স্বত্বভাব্য দ্বৈতব্য)। তাৎপর্য্য এই যে, সাধন ও উপালন্ত বলিলে উহা যে উভয় পক্ষেই লক্ষ্যযুক্ত হওয়া চাই, ইহা বুঝা যায় না। এ জ্ঞাত মহর্ষি এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা ঐরূপ সাধন ও উপালন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পক্ষেও সাধন এবং উপালন্ত থাকিবে এবং প্রতিপক্ষেও সাধন এবং উপালন্ত থাকিবে। পক্ষে বাদীর সাধন, প্রতিবাদীর উপালন্ত, প্রতিপক্ষে প্রতিবাদীর সাধন, বাদীর উপালন্ত—এইরূপ হইলে, সেই সাধন ও উপালন্তকে “ব্যতিবক্ত” বলা যায়। এইরূপ না হইলে তাহা ঐ স্থলে অর্থবিধারণের সাধনও হয় না। তাই মহর্ষি এইরূপ সাধন ও উপালন্তকে প্রকাশ করিবার জন্তই এই স্বত্রে লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্বত্রে “অবধারণ” না বলিয়া “অর্থবিধারণ” বলিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইলেই স্ত্রারের দ্বারা বস্ত পরীক্ষা স্থলে নির্ণয় হইবে না। যে অর্থ লইয়া অর্থাৎ যে বস্ত লইয়া বিচার, তাহারই অবধারণ হওয়া আবশ্যক। বিচারমাত্রই যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইয়াই থাকে। প্রকৃতার্থের অবধারণ না হইলে তাহা সেখানে নির্ণয় হইবে না। বিচার্য্য বিষয়ে সাধন ও উপালন্ত হইতে থাকিলে যেখানে ঐ সাধন ও উপালন্তের একতরের নিবৃত্তি এবং একতরের স্থিতি অবশ্যই হইবে, সেখানেই একতর পক্ষের নির্ণয় হইবে। সাধন ও উপালন্তের ঐরূপ অবস্থাই তাহানিগের পরস্পর অনুবন্ধ বলা হইয়াছে। “অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রবর্তমান” এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার শেষে পূর্বোক্ত প্রকার পরস্পর অনুবন্ধবিশিষ্ট সাধন ও উপালন্তকেই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি স্বত্রে “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াই উহা সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ



যে সাধন ও উপালন্তের চরম ফল একতর নির্ণয়, তাহাই এখানে বুঝিতে হইবে। তাহাকেই বলে অত্বকবৃত্ত সাধন ও উপালন্ত। তাৎপর্যটীকাকারও এখানে পূর্বোক্ত প্রকার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্রকার সাধন ও উপালন্তের একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি অবশ্যই হইবে। কারণ, একই পদার্থে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম কখনই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। যেখানে সাধনের স্থিতি হয়, সেখানে সেই সাধনের যেটি অর্থ, অর্থাৎ যে পদার্থকে (পক্ষ বা প্রতিপক্ষ) অশ্রয় করিয়া ঐ সাধন করা হইয়াছে, তাহারই অবধারণ হয়। যেখানে উপালন্তের স্থিতি হয় অর্থাৎ উপালন্তের পরে বিরুদ্ধবাদী আর কিছু না বলিতে পারে, তাহার খণ্ডন করিতে না পারে, সেখানে ঐ উপালন্তের যেটি অর্থ অর্থাৎ যে পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতিবাদী বাদীর সাধনের খণ্ডন করিয়াছেন, সেই পদার্থটিরই অবধারণ হইবে। এইরূপ অবধারণই পরীক্ষাত্বলো নির্ণয়। সংশয়ের পরে মধ্যস্থ ব্যক্তিরই এই নির্ণয় হইয়া থাকে। ভাষ্যোক্ত পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্তের যখন একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি হইবে, নির্ণয়ের পূর্বে দুইটিই থাকিবে না, এ কথা ইহার পূর্বেও বলা হইয়াছে, তখন সাধন ও উপালন্ত, এই দুইটিকেই অর্থাবধারণের সাধন বলা যায় কিরূপে? পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্ত মিলিত হইয়া ত নির্ণয়ের সাধন হয় না, উহার মধ্যে যেটির স্থিতি হয়, সেইটির দ্বারা নির্ণয় হয়। উত্তর-পক্ষের তাৎপর্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপালন্তের ফলে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। ঐ সাধন ও উপালন্ত, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইলে সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না এবং ঐ উভয়ের স্থিতি হইলেও সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না। যদি বাদীর সাধনের সম্ভব এবং প্রতিবাদীর উপালন্তের অসম্ভব হয়, অথবা প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব এবং বাদীর উপালন্তের অসম্ভব হয়, তবে সেখানেই মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ যদি বাদীর সাধনকে প্রতিবাদী খণ্ডন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন, অথবা প্রতিবাদীর সাধনকে বাদী খণ্ডন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন, তবেই সেখানে এক পক্ষের অবধারণ হয়, সংশয় নিবৃত্ত হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপালন্তের নিবৃত্তি হইল না, অথবা সাধন ও উপালন্ত, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইয়া গেল, কোন বাদীই স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না, উভয়েই নিবৃত্ত হইয়া গেলেন, সেখানে সংশয় নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সেখানে নির্ণয় হয় না। তাহা হইলে বুঝা গেল, পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্তের সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই নির্ণয়ের সাধন করে; সুতরাং সাধন ও উপালন্ত এই উভয়ই নির্ণয়ের সাধন। ঐ উভয়ের মধ্যে একের সম্ভব ও অপরটির অসম্ভব যখন নির্ণয়ে আবশ্যক, তখন ঐ উভয়কেই নির্ণয়ের সাধন বলিতে হইবে।

সূত্রে যে "বিমুক্ত" এই কথাটি আছে, উহার অর্থ সংশয় করিয়া। মহর্ষি গোতম "বিমুক্ত"-কেই সংশয় বলিয়াছেন। এই সূত্রে ঐ কথার প্রয়োজন কি? এতদ্বত্তে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয় পূর্বোক্ত স্থলে জ্ঞাপ্রবৃত্তির মূল। যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম লইয়া বাদী ও প্রতিবাদীর জ্ঞাপ্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডন হয়, সেই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে নিয়ত বিষয় করিয়া মধ্যস্থের সেখানে সংশয় হইয়া থাকে। ঐ সংশয়ই সেখানে



বাদী ও প্রতিবাদীর জ্ঞানপ্রবৃত্তির মূল। সুতরাং ঐরূপ স্থলে সংশয়পূর্বকই নির্ণয় হইয়া থাকে। এ জন্ত এইরূপ নির্ণয়ে মহর্ষি সংশয়ের কথা বলিয়াছেন। ভাব্যে “পক্ষপ্রতিপক্ষৌ অবদ্যোতা” এইরূপ সন্ধিবিক্ষেদ করিয়া বাক্যার্থ বৃদ্ধিতে হইবে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দ এখানে মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত। “অবদ্যোতা” এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন,— “নিরমেন বিবরীকৃত্য”। ভাব্যকার পূর্বে যে বিকল্প বর্ষদ্বয় বিষয়ে সংশয়ের কথা বলিয়াছেন, ঐ সংশয় একই সময়ে একই ধর্ম্মাভে বিকল্প বর্ষদ্বয়ের সম্বন্ধে বৃদ্ধিতে হইবে। তাই ভাব্যকার শেষে তাহাই বলিয়াছেন। ভাব্যকারের সেই কথার তাৎপর্য এই যে, বেদ্যানে কোন প্রকারে দুইটি বিকল্প ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে, সেখানে তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মে না। তজ্জন্ত কোন বাদী ও প্রতিবাদীর “জ্ঞানপ্রবৃত্তি” হয় না। যেমন মহর্ষি কণাদ “ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য-লক্ষণং” (বৈশেষিক-দর্শন, ১৫শৃঙ্গ) এই শব্দে দ্রব্যের প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন ক্রিয়া। কিন্তু দ্রব্যনাত্মেরই ক্রিয়া নাই। আত্মা প্রকৃতি দ্রব্য নিজের বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ। তাহা হইলেও “দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়” এইরূপ জ্ঞান সংশয় হইবে না। কারণ, দ্রব্যাক্রমে দ্রব্য সামান্তধর্ম্মী। তাহার মধ্যে দ্রব্যবিশেষ সক্রিয় এবং দ্রব্যবিশেষ নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বিকল্প ধর্ম্ম হইলেও ধর্ম্মীর ভেদে উহা বিকল্প নহে। একই দ্রব্য ধর্ম্মাভে যদি সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুইটি বিকল্প বর্ষের একটি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান সংশয় হইবে। যখন কোন দ্রব্যো সক্রিয় ও এবং কোন দ্রব্যো নিষ্ক্রিয় প্রমাণসিদ্ধ, তখন সামান্ততঃ দ্রব্যধর্ম্মাভে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়ের উল্লেখ করিলে তাহা সংশয় জন্মাইবে না। ঐ স্থলে দ্রব্যধর্ম্মাভে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহাকে বলে সমুচ্চর-জ্ঞান। অর্থাৎ দ্রব্য সক্রিয়ও বটে, নিষ্ক্রিয়ও বটে, কোন দ্রব্য সক্রিয়, কোন দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। এইরূপে বিভিন্ন দ্রব্যধর্ম্মাভে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়রূপ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়। জ্ঞানচাৰ্য্যগণ এইরূপ জ্ঞানকে সমুচ্চরজন জ্ঞান বলিয়াছেন। ভাব্যকার “সমুচ্চর” শব্দের দ্বারা এই সমুচ্চরজন জ্ঞানকেই প্রকাশ করিয়াছেন। সমুচ্চরজন জ্ঞান বুঝাইতে সমুচ্চর শব্দের প্রয়োগ<sup>১</sup> নব্য নৈয়ায়িকগণ করিয়াছেন। সংশয় জ্ঞানে একই ধর্ম্মাভে দুইটি বিকল্প ধর্ম্ম বিষয় হয়, অর্থাৎ “সংশয়” জ্ঞানে যে পদার্থ বিশেষ্য হইবে, তাহাতে একটমাত্র বিশেষ্যতা থাকিবে। আর বিশেষণ যে কয়েকটি হইবে, তাহাতে সেই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা থাকিবে। “সমুচ্চর” জ্ঞানে যে কয়েকটি বিশেষণ হয়, সেই কয়েকটি বিশেষ তা হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানে বিশেষণতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বিশেষ্যতাও তজ্জপ ভিন্ন ভিন্ন। সমুচ্চর ও সংশয় জ্ঞানের অন্তর্য এই তেদ সর্বত্র থাকিবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করনা করিয়াছেন।

ভাব্যকার এখানে যে সমুচ্চর জ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর ও

১। সংশয়বিশেষ্যতানাত্মক প্রকারভাবনিরূপিতবাবেদক “নির্লজ্জির্লজ্জিহ্বাশ্চ পক্ষত” ইত্যাদি-সমুচ্চরজ্ঞান সামান্যিকরবসম্বন্ধে তৎসম্বন্ধেপি ন বহুহুমিতিঃ, সমুচ্চরজ্ঞানে প্রকারভাবনিরূপিত-বিশেষ্যতা-স্বরূপপদার্থ ইত্যাদি।—পক্ষভাষিতরে ভাষ্যদীপ্তি।



বাস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐ সকল কথাই কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। “ক্রিয়াবদ্ভব্যমিতি লক্ষণ-বচনে” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার পূর্বোক্ত কথার-সুত্রটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, নহে হয়। কথার ক্রিয়াকে ভব্যমাত্রেয় লক্ষণ বলেন নাই। আত্মা প্রভৃতি ভব্যে গমনানি ক্রিয়া নাই। বাহ্যতে ক্রিয়া জন্মে, তাহা ভব্য পদার্থই হইবে; ভব্য ভিন্ন পদার্থে ক্রিয়া থাকে না, ইহাই কথাদের তাৎপৰ্য্য। প্রাচীনগণ কথার-সুত্রের ঐ অংশের এইরূপই তাৎপৰ্য্য বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং কথাদের ঐ ভব্যবিশেষের লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা বান্ধিতঃ ভব্যমাত্রে ক্রিয়া আছে কি না, এইরূপ সংশয় হয় না। কারণ, কোন ভব্যে ক্রিয়া আছে, কোন ভব্যে ক্রিয়া নাই, ইহা বুঝিলে কথাদের ঐ কথা সংশয় জন্মায় না। কেহ যেন ঐ লক্ষণ-বাক্য শুনিয়া এইরূপ সংশয় না করেন, ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার ঐ কথার অবতারণা করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। আবার কালভেদে একই ভব্যে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে। গাড়ী যখন চলিতেছে, তখন গাড়ী সক্রিয়, যখন ঠাঁড়াইয়া আছে, তখন নিষ্ক্রিয়; ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং নাশও হয়; সুতরাং একই ভব্যকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বলিলে, ঐ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সেই ভব্যে কালভেদে বুঝিতে হইবে। কালভেদে এক ভব্যেও উহা বিরুদ্ধ বর্ণ্য নহে। ফলকথা, ভব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়, এইরূপ কথা বলিলে ঐ বাক্যের দ্বারা বোদ্ধা ব্যক্তির সংশয় জন্মে না। সেখানে উহা লইয়া কোন বাদী ও প্রতিবাদীর স্তায়প্রবৃতি হয় না।

সুত্রকারোক্ত এই নির্ণয়-লক্ষণ নির্ণয় মাত্রেয় লক্ষণ নহে। স্তায়ের দ্বারা বস্তুর পরীক্ষা হলে মধ্যস্থের যে নির্ণয়বিশেষ জন্মে, মহর্ষি এই স্তায়ের দ্বারা সেই স্তায়ের ফল নির্ণয়েরই লক্ষণ বলিয়াছেন। অস্তিত্ব কেবল অর্থাবধারণই নির্ণয়ের লক্ষণ; এ কথা ভাষ্যকারও শেবে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাৎপৰ্য্যটীকাকার কিন্তু প্রথম সুত্র-ভাষ্যে নির্ণয় ব্যখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক নির্ণয় হইলে বস্তুতঃ তাহাও নির্ণয় হইবে অর্থাৎ তিনি সেখানে তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই মহর্ষি গোতমের নির্ণয় পদার্থ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে এবং শাস্ত্রে সংশয় পূর্বক নির্ণয় হয় না। বাদবিচারে মধ্যস্থ আবশ্যক নাই; সুতরাং সেখানে কাহারও সংশয়, স্তায়প্রবৃতি জন্মায় না। বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষে নিশ্চয় রাখিয়াই বিচার করে। বাদী ও প্রতিবাদীর সংশয় জন্ম কোন স্থানেই স্তায়প্রবৃতি হয় না; সুতরাং বাদবিচারে যে নির্ণয় হয়, তাহা সংশয়পূর্বক নহে। অর্থাৎ স্তায়ে যে “বিমুক্ত” এই কথাটি আছে, উহা বাদবিচার ভিন্ন বিচারান্তিমুখেই বলা হইয়াছে।

বাদবিচার-স্থলীয় নির্ণয়ের লক্ষণ বুঝিতে স্তায়ের “বিমুক্ত” এই কথাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণয়ও সংশয় পূর্বক নহে। অশ্বমেষ যাগ করিলে স্বর্গ হয়, ইহা বেদের দ্বারা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু ঐ নির্ণয়ের পূর্বে ঐ বিষয়ে অজ্ঞতা থাকিলেও সংশয় থাকে না। সুতরাং ঐ নির্ণয় সংশয়পূর্বক নহে। এ বিষয়ে অজ্ঞাত কথা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে স্তম্ভঃ ৪১।

স্তায়সূত্রকার মহানুভি গোতমের স্তায়সূত্রের প্রথম হইতে ৪১টি সূত্র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আদিক নামে সম্প্রদায়ক্রমে প্রসিদ্ধ আছে। অনেকে বলেন, মহর্ষি গোতম তাহার শিষ্যদিগকে



যে সূত্রগুলি এক দিনে বলিয়াছিলেন, সেই সূত্রগুলিই স্মারসূত্রের আঙ্কি নামে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি দশ দিনে দশ স্মারসূত্র বলিয়াছিলেন। এই জন্ত স্মারসূত্রে দশটি আঙ্কি আছে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই “আঙ্কি” শব্দের পূর্বোক্ত প্রকার অর্ণের ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার উহার অন্তরূপ কোন ব্যাখ্যাও করেন নাই। তবে এক দিবসে নিম্পন্ন, এইরূপ অর্থেও আঙ্কি’ শব্দটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কণাদসূত্র এবং পাণিনি-সূত্রেরও এইরূপ তিন ভিন্ন ভিন্ন অংশ আঙ্কি নামে প্রসিদ্ধ আছে। সূত্রগ্রন্থের কোন কোন ভাষ্যেরও সূত্রানুসারে আঙ্কি দেখা যায়। পাণিনিসূত্রের আঙ্কি অনুসারেই মহাভাষ্যের আঙ্কি প্রসিদ্ধ আছে। স্মারসূত্র-ভাষ্যকার বাণভারনও স্মারসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের ভাষ্য করিয়া “স্মারভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কি সমাপ্ত” এই কথা বলিয়া তাহার ভাষ্যের প্রথম আঙ্কিকের সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে স্মারসূত্রেরও প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের এখানেই সমাপ্তি, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে।

ভাষ্য । তিস্রঃ কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি তাসাং

সূত্র । প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ  
পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥১।৪২॥

অনুবাদ । কথা অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসন্দর্ভ ত্রিবিধ হয় ;—(১) বাদ, (২) জল্প এবং (৩) বিতণ্ডা ।

সেই ত্রিবিধ কথার মধ্যে যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব অর্থাৎ স্বপক্ষ সংস্থাপন এবং পরপক্ষ সংস্থাপনের যত্ন হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং যাহাতে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পূর্বোক্ত পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হয়, এমন যে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাতে একই পদার্থে পক্ষস্পার-বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের মধ্যে বাদী একটিকে এবং প্রতিবাদী অপরটিকে নিয়ম করিয়া স্বীকার করেন, এইরূপ যে বাক্যসন্দর্ভ, তাহা ‘বাদ’ ।

বিত্তি । বাদী ও প্রতিবাদীর যথারীতি পরস্পর বাদ-প্রতিবাদরূপ বিচার দুই উদ্দেশ্যে হইতে পারে। একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অথবা জয়লাভের উদ্দেশ্যে। তাহার মধ্যে যে বিচার কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই হয়, তাহার নাম “বাদ” এবং যে বিচার জয়লাভের

১। তেন নির্কৃৎ ।—পাণিনিসূত্র, ৪।১।১৩।

অথা নির্কৃৎ বাদিকং ।—সিদ্ধান্তকোষী ।

উদ্দেশ্যে হয়, তাহার নাম “জন্ম” ও “বিতণ্ডা।” তন্মধ্যে বিতণ্ডার বিতণ্ডাকারী আত্মপক্ষ সংস্থাপন করেন না, কেবল পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন; জন্ম হইতে বিতণ্ডার ইহাই নাত্র বিশেষ। গুরু প্রভৃতির সহিত কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাদবিচার হয়, সুতরাং তাহাতে জিগীষার গন্ধও নাই, মধ্যস্থেরও আবশ্যকতা নাই। জিগীষুর বিচার জন্ম বা বিতণ্ডা, তাহাতে মধ্যস্থ আবশ্যক। মধ্যস্থই সেখানে জয় ও পরাজয়ের ঘোষণা করেন। জন্ম ও বিতণ্ডার বিচারকদ্বয় ছিল প্রভৃতি অসহজতরও করিতে পারেন এবং সর্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উল্লেখ করিতে পারেন। কারণ, যে কোনরূপে যে কোন দিক্ দিয়া বিপক্ষকে পরাস্ত করাই সেখানে বিচারকদ্বয়ের উদ্দেশ্য থাকে। বাদবিচারে তাহা উদ্দেশ্য নহে; তাহার উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়, সুতরাং তাহাতে ‘ছল’ প্রভৃতি অসহজতর করা হয় না এবং করা যায় না। এক অর্থে প্রযুক্ত বাক্যের অল্প অর্থ কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করাকে ছল বলে। বাদী নূতন কথল অর্থে “নব কথল” শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন,—“নয়থানা কথল কোথায়, তাহা ত নাই,” এরূপ অসহজতর ‘ছল’। এই ছল তিন প্রকার। অল্প প্রকারে আরও অনেক অসহজতর আছে; সেগুলির নাম ‘জাতি’; তাহা চতুর্বিংশতি প্রকার। যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর অজ্ঞতা বা ভ্রম প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যাহা যে কোনরূপে যে কোন অংশে বাদী বা প্রতিবাদীর পরাজয় সূচনা করে, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে; এই নিগ্রহস্থান ষাণ্ণবিংশতি প্রকার। ইহার মধ্যে হেত্বাভাস একপ্রকার নিগ্রহস্থান। বাদী বা প্রতিবাদী যদি কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত স্থলে হেতু হয় না, তাহার দ্বারা অনুমান করেন, তাহা হইলে তাহার বিপক্ষ বিচারক তাহা উল্লেখ করিবেন;—এ হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা বুঝাইয়া দিবেন। বাদবিচারেও ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, সেখানে তত্ত্ব নির্ণয় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাহা তত্ত্ব নির্ণয়ের অন্তর্কূল এবং যাহা উপেক্ষা করিলে সেখানে তত্ত্ব নির্ণয়েরই বাধ্যত ঘটে, তাহা সেখানে কখনই উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। গুরু-শিষ্যের বাদ-বিচার হইতেছে, গুরু আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন, আত্মা দেহাদি নহে—ইহা বুঝাইলেন, কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে ভ্রমবশতঃ বলিয়া ফেলিলেন—“আত্মা নিত্য, বেহেতু তাহার রূপ নাই; যেমন আকাশ, কাল, দিক্ প্রভৃতি।” তখন তত্ত্বনির্ণয়ার্থী শিষ্য অবশ্যই বলিবেন—এই হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা হেত্বাভাস। কারণ, রূপ না থাকিলেই তাহা নিত্য পদার্থ হইবে, এমন নিয়ম নাই। বায়ুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু নিত্য পদার্থ নহে। গুরু যদি তখন বায়ুমাত্রকে নিত্য বলিয়াই বলেন, তাহা হইলে উহা অসিদ্ধান্ত, ইহা শিষ্য অবশ্যই বলিবেন। কারণ, অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়া গেলে প্রকৃত বিষয়ে তত্ত্বনির্ণয় ঘটিবে না; বাদবিচারে যে তত্ত্ব নির্ণয়ই উদ্দেশ্য। “অপসিদ্ধান্ত” একটি “নিগ্রহস্থান”, বাদবিচারে তাহার উদ্ভাবন আছে এবং হেত্বাভাস মাত্রেরই উদ্ভাবন আছে এবং স্থলবিশেষে আর দুই একটি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন আছে। জন্ম ও বিতণ্ডার দ্বারা বাদবিচারে সর্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, ছল ও জাতির একেবারেই কোন সংশয় নাই। বাদী ও প্রতিবাদী কেবল জয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় জন্ম বিচার করিলেও ঐ বিচার ভাল ভাবে



চলিলে উহার দ্বারা অনেক সময়ে মধ্যস্থের তত্ত্বনির্ণয় হইয়া যায়। এই নির্ণয়ই মহর্ষি গোতমের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত নির্ণয় পদার্থ। ঐ নির্ণয় মধ্যস্থের সংশয় পূর্বক। বাদবিচারে নির্ণয় ঐরূপ নহে।

ভাষ্য। একাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, প্রত্যনৌকভাবাৎ, অন্ত্যাত্মা নাস্ত্যাত্মেতি। নানাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ন পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, যথা নিত্য আত্মা অনিত্য বুদ্ধিরিতি। পরিগ্রহোহভূতপ-  
গমব্যবস্থা। সোহয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। তস্মৈ বিশেষণং, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভঃ, প্রমাণৈন্তর্কেণ চ সাধনমুপালম্ভশ্চাশ্মিন্ ক্রিয়ত ইতি। সাধনং স্থাপনা, উপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ। তৌ সাধনোপালম্ভৌ উভয়োরপি পক্ষয়োর্ব্যতিষক্তাবমুখকৌ, যাবদেকৌ নিবৃত্ত একতরৌ ব্যবস্থিত ইতি, নিবৃত্তস্তোপালম্ভৌ ব্যবস্থিতস্ত সাধনমিতি। জল্পে নিগ্রহ-স্থানবিনিয়োগান্বাদে তৎপ্রতিষেধঃ। প্রতিষেধে কস্মচিদভ্যনু-  
জ্ঞানার্থং “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ” ইতি বচনম্। “সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ” ইতি হেত্বাভাসস্ত নিগ্রহস্থানমভ্যনুজ্ঞাবাদে। “পক্ষাবয়বোপপন্ন” ইতি “হীনমন্ততমেনাপ্যবয়বেন নূনং,” “হেতুদাহরণাধিকমধিক”মিতি চৈতয়োরভ্যনুজ্ঞানার্থমিতি। অবয়বেষু প্রমাণতর্কাস্তর্ভাবে পৃথক্ প্রমাণ-  
তর্কগ্রহণং সাধনোপালম্ভব্যতিষঙ্গজ্ঞাপনার্থং, অন্যথোভাবপি স্থাপনাহেতুনা প্রবৃত্তৌ বাদ ইতি স্যাৎ। অন্তরেণাপি চাবয়বসম্বন্ধং প্রমাণান্বর্থং সাধয়ন্তীতি দৃষ্টং, তেনাপি কল্পেন সাধনোপালম্ভৌ বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভৌ জল্প ইতি বচনাদ-  
বিনিগ্রহো জল্প ইতি মা বিজ্ঞায়ি, ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভ এব জল্পঃ, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভৌ বাদ এবেতি মা বিজ্ঞায়ীত্যেবমর্থং পৃথক্-  
প্রমাণ-তর্কগ্রহণমিতি।

অনুবাদ। একাধারে অবস্থিত দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম বিরুদ্ধতাবশতঃ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন একই পদার্থে বাদীর স্বীকৃত একটি এবং প্রতিবাদীর স্বীকৃত একটি—এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলে। (যেমন) আত্মা আছে এবং আত্মা নাই, (এখানে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব পক্ষ এবং

তাহার নাস্তি প্রতাপক, আবার নিত্য আত্মার নাস্তিবাদীর নাস্তি পক্ষ, অস্তিত্ব প্রতাপক)। বিভিন্ন আধারে স্থিত বিরুদ্ধ ধর্মবয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না, যেমন আত্মা নিত্য, বুদ্ধি অনিত্য, (এখানে এক আত্মারই অথবা বুদ্ধিরই নিত্য ও অনিত্য বলা হয় নাই; সুতরাং উহা বিরুদ্ধ না হওয়ার পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে না)। পরিগ্রহ বলিতে (এখানে) স্বীকার ব্যবস্থা, অর্থাৎ এই পদার্থ এই প্রকারই হইবে, এই প্রকার হইবে না, এইরূপে স্বীকারের নিয়ম। সেই এই পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাতে পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নিয়মবদ্ধ স্বীকার থাকে, এমন বাক্যসম্পদ 'বাদ'। তাহার বিশেষণ প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব, (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ ত্রিবিধ কথ্যেই আছে, উহাই কেবল বাদের লক্ষণ হয় না, এ জ্ঞাত ঐ বাদলক্ষণে মহর্ষি বিশেষণ বলিয়াছেন—প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব,) প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা এই বাদবিচারে সাধন এবং উপালম্ব করা হয়। সাধন বলিতে স্থাপন অর্থাৎ স্বপক্ষ সংস্থাপন, উপালম্ব বলিতে প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের যত্ন। সেই সাধন ও উপালম্ব এই দুইটি উভয় পক্ষেই ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত এবং অনুরুদ্ধবিশিষ্ট হইবে। (ঐ উভয়ের অনুরুদ্ধ কি, তাহা বলিতেছেন) যে পর্য্যন্ত একটি নিবৃত্ত হইবে, একটি ব্যবস্থিত হইবে। নিবৃত্তের সম্বন্ধে উপালম্ব, ব্যবস্থিতের সম্বন্ধে সাধন হইবে।

জন্মে নিগ্রহস্থানের বিনিয়োগবশতঃ অর্থাৎ ইহার পরবর্তী সূত্রে জন্ম নামক বিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবার বিধি থাকায় বাদবিচারে তাহার নিষেধ হয় অর্থাৎ বাদবিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের নিষেধ বুঝা যায়। নিষেধ হইলেও কোন নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞার জন্ম অর্থাৎ বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচনা করিবার জন্ম (এই সূত্রে) "সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ" এই কথাটি বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, এমন পদার্থ বিরুদ্ধ এই সূত্রবশতঃ (২২২৬ সূত্র) বাদবিচারে হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞা হইয়াছে অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রে "সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ" এই কথার দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

অন্ততম অবয়বশূন্য বাক্য ন্যূন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটির প্রয়োগ না করিলেও ন্যূন নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতুবাক্য অথবা উদাহরণবাক্য একটির অধিক হইলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই দুই সূত্রোক্ত (৫ অং,



২ আঃ, ১২।১৩ সূত্র) ন্যূন এবং অধিক নামক দুইটি নিগ্রহস্থানের অমুজ্জার জন্ম অর্থাৎ বাদবিচারে ঐ দুইটিরও উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচনা করিবার জন্ম (মহর্ষি এই সূত্রে) পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথাটি বলিয়াছেন।

অবয়বগুলিতে প্রমাণ এবং তর্কের অন্তর্ভাব থাকিলেও অর্থাৎ যদিও সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথা বলাতেই প্রমাণ ও তর্কের কথা পাওয়া যায়, তথাপি সাধন ও উপালম্বের ব্যতিষদ্র জ্ঞাপনের জন্ম অর্থাৎ উভয় পক্ষেই ঐ উভয়ের সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, ইহা বুঝাইবার জন্ম (সূত্রে) পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে। অত্যা সংস্থাপনের হেতুর দ্বারা প্রবৃত্ত (প্রকাশিত) উভয় পক্ষও বাদ হউক, অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন করিয়াছেন, কেহ কোন পক্ষের সংস্থাপনের খণ্ডন করেন নাই, সেখানে সেই সংস্থাপনও বাদ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কেবল সংস্থাপন বাদ হইবে না, উভয় পক্ষে সংস্থাপনের দ্বারা উভয় পক্ষে তাহার খণ্ডনও হওয়া চাই, ইহা সূচনা করিবার জন্মই মহর্ষি বিশেষ করিয়া এই সূত্রে প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন।

পরন্তু প্রমাণগুলি অবয়বসম্বন্ধ ব্যতীতও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ত্রায়-বাক্যের প্রয়োগ না করিলেও পদার্থ সাধন করে, ইহা দেখা যায় অর্থাৎ ইহা অমুভব সিদ্ধ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সেই কল্পের দ্বারাও অর্থাৎ পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া বাদ হয়, ইহা প্রথম কল্প, পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও বাদ হয়, ইহা দ্বিতীয় কল্প; এই দ্বিতীয় কল্পেও বাদবিচারে সাধন এবং উপালম্ব হয়, ইহা জানাইয়াছেন, অর্থাৎ মহর্ষি এই বাদলক্ষণ-সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা বলিলেও পৃথক্ করিয়া প্রথমেই যে “প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব” এই কথাটি বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চাবয়বযুক্ত না হইলেও প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব হইলে অর্থাৎ বাদবিচারের অন্যান্য লক্ষণ থাকিয়া পঞ্চাবয়ব সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা বাদ হইবে, মহর্ষি ঐ কথার দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন।

পরন্তু ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব যাহাতে হয়, তাহা জল্প, এই কথা (জল্পসূত্রে) আছে বলিয়া জল্প নিগ্রহশূন্য অর্থাৎ বাদবিচারে যে সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, জল্পে সেগুলি নাই, ইহা না বুঝে। বিশদার্থ এই যে, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব যাহাতে হয়, তাহাই জল্প, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব যাহাতে হয়, তাহা বাদই, ইহা না বুঝে অর্থাৎ বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থান জল্পে নাই, জল্পস্থলীয় নিগ্রহস্থান বাদে নাই, ইহা কেহ না



বুঝে, এই জ্ঞাত পৃথক্ করিয়া (এই সূত্রে) প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে (অর্থাৎ সূত্রে অতিরিক্ত কচনের দ্বারা ইহাও বলা হইয়াছে যে, বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থানও জন্মে আছে, জল্পস্থলীয় নিগ্রহস্থানবিশেষও বাদে আছে)।

টিপ্পনী। ভাষ্যসূত্রকার মহামুনি গোতম প্রথম আক্ষিকের দ্বারা প্রমাণ হইতে নির্ণয় পর্যন্ত (ভাষ্য ও ভাষ্যক) পদার্থের লক্ষণ বলিয়া অবশিষ্ট বাদ হইতে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত পদার্থগুলির লক্ষণ বলিতে দ্বিতীয় আক্ষিক বলিয়াছেন। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষাও করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথম পদার্থ বাদ। মহর্ষি দ্বিতীয় আক্ষিকের প্রথমের সেই বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু একটি সূত্র একটি প্রকরণ হয় না, প্রকরণ ভিন্নও গ্রহণ হয় না, এই কথা মনে করিয়া ভাষ্যকার বাদ-লক্ষণ-সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, “কথা তিনটি—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা”। ভাষ্যকারের গৃঢ় তাৎপর্য এই যে, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা—এই তিনটির নাম ‘কথা’। ঐ তিন প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার কথা নাই—সামান্ততঃ ‘কথা’ বলিলে ঐ তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। ঐ ত্রিবিধ কথার পৃথক্ পৃথক্ তিনটি বিশেষ লক্ষণ-সূত্রই মহর্ষির একটি প্রকরণ। উহার নাম “কথালক্ষণ-প্রকরণ”। কথাক্রমে ঐ তিনটিই এক, সূত্রাৎ ঐ তিনটিকে লইয়া একটি প্রকরণ অদ্বন্দ্বও নহে। উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কথামাত্রই ত্রিবিধ, এইরূপ নিয়ম বলেন নাই। তিনি বিচার-বস্তুর নিয়ম বলিয়াছেন। যে বস্তু বিচার করিতে হইবে তাহা বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, এই তিন প্রকারেই বিচার করিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন আর কোন প্রকারে বস্তু বিচার হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, যখন “বৃহৎ-কথা” প্রভৃতি ভাষ্যকারোক্ত ত্রিবিধ কথার অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন কথা মাত্রই ত্রিবিধ, ইহা ভাষ্যকার বলেন নাই। বিচার্য বিষয়ে একাধিক বক্তার যে বাক্য-সন্দর্ভ, তাহাই ভাষ্যকারের ঐ কথা শব্দের অর্থ এবং তাহাকেই তিনি ত্রিবিধ বলিয়াছেন<sup>১</sup>। তর্কিকরক্ষাকার প্রভৃতিও এই “কথা”র ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কথা শব্দ মহর্ষির সূত্রে নাই, উহা ভাষ্যকারের কথা, এই কথা কোন গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন; কিন্তু এ কথা সত্য মনে। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্র হইতেই যথোক্ত অর্থে “কথা” শব্দ পাইয়া, তাহাই এখানে ব্যবহার করিয়াছেন এবং মহর্ষিপ্রোক্ত সেই কথা কি, তাহা এখানে বলিয়াছেন। ত্রিবিধ কথাতেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। বাদী বাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থটি বাদীর পক্ষ এবং প্রতিবাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। প্রতিবাদী বাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থটি প্রতিবাদীর পক্ষ এবং বাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। বিরোধী ব্যক্তিব্যক্রেও অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীকেও পরস্পর পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হয়, কিন্তু ঐ বিরোধিত্ব বা বিরুদ্ধত্ব ধর্মবশতঃ বিরুদ্ধ ধর্মবাহ্যে এখানে পক্ষ ও

১। বিচারবিষয়ে নানাবক্তৃকো বাক্যবিশেষঃ।

কথা ও জ্ঞাঃ বদ্ব্যন্থি প্রাহশ্চকারি কেচনঃ—তর্কিকরক্ষা।

২। কার্যবাসনায় কথাবিশেষো বিবেচনঃ।—ভাষ্যকর, ১৩, ২৩, ১১ সূত্র।

সিদ্ধান্তমুদ্রাপ্রতিপাদনায় কথাপ্রলোভনসিদ্ধান্তঃ।—ঐ, ২৩ সূত্র।



প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যসিদ্ধিকার ভাব্যকারোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কেই হুক্তাকারোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের মূখ্যার্থ বলিয়াছেন (নির্ণয়হুক্তভাব্য টিপ্পনী প্রভৃতি)। বাদী বলিলেন—আত্মা আছে অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে; এই কথা দ্বারা বুঝা গেল, আত্মার নিত্যত্ব-ধর্ম্মই বাদীর পক্ষ। প্রতিবাদী নৈরাশ্ব্যবাদী বোদ্ধ বলিলেন—আত্মা নাই অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা নাই; এই কথা দ্বারা বুঝা গেল, আত্মার অনিত্যত্ব-ধর্ম্মই প্রতিবাদীর পক্ষ। তাহা হইলে আত্মার অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম বাদীর প্রতিপক্ষ এবং আত্মার নিত্যত্ব-ধর্ম্ম প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, ইহাও বুঝা গেল। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্ম্ম আত্মার পক্ষে বিরুদ্ধ; এক আত্মাতে দুইটি ধর্ম্ম কখনও থাকিতে পারে না। আত্মাতে নিত্যত্বই থাকিলে, অথবা অনিত্যত্বই থাকিলে। আত্মাতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষ লইয়া উভয় বাদীর বিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি একজন বলেন, আত্মা নিত্য আর অপর বাদী বলেন, বুদ্ধি অনিত্য, তাহা হইলে দেখানে উহা লইয়া কোন বিচার উপস্থিত হয় না। কারণ, আত্মা নিত্য হইলেও বুদ্ধি অনিত্য হইতে পারে। আত্মার নিত্যত্ব এবং বুদ্ধির অনিত্যত্বে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ভাব নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মও বিরুদ্ধ হয় না, বিরুদ্ধ না হইলেও তাহা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। এককালে একই ধর্ম্মাতে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মকে বিভিন্ন-বাদী উল্লেখ করিলে তাহাই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইয়া বিচার্য্য বিষয় হইয়া থাকে।

হুক্তকার মহর্ষি এই “পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ” বলিয়া বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। হুক্তকারের পরিগ্রহ শব্দের ব্যাখ্যায় ভাব্যকার বলিয়াছেন, “অভ্যুপগমব্যবস্থা”। অভ্যুপগম বলিতে স্বীকার, ব্যবস্থা বলিতে নিয়ম; তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা গেল—স্বীকারের নিয়ম। এই পদার্থ এইরূপই, ইহার অত্ররূপ নহে, এইরূপভাবে স্বীকার বা নিশ্চয়ের নিয়মই স্বীকারের নিয়ম বা নিয়মবদ্ধ স্বীকার। উহাই ভাব্যকারের মতে হুক্তোক্ত পরিগ্রহ শব্দের অর্থ। পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের ঐ পরিগ্রহ অর্থাৎ স্বীকারের নিয়ম বা নিয়মবদ্ধ স্বীকার বাহাতে থাকে, তাহা বাদ, ইহাই ঐ কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ হুক্তে “পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ” এই বাক্য বহুব্রীহি সমাস বৃত্তিতে হইবে।

কিন্তু কেবল ঐ মাত্রই বাদের লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, পূর্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ জর ও বিতণ্ডাতেও থাকে। বিতণ্ডার দ্বিত্তাকারী স্বপক্ষের সংস্থাপন না করিলেও তাহার স্বপক্ষের একটা স্বীকার আছেই, এ জন্ত মহর্ষি ঐ বাদ-লক্ষণে বিশেষণ বলিয়াছেন,—“প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব”। প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব বাহাতে হয়, তাহাই প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব। সাধন বলিতে স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং উপালম্ব বলিতে ঐ সংস্থাপন বা সাধনের ষণ্ডন। বাদী সাধন করিলে, প্রতিবাদী ঐ সাধনেরই ষণ্ডন করেন। বাদীর পক্ষ সেই পদার্থটির বস্ত্ততঃ ষণ্ডন হয় না, এ জন্ত উপালম্ব বলিতে সর্কত্রই সাধনেরই ষণ্ডন বৃত্তিতে হয়।

ত্ৰায়বাষ্টিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, উপালম্ব বস্ত্ততঃ সাধনেরও হয় না। স্বপক্ষ সংস্থাপনই সাধন, উহা বাক্য, তাহার ষণ্ডন হইবে কিরূপে? সে বাক্য তাহার প্রতিপাদ্য প্রকাশই

করিয়াছে, তদ্বিধয়ে তাহার সামর্থ্য নষ্ট করা যায় না। ঐ উপালম্ব বস্তুতঃ সেই বাক্যবাদী পুরুষের। বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহই তাহার উপালম্ব, তাহা তাহাদিগের সাধন-বাক্যকে অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়, এ জন্ত সাধনের উপালম্ব বলা হইয়াছে। সাধনের উপালম্বই বা হুজে বলা হইয়াছে কৈ? পক্ষের সাধন এবং প্রতিপক্ষের উপালম্বই হুজের দ্বারা বুঝা যায়, এ জন্ত স্তায়বাস্তবিককার বলিয়াছেন যে, "প্রতিপক্ষ" পদার্থটি যখন উপালম্বের অধোগ্য, তখন হুজের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না, তাহা বুঝিলে ছল বুঝা হইবে। হুজে যে "প্রমাণ-তর্কনামোপালম্ব" এই বাক্যটি আছে, উহার দ্বারা "প্রমাণ-তর্কনামন" এবং "প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ব" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বোক্ত অর্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ স্থলে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমান বুঝিতে হইবে। সমাসে একটি "সাধন" শব্দের লোপ হইয়াছে। কোন ভাষ্যপুস্তকে অতিরিক্ত ভাষ্য পাঠের দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যারও আভাস পাওয়া যায়।

সে বাহা ইউক, এখন প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি এই বিশেষণের দ্বারা জয় ও বিতণ্ডা হইতে বাদের বিশেষ কি বলিলেন? এতদ্বত্তরে স্তায়বাস্তবিককার বলিয়াছেন যে, বাদে প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ব হয়; এই নিয়মই মহর্ষির বিবক্ষিত। জয় ও বিতণ্ডাতে ছল ও জাতির দ্বারাও উপালম্ব হয়, বাদে তাহা হয় না; সুতরাং মহর্ষির ঐ বিশেষণের দ্বারা জয় ও বিতণ্ডা বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় নাই। যদিও কোন জয়-বিচারে কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ব হইতে পারে, ছল ও জাতির কোন উল্লেখ না করিয়াও জয়-বিচার হয়, তথাপি জয় ও বিতণ্ডা ছল ও জাতির দ্বারা উপালম্বের দ্বারা, তাহাতে উহা করিলে করা যায়; এ জন্ত তাদৃশ জয়বিশেষ বাদলক্ষণাক্রান্ত হইবে না। অর্থাৎ বাহা প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্বের দ্বারা, তাহাই বাদ; এই পর্য্যন্তই মহর্ষির ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। যদিও তর্ক নিজে কোন প্রমাণ নহে, তাহা হইলেও প্রমাণের বিবক্ষ্য-বিবেচক হইয়া প্রমাণের অন্তর্গত অর্থাৎ প্রমাণের বিশেষ সহকারী হয়। বিচারস্থলে তর্ক দ্বারা বিবেচিত বিষয়ই প্রমাণ নির্ধারণ করে, এ জন্ত এই হুজে প্রমাণের সহিত তর্কেরও উল্লেখ হইয়াছে। এখন কহা এই যে, হুজে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পক্ষাবলম্বোপপন্ন, এই দুইটি কথার আর প্রয়োজন কি? বাদের লক্ষণে ঐ দুইটি কথার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরহুজে জয়বিচারে নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্বের কথা থাকায়, এই হুজোক্ত বাদবিচারে কোন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই অর্থাৎ বাদবিচারে উহা নিষিদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারে, এই জন্ত মহর্ষি এই হুজে ঐ দুইটি কথার দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবে। উদ্যোক্তক বলিয়াছেন যে, যখন বাদ-বিচারেও উপালম্বের কথা আছে, এই হুজে তাহা বলা হইয়াছে, তখন বাদবিচারেও নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বুঝা যায়। তবে উহার দ্বারা বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থানই উদ্ভাব্য, ইহাও বুঝিতে পারে, এ জন্ত মহর্ষি এই হুজে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পক্ষাবলম্বোপপন্ন, এই দুইটি কথা বলিয়া বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য নহে, নিগ্রহস্থানবিশেষই উদ্ভাব্য, এইরূপ নিয়ম



সূচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে, ইহা ভাব্যকার বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই বাদবিচারে নূন, অধিক এবং হেত্বাভাস নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, “অবয়ববৃদ্ধ” এই কথা বলিলে “অবয়বভাস” থাকিবে না, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে হেত্বাভাস থাকিবে না, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, অবয়বভাস প্রয়োগ করিলে সেখানে হেত্বাভাসেরই প্রয়োগ হয়। সুতরাং বাহা মহর্ষির অত্র কথার দ্বারাই পাওয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা আবার তাহারই সূচনা করা নিরর্থক, তাহা মহর্ষি করেন নাই। তবে সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথা বলার প্রয়োজন কি? এতদ্বারা উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহা সূচনা করিবার জন্তই মহর্ষি সূত্রে ঐ কথাটি বলিয়াছেন। পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণও উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যাকেই সংগত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাব্যকারের অভিপ্রায় ইহাই মনে হয় যে, সূত্রোক্ত পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারা হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহা মহজে বুঝা যায় না। পরন্তু পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথাটি মহর্ষি বাদবিচারমাত্রেরই বলেন নাই। পঞ্চাবয়ববৃদ্ধ হইয়াও বাদবিচার হইতে পারে, ইহা ভাব্যকারের কথায় পরে ব্যক্ত হইবে। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথাটি মহর্ষি বাদবিচারমাত্রেরই বলিয়াছেন। হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান বাদমাত্রেরই উদ্ভাব্য, ইহাই যখন মহর্ষি সূচনা করিবেন, তখন বুঝা যায়, (বাদবিচারমাত্রেরই মহর্ষি যে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটি বলিয়াছেন, সেই) সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটির দ্বারাই তাহা সূচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এই জ্ঞাত ভাব্যকার এখানে তাহা বুঝাইবার জন্তই মহর্ষি গোতমের বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাব্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বাহা স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, মহর্ষি তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, বাদবিচারে সিদ্ধান্তবিরোধী কিছু বলা যাইবে না, তাহা বলিলে প্রতিবাদী তাহার অবশ্য উদ্ভাবন করিবেন। উদ্যোতকর মহর্ষি-কথিত বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রের বৈরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে হেত্বাভাসমাত্রই সিদ্ধান্তবিরোধী। হেত্বাভাসমাত্রই বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ আছে, অর্থাৎ হেত্বাভাসমাত্রই “বিরুদ্ধ”। তাহা হইলে ভাব্যকার মহর্ষির বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াও সমস্ত হেত্বাভাসকে গ্রহণ করিতে পারেন। এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা সিদ্ধান্তবিরোধী অর্থাৎ হেত্বাভাসমাত্রই বাদবিচারে উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচিত হইয়াছে, ঐ কথাও বলিতে পারেন। ভাব্যকার তাহাই বলিয়াছেন (২২১৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ যে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারে তত্ত্বনির্ণয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাদবিচারে উদ্ভাবন করিতে হইবে; সুতরাং হেত্বাভাসের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থানও বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য। ভাব্যকার অপ-



সিদ্ধান্তের নাম করিয়া দে কথা না বলিলেও এই শ্রুতি সিদ্ধান্তাবিকল্প, এই কথা দ্বারা তাহাও স্থচিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তাবিকল্প এই কথা দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ কথা প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে যেট গুঢ় প্রয়োজন, শেষে তাহারই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাদবিচারে কোন্ কোন্ নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, তাহাদিগের সকলের নামোচ্চারণ করা এখানে কর্তব্য মনে করেন নাই। মহর্ষি-শ্রুতি ব্যাখ্যায় শ্রুত সিদ্ধান্তাবিকল্প, এই কথা একটি প্রয়োজন ব্যাখ্যা করাই তিনি কর্তব্য মনে করিয়া তাহাই করিয়াছেন; তাহাতে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান ভাষ্যকারের মতে বাদবিচারে উদ্ভাব্য নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না।

প্রথম শ্রুতিভাষ্যেও ভাষ্যকার হেতুভাসের পূর্বক উল্লেখের প্রয়োজন বর্ণনায় বাদবিচারে হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের ঐ কথা দ্বারা নূন, অধিক ও অপসিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাবন কর্তব্য, বুঝিতে হইবে; কেবল হেতুভাসেরই উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বুঝিতে হইবে না। এইরূপে তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটি না বলিলেও নূন নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং ছেদু ও উদাহরণ-বাক্য একের অধিক বলিলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্যকার এই দুইটি নিগ্রহস্থানের মহর্ষিপ্রোক্ত লক্ষণ-শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই দুইটিরও বাদবিচারে উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা শ্রুতি করিতে মহর্ষি পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা বলিয়াছেন। অবশ্য পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদবিচারেই এ কথা বলা হইয়াছে; সেখানেই উহা সম্ভব। পরবর্তী বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতি বাদবিচারে নূন ও অধিক নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন স্বীকার করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন যে, উহা বখন প্রমাণের দোষ নহে, উহা বক্তার দোষ, তখন বক্তার অজ্ঞান দোষের দ্বারা উহাও বাদবিচারে ধর্তব্য নহে। একটা হেতুবাধ্য বা উদাহরণ-বাক্য বেনী বলা হইলে অবশ্য একটা অবয়ব না বলিলে, তাহাতে তত্ত্বনির্ণয়ের আসে যায় কি?

প্রাচীন মত সমর্থনে উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, অবয়বগুলি প্রমাণ না হইলেও প্রমাণ-মূলক বলিয়া প্রমাণ সঙ্গত। সূত্রায় অবয়বের নূনতা বা অধিক্য কোন প্রমাণভ্রমবশতঃও হইতে পারে, এ জন্ত বাদবিচারেও তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন বাদবিচারে এক পক্ষ প্রকৃত হেতু-বুদ্ধিতেই হেতুভাস প্রয়োগ করেন এবং সেই জন্তই বাদবিচারে তাহার উদ্ভাব্যতা আছে। প্রমাণের দোষ না দেখাইলে তত্ত্বনিশ্চয়েরই ব্যাঘাত হয়। তজ্জপ নূন, অধিক ও অপসিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলেও হেতুভাসের দ্বারা সাধ্যসাধনের জন্ত প্রযুক্ত হওয়ায়, উহারা প্রমাণ সঙ্গত; সূত্রায় উহাদিগেরও উদ্ভাবন বাদবিচারে কর্তব্য। বাদবিচারে নিজের বক্তব্যটি প্রতিপাদন করিতে না পারাই নিগ্রহ; সেখানে পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই। জিগীষা না থাকায় বাদবিচারে পরাজয়রূপ নিগ্রহ হয় না।

পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেই প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধনাদি করা হয়। ফলকথা, পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা দ্বারা ই প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথা পাওয়া যায়। আবার



প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথা কেন? অথবা প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ কেন? কেবল সাধন ও উপালম্বের কথা বলিলেই হইত? পৃথক্ করিয়া আবার প্রমাণ ও তর্ক শব্দের প্রয়োজন কি? অবশ্য কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই বেখানে সাধনাদি হইবে, বাহাতে ছল ও জাতির কোন সংশয় নাই অথবা তাহার বোধ্যতাই নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা প্রমাণ ও তর্ক শব্দের গ্রহণ করিলেই হইতে পারে এবং তাহাই মহাবির এই কথার তাৎপর্য্যার্থ। নচেৎ পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ব বুঝিতে হইলে, জল্পবিচার হইতে বাদবিচারের বিশেষ বুঝা হয় না; সুতরাং পৃথক্ভাবে প্রমাণ তর্ক গ্রহণের প্রয়োজন পূর্বেই ব্যক্ত আছে, তাহাণি ভাষ্যকার যথাক্রমে উহার আরও তিনটি প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। এই তিনটি প্রয়োজন প্রসঙ্গপ্রাপ্ত, অর্থাৎ উহার মূখ্য প্রয়োজন একটি থাকিলেও উহার দ্বারা আরও তিনটি অতিরিক্ত প্রয়োজন সংগ্রহ করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম প্রয়োজন—সাধন ও উপালম্বের ব্যতিবন্ধজ্ঞাপন। ব্যতিবন্ধ বলিতে উভয়ত্র পরস্পর মিলন। যেমন পক্ষের সাধন থাকা চাই, তদ্রূপ প্রতিবাদী কর্তৃক ঐ সাধনের উপালম্বও থাকা চাই। এবং যেমন প্রতিপক্ষের সাধন থাকা চাই, তদ্রূপ বাদী কর্তৃক ঐ প্রতিপক্ষ-সাধনের উপালম্বও চাই। বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের সাধন করিলেন, কেহ কোন সাধনের উপালম্ব করিলেন না, সেখানে বাদ হইবে না। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যতিবন্ধযুক্ত সাধন ও উপালম্বই এখানে স্বত্বকারের বিবক্ষিত। মহাবির পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ করিয়া ইহা সূচনা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হয়। কারণ, তত্ত্বনির্ণয়ই বাদবিচারের উদ্দেশ্য। পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিলেও প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং সূত্রোক্ত পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথাটি বাদমাত্রেরই গ্রহণীয় নহে। পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া বাদ হইবে, ইহা এক কল এবং পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও অস্তান্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে বাদ হইবে, ইহা দ্বিতীয় কল। স্বত্বকারের পৃথক্ করিয়া “প্রমাণ-তর্ক-গ্রহণ” এই দ্বিতীয় কলটি সূচনা করিয়াছে। অর্থাৎ মহাবির, সূত্রে ঐ অতিরিক্ত কথার দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হইতে পারে।

ভাষ্যকার তৃতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, জল্পলক্ষণে (পরসূত্রে) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা বাহাতে সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহা জল্প, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে কেহ বুঝিতে পারেন যে, জল্পে বাদবিচারে উদ্ভাব্য নিগ্রহস্থান নাই। কারণ, এই সূত্রে যদি প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথাটা না বলা হয়, তাহা হইলে জল্পসূত্রে এ কথাটা পাওয়া যায় না। পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা হইতেই প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব বুঝিতে হয়। এবং ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ব, এই কথার দ্বারাই জল্পে নিগ্রহস্থানের কথা বুঝা যায়। তাহা হইলে জল্পসূত্রের ঐ কথাটির দ্বারা কেহ বুঝিতে পারেন যে, বাদবিচারে যে সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, জল্পবিচারে সেগুলি নাই। তাহা বুঝিলে কিরূপ অর্থ বুঝা হয়? ইহা বলিবার জন্তই ভাষ্যকার শেষে উহার পূর্বকথারই ফলিতার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, ছল, জাতি ও



নিগ্রহস্থানেরর দ্বারা সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহাই জর এবং প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহা বানই, ইহা কেহ না বুঝেন, এই জন্ত সূত্রে পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যের বিনিগ্রহ শব্দের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন, বাদগত নিগ্রহস্থানরহিত। শেষে বলিয়াছেন যে, বাদগত নিগ্রহ জন্মে নাই, জন্মগত নিগ্রহ বাদে নাই, ইহা বুঝিও না; বাদগত নিগ্রহও জন্মে আছে, ইহা মহবি পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ করিয়া সূচনা করিয়াছেন। উদ্ভূত বা অতিরিক্ত কথার দ্বারা অতিরিক্ত ফলের সূচনা হইয়া থাকে, ইহা প্রতীতিগত বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে মগধীর অতিরিক্ত কথার দ্বারা সেই অতিরিক্ত ফলেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রে যে প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথাটি আছে, উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব সাধাতে করেন, ইহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, তাহা অসম্ভব। বিচারে এক পক্ষ প্রমাণাভাস ও তর্কাত্মকেই প্রমাণ ও তর্ক বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা সাধন ও উপালম্ব করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত পক্ষের অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বটিরই সাধন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কে গ্রহণ করিয়া থাকেন। একাধারে দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ যখন কোন মতেই প্রমাণদিক্ হইতে পারে না, তখন এক পক্ষের ভাষাভাস হইবেই। যিনি প্রমাণাভাস ও তর্কাত্মকেই অবলম্বন করিয়া বিচার করেন, তিনিও তাহাকে প্রমাণ ও তর্ক বলিয়াই গ্রহণ করেন এবং তদ্বারা বস্ত্তঃ সাধন ও উপালম্ব না হইলেও তিনি তদ্বারাই সাধন ও উপালম্ব করিতে প্রবৃত্ত হন। এই তাৎপর্য্যই সূত্রে প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথা বলা হইয়াছে।

ঐ ভাবে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন এবং উপালম্ব ব্যতিরিক্ত এবং অস্ববদ্ধ হওয়া চাই। বাদবিচারে যখন তত্ত্বনির্ণয়ই উদ্দেশ্য, তখন তত্ত্বনির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাদবিচার চলিবেই। যে পর্য্যন্ত এক পক্ষের নিবৃত্তি এবং এক পক্ষের দ্বিতি না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাদবিচারে পূর্ণোক্ত প্রকার সাধন ও উপালম্ব করিতেই হইবে, ইহাই সাধন ও উপালম্বের পরস্পর অস্ববদ্ধ। ভাষ্যকার নির্ণয়-সূত্র-ভাষ্যেও ইহা বলিয়া আসিয়াছেন (নির্ণয়সূত্রভাষ্য ভ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যবিত্তিকার উদ্যোতকর এখানে বস্তুবদ্ধ বা সূত্রবদ্ধ প্রকৃতি বোদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বাপ-লক্ষণ তুলিয়া তাহাদিগের সহিত তুমুল বিবাদের পরিচয় দিয়া, বহু প্রতিবাদের পরে নিবৃত্ত হইয়াছেন। বাহ্যিক ভাবে সে সকল কথা আলোচিত হইল না।

উদ্যোতকর আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে কোন প্রণকারীর আবশ্যকতা নাই। প্রণকারীকে বুঝাইবার জন্তই যে বাদবিচার হয়, এমন নিয়ম নাই। প্রণকারী অজ্ঞ ব্যক্তি না থাকিলেও শুধু প্রকৃতির সহিত বাদবিচার হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রকৃতি বলিয়াছেন যে, বৈবাহ্য যদি বাদবিচার স্থলে প্রণকারী উপযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন, তবে তাহাকে বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থরূপে তব নির্ণয়ের সাহায্যের জন্ত গ্রহণ করিবেন, তাহাকে বর্জন করিবেন না।



বৃত্তিকার বিধানাথ পুরোক্ত ‘কথা’র সামান্য লক্ষণ এবং কথার অধিকারীর লক্ষণ এবং বাদের অধিকারীর লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন ।

তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভ, ইহার কোন একটির যোগ্য ভাষ্যভূত বাক্য-সন্দর্ভই কথা । লৌকিক বিবাদ কথা নহে, তাই বলিয়াছেন—ভাষ্যভূত বাক্য-সন্দর্ভ । বস্তুতঃ ভাষ্যভূত বাক্য প্রয়োগ করিণেই প্রকৃত বিচার হয় । অত্বেথা এখনকার অধিক সংখ্যক বিচার নামে প্রচলিত বাক্য-সন্দর্ভের ভাষ্য একটা লৌকিক বিবাদ অথবা ইটগোল হইয়া পড়ে । যেখানে বিচারে তত্ত্ব নির্ণয় অথবা জয়লাভের কোনটিই হইল না, কিন্তু বিচার চলিলে উহার একটি হইতে পারিত, এইরূপ বিচারও কথা হইবে । তাই বলিয়াছেন, তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভের কোন একটির যোগ্য ; উহার কোন একটি হওয়াই চাই, নচেৎ তাহা কথা হইবে না, ইহা বলেন নাই । কিন্তু যেখানে তত্ত্ব নির্ণয় অথবা জয়লাভের যোগ্যতাই নাই, সেখানে ভাষ্যভূত বাক্য-সন্দর্ভ হইলেও তাহা কথা হইবে না । বৃত্তিকারের এই কথা যুক্তিযুক্ত ।

যাহারা তত্ত্ব নির্ণয় অথবা জয়লাভের অভিলাষী এবং সর্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং শ্রবণাদি কার্যে পটু এবং কথার উপযুক্ত বাদ-প্রতিবাদাদি কার্যে সমর্থ, অথচ কলহকারী নহেন, তাঁহারা কথার অধিকারী ।

কথার অধিকারীর মধ্যে যাহারা তত্ত্বদ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসু এবং প্রকৃত বাদী ও প্রতিভাশালী এবং যাহারা বৃত্তিসিদ্ধ পদার্থ বুঝেন এবং মানেন এবং প্রত্যয়ক নহেন, তিরস্কার করেন না, তাঁহারা বাদকথার অধিকারী । এই অধিকারীর লক্ষণগুলি বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয় । যাহারা কথা ও বাদের এইরূপ অধিকারী নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা, তাঁহাদিগের প্রকৃতি, তাঁহাদিগের প্রাজ্ঞতা, এগুলিও চিন্তাশীলগণ অবশ্যই চিন্তা করিবেন ।

বাদবিচারে সভার আবশ্যকতা নাই ; জয়-পরাজয়ের ব্যাপার না থাকার মধ্যস্থত্বও আবশ্যকতা নাই । এ বিচার অতি পবিত্র । এই বিচারের কর্তা, এই বিচারের শ্রোতা—সকলেই পবিত্র, সকলেই ধর্ম্ম । কালমাহাত্ম্যে এই বাদবিচারের অধিকারী এখন নিতান্ত ছল্ভ হইয়াছে । বাদ, জয় ও বিতণ্ডা, এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে এই বাদই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা ভগবানের বিতৃতি । তাই ভগবান্ এই বাদকেই লক্ষ্য করিয়া গীতার বলিয়াছেন,—“বাদঃ প্রবদতামহম্” । ১০।৩২। অর্থাৎ বাদ, জয় ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি বাদ । ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর’ এবং টীকাকার স্বামী শ্রীধরও ভগবদ্বাক্যের ঐরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । গোতমোক্ত পারিভাষিক বাদ শব্দই ঐ স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে । ১ ।

১। বাদোৎপত্তিনির্বন্ধহেতুবাৎ প্রবাসঃ, অতঃ সেহংবদ্বিত্তি । প্রবক্তারোহে বদনভেদানামেব বাক-ব্রহ্মবিত্ত্বানা-  
সিহ প্রবণঃ প্রবক্তাবিত্তি :—শাক্তভাষ্য । প্রবর্ততাং বাদিনাং সম্বন্ধিত্বো বাব-জয়-বিতণ্ডান্তিপ্রঃ কথাস্থঃ প্রসিদ্ধাঃ,  
ভাসাং মধ্যে বাদোহং । বাবজ বীতরাগদোঃ শিখাচার্য্যোহোরভ্যোর্কী তত্ত্বনির্ণয়পঞ্চকঃ, অতোহসৌ শ্রেষ্ঠত্বাৎ  
বদিত্বুতিরিত্যর্থঃ :—শ্রীধরশাস্ত্রীক ।

সূত্র । যথোক্তোপপন্ন-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-  
সাধনোপালম্ভো জ্ঞাপঃ ॥২॥৪৩॥

অনুবাদ । যথোক্তোপপন্ন অর্থাৎ পূর্বসূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের শব্দলভ্য যে অর্থ, সেই অর্থযুক্ত, ( পরন্তু ) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ করা হয়, ( করিতে পারা যায় ), তাহা জ্ঞান ।

ভাষ্য । যথোক্তোপপন্ন ইতি “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ,” “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ,” “পক্ষাবয়বোপপন্নঃ,” “পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহঃ” । ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ ইতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধন-মুপালম্ভচাম্পিন্ ক্রিয়ত ইতি, এবং বিশেষণো জ্ঞানঃ ।

ন খলু বৈ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনং কস্মচিদর্থস্তা সম্ভবতি প্রতিষেধার্থতৈবেবাং সামান্যলক্ষণে বিশেষলক্ষণে চ শ্রীয়াতে । ‘বচন-বিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলমিতি, ‘সাধন্য-বৈধন্যভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি’রিতি, ‘বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিচ্চ নিগ্রহস্থান’মিতি, বিশেষলক্ষণেষপি যথাস্থমিতি । ন চৈতদবিজ্ঞানীয়াং প্রতিষেধার্থতরৈবার্থং সাধনম্ভোতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালম্ভো জ্ঞান ইত্যেবমপ্যুচ্যামানে বিজ্ঞায়ত এতদिति ।

প্রমাণৈঃ সাধনোপালম্ভয়োঃ ছলজাতীনামঙ্গভাবো রক্ষণার্থত্বাৎ ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ । যৎ তৎ প্রমাণৈরর্থস্তা সাধনং তত্র ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবো রক্ষণার্থত্বাৎ, তানি হি প্রযুক্ত্যমানানি পরপক্ষ-বিঘাতেন স্বপক্ষং রক্ষন্তি । তথা চোক্তং “তদ্বাদ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জ্ঞান-বিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণব”দिति । যস্মাৎ প্রমাণৈঃ প্রতিপক্ষস্তোপালম্ভস্তস্তা চৈতানি প্রযুক্ত্যমানানি প্রতিষেধ-বিঘাতাং সহকারীণি ভবন্তি, তদেবমঙ্গীভূতানাং ছলাদীনামুপাদানং—জ্ঞানো, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ, উপালম্ভে তু স্বাতন্ত্র্যমপ্যস্তুতি ।

অনুবাদ । যথোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং



পঞ্চাবয়বযুক্ত, এমন (পূর্ববসূত্রোক্ত) পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ (অর্থাৎ পূর্ব-সূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, এই সূত্রেও তাহার যোগ করিয়া এবং তাহার যথায়োগ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া জন্মের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, মহর্ষি এই সূত্রে যথোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন)। ছলজাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ব, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, এই জন্মে ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করা হয়, করিতে পারা যায়। এইরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইলে জন্ম হয়, অর্থাৎ বাদের ন্যায় কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা এবং কতিপয় নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব হইলে অর্থাৎ ছল প্রভৃতির অব্যোজ্য হইলে তাহা জন্ম নহে। বাহাতে ছল, জাতি এবং সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করা হয়, না করিলেও করিবার যোগ্যতা থাকে, তাহাই জন্ম।

(পূর্বপক্ষ) ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা কোন পদার্থের সাধন হইতেই পারে না। ইহাদিগের সামান্য লক্ষণ এবং বিশেষ লক্ষণে অর্থাৎ মহর্ষি এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের যে সামান্য লক্ষণ এবং বিশেষ লক্ষণ-গুলি বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগের প্রতিষেধার্থতাই শ্রুত হইতেছে, অর্থাৎ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান পদার্থ সাধন করে না, উহারা সাধনের প্রতিষেধ অর্থাৎ খণ্ডনই করে, সেই খণ্ডনার্থই উহাদিগের উল্লেখ হয়, মহর্ষি-কথিত ছল প্রভৃতির লক্ষণেও সেই কথাই আছে; সুতরাং এখানে ছল প্রভৃতির দ্বারা সাধনও হয়, ইহা কিরূপে বলা হইতেছে? (মহর্ষি-কথিত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণ-সূত্র তিনটির উদ্ধার করিয়া এই পূর্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন) “বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনার দ্বারা বাদীর বাক্য-ব্যাঘাতকে ছল বলে” (১ অঃ, ২ আঃ, ১০ সূত্র)—“সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের সাহায্যে দোষ কখনকে জাতি বলে” (১ অঃ, ২ আঃ, ১৮ সূত্র)—“বিপ্রতিপত্তি ও অপ্ৰতিপত্তি অর্থাৎ যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে” (১ অঃ, ২ আঃ, ১৯ সূত্র) বিশেষ লক্ষণগুলিতেও (মহর্ষি-কথিত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষ লক্ষণগুলিতেও) ইহাদিগের যথাস্বরূপ অর্থাৎ সামান্য লক্ষণকে অতিক্রম না করিয়া প্রতিষেধার্থতাই অর্থাৎ উহারা খণ্ডনার্থ, সাধনার্থ নহে, ইহাই শ্রুত হইতেছে।

( যদি বল ) প্রতিষেধার্থতাবশতই ইহার পদার্থ সাধন করে, ইহা বুঝিবে ? অর্থাৎ এই ছল প্রভৃতি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করে বলিয়াই তদ্বারা পদার্থ সাধন করে, ইহা বুঝিবার জন্যই উহাদিগের দ্বারা সাধনের কথাও বলা হইয়াছে ? ইহাও বলা যায় না। ( কারণ ) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা বাহাতে উপালম্ব্য অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা যায়, তাহা জল্প, এইরূপ বলিলেও ইহা বুঝা যায়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথা বুকান আবশ্যক হইলেও সূত্রে ‘সাধন’ শব্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল উপালম্ব্য বলিলেও তাহার চরম ফল চিন্তা করিয়া উহা বুঝা যায়।

( উত্তর ) প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পদ্ধতিবোধের মূলীভূত প্রমাণ-সমূহের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব্যে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গভাব অর্থাৎ আবশ্যকতা আছে। কারণ, উহার রক্ষার্থ, স্বতন্ত্র ইহাদিগের সাধনই নাই। বিশদার্থ এই যে, প্রমাণের দ্বারা পদার্থের সেই যে ( মহর্ষি-সূত্রোক্ত ) সাধন, তাহাতে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গই আছে ; কারণ, তাহার রক্ষার্থ, সেই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রযুক্ত্যমান হইয়া পরপক্ষ বিঘাতের দ্বারা অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়া স্বপক্ষ রক্ষা করে। মহর্ষি গৌতম সেই প্রকারই বলিয়াছেন,—“তব্বনিশ্চয় রক্ষার জন্ম জল্প ও বিতণ্ডা আবশ্যক, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুর বা ক্ষুদ্র বৃক্ষ রক্ষার জন্ম কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ আবশ্যক।”—( ৪ অঃ, ২ আঃ, ৫০ সূত্র )। আবার প্রমাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ প্রতিপক্ষ স্থাপনার এই যে উপালম্ব্য, তাহার সম্বন্ধেও এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রযুক্ত্যমান হইয়া প্রতিষেধের বিঘাত করায় অর্থাৎ প্রতিবাদীর খণ্ডনের খণ্ডন করে বলিয়া ( প্রমাণের ) সহকারী হয়। অর্থাৎ এই প্রকারেও ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, সাধন ও উপালম্ব্যের অঙ্গ হয়। সুতরাং এই প্রকারে অঙ্গীভূত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের জন্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ইহাদিগের সাধনই নাই অর্থাৎ ইহার স্বতন্ত্রভাবে সাধন করিতে পারে না। উপালম্ব্যে কিন্তু ( ইহাদিগের ) বাতন্ত্যও আছে।

টিপ্পনী। বাদ-লক্ষণের পরে ক্রমান্বয়ে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা জন্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্বসূত্রে “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব্যঃ” ইত্যাদি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, তাহা এই সূত্রে যোগ করিয়া জন্মের লক্ষণ বুঝিতে হইবে—এই তাৎপর্য্যে এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন, “বথোকোপপন্নঃ”। ভাষ্যকারও ঐ “বথোকোপপন্নঃ” এই কথার উল্লেখ পূর্বক তাহার অর্থ ব্যাখ্যার



জন্ম মহাবির পূর্বস্বত্রোক্ত চারিটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পরে এই স্বত্রোক্ত “ছল-জাতিনিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্বঃ” এই অতিরিক্ত কথাটির উল্লেখ করিয়া স্বত্রার্গ বর্ণন করিয়াছেন যে, জন্মে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করা হয়; সুতরাং এইরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া জন্ম হয়। অর্থাৎ পূর্বস্বত্রোক্ত চারিটি বাক্যের বাহা শব্দলভ্য অর্থ, তদ্বিশিষ্ট হইয়া বাহা ছল, জাতি ও সর্ববিধ নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্বের যোগ, এমন কথাই জন্ম। বাদ এরূপ নহে, সুতরাং বাদ ইহাতে জন্ম বিশিষ্ট।

উদ্যোতকর মহাবির-স্বত্রের ‘যথোক্তোপপন্নঃ’ এই কথা অবলম্বন করিয়া পূর্বপক্ষ ধরিয়াছেন যে, পূর্বস্বত্রে বাদলক্ষণে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এই স্বত্রে জন্মলক্ষণে তাহা বলা যাইতে পারে না। পূর্বস্বত্রে দুইটি কথার দ্বারা বাদবিচারে নিগ্রহস্থানবিশেষের নিয়ম করা হইয়াছে, জন্মে তাহার নিয়ম নাই। জন্মে সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। এবং জন্মে ছল ও জাতির দ্বারাও সাধন ও উপালম্ব করা যায়। কিন্তু পূর্বস্বত্রোক্ত “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ” এই কথার তাৎপর্যার্থ ইহার বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্বস্বত্রোক্ত কথাগুলি যে তাৎপর্য্যে বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই স্বত্রে ঐ সকল কথার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। তবে মহাবির এই স্বত্রে যথোক্তোপপন্নঃ, এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্বস্বত্রোক্ত প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ ইত্যাদি বাক্যের বাহা শব্দলভ্য অর্থ, তাহা জন্মে অসম্ভব নহে। পূর্বস্বত্রে ঐ সকল কথার দ্বারা যে সকল অর্থ সূচিত হইয়াছে, তাহা জন্মলক্ষণের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ঐ সকল অর্থলভ্য অর্থ এখানে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং শব্দলভ্য অর্থমাত্রই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই মহাবির তাৎপর্য্য। উদ্যোতকর কথাদেব দুইটি স্বত্র উদ্ধৃত করিয়া স্ববি-স্বত্রে যে এরূপ তাৎপর্য্যে কথা বলা অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়, ইহা দেখাইয়া তাহার উত্তরপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, ইহাই মনে করিয়া উদ্যোতকর শেষে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা স্বত্রে “যথোক্তোপপন্নঃ” এই বাক্যটি মধ্যপদলোপী সমাস। যেমন গোয়ুক্ত রথ, এই অর্থে “গোরথ” এই প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকরের অতিপ্রায় এই যে, পূর্বস্বত্রে যথোক্ত পদার্থগুলির মধ্যে জন্মে বাহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত বা সম্ভব, জন্ম তাহার দ্বারা উপপন্ন কি না যুক্ত, ইহাই যথোক্তোপপন্ন এই কথার দ্বারা মহাবির বলিয়াছেন। মধ্যপদলোপী সমাসে একটি “উপপন্ন” শব্দের লোপ হইয়াছে। তবে ভাষ্যকার পূর্বস্বত্রের বাদ-লক্ষণের ঐ সকল কথা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া এই স্বত্রের যথোক্তোপপন্ন এই কথার ব্যাখ্যা করিলেন কেন? তিনি ত উহার মধ্যে বাহা উপপন্ন, তাহাই জন্মলক্ষণে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা বলেন নাই? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যথাক্রমে পূর্বস্বত্রের পাঠ জ্ঞাপনই ঐ স্থলে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। ঐ স্বত্রপাঠের মধ্যে জন্মে বাহা উপপন্ন হয়, তাহাই জন্মে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, জন্মলক্ষণের অহুত্বল যে পাঠক্রম, তাহাই ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, উহা হইতে পদার্থস্বরূপ অর্থাৎ শব্দলভ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা



পূর্বসূত্রের দ্বারা অর্থলভ্য অর্থ এখানে বুদ্ধিতে হইবে না, তাহা উহা দ্বারা এখানে বুঝা যায় না।  
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত মধ্যপদলোপী সমাস পক্ষ আশ্রয় করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।  
ভাষ্যকার ঐরূপ কোন কথা না বলায় উদ্যোতকরের প্রথম পক্ষই তাঁহার অভিপ্রেত মনে হয়।  
মধ্যপদলোপী সমাসই মহাবির অভিপ্রেত থাকিলে তিনি “উক্তোপপন্নঃ” এইরূপ কথাই বলেন নাই  
কেন? বলা শব্দের প্রয়োগ কেন? ইহাও চিত্তনীয়। মধ্যপদলোপী সমাসে সূত্রস্থ “উপপন্ন” শব্দটি  
কোন অর্থে প্রযুক্ত, ইহাও চিত্তনীয়। সূত্রীগণ সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রায় চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, সূত্রে যে  
ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সংগত হয় না।  
কেন না, ছল প্রভৃতির দ্বারা কেবল উপালম্ব বা প্রতিষেধই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইতে  
পারে। উহাদিগের সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণেও তাহাই বলা হইয়াছে। ফলকথা, পরপক্ষ-  
সাধনের খণ্ডন করিতেই উহাদিগের প্রয়োগ করা হয়, উহাদিগের দ্বারা পদার্থ সাধন বা পক্ষ  
স্থাপন হইবে কিরূপে? তবে যদি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়াই পরস্পর উহার স্বপক্ষের  
সাধক হয়, এই কথা বলিতে হয়, তাহা হইলেও সূত্রে সাধন শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনই  
প্রয়োজন নাই; ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালম্ব, এইরূপ কথা বলিলেই তাহা বুঝা যায়।

এতদন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করিতে ছল, জাতি ও  
নিগ্রহস্থান অঙ্গ হইয়া থাকে। উহার সাধনেও অঙ্গ হয়। কারণ, স্বপক্ষ রক্ষার জন্য অনেক  
সময়ে উহাদিগের আশ্রয় করিতে হয়। মহর্ষি নিজেও তদনিষ্ঠার সংরক্ষণের জন্য ছলাদিযুক্ত  
জ্ঞান ও বিতণ্ডার আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। সূত্রায় ছল প্রভৃতি বখন পরপক্ষ স্থাপনের ব্যাঘাত  
জন্মাইয়া স্বপক্ষ স্থাপনকে রক্ষা করে, তখন স্বপক্ষস্থাপনরূপ সাধনেও ইহার অঙ্গ। ইহার স্বতন্ত্র  
ভাবে পদার্থ সাধন করিতে না পারিলেও ঐ ভাবে পদার্থ সাধন করে এবং প্রমাণের দ্বারা বখন  
পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা হয়, তখন ইহার প্রমাণের সহকারী হয়। ফলকথা, জ্ঞানে পূর্বোক্ত  
প্রকারে সাধন ও উপালম্বের অঙ্গীভূত ছল প্রভৃতির গ্রহণ করা হইয়াছে। উহার স্বতন্ত্রভাবে  
পদার্থ সাধন করে না, তাহা বলাও হয় নাই। তবে উহার স্বতন্ত্র ভাবে উপালম্ব করিতে পারে।  
উদ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারের কথা গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে, ছল, জাতি  
প্রভৃতি বখন অসমুদ্র, তখন তাহা কোনরূপেই সাধন বা উপালম্বের অঙ্গ হইতে পারে না।  
জিগীষাপরতত্ত্বাবশতঃ পরপক্ষ স্থাপনকে ব্যাহত করিব, এই বুদ্ধিতেই ছল প্রভৃতির প্রয়োগ  
করিয়া থাকে এবং ছল প্রভৃতির দ্বারা মন জন্মাইয়া অনেক সময়ে জয়লাভ করে। বস্তুতঃ  
উহাদিগের দ্বারা কোন পক্ষের সাধন বা খণ্ডন হয় না, প্রমাণ ও তর্ক বাতীত তাহা আর  
কিছুর দ্বারা হইতেও পারে না। তবে ছল প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে তাহা বাদ হইবে না,  
ইহা জানাইতেই মহর্ষি এই সূত্রে ছল প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, মহর্ষিসূত্রে ছল, জাতি প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালম্বের  
কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। এবং ছলাদিযুক্ত জ্ঞান ও বিতণ্ডার দ্বারা তৎ নিষ্ঠার রক্ষা হয়, ইহাও



মহর্ষি নিজে বলিয়াছেন। সুতরাং ছল প্রভৃতি কোনরূপে সাধন ও উপালম্বের অঙ্গই হয় না, এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অবশ্য উহার অসচ্ছত্রই বটে, অসচ্ছত্রগুলির বাস্তব পক্ষে কোন সাধন বা উপালম্বের ক্ষমতা নাই, ইহাও সত্য, কিন্তু মহর্ষি যে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা কি উত্তর পক্ষেই হইয়া থাকে? এক পক্ষ প্রমাণভাস ও তর্কভাসকে প্রমাণ ও তর্করূপে গ্রহণ করিয়াই যখন সাধন ও উপালম্ব প্রবৃত্ত হন এবং তাহার দ্বারা বস্তুতঃ সাধন ও উপালম্ব না হইলেও যখন মহর্ষি তাহা বলিয়াছেন, তখন সেই ভাবে ছল প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালম্বের কথাও বলিতে পারেন। জল্পবিচারে এক পক্ষ প্রমাণভাস বলিয়া জানিয়াও তাহাকে প্রমাণ বলিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। কিন্তু বাদে কোন বাদীই তাহা করিতে পারেন না, অপ্রমাণকে নিজে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়া তাহার প্রয়োগ করিতে পারেন না; কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি বাদে অনধিকারী। তাহা হইলে এখন মূল কথা এই যে, বাহ্য বস্তুতঃ প্রমাণ ও তর্ক নহে, বস্তুতঃ দ্বার সাধন ও যখনে ক্ষমতাই নাই, এক পক্ষ যখন তাহার দ্বারাও সাধন ও উপালম্ব করেন, নচেৎ বিচারই হইতে পারে না; মহর্ষির প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথাও নিতান্ত অসংগত হইয়া পড়ে, তখন ছল প্রভৃতিকে ভাষ্যকার যে ভাবে সাধন ও উপালম্বের অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহা অসংগত হইবে কেন? যে কোনরূপেই যদি উহার স্বপক্ষ সাধনের সহায়তা করিল, তাহা হইলে উহার একেবারে সাধনের রাজ্য হইতে নির্দ্বাপিত হইবে কেন? সাধন ও উপালম্ব ইহাদিগের দ্বারা বস্তুতঃই হয় কি না, তাহা দেখিতে হইলে প্রমাণভাসের দ্বারাও তাহা হয় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পরন্তু ভাষ্যকার ইহাদিগকে প্রকৃত প্রমাণের সহকারীও দেখাইয়াছেন। সেখানে সহকারিরূপে ইহার বস্তুতঃই সাধন ও উপালম্বের অঙ্গ হয়। প্রমাণভাস কোন দিনই তাহা হইতে পারে না, তবে সাধন ও উপালম্ব হইয়াছে বলিয়া অনেক সময়ে অনেক স্থলে প্রতিপন্ন করিতে পারো। সেই ভাবের সাধন ও উপালম্বও যদি বাধ্য হইয়া এখানে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ছলাদির দ্বারাও তাহা হয়। ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে ছলাদিও তাহার অঙ্গ হইতে পারে। সুশীল এ কথাগুলিও ভাবিয়া বিচার করিবেন।

পরবর্তী কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক এই দ্বন্দ্ব সাধন ও উপালম্ব, এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া সাধনের উপালম্ব—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই ভাষ্যক পূর্বপক্ষের সমাধান করিতে গিয়াছেন।

এই জল্পবিচারে সভার অপেক্ষা আছে। কারণ, ইহা বিতণ্ডার দ্বার জিগীষুর বিচার; ইহাতে পক্ষপাতাদি-দোষ-শূন্য উত্তর পক্ষের স্বীকৃত স্থপতিত মধ্যস্থ আবশ্যক। বিধনাথ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে জনসমূহের মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কোনও উপযুক্ত ব্যক্তি বা ঐরূপ ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ থাকেন এবং আরও সভা পুরুষ থাকেন, সেই জনসমূহের নাম সভা। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে জল্প-বিচার করিতে হইবে।



প্রথমতঃ (১) বাদী প্রমাণের উল্লেখ পূর্বক তাহার স্বপক্ষস্থাপন করিবেন, অর্থাৎ তাহার স্বপক্ষে পক্ষাবরূপ স্থায় প্রয়োগ করিয়া তাহার হেতুর নির্দোষত্ব প্রদর্শন করিবেন অর্থাৎ সামান্ততঃ তাহার হেতু হেতুভাঙ্গন নহে এবং বিশেষতঃ তাহার হেতু বিকল্প নহে, ব্যভিচারী নহে, ইত্যাদি প্রকারে সম্ভাব্যমান দোষের নিরাকরণ করিবেন। তাহার পরে (২) প্রতিবাদী বাদীর কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বাদীর কথার অমূল্যবাদ করিয়া হেতুভাঙ্গন ভিন্ন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন; তাহার উদ্ভাবন সম্ভব না হইলে হেতুভাঙ্গনের উদ্ভাবন-পূর্বক বাদীর সাধনে দোষ প্রদর্শন করিয়া শেষে স্বপক্ষের স্থাপনা করিবেন। পরে (৩) বাদীও ঐ প্রকারে প্রতিবাদী বাহা বলিয়াছেন, তাহার অমূল্যবাদ করিবেন। কারণ, তিনি প্রতিবাদীর কথা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে; না বুঝিয়া দোষ প্রদর্শন করিলে পরে তাহা টিকে না, পরন্তু তাহাতে প্রকৃত কার্য্যে অনেক সময়নাশ হয় এবং না বুঝিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে গাইরাই বিচারে প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতক এবং সভাগণের বিরক্তিকর বহু অনর্থ উপস্থিত করা হয়। সুতরাং বাদীও প্রতিবাদীর জ্ঞান প্রতিবাদীর কথার অমূল্যবাদ করিয়া, তিনি প্রতিবাদীর কথা বুঝিয়াছেন, ইহা অগ্রে প্রতিপন্ন করিবেন। পরে তাহার স্বপক্ষ-সাধনে প্রতিবাদী-প্রদর্শিত দোষগুলির উদ্ধার করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডন করিবেন, অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষস্থাপনার প্রথমতঃ অন্তর্বিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে হেতুভাঙ্গনের উদ্ভাবন করিবেন। এই প্রণালী অমূল্যদ্বারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বমতে দোষের উদ্ধার বা পরমতে দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন। বিচারকালে যিনি এই প্রণালীর কোনরূপ উল্লঙ্ঘন করেন অথবা অসময়ে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতে হয়, তদুত্তর সময়ে দোষ প্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত বা পরাজিত হন। তিনি যথার্থরূপে স্বপক্ষ সমর্থন করিলেও ঐ দোষে সেখানে নিগৃহীত বা পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। সভাপতি ও মধ্যস্থ সেই পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন। বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণ বিচারের যে নিয়ম বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক ভাবনা উপস্থিত হয় এবং তাহার বিচারের যে অধিকারী নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও ভাবনা বাড়িয়া যায়। তাহার যে সত্যের অন্বেষণের জন্তই কেবল ভাবিতেন, কৃতক, কলহ-কোলাহলে মত্ত হইয়া নৈরাসিকের বর্তমান অপবাদের বোঝা বহন করিতেন না, বাহাতে বিচারকালে কোনরূপে নীতি লঙ্ঘন না হয়, সত্যের পাছে পাছে বাওয়া হয়, চরিত্রের মালিন্য আরও বাড়িয়া না যায়, নিয়মের বন্ধনে চিত্ত, বাক্য, বুদ্ধি সংযত হয়, তাহা বুঝিতেন ও ভাবিতেন, ইহা তাহাদিগের কথাগুলি ভাবিলে জ্বলিতে পারা যায় না। এখন তাহারও নাই, তাহাদিগের নিয়মাদ্বারা বিচারকদিগকে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত নেতাও নাই। নেতা থাকিলে বা উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকিলে এখনকার প্রায় সকল বিচারকই পদে পদে নিগৃহীত হইতেন। এখন সকলেই বিচারক; কিন্তু বিচারের শাস্ত্রোক্ত নিয়মাদি অনেকেই জানেন না, জানিলেও মানেন না ॥ ২ ॥



সূত্র । সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ॥ ৩ ॥৪৪॥

অনুবাদ । সেই জল্প, প্রতিপক্ষের স্থাপনামূল্য হইয়া বিতণ্ডা হয় ।

ভাষ্য । স জল্পো বিতণ্ডা ভবতি, কিংবিশেষণঃ ? প্রতিপক্ষস্থাপনয়া হীনঃ । যৌ তৌ সমানাধিকরণৌ বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষ-বিত্যুক্তং, তয়োরেকতরং বৈতণ্ডিকৌ ন স্থাপয়তীতি, পরপক্ষপ্রতিষেধ-নৈব প্রবর্তত ইতি । অস্ত্ব তর্হি সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা ?—যদৈ খলু তৎপরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণং বাক্যং স বৈতণ্ডিকস্ত পক্ষঃ, ন ত্বসৌ কক্ষিদর্থং প্রতিজ্ঞায় স্থাপয়তীতি, তস্মাদ্ধধান্যাসমেবাস্ত্বিতি ।

অনুবাদ । সেই অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত জল্প—বিতণ্ডা হয় । ( প্রশ্ন ) কি বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া ? অর্থাৎ জল্প হইতে বিতণ্ডার যখন ভেদ আছে, তখন জল্পকেই বিতণ্ডা বলা যায় না ; তাহা বলিতে হইলে কোন বিশেষণ অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহার দ্বারা বিতণ্ডাতে জল্পের ভেদ বুঝা যায় ; সুতরাং প্রশ্ন এই যে, কোন বিশেষণযুক্ত হইয়া জল্প বিতণ্ডা হইবে ? ( উত্তর ) প্রতিপক্ষের স্থাপনামূল্য হইয়া । সমানাধিকরণ অর্থাৎ একই আধারে বিভিন্নবাদীর স্বীকৃত সেই যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে, সেই দুইটির একটিকে অর্থাৎ যেটি প্রতিবাদী বৈতণ্ডিকের পক্ষ, কিন্তু বাদীর প্রতিপক্ষ, সেই ধর্মটিকে বৈতণ্ডিক সংস্থাপন করেন না অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা সাধন করেন না । পরপক্ষ-প্রতিষেধের দ্বারাই অর্থাৎ স্বপক্ষস্থাপনকারী বাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডনের দ্বারাই প্রবৃত্ত হন ( অর্থাৎ আত্মপক্ষের স্থাপনা না করিয়া কেবল পরপক্ষ স্থাপনকেই খণ্ডন করিব, তাহার হেতুর দোষ প্রদর্শন করিব, এই বুদ্ধিতেই বৈতণ্ডিকের বিচার-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ) ।

( পূর্বপক্ষ ) তাহা হইলে “সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা” এইরূপই সূত্র হউক ? অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যখন কোন পক্ষ স্থাপন করেন না, তখন তাঁহার কোন পক্ষই নাই, ইহা বলিতে হইবে । কারণ, যাহার স্থাপন হয় না, তাহা পক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং সূত্রে “প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন” না বলিয়া “প্রতিপক্ষহীন” এই কথা বলিলেই চলে এবং সূত্রকে স্বলক্ষ্য করিবার জন্য ঐরূপ বলাই উচিত ।

( উত্তর ) সেই যে পরপক্ষপ্রতিষেধরূপ অর্থাৎ পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনরূপ বাক্য, তাহা বৈতণ্ডিকের পক্ষ, অর্থাৎ উহার দ্বারা তাঁহার পক্ষ সিদ্ধি হইবে মনে



করিয়াই বৈতণ্ডিক স্বপক্ষস্থাপন না করিয়া ঐ পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন, সুতরাং তাঁহার ঐ বাক্যই সেখানে তাঁহার পক্ষসিদ্ধির অভিমত উপায় বলিয়া পক্ষ। বৈতণ্ডিক কোন পদার্থকে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না, অতএব (সূত্র) যথাপাঠই থাকিবে, অর্থাৎ “সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা” এইরূপ যে সূত্র মহর্ষির উপন্যস্ত আছে, তাহাই থাকিবে। বৈতণ্ডিকের যখন পক্ষ থাকে, তখন “সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা” এইরূপ সূত্র মহর্ষি বলিতে পারেন না এবং সেই জন্তই তাহা বলেন নাই।

টিপ্পনী। বাদীর পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিবাদীর নিজের পক্ষই এখানে প্রতিপক্ষ। বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী যদি তাহার স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনেরই খণ্ডন করেন এবং তাহা যদি জন্মের অন্ত্যস্ত সকল লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিচার বিতণ্ডা হইবে। যদিও বাদীর পক্ষও প্রতিবাদীর পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিপক্ষ-শব্দবাচ্য, কিন্তু বাদী যদি প্রথম কোন পক্ষ স্থাপনই না করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী কিসের খণ্ডন করিবেন? তাঁহার খণ্ডনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং এখানে প্রতিপক্ষ বলিতে প্রতিবাদীর পক্ষই বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত জন্ম প্রতিপক্ষ-স্থাপনানুষ্ঠান হইলে বিতণ্ডা হয়, মহর্ষির এই কথার দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত জন্ম উভয় পক্ষের স্থাপনা থাকা চাই, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি পূর্বস্বত্রে ইহা না বলিলেও এই স্বত্রের দ্বারা তাহা সূচনা করিয়াছেন। এই স্বত্রে ‘প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন’ এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তিনি জন্ম হইতে বিতণ্ডার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত জন্মকেই প্রকাশ করিয়া বিতণ্ডার জন্মের অন্ত্যস্ত লক্ষণ থাকা চাই, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাব্যকারও প্রতিপক্ষ-স্থাপনা-হীনস্বরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট জন্মকেই বিতণ্ডা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে বিতণ্ডা যে বস্তুতঃ জন্মবিশেষ, ইহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, বিতণ্ডার জন্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ নাই। প্রতিপক্ষের স্থাপনা ভিন্ন বিতণ্ডার জন্মের আর সমস্ত লক্ষণই থাকা চাই, ইহা বলিবার জন্তই মহর্ষি ঐরূপ সূত্র বলিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, স্বত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত জন্মের একদেশই গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ জন্মলক্ষণে যে ‘উভয়পক্ষ-স্থাপনানুষ্ঠান’ এই কথাটি বলিতে হইবে, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জন্মের অন্য অংশকে দূরা হইয়াছে। কারণ, উভয়পক্ষ-স্থাপনানুষ্ঠানকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলা যায় না, উহা অযোগ্য বাক্য হয়।

তৎ-শব্দের দ্বারা ঐরূপ একদেশ গ্রহণ হইতে পারিলেও ভাব্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ এখানে ঐ কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা সুধীগণের চিন্তা করা উচিত। মহর্ষি পূর্বস্বত্রে জন্মলক্ষণে ‘উভয়পক্ষস্থাপনানুষ্ঠান’ এইরূপ কথা বলেন নাই। এই স্বত্রে বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলার জন্ম যে উভয় পক্ষের স্থাপনানুষ্ঠান, ইহা সূচিত হইয়াছে। পূর্বস্বত্রে জন্মকে বৈরূপ বলিয়াছেন, এই স্বত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা যদি তাহাই মাত্র বুদ্ধি হয়, যদি এই স্বত্রের দ্বারা সূচিত নিরূপ লক্ষণাক্রান্ত জন্মই তাঁহার বুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মহর্ষি তাহাকে



প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিতে পারেন। কারণ, পূর্বসূত্রে জল্পকে বোঝা যায় তাহা উভয় পক্ষস্থাপনাত্মকও হইতে পারে, প্রতিপক্ষস্থাপনাত্মকও হইতে পারে। মহর্ষি উক্তি-কোশলে পরসূত্রে দ্বারা জল্পের নিরূপিত লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। পূর্বসূত্রে কোন বাক্যের দ্বারা জল্পকে উভয়পক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিলে পরসূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা তাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিতে পারেন না। বাহাকে উভয়পক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিলেন, তাহাকেই আবার পরসূত্রেই প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিবেন কিরূপে? সুতরাং মহর্ষি উক্তি-কোশলে বাক্যসংক্ষেপ করিবার জন্য পরসূত্রেই জল্পের নিরূপিত লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। ফলকথা, এই সূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্র-কবিতা সেই সেই বর্ণ্যবিশিষ্টকেই যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলা যায়। নিরূপিত জল্পলক্ষণাত্মক পদার্থকে গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলা যায় না। মহর্ষি তৎ-শব্দের দ্বারা এখানে তাহাকে বুঝিয়া করিয়াছেন, সুধীগণ তাহা ভাবিয়া দেখুন। শ্রুতবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় নিরূপিত সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতণ্ডিক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে প্রতিপক্ষহীন বিচারকেই বিতণ্ডা বলিতেন। তাঁহাদিগের কোন পক্ষ না থাকার বৈতণ্ডিকের কোন পক্ষই নাই, এইরূপ কথা তাঁহারা বলিতেন। এ কথা প্রথম সূত্রভাষ্যে বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিকের কোন পক্ষই নাই, প্রতিপক্ষহীন বিচারই বিতণ্ডা, এই মত ভাষ্যকারের পূর্ব হইতেই সম্প্রদায়বিশেষে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্যোতকরও ঐ মতকে উল্লেখ করিয়া ইহা কোন সম্প্রদায় বলেন—এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্ত মতবাদী সম্প্রদায়বিশেষ মহর্ষি গোতমোক্ত বিতণ্ডা-সূত্রে স্থাপনা শব্দ নিরর্থক, এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেন। সেই জন্যই ভাষ্যকার এখানে সেই কথার উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া সূত্রোক্ত স্থাপনা শব্দের সার্থকতা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, বৈতণ্ডিকের পক্ষ আছে, তাহাকেই বলে প্রতিপক্ষ; সুতরাং প্রতিপক্ষহীন বিচারকে বিতণ্ডা বলা যায় না। প্রতিপক্ষহীন কোন বিচারই হইতে পারে না। বৈতণ্ডিকের অন্তর্নিহিত পক্ষকে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না। পরপক্ষ-স্থাপনার খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া বাইবে, ইহা মনে করিয়াই বৈতণ্ডিক কেবল পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন। ফলকথা, বিতণ্ডা প্রতিপক্ষের স্থাপনাত্মক, কিন্তু প্রতিপক্ষহীন নহে; সুতরাং মহর্ষি বোঝা যায় তাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ থাকার "সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা" এইরূপ সূত্র বলা যায় না, তাই মহর্ষি তাহা বলেন নাই।

ভাষ্যকার এখানে বৈতণ্ডিকের পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনরূপ বাক্যকে বৈতণ্ডিকের পক্ষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিকের সেই বাক্যই তাহার পক্ষ নহে। ভাষ্যকার সেই বাক্যে পক্ষ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াই এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বৈতণ্ডিক তাহার অন্তর্নিহিত স্বপক্ষ সিদ্ধির জন্যই পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডন করেন, নচেৎ তিনি কখনই তাহা করিতে বাইতেন না। বৈতণ্ডিক তাহার বাক্যকেই স্বপক্ষের সাধক বা জ্ঞাপক

মনে করেন এবং তাঁহার ঐ বাক্যের দ্বারা ই বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, ইহা অনুমান করা যায়। এ জন্ত বৈতণ্ডিকের সেই বাক্যকেই তাঁহার পক্ষ বলা হইয়াছে। অর্থবিশেষ জ্ঞাপনের জন্ত এইরূপ গোপ প্রয়োগ অনেক স্থানেই দেখা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে “যদৈ ধনু” এই স্থলে ‘ঐ’ শব্দের দ্বারা পূর্বপক্ষের অযুক্ততা সূচিত হইয়াছে। ধনু শব্দটি হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে হেতু বৈতণ্ডিকের পক্ষ আছে, অতএব পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ অযুক্ত। বিতণ্ডা নথ্যে অজ্ঞাত কথা প্রথম স্তম্ভভাষ্যে বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্তাঃ হেতুবদাভাস-  
মানাঃ। ত ইমে।

সূত্র। সব্যভিচার-বিরুদ্ধ প্রকরণ-সমসাধ্যসম-  
কালাতীত হেতুভাষাঃ ॥৪॥৪৫॥

অনুবাদ। হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু অর্থাৎ প্রকৃত হেতু নহে, হেতুর সামান্ত অর্থাৎ কোন সামান্ত ধর্ম বা সাদৃশ্য থাকায় হেতুর তায় প্রকাশমান অর্থাৎ যাহা এইরূপ পদার্থ, তাহা হেতুভাষ্য।

সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত এই হেতুভাষ্য (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম, (৫) কালাতীত—অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচ প্রকার।

বিস্তৃতি। অনুমান করিতে হইলে হেতু আবশ্যক। যেখানে যে পদার্থকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেই পদার্থ যদি বস্তুতঃ হেতু হয়, প্রকৃত হেতু হয়, তবেই সেখানে অনুমান খাটি হইতে পারে। যে পদার্থে হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকে অর্থাৎ যে সকল ধর্ম থাকিলে তাহাকে হেতু বলা যায়, তাহা থাকে, তাহাই প্রকৃত হেতু, তাহাই সাধ্যের সাধন। যাহা বস্তুতঃ সাধ্যের সাধন, তাহাই বস্তুতঃ হেতু। যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহা সাধ্যসাধন নহে, তাহা হেতু নহে। তবে তাহা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে হেতুর কোন সামান্ত ধর্ম বা সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর তায় প্রতীয়মান হয়; এ জন্ত অনেক সময়ে তাহাকে হেতু বলিয়া ভ্রম হয়, সুতরাং তাহার নাম হেতুভাষ্য। পরবর্তী কালে ইহাকে ছষ্ট হেতুও বলা হইয়াছে। এই হেতুভাষ্য বা ছষ্ট হেতু মহর্ষি গোতম পঁচটি নামে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম (১) সব্যভিচার। সব্যভিচার বলিলে বুঝা যায়, ব্যভিচার সহিত অর্থাৎ ব্যভিচারযুক্ত বা ব্যভিচারী। ব্যভিচার বলিতে কোন নিয়মবিশেষ না থাকা। বি—বিশেষতঃ, অভি—উভয়তঃ, চার—গতি (স্বত্ব)। অর্থাৎ যাহার গতি বা স্বত্ব কোন বিশেষ উভয় স্থানে আছে, তাহা ব্যভিচারী।



কোন পদার্থে যে পদার্থকে সাধন বা অনুমান করিতে হইবে, সেই অনুমানের পদার্থটিকে সাধ্য বলা যায়। তাহা সেই সাধ্যযুক্ত স্থান এবং সেই সাধ্যশূন্য স্থান, এই উভয় স্থানেই থাকে, তাহা ঐ সাধ্যের ব্যভিচারী পদার্থ; তাহা দেখানে সাধ্যসাধন হয় না। এ জন্য তাহা দেখানে প্রকৃত হেতু নহে, তাহা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। যেমন যদি কেহ হস্তীর অনুমানে অশ্বকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেখানে অশ্ব সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। কারণ, অশ্ব হস্তিযুক্ত স্থানেও থাকে এবং হস্তিশূন্য স্থানেও থাকে। অশ্ব থাকিলেই দেখানে হস্তী থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং অশ্ব হস্তিরূপ সাধ্যের সাধন হয় না, উহা ঐ স্থলে হেত্বাভাস। আবার অশ্বের অনুমানে পূর্ণোক্ত প্রকারে হস্তীও সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। হস্তীও অশ্বের সাধন হয় না। আবার কেহ যদি দাতৃত্বের অনুমানে ধনিষকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, অথবা ধনিষের অনুমানে দাতৃত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ উভয় স্থলেই উহা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইবে। কারণ, ধনী মাত্রই দাতা নহে এবং দাতা মাত্রই ধনী নহে। ধনিষ দাতা ও অদাতা—উভয়েই আছে এবং দাতৃত্বও ধনী ও দরিদ্র—উভয়েই আছে।

আবার শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসক যদি বলেন—শব্দ নিত্য। কারণ, শব্দ স্পর্শশূন্য; শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কোন স্পর্শ শব্দে নাই; স্পর্শশূন্য পদার্থ হইলেই তাহা নিত্য পদার্থই হয়, যেমন আত্মা এবং স্পর্শযুক্ত পদার্থ হইলেই তাহা অনিত্য হয়, যেমন ফল, জল প্রভৃতি। শব্দ যখন স্পর্শশূন্য, তখন শব্দ নিত্য পদার্থ। এখানে মীমাংসকের গৃহীত স্পর্শশূন্যতা শব্দের নিত্যত্বানুমানে হেতু হয় না। কারণ, ঐ স্পর্শশূন্যতা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত আত্মা প্রভৃতি পদার্থেও আছে, আবার অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি পদার্থেও আছে। স্পর্শশূন্য হইলেই তাহা নিত্য পদার্থ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই; সুতরাং ঐ স্থলে স্পর্শশূন্যতা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস।

দ্বিতীয়টির নাম (২) বিরুদ্ধ। তাহা সাধ্য পদার্থকে বিশেষরূপে বন্ধ করে, ব্যাক্ত করে, অর্থাৎ সাধ্যযুক্ত কোন স্থানেই না থাকিয়া কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, তাহা সাধ্যের বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। ইহা সাধ্যের সাধন না হইয়া সাধ্যের অভাবেরই সাধন হয়, সুতরাং স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষরূপ সাধ্যকেই ব্যাহত করে। যেমন যদি কেহ বলেন,— এই জগৎ একেবারে বিনষ্ট হয় না, ইহার অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র। কেন না, এই জগৎ নিত্য পদার্থ নহে, ইহা চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে অবস্থারই হউক, এই জগৎ থাকে, ইহার একেবারে নাশও হয় না। এখানে ফলতঃ জগৎ নিত্য, ইহাই বলা হইল। কারণ, বাহার নাশ নাই, এমন ভাব পদার্থ নিত্যই হয়; কিন্তু এখানে পূর্বে যে অনিত্যত্ব হেতু বলা হইয়াছে, তাহা এই নিত্যত্ব সাধ্যের বিরুদ্ধ। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একাধারে কখনই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঐ অনিত্যত্ব হেতু, জগতের নিত্যত্বরূপ সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষকে ব্যাহত করিবে। যে অনিত্যত্ব হেতু কোন কালে জগতের নাস্তিই সাধন করে, তাহা জগতের সদাভাব বা সর্বকালে বিদ্যমানতারূপ নিত্যত্বের অনুমানে কখনই কোন পক্ষে হেতু হইতে



পারে না। কারণ, যে অনিত্যকে পূর্বে সাধকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সাধক না হইয়া বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষ নিত্যত্বের বাধকই হয়; সুতরাং ঐ স্থলে অনিত্যত্ব জগতের সদাতনত্বের অল্পমানে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ। যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, এমন পদার্থই সদাতন, এই সিদ্ধান্ত যিনি স্বীকার করেন, তিনি 'এই পৃথিবী জন্ত পদার্থ অর্থাৎ ইহার উৎপত্তি হইয়াছে; কারণ, ইহা সদাতন,' এইরূপে পৃথিবীতে জন্তত্বের অল্পমানে যদি সদাতনত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ স্থলে উহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ হইবে। কারণ, সদাতনত্ব জন্তত্বের বিরুদ্ধ; যাহার উৎপত্তি নাই, তাহাই ত সদাতন বলিয়া স্বীকৃত। পৃথিবীকে সদাতন বলিয়াও জন্ত বলিলে ঐ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়। স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইলে তাহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ হইবে।

চতুর্থটির নাম (১) প্রকরণ-সম। বাদী ও প্রতিবাদী যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের প্রকরণ বা প্রস্তাব করেন, তাহাই এখানে প্রকরণ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ যাহাকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে প্রকরণ। যেমন শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব। যাহা হইতে এই প্রকরণ সথক্কে চিন্তা জন্মে অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে সংশয় জন্মে, এমন পদার্থ হেতুরূপে গ্রহণ করিলে ঐ পদার্থ প্রকরণ-সম নামক হেতুভাঙ্গ। যেমন একজন বলিলেন,—শব্দ অনিত্য। কারণ, শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্মের উপলব্ধি হইতেছে না। নিত্য ধর্মের উপলব্ধি না হইলে সে পদার্থ অনিত্যই হয়, যেমন বজ্রাদি। তখন অপর বাদী এই হেতুর আর কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। শব্দে কোন নিত্য ধর্মের উপলব্ধি তাঁহারও তখন হইতেছে না, কিন্তু তিনিও তখন বাদীর জ্ঞান বলিয়া বলিলেন,—শব্দ নিত্য; কারণ, শব্দে কোন অনিত্য ধর্ম অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের ধর্ম উপলব্ধি হইতেছে না। তখন পূর্ববাদী এই হেতুতেও কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না; শব্দে অনিত্য ধর্মের উপলব্ধি তাঁহারও নাই, সুতরাং সেখানে কাহারও কোন পক্ষের অল্পমান হইতে পারিল না। পরন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ একটা সংশয়ই সেখানে জন্মিল। কারণ, বিশেষের অনুপলব্ধি সংশয়ের একটা কারণ, তাহা উভয় পক্ষেই আছে। শব্দে নিত্যধর্মের উপলব্ধি অথবা অনিত্য-ধর্মের উপলব্ধি থাকিলে কখনই ঐরূপ সংশয় হইতে পারিত না। সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর ঐ বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি, যাহা সেখানে হেতুরূপে গ্রহীত, তাহা সেখানে প্রকরণ-সম নামক হেতুভাঙ্গ। যাহা প্রকরণের জ্ঞান অনিশ্চায়ক, পরন্তু উভয় প্রকরণেই তুল্য, তাহা প্রকরণ বিষয়ে সংশয়েরই উৎপাদক, তাহা প্রকরণের নির্ণয়ের জন্ত প্রযুক্ত হইলে প্রকরণ-সম হইবে। পূর্বোক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর দুই হেতুই ভুল; দুই হেতুই প্রকরণ-সম। ঐরূপ সংশয়োৎপাদক পদার্থ অল্পমানে হেতু হইতে পারে না।

চতুর্থটির নাম (৩) সাধ্যসম। যাহা অসিদ্ধ, তাহাই সাধ্য হয়। উভয়বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধ পদার্থ সাধ্য হয় না। অল্পমানে এই সাধ্য ভিন্ন আর সমস্ত পদার্থই সিদ্ধ হওয়া চাই। হেতু সিদ্ধ পদার্থ না হইলে সাধ্যের সাধক হইতে পারে না। সে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে পরকে কিরূপে



সাধন করিবে? যদি কোন স্থানে প্রবৃত্ত হেতু সিদ্ধ না হয়, প্রতিবাদী ঐ হেতু না মানেন, তাহা হইলে ঐ হেতু সেখানে সাধন করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং ঐ হেতু সেখানে সাধ্যের তুল্য, উহা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধ্যসাধন হইতে পারে না; সুতরাং উহা প্রকৃত হেতু নহে, উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ অনুমান করিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকার জব্দ্য পদার্থ; কারণ, তাহার গতি আছে। কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে তাহার পশ্চাদ্বেশী ছায়াও সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। বাহা গমন করে, তাহা অবশ্যই জব্দ্য পদার্থ। জব্দ্য ভিন্ন আর কোনও পদার্থের গতি নাই। নৈয়ায়িক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকারের গতি সিদ্ধ পদার্থ নহে। গমনকারী পুরুষ আলোকের আধরক অর্থাৎ আচ্ছাদক হয়, এ জন্ত তাহার পশ্চাদ্বেশে ছায়া পড়ে। ঐ স্থানে তখন আলোকের অভাব সর্বসম্মত। যখন পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হয়, তখন তাহার পশ্চাদ্বেশী আলোকোভাবও উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়; এই জন্ত পুরুষের স্তায় ছায়াও ক্রমে তাহার পাছে পাছে গমন করিতেছে, এরূপ ভ্রম হয়। সুতরাং ছায়ার গতি আছে, ইহা স্বীকার করি না। ছায়া আলোকের অসন্নিধি মাত্র। ছায়ার গতি যদি প্রমাণসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে অবশ্য ছায়া জব্দ্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। ছায়ার গতি অসিদ্ধ, সুতরাং উহা সাধ্যের তুল্য। ছায়ার জব্দ্যত্বানুমাণে উহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, উহা প্রকৃত হেতু নহে।

পঞ্চমটির নাম (৫) কালাতীত। যে হেতু কালের অতিক্রমযুক্ত, তাহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ বলিয়াছেন যে, শব্দ তাহার শ্রবণের পূর্বেও থাকে, পরেও থাকে, উহা রূপের স্তায় স্থির পদার্থ। কারণ, শব্দ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, অর্থাৎ শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগজন্ম। তেরী ও দণ্ডের সংযোগে এবং কাঠ ও কুঠারের সংযোগে শব্দের উৎপত্তি হয় না, শব্দের অভিব্যক্তিই হয়। বাহার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সংযোগ-জন্ম, তাহাকেই বলে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য। বাহা সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা অভিব্যক্তির পূর্ক হইতেই থাকে এবং তাহার পরেও থাকে, যেমন রূপ। অন্ধকারে রূপ দেখা যায় না, এ জন্ত বাহার রূপ দেখিব, তাহাতে আলোক সংযোগ আবশ্যক। আলোক সংযোগের পরেই রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। দেখানে রূপ পূর্ক হইতেই আছে এবং পরেও থাকিবে। রূপ আলোক-সংযোগ-ব্যঙ্গ্য। সুতরাং বাহা সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা পূর্ক হইতেই থাকে, ইহা যখন রূপে দেখিতেছি, তখন শব্দও পূর্ক হইতেই থাকে, ইহা অনুমান করিতে পারি। ভাষ্যকার বাস্তবায়ন বলিয়াছেন যে, তাহা পার না। কারণ, তোমার ঐ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য হেতু ঐ স্থলে কালাতীত। কেন না, রূপের প্রত্যক্ষ আলোক সংযোগের সমকালেই হয়। আলোক-সংযোগ নিবৃত্ত হইলে আর হয় না। সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্ম, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগ-জন্ম হইতে পারে না। কারণ, কাঠ ও কুঠারের সংযোগকালেই দূরত্ব ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, অনেক পরেই তাহার শব্দ শ্রবণ হয়। দূরত্ব শ্রোতা দূরত্ব শব্দ শ্রবণ করে না, ক্রমে তাহার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই সে শ্রবণ করে। তখন পূর্কজাত সেই কাঠ-কুঠার-সংযোগ থাকে না।



কল কথা, ঐ সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, স্ততরাং শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগ-জ্ঞত বলা যায় না, শব্দকেই সংযোগ-জ্ঞত বলিতে হইবে। তাহা হইলে-শব্দকে রূপের জ্ঞার সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলা যায় না। শব্দের অভিব্যক্তি কাঠ ও কুঠারের সংযোগ-কালকে অতিক্রম করে, এ জ্ঞত সংযোগ-ব্যঙ্গ্য মীমাংসকের পূর্বোক্ত অহুমান কালাতীত নামক হেতুভাস। অথবা যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অহুমান করিতে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইবে, সেই ধর্ম্মীতে যদি সেই সাধ্য ধর্ম্ম বা অহুমেয় ধর্ম্মটি নাই, ইহা বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আর সেখানে সাধ্য সন্দেহের কাল থাকে না। সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে অর্থাৎ বলবৎ প্রমাণের দ্বারা অহুমানের আশ্রয়ে সাধ্য ধর্ম্মের অর্ভাব নিশ্চয় স্থলে সেই সাধ্যের অহুমানে হেতুরূপে প্রযুক্ত পদার্থ কালাতীত নামক হেতুভাস। যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, কেহ অগ্নিতে অহুষ্ণতার অহুমান করিতে যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা কালাতীত নামক হেতুভাস হইবে।

টিপ্পনী। বাদ, জর ও বিতণ্ডায় হেতুভাসের জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। এ জ্ঞত মহর্ষি তাহার পরেই হেতুভাসের উল্লেখ করিয়া তাহার নিরূপণ করিয়াছেন। অহুমানের হেতু নির্দোষ না হইলে অহুমান খাঁটি হয় না। অনেক সময়েই ভ্রষ্ট হেতুর দ্বারা অহুমান করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয়। স্ততরাং কোন্ হেতু সং এবং কোন্ হেতু অসং অর্থাৎ ভ্রষ্ট, তাহা বুঝা নিতান্ত প্রয়োজন। ফলতঃ অহুমানের দ্বারা তদ্বিনির্গমে এবং জর ও বিতণ্ডায় জরলাভে হেতুভাস জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। যে হেতুতে ব্যভিচারাদি কোন দোষ নাই, তাহাই সং হেতু। বাহাতে ব্যভিচারাদি কোন দোষ আছে, তাহাই অসং হেতু বা ভ্রষ্ট হেতু। ইং বস্তুতঃ হেতু না হইলেও হেতুরূপে গৃহীত হয় এবং হেতুসদৃশ, এ জ্ঞত ইহাতেও হেতু শব্দের গোপ প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। মহর্ষি গোতম পূর্বোক্ত অসং হেতু বা ভ্রষ্ট হেতুকেই হেতুভাস বলিয়াছেন। “হেতুভাসাসক্তে” অর্থাৎ বাহা হেতু নহে, কিন্তু হেতুর জ্ঞার প্রতীয়মান হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হেতুভাস শব্দের দ্বারাই মহর্ষি হেতুভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষি যেখানে পৃথক্ করিয়া সামান্য লক্ষণসূত্র বলেন নাই, কেবল বিভাগ-সূত্রের দ্বারা বিভাগ করিয়াছেন, সেখানে তাহার বিভাগসূত্রের দ্বারাই সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এ কথা প্রমাণ-বিভাগ-সূত্রের (তৃতীয় সূত্রের) পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। সামান্য লক্ষণ ব্যতীত বিভাগ হয় না। বিশেষ জ্ঞানের জ্ঞত যে বিভাগ, তাহা সামান্য জ্ঞান সম্পাদন না করিয়া করা যায় না। স্ততরাং মহর্ষি এই বিভাগ-সূত্রেই হেতুভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা অবগ্রহী করিয়াছেন। “হেতোরভাসাঃ” অর্থাৎ হেতুর দোষ, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে রঘুনাথ প্রভৃতি কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক হেতুর দোষগুলিকেও হেতুভাস বলিয়া তাহার সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাদ, এই পঞ্চবিধ হেতুর দোষকে পঞ্চবিধ হেতুভাস বলিয়া তদ্বিচিন্তামণিকার ধর্ম্মেশ্বরের হেতুভাস-সামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম দব্যভিচার অর্থাৎ ব্যভিচাররূপ দোষযুক্ত,



বিকল্প অর্থাৎ বিরোধরূপ দোষদুস্ত ইত্যাদি পঞ্চবিধ ছুট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন । ঐ সব্যভিচার প্রভৃতির বিশেষ লক্ষণ-সূত্রেও ইহা স্বব্যক্ত আছে । আভাস শব্দের দোষ অর্থও সুখ্য নহে । এই সমস্ত কারণে হেতুর দোষগুলিকে হেত্বাভাস নামে ব্যাখ্যা করা সমুচিত বলিয়া মনে হয় না । তদ্বর্চিস্তামনিকার গল্পেও কিন্তু শেষে হেত্বাভাসের বিভাগ-ব্যাক্যে সব্যভিচার প্রভৃতি ছুট হেতুরই বিভাগ করিয়াছেন । রঘুনাথের দীপ্তির টীকাকার গদাধর প্রভৃতি সেখানে গল্পেশের অন্তরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিলেও গল্পে ছুট হেতুরই সামান্য লক্ষণ বলিয়া তাহারই বিভাগ করিয়াছেন, ইহাই সহজে মনে আসে । গল্পেশের হেত্বাভাসের লক্ষণ তিনটির ছুট হেতুর লক্ষণ পক্ষেও ব্যাখ্যা করা যায় । অনেকে তাহাও করিয়াছেন । দীপ্তিকার রঘুনাথ সে ব্যাখ্যাও বলিয়াছেন ।

সে যাহা হউক, এখন হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ কি বুঝা যায়, তাহা বুঝিতে হইবে । হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা যাহা হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান হয়, এমন পদার্থকে বুঝা যায় । হেতুর জ্ঞায় অর্থাৎ হেতুসদৃশ, এই কথা বলিলে তাহা হেতু নহে—অহেতু, ইহা বুঝা যায় । বাহ্যতে হেতুর লক্ষণ নাই, তাহাই অহেতু । হেত্বাভাস পদার্থ বখন অহেতু, তখন তাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই । তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রস্থ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা সৃচিত হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু । যে পদার্থকে যেখানে হেতুরূপে গ্রহণ করা না হয় অথবা বাহ্যতে হেতুর কোনরূপ লক্ষণ নাই, এমন পদার্থ সেখানে হেত্বাভাস নহে ; কিন্তু কেবল অহেতু পদার্থকে হেত্বাভাস বলিলে সেখানে সেই পদার্থ এবং সর্বত্র ঐরূপ অসংখ্য পদার্থ হেত্বাভাস হইয়া পড়ে । এই জন্ত ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, হেতুর সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান, অর্থাৎ যে পদার্থ হেতু নহে, কিন্তু হেতুর কোন সামান্য ধর্ম থাকায় হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভাস । বস্তুতঃ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায় ।

হেত্বাভাসে হেতুর সামান্য ধর্ম কি আছে ? বাহার জন্ত উহা হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান হয় ? এতদ্ব্যতীত উদ্যোতকর প্রথম বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনন্তর প্রয়োগই সামান্য ধর্ম । প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে যেমন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয়, তজপ হেত্বাভাস বা ছুট হেতুরও প্রয়োগ হয় । পরে আবার বলিয়াছেন যে, যে সকল ধর্ম থাকিলে তাহা প্রকৃত হেতু হয়, তাহার কোন না কোন ধর্ম হেত্বাভাসেও থাকে, অর্থাৎ ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ হেতুর কোন ধর্ম ছুট হেতুতেও থাকে । সাধক ও অসাধকই যথাক্রমে হেতু ও হেত্বাভাসের বিশেষ ধর্ম । হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকাই তাহার সাধক এবং সমস্ত লক্ষণ না থাকা বা কোন লক্ষণ থাকাই হেত্বাভাসের অসাধক ।

এখন হেতুর সমস্ত লক্ষণ কি, তাহা বলিতে হইবে । পরবর্তী নৈরায়িকগণের পরিভাষা-সারে যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমান করা হয়, ঐ ধর্মীর নাম পক্ষ এবং ঐ অন্ত্রের ধর্মটির নাম সাধ্য । যেমন পক্ষত-ধর্মীতে বহি-ধর্মের অনুমান করা হইলে পক্ষত পক্ষ, বহি সাধ্য । এই



(১) পক্ষসত্ত্ব অর্থাৎ পক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যাহা পক্ষে নাই, তাহা হেতু হইতে পারে না। পর্তুতে যদি ধুম থাকে, তাহা হইলেই সেখানে বহির অনুমানে উহা বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে হেতু হইতে পারে। যে পদার্থ পূর্বোক্ত সাধ্যযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত, তাহার নাম সপক্ষ; যেমন পর্তুতে বহির অনুমানে পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষ; কারণ, সেখানে বহি আছে, ইহা সর্বসম্মত। এই (২) সপক্ষসত্ত্ব অর্থাৎ সপক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। পূর্বোক্ত বহির অনুমানে ধুমহেতু পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষে আছে, সুতরাং উহাতে সপক্ষসত্ত্ব আছে। যেখানে সাধ্যযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত কোন পদার্থ নাই, অর্থাৎ যেখানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষসত্ত্ব হেতুর লক্ষণ হইবে না। যেখানে সপক্ষ আছে, সেখানেই হেতুতে সপক্ষসত্ত্ব আছে কি না, দেখিতে হইবে এবং সেখানেই সপক্ষসত্ত্ব হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যে পদার্থ সাধ্যযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত, তাহার নাম বিপক্ষ। এই (৩) বিপক্ষে অসত্তা অর্থাৎ বিপক্ষে না থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যেমন পর্তুতে বহির অনুমানে নদ-নদী প্রভৃতি বিপক্ষ। কারণ, তাহা বহিশূন্য বলিয়া নিশ্চিত। বহিশূন্য বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত পদার্থ আরও প্রচুর আছে; সেখানে ধুম নাই, থাকিতেই পারে না, সুতরাং ঐ স্থলে ধুম হেতুতে বিপক্ষে অসত্তা আছে। যেখানে বিপক্ষই নাই অর্থাৎ সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থই নাই, সেখানে বিপক্ষে অসত্তা হেতুর লক্ষণ হইবে না, সেখানে উহা বলাই বাইবে না, সেখানে ঐটিকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য ধর্মগুলিকেই হেতুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

যেখানে সাধ্যযুক্ত পদার্থকেই পক্ষ করিয়া সেই সাধ্য সাধনে হেতুপ্রয়োগ করা হয়, তাহার নাম বাধিত হেতু; উহা হেতুর পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও হেতু হয় না; কারণ, উহা সাধ্য-সাধন হয় না। যেখানে সাধ্য নাই বলিয়াই বলবৎ প্রমাণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেখানে আর কোন হেতুই সাধ্যসাধন করিতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ পদার্থে সেখানে হেতুর কোন লক্ষণ নাই, ইহা বলিতেই হইবে। এ জন্ত বলা হইয়াছে, (৪) অবাদিতত্ত্ব হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যে হেতু পূর্বোক্ত প্রকারে বাধিত, তাহাতে অবাদিতত্ত্ব থাকে না, এ জন্ত তাহা হেতু নহে। আবার যেখানে কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অনুমান করিতে গেলে, ঐ সাধ্যের অভাবের অনুমানে আর একটি পূর্বক হেতু উপস্থিত হয় এবং উক্ত পক্ষের উক্ত হেতুই তুল্যবল হওয়ায় কেহ কাহাকে বাধা দিতে না পারে, সেখানে ঐ সাধ্য ও সাধ্যাতাব বিষয়ে একটা সংশয় উপস্থিত হয়, সেখানে ঐ উক্ত হেতুকেই বলা হইয়াছে ‘সংপ্রতিপক্ষ’ বা ‘সংপ্রতিপক্ষিত’। সেখানে দুই হেতুই পরস্পর প্রতিপক্ষ, সুতরাং যাহার প্রতিপক্ষ সং—কি না বিদ্যমান, তাহাকে সংপ্রতিপক্ষ বলা যায়। ঐ দুই হেতুর কোনটাই সাধ্যসাধন করিতে না পারায় উহাকে হেতু বলা যায় না, সুতরাং অবশ্যই উহাতে হেতুর কোন লক্ষণ নাই বলিতে হইবে। তাই বলা

১। বহির অনুমানে ধুমবস্ত্রে ধুম বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে হেতু। বহিশূন্য কোন স্থানেই ঐ বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে ধুম থাকে না। সামান্তর্য্য সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধুমই বহির অনুমানে হেতু। ২ অং, ১ অং, ৩০ অং টীকায় উক্ত।



হইয়াছে (৫) 'অসংপ্রতিপক্ষত্ব' হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যে দুইটি হেতু সংপ্রতিপক্ষ, তাহাতে অসংপ্রতিপক্ষত্ব থাকে না, এ জ্ঞাত তাহা হেতু নহে। হেতু সদৃশ বলিয়াই কিন্তু অহেতুতেও হেতু শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

এখন বুঝা গেল, (১) পক্ষসম্বন্ধ, (২) সপক্ষসম্বন্ধ, (৩) বিপক্ষে অসম্বন্ধ, (৪) অব্যবহিত্য, (৫) অসংপ্রতিপক্ষত্ব—এই পাঁচটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ। এই পাঁচটি ধর্ম থাকিলেই তাহাকে সাধ্যের গমক বা সাধক বলা হইয়াছে। এবং ঐ পাঁচটি ধর্মকেই হেতুর "গমকতৌপয়িক রূপ" বলা হইয়াছে। গমকতার কলিতার্থ অহুমান্যকতা; ঔপয়িক বলিতে উপায় বা প্রয়োজক। হেতু যে অহুমান্যক হয়, সেই অহুমান্যকতার প্রয়োজকই ঐ পাঁচটি ধর্ম। অবশ্য যেখানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষসম্বন্ধকে ছাড়িয়া দিয়া এবং যেখানে বিপক্ষ নাই, সেখানে বিপক্ষে অসম্বন্ধকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট পূর্কোক্ত চারিটি ধর্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্কোক্ত পাঁচটি ধর্ম এবং স্থলবিশেষে চারিটি ধর্মকেই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী প্রায় সকল নৈয়ায়িকের মতেই অমরী, ব্যতিরেকী ও অমরব্যতিরেকী নামে হেতু ত্রিবিধ। এ সকল কথা অবরব-প্রকরণে হেতুবাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। পূর্কোক্ত প্রকারে ত্রিবিধ হেতুবাদী নৈয়ায়িকদিগের মতে অমরব্যতিরেকী হেতুহলে পূর্কোক্ত পাঁচটি ধর্মই হেতুতে থাকা আবশ্যক, নচেৎ তাহা হেতু হয় না। এবং অমরী বা কেবল্যমরী হেতুহলে বিপক্ষে অসম্বন্ধকে ছাড়িয়া দিয়া আর চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্যক। এবং ব্যতিরেকী বা কেবল্যব্যতিরেকী হেতু হলে সপক্ষসম্বন্ধকে ছাড়িয়া দিয়া আর চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্যক। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও তর্কানুত আছে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্কোক্ত পক্ষসম্বন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি ধর্মের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পক্ষবিধ হইয়াছে। কারণ, সম্ভবহলে ইহাদিগের কোন একটি ধর্ম না থাকিলেও তাহা হেতু হয় না। ঐ পাঁচটি ধর্মই গোতম মতে হেতুর "গমকতৌপয়িক রূপ" অর্থাৎ অহুমান্যকতার প্রয়োজক, সাধকতার প্রয়োজক। মহর্ষি গোতম কর্তৃক: এ সকল কথা কিছু না বলিলেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে। সুত্রে সকল কথার বিশদ প্রকাশ থাকে না, তাহা থাকিতেও পারে না; সুত্রে অনেক ভঙ্গের সূচনাই থাকে, তাই উহার নাম সূত্র। মহর্ষি হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিতে সাধ্যসাধন পদার্থকেই হেতুপদার্থ বলিয়া সূচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে উদাহরণবিশেষের সাধন্য এবং উদাহরণবিশেষের বৈধন্য বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানদ্বারা মহর্ষি-সম্মত ত্রিবিধ হেতুপদার্থও পূর্কোক্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে যে, কিরূপ পদার্থ হইলে তাহা সাধ্যসাধন পদার্থ হইয়া হেতু পদার্থ হইতে পারে। পূর্কোক্ত যুক্তির দ্বারা বুঝা যায়, পক্ষসম্বন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম অথবা স্থলবিশেষে চারিটি ধর্ম থাকিলেই তাহা সাধ্যসাধন হয় এবং মহর্ষি যে পক্ষবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন, তাহার মূল চিন্তা করিলেও তাহার মতে যাহা হেত্বাভাসে থাকে না, এমন পাঁচটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এই সব চিন্তা করিয়াই পূর্কোক্ত পক্ষ ধর্মকেই গোতম মতে হেতুর লক্ষণ বলিয়া



স্থির করিয়াছিলেন। এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন পারিভাসিক শব্দের দ্বারা গৌতম নতেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে যে পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা প্রাচীন উদ্যোতকের প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণই প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা সে দিনের নব্য জ্ঞানের কর্তৃদিগেরই আবিষ্কৃত নহে। উদ্যোতকের জ্ঞানবৃত্তিক হইতে পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ অনেক কথা লইয়াছেন। ভাষ্যকারও সূত্রকারের জ্ঞান অনেক কথার সূচনাই করিয়াছেন। পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মই যে হেতুর লক্ষণ, ইহা তিনি না বলিলেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। যাহারা পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মকে হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাদিগের কথা বলা হইল। এ সকল কথা না বলিলেও যে সকল ধর্ম থাকিলে সে পদার্থ হেত্বাভাস হয় না, তাহা সামান্যদৃষ্ট হয়, সেই সকল ধর্মই যে হেতুর লক্ষণ, তাহা সকলকেই বলিতে হইবে। সেই ধর্মগুলি যিনি যেরূপ বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন এবং যে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবেন, তাহাই হেতুর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহা পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মই হউক, আর তাহার কম বা বেশী অন্ত ধর্মই হউক, তাহাতে ফলের কোন হানি নাই। এ জন্ত অনেকে অন্তান্ত প্রকারেও হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তবে পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পক্ষবিধ হইয়াছে, ইহা অবিকার্যশেষের মত। তাহা হইলে বুঝা গেল, যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহাই অসাধক; তাহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেত্বাভাস হইবে, ইহাই হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহা হেতু নহে অর্থাৎ যাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই অথচ যাহা হেতুর জ্ঞান প্রতীক্ষমান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। তাহা হইলে উহার দ্বারা হেতুর লক্ষণশূন্য হইয়া হেতুর জ্ঞান প্রতীক্ষমানহই হেত্বাভাসের সামান্ত লক্ষণ বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রথমতঃ তাহাই বলিয়া এই বিভাগ-সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন। উদ্যোতকের কথায় বুঝা যায় যে, হেতুর সমস্ত লক্ষণ হেত্বাভাসে থাকিবে না, কিন্তু কোন লক্ষণ থাকিবে; এই জন্তই হেত্বাভাস অসাধক হইয়াও হেতুর জ্ঞান প্রতীক্ষমান হয় এবং ঐ তাহাই তাহার হেত্বাভাস বা অসাধকত্ব। কিন্তু যাহাতে হেতুর কোন লক্ষণই নাই অর্থাৎ যাহা একত্র পক্ষবিধ হেত্বাভাসই হয়, এমন হেত্বাভাসও নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন। তবে ভাষ্যকারও উদ্যোতকের ব্যাখ্যাসূত্রে প্রকরণ-সম বা সংপ্রতিপক্ষ সেখানে হইবে না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা হেত্বাভাসের সামান্ত লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এই কথা বলিয়া প্রথমতঃ পূর্বোক্ত পক্ষসমূহ প্রভৃতি পক্ষধর্মশূন্যতাই হেত্বাভাসের সামান্ত লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, পূর্বোক্ত পক্ষধর্মই হেতুর লক্ষণ। পরে বলিয়াছেন যে, যখন কোন স্থলে সপক্ষ থাকে না এবং কোন স্থলে বিপক্ষ থাকে না, তখন পূর্বোক্ত পক্ষধর্ম সর্বত্র প্রসিদ্ধ না হওয়ার ঐ পক্ষধর্মশূন্যতাকে হেত্বাভাসের সামান্ত লক্ষণ বলা যায় না। যেখানে কোন পদার্থেই ঐ পক্ষধর্ম সিদ্ধ নাই, সেখানে ঐ পক্ষধর্মশূন্যতাও একটা পদার্থ হইতে পারে না; সুতরাং সেখানে হেত্বাভাস কেহই হইতে পারে না। সুতরাং উহা হেত্বাভাসের লক্ষণ হয় না। পূর্বোক্ত পক্ষ-ধর্মের মধ্যে সম্ভবস্থলে পক্ষসমূহ, সপক্ষ সমূহ এবং বিপক্ষের অসমূহ, এই তিনটি ধর্ম থাকিবে না,



ইহা হেতুভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায় এবং অবাবিত্ত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষ থাকিবে না, ইহাও হেতুভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের ( সম্ভবতঃ ) কোন একটি ধর্ম না থাকিলেও তাহা হেতু হয় না, তাহা অহেতু। হেতুভাস শব্দের দ্বারা যখন হেতুলক্ষণশূন্য পদার্থই বুঝা যায়, তখন তাহার দ্বারা পূর্বোক্ত ধর্মদ্বয়ের অভাব বুঝা যায়। তাহা হইলে উহার দ্বারা ফলে অহুমিত্তির কারণ যে জ্ঞান, তাহার বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে। কোন হেতুতে পূর্বোক্ত ধর্মদ্বয় নাই, ইহা বুঝিলে সেখানে অহুমিত্তির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত ধর্মদ্বয়শূন্য, এই কথার দ্বারা অহুমিত্তির কারণ জ্ঞানের বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে হয়। এইরূপ কোন হেতুকে বাধিত বা সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া বুঝিলে সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই অহুমিত্তির প্রতিবন্ধক হয়। তাহা হইলে পূর্বোক্ত অবাবিত্ত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষের অভাব যে বাধিতত্ব ও সংপ্রতিপক্ষত্ব, তাহার দ্বারা ফলে অহুমিত্তি বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে হেতুভাস শব্দের দ্বারা বুঝা গেল যে, বাহ্য জ্ঞানমান হইয়া অহুমিত্তি অথবা তাহার কারণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান অথবা পরামর্শের বিরোধী, সেই পদার্থই হেতুভাস অর্থাৎ বাহ্য বুঝিলে অহুমিত্তি জন্মে না অর্থাৎ সেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে না অথবা পরামর্শ জন্মে না, সেই পদার্থগুলি হেতুর দোষ। সম্বন্ধবিশেষে ঐ দোষ যে পদার্থে থাকে, তাহা হেতুভাস বা হ্রষ্ট হেতু। ইহাই বৃত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার স্থল তাৎপর্য।

তত্ত্বচিন্তামণিকার গবেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এক উক্তিভেদে হেতুভাসের সামান্য লক্ষণ বুঝাইতে যাইয়া প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদিগের পরবর্তী নৈয়ায়িক বিখ্যাত ও রঘুনাথের কথা লইয়াই এখানে হেতুভাসের সামান্য লক্ষণের চরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যার বিস্তার করেন নাই। তাহারা লক্ষণ বিষয়ে কিছু সূচনাই করিয়া গিয়াছেন, পদার্থ বিষয়ে বাহ্যতে একটি ধারণা জন্মিতে পারে, তাহাই তাহারা বলিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে পদার্থ নির্বাচন করিবার জন্ত পরে যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বঙ্গের জায়বীর আচার্য্যগণ জ্ঞান বিষয়ে অদ্বুত লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। মনে হয়, প্রাচীন জ্ঞানার্থ্যগণ সর্বত্র এক উক্তিভেদে হেতুভাসের একটি সামান্য লক্ষণ আবশ্যক মনে করেন নাই এবং উহা অসম্ভব মনে করিয়াও ঐ বিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই। সেখানে পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয় সিদ্ধই নাই, সেখানে যে চারিটি ধর্ম প্রসিদ্ধ আছে অথবা বাহ্যই সেখানে হেতুর লক্ষণ বলা যাইবে, তাহার অভাবই সেখানে হেতুভাসের লক্ষণ হইবে। সর্বত্র হেতুভাসের একটি লক্ষণ নাই বা হইল, আর তাহা হইবেই বা কিরূপে? অহুমানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতু সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন। এক উক্তিভেদে একটা লক্ষণ বলিতে পারিলেও ফলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নই হইবে। আর এক উক্তিভেদেই বা তাহা সর্বত্রই হইবে কি নিঃসন্দেহরূপে কি করিয়া বলা যাইবে? দীর্ঘবিত্তিকার রঘুনাথও ত তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনিও হেতুভাসের সামান্য লক্ষণে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্নের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও শেষে যাদৃশ পক্ষ, যাদৃশ সাধ্য ও যাদৃশ হেতু হলে বতগুলি হেতুভাস সম্ভব হয়, তাবৎ পদার্থের অন্ততমই হেতুর



দোষরূপ হেত্বাভাসের একটি লক্ষণ বলিয়া সেই কল্পের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেখানে টীকাকার গদাধরও মতান্তরে সেই কল্পেই রঘুনাথের নির্ভর, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এবং সেই কল্পটিই যে কোন স্থলবিশেষের জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ স্থলবিশেষে যে হেত্বাভাসের লক্ষণ অগত্যা ঐরূপই বলিতে হইবে, ইহাও গদাধরের বিচারে সেখানে পরিষ্কৃত রহিয়াছে। সুতরাং সর্বত্র হেত্বাভাসের একটি লক্ষণই ব্যাখ্যাত হইয়াছে কোথায়? গদাধর বাহ্য ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন নাই, কেবল সকল লক্ষণের দোষ ব্যাখ্যা করিয়াই তিনি তাহার বুদ্ধিমত্তার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আশাহ্নরূপ নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতে আর কাহারই বা শক্তি আছে? একটা ব্যাখ্যা করিলেই বা তাহার নির্দোষত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় কৈ? নব্য জ্ঞানের অধ্যাপকগণ গদাধরের হেত্বাভাস বিচার স্বরণ করিলে সর্বত্র হেত্বাভাসের একটি সামান্য লক্ষণ নির্দোষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, তাহা স্বরণ করিতে পারিবেন। ফলকথা, প্রাচীন জ্ঞানচর্চাগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে হেত্বাভাসের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণই বলিতেন; এ জ্ঞান তাহার হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যায় নব্যগণের জ্ঞান কোন গুরুতর চিন্তা করিতে যান নাই। বাহ্যতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই অথচ বাহ্য হেতুর জ্ঞান প্রতীয়মান হয়, কোন কারণে বাহ্যকে হেতু বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাই হেত্বাভাস, এইরূপ বলিলেই হেত্বাভাসের সামান্য জ্ঞান হইবে এবং বিশেষ লক্ষণ বলিলে বিশেষ জ্ঞান হইবে। বিশেষলক্ষণের দ্বারাও তাহাকে হেত্বাভাস বলিয়া বুঝা যাইবে, ইহাই প্রাচীনদিগের মনের কথা বলিয়া মনে হয়।

পরবর্তী বিশেষ লক্ষণসূত্রগুলিতেই সব্যভিচার প্রভৃতি পাঁচটি নাম এবং তাহাদিগের লক্ষণ ব্যক্ত আছে। তবে আবার এই সূত্রটির প্রয়োজন কি? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাস বহু প্রকার আছে, সেগুলি সমস্তই এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ ভিন্ন আর কোন হেত্বাভাস নাই, এই বিশেষ নিয়ম জ্ঞাপনের জন্মই মর্ষি এই বিভাগ-সূত্রটি বলিয়াছেন। হেত্বাভাস যে কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা উদ্যোতকর দেখাইয়াছেন এবং তাহার উদাহরণ ও সংখ্যার বর্ণনা করিয়াছেন। শেষে গিয়া তাহা অসংখ্যই হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। তেনাং।

সূত্র। অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥৫॥৪৩॥

অনুবাদ। সেই অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে বাহ্য অনৈকান্তিক অর্থাৎ ঐকান্তিক নহে, সাধ্য ও সাধ্যের সম্ভাব, এই দুই পক্ষের কোন পক্ষেই নিয়ত নহে অর্থাৎ বাহ্য সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে, এমন পদার্থ সব্যভিচার (সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস)।

ভাষ্য। ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্ততে ইতি সব্যভিচারঃ। নিদর্শনঃ—নিত্যঃ শব্দোহস্পর্শদ্বাং স্পর্শবান্



কুস্তোহনিত্যো দৃষ্টো ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দস্তস্মাদস্পর্শত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইতি । দৃষ্টান্তে স্পর্শবস্ত্বনিত্যত্বক ধর্মো ন সাধ্যসাধনভূতো গৃহ্যেতে, স্পর্শবাংশচাণুনিত্যশ্চেতি । আত্মাদৌ চ দৃষ্টান্তে ‘উদাহরণসাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতু’রিত্যস্পর্শত্বাদিত্যিতি হেতুর্নিত্যত্বং ব্যভিচারতি অস্পর্শা বুদ্ধিরনিত্য। চেতি । এবং দ্বিবিধেপি দৃষ্টান্তে ব্যভিচারাং সাধ্যসাধন-ভাবো নাস্তীতি লক্ষণাভাবাদহেতুরিত্যিতি । নিত্যত্বমেকোহন্তঃ, অনিত্যত্ব-মেকোহন্তঃ, একস্মিন্নন্তে বিদ্যত ইতি ঐকান্তিকঃ, বিপর্যয়াদনৈকান্তিকঃ, উভয়াস্তব্যাপকত্বাদিত্যিতি ।

অনুবাদ । ব্যভিচার বলিতে কোন এক পক্ষে ব্যবস্থিতি না থাকা অর্থাৎ নিয়ম না থাকা । ব্যভিচারের সহিত বর্তমান থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারবিশিষ্ট, এই অর্থে সব্যভিচার, অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত সব্যভিচার শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—ব্যভিচারী । সুতরাং বুঝা যায়, ব্যভিচারিহই সব্যভিচার নামক হেতুভাসের লক্ষণ । নিদর্শন—অর্থাৎ এই সব্যভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । ( প্রতিজ্ঞা ) শব্দ নিত্য, ( হেতু ) স্পর্শশূন্যতা জ্ঞাপক, ( উদাহরণ ) স্পর্শবিশিষ্ট কুস্ত অনিত্য দেখা যায়, ( উপনয় ) শব্দ সেই প্রকার ( কুস্তের তায় ) স্পর্শবিশিষ্ট নহে, ( নিগমন ) সেই স্পর্শশূন্যতা হেতুক শব্দ নিত্য । ( এই স্থলে ) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত কুস্তে স্পর্শ এবং অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্মকে সাধ্যসাধনভূত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ স্পর্শ হেতু, অনিত্যত্ব তাহার সাধ্য ; যেখানে যেখানে স্পর্শ থাকে, সে সমস্তই অনিত্য, ইহা পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না । ( কারণ ) পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট, অথচ নিত্য, অর্থাৎ পরমাণুতে স্পর্শ থাকিলেও তাহা যখন অনিত্য নহে, তখন স্পর্শ অনিত্যত্বের সাধন হয় না । আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তেও অর্থাৎ বাহ্য বাহ্য স্পর্শশূন্য, তাহা নিত্য, যেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপে গৃহীত আত্মা প্রভৃতি সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত স্থলেও ‘উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু’ ( ১ অং, ৩৪ সূত্র ) এই সূত্রানুসারে ‘অস্পর্শত্বাং’ এই বাক্য প্রতিপাদ্য হেতু অর্থাৎ স্পর্শশূন্যতারূপ হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হইতেছে ; ( কারণ ) বুদ্ধি স্পর্শশূন্য অথচ অনিত্য, ( অর্থাৎ স্পর্শশূন্য হইলেই যে সে পদার্থ নিত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি ঐ দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না । কারণ, বুদ্ধি পদার্থে উহার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে ) । এইরূপে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারবশতঃ সাধ্য-সাধনত্ব নাই অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে শব্দে নিত্যত্বের অনুমান



করিতে যে স্পর্শশূন্যতাকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে নিত্যের সাধের সামান্য নাই। এ জন্ত লক্ষণের অভাব বশতঃ অর্থাৎ হেতুর লক্ষণ না থাকায় (উহা) অহেতু।

নিত্য একটি পক্ষ, অনিত্য একটি পক্ষ। একই পক্ষে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ একই পক্ষে নিয়মবদ্ধ, এই অর্থে 'ঐকান্তিক'। বৈপরীত্যবশতঃ অর্থাৎ এই ঐকান্তিকের বিপরীত হইলে অনৈকান্তিক। কারণ, (তাহাতে) উভয় পক্ষের ব্যাপকদ আছে অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি সাধ্য ও সাধ্যাভাবরূপ যে দুইটি পক্ষ বা ধর্মবিশেষ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের আশ্রয়েই বাহা থাকে, কোন একটি মাত্রের আশ্রয়ে থাকে না, এ জন্ত তাহা ঐকান্তিক নহে—অনৈকান্তিক।

টীপনী। হুত্রে অনৈকান্তিক এবং সব্যভিচার শব্দ একার্থবোধক পর্যায় শব্দ। যাহাকে অনৈকান্তিক বলে, তাহাকেই সব্যভিচার বলে। হুতরাং অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা সব্যভিচারের লক্ষণ প্রকাশ করা যায় কিরূপে? বুদ্ধের লক্ষণ বলিতে কি 'মহৌদ্ধকে বুদ্ধ বলে' এইরূপ কথা বলা যায়? আর তাহা বলিলেই কি বলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? তাৎপর্যটাকার এ জন্ত বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া মহর্ষি এই হুত্রে দুইটি শব্দকেই লক্ষ্য ও লক্ষণবোধকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু সব্যভিচার বলিলে বুঝে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—সব্যভিচারকেই অনৈকান্তিক বলে। যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু অনৈকান্তিক বলিলে বুঝে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—অনৈকান্তিককে সব্যভিচার বলে। হুতরাং বোদ্ধার ভেদে এই হুত্রে দুইটি শব্দই লক্ষ্যনির্দেশ এবং লক্ষণনির্দেশ। এই জন্ত ভাষ্যকারও প্রথমে সব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, উহার দ্বারাই সব্যভিচার নামক হেতুভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সব্যভিচার শব্দটিকেই প্রথমতঃ লক্ষণ-বোধকরূপে গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারাই লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে সব্যভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সর্বশেষে তিনি হুত্রে অনৈকান্তিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ অনৈকান্তিক শব্দও এক পক্ষে লক্ষণ-বোধক, এ জন্ত ঐ শব্দটির যৌগিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার উহার দ্বারাও শেষে সব্যভিচার নামক হেতুভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ যাহার নাম সব্যভিচার, তাহার নামই অনৈকান্তিক।

তাৎপর্যটাকার এইরূপ বলিলেও প্রথমতঃ মহর্ষি পঞ্চবিধ হেতুভাসের নাম কীর্তন করিতে সব্যভিচার শব্দই বলিয়াছেন। হুতরাং এই হুত্রে সব্যভিচার শব্দকেই তিনি লক্ষ্য নির্দেশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই কিন্তু মনে হয়। ভাষ্যকার নিজে সব্যভিচার শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াও সব্যভিচার নামক হেতুভাসের লক্ষণ বুঝাইতে পারেন এবং উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারেন। পরে হুত্বকারের অনৈকান্তিক শব্দের যৌগিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া হুত্বোক্ত লক্ষণেরও ব্যাখ্যা করিতে পারেন। হুত্বকারও লক্ষণহুত্রে লক্ষ্যবোধক শব্দটিকে পরেই উল্লেখ করিয়াছেন,



এ কথাগুলিও ভাবিতে হইবে। তবে একার্থবোধক পর্ধ্যায় শব্দের দ্বারা লক্ষ্য ও লক্ষণ বলিলে যদি দোষ হয়, তাহা তাৎপর্যটীকাকারের পক্ষেও হইবে না কেন? যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ অথবা অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ জানে, সে ত সব্যভিচার নামক হেতুভাষ্য কাহাকে বলে, তাহা জানেই; তাহাকে আর উহা বলিবার প্রয়োজনই বা কি? কোন শব্দবিশেষ না জানিলে পদার্থের অজ্ঞতা হয় না। মহর্ষি গোতম যাহাকে সব্যভিচার বলিয়াছেন, তাহাকে অন্ত কোন শব্দের দ্বারা জানিলেও তাহার জ্ঞান সম্পন্ন হয়। সুতরাং মনে হয় যে, মহর্ষি পূর্বসূত্রে সব্যভিচার শব্দের দ্বারা যে এক প্রকার হেতুভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সব্যভিচার শব্দের প্রতিপাদ্য সেই হেতুভাষ্যের স্বরূপ বলিবার জ্ঞানই এই সূত্রটি বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়, যাহা অনৈকান্তিক, তাহাই সব্যভিচার অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত সব্যভিচার শব্দের প্রতিপাদ্য হেতুভাষ্য। বিভিন্ন ধর্মপ্রকারে একার্থবোধক শব্দের দ্বারাও লক্ষণ বলা যায়, তাহাতে পুনরুক্তি-দোষ হয় না। ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত-লক্ষণ ব্যাখ্যায় দীর্ঘিতিটীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও এ কথা বলিয়া গিয়াছেন।<sup>১)</sup>

ভাষ্যকার প্রথমতঃ সব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াই সব্যভিচার নামক হেতুভাষ্যের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। কারণ, তাহাও বুঝান যায় এবং এখানে তাহাও বুঝাইতে হয়। শব্দে নিত্যত্বের অনুমানে অস্পর্শত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা সব্যভিচার হেতুভাষ্য। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইবার জন্ত ঐ স্থলে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা প্রকৃতি পক্ষাববহ প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং যাহাতে অস্পর্শ নাই অর্থাৎ যাহাতে স্পর্শ আছে, তাহা অনিত্য, যেমন কুন্ত—এইরূপে কুন্তকে বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য এবং তদনুসারে পরে বৈধর্ম্যোপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের উদাহরণ-বাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অনিত্য কুন্ত স্পর্শবিশিষ্ট দেখা যায়, ইহাই ভাষ্যার্থ বুদ্ধিতে হইবে। কারণ, বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে যেখানে যেখানে সাধ্য নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতু নাই, ইহাই বুদ্ধিতে হয়। ভাষ্যকার কিন্তু বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেখানে সাধ্য নাই, এইরূপ কথাই পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন; তিনি এখানেও তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিশেষ মতটি পরবর্তী সকলেই উপেক্ষা করিলেও উহা যে তাঁহার মত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাৎপর্যটীকাকারও পূর্বে ভাষ্যকারের ঐ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ভাষ্য ব্যাখ্যায় তাঁহার নিজ মতানুসারে অন্ত-রূপে ভাষ্য-সন্দর্ভের যোজনা কেন করিয়াছেন, ইহা সুযোগ্য চিন্তা করিবেন। ভাষ্যকারের মতানুসারে ঐরূপ যোজনা নিষ্ফল ও ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, পরে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেও যেখানে যেখানে অস্পর্শ হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই নিত্য নাই, যথা কুন্ত—এইরূপ অর্থই ঐ স্থলে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার ঐ ভাবেই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য অন্তঃপ্রদত্ত বলিয়াছেন ( নিগমনসূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )।

প্রদর্শিত স্থলে ভাষ্যকার শেষে আত্মা প্রকৃতি সাধর্ম্যদৃষ্টান্তেও ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধর্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে হেতুর নাম সাধর্ম্য হেতু। ভাষ্যকার মহর্ষিপ্রোক্ত সাধর্ম্যহেতুবাক্যের লক্ষণ-

১) তেন ব্যাপ্তিগবেশনি তায়দর্শনানামিকরণোক্ত্য ন সৌনকজন্ম।—সিদ্ধান্ত-লক্ষণ-বীথিত, জায়াবীথি।



সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তদনুসারে এখানে বাদী ‘অস্পর্শত্বাং’ এইরূপ সাধন্যাহেতুবাক্য প্রয়োগ করিলেও ঐ অস্পর্শ পদার্থ নিত্যত্বের ব্যতিচারী, ইহা দেখাইয়াছেন। ফলকথা, ঐ স্থলে অস্পর্শ পদার্থ সাধন্যাহেতুরূপেই গৃহীত হউক, আর বৈশম্যাহেতুরূপেই গৃহীত হউক, উহা ঐ স্থলে বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যতিচারী বলিয়া উহাতে সাধন্যাদান নাই, সুতরাং উহাতে হেতুর লক্ষণ না থাকার উহা ঐ স্থলে অহেতু, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যকার যে সাধন্যাদানকেই হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিতেন, ইহা এখানে তাঁহার কথায় পাওয়া যায়। এবং সাধ্যের ব্যতিচারী হইলে ঐ সাধন্যাদান থাকে না, ইহাও এখানে তাঁহার কথায় পাওয়া যায়। মহাবীর হেতুবাক্যের লক্ষণসূত্রেও সাধন্যাদানকেই হেতুপদার্থের লক্ষণ, ইহা স্মৃতিত হইয়াছে। যে যে ধর্ম থাকিলে এই সাধন্যাদান থাকে, সেই সেই ধর্মগুলি চিন্তা করিয়া তাহারই উল্লেখ করতঃ পরবর্তী জায়াচার্যগণ হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হেতুভাদের লক্ষণ ব্যাখ্যায় সেই সকল কথা বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলে অস্পর্শ অনৈকান্তিক হইলেই সূত্রানুসারে সব্যতিচার হইতে পারে। এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে সূত্রোক্ত অনৈকান্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্গের ব্যাখ্যা করিয়া নিত্যত্বের অহুমানো অস্পর্শ অনৈকান্তিক, ইহাও বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, নিত্যত্ব একটি ‘অন্ত’, অনিত্যত্ব একটি অস্ত। এখানে ‘অন্ত’ শব্দ কোন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। তর্কিকরক্ষাকার বরদরাজ হেতুভাস প্রস্তাবে অনেকান্ত শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“একান্তো নিশ্চয়ো ব্যবস্থিতির্নিজীতি”। সেখানে টীকাকার মলিনাথ বলিয়াছেন যে, অন্ত শব্দ নিশ্চয়বাচক, সুতরাং উহার দ্বারা ব্যবস্থা বা নিয়মরূপ লাক্ষণিক অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, কোন এক পক্ষে যাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম নাই, তাহাই অনেকান্ত। অনেকান্ত, অনৈকান্ত এবং অনৈকান্তিক—এই ত্রিবিধ প্রয়োগই ঐ অর্থে দেখা যায়। মহাবীর গৌতম এবং ভাষ্যকারও অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা অনেকান্ত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। তর্কিক-রক্ষাকার ও মলিনাথের ব্যাখ্যানুসারে এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত অন্ত শব্দের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, ভাষ্যকার এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্মকেই অন্ত বলিয়াছেন। উদ্যোতকরও তাহাই বলিয়াছেন। অন্ত শব্দের নিশ্চয় অর্থ থাকিলেও এখানে সেই অর্থ অবলা নিয়ম অর্থ সঙ্গত হয় না। উদ্যোতকর লিখিয়াছেন,—“একদ্বিরস্তে নিয়ত ঐকান্তিকঃ”। অর্থাৎ কোন একটিনাত্র অস্তে বাহা নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ, তাহাই ঐকান্তিক। ফলকথা, ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মদ্বয়কেই অন্ত বলিয়াছেন। অন্ত শব্দের ‘ধর্ম’ অর্থ অভিধানেও পাওয়া যায়। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়কে অথবা কোন পদার্থ এবং তাহার অভাবরূপ দুইটি ধর্মকেই দার্শনিক ভাষায় প্রাচীনগণ অন্ত শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করিতেন। জৈন দার্শনিক দিগম্বর সম্প্রদায় অনেকান্তবাদী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার বস্তুমাত্রকেই অনেকান্ত বলিতেন। সকল পদার্থেই কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম থাকে, ইহা তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত। এ জন্ত তাঁহাদিগের মত “স্তাদবাদ” নামেও প্রসিদ্ধ। জায়দীপিকা নামক জৈন জ্ঞানগ্রন্থের শেষে এই অনেকান্ত-বাদের যে বাখ্যা আছে, তাহাতে



“অনেকে অহা ধর্মাঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। সুতরাং তাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্মকে প্রাচীন কালে অস্ত্র বলা হইত, ইহা বুঝা যায়। প্রকৃত হলে ভাষ্যকারও সেই অর্থেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-রূপ বিরুদ্ধ ধর্মকে অস্ত্র বলিয়াছেন। অস্পর্শ পদার্থ নিত্য পদার্থেও আছে এবং অনিত্য পদার্থেও আছে; সুতরাং অস্পর্শ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি অস্ত্রে অর্থাৎ দুইটি পক্ষেই আছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“উভয়ান্তব্যাপকত্বাৎ”। ঐ কথাই দ্বারা উভয় অস্ত্রের আধারেই আছে, এইরূপ অর্থেই বুঝিতে হইবে। উভয় অস্ত্রের সকল আধারেই আছে, ইহা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা এখানে অসম্ভব। তাৎপর্যটীকাকারও ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যায় অনৈকান্তিকের চরম ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,—“উভয়পক্ষগামী”। সুতরাং তিনিও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মরূপ পক্ষকেই অনৈকান্তিক শব্দের অন্তর্গত অস্ত্র শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

মূলকথা, যে পদার্থ সাধ্যধর্মরূপ এক পক্ষেই নিয়মবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কেবল সাধ্যধর্মযুক্ত স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্মশূন্য কোন স্থানেই থাকে না, সেই পদার্থই সাধ্যধর্মের ঐকান্তিক, তাহাই সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য। যে পদার্থ ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাহ্য সাধ্যধর্মের আধারেও থাকে, সাধ্যধর্মশূন্য স্থানেও থাকে, তাহাই ভাষ্যকারের মতে অনৈকান্তিক, তাহাই সব্যভিচার বা ব্যভিচারী। যে পদার্থ কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্মযুক্ত স্থানে থাকে না, তাহা বিরুদ্ধ। তাহাকে ভাষ্যকার সব্যভিচার বলেন নাই। মহর্ষি হৃত্রেও অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাসমূহের তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি বিরুদ্ধ নামক পৃথক্ হেতুভাসও বলিয়াছেন। পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িক বিরুদ্ধ হেতুকে সব্যভিচারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সব্যভিচারের কোন প্রকার-ভেদ বলেন নাই।

হেতুকে সব্যভিচার বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যভিচার নিশ্চয় হইলে, তাহাতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মিতে পারে না; সুতরাং সেখানে ঐ হেতু সাধ্যের সাধন হয় না; তাই উহাতে সেখানে সাধ্যসাধনরূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় উহা হেতুভাস। মহর্ষি এই যুক্তি অল্পসময়ে সব্যভিচারকে হেতুভাস বলায় তাঁহার মতে হেতুতে সাধ্যধর্মের অব্যভিচারই ব্যাপ্তি, ইহা বুঝা যায় এবং এই স্বত্বের দ্বারা ঐ অব্যভিচার বা ঐকান্তিককেই তিনি ব্যাপ্তিপদার্থরূপে সূচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। মহর্ষি গৌতম প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে যে হেতু-বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তিনি ব্যাপ্তি পদার্থের সূচনা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের কথা সেখানেই বলা হইয়াছে। মহর্ষি জায়হৃত্রে অস্ত্রত্বও অব্যভিচার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (২অ°, ২অ°, ১৫।১৭ হৃত্র শ্রুতব্য)। সেখানে তাঁহার কথিত হেতুতে ব্যভিচার নাই, ব্যাপ্তিই আছে, ইহা দেখাইতেই অব্যভিচার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার “ব্যভিচারাদহেতুঃ” (৪অ°, ১অ°, ৫হৃত্র) এই স্বত্বের দ্বারা ব্যভিচার থাকিলে যে হেতু হয় না, ইহা স্পষ্টে বলিয়াছেন। তাহা হইলে হেতুতে অব্যভিচার থাকা আবশ্যক, ইহা বুঝা যায়। ঐ অব্যভিচার পদার্থ যদি ব্যভিচারের অভাবই মহর্ষির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও উহাকেই তিনি ব্যাপ্তি বলিয়াছেন

অর্থাৎ এই অব্যক্তির কথাই দ্বারাই তিনি ব্যাপ্তিলক্ষণ সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। ব্যক্তির অন্বেষণে অব্যক্তিরই যে ব্যাপ্তি পদার্থ, ইহা পরবর্তী অনেক নৈয়্যিকও বলিয়াছেন। যদিও গদ্যে এবং তত্ত্বাত্মক নৈয়্যিকগণ অব্যক্তিরিতরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহারা ব্যাপ্তির যে নিকট স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাই যদি মহর্ষিহ্রোক্ত অব্যক্তির পদার্থ হয় অর্থাৎ মহর্ষি যদি তাহাকেই অব্যক্তির শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়া থাকেন, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে আর তাহাদিগেরই বা আপত্তি কি? গদ্যে অনৌপায়িকরূপে ব্যাপ্তিলক্ষণের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন, অব্যক্তিরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা করা যাইবে না কেন? মহর্ষিহ্রোক্ত অব্যক্তির শব্দকে পারিভাষিক বলিলেও উহার ঐরূপ একটা ব্যাখ্যা করা যায়। পরন্তু গদ্যে ব্যাপ্তির বহুবিধ লক্ষণ বলিলেও শেষে ব্যাপ্ত্যভুগম্য আছে তাঁহার কথিত কোন এক প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই লাববৎতঃ অসম্মতির হেতু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্যক্তির অন্বেষণে অব্যক্তিরূপ ব্যাপ্তি না বলিলেও বাহাকে অব্যক্তিরূপে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, মহর্ষিহ্রোক্ত অব্যক্তির শব্দের দ্বারা তাহাও বুঝা যাইতে পারে, তাহাও সূচিত হইতে পারে। পরন্তু গদ্যের মত স্বীকার না করিয়া কোন নব্য নৈয়্যিক সম্প্রদায় সাধ্যশূন্য স্থানে অবস্থানতরূপে ব্যাপ্তিকেই অর্থাৎ ব্যক্তির অন্বেষণে ব্যাপ্তিকেই লাববৎতঃ সর্বত্র অসম্মতির প্রয়োজক বলিয়াছেন। ব্যাপ্ত্যভুগম্যের টীকা মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং কেবলসাধ্যমান-নীতির শেষে রঘুনাথ শিরোমণি এই মতের উল্লেখপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি অব্যক্তির শব্দের দ্বারা এই মতেরও সূচনা করিতে পারেন। ফলকথা, জ্ঞানসূত্রে ব্যাপ্তির কোন কথা নাই, ব্যাপ্তিবাদ নব্য নৈয়্যিকদিগেরই উদ্ভাবিত, এইরূপ মত প্রকাশ নিতান্তই অজ্ঞতার ফল। যে মহর্ষি পঞ্চাবয়ব জ্ঞানবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, হেতুভাস নিরূপণ করিয়াছেন, অব্যক্তির হেতু সাধ্যসাধন নহে, উহা হেতুভাস, অব্যক্তির হেতুই সাধ্যসাধন, ইহা বলিয়াছেন, হেতু পদার্থে সাধ্য পদার্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্ত উদাহরণ-বাক্যকে তৃতীয় অবয়বরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ব্যাপ্তি পদার্থ জানিতেন না বা মানিতেন না, অথবা জ্ঞানসূত্রে তাহার কিছুমাত্র সূচনা করেন নাই, ইহার জ্ঞান অসম্মত কথা আর কি হইতে পারে? মহর্ষি গোতম পঞ্চমাধ্যয়ে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধ্য ও বৈধর্ম্য অবলম্বন করিয়া বা অসম্মতরূপে বস্তু প্রকার অসম্মত হইতে পারে, সেগুলিকে জ্ঞান নামে পরিচয় করিয়া তাহাদিগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন এবং সেগুলি অসম্মত কেন, তাহাও সেখানে বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি ঐগুলি পড়িয়া গোতমের ব্যাপ্তিবিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচয় পাইয়াছেন, তাহার সর্বপ্রথমে গুরু-শ্রদ্ধা করিয়া জ্ঞানসূত্রের সহিত পরিচিত হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। মূলকথা, বুদ্ধিতে হইবে যে, অসম্মতের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়ই ব্যাপ্তি পদার্থ জানিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থের প্রকাশ করিতেন। যে ব্যাপ্তি অসম্মতের প্রধান ভঙ্গ, সূত্রাৎ বাহা অনাদিশিষ্ট, তাহা কি ঋষিগণের অজ্ঞাত বা অসম্মত থাকিতে পারে? সাধ্যসূত্রে পঞ্চশিখাচার্যের ব্যাপ্তি-



নিম্নে মতের উল্লেখ আছে। ৫ অং। ৩২। পঞ্চমিথ অতি প্রাচীন সাংখ্যচার্য্য। মহাত্মারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও তাঁহার নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে ব্যাপ্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাপ্তি পদার্থ তাঁহার পূর্বাচার্য্যগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাংখ্যগুরু কপিলও ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন। সাংখ্যের ব্যাপ্তিলক্ষণ-সূত্রে ব্যাপ্তি শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়<sup>১</sup>। আবার অস্ত্র সূত্রে ব্যাপ্তি অর্থে সম্বন্ধ ও প্রতিবন্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়<sup>২</sup>। ব্যাপ্তি শব্দ না দেখিলেই যে সেই শাস্ত্রে বা গ্রন্থে ব্যাপ্তি নাই, ব্যাপ্তি জানিতেন না বা ব্যাপ্তি বলেন নাই, এইরূপ নিষ্কান্ত করিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অজ্ঞতার কল। প্রাচীন কালে ব্যাপ্তি অর্থে অব্যভিচার, অবিনাভাব, প্রতিবন্ধ, সম্বন্ধ, সমন, নিয়ম প্রভৃতি বহু শব্দের প্রয়োগ হইত। বৌদ্ধ ভায় ও জৈন ভায়ের গ্রন্থেও ব্যাপ্তি অর্থে অনেক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ব্যাপ্তি শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও ব্যাপ্তি অর্থে অস্বাভাবিক শব্দের ভায় ব্যাপ্তি শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে ব্যাপ্তি অর্থে 'সমন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কন্দলীকার ত্রীধর উহার ব্যাখ্যায় ব্যাপ্তি-বোধক অবিনাভাব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তিনি ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব ও অব্যভিচার শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ 'অবিনাত' শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (প্রশস্তপাদভাষ্যে অনুমান নিকূর্ণ দ্রষ্টব্য)। কণাদ-সূত্রে "প্রসক্তি" শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থ সূচিত হইয়াছে<sup>৩</sup>।

বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব বলিতেন, গবেষণ প্রভৃতি ঐ অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের খণ্ডন করিলেও তাহাতে ব্যাপ্তি পদার্থ খণ্ডিত হয় নাই। ব্যাপ্তির বাহ্য নির্দেশক লক্ষণ হইবে, তাহাকেও কেহ অবিনাভাব শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন। পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে সকলেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। সূত্রাং প্রশস্তপাদ ও কন্দলীকার ত্রীধর অবিনাভাবকেও ব্যাপ্তি বলিতে পারেন। ভাষ্যকার বাংজায়নও ব্যাপ্তি বুঝাইতেই অবিনাভাববৃত্তি অর্থাৎ অবিনাভাবসম্বন্ধ বলিয়াছেন (২।২।২ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ঐ অবিনাভাবসম্বন্ধই ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। উহাকেই ভাষ্যকার অনুমান লক্ষণ-সূত্র (৪) ভাষ্যে বলিয়াছেন—লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ। সূত্রাং ভাষ্যকার ব্যাপ্তির কোন কথা বলেন নাই, ইহাও সত্য কথা নহে। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনগণ সংক্ষেপে উহা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়া ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল সম্বন্ধ শব্দের দ্বারাও অনেক প্রাচীন আচার্য্য ব্যাপ্তি পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাংজায়নও তাহা করিয়াছেন

১। নিয়তপূর্ণসাহিত্যসূত্রায়েরকর্তৃত্ব বা ব্যাপ্তি:। ৫২২।

২। প্রতিবন্ধবৃত্ত: প্রতিবন্ধজাননমুদান:। ১।১০০।

সম্বন্ধভাবসূত্রমুদান:। ৫।১১।

৩। প্রসক্তিবূর্ত্তকর্য্যবশেষত:। ৩।১২।



(২।১।৫১ সূত্রভাষ্য ১) শব্দ-ভাষ্যে অনুমানলক্ষণে “জ্ঞাতসম্বন্ধত” এই কথা দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের জ্ঞানই বলা হইয়াছে। সেখানে পার্থসারথিমিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কি? অল্প সম্প্রদায় বে সকল সম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না; তাহা বলিলে দোষ হয়। তাই ভট্টকুমারিল প্লোকবার্ত্তিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, — “সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাঙ্ক লিঙ্গ-ধর্ম্মস্ত লিঙ্গিনা।”—অনুমানপরিচ্ছেদ, ৪। ভাষ্যকার বাৎস্তানোক্ত লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধও ঐ ব্যাপ্তি বৃত্তিতে হইবে। পার্থসারথিমিশ্র কুমারিলের ব্যাপ্তি পদার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—নিয়ম। বস্তুতঃ নিয়ম শব্দও ব্যাপ্তি অর্থে প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন। নব্য নৈয়ায়িক যখনাথ শিরোমণিও ব্যাপ্তি শব্দের জায় ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (গঙ্গেশের ব্যাপ্তিসিদ্ধান্ত-লক্ষণ-দ্বীপতি ভ্রষ্টব্য)। জায়হুত্রেও ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম শব্দের প্রয়োগ আছে (৩২।১।৬৮।০ সূত্র ভ্রষ্টব্য)। সেই সকল স্থলে ইহা আরও পরিষ্কৃত হইবে।

কলকথা, ব্যাপ্তি অনুমানের প্রধান অঙ্গ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই অনুমিতি হইতে পারে না। অনুমান বৃত্তিতে হইলে প্রথমেই ব্যাপ্তি বুঝা আবশ্যক। অতঃপর অনুমানতত্ত্বের উপদেশক সকল আচার্য্যই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। ঋষিগণ হইতে অনুমানবাদী সকল আচার্য্যই শিষ্যদিগকে ব্যাপ্তির বিস্তৃত উপদেশ করিয়াছেন। ঋষিগণ সূত্রগ্রন্থে সংক্ষেপে তাহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। পরে ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্রমে তাহারই বিস্তৃতি হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগের সৃষ্টিত্ব ও শিষ্যদিগকে উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি সুবিস্তৃত গ্রন্থের দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং বহু বিচারের ফলে ক্রমে ঐ সকল তত্ত্ব বহু মতভেদ হইয়াছে; তাহা অবশ্যই হইবে। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিলেও লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির চরম কারণবস্তুতঃ প্রধান অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। কেহ ঐ পরামর্শরূপ জ্ঞানবিষয় হেতুকেই অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। তব্ধিত্তামণিকার গঙ্গেশ পরামর্শ গ্রন্থে ঐ সকল মত খণ্ডন করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমানপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানচিন্তামণির প্রথমে গঙ্গেশ লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমিতির কারণ, এই কথা বলিয়াছেন। গঙ্গেশের পরগ্রন্থ দেখিয়া ঐ লিঙ্গপরামর্শ শব্দের দ্বারা লিঙ্গ অর্থাৎ হেতুতে পরামর্শ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান—এইরূপ অর্থ বুঝা হয় বটে, কিন্তু গঙ্গেশ ব্যাপ্তিজ্ঞান না বলিয়া লিঙ্গপরামর্শ শব্দ প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, তাহা চিন্তনীয়। গঙ্গেশ প্রথমে কি উদ্যোতকরের মতানুসারেই ঐ কথা বলিয়াছেন? পরে পূর্বপক্ষনিরাসক বিচারের ফলে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? চরম কারণ কারণ হইতে পারে না, এই মতই সংগত মনে করিয়াছেন? অথবা তিনি ব্যাপ্তিজ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ শব্দের দ্বারাও উল্লেখ করিতেন? শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই ঐ বিরোধ তরল করা হইয়া থাকে। কিন্তু নৈয়ায়িক গ্রন্থকারগণ যে কোন কোন স্থলে মতান্তর আশ্রয় করিয়াও বিরুদ্ধবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও ত দেখা যায়। তব্ধিত্তামণি গ্রন্থেও তাহা পাওয়া যাইবে। টীকাকার যখনাথ প্রভৃতিও ত কোন কোন স্থলে “ইদঞ্চ প্রাচীনমতানুসারেণ, ইদমাপাততঃ” ইত্যাদি কথাও



লিখিয়াছেন।<sup>১</sup> কলকথা, অল্প প্রকারে ঐ বিরোধ ভঞ্জন করা যায় কি না, স্বীকৃত চিন্তা করিবেন। অহুমান-হৃদ-ভাষ্যে এই তাৎপর্য্যেই উহা চিন্তনীর বলিয়াছি। সেখানে গদ্যেশের চরম সিদ্ধান্তের অপলাপ করি নাই। এইরূপ কেহ কেহ মনকেই অহুমিত্তির করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরামর্শদীপ্তিতে রঘুনাথ শিরোমণি ঐ মতের আপত্তি নিরাস করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, পরবর্তী কালে বহু ধর্ম্মান্ ব্যক্তির বহু বিচারের ফলে অহুমান বিষয়ে ঐরূপ অবাস্তব বহু মতভেদ হইলেও অহুমানাপ্য ব্যাপ্তি প্রকৃতি মূল পদার্থ বিষয়ে কোন বিবাদ হয় নাই। উহা স্থিরকাল হইতেই ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে। নচেৎ অহুমানতত্ত্বের আলোচনাই হইতে পারে না।

এখন প্রকৃত বিষয়ে অবশিষ্ট বক্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি। পরবর্তী স্বাধীনতাগণ এই সত্যভিচার নামক হেতুভাসকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। (১) “সাধারণ” সত্যভিচার, (২) “অসাধারণ” সত্যভিচার, (৩) “অনুপসংহারী” সত্যভিচার। সাধারণ সত্যভিচারের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ সাধ্য ও সাধ্যভাবের কোন একটি পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই ঐকান্তিক। সেই ঐকান্তিকের বিপরীত হইলেই তাহা অনৈকান্তিক, ইহাই অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং যে ভাবেই হউক, যে হেতু পূর্কোক্ত কোন একটি পক্ষেই নিয়ত নহে, তাহাকে অনৈকান্তিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে যে হেতু সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে, তাহা সাধারণ অনৈকান্তিক বা সত্যভিচার। কারণ, ইহা সাধ্যযুক্ত এবং সাধ্যশূন্য, এই উভয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম। বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না হইলে ঐ সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানবশতঃ ঐরূপ স্থলে সাধ্যসংশয় হয়। ভাষ্যকার এই সাধারণ সত্যভিচারেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে হেতু সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে না, কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, তাহাকেও সাধারণ সত্যভিচার বলিয়াছেন। যেমন গোব্ধের অহুমান করিতে অশ্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাও ঐ মতে সাধারণ সত্যভিচার হইবে। প্রাচীন মতে কিন্তু ইহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস হইবে।

যে হেতু সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত স্থানেও থাকে না, সাধ্যশূন্য বলিয়া নিশ্চিত কোন স্থানেও থাকে না, তাহা অসাধারণ সত্যভিচার। যেমন শব্দে নিত্যত্বের অহুমানে শব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা অসাধারণ সত্যভিচার হইবে। কারণ, শব্দ শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না। শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, তাহা অহুমানের পূর্ক্বে অনিশ্চিত। সুতরাং শব্দ নিত্য বলিয়া নিশ্চিত অস্বাদি পদার্থে এবং অনিত্য বলিয়া নিশ্চিত ঘটাদি পদার্থে না থাকায় উহা নিত্য অথবা অনিত্যত্বের কোন একটি পক্ষে তখন নিয়ত বলা যায় না। তাহা হইলে ঐ স্থলে শব্দকে অনৈকান্তিক বলা যায়। ঐকান্তিক না হইলে তাহাকে তখন অনৈকান্তিকই বলিতে হইবে। পূর্কোক্ত স্থলে শব্দ অসাধারণ অনৈকান্তিক। বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চয় না হইলে ঐ শব্দরূপ অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান ঐ স্থলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মায়। ঐ স্থলে

শব্দে নিত্যত্বের অস্বীকারিতা জন্মে না। (সংশয়-সূত্র-টীকায় দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী অনেক নব্য নৈয়ায়িকের মতে কেবল সাধ্যযুক্ত স্থানে না থাকিলেই সেই হেতু ঐ অসাধারণ সত্যভিচার হইবে। পূর্বোক্ত স্থলে শব্দই নিত্যরূপে সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থে না থাকায় অসাধারণ সত্যভিচার হইবে।

যে ধর্ম সর্বত্র থাকে, তাহার অভাবই নাই, তাহাকে কেবলাধারী ধর্ম বলে। যে ধর্মীতে অস্বীকার করিতে হইবে, সেই ধর্মী যদি কোন কেবলাধারী ধর্মযুক্তরূপে সেখানে ধর্মী হয়, তাহা হইলে সেই স্থলীয় যে কোন হেতু অস্বপনংহারী নামক সত্যভিচার হইবে। যেমন কেহ বলিলেন,—সমস্তই নিত্য, যেহেতু সমস্ত পদার্থই কোন না কোন শব্দের বাচ্য। এখানে সমস্তরূপে কেবলাধারী ধর্মযুক্তরূপে সমস্ত পদার্থই অস্বীকারের ধর্মী হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত পদার্থেই নিত্য সাধ্যের সন্দেহ রহিয়াছে। কোন স্থানেই ঐ স্থলীয় হেতুতে নিত্য সাধ্যের ব্যাধিনিশ্চয় না থাকায় ঐ হেতু ব্যভিচারী। বাহা সাধ্য ও তাহার অভাবরূপ কোন একটি পক্ষে নিরসন নহে, তাহাই যখন অনৈকান্তিক, তখন পূর্বোক্ত স্থলে সমস্ত পদার্থে নিত্য সাধনে প্রযুক্ত হেতুও অনৈকান্তিক। উহার নাম অস্বপনংহারী। পরবর্তী অনেক নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে পূর্বোক্ত কেবলাধারী ধর্ম সাধ্যরূপে অথবা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে সেখানে ঐ হেতু অস্বপনংহারী সত্যভিচার হইবে। এই সকল বিষয়ে পরবর্তিগণ ভূরি চর্চা করায় অনেক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল মতের বিশদ আলোচনা দেখিতে হইলে এবং এ বিষয়ে অস্তিত্ব মতভেদ জানিতে হইলে গঙ্গেশের তত্ত্ব-চিন্তামণি এবং রঘুনাথের দীপ্তি এবং জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে কেবল প্রসিদ্ধ মতভেদগুলিই উল্লিখিত হইল। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণানুসারে কিন্তু অনৈকান্তিকের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিভাগ পাওয়া যায় না ॥ ৫।

## সূত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥৩॥৪৭॥

অস্ববাদ। সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক, তাহা বিরুদ্ধ, (বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস)।

ভাষ্য। তং বিরুদ্ধকীতি তদ্বিরোধী। অভ্যুপেত্য সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি। যথা—সোহয়ং বিকারো ব্যক্তেরপৈতি নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ, ন নিত্যো বিকার উপপদ্যতে, অপেতোহপি বিকারোহস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ, সোহয়ং নিত্যত্বপ্রতিষেধাদিত্যেহেতুর্ব্যক্তেরপেতোহপি বিকারোহস্তীত্যনেন অসিদ্ধান্তেন বিরুদ্ধ্যতে। কথম্? ব্যক্তিরাত্মলাভঃ, অপায়ঃ প্রচ্যুতিঃ, বদ্যাত্মলাভাঃ প্রচ্যুতো বিকারোহস্তি নিত্যত্বপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে,



যদ্যন্তেরপেতস্তাপি বিকারস্বাস্তিত্বং তৎ খলু নিত্যত্বমিতি, নিত্যত্বপ্রতিবেদো নাম বিকারস্বাস্তিত্বলাভাৎ প্রচ্যুতেরূপপত্তিঃ । যদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে তদনিত্যং দৃষ্টং, যদস্তি ন তদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে । অস্তিত্বকাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতিরिति বিরুদ্ধাবেতৌ ধর্মৌ ন সহ সম্ভবত ইতি । মোহিং হেতুর্বাং সিদ্ধান্তমাস্তিত্য প্রবর্ততে তমেব ব্যাহস্তীতি ।

অনুবাদ । তাহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে 'তদ্বিরোধী' । বিশদার্থ এই যে, স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করে, অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক বা বাধক হয়, তাহাই বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস ।

(উদাহরণ) যেমন সেই এই বিকার ( সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত ) ব্যক্তি হইতে ( আত্মলাভ হইতে ) অর্থাৎ ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম হইতে প্রচ্যুত হয় অর্থাৎ চিরকাল ঐ সকল বিকার পদার্থের ঐ ত্রিবিধ পরিণাম থাকে না ; কারণ, নিত্য নাই ( অর্থাৎ ) বিকার নিত্য বলিয়া উপপন্ন হয় না । প্রচ্যুত হইয়াও অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিকার-পদার্থ আত্মলাভ বা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও থাকে ; কারণ, বিনাশ নাই অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিকার পদার্থগুলির বিনাশ না থাকায় উহারা আত্মলাভ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব থাকে । সেই এই ( অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে পাতঞ্জল সিদ্ধান্তবাদীর গৃহীত ) নিত্যত্বের অভাবরূপ হেতু, আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার থাকে—এই নিজ সিদ্ধান্তের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতু ঐ নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হইয়াছে ।

( প্রশ্নপূর্বক ইহা বুঝাইতেছেন ) । ( প্রশ্ন ) কি প্রকারে ? ( উত্তর ) ব্যক্তি বলিতে আত্মলাভ, অপায় বলিতে প্রচ্যুতি । যদি আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার থাকে, ( তাহা হইলে ) নিত্যত্বের নিষেধ উপপন্ন হয় না । ( কারণ ) আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকারের যে অস্তিত্ব, তাহাই ত ( তাহার ) নিত্যত্ব । নিত্যত্বের নিষেধ বলিতে বিকারের আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতির উপপত্তি, অর্থাৎ আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি হওয়াই বিকারের অনিত্যত্ব । বাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যে বস্তুর আত্মলাভ হইতে ভ্রংশ ঘটে, তাহা অনিত্য বলিয়াই নিশ্চিত । বাহা থাকে অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব চিরকালই থাকিবে, তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয় না । অস্তিত্ব এবং আত্ম-

লাভ হইতে প্রচ্যুতি, এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম মিলিত হইয়া থাকে না অর্থাৎ একাধারে থাকে না। সেই এই হেতু অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিত্যস্বাভাবরূপ হেতু, যে সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বিকারের অস্তিত্ব বা সদাতনরূপ যে সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত) হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তকেই অর্থাৎ বিকার-পদার্থগুলির চিরকাল অস্তিত্বরূপ সেই নিত্য সিদ্ধান্তকেই ব্যাহত করিয়াছে।

টিপ্পনী। হুত্রোক্ত সিদ্ধান্ত শব্দের দ্বারা এখানে প্রকৃত সিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে না। যে বাদী বাহ্য সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন, সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে। ফলকথা, সিদ্ধান্তের স্বীকারই এখানে হুত্রকাদের বিবক্ষিত। হুত্রকার এই ভ্রম 'সিদ্ধান্ত-বিরোধী' এই কথা না বলিয়া সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া 'তবিরোধী' এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। অচেতন হেতু পদার্থ কোন সিদ্ধান্ত স্বীকারের কর্ত্তা না হইলেও, হেতুবাদী ব্যক্তি সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, সেই কর্ত্তাই তাহার প্রযুক্ত হেতুতে বিবক্ষা করিয়া মহর্ষি ঐরূপ হুত্র বলিয়াছেন। উদ্যোতকর মহর্ষি-হুত্রের ফলিতার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াছেন যে, বাহ্য স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ। ঐ কথার দ্বারা বাহ্য স্বীকৃত পদার্থকে বাণিত করে অর্থাৎ স্বীকৃত পদার্থের অভাবেরই সাধন হয় এবং বাহ্য স্বীকৃত পদার্থের বিবক্ষা হয়, এই দুই প্রকার অর্থই উদ্যোতকরের বিবক্ষিত। তিনি বলিয়াছেন যে, এইরূপ হুত্রার্থ হইলে আরও যে সকল বিরুদ্ধ হেতুভাস আছে, নেওগুলিও এই হুত্রের দ্বারা বলা হয়। এইরূপ হুত্রার্থ না বলিলে অনেক হেতুভাস বলা হয় না, তাহাতে মহর্ষির হেতুভাস নিরূপণের ন্যূনতা থাকে। বাহ্য স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে পদার্থ স্বরূপতাই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, অথবা যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের হেতুই হয় না, অর্থাৎ বাহ্যতে স্বীকৃত সিদ্ধান্তরূপ সাধ্যপদের সাধনই নাই; তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে উদ্যোতকর এইরূপে ভাষ্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় পূর্বপদ এই যে, তাহা হইলে আর সব্যভিচার প্রভৃতি চতুর্নিধ হেতুভাস বলিবার প্রয়োজন কি? মহর্ষি-হুত্রোক্ত বিরুদ্ধ নামক হেতুভাসের যে লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হইল, এই লক্ষণ সব্যভিচার প্রভৃতি সমস্ত হেতুভাসেই আছে; কারণ, হেতুভাস মাত্রই বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্তের অর্থাৎ সাধ্যপদের সাধন স্বরূপ থাকে না, ঐরূপে সকল হেতুভাসই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। উদ্যোতকর এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, হেতুভাস মাত্রই এই হুত্রোক্ত বিরুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত, অতরাং হেতুভাস মাত্রই বিরুদ্ধ, ইহা সত্য অর্থাৎ এই বিরুদ্ধরূপে হেতুভাসগুলি একই, ইহা সত্য। কিন্তু সব্যভিচার প্রভৃতি হেতুভাসে যে ভ্রম প্রকারে ভেদ আছে, সেই ভেদ ধরিয়াই হেতুভাসকে পক্ষবিধ বলা হইয়াছে। যেমন প্রদেয়রূপে সকল পদার্থ এক হইলেও ভ্রম প্রকারে ভেদ ধরিয়া প্রমাণাদি বোদ্ধ শ পদার্থ বলা হইয়াছে। ফলকথা, উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাহসারে হেতুভাস মাত্রই বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ-সব্যভিচার বিরুদ্ধ-সাধ্যসম ইত্যাদি প্রকার নামে বিরুদ্ধবিশেষই হুত্রোক্ত



অনৈকান্তিক প্রভৃতি শব্দের ব্যাচ। অর্থাৎ অনৈকান্তিক প্রভৃতি হেতুভাসে (১) বিরুদ্ধ এবং অনৈকান্তিক প্রভৃতির (২) কোন একটি, এই দুই ধর্মই আছে, এই জন্ত ঐগুলিতে বিরুদ্ধ নামেরও ব্যবহার হইবে। কিন্তু যে সকল হেতুভাসে অনৈকান্তিক বা নব্যভিচার প্রভৃতি চারিটি ধর্মের কোন ধর্ম নাই, তাহাতে কেবল বিরুদ্ধ নামেরই ব্যবহার হইবে অর্থাৎ সেই সকল হেতুভাস কেবল বিরুদ্ধই হইবে। এই জন্তই পৃথক্ করিয়া মহাবি বিরুদ্ধ নামক হেতুভাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্যোতকর বেক্রপ বলিয়াছেন, ভাষ্যকারেরও তাহাই নত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, ভাষ্যকার বাললক্ষণসূত্রে 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই কথার প্রয়োজন বর্ণনায় মহাবির এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা বাদবিচারে হেতুভাসের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে। হেতুভাসনামাই এই সূত্রোক্ত বিরুদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত না হইলে ভাষ্যকার সেখানে এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন কেন ? (বাদসূত্র-ভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত বিরুদ্ধ নামক হেতুভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে এখানে যোগসূত্র-ভাষ্যপ্রদর্শিত কোন 'অনুমানকে' আশ্রয় করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যোক্ত বিকার শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। ঐগুলি সাংখ্যপরম্পরায় সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মূলপ্রকৃতির বিকৃতি। মূল প্রকৃতি কাহারও বিকৃতি নহে। মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই বিকৃতি; এ জন্ত উহাদিগকে বিকারও বলা হয়। ঐ বিকার পদার্থের যে ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণাম হয়, ভাষ্যকার ঐ ত্রিবিধ পরিণামকেই উহাদিগের "ব্যক্তি" বলিয়াছেন।

যোগসূত্র এবং তাহার ভাষ্য বিকারের পরিণাম ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্মীভবের আবির্ভাবের নাম ধর্মপরিণাম। যেমন মৃত্তিকা পিণ্ডরূপে থাকিয়া ঘটরূপে আবর্তিত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার পিণ্ডভাবের নিবৃত্তি হইয়া ঘটভাবের আবির্ভাব হইলে ধর্মপরিণাম হয়। এক লক্ষণের তিরোভাবের পরে অন্য লক্ষণের আবির্ভাব লক্ষণপরিণাম। যেমন ঘটের আবির্ভাবের পরে যে লক্ষণ থাকে, ঘটের পাক হইলে তখন ঐ লক্ষণের তিরোভাব হইয়া অন্তরূপ লক্ষণের আবির্ভাব হয়। এইরূপ কোন অবস্থাবিশেষের তিরোভাব হইয়া অন্য অবস্থার আবির্ভাব হইলে তাহাকে অবস্থাপরিণাম বলে। যেমন ঘটের নূতন অবস্থার তিরোভাব হইয়া পুরাতন অবস্থা হয় ইত্যাদি।

১। যোগসূত্রভাষ্যে এইরূপ একটি সম্বন্ধ দেখা যায়,—“তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যাক্তেরূপেতি, কস্মাৎ ? নিত্য-প্রতিবেদ্যং, অপেতবশ্যান্তি বিনাশপ্রতিবেদ্যং।” (যোগসূত্র, বিতৃতিপাঠ, ১৩ পুত্রের ভাষ্য)। উদ্যোতকর ভাষ্যভিত্তিক এখানে এই সম্বন্ধটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকরের উদ্ধৃত পাঠে ‘কস্মাৎ’ এই কথাটি নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি যোগসূত্রভাষ্যের নাম করিয়া ঐ কথার উল্লেখ না করিলেও ভাষ্যকার যে যোগসূত্র-ভাষ্য-প্রদর্শিত ঐ অনুমানকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তাৎপর্যটীকাকরের ব্যাখ্যা দেখিলেও তাহাই মনে আসে।

প্রলয়কালে বিকারের এই ত্রিবিধ পরিণাম থাকে না। কারণ, তখন সমস্ত বিকার পদার্থই প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন প্রকৃতিরই কেবল সদৃশ পরিণাম থাকে। ভাষ্যকার পূর্কোক্ত বিকার পদার্থের পূর্কোক্ত ত্রিবিধ পরিণামকেই তাহাদিগের আত্মলাভ বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য-টীকাকারের ব্যাখ্যানসারে বুঝা যায়। ভাষ্যকার “ব্যক্তি” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—আত্মলাভ। ব্যক্তি বলিতে অতিবক্তি বা আবির্ভাব। সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রকৃতি সংকার্যবাদীর মতে বস্তুর আবির্ভাবই বস্তুর আত্মলাভ, অর্থাৎ স্বরূপ লাভ। এবং প্রতি ফণেই অল্প বস্তুর পূর্কোক্ত কোন প্রকার পরিণাম হইতেছে। প্রলয়কালে বিকার পদার্থ প্রকৃতিতে লীন হওয়ার তাহাদিগের কোন প্রকার পরিণাম থাকে না। তখন তাহারা সর্বপ্রকার পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহার হেতু বলা হইয়াছে—নিত্যত্বের অভাব। ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে,—বিকার পদার্থ নিত্য বলিয়া উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য এই যে, বিকার পদার্থগুলি যখন মূল প্রকৃতির স্থায় নিত্য নহে, তখন চিরকালই তাহাদিগের পরিণাম থাকিতে পারে না, তাহারা যখন প্রকৃতিতে লীন হইয়া মূল প্রকৃতিরূপে থাকিবে, তখন পূর্কোক্তপ্রকার ত্রিবিধ পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু তাহারা তখন পরিণামভ্রষ্ট হইলেও অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেলেও থাকিবে। তাহাদিগের অস্তিত্ব চিরকালই আছে। ইহার হেতু বলিয়াছেন—বিনাশের অভাব অর্থাৎ বিকার-পদার্থগুলির যখন একেবারে বিনাশ নাই, তখন ইহার পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও থাকে।

ভাষ্যকার পূর্কোক্ত অহমান উল্লেখ পূর্কক এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্কক যে নিত্যত্বের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বিকারের সর্বকালে অস্তিত্বরূপ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্কক বলা হইয়াছে, বিকারের নিত্যত্ব নাই, পরে বলা হইয়াছে, বিকারের বিনাশ নাই; সুতরাং বিকার সর্বদাই থাকে, এই সর্বদা অস্তিত্বই বিকারের নিত্যত্ব। পূর্কোক্ত নিত্যত্বাভাবরূপ হেতু, এই নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। ফলতঃ পূর্কোক্ত এবং পরোক্ত ঐ দুইটি বাক্য পরস্পর বাধিত। তাৎপর্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যেখানে দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মান্তে সাধ্যধর্ম্ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকে, সেখানেই সেই সাধ্যধর্ম্মের অন্তর্য্যানে প্রযুক্ত হেতুকে ‘কালাত্যাগাদিষ্ট’ বা বাধিত বলে। যেমন ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞাশ্রমে যে পদার্থ হেতুরূপে গৃহীত হইবে, তাহা কালাত্যাগাদিষ্ট বা বাধিত হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণের সর্ববিধ সুরাপানই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ থাকায় ঐ স্থলে সুরাতে ব্রাহ্মণ-বর্জ্য পান-ক্রিয়ায় অভাবই নিশ্চিত আছে। \*পূর্কোক্ত স্থলে দুইটি বাক্যই পরস্পর বিরুদ্ধ এবং তুল্যবল বলিয়া একটি অপরাটিকে বাধা দিতে পারে না। এ জন্ত ঐ স্থলে কালাত্যাগাদিষ্ট বা বাধিত নামক হেতুভাষ্য হইবে না। ঐ স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্যই হইবে।

উদ্যোতকর পরে এই স্থলের ব্যাখ্যানের বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতুবাক্যের বিরোধ হইলেই সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্য হয়। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের এই দ্বিতীয় কন্মের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, “সেই এই বিকার আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়,” এই



প্রতিজ্ঞা “নিত্যত্বের অভাবজ্ঞাপক,” এই হেতুবাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, পরে বলা হইয়াছে যে, বিকার আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও থাকে। যেহেতু বিকারের একেবারে বিনাশ নাই, এই শেখোক্ত কথার দ্বারা ‘বিকার নিত্য’ ইহাই পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার অর্থ বুঝা গিয়াছে অর্থাৎ শেখোক্ত ঐ কথার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার ঐ অর্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিকারের নিত্যত্বই ঐ প্রতিজ্ঞার প্রতিপাদ্য হইলে তাহাতে নিত্যস্বভাবরূপ হেতু থাকিতে পারে না; সুতরাং ঐ হলে প্রতিজ্ঞার্প এবং হেতু পদার্থ বিরুদ্ধ হওয়ায় বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্য হইয়াছে। ভাষ্যে “সদিস্তাস্তেন বিরুদ্ধতঃ” এই হলে সদিস্তাস্ত বলিতে স্বপক্ষ। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থে ভাষ্য সঙ্গম। অর্থাৎ উদ্যোতকরের শেখোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে সহজেই ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যা হয়। এই করে আপত্তি এই যে, মহর্ষি প্রতিজ্ঞা-বিরোধ নামে এক প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধই তাহার অর্থ। মহর্ষি সেই প্রতিজ্ঞা-বিরোধকেই আবার বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্য বলিবেন কিরূপে? উদ্যোতকর এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, যেখানে ঐ বিরোধটি প্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া হইবে, সেখানে উহা “প্রতিজ্ঞা-বিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর যেখানে ঐ বিরোধ হেতুকে আশ্রয় করিয়া হইবে, সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্য হইবে। অর্থাৎ মহর্ষি ঐ বিরোধের আশ্রয়ভেদ বিবক্ষা করিয়াই প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ হইলে নিগ্রহস্থানও বলিয়াছেন এবং হেতুভাষ্যও বলিয়াছেন। ( ৫ অং, ২ অং, ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) । পূর্বোক্ত উদাহরণহলে যোগসূত্র-ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, বিকারের ঐকান্তিক নিত্যতা নাই এবং একেবারে যে উহাদিগের বিনাশ, তাহাও হয় না। এ অল্প উহার সর্বথা অনিত্যও নহে। সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে নিত্য পদার্থ ত্রিবিধ; কূটস্থ নিত্য এবং পরিণামী নিত্য। যে পদার্থের কোনরূপ পরিণাম নাই, বাহ্য চিরকাল একপ্রকারই আছে ও থাকিবে, তাহাকেই বলে কূটস্থ নিত্য, তাহাই ঐকান্তিক নিত্য; যেমন চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। আর যে পদার্থের সর্বদাই কোন প্রকার পরিণাম থাকে, কোন সময়েই বাহার অল্প পদার্থে লয়ের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে বলে পরিণামী নিত্য; সেমন মূলপ্রকৃতি। মহৎ প্রভৃতি বিকার-পদার্থগুলির যখন আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে, তখন তাহাদিগকে ঐকান্তিক নিত্য বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টীকা পূর্বোক্ত হলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের জ্ঞায় জগতের ঐকান্তিক নিত্যতা নাই এবং একেবারে যে সর্বদা অনিত্যতা, তাহাও নাই অর্থাৎ প্রলয়েও প্রকৃতিরূপে জগৎ থাকে, তখন জগৎ অলীক নহে। পরিণামবাদী সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি সংস্কারবাদীর মতে জগতের এই ভাবে কথঞ্চিৎ নিত্যতা এবং কথঞ্চিৎ অনিত্যতা বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু মহর্ষি গোতম অসং-স্কার্য্যপন্থী গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার দিকান্তে বাহার কোন দিন একেবারে বিনাশ হইবে না, তাহা নিত্য। বাহ্য চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাকে অনিত্যও বলিব, আবার নিত্যও বলিব, ইহা গোতম মতে সম্ভব নহে। সুতরাং বিকারকে অনিত্য বলিয়া শেষে আবার

নিত্য বলিতে গেলে, উহা বিরুদ্ধবাদ হইবে। ভাষ্যকার গোঁতম সিদ্ধান্তানুসারেই যোগস্বরের ব্যাণ্ড্যব্যোক্ত অহুনানের হেতুকে বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, যে ধর্মীতে কোন পদার্থের অহুমান করা হয়, ঐ ধর্মী সিদ্ধ পদার্থই থাকে। প্রতিজ্ঞাবাক্যে ঐ ধর্মীরূপ সিদ্ধ পদার্থের অস্তিত্ব সাধ্য পদার্থটি বলা হয়, এ জন্ত সাধ্যধর্মকেই এই স্বত্রে সিদ্ধান্ত শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্মকে উদ্দেশ্য করিয়া (অর্থাৎ তাহার সাধনের জন্ত) প্রযুক্ত হেতু যদি ঐ সাধ্যধর্মের বিরোধী হয় অর্থাৎ যদি সাধ্যধর্মের অভাবেরই সাধক হয়, তাহা হইলে উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন জলে বহির সাধনে জলরূপে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে এবং কোন পদার্থে গোঁতম ধর্মের অহুমান করিতে অশব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, ঐ জলরূপ এবং অশব্দ পদার্থ বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। ফলস্বরূপ, যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সাধন না হইয়া তাহার অভাবেরই সাধন হয় অর্থাৎ সে পদার্থ সাধ্যধর্মের সহিত কোন স্থানেই মিলিত হইয়া থাকে না, সেই পদার্থ সেই সাধ্যধর্মের বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া সেই স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। প্রকরণসম বা সংপ্রতিপক্ষিত হেতু স্থলে বাদীর প্রযুক্ত হেতুই তাহার সাধ্যধর্মের অভাব সাধক হয় না, প্রতিবাদীর প্রযুক্ত অথ হেতুই বাদীর সাধ্যধর্মের অভাবের সাধকরূপে প্রযুক্ত হয়, সুতরাং বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস সংপ্রতিপক্ষিত হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন। নব্য নৈয়ায়িকগণও পূর্বোক্ত প্রকার বিরুদ্ধ হেতুকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। বিরুদ্ধ হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য, তাহাকে ঐ ভাবে বুঝিলে সাধ্যাভাবেরই সেখানে অহুমানিতি হইয়া পড়ে; সুতরাং বাদীর সাধ্যাহুমানিতির বাণী হয়, এই জন্তই নব্যগণ ঐরূপ বিরুদ্ধ হেতুকে হেত্বাভাস বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

**সূত্র।** যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্ঠঃ  
**প্রকরণসমঃ ॥৭॥৪৮॥**

অনুবাদ। যে পদার্থ-হেতুক প্রকরণের চিন্তা জন্মে অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত একটা চিন্তা বা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সেই পদার্থ, নির্ণয়ের জন্ত প্রযুক্ত হইলে প্রকরণসম অর্থাৎ প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস হয়।

ভাষ্য। বিমর্শার্থীষ্টানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবুভাবনবসিতৌ প্রকরণং,—  
তস্তা চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাঙনির্ণয়াদবৎ সমীক্ষণং, সা জিজ্ঞাসা  
যৎকৃতা, স নির্ণয়ার্থঃ প্রযুক্ত উভয়পক্ষসাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্তমানঃ  
প্রকরণসমো নির্ণয় ন প্রকল্পতে। প্রজ্ঞাপনস্থনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্মীনা-  
পলঙ্কেরিত্যানুপলভ্যমাননিত্যধর্মকনিত্যং দৃষ্টং স্থালাদি। যত্র সমানো



ধর্মঃ সংশয়কারণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে স সংশয়সমঃ সব্যভিচার এব ।  
 যাতু বিমর্শস্ত বিশেষাপেক্ষিতা উভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিঃ, সা প্রকরণং  
 প্রবর্তয়তি । যথা শব্দে নিত্যধর্মো নোপলভ্যতে, এবমনিত্যধর্মোহপি,  
 সেয়মুভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং প্রবর্তয়তি । কথম ?  
 বিপর্যয়ে হি প্রকরণনিবৃত্তেঃ, যদি নিত্যধর্মঃ শব্দে গৃহ্যেত, ন স্যাৎ  
 প্রকরণং, যদি বা অনিত্যধর্মো গৃহ্যেত, এবমপি নিবর্তেত প্রকরণং,—  
 সোহয়ং হেতুরুভৌ পক্ষৌ প্রবর্তয়মম্মতরস্ত নির্ণয়ান ন প্রকল্পতে ।

অনুবাদ । সংশয়ের বিষয় অথচ অনির্গত, এমন পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ উভয়  
 ধর্মকে প্রকরণ বলে । সেই প্রকরণের চিন্তা কি না সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব কাল  
 পর্যন্ত যে আলোচনা, সেই জিজ্ঞাসা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত চিন্তারূপ জিজ্ঞাসা যৎকৃত,  
 অর্থাৎ যে পদার্থপ্রযুক্ত, সেই পদার্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইলে উভয় পক্ষে  
 সমানতাবশতঃ প্রকরণকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অতিক্রম না করায়  
 প্রকরণসম হইয়া নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না ।

প্রজ্ঞাপন কিন্তু অর্থাৎ এই প্রকরণসমের উদাহরণ কিন্তু—( প্রতিজ্ঞা ) শব্দ  
 অনিত্য, ( হেতু ) নিত্য ধর্মের অনুপলব্ধি জ্ঞাপক, ( উদাহরণ ) বাহাতে নিত্যধর্মের  
 উপলব্ধি হয় না, এমন স্থানী প্রভৃতি অনিত্য দেখা যায় ( অর্থাৎ এইরূপ স্থাপনায়  
 যে নিত্যধর্মের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা প্রকরণসম নামক  
 হেতুভাস ) । যে স্থলে সমান ধর্মরূপ সংশয়ের প্রযোজক ( পদার্থটি ) হেতু বলিয়া  
 গৃহীত হইবে, তাহা অর্থাৎ হেতু বলিয়া গৃহীত সেই সমানধর্ম সংশয়সম হওয়ার  
 সব্যভিচারই হইবে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণসম হইবে না । বাহা কিন্তু সংশয়ের  
 বিশেষাপেক্ষিতা এবং উভয় পক্ষে বিশেষেয় অনুপলব্ধি, তাহা প্রকরণকে প্রবৃত্ত  
 করে । বিশদার্থ এই যে, যেমন শব্দে নিত্যধর্ম উপলব্ধ হইতেছে না, এইরূপ অনিত্য  
 ধর্মও উপলব্ধ হইতেছে না, সেই এই উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি, প্রকরণ-  
 চিন্তাকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সম্বন্ধে আলোচনারূপ জিজ্ঞাসাকে  
 প্রবৃত্ত করে, ( উপস্থিত করে ) । ( প্রশ্ন ) কেন ? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উভয় পক্ষে  
 বিশেষের অনুপলব্ধি প্রকরণচিন্তার প্রবর্তক হয় কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু বিপর্যয়  
 হইলে প্রকরণের নিবৃত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি নিত্যধর্ম শব্দে উপলব্ধ হইত,  
 তাহা হইলে প্রকরণ অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্যরূপ দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষ

থাকিত না। অথবা যদি শব্দে অনিত্যধর্ম উপলব্ধ হইত, এইরূপ হইলেও প্রকরণ নিবৃত্ত হইত। সেই এই হেতু অর্থাৎ শব্দে নিত্যধর্মের অনুপলব্ধি এবং অনিত্যধর্মের অনুপলব্ধি উভয় পক্ষকে অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্য, এই দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে প্রবৃত্ত করতঃ অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, কি নিত্য, এইরূপ একটা চিন্তা বা জিজ্ঞাসা উপস্থিত করে বলিয়া একতরের অর্থাৎ শব্দে অনিত্য অথবা নিত্যের নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না।

টিপ্পনী। এইবার ক্রমাগতের প্রকরণনামক হেতুভাসের নিরূপণ করিয়াছেন। প্রকরণ শব্দের অর্থ এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। শব্দে নিত্যের সংশয় হইলে নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে নিত্য ও অনিত্য, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে। যিনি নিত্য সাধন করিতে যান, তাহার সম্বন্ধে নিত্য পক্ষ, অনিত্য প্রতিপক্ষ। আবার বিপরীতক্রমে অনিত্য পক্ষ, নিত্য প্রতিপক্ষ। বাদীর ভেদে আবার দুইটিই পক্ষ, সুতরাং ঐ দুইটিকে পক্ষ শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কলকথা, (প্রক্রিয়তে সাধাৎকেনাবিক্রিয়তে) বাহা সাধ্যরূপে প্রকৃত বা অবিকৃত হয়, তাহাই এখানে প্রকরণ। কেহ শব্দে নিত্যকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ অনিত্যকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সেখানে ঐ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম প্রকরণ। উহা বিমর্শের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় হইয়া যে পর্য্যন্ত ‘অববসিত’ অর্থাৎ অনির্ণীত, সে পর্য্যন্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। সংশয়ের পরে একতর নির্ণয় হইয়া গেলে তখন আর ঐ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে না। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা নির্ণীত ধর্মকে বুঝায় না। বাদী ও প্রতিবাদীর নির্ণয় থাকিলেও মধ্যস্থের সংশয় হওয়ায় ঐ দুইটি ধর্ম সংশয়ের বিষয় হয়। বাদবিচারে মধ্যস্থ না থাকিলেও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিবার জন্য একটা সংশয় করিয়া লইতে হয়। নির্ণয় মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক না হইলেও বিচার সংশয়পূর্ব্বক, এ জন্য মহবি সর্ব্বাঙ্গে সংশয়ের পরীক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে একথা পরিষ্কৃত হইবে। স্বত্রের প্রকরণ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া ভাব্যকার শেষে চিন্তা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকরণের যে আলোচনা, তাহাই প্রকরণচিন্তা। ভাব্যোক্ত সমীকণ শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন, আলোচন; আবার তাহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—জিজ্ঞাসা। ভাব্যকারও শেষে জিজ্ঞাসা বলিয়াই স্বত্রোক্ত চিন্তার বিবৃতি করিয়াছেন। এই জিজ্ঞাসা কিসের জন্য হয়? তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন—তত্ত্বের অনুপলব্ধিবশতঃ হয়। শব্দে নিত্য-ধর্মের উপলব্ধি হইলে নিত্যের নিশ্চয় হইয়া যায় এবং অনিত্য-ধর্মের উপলব্ধি হইলে অনিত্যের নিশ্চয় হইয়া যায়। কিন্তু যদি নিত্যধর্মেরও উপলব্ধি না হয় এবং অনিত্যধর্মেরও উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় হয়; সুতরাং শব্দের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়,—ইহাই এই স্থলে প্রকরণচিন্তা। নিত্য ধর্মের অনুপলব্ধিবশতঃ এবং অনিত্য ধর্মের অনুপলব্ধিবশতঃই ঐ জিজ্ঞাসা জন্মে; সুতরাং শব্দে অনিত্যত্বহুমানো ঐ নিত্য-



ধর্মের অল্পপলঙ্কিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা প্রকরণসম নামক হেতুভাঙ্গ হইবে। উহা উভয় পক্ষেই সমান বলিয়া নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ কোন প্রকরণকে অতিক্রম করে না। এ জন্ত প্রকরণসম নামে কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণ যেমন নিশ্চায়ক নহে, তদ্রূপ উভয় পক্ষের বিশেষের অল্পপলঙ্কিও নিশ্চায়ক নহে। এ জন্ত ঐ বিশেষাল্পপলঙ্কিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহাকে প্রকরণসম নামক হেতুভাঙ্গ বলা হইয়াছে। যাহা প্রকরণের তুল্য, তাহাকে প্রকরণসম বলা যায়।

তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ইহা প্রকরণসম শব্দের ব্যুৎপত্তি নাই। কারণ, উভয় পক্ষে সমান বলিয়া সংশয়ের প্রয়োজক হইলেই যদি তাহা প্রকরণসম নামক হেতুভাঙ্গ হয়, তাহা হইলে সব্যভিচার নামক হেতুভাঙ্গও প্রকরণসম হইয়া পড়ে। তবে প্রকরণসম শব্দের প্রকৃতার্থ কি? তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সংপ্রতিপক্ষ হেতুকেই প্রকরণসম বলে। পরবর্তী স্মার্তাচার্য্যগণ এই প্রকরণসমকে সংপ্রতিপক্ষ এবং সংপ্রতিপক্ষিত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যে হেতুর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী অস্ত্র হেতু সং অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বাদী তাঁহার সাধ্যসাধনের জন্ত যে হেতুকে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যের অভাব সাধনের জন্ত যদি অস্ত্র কোন হেতু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ হেতুদ্বয়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ; এই জন্ত ঐ দুই হেতুকেই সংপ্রতিপক্ষ বলা হয়। কিন্তু যদি ঐ দুইটি হেতুর কোন হেতু দুর্বল হয় অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী যদি কোন হেতুর অস্ত্ররূপ দোষ দেখাইতে পারেন, অথবা অস্ত্ররূপ দোষের সংশয়ও জন্মাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই হেতু, অপর প্রবল হেতুটির প্রতিপক্ষ না হওয়ার, সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হইবে না। যেখানে উভয় পক্ষের দুইটি বিরুদ্ধ হেতুই তুল্যবল বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না, কেবল সাধ্য ও তাহার অভাব বিষয়ে সংশয়ই জন্মায়, সেখানেই ঐ দুই হেতুই সংপ্রতিপক্ষ হয়। এই সংপ্রতিপক্ষের উদাহরণ নব্যগণ বেদগণ<sup>১</sup> বলিয়াছেন, ভাব্যকার-প্রদর্শিত উদাহরণ তাহা হইতে বিশিষ্ট। ভাব্যকার “প্রজ্ঞাপনস্ত” এই স্থানে তু শব্দের দ্বারা বৌদ্ধাদি-সম্মত উদাহরণ সংগত নহে, ইহা স্থচনা করিয়াছেন। যাহার দ্বারা প্রজ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি বুকাইরা দেওয়া হয়, এই অর্থে প্রজ্ঞাপন শব্দের দ্বারা এখানে উদাহরণ বুঝিতে হইবে। শব্দে অনিত্যত্বের অল্পমানে নিত্যধর্মের অল্পপলঙ্কিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তখন প্রতিবাদী যদি শব্দে নিত্যত্বের অল্পমান করিতে অনিত্য-ধর্মের অল্পপলঙ্কিকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষের ঐ দুই হেতুই প্রকরণসম বা সংপ্রতিপক্ষ হইবে (বিবৃতি স্রষ্টব্য)। ফলকথা, ভাব্যকার প্রভৃতির মতে যে কোন পদার্থ প্রকরণসম হইতে পারে না। উভয় পক্ষের বিশেষ ধর্মের অল্পপলঙ্কিই হেতুরূপে গৃহীত হইলে তাহাই স্ত্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার প্রবর্তক বা নিষ্পাদক হওয়ার প্রকরণসম বা সং-

১। বাদী বলিলেন,—“শব্দো নিত্যঃ প্রাবর্ত্যতঃ শব্দবৎ”। প্রতিবাদী বলিলেন,—“শব্দোহনিত্যঃ কাৰ্য্যভাঃ শব্দবৎ”। এইরূপ হলে সংপ্রতিপক্ষের উদাহরণ বুকাইতে পারে।

প্রতিপক্ষ হইবে। অন্য কোন পদার্থ হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা স্বপ্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার প্রবর্তক হয় না, ইহাই ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনগণের সিদ্ধান্ত।

পূর্বোক্ত অনৈকান্তিক হইতে এই প্রকরণসমের ভেদ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যেখানে কোন সমান ধর্ম সংশয়ের প্রয়োজক হয় এবং তাহাকেই হেতুরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা সবাভিচারই হইবে। তাৎপর্য্যাত্মক ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, এখানে নিত্য-ধর্মের অল্পপল্লি, উভয়বাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থে নাই এবং অনিত্য-ধর্মের অল্পপল্লিও উভয়বাদিসিদ্ধ অনিত্য পদার্থে নাই, সুতরাং ঐ নিত্যধর্মের অল্পপল্লি এবং অনিত্য-ধর্মের অল্পপল্লি, হেতুরূপে গৃহীত হইলে সবাভিচার হইতে পারে না। ঐ দুইটি পরস্পর সংপ্রতিপক্ষ হওয়াতেই প্রকরণসম বা সংপ্রতিপক্ষ নামক হেতুভ্রান্ত হইবে। বস্তুতঃ যাহা উভয়বাদিসম্মত নিত্য পদার্থেও আছে এবং ঐরূপ অনিত্য পদার্থেও আছে, এমন পদার্থই নিত্যের অহুমান সবাভিচার হইবে। মহাবি-কথিত সবাভিচার-লক্ষণ ঐ স্থলে ঐরূপ পদার্থেই থাকে। যেমন শব্দে নিত্যস্বাহুমান অস্পর্শক। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা নব্যসম্মত অসাধারণ ও অল্পসংসহারীকে তিনি সবাভিচার বলেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রাচীন মতে এই সংপ্রতিপক্ষতা অনিত্য দোষ। অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কোন পক্ষের লিপ্য-পরামর্শের কোন অংশে ভ্রম নিশ্চয় না হইবে, সেই পর্য্যন্তই উভয় পক্ষের গৃহীত বিরুদ্ধ হেতুসম সংপ্রতিপক্ষ থাকিবে। একই আধারে নিত্যের ব্যাপ্য ধর্ম এবং অনিত্যের ব্যাপ্য ধর্ম বস্তুতঃ কিছুতেই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ ভাবে ঐ স্থলে উভয়বাদীর লিপ্যপরামর্শ-দ্বয়ের কোন একটিকে কোন অংশে নিশ্চয়ই ভ্রম বলিতে হইবে। যে সময়ে সেই ভ্রম নিশ্চয় হইবে, তখন আর দেখানে সংপ্রতিপক্ষ হইবে না। এই ভাবে প্রাচীন মতে নির্দোষ হেতুস্থলেও বিরুদ্ধ হেতুর ভ্রম পরামর্শ হইলে ঐ ভ্রম নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত সংপ্রতিপক্ষ হইবে। তদ-চিন্তামণিকার হেতুভ্রান্ত সামান্য-লক্ষণ ব্যাখ্যা-প্রস্তাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও সংপ্রতিপক্ষতার অনিত্য-দোষই বুঝা যায়। কিন্তু নব্য নৈরাসিক রঘুনাথ হেতুর দোষমাত্রকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করায় তিনি গল্পেশের গ্রন্থের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রঘুনাথ প্রকৃতি নব্য নৈরাসিক-গণের মতে যে ধর্ম্মীতে কোন সাধ্যের সাধন করিতে বাদী কোন একট হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্য ধর্ম যদি বস্তুতঃ থাকে, সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হয়। যেমন জলে বহির অভাবের ব্যাপ্য জলধর্ম থাকায় জলে বহির অহুমান সংপ্রতিপক্ষ হয়। ঐরূপ দোষ নিত্যদোষ। কারণ, বহির অভাবের ব্যাপ্যধর্ম্মটি জলে সর্বদাই আছে। রক্ত-কোষকার সংপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় পক্ষেই সংশয়কার অহুমতি জন্মে, এই মত বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। গল্পেশ ঐ মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ৷৮৥৪৯৥

**সূত্র।** সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ ॥৮॥৪৯॥

অনুবাদ। সাধ্যবশতঃ অর্থাৎ অসিদ্ধ নিবন্ধন সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট



পদার্থ সাধ্যসম ( সাধ্যসম নামক হেতুভাস ) অর্থাৎ যে পদার্থ অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য পদার্থের সদৃশ, তাহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সাধ্যসম নামক হেতুভাস হয় ।

ভাব্য । দ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমত্বাদিতিহেতুঃ সাধ্যোনাবিশিষ্টঃ সাধনীয়ত্বাৎ সাধ্যসমঃ । অরমপ্যসিদ্ধত্বাৎ সাধ্যবৎ প্রজ্ঞাপয়িতব্যঃ, সাধ্যং তাবদেতৎ—কিং পুরুষবচ্ছায়াইপি গচ্ছতি ? আহো স্বিদাবরকদ্রব্যে সংসর্পতি আবরণসন্তানাদসম্মিধিসন্তানোহয়ং তেজসো গৃহ্যত ইতি । সর্পতা খলু দ্রব্যেণ যো যন্তেজোভাগ আত্রিয়তে তস্ত তস্তাসম্মিধিরেবাবিচ্ছিন্নো গৃহ্যত ইতি, আবরণস্ত প্রাপ্তিপ্ৰতিষেধঃ ।

অনুবাদ । ছায়া দ্রব্য, ইহা সাধ্য অর্থাৎ ছায়ার দ্রব্যের অথবা দ্রব্যের বিশিষ্ট ছায়া মীমাংসকদিগের সাধ্য । ‘গতিমত্বাৎ’ এই বাক্য-প্রতিপাদ্য হেতু অর্থাৎ ছায়ার দ্রব্যের সাধনে মীমাংসকদিগের গৃহীত গতিমত্ব বা গমনক্রিয়ারূপ হেতু সাধনীয়ত্ব-বশতঃ অর্থাৎ ছায়াতে ঐ গতিমত্ব অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সাধ্যসম অর্থাৎ সাধ্যসম নামক হেতুভাস । ( সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট কেন, তাহা বলিতেছেন ) ইহাও অর্থাৎ হেতুরূপে গৃহীত গতিমত্ব বা গমনক্রিয়াও অসিদ্ধত্ববশতঃ অর্থাৎ ছায়াতে সিদ্ধ নয় বলিয়া সাধ্যের দ্বারা অর্থাৎ ছায়াতে দ্রব্যের দ্বারা প্রজ্ঞাপনীয় ( সাধনীয় ) । ( ছায়াতে গতিক্রিয়া অসিদ্ধ কেন, তাহা বলিতেছেন ) ইহা সাধ্য অর্থাৎ ইহা সাধন করিতে হইবে, পুরুষের দ্বারা ছায়াও কি গমন করে ? অথবা আবরক দ্রব্য গমন করিতে থাকিলে অর্থাৎ আলোকের আচ্ছাদক পুরুষ যখন গমন করে, তখন আবরণের সমষ্টিবশতঃ ইহা আলোকের অসম্মিধির সমষ্টি অর্থাৎ আলোকসম্মিধানের অভাব-সমষ্টি উপলব্ধ হয় । বিশদার্থ এই যে, গমন করিতেছে যে দ্রব্য, তৎকর্তৃক অর্থাৎ গমনবিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক যে যে আলোকাংশ আবৃত হয়, সেই সেই আলোকাংশের অবিচ্ছিন্ন অসম্মিধানই উপলব্ধ হয় । আবরণ কিন্তু প্রাপ্তির অভাব অর্থাৎ আলোকের সম্বন্ধের অভাবই আলোকের আবরণ ।

টিপ্পনী । হুত্রে সাধ্যাবিশিষ্ট এই কথাটির দ্বারা সাধ্যসম নামক হেতুভাসের লক্ষণ হুত্রে ইহা আছে । ইহাকেই পরবর্তী শ্রীমদাশ্রম অসিদ্ধ নামে উল্লেখ করিয়াছেন । বাহা সাধ্যের দ্বারা সিদ্ধ পদার্থ নহে অর্থাৎ অসিদ্ধ, তাহাকে সাধ্য সাধনের জন্য হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সাধ্যসম নামক অথবা অসিদ্ধ নামক হেতুভাস । তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে,

এই অসিদ্ধ (১) স্বরূপাসিদ্ধ, (২) একদেশাসিদ্ধ, (৩) আশ্রয়াসিদ্ধ এবং (৪) অন্ত্যাসিদ্ধ—  
এই চারি প্রকারে হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার অসিদ্ধই অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট।  
সুতরাং সাধ্যাবিশিষ্ট, এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার অসিদ্ধই সংগৃহীত হইয়াছে। এবং  
অসিদ্ধ শব্দের দ্বারা লক্ষণ না বলিয়া সাধ্যাবিশিষ্ট শব্দের দ্বারা লক্ষণ বলার উদ্দেশ্য এই যে,  
অত্যন্ত অসিদ্ধই যে কেবল সাধ্যসম, তাহা নহে, বাহা কোন বাদীর সিদ্ধ, কিন্তু প্রতিবাদীর তাহা  
অসিদ্ধ, সুতরাং সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ার ঐ পদার্থও হেতুরূপে গৃহীত হইলে সাধ্যসম নামক  
হেতুভাস হইবে। কিন্তু বাদী ঐ পদার্থের সাধন করিতে পারিলে তখন আর তাহা সাধ্যসম হইবে  
না। কারণ, তখন ঐ পদার্থ উভয় মতেই সিদ্ধ হওয়ার সাধ্য হইতে বিশিষ্ট হইয়া যায়। তখন সে  
পদার্থে সাধ্যত্ব থাকে না। সুত্রে “সাধ্যত্বাৎ” এই স্থলে সাধ্যত্ব শব্দের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে—  
অসিদ্ধতা। অসিদ্ধ পদার্থই সাধ্য হইয়া থাকে, সিদ্ধ পদার্থে সাধ্যতা থাকে না, সাধ্য পদার্থেও  
সিদ্ধতা থাকে না, সুতরাং সূত্রোক্ত সাধ্যত্ব শব্দের দ্বারা অসিদ্ধতাই ফলিতার্থ বুঝা যাইতে পারে।  
তাহা হইলে অত্যন্ত অসিদ্ধ পদার্থও অসিদ্ধতাবশতঃ সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ার সাধ্যসম হইতে  
পারিবে। কোন পদার্থের সর্বদা অসিদ্ধতা আছে, কোন পদার্থের সাময়িক অসিদ্ধতা আছে;  
কিন্তু অসিদ্ধত্বরূপে সর্বপ্রকার অসিদ্ধই সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ার সর্বপ্রকার অসিদ্ধই সাধ্যসম  
হইতে পারিবে অর্থাৎ সূত্রোক্ত এই সাধ্যসমের লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যই আছে। তবে হেতুভাসের  
সামান্য লক্ষণ না থাকিলে তাহা কোন বিশেষ হেতুভাসও হইবে না। কারণ, বিশেষ লক্ষণ সামান্য  
লক্ষণ-সাপেক্ষ।

ভাষ্যকার এই সাধ্যসমের উদাহরণ প্রদর্শনের সহিতই স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। মীমাংসক  
সম্প্রদায় ছায়া বা অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধনে  
তাহার গতিমত্ব বা গমন-ক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদিগের কথা এই যে, কোন  
মুখ্য গমন করিতে থাকিলে তখন তাহার পাছে পাছে ছায়াও গমন করে, ইহা দেখা যায়;  
সুতরাং ছায়া বা অন্ধকারে গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। গতিক্রিয়া থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্থই হয়,  
দ্রব্য ভিন্ন আর কোন পদার্থে গতিক্রিয়া থাকে না, ইহা সর্ববাদিসম্মত। বিশেষতঃ নৈমায়িকগণের  
ইহা সমর্থিত সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে ঐ গতিক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন  
করা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ নহে, উহা কতকগুলি আলোকের  
অভাববিশেষ। গতিক্রিয়া থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্থই হয় বটে, কিন্তু ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ  
নহে। ভাষ্যে “সাধনীয়ত্বাৎ” এই কথাটি সূত্রের “সাধ্যত্বাৎ” এই কথার ব্যাখ্যা নহে। ছায়াতে গতি-  
ক্রিয়া সাধনীয় অর্থাৎ অসিদ্ধ, ইহাই ঐ কথার দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মীমাংসকের  
গৃহীত গতিক্রিয়ারূপ হেতুকে ছায়াতে অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট বলিয়া বুকাইয়াছেন।  
ছায়াতে দ্রব্যত্বরূপ সাধ্য পদার্থকে অথবা দ্রব্যত্বরূপে ছায়াকে মীমাংসক যেন সাধন করিবেন,  
তদ্রূপ ছায়াতে গতিক্রিয়াও সাধন করিতে হইবে। ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ না হইলে



উহা হেতু হইতে পারে না, উহাতে হেতুর লক্ষণ থাকে না, সুতরাং ঐ স্থলে উহা সাধ্যসম নামক হেতুভাঙ্গ।

ছায়াতে গতিজিয়া দিচ্ছ পদাৰ্থ নয় কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য চলিয়া যাইতে থাকিলে তখন সেই মনুষ্যের ছায় ছায়াও গমন করে কি না, ইহা সাধ্য ; ছায়া পুরুষের ছায় তাহার পাছে পাছে গমন করে, ইহা সাধন করিতে হইবে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কারণ, আমরা উহা স্বীকার করি না। কারণ, কোন মনুষ্য গমন করিতে থাকিলে সেই স্থানীয় যে সকল তৈজসিক অংশ ঐ মনুষ্য কর্তৃক আবৃত হয়, সেই সকল তৈজসিক অংশের অর্থাৎ আলোকের অভাবগুলিই ঐ স্থানে অবিচ্ছিন্নরূপে অদৃশ্য হইয়া থাকে, ইহা বলিতে পারি। যে স্থানের সহিত ঐ তৈজসিক অংশগুলির বা আলোকগুলির প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইত, সেই স্থান দিয়া মনুষ্য গমন করে বলিয়া সেই স্থানে সেই আলোকগুলির সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই সেখানে আলোকের অবরণ। ফলতঃ উহা সেখানে কতকগুলি আলোক-সদৃশের অভাব। ঐ সম্বন্ধের অভাববশতই সেখানে কতকগুলি আলোকের অভাবই অদৃশ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ কতকগুলি আলোকের অবিচ্ছিন্ন অভাবসমষ্টিই ছায়া বা অন্ধকার, উহা ভাব পদাৰ্থ নহে। তাহা হইলে উহাতে গতিজিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব পদাৰ্থে গতিজিয়া সৰ্ব্বমতেই অসিদ্ধ। সুতরাং ছায়া বা অন্ধকারের গতিজিয়া অসিদ্ধ বলিয়া উহা পূৰ্ব্বোক্ত স্থলে হেতু হয় না, উহা সাধ্যসম নামক হেতুভাঙ্গ। (বিরূতি দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যে সন্তান শব্দের অর্থ সন্নিবিষ্ট। আবরণ শব্দের অর্থ সম্বন্ধের অভাব। গমনকারী ব্যক্তি কর্তৃক আবৃত আলোকসমূহের বস্তুগুলি সম্বন্ধাভাব, তৎপ্রযুক্ত ঐ আলোকগুলির অভাবসমূহ অদৃশ্য হইয়া থাকে। ঐ আলোকসমূহের অসন্নিবিষ্ট বা অভাব অবিচ্ছিন্নভাবে অদৃশ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে স্থান পর্য্যন্ত ছায়া দেখা যায়, সেই স্থানের সর্বত্রই পূৰ্ব্বোক্ত প্রকার আলোকের অসন্নিবিষ্ট বা অভাব অদৃশ্য হইয়া থাকে, ইহাই ভাষ্যকারের অর্থ।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার-প্রদৰ্শিত সাধ্যসমের উদাহরণটি স্বরূপাসিদ্ধ, আশ্রয়সিদ্ধ এবং অস্ত্রথাসিদ্ধের সাধারণ উদাহরণ, উদ্যোতকর তাহা বুঝাইয়াছেন। যেমন ছায়াতে দ্রব্য সাধ্য, তদ্রূপ গতিজিয়াও সাধ্য অর্থাৎ ছায়াতে গতিজিয়া স্বরূপতাই অসিদ্ধ, তাই উহা স্বরূপাসিদ্ধ সাধ্যসম। নীমাংসক যদি বলেন যে, ছায়াতে বস্তু দেখা শুধু দেখি, তখন তাহার গতিজিয়া আছে, এক স্থানে দৃষ্ট পদাৰ্থের অস্তিত্ব দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না,—এত-  
দ্রব্যের উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও ঐ হেতু আশ্রয়সিদ্ধ। কারণ, ছায়া দ্রব্য হইলেই তাহার দেশান্তরে দর্শন বলা যাইতে পারে। ছায়ায় দ্রব্য বস্তু সিদ্ধ হয় নাই, তখন ঐ কথা বলা যাইতে পারে না। যিনি ছায়াতে দ্রব্যরূপে মানিয়া লইয়া তাহার দেশান্তর-দর্শনের দ্বারা তাহার গতিজিয়ার অস্তিত্ব করিবেন, তাহার পক্ষে ঐ হেতু আশ্রয়সিদ্ধ। কারণ, দ্রব্যরূপ ছায়া সিদ্ধ পদাৰ্থ নহে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া দেশান্তরে দর্শনকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে ঐ হেতু আশ্রয়সিদ্ধ হইবে। আর যদি ছায়ায় দেশান্তরে দর্শন স্বীকারই করা যায়,

তাহা হইলেও ঐ দেশান্তরে দর্শনরূপ হেতু অন্তর্ধানিক। কারণ, ছায়াকে আলোকবিশেষের অভাববিশেষ বলিলেও তাহার দেশান্তরে দর্শন হইতে পারে। যাহা অন্ত প্রকারেও অর্থাৎ ছায়া দ্রব্য না হইলেও নিক হইতে পারে, সেই দেশান্তরে দর্শন হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছায়াতে গতিক্রিয়ার অনুমান করা যায় না। ঐ হেতু ঐ স্থলে অন্তর্ধানিক বলিয়া সাধাসন নামক হেতুভাস। উদ্যোতকর পূর্বোক্ত প্রকারে সাধাসন বা অসিককে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তাৎপর্য-টীকাকার যে একদেশাসিক নামেও এক প্রকার অসিক বলিয়াছেন, উদ্যোতকরের মতে তাহা স্বরূপাসিকের অন্তর্গত।

নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সাধাসনের নাম বলিয়াছেন “অসিক”। এবং আশ্রয়াসিক, স্বরূপাসিক এবং ব্যাপ্যাসিক—এই নামত্রয়ে ঐ অসিককে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করিতে হেতু প্রয়োগ হইবে, ঐ ধর্ম্মীকে আশ্রয় বলে। নব্যগণ ঐ ধর্ম্মীকে পক্ষ বলিয়াছেন এবং আশ্রয়ও বলিয়াছেন। ঐ আশ্রয় অসিক হইলে ঐ হেতু আশ্রয়াসিক। যেমন আকাশ-কুন্তলে কেহ গন্ধের অনুমান করিতে গেলে তাহার প্রযুক্ত হেতু আশ্রয়াসিক এবং স্বর্গময় আকাশ শব্দের কারণ, এইরূপে কেহ অনুমান করিতে গেলে আকাশে স্বর্গময়রূপ বিশেষণ না থাকায় ঐ আশ্রয় অসিক। সুতরাং ঐ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই আশ্রয়াসিক। যে হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হইবে, ঐ হেতু পদার্থ পূর্বোক্ত ধর্ম্মী বা পক্ষে না থাকিলে তাহা স্বরূপাসিক। যেমন জলে বহির অনুমানে ধূমকে হেতু বলিলে এবং শব্দে নিত্যত্বের অনুমানে চাক্ষুযকে হেতু বলিলে ঐ ধূম জলে না থাকায় এবং চাক্ষুয শব্দে না থাকায় উহা স্বরূপাসিক হইবে। কোন স্থলে হেতু পদার্থ পূর্বোক্ত ধর্ম্মীতে সন্নিবিষ্ট হইলেও তাহা স্বরূপাসিক হইবে। তাহাকে বলে সন্নিবিষ্টাসিক। যেখানে সাধ্য পদার্থ অথবা হেতু পদার্থ অপ্রসিক, অর্থাৎ সাধ্যবর্ণে প্রযুক্ত বিশেষণটি সাধ্যধর্ম্মে নাই অথবা হেতু পদার্থে প্রযুক্ত বিশেষণটি হেতু পদার্থে নাই, সেখানে ঐ হেতুর নাম ব্যাপ্যাসিক। যেমন পক্ষিতে স্বর্গময় বহির অনুমান করিতে গেলে স্বর্গময়ত্ব বিশেষণটি বহিতে না থাকায় ঐ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই ব্যাপ্যাসিক হইবে। এবং পক্ষিতে বহির অনুমানে স্বর্গময় ধূমকে হেতু বলিলেও পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যাপ্যাসিক হইবে। এবং পক্ষিতে বহির অনুমানে নীল ধূমকে হেতু বলিলেও অনেকের মতে ঐ হেতু ব্যাপ্যাসিক হইবে। তাঁরাদিগের অভিপ্রায় এই যে, পক্ষিতে বহির অনুমানে ধূম হেতুতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ। কেবল ধূমকে সন্দেহবিশেষে হেতু বলিলেই চলিতে পারে। পরন্তু ধূমরূপেই ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে, ধূমে ব্যর্থ বিশেষণের প্রয়োগ করিলে সেইরূপে তাহাতে ব্যাপ্য অসিক হওয়ার ঐরূপ স্থলে ঐ হেতু ব্যাপ্যাসিক হইবে। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ইহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, হেতু পদার্থে কোন ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে হেতুর কোন দোষ হইতে পারে না। সেইরূপ স্থলে হেতুবাদী ব্যক্তিগণই দোষ হইবে। ঐরূপ হেতুবাদীই “অসিক” নামক নিগ্রহস্থান-প্রযুক্ত সেখানে নিগৃহীত হইবেন। ফলকথা, বহির অনুমানে নীল ধূমকে হেতু বলিলে ব্যর্থ বিশেষণ প্রযুক্ত উহা কোন হেতুভাস হইবে না, ইহাই রঘুনাথের



সিদ্ধান্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ নব্য মতানুসারে সূত্র-ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু যদি কোন অংশে কোন প্রকারে অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু সাধ্যাসন্ন নামক হেত্বাভাস, ইহাই সূত্রার্থ। সূত্রে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম—এই কথাটির অধ্যাহার না করিলে সূত্রের দ্বারা কেবল স্বরূপাসিদ্ধেরই লক্ষণ পাওয়া যায়, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা ॥৮॥

### সূত্র। কালাত্যয়াপদিফঃ কালাতীতঃ ॥৯॥৫০॥

অনুবাদ। যে পদার্থ কালাত্যয়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মোক্তে বলবৎ প্রবাহের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব নির্ণয় হওয়ায় সাধ্য সংশয়ের কাল অতীত হইলে বাহ্য ঐ সাধ্যসাধনের জন্ম হেতুরূপে গৃহীত, সেই পদার্থ কালাতীত (কালাতীত নামক হেত্বাভাস)।

ভাষ্য। কালাত্যয়েন যুক্তো যস্যার্থেকদেশোহপদিষ্ঠ্যমানস্ত স কালাত্যয়াপদিফঃ কালাতীত উচ্যতে। নিদর্শনম্—নিত্যঃ শব্দঃ সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ রূপবৎ, প্রাগ্লুক্যং ব্যক্তেরবস্থিতং রূপং প্রদীপ-ঘটসংযোগেন ব্যজ্যতে, তথা চ শব্দোহপ্যবস্থিতো ভেরী-দণ্ডসংযোগেন ব্যজ্যতে দারুপরশুসংযোগেন বা, তস্মাৎ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইত্যয়মহেতুঃ কালাত্যয়াপদেশাৎ। ব্যঞ্জকস্ত সংযোগস্ত কালং ন ব্যঙ্গ্যস্ত রূপস্ত ব্যক্তি-রত্যেতি। সতি প্রদীপসংযোগে রূপস্ত গ্রহণং ভবতি, নিবৃত্তে সংযোগে রূপং ন গৃহ্যতে নিবৃত্তে দারুপরশুসংযোগে দূরস্থেন শব্দঃ শ্রুতং বিভাগ-কালে, সেয়ং শব্দস্ত ব্যক্তিঃ সংযোগকালমত্যেতীতি ন সংযোগনির্মিতা ভবতি। কস্মাৎ? কারণাভাবাক্তি কার্য্য্যভাব ইতি। এবমুদাহরণসাধ্যশ্র-ম্মাভাবাদসাধনময়ং হেতুর্হেত্বাভাস ইতি।

অবয়ববিপর্য্যাস-বচনস্ত ন সূত্রার্থঃ। কস্মাৎ? “যস্ত যেনার্থসম্বন্ধো দূরস্থস্তাপি তস্ত সঃ। অর্থতো হুসমর্থানামানন্তর্য্যমকারণং” ইত্যেতদ্-বচনাদ্বিপর্য্যাসেনোক্তো হেতুরুদাহরণসাধ্যশ্রম্মাৎ তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুলক্ষণং ন জহাতি, অজহঙ্কেতুলক্ষণং ন হেত্বাভাসো ভবতীতি। অবয়ব-বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালমিতি নিগ্রহস্থানমুক্তং, তদেবেদং পুন-রুচ্যত ইতি অন্তস্তম সূত্রার্থঃ।

অনুবাদ। অপদিষ্টমান অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত্যমান যে পদার্থের অর্থৈক-  
দেশ অর্থাৎ হেতু পদার্থের বিশেষণ কালাত্মক যুক্ত হয় অর্থাৎ কালবিশেষকে  
অতিক্রম করে, সেই পদার্থ কালাত্মকে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হওয়ায় কালাতীত নামে  
কথিত হয় অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থকেই কালাতীত নামক হেতুভাষ্য বলে।

নিদর্শন অর্থাৎ ইহার উদাহরণ (বলিতেছি)। (প্রতিজ্ঞা) শব্দ নিত্য অর্থাৎ  
শব্দ তাহার শ্রবণের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, (হেতু) সংযোগ-ব্যঙ্গ্য  
জ্ঞাপক। (উদাহরণ) যেমন রূপ। অভিব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যকের পূর্বে এবং  
পরে বিদ্যমান রূপ (ঘটের রূপ) প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয়  
অর্থাৎ প্রত্যক হয়। (উপনয়) শব্দও সেই প্রকার অর্থাৎ ঘটরূপের স্থায় পূর্ব  
হইতেই বিদ্যমান থাকিয়া ভেরী ও দণ্ডের সংযোগের দ্বারা অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের  
সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয় অর্থাৎ ত্রুত হয়। (নিগমন) সেই সংযোগ-ব্যঙ্গ্য-  
হেতুক শব্দ নিত্য (পূর্ব হইতেই অবস্থিত)। ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংযোগ-ব্যঙ্গ্য  
আহেতু (হেতু নহে, হেতুভাষ্য)। কারণ, কালাত্মক যুক্ত প্রয়োগ হইয়াছে।  
(সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন) ব্যঙ্গ্য রূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রদীপের সহিত  
ঘটের সংযোগজন্য যে রূপপ্রত্যক হয়, ঐ রূপপ্রত্যক ব্যঙ্গ্যক সংযোগের (প্রদীপের  
সহিত ঘটের সংযোগের) কালকে অতিক্রম করে না। (কারণ) প্রদীপের সংযোগ  
বিদ্যমান থাকিলেই রূপ প্রত্যক হয়, সংযোগ নিবৃত্ত হইলে রূপ প্রত্যক হয় না  
অর্থাৎ যে পর্যন্ত ঘটের সহিত প্রদীপের সংযোগ থাকে, সেই পর্যন্তই ঘটের রূপের  
প্রত্যক হয়, (কিন্তু) কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইলে বিভাগের সময়ে  
অর্থাৎ যখন কাষ্ঠ হইতে কুঠারের বিভাগ হয়, সেই কাষ্ঠ হইতে কুঠারের উত্তোলন-  
কালে দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করে। সেই এই শব্দের অভিব্যক্তি (শ্রবণ) অর্থাৎ  
যাহা কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগকালে জন্মে না, বিভাগ-কালেই জন্মে, তাহা  
সংযোগের কালকে (কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ-কালকে) অতিক্রম করে;  
এই হেতু (উহা) সংযোগজন্য হয় না অর্থাৎ ঐ শব্দ শ্রবণ ঐ স্থলে কাষ্ঠের সহিত  
কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ-জন্য, ইহা বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ কাষ্ঠের  
সহিত কুঠারের সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, তাহাতে ঐ শব্দ-শ্রবণ  
ঐ সংযোগ-জন্য হইবে না কেন? (উত্তর) যেহেতু কারণের অভাব প্রযুক্ত  
কার্যের অভাব হইয়া থাকে (অর্থাৎ যদি ঐ স্থলে কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগ ঐ শব্দ  
শ্রবণের কারণ হইত, তাহা হইলে ঐ সংযোগের অভাবে ঐ শব্দ শ্রবণরূপ কার্য



হইতে পারিত না। যাহা কারণ, তাহা কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকিবে এবং তাহার অভাবে কখনই কার্য হইবে না। প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ নিবৃত্ত হইলে ঘটের রূপ দর্শন তখন হয় না, সুতরাং সেখানে ঘটরূপ প্রত্যক্ষ ঐ সংযোগ-জন্ম, সুতরাং ঘটের রূপ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য; কিন্তু শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্ম নহে, সুতরাং শব্দকে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলা যায় না)। এইরূপ হইলে উদাহরণের সাধন্য না থাকায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনুমানে দৃষ্টান্ত যে ঘটের রূপ, তাহার সাধন্য যে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা ঐ অনুমানে সাধন্যমণী যে শব্দ, তাহাতে না থাকায় এই হেতু অর্থাৎ পূর্বোক্তানুমানে হেতুরূপে গৃহীত সংযোগ-ব্যঙ্গ্য সাধন না হওয়ায় (হেতু-লক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায়) হেতুভাস।

অবয়বের বিপরীতক্রমে উল্লেখ কিন্তু সূত্রার্থ নহে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া শেষে হেতুবাক্য বলিলে ঐ হেতু কালাত্যায়ে প্রযুক্ত হওয়ায় কালাতীত হইবে, ইহা কিন্তু সূত্রার্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যে বাক্যের সহিত যে বাক্যের অর্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ অর্থের কি না সামর্থ্যের সহিত সম্বন্ধ আছে, সেই বাক্য দূরস্থ হইলেও তাহার সেই অর্থ সম্বন্ধ থাকে। যে হেতু অর্থতঃ অসমর্থ বাক্যগুলির অর্থাৎ যে বাক্যগুলির পরস্পর মিলিত হইয়া বাক্যার্থ-বোধে সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের আনন্তর্য্য অর্থাৎ নিকটবর্তিতা (বাক্যার্থবোধে) কারণ নহে, অর্থাৎ বাক্যগুলি মিলিত হইয়া বাক্যার্থবোধে সমর্থ হইলে তাহারা যথাস্থানে কথিত না হইয়া বিপরীতক্রমে কথিত হইলেও বাক্যার্থবোধ জন্মায়। বাক্যার্থবোধে সামর্থ্য থাকিলে তাহা দূরস্থ বাক্যও থাকে, এই বচন প্রযুক্ত বিপরীতক্রমে কথিত হেতু অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া হেতুবাক্যের দ্বারা যে হেতু-পদার্থ বলা হয়, তাহা উদাহরণের সাধন্যপ্রযুক্ত এবং উদাহরণের বৈশিষ্ট্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হওয়ায় হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না। হেতুর লক্ষণ ত্যাগ না করিলেও তাহা হেতুভাস হয় না। (পরন্তু) অবয়বের বিপরীতক্রমে বচন অপ্রাপ্তকাল (৫ অং, ২ অং, ১১ সূত্র) এই সূত্রের দ্বারা (মহর্ষি) নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। ইহা তাহাই পুনরায় বলা হয়, এ জন্ম তাহা সূত্রার্থ নহে। অর্থাৎ অবয়বের বদি ক্রম ভঙ্গ করিয়া প্রয়োগ হয়, তাহাকে মহর্ষি পরে অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এই সূত্রের বদি ঐরূপই অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে মহর্ষির পুনরুক্তি-দোষও হইয়া পড়ে; সুতরাং এ জন্মও বুঝা যায়, এই সূত্রের ঐরূপ অর্থ নহে।

টিপ্পনী। মহবি পঞ্চম হেতুভাসকে বলিয়াছেন—কালাতীত। অনেক পুস্তকে হেতুভাসের বিভাগসূত্রে (২ আ° ৪ সূত্রে) ‘অতীত কাল’ এইরূপ নাম দেখা যায়। বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতি কেহ কেহ এ জন্ত এই সূত্রে কালাতীত শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অতীতকাল এবং কালাতীত, এই দুইটি সমানার্থক শব্দ বলিয়া মহবি এই সূত্রে কালাতীত শব্দের দ্বারা অতীত কাল নামক হেতুভাসকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বদ্বতঃ মহবি পূর্বেও কালাতীত শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিভাগসূত্রে অতীত কাল, এইরূপ নাম বলিয়া তাহার লক্ষণ-সূত্রে কালাতীত নামে লক্ষ্য নির্দেশ করিবেন বেন? অর্থ এক হইলেও ঐ নাম দুইটি বহন পৃথক্, তখন মহবি বিভাগ-সূত্রে যে নাম বলিয়াছেন, লক্ষণ-সূত্রেও সেই নামই বলিয়াছেন, ইহাই সম্ভব; কারণ, সেইরূপ বলাই উচিত। বাচস্পতি মিশ্রের স্তায়সূচীনিবদ্ধ প্রভৃতি অনেক পুস্তকে বিভাগ-সূত্রেও ‘কালাতীত’ এইরূপ পাঠই আছে। বৃত্তিত স্তায়বার্ত্তিকে উদ্ধৃত সূত্রে ঐ স্থলে ‘অতীতকাল’ পাঠ থাকিলেও উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে হয় না। মহবি গোতম কালাত্যয়াপদিষ্ট, এই কথার দ্বারা এই সূত্রে কালাতীত নামক পঞ্চম হেতুভাসের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। সাধ্য-সন্ধেহের কালই হেতু প্রয়োগের কাল। নির্ণীত পদার্থে স্তায়প্রয়োগ হয় না, এ কথা ভাষ্যকারও প্রথম সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মাতে কোন ধর্ম্মের অসম্মান করিতে হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেই ধর্ম্মাতে যদি ঐ অসম্মানের ধর্ম্মটি নাহি, ইহা দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে আর সেখানে ঐ সাধ্যধর্ম্ম আছে কি না, এইরূপ সংশয়ও হয় না। জলে বহি নাহি, ইহা নির্ণীত হইলে আর কি সেখানে বহির সংশয় হইতে পারে? ফলকথা, যে পর্য্যন্ত সাধ্যধর্ম্মাতে সাধ্যধর্ম্মের সংশয় আছে, সেই পর্য্যন্তই তাহাতে সাধ্যধর্ম্মের অসম্মানের জন্ত হেতু প্রয়োগ করিলে, ঐ হেতুতে আর কোন দোষ না থাকিলে, উহা হেতু হইতে পারে, উহা সেখানে সাধ্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মাতে অসম্মানের ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলেই তাহা সাধ্য-সন্ধেহের কালকে অতিক্রম করার অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হওয়ার সাধ্যধর্ম্মের সংশয়ের কাল চলিয়া গেলে প্রযুক্ত হয়, এ জন্ত উহা কালাত্যয়ে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত); অতরাং তাহা কালাতীত নামক হেতুভাস। ঐরূপ স্থলে অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মাতে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে আর কোন পদার্থই সেখানে সেই সাধ্যের সাধন হইতে পারে না, এ জন্ত ঐরূপ স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত পদার্থ মাত্রই হেতুভাস। ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে যে স্তায়ভাসের কথা বলিয়াছেন, সেই স্তায়ভাস স্থলীর হেতুই ইহার উদাহরণ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অসম্মান স্থলে প্রযুক্ত হেতুই এই সূত্রোক্ত কালাতীত নামক হেতুভাস। পরবর্ত্তী স্তায়চাৰ্য্যগণ ইহাকেই ব্যাপ্ত নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্তায়পটীকাকার এই ভাবে স্তায়ার্ণবর্ণন ও উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃতার্থ এবং ভাষ্যকারেরও ইহাই মনোগত অর্থ। ভাষ্যকার পূর্বে স্তায়ভাসের কথা বলিয়াই তাহার নিজ দত্তানুসারে এই কালাতীত নামক হেতুভাসের উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এ জন্ত এখানে নিজ মতে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করেন নাই। অস্ত্র ব্যাখ্যাকারগণ



এই স্বরের বেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বেরূপ উদাহরণ বলিতেন, ভাব্যকার এখানে সেই উদাহরণেরই উল্লেখ করিয়া এই কালাতীত নামক হেত্বাভাস বিষয়ে মতান্তর বিজ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রশংসনীয়: হত্বার্থ ব্যাখ্যায় ভাব্যকার কৌশলে একই ভাবায় পরমতের ব্যাখ্যায় জায় নিজ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে হেতুর অর্থৈকদেশ অর্থাৎ একদেশরূপ পদার্থ, ফলিতার্থ এই যে, যে হেতুর বিশেষণ-পদার্থ কালাত্যয়যুক্ত হইবে, সেই হেতু কালাতীত; এইরূপে পরমতাহুসারে ঐ ভাব্যের ব্যাখ্যা হইবে। এই পরমতাহুসারেই ভাব্যকার শব্দের নিত্যত্বাহুসানে নীমাংসকের গৃহীত সংযোগবাদ্যত্ব হেতুকে কালাতীত হেত্বাভাস বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সংযোগবাদ্যত্ব হেতুর একদেশ অর্থাৎ বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা ঐ স্থলে কালাত্যয়যুক্ত হওয়ার ঐ হেতু কালাতীত হেত্বাভাস হইয়াছে। রূপের প্রত্যক্ষ রূপযুক্ত বস্তুতে আলোক-সংযোগ আবশ্যক। কারণ, অন্ধকারে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং রূপ প্রত্যক্ষ সংযোগজ্ঞাত, তাহা হইলে রূপকে সংযোগবাদ্য বলা যায়। বাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ কোন সংযোগজ্ঞাত, তাহাকে সংযোগ-বাদ্য পদার্থ বলে। কিন্তু রূপ সংযোগ-বাদ্য হইলেও শব্দ সংযোগ-বাদ্য নহে। কারণ, যে সংযোগ-জ্ঞাত শব্দ জন্মে, সেই সংযোগের নিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগজ্ঞাত না হওয়ার শব্দ সংযোগ-বাদ্য নহে। শব্দের প্রত্যক্ষ শব্দজনক সংযোগের কালকে অতিক্রম করার সংযোগ-বাদ্যরূপ হেতুর একদেশ বা বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা ঐ স্থলে কালাত্যয়যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্কোক্ত অহুসানে সংযোগবাদ্যত্ব হেতু কালাতীত নামক হেত্বাভাস (বিবৃতি স্রষ্টব্য)। সংযোগবাদ্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য হয় না। আলোক-সংযোগের সাহায্যে যে ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সংযোগ-বাদ্য ঘটাদি পদার্থে নিত্যত্ব নাই, তবে নিত্যত্বের অহুসানে সংযোগ-বাদ্যত্বকে হেতু বলা হইয়াছে কিরূপে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে 'শব্দ নিত্য' এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ এই যে, শব্দ পূর্ক হইতেই অবস্থিত। বাহা পূর্ক থাকে না, তাহা সংযোগবাদ্য নহে। শব্দ যখন সংযোগবাদ্য, তখন শব্দ স্থির পদার্থ, শব্দ ঘটাদির রূপের জায় প্রত্যক্ষের পূর্ক হইতেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই পূর্কোক্ত প্রতিজ্ঞাবাদীর তাৎপর্য। ঐরূপে শব্দের স্থিরত্ব সাধন করিয়া নীমাংসক শব্দের নিত্যত্ব সাধনের জ্ঞাত অজ্ঞাত হেতুর প্রয়োগ করিয়াছেন (দ্বিতীয়াধ্যয়ে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা-প্রকরণ স্রষ্টব্য)। বস্তুত: পূর্কোক্ত স্থলে যখন ঘটাদির রূপকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দের স্থিরত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতাক্রম নিত্যতা ঘটাদির রূপে নাই। এবং সংযোগ-বাদ্যত্ব বলিতেও সংযোগজ্ঞাত প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব বুঝা যায়। সংযোগের দ্বারা বাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে সংযোগবাদ্য শব্দের প্রতিপাদ্য নহে। কারণ, নীমাংসক মতে শব্দও যদি ঐরূপ সংযোগবাদ্য বলা যায়, তাহা হইলেও ঘটাদি রূপের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব সংযোগজ্ঞাত নহে। সামান্তত: সংযোগজ্ঞাত বলিলে জ্ঞাত জ্ঞানের উৎপত্তি আত্মনাসংযোগ-জ্ঞাত, কিন্তু ঐ জ্ঞাত জ্ঞান নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে। ফলতঃ, বাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-বিশেষ-জ্ঞাত, তাহাকেই সংযোগ-

ব্যাক্য-বলিয়া রূপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শব্দের স্থির স্থান করিতে পূর্বোক্ত প্রকার সংযোগ-ব্যাক্যকে হেতু বলা হইয়াছে। ঐ হেতুতে যে ঐ স্থলে আর কোন দোষ নাই, তাহা নহে। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে সংযোগ-ব্যাক্য সাধ্যসন নামক হেতুভাগই হইয়াছে; উহার জন্ত আর পূর্ব করিয়া কালাতীত নামক হেতুভাগ বলা নিশ্চয়োজন। বাহারি কালাতীত হেতুভাগের ঐ উদাহরণ বলিয়াছেন, তাহাদিগের ব্যাক্যের এই দোষ ছিল, সকলেই উহা বুঝিয়া লইতে পারিবে, ইহাই মনে করিয়া ভাষ্যকার ঐ দোষের উদ্ধাবন করেন নাই; তিনি কেবল তাহাদিগের ঐ উদাহরণটিকেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার যেরূপ করণা করিয়াছেন, ভাষ্যকারের কথার কিন্তু তাহা মনে আসে না। তবে ভাষ্যকারের নিজের মতকে নির্দোষ রাখিবার জন্ত গত্যন্তর না থাকায় তাৎপর্যটীকাকার সম্ভবতঃ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ অনুসারেই ঐরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকারের মূল কথা এই যে, ভাষ্যকার এখানে একই ভাষায় নিজের মতে এবং পরের মতে স্বত্বার্থ বর্ণন করিয়া পরের মতেই উদাহরণ বলিয়া গিয়াছেন। প্রথম স্বত্ব-ভাষ্যে হেতুভাগের কথা বলাতে ভাষ্যকারের নিজ সম্মত কালাতীত হেতুভাগের উদাহরণ বলাই হইয়াছে, আর তাহার পুনরুক্তি করেন নাই। ভাষ্যকারের নিজ মত অনুসারে স্বত্বার্থবোধক ভাষ্যের ব্যাখ্যা এই যে, অপদিষ্টমান যে পদার্থের অর্থৈকদেশ অর্থাৎ প্রযুক্তমান হেতু পদার্থের অর্থ কি না—সাধনীর যে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী (সাধ্যধর্মী), তাহার একদেশ অর্থাৎ বিশেষণরূপ একাংশ যে সাধ্যধর্ম, তাহা যদি কালাতারযুক্ত হয় অর্থাৎ কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সেই ধর্মীতে সাধ্যধর্মের অভাব নিশ্চয় হওয়ায় সাধ্য সন্দেহের কালকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে প্রযুক্তমান সেই হেতু সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে প্রযুক্ত হওয়ায় কালাতীত নামক হেতুভাগ হয়।

তাৎপর্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক মহর্ষি গোতমের এই স্বত্বের ব্যাখ্যা করিতে নাই, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরেই হেতুবাক্য প্রয়োগের কাল। সেই কালকে অতিক্রম করিয়া যদি পরে অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্যের পরে হেতু প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু কালাতীত নামক হেতুভাগ হয়। সেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িক এইরূপ স্বত্বার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এই ব্যাখ্যানুসারে কালাতীত নামক কোন হেতুভাগ স্বীকার করা নিশ্চয়োজন, কালাতীত নামক কোন হেতুভাগ নাই, ইহাই সমর্থন করিয়া মহর্ষি-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করিয়াই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের ব্যাখ্যাত ঐ দোষের পরিহার করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই স্বত্বের ঐরূপ অর্থ নহে। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া, তাহার পরে যদি কেহ হেতু প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণ প্রয়োগকর্তার দোষ হইতে পারে। ঐরূপ হলে প্রযুক্ত হেতুতে যদি হেতুর লক্ষণ থাকে অর্থাৎ উহা যদি উদাহরণের সাধ্যার্থ অথবা উদাহরণের বৈধর্ম্য ইহা সাধ্যসাধন হয়, তাহা হইলে হেতুভাগ হইতে পারে না। বাহ্যতে হেতুপদার্থের সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাহা কখনই হেতুভাগ হয় না। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য মিলিত হইয়া যে বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, তাহাতেও হেতুবাক্যটি প্রতিজ্ঞাবাক্যের দূরত্ব



হইলেও কোন হানি নাই। ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত এখানে যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ কারিকাটি কোন্ গ্রন্থের, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের পাই নাই। নানাগ্রন্থদর্শী অনুসন্ধিৎসু অনেক মনোবীণ উহার সংবাদ পান নাই, জানিয়াছি। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই কারিকায় ‘অর্থনন্দকে’ শব্দের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন,—“অর্থেন সামর্থ্যেন যথাক্রোধনন্দকঃ।” তিনি এই কারিকা সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের উদ্ধৃত কারিকায় ‘অর্থনন্দকে’র ব্যাখ্যার বলিয়াছেন—সামর্থ্য-সম্বন্ধ। যে বাক্য অথবা বাক্যের সহিত মিলিত হইয়া অর্থার্থ একবাক্যতা লাভ করিয়া বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর আকাজ্ঞা বা অপেক্ষা আবশ্যক। উহাকে বাক্যের সামর্থ্যও বলা হয় ( নিগমন-স্বত্ব-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। ঐ সামর্থ্য-সম্বন্ধ বা আকাজ্ঞা দূরত্ব বাক্যও থাকে, উহা না থাকিলে নিকটত্ব বাক্যও মিলিত হইয়া শব্দ বোধ জন্মাইতে পারে না, ইহাই ঐ কারিকার তাৎপর্য্যার্থ। ইহা প্রাচীন মত। এই মত সর্বদক্ষত নহে। মনে হয়, এই জন্তই ভাষ্যকার শেষে অত্র একটি যুক্তির উপস্থাপন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মহাবি পঞ্চমাধ্যয়ে যাহা অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এই স্বত্বের দ্বারা তাহাই হেতুভাসের মধ্যে বলিবেন কিরূপে ? ঐ ভাবে ঐরূপ পুনরুক্তি মহাবি কখনই করিতে পারেন না। সুতরাং উহা মহাবি-স্বত্বের অর্থ নহে।

মহাবি-স্বত্বের অর্থ তাৎপর্য্যটীকাকার বৈরূপ বলিয়াছেন, তাহাই অনুবাদে গৃহীত হইয়াছে। উদ্যোতকরও ভাষ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উহা যে মতান্তরে ব্যাখ্যা বা মতান্তর জ্ঞাপন, তাহা কিছুতেই মনে হয় না। তবে উদ্যোতকরের পর ইহাতেই মহাবি গোতমোক্ত কালাতীত নামক হেতুভাস বান্ধিত এবং বাণিতসাধ্যক ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য কালাতীত প্রকৃতি নামের ব্যবহারও পরবর্তী গ্রন্থে স্থলবিশেষে দেখা যায়। বিশ্বনাথ ভাষ্যপরিচ্ছেদে কালাত্যয়াদিষ্ট নামেরও ব্যবহার করিয়াছেন। মূলকথা; যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমানের জন্ত হেতু প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যার্থটি নাই, ইহা যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত, সেই স্থলীর হেতুকেই উদ্যোতকরের পরবর্তী আজ্ঞাযোগ স্পষ্ট ভাষায় মহাবি গোতমোক্ত পঞ্চম হেতুভাস বলিয়া অর্থার্থ কালাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম স্বত্বভাষ্যে ভাষ্যকার যে ত্রায়াভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন, সেখানেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রায়াভাস স্থলেই এই কালাতীত নামক হেতুভাস থাকে। এ জন্ত মহাবি ত্রায়াভাস নাম করিয়া কোন কথা আর বলেন নাই। হেতুভাস বলাতেই ত্রায়াভাস বলা হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাভাস, দৃষ্টান্তাভাস প্রকৃতিও তাহাতেই বলা হইয়াছে। পরবর্তী কোন কোন ত্রায়েকদেশী ‘অন্যবসিত’ নামে বর্ত্ত হেতুভাস স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু

১। কালাতীতো বলবতা প্রমাণেন প্রাবর্তিতঃ—তর্কিকরক্ষা, ১৩০।

২। ন স্বত্বভাষ্যে কিসিতি চেদুদ্যোতকভাসলক্ষণং।

অন্তর্ভাষ্যে বর্ত্তমান্যং হেতুভাসেব, শঙ্করঃ—ই।

ভাষাও গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেতুভাসেই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বহির্বিষয়ক কোন হেতুভাস বলেন নাই। যে হেতুতে ব্যক্তিভার সংশয়-নিরাসক অমুকুল তর্ক নাই, তাহাকে অপ্রয়োজক বলে। যে হেতুতে ঐক্য অমুকুল তর্ক আছে, তাহাকে প্রয়োজক বলে। কেহ কেহ পূর্বোক্ত অপ্রয়োজক নামে হেতুভাস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ উহাকে 'ব্যাপ্যবাদিন্দ' বলিয়া ঐ নামে কোন অতিরিক্ত হেতুভাস স্বীকার অনাবশ্যক বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও ঐ মত ধণ্ডন করিয়া অপ্রয়োজক নামে পৃথক কোন হেতুভাস নাই, উহা গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেতুভাসেই অন্তর্ভুক্ত, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

বহির্বিষয়ক হেতুকে বলিয়াছেন—অপদেশ, হেতুভাসকে বলিয়াছেন—অনপদেশ। তাঁহার মতে (১) অপ্রসিদ্ধ, (২) অসং, (৩) সন্দিগ্ধ, এই নামত্রয়ে হেতুভাস ত্রিবিধ। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ অনব্যবসিত নামক এক প্রকার হেতুভাস বলিলেও উহা কণাদসূত্রের অপ্রসিদ্ধ অথবা সন্দিগ্ধ, এই কণার দ্বারা সংগৃহীত বলিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, কণাদসূত্রের বৃত্তিকার সূত্র "চ" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেতুভাসই কণাদের সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে। কারণ, কণাদ যে হেতুভাসত্রয়বাদী, এ বিষয়ে প্রাচীন প্রবাদ আছে। বস্তুতঃ গোতমোক্ত প্রকরণগন ও কালাতীত নামক হেতুভাসকে কণাদ হেতুভাস-মধ্যে গণ্য করেন নাই, ইহাই প্রচলিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের মূল যুক্তি এই যে, যে হেতু সাধ্যার্থের ব্যাপ্য বলিয়া এবং সাধ্যার্থীতে বর্তমান বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত, তাহা কখনও অহেতু অর্থাৎ হেতুলক্ষণশূন্য হয় না। পক্ষসম্ব, সপক্ষসম্ব এবং বিপক্ষে অসম্ব—এই তিনটি দৃষ্টই কণাদের মতে হেতুর সাধকতার প্রয়োজক। ঐ লক্ষণত্রয় হেতু স্থলে যদি অস্ত্র কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতি না হয় অথবা হইলেও তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে ঐ হেতুর কোন দোষ বলা যায় না। হেতুর সম্পূর্ণ লক্ষণ যাহাতে আছে, তাহাকে অহেতু কিছুতেই বলা যায় না। ঐরূপ হেতু স্থলে অনুমিতির অস্ত্র প্রতিবন্ধক যদি উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐ হেতু কখনই দুষ্ট বা হেতুভাস হইতে পারে না। যে স্থলে অনুমিতির যে কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে, সেই স্থলীয় হেতু নাক্রমে দুষ্ট হেতু বলিলে হেতুভাস আরও নানাপ্রকার হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধ্যার্থের ব্যাপ্য এবং সাধ্যার্থীতে বর্তমান হেতু যদি ব্যাহিত অথবা সংপ্রতিপদিত হয়, তাহা হইলেও

১। বস্তুমুকুলতর্কোহসি স এব ত্র্যয় প্রয়োজকঃ।

ত্বভাবোহস্মদ্ব্যনিত্তিস্তত্ত্বাঃ স হি নিবারণকঃ।

অত্রোহ প্রয়োজকত্বাদ্ভাষ্যাদিসিদ্ধেরসিদ্ধতাঃ—তর্কি সূত্রিকা।

২। অপ্রসিদ্ধে হনপবেশে হনসন্দিগ্ধচানপবেশেঃ।—কণাদ-সূত্র, ৩৩, ১১৩।

ভার্য্য সূত্রেও কোন স্থলে হেতুভাস বলিতে অনপদেশ বলা হইয়াছে। (২২/৩৩)।

৩। বিরুদ্ধাসিদ্ধ-সন্দিগ্ধ-সিদ্ধ-প্রসিদ্ধ-কালোপ-সংগৃহীতঃ। এই মোক্ষার্ণব প্রশস্তপাদভাষ্যে দেখা যায়। কন্যলীকার উহা প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বাক্যটি আরও অতি প্রাচীন প্রবাদ, এইরূপও প্রবাদ শুনা যায়।



ঐ হেতু ছুট হইবে না। কারণ, হেতুর প্রকৃত লক্ষণ তাহাতে আছেই, সুতরাং ঐ হেতু হেতুভাসের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বুক্তি।

ভার্যাসার্থ্য মহাবি গোতমের অভিপ্রায় নহে এই যে, যে হেতুতেই অহুমিতি হইলে বার্থ্য অহুমিতিই হয়, তাহাকেই হেতু বলা উচিত। যে হেতু সাধ্যবশ্তের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবশ্তীতে বর্তমান হইলেও কোন স্থলে সাধ্যবশ্তীতে বস্তুতঃ সাধ্যবশ্ত না থাকায় বার্থ্য অহুমিতির প্রয়োজক হইতেই পারিবে না, সেখানে অহুমিতি হইলেও ভ্রম অহুমিতি হইবে, সেই হেতু বাণিত। এবং যে হেতুর তুল্যবল প্রতিপক্ষ অস্ত্র হেতু প্রযুক্ত হওয়ার সেখানে সাধ্য-সংশয়ই জন্মিবে, অহুমিতি জন্মিতেই পারিবে না, তাহা সংপ্রতিপক্ষিত হেতু। এই বাণিত ও সং-প্রতিপক্ষিত হেতু বধন কোথায়ও কখনও বার্থ্য অহুমিতির প্রয়োজক হইবে না, তখন ঐরূপ হেতুকে প্রকৃত হেতু বলা যায় না। কারণ, সাধ্যসাধনই হেতুর লক্ষণ; তাহা ঐরূপ হেতুতে না থাকায় উহা অহেতু, উহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেতুভাসই হইবে। মূলকথা হইল যে, হেতুভাস শব্দের মধ্যে যে হেতু শব্দ আছে, বৈশেষিক নহে তাহার অর্থ সাধ্যবশ্তের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবশ্তীতে বর্তমান হেতু, আর ভ্রমমতে উহার অর্থ সাধ্যসাধন বা বার্থ্য অহুমিতির প্রয়োজক হেতু। ইহা হইতেই বৈশেষিক ও ভ্রমে হেতুভাস ত্রিবিধ এবং পঞ্চবিধ, এই দুই নতের সৃষ্টি হইয়াছে। (২ অং, ৪ সূত্র-টিপ্পনীতে ভ্রমলক্ষণ ত্রিবিধ)। ২।

ভাষ্য। অর্থ ছলম

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ হেতুভাস নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) ছল (নিরূপণ করিয়াছেন)।

সূত্র। বচনবিঘাতোৎপত্তিকম্পোপপত্ত্যা ছলং ॥১০॥৫১॥

অনুবাদ। বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ-কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে।

ভাষ্য। ন সামান্তলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহর্তুং বিভাগে তদাহরণানি।

অনুবাদ। সামান্ত লক্ষণে ছলের উদাহরণ দেওয়া যায় না। বিভাগে কিন্তু অর্থাৎ ছলের বিশেষ লক্ষণেই উদাহরণগুলি বলিব।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে হেতুভাসের পরেই ছলের নাম বলা হইয়াছে। সুতরাং তদন্তরগারে মহাবি হেতুভাসের পরেই তাহার উদ্দিষ্ট ছল পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার “অর্থ ছলং” এই কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রে ‘অর্থবিকল্প’ বলিতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনা। ঐ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাদীর বাক্যের বিঘাত করাই ছল। অর্থাৎ যে অর্থ বাদীর তাৎপর্যাবিষয় নহে, বাদীর বাক্যের সেই অর্থ কল্পনা করিয়া বাদীর প্রযুক্ত

হেতুতে যে দোষ প্রদর্শন, তাহাই ছল। এই ছল বাক্যবিশেষ। বিরুদ্ধার্থ করনাই ছলবাদীর উপপত্তি বা যুক্তি, উহা ছাড়া তাহার আর কোন উপপত্তি নাই। সুতরাং বাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ বা বাদীর তাৎপর্য্যবিবরণীভূত অর্থ ছাড়া বাদীর বাক্যের আর একটা অর্থও ব্যাখ্যা করিতে পারা চাই, নচেৎ ছল হইতে পারিবে না। এই অর্থান্তর-করনা কেবল কোন শব্দবিশেষকে ধরিয়াই যে হইবে, এমন কথা নহে; যে দিক্ দিয়াই হউক, বাদীর তাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য তাৎপর্য্যের করনা করিয়া বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিলেই তাহা ছল হইবে। এই ছলের উদাহরণ বিশেষ-লক্ষণে বলা হইয়াছে। কারণ, সেই বিশেষ ছল ভিন্ন ছলের উদাহরণ প্রদর্শন অসম্ভব। ছলের উদাহরণ দেখাইতে হইলেই কোন একটি বিশেষ ছলের উদাহরণকেই উল্লেখ করিতে হইবে। সেই বিশেষ ছলের লক্ষণ না বলিলেও তাহার উদাহরণ দেখান যাইবে না। এ জন্ত ছলের বিশেষ লক্ষণগুলিতেই অর্থাৎ সেই বিশেষ লক্ষণ-সূত্রত্রয়ের তাহোই ছলের উদাহরণ বলা হইয়াছে। তাহা “বিভাগে তু” এই স্থলে বিভাগ শব্দের দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন,—“বিভজ্যত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণম্”। ১০।

ভাষ্য। বিভাগশ্চ।

সূত্র। তৎ ত্রিবিধং বাকুছলং সামান্যচ্ছলমুপ-  
চারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১॥৫২ ॥

অনুবাদ। বিভাগ অর্থাৎ ছলের বিভাগ-সূত্র। সেই ছল তিন প্রকার,—  
(১) বাকুছল, (২) সামান্যচ্ছল এবং (৩) উপচারচ্ছল।

টীকণী। পূর্বসূত্রের দ্বারা ছলের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়া এই সূত্রের দ্বারা মহাবি ছলের বিভাগ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলির উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নাম কৌতুককে বিভাগ বলে। উহা উদ্দেশ্যেরই অন্তর্ভূত। উহা না করিলে বিশেষ লক্ষণ বলা যায় না, এ জন্ত উহা করিতে হয়। পরন্তু নিয়মের জন্তও উহা করা হয়। ছল বহু প্রকার হইতে পারিলেও এই সূত্রোক্ত তিন প্রকারের মধ্যেই সমস্ত ছল আছে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার ছল আর নাই, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তও মহাবি ছলের এই বিভাগসূত্রটি বলিয়াছেন। তাহা বিভাগ শব্দের দ্বারা এখানে বিভাগসূত্র বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন,—“বিভজ্যতেহেনেনেতি বিভাগঃ সূত্রমুচ্যতে”।

এই সূত্রের শেষে একটি ‘ইতি’ শব্দ অনেক পুস্তকেই দেখা যায়। মুদ্রিত ভাষ্যবাস্তিকেও উহা দেখা যায়। কিন্তু এখানে ‘ইতি’ শব্দের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও তাহার ভায়সূতীনিবন্ধে ইতিশব্দান্ত সূত্র গ্রহণ করেন নাই। “তৎ ত্রিবিধং” এই অংশও অনেকে ভাষ্যকারের কথা বলিয়া সূত্রে গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ উহা সূত্রের অন্তর্গত। অহমনি-সূত্রে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন আছে (পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য)। ১১।



ঐ হেতু দৃষ্ট হইবে না। কারণ, হেতুর প্রকৃত লক্ষণ তাহাতে আছেই, সুতরাং ঐ হেতু হেতুভাসের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি।

ত্ৰায়ার্জ্য মহৰি গোতমের অভিপ্রায় মনে হয় এই যে, যে হেতু হলে অনুমিতি হইলে বার্থ অনুমিতিই হয়, তাহাকেই হেতু বলা উচিত। যে হেতু সাধ্যবর্ধের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবর্ধীতে বৰ্ধমান হইলেও কোন স্থলে সাধ্যবর্ধীতে বস্ততঃ সাধ্যবর্ধ না থাকায় বার্থ অনুমিতির প্রয়োজক হইতেই পারিবে না, সেখানে অনুমিতি হইলেও ক্রম অনুমিতি হইবে, গেই হেতু বাণিত। এবং যে হেতুর তুল্যকল প্রতিপক্ষ অন্য হেতু প্রযুক্ত হওয়ায় সেখানে সাধ্য-সংশয়ই জন্মিবে, অনুমিতি জন্মিতেই পারিবে না, তাহা নঃপ্রতিপক্ষিত হেতু। এই বাধিত ও সং-প্রতিপক্ষিত হেতু বধন কোথায়ও কখনও বার্থ অনুমিতির প্রয়োজক হয় না, তখন ঐরূপ হেতুকে প্রকৃত হেতু বলা যায় না। কারণ, সাধ্যসাধনই হেতুর লক্ষণ; তাহা ঐরূপ হেতুতে না থাকায় উহা অহেতু, উহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেতুভাসই হইবে। মূলকথা হইল যে, হেতুভাস শব্দের মধ্যে যে হেতু শব্দ আছে, বৈশেষিক নতে তাহার অর্থ সাধ্যবর্ধের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবর্ধীতে বৰ্ধমান হেতু, আর ত্ৰায়নতে উহার অর্থ সাধ্যসাধন বা বার্থ অনুমিতির প্রয়োজক হেতু। ইহা হইতেই বৈশেষিক ও ত্ৰায়ে হেতুভাস ত্রিবিধ এবং পঞ্চবিধ, এই দুই নতের সৃষ্টি হইরাছে। ( ২ অং, ৪ সূত্র-টিপ্পনীতে ত্ৰায়নমত হেতুর লক্ষণ দ্রষ্টব্য )। ৯।

ভাষ্য। অথ ছলম্

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ হেতুভাস নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) ছল (নিরূপণ করিয়াছেন)।

সূত্র। বচনবিঘাতোর্থবিকম্পোপপত্ত্যা ছলং ॥১০॥৫১॥

অনুবাদ। বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ-কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে।

ভাষ্য। ন সামান্যলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহৰ্ত্তুং বিভাগে উদাহরণানি।

অনুবাদ। সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ দেওয়া যায় না। বিভাগে কিন্তু অর্থাৎ ছলের বিশেষ লক্ষণেই উদাহরণগুলি বলিব।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে হেতুভাসের পরেই ছলের নান বলা হইরাছে। সুতরাং তদন্তগারে মহৰি হেতুভাসের পরেই তাহাও উল্লিষ্ট ছল পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার “অথ ছলং” এই কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রে “অর্থবিকল্প” বলিতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনা। ঐ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাদীর বাক্যের বিঘাত করাই ছল। অর্থাৎ যে অর্থ বাদীর তাৎপর্য্যবিষয় নহে, বাদীর বাক্যের সেই অর্থ কল্পনা করিয়া বাদীর প্রযুক্ত

হেতুতে যে দোষ প্রদর্শন, তাহাই ছল । এই ছল বাক্যবিশেষ । বিরুদ্ধার্থ করনাই ছলবাদীর উপপত্তি বা যুক্তি, উহা ছাড়া তাহার আর কোন উপপত্তি নাই । সূত্রটি বাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ বা বাদীর তাৎপর্যবিপরীত অর্থ ছাড়া বাদীর বাক্যের আর একটা অর্থও ব্যাখ্যা করিতে পারা চাই, নচেৎ ছল হইতে পারিবে না । এই অর্থান্তর-করনা কেবল কোন শব্দবিশেষকে ধরিয়াই যে হইবে, এমন কথা নহে ; যে দিক্ দিয়াই হউক, বাদীর তাৎপর্য ভিন্ন অন্য তাৎপর্যের করনা করিয়া বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিলেই তাহা ছল হইবে । এই ছলের উদাহরণ বিশেষ-লক্ষণে বলা হইয়াছে । কারণ, সেই বিশেষ ছল ভিন্ন ছলের উদাহরণ প্রদর্শন অসম্ভব । ছলের উদাহরণ দেখাইতে হইলেই কোন একটি বিশেষ ছলের উদাহরণকেই উল্লেখ করিতে হইবে । সেই বিশেষ ছলের লক্ষণ না বলিলেও তাহার উদাহরণ দেখান যাইবে না । এ জ্ঞাত ছলের বিশেষ লক্ষণগুলিতেই অর্থাৎ সেই বিশেষ লক্ষণ-স্বত্রত্রয়ের ভাবোই ছলের উদাহরণ বলা হইয়াছে । ভাষ্যে “বিভাগে তু” এই স্থলে বিভাগ শব্দের দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে । তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন, —“বিভজ্যাত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণম্” ॥ ১০ ॥

ভাষ্য । বিভাগশ্চ ।

সূত্র । তৎ ত্রিবিধং বাকুছলং সামান্যছলমুপ-  
চারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । বিভাগ অর্থাৎ ছলের বিভাগ-সূত্র । সেই ছল তিন প্রকার,—  
(১) বাকুছল, (২) সামান্যছল এবং (৩) উপচারছল ।

টিপ্পন্য । পূর্বসূত্রের দ্বারা ছলের সামান্য লক্ষণ হুচনা করিয়া এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি ছলের বিভাগ করিয়াছেন । বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলির উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নাম কীর্ত্তনকে বিভাগ বলে । উহা উদ্দেশ্যেরই অন্তর্ভূত । উহা না করিলে বিশেষ লক্ষণ বলা যায় না, এ জ্ঞাত উহা করিতে হয় । পরন্তু নিয়মের জ্ঞাতও উহা করা হয় । ছল বহু প্রকার হইতে পারিলেও এই সূত্রোক্ত তিন প্রকারের মতোই সমস্ত ছল আছে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার ছল আর নাই, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জ্ঞাতও মহর্ষি ছলের এই বিভাগসূত্রটি বলিয়াছেন । ভাষ্যে বিভাগ শব্দের দ্বারা এখানে বিভাগসূত্র বুঝিতে হইবে । তাৎপর্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন,—“বিভজ্যতেহেনেনেতি বিভাগঃ সূত্রমুচ্যতে” ।

এই সূত্রের শেষে একটি ‘ইতি’ শব্দ অনেক পুস্তকেই দেখা যায় । মুদ্রিত ভাষ্যবার্ত্তিকেও উহা দেখা যায় । কিন্তু এখানে ‘ইতি’ শব্দের কোন প্রয়োজন নাই । ত্রীমদ্ব্যাকরণম্ভিত্তি মিশ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃশ্রীনিবন্ধে ইতিশব্দান্ত সূত্র গ্রহণ করেন নাই । “তৎ ত্রিবিধং” এই অংশও অনেকে ভাষ্যকারের কথা বলিয়া সূত্রে গ্রহণ করেন নাই । বস্তুতঃ উহা সূত্রের অন্তর্গত । অনুমান-সূত্রে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন আছে ( পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য ) ॥ ১১ ॥



ভাষ্য । তেষাং

সূত্র । অবিশেষাভিহিতেহর্থ বক্তুরভিপ্রায়াদর্থা-  
ত্তুরকম্পনা বাক্চ্ছলম্ ॥ ১২ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । সেই ত্রিবিধ ছলের মধ্যে অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ বিবিধ অর্থের বোধক সমান শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ বিষয়ে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা অর্থাৎ ঐরূপ অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা যে দোষ প্রদর্শন, তাহা বাক্চ্ছল ।

ভাষ্য । নবকম্পলোহয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ । অত্র নবঃ কম্পলোহ-  
স্মেতি বক্তুরভিপ্রায়ঃ । বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে । তত্রায়ং ছলবাদী  
বক্তুরভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমন্ত্যমর্থঃ নবকম্পলা অস্মেতি ভাবদভিহিতং  
ভবতেতি বলয়তি । কল্পয়িত্বা চাসম্ভবেন প্রতিবেদতি, একোহস্ম কম্পলঃ  
কুতো নবকম্পলা ইতি । তদিদং সামান্যশব্দে বাচি ছলং বাক্চ্ছলমিতি ।

অনুবাদ । ‘এই বালক নবকম্পলবিশিষ্ট’ এইরূপ প্রয়োগ হইল । এই প্রয়োগে  
এই বালকের নূতন কম্পল, ইহাই বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ অভিপ্রেত । বিগ্রহে  
অর্থাৎ ‘নবকম্পল’ এই বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যেই বিশেষ আছে, সমাসে বিশেষ  
নাই । সেই প্রয়োগে এই ছলবাদী বক্তার অভিপ্রেত ভিন্ন – কি না অবিবক্ষিত অর্থাৎ  
বক্তা যে অর্থ বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ ‘এই’ বালকের নয়খানা কম্পল,  
ইহা আপনি বলিয়াছেন’, এইরূপে কল্পনা করে । কল্পনা কবিতা অসম্ভব হেতুক  
প্রতিবেদও করে । ( সে প্রতিবেদ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) এই বালকের  
একখানা কম্পল, নয়খানা কম্পল কোথায় ? সেই এই সামান্য শব্দ অর্থাৎ উভয়  
অর্থেই সমান শব্দরূপ বাক্যানিমিত্তক ছল বাক্চ্ছল ।

টীকণী । মহবি-কথিত ত্রিবিধ ছলের মধ্যে প্রথম বাক্চ্ছল । বাক্যানিমিত্তক সে ছল  
অর্থাৎ উভয় অর্থে বাক্যটি সমান হওয়ার এবং সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করাতাই ছল করিতে  
পারায় বাক্য যে ছলের নিমিত্ত, সেই ছলকে বাক্চ্ছল বলে । ইহাই বাক্চ্ছল শব্দের বুৎপত্তি-  
লভ্য অর্থ । ভাষ্যে “বাচি ছলং” এই কথার দ্বারা শেষে বাক্চ্ছল শব্দের এই বুৎপত্তি প্রদর্শিত  
হইয়াছে । ঐ ছলে ‘বাচি’ এখানে নির্মিতার্থে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । হত্রে ‘অবিশেষা-  
ভিহিত’ এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত উভয়ার্থে সমান শব্দকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । উদ্যোক্ত-  
কর ঐ কথার দ্বারা সমান বাক্য বা সমান পদই বুঝিতে বলিয়াছেন । তাহা হইলে যে বাক্য  
বা যে পদ নির্দিষ্টভাবে অভিহিত অর্থাৎ উভয় অর্থেই সমানরূপে উচ্চারিত, তাহাই হত্রে বলা

হইয়াছে “অকিংশবাভিহিত”। ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থবিষয়ে যে অর্থাভ্রের  
কল্পনা, তাহা বাক্‌ছল। যুগ্মে ‘অ’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ  
শব্দে অর্থাভ্রের কল্পনা নহে, ঐরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার একটি অর্থ আর একটি অর্থের  
কল্পনা অর্থাৎ যে অর্থটি বক্তার তাৎপর্য্যাবিষয় নহে, সেই অর্থকে বক্তার তাৎপর্য্যাবিষয় বলিয়া  
কল্পনা। যুগ্মে “বক্তুরভিপ্রায়াং” এই কথা থাকায় ঐরূপ অর্থ বুঝা যায়। উদ্যোতকর যুগ্মে  
অর্থ শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন। যুগ্মে অভিপ্রায় শব্দের অর্থ এখানে  
‘অভিপ্রেত’। অভিপ্রায় শব্দের ‘ইচ্ছা’ অর্থ গ্রহণ করিয়া যুগ্মে কোনরূপ উপপত্তি (বক্তুরভিপ্রায়াং  
উপেক্ষা অবিকার ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া) করিতে পারিলেও ভাষ্যে অভিপ্রায় শব্দের অভিপ্রেত  
অর্থই স্পষ্টত মনে হয়। বক্তার অভিপ্রেত হইতে অল্প, অর্থাৎ বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ।  
তাহারই নিবরণ অবিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তা যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ।

এখন এই বাক্‌ছলের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কোন বালক একখানা নূতন কঞ্চল গায়ে  
দিয়া আনিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া কোন বাদী বলিলেন,—“নবকঞ্চলোহয়ং মাণবকঃ” অর্থাৎ  
এই বালক নূতন কঞ্চলবিশিষ্ট। এখানে ‘নবকঞ্চল’ এইটি বহুব্রীহি সমাস। “নবঃ কঞ্চলোহিত”  
এইরূপ ব্যাসবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা যায়, এই ব্যক্তির নূতন কঞ্চল আছে। “নব কঞ্চলা অস্ত্র”  
এইরূপ ব্যাসবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা যায়, এই ব্যক্তির নরখানা কঞ্চল আছে। দ্বিবিধ ব্যাসবাক্যেই  
নবকঞ্চল এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হয়, সুতরাং সমাসে কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ উভয় অর্থেই  
‘নবকঞ্চল’ এইটি সমান শব্দ, ব্যাসবাক্যেই কেবল বিশেষ আছে। এবং এক পক্ষে নব শব্দ,  
অস্ত্র পক্ষে নবন্ শব্দ। নব শব্দের অর্থ নূতন, নবন্ শব্দের অর্থ নব সংখ্যক, কিন্তু উভয় পক্ষেই  
‘নবকঞ্চল’ এই বাক্যটি সমান। “নবকঞ্চল” বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থবয়ের মধ্যে ‘নূতন কঞ্চলবিশিষ্ট’  
এইরূপ অর্থই বক্তার অভিপ্রেত এবং সেখানে ঐরূপ অর্থই সম্ভব, বিতীর অর্থটি সম্ভবও নহে।  
কিন্তু ছলবাদী প্রতিবাদী বলিয়া বলিলেন—ঠিক, এই বালকের নরখানা কঞ্চল কোথায়? ইহার ত  
একখানা ছাড়া আর কঞ্চল দেখি না। প্রতিবাদী ঐরূপ অর্থাভ্রের কল্পনা করিয়া অসম্ভবের  
দ্বারা এখানে বাদীর কথার প্রতিবেশ করিলেন। এই ছল ঐ স্থলে ‘নবকঞ্চল’ এই বাক্যানিষিদ্ধক।  
বাদী নব কঞ্চল না বলিয়া যদি ‘নূতন কঞ্চল’ এইরূপ কথা বলিতেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী ঐ  
ছল করিতে পারিতেন না, বিরুদ্ধার্গ কল্পনারূপ উপপত্তি বাটত না, সুতরাং ঐরূপ ছল বাক্‌ছল।  
যখন কোন বাদী অহম্মানের দ্বারা অপরকে বুঝাইতে যাইবেন,—“নেপালাদাগতোহয়ং নবকঞ্চলদ্বাং,  
আঢ্যোহয়ং নবকঞ্চলদ্বাং” অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল দেশ হইতে আনিয়াছে অথবা এই ব্যক্তি ধনী,  
কারণ, এই ব্যক্তি নবকঞ্চলবিশিষ্ট, এতাদৃশ নবকঞ্চল নেপাল ভিন্ন আর কোথাও নিলে না এবং  
দরিদ্র লোকেও ক্রয় করিতে পারে না। এইরূপ স্থাপনার ছলকারী প্রতিবাদী যদি বলেন, এই  
ব্যক্তির নরখানা কঞ্চল নাই, তাহা হইলে তিনি বাদীর হেতুকে সাধ্যদম বা অদিক্ নামক হেত্বাভাস  
বলিলেন। অর্থাৎ তোমার প্রযুক্ত হেতু এই ব্যক্তিতে নাই, উহা অসম্ভব, ইহাই তাহার প্রকৃত  
বক্তব্য। সুতরাং ঐরূপ অর্থাভ্রের কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুর দোষ প্রশ্ননই ঐ স্থলে ছলের



প্রকৃত উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ তাহাতে বাদীর হেতুর অনিচ্ছাপ্রদর্শন হয় না। কারণ, বাদীর হেতু নূতন বস্তুবিশিষ্ট, তাহা সেই ব্যক্তিতে আছেই। বাদীর বিবক্ষিত হেতুতে দোষ প্রদর্শন না হওয়ায় ঐ ছল সহজতর নহে, ঐ জটাই উহা অসহজতর। বাদীর হেতুতে যদি অন্য কোন দোষও থাকে, তথাপি ছলকারী যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ, ছলকারী অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ দেখাইতে পারেন নাই।

পরবর্তী ছায়াচারণ্যগণ এইরূপে নবকল্পন হেতু গ্রহণ করিয়াই বাক্‌ছলের পূর্বোক্ত প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার নবকল্পনকে সাধ্যবর্ধকরূপে গ্রহণ করিয়াই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেদিকেও ছল হইতে পারে। নবকল্পন সাধন করিতে যে হেতু প্রয়োগ করা হইবে, সেই হেতু বাধিত, উহা সাধ্যবর্ধকশূন্য ধর্ম্মান্তে থাকার হেতুভাৱন, ইহাই সেখানে ছল-বাদীর শেষ বস্তুব্য হইবে। ফলকথা, যে দিকেই হউক, পূর্বোক্ত প্রকার অর্গন্তর করনার দ্বারা বাদীর হেতুতে যে কোনরূপ দোষ প্রদর্শনই বাক্‌ছলের উদ্দেশ্য। এইরূপ “গোবিন্দবাণী” এইরূপ প্রয়োগ করিলে যদি কেহ বলেন,—বাণের শূন্য কোথায়? বাণের শূন্য নাই; সুতরাং বাণে শূন্য সাধন করিতে তুমি যে হেতু প্রয়োগ করিবে, তাহা বাধিত হইবে। গো শব্দের অনেক অর্থ অভিধানে কথিত হইয়াছে। ত্রায়মতে স্নিষ্ট শব্দের সবগুলি অর্থই মুখ্য। গো শব্দের গো অর্থের ত্রায় বাণ অর্থও মুখ্য। বাদী গো অর্থে এখানে গো শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবাদী ‘বাণ’ অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার কথা বলিলে তাহা বাক্‌ছল হইবে। এবং বিবাণ শব্দের পশুশূন্য এবং হস্তিদন্ত এই উভয় অর্থই অভিধানে অভিহিত আছে। (পশুশূন্যতদন্তয়ো-র্কিবাণং ইত্যমরঃ)। কোন বাদী “গজো বিবাণী” এইরূপ প্রয়োগ করিলে যদি কেহ বিবাণ শব্দের শূন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন, হস্তীর শূন্য কোথায়? হস্তীর শূন্য নাই, তাহা হইলেও বাক্‌ছল হইবে। বাদী ঐ স্থলে হস্তিদন্ত অর্থেই বিবাণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং বাদীর অভিপ্রেত অর্থে কোন দোষ নাই। এইরূপ কোন বাদী বলিলেন,—“খেতো ধাবতি”। খেত শব্দের দ্বারা খেতরূপ-বিশিষ্ট অর্থই এখানে বাদীর অভিপ্রেত। পূর্বোক্ত বাদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী বাদীর ‘খেতঃ’ এই কথার মধ্যে ‘খা ইতঃ’ এইরূপে সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া যদি বলেন, এই স্থান দিয়া ত কুকুর বাইতেছে না, কুকুর কোথায়? তাহা হইলে এখানেও বাক্‌ছল হইবে। খন্ শব্দের কুকুর অর্থ প্রসিদ্ধই আছে। খন্ শব্দের প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে ‘খা’ এইরূপ পদ হয়, সুতরাং ‘খা ইতো ধাবতি’ এইরূপে পূর্বোক্ত বাদিবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিবাদী ঐরূপ ছল করিতে পারেন, কিন্তু বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ না হওয়ার উহা সহজতর হইবে না। সর্বত্রই বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ প্রদর্শন না হওয়ার ছল মাত্রই অসহজতর। বাদীর অভিপ্রেত অর্থ বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, পূর্বোক্ত প্রকারে অর্গন্তর করনার দ্বারা দোষোদ্ভাবন করিলে ছল করা হয়। অন্তান্ত ছলেও তাহা হইতে পারে, অর্গ্য বাদীর অভিপ্রেত অর্থ বুঝিয়াও ছল করা যাইতে পারে, উদ্যোতকর ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই বাক্‌ছলের বৈচিত্র্যটি গ্রহণ করিয়াই আলঙ্কারিকগণ শ্লেষবক্রোক্তি নামে অগম্য গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন “কে ব্যং হল এব সম্প্রতি ব্যং” ইত্যাদি

কবিতায় প্রসন্ন হইয়াছে—“কে যুগং” অর্থাৎ তোমরা কে ? উত্তরবাদী ‘ক’ শব্দের সঙ্গমীর একবচনে ‘কে’ এই পদ দিয়া এবং ‘ক’ শব্দের জল অর্থ অভিধানে অভিহিত থাকায়, ঐ জল অর্থ গ্রহণ করিয়া ‘কে যুগং’ এই প্রশ্ন-বাক্যের ‘জলে যুগং’ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ বাদীর অভিপ্রেত অর্থ হইতে অন্য অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদ করিলেন—‘হল এব সম্প্রতি যুগং’ অর্থাৎ আমরা জলে কোথায় ? আমরা সম্প্রতি হলেই আছি। এই বক্তব্যে ক্রোধে বাগ্‌বৈচিত্র্য সম্পাদন করার শকালকার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। মনে হয়, গোতমোক্ত বাক্যই এই বক্তব্যে অলঙ্কার উদ্ভাবন করাইয়াছে।

ভাষ্য। অস্ত্য প্রত্যবস্থানং—সামান্যশব্দস্থানেকার্থত্বেহন্ততরাভিধান-কল্পনায়াং বিশেষবচনং। নবকম্বল ইত্যনেকার্থস্ত্যভিধানং, নবঃ কম্বলোহস্ত্য নবকম্বলা অস্ত্যেতি। এতন্নিম্ন প্রযুক্তে যেয়ং কল্পনা, নব-কম্বলা অস্ত্যেত্যেতদভবতাইতিহিতং তচ্চ ন সম্ভবতীতি। এতস্ত্যামন্ততরা-ভিধানকল্পনায়াং বিশেষো বক্তব্যঃ, যস্মাদ্বিশেষোহর্থবিশেষেষু বিজ্ঞায়-তেহয়মর্থোহেননাভিহিত ইতি। স চ বিশেষো নাস্তি, তস্মান্মিথ্যাভিযোগ-মাত্রমেতদ্বিতি।

প্রসিদ্ধশ্চ লোকে শব্দার্থসম্বন্ধোহভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ, অস্ত্য-ভিধানস্তায়মর্থোহভিধেয় ইতি, সমানঃ সামান্যশব্দস্ত, বিশেষো বিশিষ্টশব্দস্ত, প্রযুক্তপূর্ব্বাশ্চেষ্মে শব্দা অর্থে প্রযুক্ত্যন্তে নাপ্র-যুক্তপূর্ব্বাঃ, প্রয়োগশ্চার্থসম্প্রত্যয়ার্থঃ, অর্থপ্রত্যয়াক্ষ ব্যবহার ইতি। তত্রৈবমর্থগত্যর্থো শব্দপ্রয়োগে সামর্থ্যাং সামান্যশব্দস্ত প্রয়োগ-নিয়মঃ। অজ্ঞাং গ্রামং নয়, সর্পিরাহর, ভ্রাক্ষণং ভোজয়েতি। সামান্যশব্দাঃ সন্তোহর্থাবয়বেষু প্রযুক্ত্যন্তে সামর্থ্যাং, যত্রার্থক্রিয়াচোদনা সম্ভবতি তত্র প্রবর্ত্তন্তে নর্থসামান্যে, ক্রিয়াচোদনাইসম্ভবং। এবময়ং সামান্যশব্দো নবকম্বল ইতি, যোহর্থঃ সম্ভবতি নবঃ কম্বলোহস্ত্যেতি তত্র প্রবর্ত্ততে, যন্ত ন সম্ভবতি নবকম্বলা অস্ত্যেতি তত্র ন প্রবর্ত্ততে। সোহয়মনুপপদ্যমানার্থ-কল্পনা পরবাক্যোপালম্বো ন কল্পত ইতি।

অনুবাদ। এই বাক্যের প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ বা যপ্তন (বলিতেছি) অর্থাৎ ইহা যে সঙ্গত নহে, তাহা বাদী যেক্রমে বুঝাইবেন, তাহা বলিতেছি। সামান্য শব্দের অনেকার্থতা থাকিলে অর্থাৎ কোন একটি সামান্য শব্দের যদি একাধিক



মুখ্যার্থ থাকে, তবে সেখানে একতর অর্থের অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ অর্থের কখন কল্পনা করিলে বিশেষ বলিতে হয়। বিশদার্থ এই যে, নবকম্বল শব্দের দ্বারা একাধিক অর্থের কখন হয়, ( সে কি কি অর্থ, তাহা বলিতেছেন ) ইহার নূতন কম্বল আছে (এবং) ইহার নয়খানা কম্বল আছে। এই নবকম্বল শব্দ প্রয়োগ করিলে ইহার নয়খানা কম্বল আছে, ইহা আপনি বলিয়াছেন, এই যে কল্পনা—তাহা সম্ভব হয় না। ( কারণ ) এই একতর অর্থের কখন কল্পনা করিলে অর্থাৎ ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এই অর্থবিশেষই নবকম্বল শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা কল্পনা করিলে বিশেষ বলিতে হইবে। যে বিশেষ বশতঃ অর্থবিশেষগুলির মধ্যে এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ অভিহিত হইয়াছে, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ অর্থবিশেষ বুঝা যায়, সে বিশেষ কিছু নাই, অর্থাৎ এখানে নবকম্বল শব্দের দ্বারা ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এই অর্থই বুঝিতে হইবে, এই বিষয়ে কোন বিশেষ অর্থাৎ প্রকরণ প্রভৃতি নিয়ামক নাই, সুতরাং ইহা মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। ( তাৎপর্য এই যে, যখন নবকম্বল শব্দের দ্বারা মুখ্যরূপেই দুইটি অর্থের বোধ হয় এবং তন্মধ্যে এখানে ইহার নূতন কম্বল আছে, এই অর্থই সম্ভব, তখন ঐ সম্ভব অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এইরূপ অসম্ভব অর্থটির গ্রহণ করা এবং বাদী ঐরূপই বলিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অশুচিত )।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধই আছে। ( সে সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন ) অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ শব্দ এবং তাহার বাচ্য অর্থের যে নিয়ম, তদ্বিষয়ে নিয়োগ, অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থই বুঝিতে হইবে, এইরূপ সম্বন্ধে। ( অভিধান ও অভিধেয়ের নিয়ম কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) এই শব্দের এই অর্থই অভিধেয় ( বাচ্য ), অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম বিষয়ে যে শব্দ-সংকেত, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ। ( এই সম্বন্ধ ) সামান্য শব্দের সমান অর্থাৎ সামান্য, বিশিষ্ট শব্দের বিশেষ। ( শব্দ ও অর্থের এইরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কি ? এ জ্ঞাত বলিতেছেন ) প্রযুক্তপূর্ব্ব এই সকল শব্দই অর্থে ( সেই সেই বাচ্য অর্থে ) প্রযুক্ত হইতেছে, অপ্রযুক্তপূর্ব্ব এই সকল শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে না অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধানুসারে পূর্ব্ব হইতেই এই সকল শব্দের সেই সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, এই সকল শব্দের পূর্ব্ব কখনও প্রয়োগ হয় নাই, এমন নহে। ( তাহাতেই বা কি ? এ জ্ঞাত বলিতেছেন ) অর্থ বোধের জন্তই প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ বশতঃই ব্যবহার হইতেছে। ( এ বাবৎ বাহা

বলিলেন, প্রকৃত স্থলে তাহার যোজন্য করিতেছেন ) অর্থবোধার্থ অর্থাৎ অর্থবোধই  
যাহার প্রয়োজন, এমন সেই এই প্রকার শব্দ প্রয়োগে সামান্য শব্দের সামর্থ্য বশতঃ  
প্রয়োগের নিয়ম-আছে । ( উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক পূর্বেবাক্ত কথা বুঝাইতেছেন )  
‘ছাগীকে গ্রামে লইয়া যাও’, ‘দুত আহরণ কর’, ‘ত্রাক্ষণকে ভোজন করাত’ । সামান্য  
শব্দ হইয়াও অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যে অজ্ঞা, সর্পিষ্ এবং ত্রাক্ষণ শব্দ যথাক্রমে সামা-  
ন্যতঃ ছাগী মাত্র, দুত মাত্র এবং ত্রাক্ষণ মাত্রের বোধক হইয়াও সামর্থ্য বশতঃ ঐ সকল  
অর্থের অংশবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যে ঐ তিনটি শব্দ যথা-  
ক্রমে ছাগীবিশেষ, দুতবিশেষ এবং ত্রাক্ষণবিশেষই বুঝাইতেছে । ( সামর্থ্য কি, তাহা  
বলিতেছেন ) যে অর্থে প্রয়োজন নির্বাহের উপদেশ সম্ভব হয়, সেই অর্থে ( শব্দ-  
গুলি ) প্রযুক্ত হয়, অর্থসামান্যে প্রযুক্ত হয় না । কারণ, ( অর্থসামান্যে ) প্রয়ো-  
জন নির্বাহের উপদেশ সম্ভব হয় না । ( অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে ছাগী মাত্রকে  
গ্রামে লওয়া, দুতমাত্রকে আহরণ করা এবং ত্রাক্ষণ মাত্রকে ভোজন করান অসম্ভব,  
সুতরাং ঐরূপ উপদেশ বা আদেশ সম্ভব নহে, এ জন্য ঐ স্থলে অজ্ঞা শব্দ ছাগী-  
বিশেষ অর্থে, সর্পিষ্ শব্দ দুতবিশেষ অর্থে এবং ত্রাক্ষণ শব্দ ত্রাক্ষণবিশেষ অর্থেই  
প্রযুক্ত হয়, বুঝিতে হইবে ) ।

এইরূপ ‘নবকঞ্চল’ এইটি সামান্য শব্দ ; ‘ইহার নূতন কঞ্চল আছে’ এইরূপ যে  
অর্থ ( এখানে ) সম্ভব হয়, সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ সেই অর্থই বুঝায় । ইহার  
নয়খানা কঞ্চল আছে, এইরূপ যে অর্থ কিন্তু সম্ভব হয় না, সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় না  
অর্থাৎ তাহা বুঝায় না, ঐ স্থলে ঐরূপ অসম্ভব অর্থে উহার প্রয়োগ হয় না ।  
( সুতরাং ) অনুপপাদ্যমান অর্থাৎ যাহা উপপন্ন হয় না, যাহা অসম্ভব, এমন অর্থের  
কল্পনার দ্বারা সেই এই অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রকার পরবাক্য-প্রতিবেদ যুক্তিযুক্ত  
হয় না ।

টিপ্পনী । প্রতিবাদী পূর্বেবাক্ত প্রকার ছল করিলে, বাদী উহা যে অসম্ভব, উহা একটা মিথ্যা  
অনুযোগ বা অভিযোগ মাত্র, ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইবেন ; তাহাকেই বলে ছলের প্রত্যবস্থান ।  
প্রতিকূল ভাবে অবস্থানই প্রত্যবস্থান । ছলবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন  
না, তাহার করণা অযুক্ত, ইহা বুঝাইগেই তাহার ছলের প্রতিকূল ভাবে অবস্থান হয় । ফলতঃ  
প্রতিবাদ পূর্বক কাহারও প্রতিবেদ করা বা খণ্ডন করাকেই প্রত্যবস্থান বলে এবং বস্তুতঃ  
প্রতিবেদ না হইলেও তাহাকে প্রত্যবস্থান বলা হইয়া থাকে ।

ভাষ্যকার এখানে শিষ্য-হিতের জন্ত তাহার পূর্বপ্রদর্শিত বাক্যগুলির কারণে প্রতিবেদ



করিতে হইবে, তাহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ সংক্ষেপে একটি সম্বন্ধের দ্বারা বক্তব্যটি বলিয়া পরে নিজেই তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাকেই বলে স্বপদবর্ণন, ভাব্যগ্রন্থের উহা একটি লক্ষণ। বহু স্থলে কেবল স্বপদবর্ণন থাকিতেই ভাব্যনির্ণাহ হইয়া থাকে।

ভাব্যকারের প্রথম কথাটির মর্ম এই যে, যে সকল অনেকার্গ-বোধক সামান্য শব্দ আছে, যেমন গো শব্দ, হরি শব্দ এবং নবকদল প্রভৃতি বাক্যরূপ শব্দ, ইহাদিগের দ্বারা কোন একটি বিশেষ অর্থ বুঝিতে হইলে দেশ, কাল, প্রকরণ, ঐতিহ্য প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ামক বুঝা আবশ্যক, নচেৎ প্রকৃত স্থলে কোন অর্থ বলার অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত, তাহা বুঝা যায় না। নবকদল এইরূপ বহুব্রীহি সমাদিসিদ্ধ বাক্যের দ্বারা যে দুইটি অর্থ বুঝা যায়, তাহার মধ্যে বাদীর কোন অর্থ বিবক্ষিত, তাহা বুঝিতে হইলে কোন অর্থ দেখানে সম্ভব, তাহা চিন্তা করিতে হইবে এবং কোন একটি অর্থনিশ্চয়ের ব্যাখ্যা করিতে গেলেও কেন সেই অর্থনিশ্চয়ের ব্যাখ্যা করিতেছি, কোন বিশেষ বা নিয়ামক দেখিয়া সেই বিশেষ অর্থটিই বাদীর বিবক্ষিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহা বলিতে হইবে, তাহা না বলিলে লোকে সে কল্পনা শুনিবে কেন? যেহেতুহুনারে কেটা ব্যাখ্যা করিয়া কাহারও কথার দোষ ধরিলে তাহাই বা টিকিবে কেন? সুতরাং পূর্নোক্ত স্থলে ছলবাদী বাদীর অনেকার্গপ্রতিপাদক 'নবকদল' এই সামান্য শব্দ প্রবণ করিয়া যে বাদীকে বলিলেন—আপনি এই ব্যক্তির নরখানা কদল আছে বলিয়াছেন, তাহার এই কল্পনা করিতে তিনি ঐ স্থলে ঐ অর্থ বুঝিবার পক্ষে কোন বিশেষ বা নিয়ামক পাইয়াছেন, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাহা যখন তিনি বলিতে পারেন না, সেই বিশেষ এখানে যখন কিছুই নাই, তখন তাহার এই কল্পনা অসম্ভব। কোন বিশেষ না থাকিলে অনেকার্গপ্রতিপাদক বাক্য বা শব্দের কোন একটি বিশেষ অর্থের কখন কল্পনা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বাদীর কথিত বালকের গাত্রে যদি পুরাতন কদল থাকিত অথবা অল্প কোন এমন বিশেষ বা নিয়ামক দেখানে থাকিত, তাহার দ্বারা বাদী সেই বালক নূতন কদলবিশিষ্ট, এ কথা বলিতে পারেন না, তাহা হইলে প্রতিবাদী ঐরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন। তাহা যখন নাই, তখন ছলবাদীর ঐ কল্পনা বা ঐরূপ কথা মিথ্যা অস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক নাজ, উহা নিরর্থক দোষারোপ বা নিরর্থক প্রশ্ন। অনেক ভাষ্য-পুস্তকে "মিথ্যা নিরোগমাত্রঃ" এইরূপ পাঠ আছে। কোন পুস্তকে "মিথ্যাভিযোগমাত্রঃ" এইরূপ পাঠ আছে। মিথ্যাস্বাভাবিক স্থলে মিথ্যানিরোগ, এইরূপ কথাও প্রমাদবশতঃ বুদ্ধিত বা লিপিত হইতে পারে। মূলে "মিথ্যাভিযোগমাত্রঃ" এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে, ঐরূপ পাঠ কোন পুস্তকেও দেখা যায়। "মিথ্যানিরোগমাত্রঃ" এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। সুবীণগ ইহার বিচার করিবেন।

ভাব্যকারের পূর্বকথার আপত্তি হইতে পারে যে, বাদী 'নবকদল' এইরূপ অনেকার্গপ্রতিপাদক সাধারণ শব্দেরই বা কেন প্ররোগ করেন? বাদী যদি 'নূতন কদল' এইরূপ অনাদিসিদ্ধ বা বিশেষ শব্দের দ্বারা তাহার বিশেষ অর্থটি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ত প্রতিবাদী ঠিক বুঝিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলেও পূর্নোক্ত প্রকারে অর্থান্তর কল্পনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং

এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ছলকারীরই অপরাধ কেন ? ঐরূপ বাক্যবক্তা বাদীরই অপরাধ নয় কেন ? এ জন্ত ভাব্যকার শেষে বলিয়াছেন, —“প্রসিদ্ধ” ইত্যাদি। ভাব্যকারের ঐ কথাগুলির তাৎপর্য এই যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ লোক-প্রসিদ্ধ পদার্থ। যিনি উহা জানেন না, তিনি বিচারে অবিকারীই নহেন। যিনি লোক-প্রসিদ্ধ পদার্থেও অজ্ঞ, তাহার সহিত কোন বিচারই হইতে পারে না। বাচক শব্দকে (অভিধীয়তেহেনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) অভিধান বলে। এবং তাহার বাচ্য অর্পকে অভিধেয় বলে। এই শব্দের এই পদার্থটি অথবা এই পদার্থগুলি অভিধেয়, এইরূপ নিয়ম আছে। সকল অর্থই সকল শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য নহে। এই নিয়ম বিষয়ে যে নিয়োগ অর্থাৎ এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ অথবা এই অর্থগুলি বুঝিতে হইবে, এইরূপ যে সম্বন্ধ, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকেই শব্দের শক্তি বলে। (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমান্তিকের শেষভাগ দ্রষ্টব্য)। এই সংকেতানুসারেই শব্দগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে পূর্ণ হইতেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এই সংকেতও সামান্য ও বিশেষ, এই দুই প্রকার আছে। নানার্থবোধক সামান্য শব্দ হইলে তাহার সংকেত সামান্য। বিশিষ্টার্থ-বোধক বিশেষ শব্দ হইলে তাহার সংকেত বিশেষ। এই সংকেতানুসারেই শব্দগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে সূচিরূপে হইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অর্থবোধের জন্তই এই শব্দ প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ প্রযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে। সুতরাং পূর্ব পূর্ব প্রয়োগ ও বৃদ্ধ-ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা হির থাকতেই লোকে সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থের প্রকাশ করিতেছে এবং অজ্ঞ লোকেও সেই শব্দ শুনিয়া সেই অর্থ বুঝিতেছে এবং সেই পদার্থের ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং যখন অর্থবোধের জন্তই শব্দ প্রয়োগ হইতেছে, তখন এই শব্দ প্রয়োগে সামর্থ্যবশতঃই সামান্য শব্দের প্রয়োগ নিয়ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দ নিখিল ব্রাহ্মণের বাচক। ব্রাহ্মণ-সমষ্টিই ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও, এইরূপ বাক্যে ব্রাহ্মণ—এইরূপ সামান্য শব্দের যে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, ঐ প্রয়োগ নিখিল ব্রাহ্মণ অর্থে হইতেছে না, সামর্থ্যবশতঃ কতিপয় ব্রাহ্মণ বা কোনও ব্রাহ্মণ অর্থেই হইতেছে। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ যে ব্রাহ্মণ-সমষ্টি, তাহার অবয়ব অর্থাৎ অংশ বা ব্যক্তি ব্রাহ্মণেই ঐরূপ সামান্য ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ হইতেছে; যিনি বোদ্ধা, তিনি সেখানে তাহাই বুঝিয়া থাকেন। ভাব্যকার সামর্থ্যবশতঃ সামান্য শব্দের প্রয়োগ নিয়ম আছে বলিয়াছেন। এই সামর্থ্য কি, তাহা দেখাইতে হয়। তাই শেষে বলিয়াছেন যে, যে অর্থে অর্গজিয়ার উপদেশ সম্ভব হয়, সামান্য শব্দ সেই অর্থেই প্রবৃত্ত হয়। অর্থ বলিতে প্রয়োজন, জিয়া বলিতে নির্দাহ বা সম্পাদন। বস্ত্রমাত্রই কোন না কোন প্রয়োজন নির্দাহ করে। এ জন্ত দার্শনিক ভাষায় বস্ত্র-মাত্রকেই বলা হয়—অর্গজিয়াকারী। যাহা অর্গজিয়াকারী নহে, তাহা বস্ত্র নহে, তাহা অলীক। ঐ অর্গজিয়া বা কোন প্রয়োজন নির্দাহের জন্ত যে উপদেশ-বাক্য বা প্রবর্তক বাক্য, তাহাই অর্গজিয়া-চোদনা। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও, ছাগীকে গ্রামে লইয়া যাও, দ্রুত আহরণ কর ইত্যাদি বাক্যগুলি কোন প্রয়োজন নির্দাহের জন্ত উপদেশ-বাক্য বা প্রবর্তক বাক্য। সমস্ত ছাগী, সমস্ত দ্রুত এবং



সমস্ত ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। সুতরাং যে ছাগী, যে ঘর এবং যে ব্রাহ্মণ অর্থে ঐরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় অর্থাৎ প্রয়োজন নির্দিষ্টের জন্য যে ছাগী প্রভৃতি তাৎপর্যে ঐরূপ উপদেশ-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই ছাগী প্রভৃতিই পূর্বোক্ত প্রয়োগে অজ্ঞা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয়, বোকা ব্যক্তি তাহাই বুঝিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত প্রয়োগে অজ্ঞা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ছাগীবিশেষ প্রভৃতি বুঝিলেও লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারা এখানে বুঝা যায় অর্থাৎ বক্তার তাৎপর্য্য বুঝিয়াই ঐরূপ বিশেষ অর্থ বুঝা যায়। যেখানে যে অর্থে সামান্য শব্দের সামর্থ্য আছে, তাহা বুঝিয়াই বক্তার তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। সামান্য শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ বুঝিলে লক্ষণার আশ্রয় করা হয়; কারণ, বিশেষ-রূপে বিশেষ অর্থে সামান্য শব্দের শক্তি নাই, ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত হইলেও বক্তার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সামান্যরূপে বিশেষ অর্থও লক্ষণা ব্যতিরেকে সামান্য শব্দের দ্বারা স্থলবিশেষে বুঝা যায়, ইহা নব্য নৈয়ায়িকও বলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চমূলী, সপ্তশতী ইত্যাদি প্রয়োগই তাহার দৃষ্টান্ত। পঞ্চমূলী বলিতে যে কোন পাঁচটি মূল বুঝায় না, মূলপঞ্চকবিশেষই বুঝাইয়া থাকে। সপ্তশতী বলিতে যে কোন গ্রহের যে কোন স্থানের সাত শত শ্লোক বুঝায় না, মার্কণ্ডেয় পুরাণের নবী-মাহাত্ম্যের তদাদি তদন্ত সাত শত শ্লোকই বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং এ সব স্থলে সামান্য শব্দের বিশেষার্থই গ্রহণ করিতে হয়। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার এখানে তাৎপর্য্যানুসারেই বিশেষার্থ গ্রহণের কথা বলিয়া গিয়াছেন<sup>১</sup>। লক্ষণার আশ্রয় করিলে ঐ দুই স্থলে বিগুণমান হইতে না পারায় ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। বিগুণমানে লাক্ষণিক অর্থের বোধ হয় না, এ অল্প ত্রিকটু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি প্রয়োগে লক্ষণার আশ্রয় করিয়া কণ্ঠধার সমানই হইয়া থাকে, ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের সিদ্ধান্ত। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকার বিগুণমান-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ফল কথা, ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, লক্ষণা ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণরূপে ব্রাহ্মণ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণবিশেষ বুঝা যায়। এইরূপ অজ্ঞাত সামান্য শব্দের দ্বারাও সামর্থ্যবশতঃ ঐরূপ বুঝা যায় এবং বুঝিতে হয়। ব্রাহ্মণ শব্দ প্রভৃতি সামান্য শব্দ হইলেও সর্বত্র তাহার অর্থসামান্যে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, অর্থসামান্যে পূর্বোক্ত অর্থক্রিয়ার উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। অর্থক্রিয়ার জন্য উপদেশ-বাক্য বলিলে তাহার মধ্যে সামান্য শব্দগুলি ব্যবহৃত ঐরূপ বিশেষ অর্থই বুঝাইবে। এ পর্য্যন্ত বাহা বলা হইল, তাহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, শব্দগুলি সংকেতানুসারেই পূর্ণ হইতেই সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে এবং অর্থবোধের জন্যই শব্দ প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে এবং শব্দের অর্থবোধ প্রযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে। শব্দের মধ্যে যেগুলি সামান্য শব্দ, তাহার যেখানে যে অর্থ সম্ভব, সেই বিশেষ অর্থই সেখানে বুঝিতে হয়, সেইরূপ অর্থেই সেখানে তাহার প্রয়োগ হয়। নবকল্প—এইটি সামান্য শব্দ। ইহার যে অর্থ সেখানে সম্ভব, সেই অর্থই

১। পঞ্চমূলীতানো তু মূলপঞ্চকভেদেব স্থলবিশেষে তাৎপর্য্যং ন তু বিশেষরূপাণি ইত্যাদি।—(শব্দশক্তি-প্রকাশিকা)।

বুঝিতে হইবে। সামান্য শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত থাকিলে দেশ, কাল, প্রকরণ, ঐতিহ্য প্রভৃতির দ্বারা সেখানে কোন বিশেষ অর্থই বুঝিতে হইবে। সংকেতানুসারে সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিলে তজ্জন্ত বাদী অপরাধী হইতে পারেন না। বাদী বিশেষ শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, তিনি নানারূপ সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বাদীর অপরাধ বলা যায় না। কারণ, বাদী সংকেতানুসারেই সামান্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সামান্য শব্দে ঐরূপ সংকেত থাকে কেন? এই বলিয়া সংকেতকে অপরাধী বলিতে পার, বল; কিন্তু বাদীকে অপরাধী বলিতে পার না। বাদীকে ঐরূপ সামান্য শব্দ প্রয়োগের জন্ত অপরাধী বলিলে, ছলকারী প্রতিবাদীকেও ঐ ভাবে অপরাধী হইতে হইবে। কারণ, তাহার উচ্চারিত বাক্যগুলির মধ্যেও সামান্য শব্দ পাওয়া যাইবে অথবা যে কোনরূপে তাহার কথ্যভাষাতেও কোনরূপ ছল করা যাইবে; তিনি সংকেতানুসারেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইত্যাদি বলিয়া আর তখন নিজের নিরপরাধ প্রতীপন্ন করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, বাদী সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার যে বিশেষ অর্থটি যেখানে উপপন্ন হয় না, সেই অর্থের কর্ত্তব্য করিয়া বাদীর বাক্যের প্রতিবেদন করা অযুক্ত, ঐরূপ করিলে তজ্জন্ত ছলকারী প্রতিবাদীই অপরাধী। বাদীর ঐ স্থলে কোনই অপরাধ নাই। ছলকারী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়াও ছল করেন, তাহা হইলে উহা সত্য বুঝিয়াও সত্য গোপন, অথবা কলটতামূলক সত্যোপলব্ধি। আর যদি বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিয়া ছল করা হয়, তাহা হইলে ছলকারীর অজ্ঞতারূপ দোষ অপরিহার্য। পরন্তু বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিলে বাদীর নিকটে প্রয়োগ করিয়া তাহা বুঝা উচিত। ছলকারী বুঝিতে পারেন নাই এবং প্রয়োগ করিয়াও বুঝিয়া লন নাই, এই ক্ষেত্রে বাদীর অপরাধ কি? কলকথা, যে ভাবেই ছল করা হউক, সেখানে ছলকারী প্রতিবাদীই অপরাধী, বাদীর ঐ স্থলে কোনই অপরাধ নাই।

এই শব্দ এই অর্থের বাচক অথবা এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপ সংকেত ভিন্ন ভিন্নরূপে শব্দ ও অর্থের কোন সংঘাত স্বীকৃত হয় নাই। ভাষ্যকার এখানে শব্দ-সংকেতের কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে "নবকথন"-বাক্যরূপ শব্দেরও সংকেত তিনি স্বীকার করিতেন, ইহা মনে আসে। পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যে শক্তি স্বীকার না করিলেও প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝিবার হেতু পাওয়া যায়। যথাক্রমে এ কথার আলোচনা পাওয়া যাইবে। (দ্বিতীয়ভাগের প্রথমমুদ্রিকের শেষভাগ ও দ্বিতীয় আধিকের শেষভাগ জটব্য)।

প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকগুলিতে 'অর্থক্রিয়াদেশনা' এইরূপ পাঠ আছে। দেশনা বলিতেও উপদেশ-বাক্য বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার 'অর্থক্রিয়াদেশনা' এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কশ্যপবর্গক বাক্যকে প্রাচীনগণ 'চোদনা' বলিয়াছেন<sup>১</sup>। শব্দ স্বামীর চোদনা শব্দের ব্যাখ্যায়<sup>২</sup> ভট্ট কুমারিল শব্দমাত্রই চোদনা শব্দের পৌরোগ্য, ইহা বলিয়াছেন<sup>৩</sup>।

১। দেশনা লোকনাশনাং সংশ্লিষ্টবশাদিভিঃ। ইত্যাদি (বাংলাভাষ্য)।

২। চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং ঘটনমাত্রং। (শব্দভাষ্য) ২ পৃষ্ঠে।

৩। চোদনেতি প্রবর্ত্তকং শব্দমাত্রং। ইত্যাদি।—দীর্ঘসাম্বন্ধীয়াসুত্রভাষ্যার্থিকের ৭ শ্লোক।



সূত্র । সম্ভবতোহর্থস্ফাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থ-  
কম্পনা সামান্যচ্ছলম্ ॥১৩॥৫৪॥

অনুবাদ । সম্ভাব্যমান পদার্থের অর্থাৎ ইহা হইতে পারে, ইহা সম্ভব, এইরূপ তাৎপর্যে কথিত পদার্থের অতি সামান্য ধর্মের যোগবশতঃ অর্থাৎ যে সামান্য ধর্মটি ঐ সম্ভাব্যমান পদার্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্মটিতে যে পদার্থ অসম্ভব, বক্তা যাহা বলেনও নাই, সেই পদার্থের যে আরোপ, কলিতার্থ এই যে, ঐরূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা যে বাক্যব্যাঘাত বা প্রতিষেধ, তাহা সামান্যচ্ছল ।

ভাষ্য । ‘অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন’ ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ ‘সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্প’দिति । অস্ত্য বচনস্ত বিধাতোহর্থবিকলো-  
পপত্ত্যাহসম্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে । যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবতি  
ব্রাত্যোহপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোহপি ব্রাহ্মণঃ সোহপ্যস্ত বিদ্যাচরণসম্পন্ন  
ইতি । যদ্বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যোতি চ তদতিসামান্যম্ । যথা  
ব্রাহ্মণস্তং বিদ্যাচরণসম্পদং কচিদাপ্নোতি কচিদত্যোতি । সামান্যনিমিত্তং  
ছলং সামান্যচ্ছলমিতি ।

অনুবাদ । আহা, এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন, এই কথা ( কেহ ) বলিলে  
কেহ অর্থাৎ দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি বলিলেন,—ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব ।  
(এখানে) অসম্ভূত অর্থের কল্পনারূপ অর্থবিকলোপপত্তির দ্বারা অর্থাৎ ( ছলের সামান্য  
লক্ষণসূত্রোক্ত ) বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা এই  
বাক্যের অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বিতীয়বাদীর বাক্যের বিঘাত (ছলকারী কোন তৃতীয় ব্যক্তি)  
করে । ( সে কিরূপে, তাহা বলিতেছেন ) । যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পৎ  
সম্ভব হয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও অর্থাৎ যাহার উপনয়নের কাল গিয়াছে, তবুও উপনয়ন  
হয় নাই, বেদাধ্যয়ন হয় নাই, এমন ব্রাহ্মণেও সম্ভব হউক ? বিশদার্থ এই যে,  
ব্রাত্য ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, তিনিও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন ? যাহা বিবক্ষিত পদার্থকে  
প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহা অর্থাৎ সেই ধর্মকে অতিসামান্য বলে ।  
যেমন ব্রাহ্মণর বিদ্যাচরণসম্পৎকে কোন স্থলে ( বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে ) প্রাপ্ত হয়,

কোনও স্থলে (ব্রাত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণে) অতিক্রম করে, (অর্থাৎ প্রকৃত স্থলে ব্রাহ্মণের ধর্মই বিদ্যাচরণসম্পদের অতি সামান্য ধর্ম, উহা বক্তা বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে বলেন নাই এবং উহাতে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুই সম্ভবও নহে, কিন্তু ছলকারী ঐ ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুই কল্পনা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন)। ব্রাহ্মণের ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও আছে, সেখানে বিদ্যাচরণসম্পদ নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু হইতে পারে না, ইহাই ছলকারীর বক্তব্য)। সামান্যনিমিত্তক অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্মনিমিত্তক ছল (এ জন্য) সামান্য ছল, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্মনিমিত্তক ছল বলিয়াই ইহার নাম সামান্যছল।

টিপ্পনী। বাক্‌ছনের লক্ষণ বলিয়া মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা ক্রমগোপ্ত সামান্যছনের লক্ষণ বলিয়াছেন। সামান্যছল পূর্বোক্ত বাক্‌ছনের জায় শব্দের অর্গস্তর কল্পনা করিয়া হয় না। সামান্যধর্ম-নিমিত্তক ছল বলিয়াই ইহার নাম সামান্যছল। সামান্য ধর্ম বলিতে যে কোনরূপ সামান্য ধর্ম এখানে বুঝিতে হইবে না। এই জন্ত হৃত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন,—‘অতিসামান্যগোপ্তা।’ ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, যে ধর্মটি বক্তার বিবক্ষিত অর্গকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকে অতিক্রমও করে, এমন ধর্মই হৃত্রোক্ত অতিসামান্য ধর্ম। যেমন কোন ব্যক্তি কোন একজন বেদাধ্যয়নশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন। বেদবিদ্যার অধ্যয়নাদিরূপ আচরণই ব্রাহ্মণের সম্পৎ। উপনিষৎ ঐরূপ ব্রাহ্মণকে ‘অনুচান’ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত বিদ্যাচরণসম্পৎ সকল ব্রাহ্মণেই থাকে না। যিনি উপনীত হইয়া বেদবিদ্যার অধ্যয়নাদি করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাহাতেই ঐ সম্পৎ থাকে। শিশু ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাত্য ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণসম্ভান বলিয়া ব্রাহ্মণ। দেহগত ব্রাহ্মণের জাতি তাহাদিগেরও আছে, কিন্তু ঐ সকল ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ নাই। ঐ সকল ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবই নহে। পূর্বোক্ত প্রকার ব্রাহ্মণ-বিশেষেই উহা সম্ভব। সুতরাং পূর্বোক্ত বাক্যস্থলে ব্রাহ্মণবিশেষের বিদ্যাচরণসম্পত্তিই হৃত্রোক্ত ‘সম্ভবৎ’ পদার্থ এবং উহাই পূর্ববক্তার বিবক্ষিত এবং পূর্ববক্তার ঐ বাক্যটি প্রশংসার্গ। ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রশংসার জন্ত ঐ বাক্যের সমর্থন করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব। অর্থাৎ ইনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ইহার বিদ্যাচরণসম্পৎ থাকাই সম্ভব। এই বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইবেন, ইহা বলা দ্বিতীয় বক্তার উদ্দেশ্য নহে, দ্বিতীয় বক্তা তাহা বলেন নাই। কিন্তু ঐ স্থলে তৃতীয় কোন বক্তা দ্বিতীয় বক্তার তাৎপর্য বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে করিয়া দোষপ্রদর্শন করিলেন,—যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউক? তৃতীয় বক্তার কথা এই যে, ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু



বলিয়াছ, তাহা বলিতে পার না। ত্রাত্য ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণ্য আছে, কিন্তু সেখানে বিদ্যাচরণ-সম্পত্তি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য জাতি বিদ্যাচরণসম্পদের ব্যভিচারী। বলিয়া উহা তাহার সাধন হয় না। এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মটি বিদ্যাচরণসম্পত্তিকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে অর্থাৎ বিদ্যাচরণসম্পন্ন ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণ্য থাকে, ত্রাত্য ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণ্য থাকে, এ অজ্ঞ উহা বক্তার বিবক্ষিত এবং সম্ভবপদার্থ যে বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে অতি সামান্য ধর্ম। ত্রাত্য ব্রাহ্মণে উহার দোষ বা সম্বন্ধ থাকিতে তৃতীয় বক্তা অসম্ভব অর্গ করনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এ অজ্ঞ তৃতীয় বক্তার ঐ দোষ প্রদর্শন সামান্যত্ব হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিদ্যাচরণ-সম্পদের হেতু অসম্ভব পদার্থ, অর্থাৎ উহা সম্ভব নহে। তৃতীয় বক্তা ঐ অসম্ভব হেতুের করনা বা আরোপ করিয়া ত্রাত্য ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্যরূপ অতি সামান্য ধর্ম আছে বলিয়া এখানে ছল করিয়াছেন।

ভাষ্য। অস্যা চ প্রত্যবস্থানং। অবিবক্ষিতহেতুকম্য বিয়য়ানুবাদঃ, প্রশংসার্থবাদ্বাক্যম্য, তদত্রাসম্ভূতার্থকল্পনানুপপত্তিঃ যথাসম্ভবন্ত্যগ্নিন্ ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্ত ক্ষেত্রং প্রশস্যতে। মোহয়ং ক্ষেত্রানুবাদো নাগ্নিন্ শালয়ো বিধীয়ন্ত ইতি। বীজান্তু শালিনির্বৃতিঃ সত্যী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যা-চরণসম্পদিত্তি, সম্পদ্বিময়ো ব্রাহ্মণ্যং ন সম্পদ্বৈতুঃ, ন চাত্র হেতুর্বি-বক্ষিতঃ,—বিয়য়ানুবাদস্তয়ং, প্রশংসার্থবাদ্বাক্যম্য। সতি ব্রাহ্মণ্যে সম্পদ্বৈতুঃ সমর্থ ইতি। বিষয়ঞ্চ প্রশংসতাবাক্যেন যথাহেতুতঃ ফল-নিবৃত্তিন প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোহসম্ভূতার্থকল্পনয়া নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। এই সামান্য ছলেরও প্রত্যবস্থান অর্থাৎ সমাধান বা উত্তর (বলিতেছি)। বিনি হেতুবিবক্ষা করেন নাই অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ব্রাহ্মণ্যকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা বাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলেন নাই, সেই দ্বিতীয় বক্তার (ঐ বাক্যটি) বিষয়ের অনুবাদ। কারণ, (ঐ) বাক্যটি প্রশংসার্থ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যের প্রশংসার জগাই দ্বিতীয় বক্তা ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার সেই বাক্যের ব্যাঘাতের) উপপত্তি হয় না। [একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্বক পূর্বোক্ত ভাবের বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন]। যেমন এই ক্ষেত্রে শালি (কলম প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ) সম্ভব। (এই বাক্যের দ্বারা) বীজ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাকৃত হয় নাই, বিবক্ষিতও হয় নাই,

অর্থাৎ যিনি ঐরূপ কথা বলেন, তিনি এই ক্ষেত্রে বীজ রোপণ না করিলেও শালি জন্মে, ইহা বলেন না এবং বীজাদি কারণের দ্বারা এই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, এইরূপ কথাও তিনি বলেন না, ঐরূপ বলা সেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রভৃতির বিষয় ক্ষেত্র ঐ বাক্যের দ্বারা প্রশংসিত হয়, অর্থাৎ ঐ স্থলে কেবল ক্ষেত্রকে প্রশংসা করাই বক্তার উদ্দেশ্য। বিশদার্থ এই যে, সেই এইটি (পূর্বোক্ত বাক্যটি) ক্ষেত্রের অনুবাদ। এই বাক্যে (ক্ষেত্রে) শালি বিহিত হয় না অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা বক্তা বীজ ব্যতীতও সেই ক্ষেত্রে শালির বিধান করেন না এবং বীজ হইতে শালির যে উৎপত্তি হয়, তাহাও (ঐ বক্তার) বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে সেই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, ইহা বলাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

এইরূপ ভ্রাক্ষণে বিদ্যাচরণসম্পদ সম্ভব, এই স্থলে ভ্রাক্ষণের বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়, বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু নহে, এই বাক্যে হেতু বিবক্ষিতও নহে, অর্থাৎ ভ্রাক্ষণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা বক্তার উদ্দেশ্যও নহে, বক্তা তাহা বলেনও নাই, কিন্তু এই বাক্যটি বিষয়ের অনুবাদ; কারণ, বাক্যটি প্রশংসার্থ।

[ভ্রাক্ষণরূপ বিষয়ের প্রকৃতস্থলে প্রশংসা কি, তাহা বলিতেছেন]। ভ্রাক্ষণের থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু (অধ্যয়ন, ভ্রাক্ষণাদি) সমর্থ হয় অর্থাৎ বিদ্যাচরণসম্পদ জন্মাইতে সামর্থ্যশালী হয়। বিষয়ের প্রশংসাকারী বাক্যের দ্বারা যথাহেতু হইতে ফলের উৎপত্তি নিষেধ করা হয় না, (অর্থাৎ যে প্রকার হেতুর দ্বারাই যে ফল জন্মে, সেই প্রকার হেতুর দ্বারাই সেই ফল জন্মিবে। অধ্যয়ন প্রভৃতি বিদ্যাচরণসম্পদের যেগুলি হেতু, তদ্ব্যতীত ভ্রাক্ষণও বিদ্যাচরণসম্পদ হইতে পারেন না। কেহ কোন বাক্যের দ্বারা ভ্রাক্ষণের প্রশংসা করিলে তাহাতে ভ্রাক্ষণই বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ভ্রাক্ষণের বিদ্যাচরণসম্পদ হইতে অধ্যয়নাদি কারণ আবশ্যক নাই, এ কথা বলা হয় না। কেবল ভ্রাক্ষণের প্রশংসা করাই হয়)। সুতরাং এইরূপ হইলে অসম্ভব পদার্থের অর্থাৎ ভ্রাক্ষণের জাতিতে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুর যাহা অসম্ভব, যাহা ঐ স্থলে দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিতও নহে, তাহার কল্পনার অর্থাৎ আরোপের দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার) বাক্যব্যবহৃত উপপন্ন হয় না।

১। বিষয় শব্দের দেশ স্বর্গ অভিধানে পাওয়া যায়। এ ভক্ত হান বা আবার বুঝাইতে প্রাচীনবর্ণ বিষয় শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ভ্রাক্ষণের বিদ্যাচরণের বিষয়, এই কথা বলিলে বিদ্যাচরণের হান বুঝা যাইতে পারে। ভ্রাক্ষণ বিদ্যাচরণের হান, ইহাই ঐ কথার অর্থার্থ। ভ্রাক্ষণই ভ্রাক্ষণকে বিদ্যাচরণের বিষয় বা হান করিয়াছে, তাই ভ্রাক্ষণকে বিষয় বলা হইয়াছে।



টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষিপ্রাক্ত সামান্ত জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে তাহারও সমান বা প্রত্যাহার প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সনাতনের তাৎপর্য এই যে, প্রথম বক্তা ব্রাহ্মণবিশেষের প্রশংসার জন্য যে বাক্য বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা সেই বাক্যের অহুমোদন করিতে ব্রাহ্মণবিশেষের প্রশংসাই করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ইহা তিনি বলেন নাই। সূত্রগ্রন্থ তৃতীয় বক্তা ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থে কোন দোষ না হওয়ায় উহা অসম্ভব। দ্বিতীয় বক্তা যদি ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তৃতীয় বক্তার প্রদর্শিত পূর্বোক্ত প্রকার দোষ হইত। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তার তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে; ব্রাহ্মণবিশেষের প্রশংসা করাই তাহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণের থাকিলে তিনি বেদবিদ্যার অধিকারী এবং যে কর্মফলে ব্রাহ্মণের লাভ হয়, সেই কর্মফল ব্রাহ্মণকে বিদ্যার আচরণে প্রবৃত্ত করে এবং ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি শাস্ত্রানুসারে বিদ্যার আচরণ করিতে বাধ্য, ব্রাহ্মণের চিরাচরিত আচারও ঐরূপ, সূত্রগ্রন্থ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ সম্ভব, এইরূপ তাৎপর্য্যে বাহা বলা হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণই বিদ্যাচরণসম্পদের কারণ, অধ্যয়নাদি না করিলেও ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, ইহা বলা হয় না। অধ্যয়নাদি বাতীত ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইতে পারেন না। বিদ্যাচরণ-বর্জিত ব্রাহ্মণও চিরকালই আছেন। অত্রিসংহিতার দশবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায়। সর্ববিধ ব্রাহ্মণেরই দেহগত ব্রাহ্মণের জাতি আছে, কিন্তু অধ্যয়নাদি কারণের অভাবে বিদ্যাচরণসম্পত্তি সকল ব্রাহ্মণের নাই, তাহা থাকিতেই পারে না। পূর্বোক্ত স্থলে দ্বিতীয় বক্তা ব্রাহ্মণকেই ঐ বিদ্যাচরণসম্পত্তির কারণ বলেন নাই। তিনি বিদ্যাচরণসম্পত্তি লাভে অধ্যয়নাদি কারণের অপলাপ করিয়া, যেহেতু ইনি ব্রাহ্মণ, অতএব অবশ্যই ইনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, ইহা বলেন নাই, তিনি ব্রাহ্মণবিশেষের প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ববক্তা যে ব্রাহ্মণবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা তাহার প্রশংসার জন্য সেই ব্রাহ্মণবিশেষের পুনরুৎপত্তি করিয়া উহার অহুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তার বাক্যটি ব্রাহ্মণবিশেষের প্রশংসার্থ, এ জন্য উহা ব্রাহ্মণস্বরূপ বিষয়ের অহুমোদন। সপ্রয়োজন পুনরুৎপত্তিকে অহুমোদন বলে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলেন - এই ক্ষেত্রে শালি উৎপাদন করিবে; তখন দ্বিতীয় বক্তা যদি বলেন যে, এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বীজাদি কারণ ব্যতীতই শালি উৎপন্ন হয়, এ কথা বলা হয় না। বীজাদি কারণের দ্বারা শালি উৎপন্ন হয়, ইহা বলাও তাহার উদ্দেশ্য নহে; ক্ষেত্রের প্রশংসাই তাহার উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শালি জন্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র, এইমাত্র বলাই তাহার উদ্দেশ্য। তাহার ঐ বাক্যটি প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্রের অহুমোদন। ঐ বাক্যে শালি বিহিত হয় নাই, সূত্র ১৭ উহা বিধায়ক বাক্য নহে। পূর্বে কোন বক্তা সেই ক্ষেত্রে শালি বিধায়ক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা পূর্ববাদী; উক্ত ক্ষেত্রের প্রশংসার্থ সেই ক্ষেত্রের অহুমোদন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক বলিয়াছেন যে, এইরূপ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ সম্ভব; এই বাক্য ও ব্রাহ্মণস্বরূপ বিষয়ের অহুমোদন ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়, কিন্তু হেতু নহে; হেতু বলা বক্তার উদ্দেশ্যও নহে। ব্রাহ্মণের

থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পত্তির হেতুগুলি সমর্থ হয়, তাই ব্রাহ্মণ্য বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়। বিষয় শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার এখানে বাহ্য থাকিলে অর্থাৎ বাহ্যর আধারে প্রকৃত-কার্যের কারণগুলি সমর্থ বা সামর্থ্যশালী অর্থাৎ সকল হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐরূপ বিষয় পদার্থ প্রকৃত কার্যে হেতু নহে, ইহাই ভাষ্যকারের কথা। পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ছল অনেক সময়েই হইয়া থাকে। বক্তার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ঐরূপ প্রতিবাদ হয় এবং ভাষ্যোক্তরূপে আবার তাহার প্রতিবাদ হয়। লৌকিক বিষয়েও যে কত বাদ-প্রতিবাদ ঐ ভাবে হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল চিন্তা করুন ॥১৩॥

## সূত্র । ধর্মবিকল্পনির্দেশেইর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্ ॥১৪॥৫৫॥

অনুবাদ । ধর্মবিকল্পের নির্দেশ হইলে অর্থাৎ শব্দের ধর্ম যে যথার্থ প্রয়োগ, তাহার যে বিকল্প অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ মুখ্য, তাহা হইতে ভিন্নার্থে প্রয়োগ, তাহার নির্দেশ হইলে, ফলিতার্থ এই যে, লাক্ষণিক বা গোণ অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, অর্থসদ্ভাবের দ্বারা যে প্রতিষেধ, অর্থাৎ মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন, তাহা উপচারছল।

ভাষ্য । অভিধানস্ত ধর্মো যথার্থপ্রয়োগঃ । ধর্মবিকল্পোহন্যত্র দৃষ্ট-  
স্ত্রান্যত্র প্রয়োগঃ । তস্ত নির্দেশে ধর্মবিকল্পনির্দেশে । যথা—মঞ্চাঃ  
ক্রোশন্তীতি অর্থসদ্ভাবেন প্রতিষেধঃ, মঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি ।  
ক। পুনরত্রার্থবিকল্পোপপত্তিঃ ? অন্যথা প্রযুক্তস্ত্রান্যথাইর্থকল্পনং, ভক্ত্যা  
প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং । উপচারবিষয়ং ছলমুপচারছলং । উপচারো  
নীতার্থঃ, সহচরণাদিনিমিত্তেনাতদ্ভাবে তদ্বদভিধানমুপচার ইতি ।

অনুবাদ । অভিধানের অর্থাৎ শব্দের ধর্ম যথার্থ প্রয়োগ। ধর্মের বিকল্প বলিতে (এখানে) অন্য অর্থে দৃষ্ট শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ, অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থে সামান্যতঃ প্রয়োগ দেখা যায়, কোন বিশেষবশতঃ তাহা হইতে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগই এই সূত্রোক্ত ধর্মবিকল্প। তাহার নির্দেশে (এই অর্থে সূত্রে বলা হইয়াছে) ধর্মবিকল্প-নির্দেশে। (উদাহরণ) যেমন মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এই স্থলে অর্থাৎ কেহ ঐ বাক্য বলিলে অর্থসদ্ভাবের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের সদর্থ বা মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়া নিষেধ করা হয়। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) মঞ্চস্থিত পুরুষগণ রোদন করিতেছে, কিন্তু মঞ্চ (কাষ্ঠের আসনবিশেষ) রোদন



কৰিতেছে না। (প্ৰশ্ন) এই স্থলে অৰ্থবিকল্পৰূপ উপপত্তি কি ? অৰ্থাৎ চল্লৈ সামান্য লক্ষণে যে অৰ্থ-বিকল্পৰূপ উপপত্তি বলা হইয়াছে, বাহা চল্লৈ মাতেই আবশ্যক, তাহা পূৰ্বেবাক্ত উদাহৰণে কি আছে ? (উত্তৰ) অন্যপ্ৰকাৰে প্ৰযুক্ত শব্দেৰ অন্য প্ৰকাৰ অৰ্থকল্পনা। বিশদাৰ্থ এই যে, লক্ষণাৰ দ্বাৰা প্ৰয়োগ হইলে প্ৰধানৈ দ্বাৰা অৰ্থাৎ শক্তিৰ দ্বাৰা কল্পনা (অৰ্থান্তৰ কল্পনা)। অৰ্থাৎ পূৰ্বেবাক্ত স্থলে মঞ্চস্থিত পুৰুষ বুকাইতে মঞ্চ শব্দেৰ লাক্ষণিক প্ৰয়োগ হইয়াছে, কিন্তু চল্লৈকাৰী প্ৰতিবাদী মঞ্চ শব্দেৰ মুখ্য অৰ্থ যে মঞ্চ, তাহা অবলম্বন কৰিয়া নিষেধ কৰিয়াছেন যে, মঞ্চ বোদন কৰিতেছে না, মঞ্চস্থ পুৰুষগণই বোদন কৰিতেছে। তাহা হইলে মঞ্চ-শব্দেৰ অৰ্থ বিকল্প বা অৰ্থান্তৰ কল্পনা-ৰূপ উপপত্তিব দ্বাৰাই এখানে চল্লৈ হইয়াছে। উপচাৰ-বিষয়ক চল্লৈ—উপচাৰ-চল্লৈ। অৰ্থাৎ লাক্ষণিক বা গৌণ প্ৰয়োগৰূপ উপচাৰকে বিদয় কৰিয়া (আশ্ৰয় কৰিয়া) পূৰ্বেবাক্ত প্ৰকাৰ চল্লৈ কৰা হয়; এজন্য ইহাৰ নাম উপচাৰচল্লৈ। উপচাৰ ‘নীতাৰ্থ’, অৰ্থাৎ সাহচৰ্য্য প্ৰভৃতি কোন নিমিত্ত কৰ্ত্তৃক যেখানে কোন শব্দ মুখ্য অৰ্থ হইতে ভিন্ন অৰ্থ প্ৰাপিত হয়, তাহাই উপচাৰ। তদুতাব না থাকিলেও সাহচৰ্য্য প্ৰভৃতি (কোন) নিমিত্তবশতঃ তদ্বৎকথন উপচাৰ। (অৰ্থাৎ যে অৰ্থে যে শব্দেৰ বাচ্যতা নাই, সাহচৰ্য্য প্ৰভৃতি কোন নিমিত্তবশতঃ সেই শব্দেৰ দ্বাৰা সেই অৰ্থেৰ কথনই উপচাৰ, ইহা মহাৰ্থি গোতম নিজেই বলিয়াছেন)।

টিপ্পনী। সূত্ৰে প্ৰথমেই যে ধৰ্ম্ম শব্দটি আছে, উহাৰ দ্বাৰা শব্দেৰ ধৰ্ম্মই মহাৰ্থিৰ বিবক্ষিত। তাহাৰ দ্বাৰা কোন অৰ্থ অতিহিত হয়, এই ব্যুৎপত্তিৰ দ্বাৰা ভাব্যেৰ-প্ৰথমে ‘অভিধান’ বলিতে শব্দ বুঝিতে হইবে। যে শব্দটি যে অৰ্থে সামান্যতঃ প্ৰযুক্ত হইয়া আসিতেছে, সেই শব্দেৰ সেই অৰ্থে প্ৰয়োগই তাহাৰ যথার্থ প্ৰয়োগ, উহা শব্দেৰ ধৰ্ম্ম। যেমন চল্লৈ শব্দেৰ চল্লৈ অৰ্থে প্ৰয়োগ, মঞ্চ শব্দেৰ কাৰ্টি-নিৰ্ম্মিত আসনবিশেষ অৰ্থে প্ৰয়োগ, এইগুলি শব্দেৰ যথার্থ প্ৰয়োগ। শব্দেৰ মুখ্যার্থ হইতে অন্য অৰ্থে প্ৰয়োগই এখানে ভাব্যকাৰেৰ মতে ধৰ্ম্মবিকল্প। যেমন মঞ্চ শব্দেৰ ‘মঞ্চস্থিত পুৰুষ’ অৰ্থে প্ৰয়োগ। উহা মঞ্চ শব্দেৰ মুখ্যার্থ নহে; উহাকে বলে লাক্ষণিক অৰ্থ। ঐ অৰ্থেও মঞ্চ শব্দেৰ প্ৰয়োগ হইয়া থাকে। ভাব্যকাৰ এইৰূপ ধৰ্ম্মবিকল্পেৰ নিৰ্দেশকেই সূত্ৰোক্ত ধৰ্ম্মবিকল্প-নিৰ্দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন।

তাৎপৰ্য্যটীকাৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন যে, শব্দেৰ ধৰ্ম্ম প্ৰয়োগ। তাহাৰ বিকল্প বলিতে বৈবিধ্য অৰ্থাৎ শব্দেৰ প্ৰয়োগ বিবিধ;—মুখ্য এবং গৌণ। শব্দেৰ সামান্যতঃ মুখ্য প্ৰয়োগই হয়। কোন বিশেষবশতঃ কোন কোন স্থলে গৌণ প্ৰয়োগও হয়। সেই ধৰ্ম্ম-বিকল্পপ্ৰযুক্ত যে নিৰ্দেশ অৰ্থাৎ বাক্য, তাহাই ধৰ্ম্ম-বিকল্প-নিৰ্দেশ। তাহাৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশ কৰা হয়, এই অৰ্থে সূত্ৰে নিৰ্দেশ শব্দেৰ দ্বাৰা বাক্য বুঝিতে হইবে। ভাব্যেৰ প্ৰচলিত পাঠানুসাৰে তাৎপৰ্য্য-

টীকাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যব্যাখ্যা বলা যায় না। কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারের কথার উল্লেখ করিয়াই এখানে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রচলিত পাঠই মূলে গ্রহীত হইয়াছে। সকল পুস্তকেই ঐরূপ পাঠ দেখা যায়।

প্রকৃত কথা এই যে, অনেক শব্দের অর্থবিশেষে গৌণ বা লাক্ষণিক প্রয়োগ স্মৃতিরকাল হইতেই লোকসিদ্ধ আছে। উহাকে প্রাচীনগণ 'উপচার' বলিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম দ্বিতীয় অব্যয়ের দ্বিতীয় আক্ষিকের ৫৯ শ্লোকে সাহচর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিত্তবশতঃ এই উপচার হয়, এ কথা বলিয়াছেন। যেমন কোন ব্যক্তি মঞ্চস্থ ব্যক্তিদ্বিগের রোদন শুনিয়া বলিলেন,—মঞ্চগণ রোদন করিতেছে। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদ করিলেন যে, মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ ব্যক্তিরাই রোদন করিতেছে। মঞ্চ অচেতন পদার্থ, তাহা রোদন করিতে পারে না। পূর্বোক্ত বাক্যে মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। মঞ্চস্থ ব্যক্তিরা মঞ্চ অবস্থান করার ঐ স্থানরূপ নিমিত্তবশতঃ মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের উপচার প্রসিদ্ধই আছে (২ অ০, ২ আ০, ৫৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। প্রতিবাদী ঐ উপচারকে বিদ্রব করিয়া ঐ স্থলে মঞ্চ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা যে নিষেধ করিলেন, তাহা উপচার-ছল। মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ কাঠ-নির্মিত আসনবিশেষ। তাহা অচেতন পদার্থ বলিয়া রোদন করিতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে অর্থ-সদৃশ্যের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের যে অর্থের সদৃশ্য বা মুখ্যতা আছে, সেই মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়াই ঐ স্থলে প্রতিবাদী ঐরূপ নিষেধ করিয়াছেন। উদ্যোতকরের মতে অর্থ-সদৃশ্যের প্রতিষেধই হত্বেক্ক অর্থ-সদৃশ্য-প্রতিষেধ। মূলকথা, বাদী যে মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়া মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এই কথা বলিয়াছেন, প্রতিবাদী তাহা বুঝিয়াই হটক, আর না বুঝিয়াই হটক, মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ ধরিয়া, মঞ্চের রোদন অসম্ভব বলিয়া বাদীর বাক্যের যে ব্যাঘাত করিলেন, তাহা উপচার-ছল। ছলমাত্রেরই অর্থবিকল্পরূপ উপগতি চাই, এখানেও তাহা আছে; কারণ, লক্ষণার দ্বারা মঞ্চ শব্দের 'মঞ্চস্থ ব্যক্তি' অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, শক্তির দ্বারা প্রতিবাদী তাহার মুখ্য অর্থের করনা করিয়াছেন। মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ বখন এখানে বাদীর বিবক্ষিত নহে, তখন ঐ মুখ্য অর্থ গ্রহণ এখানে ছলকারীর অর্থান্তর করনাই হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এক অর্থে চিরপ্রযুক্ত শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা হইলে সকল শব্দেরই সকল অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে অর্থাৎ সকল অর্থেই সকল শব্দের উপচার হইতে পারে। এই ভুল ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“উপচারো নীতার্থঃ।” তাৎপর্য্য-টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নীতার্থঃ প্রাপিতার্থঃ সহচরণাদিনা নিমিত্তেনেতি”। অর্থাৎ উপচার নিজের ইচ্ছা-মত হয় না। সাহচর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কোন নিমিত্ত দেখানে কোন শব্দকে অন্য অর্থ প্রাপ্ত করার, সেখানেই সেই অর্থে সেই শব্দের উপচার বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, সেইরূপ প্রয়োগই উপচার। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ ব্যাখ্যার পরে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, এক অর্থে দুই শব্দের যে অন্য অর্থে প্রয়োগ, তাহা সেই শব্দের মুখ্য অর্থের



সহিত গৌণ অর্থের কোন নব্বদ্বিংশে প্রযুক্তই হয়, সুতরাং যে কোন শব্দের যে কোন অর্থে ঐরূপ উপচার বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হইতে পারে না।

বৃত্তিকার বিখ্যাত পদ্ধতি পরবর্তী কেহ কেহ মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়াও উপচার-ছল হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় লাক্ষণিক অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহাই উপচার-ছল বলিয়া বুঝা যায়। অবশ্য মুখ্য অর্থের দ্বারা গৌণ অর্থ ধরিয়াও প্রতিষেধ হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে গৌণ অর্থ গ্রাহ্য নহে। সুতরাং মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধকে ভাষ্যকার উপচার-ছল বলেন নাই। মহর্ষির স্বত্রের দ্বারাও সরল ভাবে তাহা বুঝা যায় না। উপচার-ছল, এই নামের দ্বারাও সহজে তাহা বুঝা যায় না। মনে হয়, এই সকল কারণেই ভাষ্যকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

ভাষ্য। অত্র সমাধিঃ, প্রসিদ্ধে প্রয়োগে বক্তুর্যথাভিপ্রায়ঃ শব্দার্থয়ো-  
রনুজ্ঞা-প্রতিষেধো বা ন হৃদ্যতঃ। প্রধানভূতস্য শব্দস্য ভাক্তস্য চ  
গুণভূতস্য প্রয়োগ উভয়োলোকসিদ্ধঃ। সিদ্ধপ্রয়োগে যথা বক্তুরভিপ্রায়-  
স্তথা শব্দার্থানুজ্ঞেরো, প্রতিষেধো বা ন হৃদ্যতঃ। যদি বক্তা প্রধান-  
শব্দং প্রযুক্তে যথাভূতস্তানুজ্ঞা প্রতিষেধো বা ন হৃদ্যতঃ, অথ  
গুণভূতং তদা গুণভূতস্য, যত্র তু বক্তা গুণভূতং শব্দং প্রযুক্তে, প্রধান-  
ভূতমভিপ্রৈত্য পরঃ প্রতিষেধতি, স্বমনীষয়া প্রতিষেধোহসৌ ভবতি  
ন পরোপালম্ব ইতি।

অনুবাদ। এই উপচার-ছল বিষয়ে সমাধান ( বলিতেছি )। প্রসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে শব্দ এবং অর্থের অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ হয়, ছলের দ্বারা অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে হয় না। বিশদার্থ এই যে, প্রধানভূত শব্দের অর্থাৎ মুখ্য শব্দের এবং ভাক্ত কি না গুণভূত ( অপ্রধান ) শব্দের প্রয়োগ উভয় পক্ষে লোকসিদ্ধ, অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ এই দ্বিবিধ শব্দের প্রয়োগই যে লোকসিদ্ধ, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত। সিদ্ধ প্রয়োগে অর্থাৎ লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার যে প্রকার অভিপ্রায়, তদনুসারে শব্দ ও অর্থকে অনুজ্ঞা করিবে, অথবা নিষেধ করিবে,—ছলের দ্বারা অর্থাৎ স্বৈচ্ছানুসারে করিবে না। বক্তা যদি প্রধান শব্দ প্রয়োগ করেন, ( তাহা হইলে ) যথাভূত অর্থাৎ সেখানে ঐ শব্দ এবং তাহার অর্থ যে প্রকার, তাহারই অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ করিতে হইবে, স্বৈচ্ছানুসারে করিতে হইবে না, আর যদি বক্তা গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান বা লাক্ষণিক শব্দ

প্রয়োগ করেন, ( তাহা হইলে ) গুণভূতের অর্থাৎ সেই অপ্রধান শব্দ ও অর্থের অনুজ্ঞা ও প্রতিবেদ হয় ( স্বেচ্ছানুসারে প্রতিবেদ হয় না )। যে স্থলে কিন্তু বক্তা অপ্রধান শব্দ প্রয়োগ করেন, অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী ( ঐ শব্দকে ) প্রধানভূত মনে করিয়া নিবেদ করেন, এই নিবেদ নিজ বুদ্ধির দ্বারা হয়, ( উহার দ্বারা ) পরের অর্থাৎ বাদীর উপালম্ব ( বাক্য-ব্যাঘাত বা নিগ্রহ ) হয় না।

টিপ্পনী। ভাব্যকার উপচার-স্থলের সমাধান বলিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, শব্দের মুখ্য প্রয়োগ এবং গৌণ প্রয়োগ লোক-সিদ্ধ। বক্তা যদি মুখ্য শব্দেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই মুখ্য শব্দ এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিবেদের কারণ থাকিলে নিবেদ করা যায় অর্থাৎ তাহাতে কোন দোষ থাকিলে সেই দোষ প্রদর্শন করা যায়, আর তাহা নিবেদ করিবার কোন কারণ না থাকিলে সেই মুখ্য শব্দ এবং তাহার অর্থের অনুজ্ঞাই করিতে হয়। নিজের ইচ্ছানুসারে শব্দ ও অর্থের অনুজ্ঞা অথবা নিবেদ করা যায় না। আর যদি বক্তা কোন ভাক্ত শব্দের অর্থাৎ অপ্রধান শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে সেই শব্দ ও তাহার প্রতিপাদ্য লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিবেদ বা অনুজ্ঞা করিতে হয়। বক্তা কোন স্থলে গৌণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া কোন গৌণ অর্থ প্রকাশ করিলেন, সেখানে বক্তার ঐ শব্দটিকে মুখ্য শব্দ বলিয়া কল্পনা করিয়া এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ ধরিয়া নিবেদ করিলে তাহা নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিজের ইচ্ছানুসারে নিবেদ হয়, ঐ নিবেদে বাদীর বাক্যের বক্তব্য ব্যাঘাত হইতে পারে না, উহাতে বাদীর কথিত পদার্থের কোন নিবেদ হয় না। বাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়ানুসারে তাহাই গ্রহণ করিয়া যদি তাহার নিবেদ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই বাদীর উপালম্ব বা পক্ষদুষণ হইতে পারে। পূর্বোক্ত স্থলে বাদী মঞ্চস্থ ব্যক্তি বুঝাইতে মঞ্চ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন ; উহা উপচার এবং উহা লোক-সিদ্ধ। প্রতিবাদীও ঐরূপ প্রয়োগের লোক-সিদ্ধতা স্বীকার করিতে বাধ্য। হুতরাং ঐরূপ লোক-সিদ্ধ গৌণ প্রয়োগ করিতে বাদীর কোন অপরাধ নাই। প্রতিবাদী, বাদীর প্রযুক্ত ঐ গৌণ শব্দকে প্রধান শব্দ ধরিয়া অর্থাৎ মঞ্চ শব্দটি যে অর্থের বাচক, যে অর্থ বুঝাইতে উহা প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দ, সেই অর্থ ধরিয়া বাদীর অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করিয়া নিবেদ করিলেন—মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ ব্যক্তিরাই রোদন করিতেছে। মঞ্চগুলি অচেতন পদার্থ, তাহাদিগের রোদন অসম্ভব, ইহা বাদী জানেন, বাদী সেই মঞ্চের রোদন বলেনও নাই। প্রতিবাদী বাদীর অভিপ্রায় বুঝিয়াও ঐরূপ গৌণ অর্থ ধরিয়া নিবেদ করিলে উহা প্রতিবাদীরই অপরাধ। আর বাদীর বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ নিবেদ করিলেও গৌণ প্রয়োগ বিষয়ে নিজের অনভিজ্ঞতা তাহারই দোষ। পরন্তু বাদীর বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিলে প্রতিবাদীর তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝা উচিত, তাহা না করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে বাদীর প্রযুক্ত গৌণ শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ প্রদর্শন কখনই উচিত নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি গৌণ প্রয়োগ বলিয়াই উপপত্তি



করা যায়, তাহা হইলে আর কাহারও কোন বাক্যে দোষ থাকিতেই পারে না, সর্বত্রই শব্দের একটা গৌণ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া উপপত্তি করা যায়। এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রধান-ভূত শব্দ এবং ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ আছে অর্থাৎ লোক-সিদ্ধ গৌণ প্রয়োগই করিতে হইবে, নিম্নরোজনে নূতন কোনরূপ গৌণ প্রয়োগ করা যায় না। পূর্বোক্ত স্থলে মঞ্চ শব্দের মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে গৌণ প্রয়োগ অর্থাৎ মঞ্চগণ বোধন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ লোক-সিদ্ধই আছে, ঐরূপ প্রয়োগ বাদী নূতন করেন নাই। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও ভাষ্য-কারের এখানে ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ আছে, এইমাত্রই বক্তব্য, উহা বলিলেই পূর্বোক্ত আপত্তির নিরাস হয়, তাহা হইলেও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্তই প্রধান শব্দের কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দের প্রয়োগ যেমন লোক-সিদ্ধ, তদ্রূপ ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগও লোক-সিদ্ধ। লোক-সিদ্ধ প্রয়োগে বাদীর কোন অপরাধ হইতে পারে না। যেচ্ছা-নারে নূতন করিয়া লাক্ষণিক প্রয়োগ করিলে দোষ বলা যাইতে পারে।

যে অর্থটি যে শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ, সেই অর্থে সেই শব্দকে প্রধান শব্দ ও মুখ্য শব্দ বলে। যে শব্দের মুখ্যার্থের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত অপর একটি অর্থ ঐ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ঐ অর্থে ঐ শব্দকে ভাক্ত শব্দ বলে। ভাক্ত শব্দ গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান। যেমন মঞ্চ শব্দটি মঞ্চ অর্থে মুখ্য শব্দ, মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে ভাক্ত শব্দ। প্রাচীনগণ লক্ষণকে ভক্তি বলিতেন। ঐ ভক্তি শব্দ হইতেই ভাক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উদ্যোতকর অন্তর বাহা বলিয়াছেন, 'তাহাতে বুঝা যায়, ভক্তি বলিতে সাদৃশ্যবিশেষ। "উভয়েন ভজ্যতে" অর্থাৎ উভয় পদার্থ বাহাকে ভজন বা আশ্রয় করে, এই অর্থে ভক্তি শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য বুঝা যায়। এক পদার্থে সাদৃশ্য থাকে না, সাদৃশ্য উভয়াশ্রিত। তাহা হইলে সাদৃশ্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণা অর্থাৎ বাহাকে গোণী লক্ষণা বলা হইয়াছে, তাহাই ভক্তি শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয় এবং ঐরূপ লক্ষণাত্মকে সেই শব্দকে ভাক্ত বলিতে পারা যায়। ভাষ্যকার কিন্তু মঞ্চস্থ পুরুষে লাক্ষণিক মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়াও এখানে ঐ শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতরংগ সামান্যতঃ লাক্ষণিক শব্দমাত্রই ভাক্ত, ইহা তাহার কথায় বুঝা যায়। "ভাক্তস্ত গুণভূতস্ত" এই স্থলে গুণভূত শব্দের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ স্থলে গুণভূত বলিতে অপ্রধান অর্থাৎ লাক্ষণিক। ভাদো "ছন্দতঃ" এই স্থলে ছন্দ শব্দের অর্থ ইচ্ছা বা যেচ্ছা। অভিধানে ছন্দ শব্দের অভিপ্রায় অর্থ পাওয়া যায়। তাৎপর্যটীকাকার "ছন্দতঃ" ইহার ব্যাখ্যা বলিয়াছেন ছিগ্না।" ছয়ান শব্দের অর্থ কপট। কোন পুস্তকে ঐ স্থলে "ছলতঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ১৫১

১। ভক্তির্নাম অতথাকৃতস্ত তথাভাবিতিঃ সামান্যং, উভয়েন ভজ্যতে ইতি ভক্তিঃ, যথা বাহীকস্ত বন্দ্যমন্তঃ সংজ্ঞাপ্রদায় বাহীকো দোষিতঃ।—ভাট্টবাহীক, ২১১৩০ স্থ।

## সূত্র । বাক্‌ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবি- শেষাৎ ॥১৫॥৫৩॥

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) উপচারচ্ছল—বাক্‌ছলই ; কারণ, তাহা হইতে বিশেষ নাই । অর্থাৎ বাক্‌ছলে যেমন অর্থান্তরকল্পনা, উপচারচ্ছলেও তদ্রূপ অর্থান্তর-কল্পনা, সুতরাং উপচারচ্ছল ও বাক্‌ছলে কোন ভেদ না থাকায় ছল বিবিধ, ত্রিবিধ নহে ।

ভাষ্য । ন বাক্‌ছলাদুপচারচ্ছলং ভিত্যতে, তস্তাপ্যর্থান্তরকল্পনারা অবিশেষাৎ । ইহাপি স্থানার্থো গুণশব্দঃ প্রধানশব্দঃ স্থানার্থ ইতি কল্পয়িত্বা প্রতিষিধ্যত ইতি ।

অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) বাক্‌ছল হইতে উপচারচ্ছল ভিন্ন নহে । কারণ, সেই উপচারচ্ছলের সম্বন্ধেও অর্থান্তর কল্পনার বিশেষ নাই । বিশদার্থ এই যে, এই উপচারচ্ছলেও স্থানীর বোধক অপ্রধান শব্দ ( অর্থাৎ মঞ্চস্থ ব্যক্তির বোধক মঞ্চ শব্দটি ) স্থানার্থ অর্থাৎ মঞ্চরূপ স্থানের বাচক প্রধান শব্দ, ইহা কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ করা হয় ।

টীপনী । মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি বোড়শ প্রকার পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণ বলিয়া উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন । উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা, এই তিন প্রকারেই মহর্ষি শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছেন । পরীক্ষা-প্রকরণে সকল পদার্থেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন নাই । যে পদার্থে সংশয় হইবে, সেই পদার্থে মহর্ষির প্রদর্শিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে । এই কথা দ্বিতীয়ায়্যায়ে বলিয়া গিয়াছেন । ছল পদার্থের ত্রিবিধত্ব বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া মহর্ষি এখানেই ছলের পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন । পরীক্ষা-প্রকরণে ছলের পরীক্ষা করিলে প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ছলের পূর্বকথিত অনেক পদার্থ উল্লঙ্ঘন করিয়া সে পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে ঐ পরীক্ষা-প্রকরণের পূর্বকথার সহিত সংগতি থাকে না । পরন্তু পরীক্ষা-প্রকরণও নিকটবর্তী । মহর্ষির শিষ্যগণও পরীক্ষা-চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাই মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণেও ছলের লক্ষণের পরে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা করিয়াছেন । প্রথমতঃ সংশয়, পরে পূর্বপক্ষ, তাহার পরে সিদ্ধান্ত, এই ভাবেই পদার্থের পরীক্ষা হয় । মহর্ষি-কথিত উপচারচ্ছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন কি না ? এইরূপ সংশয়ে মহর্ষি তাহার পরীক্ষার জন্ত প্রথমেই পূর্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন । পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, উপচারচ্ছল বাক্‌ছল হইতে অভিন্ন । কারণ, উপচারচ্ছলও শব্দের অর্থান্তর কল্পনামূলক, বাক্‌ছলও শব্দের অর্থান্তর কল্পনামূলক । সুতরাং উভয় ছলেই যখন শব্দের অর্থান্তর কল্পনার কোন বিশেষ নাই, তখন উপচারচ্ছল বাক্‌ছলের মধ্যেই গণ্য । কলকথা, ছল



ত্রিবিধ নহে, বাক্‌ছল এবং সামান্‌ছল, এই দুই নামে ছল বিবিধ। ভাব্যকার তাহার প্রদর্শিত উপচারছলের উদাহরণে বাক্‌ছলের দ্বারা অর্থান্তর করণা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উপচারছলেও স্থানীয় বোধক অপ্রধান শব্দকে স্থানার্থপ্রধান শব্দ বলিয়াই করণা করিয়া নিবেদন করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, মঞ্চ শব্দের মুখ্যার্থ মঞ্চ নামক স্থান। ঐ অর্থে মঞ্চ শব্দটি প্রধান শব্দ। ঐ মঞ্চস্থিত পুরুষগণ স্থানীয়; কারণ, তাহারাই মঞ্চে অবস্থান করিতেছে। মঞ্চ তাহানিগের স্থান, সুতরাং তাহারাই স্থানীয়। মঞ্চ শব্দ বর্ণন ঐ স্থানীয় অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষকে বুঝাইবে, তখন মঞ্চ শব্দটি ঐ স্থানীয় অর্থে অপ্রধান শব্দ বা তান্ত্র অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ। বাক্‌ছল মঞ্চ শব্দটিকে ঐ স্থানে মঞ্চস্থিত পুরুষরূপ স্থানীয় অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; প্রতিবাদী মঞ্চ শব্দের স্থানরূপ অর্থ করণা করিয়া নিবেদন করিয়াছেন। সুতরাং বাক্‌ছলের দ্বারা এই উপচারছলেও শব্দের অর্থান্তর করণা রহিয়াছে। তাহা হইলে উপচারছল বাক্‌ছলবিশেষই। উহা বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন কোন প্রকার ছল নহে। ১৫।

**সূত্র। ন তদর্থান্তরভাবাৎ ॥ ১৬ ॥ ৫৭ ॥**

অনুবাদ। ( উত্তর ) না, অর্থান্ত উপচারছল বাক্‌ছলই নহে; কারণ, উপচারছলে যে অর্থসদৃশ্য প্রতিবেদন হয়, অর্থান্তর করণা হইতে তাহার ভেদ আছে।

ভাষ্য। ন বাক্‌ছলমেবোপচারছলং, তদর্থান্তরভাবপ্রতিবেদন-  
অর্থান্তরভাবাৎ। কৃতঃ? অর্থান্তরকরণাৎ। অন্য অর্থান্তরকরণা  
অন্যোর্থসদৃশ্যপ্রতিবেদন ইতি।

অনুবাদ। ( উত্তর ) উপচারছল বাক্‌ছলই নহে; কারণ, সেই অর্থসদৃশ্য প্রতিবেদনের অর্থান্ত উপচারছলে যে অর্থসদৃশ্য প্রতিবেদন হয়, তাহার অর্থান্তর ভাব অর্থান্ত ভিন্নপদার্থতা বা ভিন্নত্ব আছে। ( প্রশ্ন ) কি হইতে? অর্থান্ত কি হইতে অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদনের ভেদ আছে? ( উত্তর ) অর্থান্তরকরণা হইতে। বিশদার্থ এই যে, অর্থান্তরকরণা ভিন্ন পদার্থ, অর্থসদৃশ্যপ্রতিবেদন ভিন্ন পদার্থ। ( ঐ দুইটি একই পদার্থ নহে; সুতরাং উপচারছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন )।

টিপ্পনী। পূর্বসূত্রের দ্বারা যে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ করা হইয়াছে, এই সূত্রের দ্বারা তাহার নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, উপচারছলে অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদন হয়, আর বাক্‌ছলে তাহা হয় না, কেবল অর্থান্তর করণার দ্বারা ইহা প্রদর্শন হয়। অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদন, আর অর্থান্তরকরণা এক পদার্থ নহে, ঐ দুইটি ভিন্ন পদার্থ; সুতরাং উপচারছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন। উদ্যোগকরের মতে অর্থসদৃশ্যের নিবেদনই সূত্রোক্ত অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদন। অর্থসদৃশ্য বলিতে বস্তুর সত্তা। তাহার নিবেদন বাক্‌ছলে হয়

না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, মঞ্চগুণ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা মঞ্চে রোদনরূপ বস্তুর অস্তিত্বই নিবন্ধ হয়, অর্থাৎ মঞ্চে রোদন পদার্থের সম্বন্ধে অস্বীকার করা হয়, কিন্তু বাক্যে এই বাক্যের নবদগ্ধাধিকার কখন নাই, এই কথা দ্বারা তাহার কথনের সম্ভার নিবেদন করা হয় না। বাদী, এই বাক্যে নবকথনবিশিষ্ট, এই বাক্যের দ্বারা বাক্যবিশেষে যে নবকথনবিশিষ্ট কথনের বিধান করিয়াছেন, সেই বিবর্তমান কথন সেই বাক্যকে আছে, ইহা স্বীকার করিয়া অর্থাৎ তাহার প্রতিবেদন না করিয়া তাহার বিশেষণ যে নবকথন, তাহারই নিবেদন করা হয়। কিন্তু উপচারহলে (পূর্বোক্ত হলে) মঞ্চে বিবর্তমান রোদন পদার্থেরই প্রতিবেদন করা হয়, সুতরাং বাক্যে ও উপচারহলে বিশেষ ভেদ আছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও উপচারহলে ও বাক্যহলে পূর্বোক্ত প্রকার ভেদ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের ইহাই মূল তাৎপর্য। ১৬।

**সূত্র।** অবিশেষে বা কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাদেক-ছল-  
প্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৫৮॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে—বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ যদি বাক্যে ও উপচার-  
হলের ঐ বিশেষ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত এক ছলের  
আপত্তি হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে ছল একই হইয়া পড়ে, ছল দ্বিবিধও হইতে  
পারে না।

ভাষ্য। ছলস্ত দ্বিত্বমভ্যনুজ্ঞায় ত্রিত্বং প্রতিষিধ্যতে কিঞ্চিৎ  
সাধর্ম্যাৎ, যথা চারং হেতুদ্বিত্বং প্রতিষেধতি তথা দ্বিত্বমপ্যভ্যনুজ্ঞাতং  
প্রতিষেধতি, বিদ্যতে হি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যাৎ দ্বয়োরপীতি। অথ দ্বিত্বং  
কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাম্ নিবর্ততে ত্রিত্বমপি ন নিবর্ত্ততি।

অনুবাদ। ছলের দ্বিত্ব স্বীকার করিয়া কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যা বশতঃ ত্রিত্বকে নিষেধ  
করা হইতেছে অর্থাৎ বাক্যে ও উপচারহলে কিছু সাধর্ম্যা থাকায় ঐ দুইটিকে  
এক বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী ছলকে দ্বিবিধ বলিতেছেন, ছলের ত্রিত্ব বা ত্রিবিধত্ব খণ্ডন  
করিতেছেন। (তাহা হইলে) যেমন এই হেতু অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যরূপ হেতু  
(ছলের) ত্রিত্বকে নিষেধ করিতেছে, তদ্রূপ স্বীকৃত ত্রিত্বকেও নিষেধ করিতেছে।  
যেহেতু কিঞ্চিৎসাধর্ম্যা দুই ছলেও আছে অর্থাৎ বাক্যে ও সামান্যত্ব নামে যে  
দ্বিবিধ ছল স্বীকার করা হইতেছে, তাহাতেও কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যা থাকায় ছল দ্বিবিধও  
হইতে পারে না। আর যদি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যা বশতঃ ত্রিত্ব নিবৃত্ত না হয়, (তাহা  
হইলে) ত্রিত্বও নিবৃত্ত হইবে না।

টিপ্পনী। আপত্তি হইতে পারে যে, বাক্যে এবং উপচারহলে কোন অংশে বিশেষ



থাকিলেও অর্থাস্তরকল্পনা ঐ উভয় ছলেই আছে, সুতরাং অর্থাস্তরকল্পনারূপ সাধর্ম্যবশতঃ উপচারছলকে বাক্ছলই বলিব, উহার মধ্যে আর কোন বিশেষ গ্রহণ করিব না। এতদ্বত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যদি অর্থাস্তরকল্পনারূপ কোন একটি সাধর্ম্য লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ছলকেও এক বল, তাহা হইলে ছল দ্বিবিধও বলিতে পার না। তাহা হইলে ছল পদার্থ একই হইয়া পড়ে, ছলের আর কোন প্রকার-ভেদ থাকে না। কারণ, যে কোনরূপে অর্থাস্তরকল্পনা ছল মাত্রেই আছে। অর্থাস্তরকল্পনা স্বতীত কোনরূপ ছলই হয় না। সামান্ত ছলেও পূর্বোক্ত স্থলে ব্রাহ্মণক-ধর্ম্মে বিদ্যাচরণদম্পদের হেতুরূপ অর্থাস্তর (অর্থাৎ সেখানে যাহা বস্তুর বিবক্ষিত নহে, এমন অর্থ) কল্পনার দ্বারা দোষ প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং অর্থাস্তরকল্পনারূপ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য ছল মাত্রেই থাকায় ছল একই হইয়া পড়ে, ছলের দ্বিবিধত্বও থাকে না।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যরূপ যে হেতুকে গ্রহণ করিয়া ছলের দ্বিবিধত্ব নিবেদন করিতেছেন, সেই কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যরূপ হেতুই তাহার স্বীকৃত ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক হইতেছে। ফলতঃ পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত হেতুর দ্বারা যখন তাহার নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত হইতেছে, তখন উহা ঐ স্থলে হেতু হইতে পারে না। যদি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যরূপ হেতু তাহার নিজ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ছলের দ্বিবিধত্বের বাধক না হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক হইতে পারে না। মূলকথা, যে যুক্তিতে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য ছলের দ্বিবিধত্বের বাধক বলা হইতেছে, সেই যুক্তিতেই উহাকে ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক বলা যাইবে। অন্ততঃ ছলত্ব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য ছলমাত্রেই আছে। সুতরাং ছলকে একই বলিতে হইবে, ছলকে দ্বিবিধও বলা যাইবে না। পরিশেষে তাহাই স্বীকার করিলে অর্থাৎ সাধর্ম্যবশতঃ ছলকে একই বলিলে কোন পদার্থেরই প্রকার-ভেদ বলিতে পারিবে না। কারণ, বস্তু মাত্রেরই বস্তুত্ব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য আছেই, অতএব বস্তু মাত্রেরই প্রকার-ভেদের উচ্ছেদ হইয়া যায়। সুতরাং পদার্থের যে অংশে যে ভেদ আছে, ঐ ভেদ বা বিশেষকে গ্রহণ করিয়াই পদার্থের প্রকার-ভেদ বলিতে হইবে। তাহা হইলে বাক্ছল ও উপচারছলের যে অংশে ভেদ আছে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া ছলকে দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে। মহর্ষি গোতম তাহাই বলিয়াছেন। ১৭।

ভাষ্য। ছললক্ষণাদূর্জম।

অনুবাদ। ছলের লক্ষণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন)।

সূত্র। সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং  
জাতিঃ ॥১৮॥৫৯॥

অনুবাদ। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র কোন সাধর্ম্যবিশেষ অথবা বৈধর্ম্যবিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ—জাতি।

ভাষ্য। প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে স জ্ঞাতিঃ। স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপালম্বঃ প্রতিবেধ ইতি। উদাহরণ-সাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যশ্বোদাহরণ-বৈধর্ম্যেণ প্রত্যবস্থানম্। উদাহরণ-বৈধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যশ্বোদাহরণ-সাধর্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং, প্রত্যনৌকভাবাং। জায়মানোহর্থো জাতিরिति।

অনুবাদ। হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ কোন বাদী কোন সাধ্য সাধনের জ্ঞাত কোন হেতু অথবা হেতুভাঙ্গ প্রয়োগ করিলে যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা জ্ঞাতি। সেই প্রসঙ্গ কিন্তু সাধর্ম্যা অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান কি না উপালম্ব, প্রতিবেধ। উদাহরণের সাধর্ম্যা প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ সাধর্ম্যা হেতু স্থলে উদাহরণের বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। উদাহরণের বৈধর্ম্যা প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ বৈধর্ম্যা হেতু স্থলে—উদাহরণের বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানকে জ্ঞাতি বলে; কারণ, প্রত্যনৌকভাব অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানে প্রতিকূল ভাব বা বিরুদ্ধতা আছে। জায়মান পদার্থ জ্ঞাতি, অর্থাৎ বাদী হেতু অথবা হেতুভাঙ্গের প্রয়োগ করিলে পূর্বোক্ত প্রকার প্রত্যবস্থান জন্মে, এই জ্ঞাত উহার নাম জ্ঞাতি। যাহা জন্মে, তাহাকে জ্ঞাতি বলা যায়।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে ছল পদার্থের পরেই জ্ঞাতি নামক পদার্থ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। সূত্ররূপ লক্ষণ-প্রকরণে ছলের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত জ্ঞাতির লক্ষণ বক্তব্য। মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা করা হইলেও ছলের লক্ষণের পরে অত্র কোন পদার্থের লক্ষণ বলা হয় নাই। যথাক্রমে মহর্ষি ছলের লক্ষণের পরে জ্ঞাতিরই লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সেই কথা বলিয়াই জ্ঞাতি-লক্ষণ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রতিকূল ভাবে অবস্থানকে প্রত্যবস্থান বলে। বাদী কোন সাধ্য সাধনের জ্ঞাত হেতু অথবা হেতুভাঙ্গ প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ বাদী তাহার স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন একটি দোষ প্রদর্শন বা আপত্তি করিয়া প্রত্যাশ্রয় করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিকূল ভাবে দাঁড়াইলেন; তাই প্রত্যবস্থানকে ভাষ্যকার উপালম্ব বলিয়াছেন, শেষে প্রতিবেধ বলিয়া আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ হাহার নাম উপালম্ব এবং প্রতিবেধ, সূত্রে তাহাকেই প্রত্যবস্থান বলা হইয়াছে। কেবল প্রত্যবস্থান মাত্রকেই জ্ঞাতি বলা যায় না। তাহা বলিলে ছল নামক পূর্বোক্ত প্রকার সূত্রের এবং সূত্রেরগুলিও জ্ঞাতির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; কারণ, সেগুলিও উপালম্ব বা প্রতিবেধ, সূত্ররূপ সেগুলিও প্রত্যবস্থান। এজন্য মহর্ষি বলিয়াছেন—“সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং।” অর্থাৎ সাধর্ম্যা অথবা বৈধর্ম্যা মাত্র অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাই জ্ঞাতি। সাধর্ম্যা অথবা বৈধর্ম্যা প্রযুক্ত কোন প্রকার ছল হয় না। সূত্রেরগুলিও কেবল



সাধন্য অথবা কেবল বৈধন্যমাত্র ধরিয়া হয় না, তাহা হইলে সে উত্তর সহজতরই হয় না। পূর্বোক্ত ঐরূপ প্রত্যুত্তরকেই জাতি বলে, উহা অসহজতর। যেমন কোন বাদী বলিলেন—আত্মা নিষ্ক্রিয়, যেহেতু আত্মাতে বিত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্ব আছে, বাহা বাহা সর্বব্যাপী পদার্থ, তাহা নিষ্ক্রিয়, যেমন গগন। এখানে কোন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি নিষ্ক্রিয় গগনের সাধন্য বিত্ব থাকিতেই আত্মা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে সক্রিয় ঘটের সাধন্য সংযোগ আত্মাতে আছে বলিয়া আত্মা সক্রিয় হউক। আত্মা সর্বব্যাপী অর্থাৎ আত্মার সহিত সমস্ত মূর্ত পদার্থের সংযোগ আছে, সুতরাং ঘট প্রকৃতি ক্রিয়াযুক্ত পদার্থের সহিতও আত্মার সংযোগ আছে, তাহা হইলে ক্রিয়াযুক্ত ঘটের সাধন্য যে সংযোগ, তাহা আত্মাতে থাকায় আত্মা ক্রিয়াযুক্ত হউক। প্রতিবাদী এই কথা বলিয়া বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, ঐ দোষ প্রকৃত দোষ নহে। কারণ, সংযোগ থাকিলেই যে সে পদার্থ সক্রিয় হইবে, এমন নিয়ম নাই। প্রতিবাদী কেবল সংযোগরূপ সাধন্যটি লইয়া ঐরূপ আপত্তি করিয়াছেন। তাহার গৃহীত সংযোগরূপ সাধন্যে সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তি নাই। প্রতিবাদী ঐ ব্যাপ্তির কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধন্যমাত্র অবলম্বনে পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিবেশ করায়, উহা জাতি হইবে। ঐরূপ জাতিকে সাধন্যসমা জাতি বলে। এবং যদি কোন বাদী বলেন যে, শব্দ অনিত্য—যেহেতু শব্দ জন্ত এবং ভাব পদার্থ, বাহ্য বাহ্য অনিত্য নহে, তাহা জন্ত ও ভাবপদার্থ নহে। এই স্থলে যদি কোন প্রতিবাদী বলেন যে, শব্দ যদি নিত্য পদার্থের বৈধন্য জন্ত-ভাবন হেতুক অনিত্য হয়, তাহা হইলে অনিত্য ঘটের বৈধন্য যে শ্রাব্যতা সেই শ্রাব্যতাহেতুক শব্দ নিত্য হউক। ঘট, শ্রবণেন্দ্রিয়-জন্ত প্রত্যক্ষের বিবরণ হয় না, সুতরাং শ্রাব্যতা ঘটে না থাকায় উহা ঘটের বৈধন্য। ঘট অনিত্য, ইহা উত্তরবাদীরই সম্মত। সুতরাং প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধন্য যে শ্রাব্যতা, তাহা শব্দে আছে বলিয়া শব্দে নিত্যত্বের আপত্তি করিলে অর্থাৎ ঐ আপত্তির দ্বারা বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, উহা কেবল বৈধন্য মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবেশ হওয়ায় জাতি হইবে, এইরূপ জাতিকে বৈধন্যসমা জাতি বলে। পূর্বোক্ত স্থলে শ্রাব্যতা-রূপ বৈধন্যে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই, অর্থাৎ শ্রাব্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। প্রতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল বৈধন্য মাত্র অবলম্বনে ঐ স্থলে প্রতিবেশ করায় তাহার ঐ উত্তর জাতি হইয়াছে। এই জাতি নামক উত্তর অসহজতর। কারণ, যে প্রশ্নালীতে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত প্রকার উত্তর করিয়াছেন, সেই প্রশ্নালীতেই তাহার ঐ উত্তর খণ্ডিত হয়। বাদী প্রতিবাদীর প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন যে, যদি কেবল একটা সাধন্য থাকিলেই ঐ সাধন্যের সহচর বস্তুটি সেখানে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রম্নেয়রূপ অপ্রমাণের সাধন্য থাকায় প্রতিবাদীর উত্তরেও অপ্রমাণত্ব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ কোন বৈধন্য থাকিতে প্রতিবাদীর উত্তরেও অপ্রমাণত্ব প্রকৃতি সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ প্রতিবাদী যেমন কোন একটি সাধন্যমাত্র অথবা বৈধন্যমাত্র অবলম্বন করিয়া বাদীর পক্ষ ব্যাহত করিবেন, সেইরূপ কোন একটি সাধন্য অথবা বৈধন্য মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষকেও ঐ ভাবে যখন খণ্ডন করা যায়, তখন জাতি নামক উত্তর কখনই সহজতর হইতে পারে না।

এই জন্তই প্রাচীনগণ জাতিকে অব্যাহতক উত্তর বলিয়াছেন। কেহ কেহ অব্যাহতক উত্তরকেই জাতির স্বরূপ বলিয়াছেন<sup>১</sup>। এই জাতি চতুর্বিংশতি প্রকার। মহর্ষি গৌতম পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম অঙ্কিকে সেই চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির বিশেষ নাম ও বিশেষ লক্ষণগুলি বলিয়াছেন। সেখানে এই জাতির পরীক্ষাও করিয়াছেন। তাহাতে এই জাতি অসম্ভবের কেন, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বর্তমান জাতি পদার্থ বিষয়ে সকল কথা সূচক হইবে।

ভাষ্যে হেতু প্রযুক্ত হইলে এইরূপ কথা আছে, কিন্তু তাৎপর্যটিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু অথবা হেতুভাস প্রয়োগ করিলে যে প্রশঙ্গ জন্মে, তাহা জাতি। বস্তুতঃ হেতুভাস প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী জাতি নামক অসম্ভবের করিতে পারেন। ভাষ্যে প্রশঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার শেষে উহারই ব্যাখ্যার সাধন্যা অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যাবহান বলিয়াছেন। প্রশঙ্গ শব্দের দ্বারা প্রশক্তি বা আপত্তি বুঝা যায়। সর্বত্রই জাতি নামক উত্তরে একটা আপত্তি প্রশ্ন করিয়া হইয়া থাকে। ভাষ্যকার সেই তাৎপর্যও এখানে প্রশঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ আপত্তি-সূচক প্রতিবেদ-বাক্যই জাতি।

উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, সূত্রে সাধন্যা ও বৈধর্ম্যা শব্দের দ্বারা যে কোন পদার্থের সহিত সাধন্যা ও বৈধর্ম্যা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার যে শেষে উদাহরণ-সাধন্যা এবং উদাহরণ-বৈধর্ম্যা বলিয়াছেন উহা সূত্রকারের সাধন্যা ও বৈধর্ম্যা শব্দের ব্যাখ্যা নহে। ভাষ্যকার একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্তই এইরূপ কথা শেষে বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন উদাহরণের সহিত সাধন্যা এবং বৈধর্ম্যা, তজ্জপ যাহা উদাহরণ নহে, তাহার সহিতও সাধন্যা এবং বৈধর্ম্যা। কলিতার্থ এই যে, যে কোন পদার্থের সহিত সাধন্যা অথবা বৈধর্ম্যা অবলম্বন করিয়া প্রতিবেদ করিলেই জাতি হইবে। উদ্যোতক শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ সূত্রার্থ না হইলে চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির লক্ষণ বলা হয় না। কারণ, সর্ববিধ জাতিই উদাহরণের সাধন্যা অথবা উদাহরণের বৈধর্ম্যা প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু জাতিমাত্রই যে কোন পদার্থের সাধন্যা অথবা বৈধর্ম্যা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সূত্রায় তাহা বলা যাইতে পারে। মহর্ষি সর্বপ্রকার জাতির সামান্য লক্ষণ বলিতে তাহাই বলিয়াছেন।

উদ্যোতক এইরূপ বলিলেও ভাষ্যকারের কথার দ্বারা কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উদাহরণের সাধন্যা প্রযুক্ত হেতু প্রয়োগ করিলে উদাহরণের কোন একটি বৈধর্ম্যের দ্বারা এবং উদাহরণের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত হেতু প্রয়োগ করিলে উদাহরণের কোন একটি সাধন্যের দ্বারা যে প্রত্যাবহান, তাহাই এখানে সূত্রকারের অভিপাত। কারণ, এইরূপ প্রতিবেদে বিরুদ্ধ ভাব আছে। ভাষ্যকার শেষে এইরূপ কথার দ্বারা সূত্রেরই তাৎপর্যার্গ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে জাতিমাত্রের লক্ষণ বলা হয় না, ইহা সত্য। বৃত্তিকার বিধানাথ বলিয়াছেন যে, সূত্রকার

১। প্রযুক্ত বাপনা(হেতু) যুগ্মাশকসুত্রম্।

জাতিমাত্রমাত্রে তু অব্যাহতকসুত্রম্।—তর্কিকরক্ষা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১ন কাটিকা।



এই স্বত্রের দ্বারা জ্ঞাতির সামান্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বর্ণন নাই; বাহা বলিতেছেন, তাহাতে জ্ঞাতির সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে<sup>১</sup>। অর্থাৎ ছল প্রভৃতি ভিন্ন দৃশ্যসমর্থ উত্তর, অথবা স্বব্যাঘাতক উত্তর জ্ঞাতি, ইহাই এই স্বত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সূত্রাং উহার দ্বারা জ্ঞাতিমাত্রের সামান্য লক্ষণ বুঝা গিয়াছে। জন দাতৃ ইহাতে জ্ঞাতি শব্দটি সিক্ত হইয়াছে। সূত্রায় বাহা জন্মে, তাহাকে জ্ঞাতি বলা যায়। ভাষ্যকার শেষে জ্ঞায়মান পদার্থ জ্ঞাতি, এই কথা বলিয়া এই জ্ঞাতি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা জ্ঞাতি শব্দের একটা ব্যুৎপত্তি মাত্র। জায়মান পদার্থমাত্রই জ্ঞাতি নহে; পূর্বোক্ত প্রকার স্বব্যাঘাতক উত্তরই জ্ঞাতি। ঐ অর্থে মহর্ষির এই জ্ঞাতি শব্দটি পারিভাষিক। প্রথম অধ্যায়ে এই জ্ঞাতির সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিবৃত হইবে। সেখানেই এই জ্ঞাতির সমস্ত তত্ত্ব পরিষ্কৃত হইবে। ১৮।

## সূত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিঞ্চ নিগ্রহ- স্থানম্ ॥ ১৯ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান এবং অপ্রতি-  
পত্তি অর্থাৎ অভ্যুতাবিশেষ নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ বাহার দ্বারা পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি  
অথবা অপ্রতিপত্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে।

ভাষ্য। বিপরীতা বা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তির্বিপ্রতিপত্তিঃ, বিপ্রতি-  
পদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি, নিগ্রহস্থানং ধলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ। অপ্রতি-  
পত্তিত্বারম্ভবিষয়ে অনারম্ভঃ। পরেণ স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি, প্রতি-  
ষেধং বা নোদ্ধরতি। অসমাসাচ্চ নৈতে এব নিগ্রহস্থানে ইতি।

অনুবাদ। বিপরীত অথবা কুৎসিত জ্ঞান বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপদ্যমান ব্যক্তি  
অর্থাৎ বাহার ঐরূপ বিপ্রতিপত্তি আছে, সেই ব্যক্তি পরাজয় প্রাপ্ত হয়। নিগ্রহস্থানই  
পরাজয় লাভ। অপ্রতিপত্তি কিন্তু আরম্ভ বিধয়ে অনারম্ভ। (সে কিরূপ, তাহা  
বলিতেছেন) পর কর্তৃক স্থাপিত পক্ষকে প্রতিষেধ করে না অথবা (পরকৃত) প্রতি-  
ষেধকে উদ্ধার করে না। সমাস না করায় অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং  
অপ্রতিপত্তি, এই দুইটি শব্দের সমাস না করিয়া উল্লেখ করায় (বুঝিতে হইবে যে)  
এই দুইটিই অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে।

টীকনৌ। জ্ঞাতি-লক্ষণের পরে মহর্ষি এই স্বত্রদ্বারা তাহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের

১। তেন চ সন্দর্ভেণ দৃশ্যসমর্থং স্বব্যাঘাতকং বা বর্ণিতং। তথাচ হলাহিতিকদৃশ্যসমর্থমুত্তরং  
স্বব্যাঘাতকমুত্তরং বা জ্ঞাতিভিত্তি সূত্রিতং, সাধর্মা-সমানিতত্ত্বাঃপতাজ্ঞাত্যং তদর্থ ইত্যপি বক্তব্য—বিষয়ঃ বৃত্তিঃ।

লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। সূত্রে যে বিপ্রতিপত্তি শব্দ আছে, তাহার বাণ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—বিপরীত জ্ঞান এবং কুংসিত জ্ঞান। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সূক্ত-বিষয়ক জ্ঞান বিপরীত জ্ঞান, স্থূলবিষয়ক জ্ঞান কুংসিত জ্ঞান। অর্থাৎ যদিও কুংসিত জ্ঞানও বিপরীত জ্ঞানই, বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ ভিন্ন তাহা কুংসিত জ্ঞান হয় না, তাহা হইলেও সূক্ত বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জ্ঞানিলে তাহাকে বিপরীত জ্ঞান বলিয়াছেন, আর স্থূল বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জ্ঞানিলে তাহাকে কুংসিত জ্ঞান বলিয়াছেন। এইরূপ বিষয়ভেদেই ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তিকে বিপরীত জ্ঞান এবং কুংসিত জ্ঞান বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকারের ঐ কথার ইহাই তাৎপর্য মনে হয়। পুরোক্তপ্রকার বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান হইবে কি প্রকারে? এ জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিযুক্ত ব্যক্তি পরাজয় লাভ করে অর্থাৎ যাহার পুরোক্ত প্রকার বিপ্রতিপত্তি জন্মে, তাহার পরাজয় হয়। পরাজয় হইলেই নিগ্রহ হইল, নিগ্রহস্থান ও পরাজয়লাভ, ফলে একই কথা। সূত্রায় পুরোক্ত প্রকার বিপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলা যাইতে পারে। এবং আরম্ভ বিষয়ে আরম্ভ না করাই এখানে অপ্রতিপত্তি। বিপর্য ব্যক্তি স্বপক্ষ স্থাপনা করিলে তখন তাহার প্রতিষেধ বা খণ্ডন করিতে হইবে, অথবা প্রতিষেধ করিলে তাহার উদ্ধার করিতে হইবে, তাহা না করাই আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ, ইহা অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতই হয়, এ জন্ত ইহাকে অপ্রতিপত্তি বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি বলিয়াই মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকে যে প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণও বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক এবং কতকগুলি অপ্রতিপত্তিমূলক। এই জন্ত এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি শব্দের দ্বারাই মহর্ষি নিগ্রহস্থানগুলির সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাতও বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলা যায় না, এই কথা বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি—ইহার কোন একটির অনুমাপক ধর্ম আছে, তাহাই নিগ্রহস্থান, এই পর্য্যন্তই মহর্ষির তাৎপর্যার্থ। নিগ্রহস্থানের দ্বারা পরাজয় লাভ হয়, এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে নিগ্রহস্থানকেই পরাজয়লাভ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয় লাভের কারণ।

মহর্ষি এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি শব্দের সমাস করিয়া ‘বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্তী’ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই কেন? এইরূপ বাক্য বলিলে তাহার শব্দ-বাধবই হইত। এতদ্বন্ধে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই দুইটিই নিগ্রহস্থান নহে, ইহা সূচনা করিবার জন্তই মহর্ষি সমাস করেন নাই। তাৎপর্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন আরও নিগ্রহস্থান আছে। মহর্ষি এই সূত্রে সমাস না করিয়া

১। বাণ্যায়তবস্তুতঃ পরনিষ্ঠ বোধ্যবস্থিতমহর্ষি প্রতিজ্ঞাহানাদিগ্রহস্থানস্বাপেক্ষিত তথাপি বিপ্রতিপত্ত্য-প্রতিপত্ত্যাকরোক্তাৎপদবৎ ওকঃ ইত্যাদি।—বিখ্যাত-বৃত্তি।



গ্রন্থগৌরবের দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন নিগ্রহস্থানও এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু ইহার পরবর্তী সূত্রভাষ্যে মহর্ষি গৌতমোক্ত নিগ্রহস্থানের মধ্যে কতকগুলিকে অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়া অবশিষ্টগুলি বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান, এই কথা বলিয়াছেন। এখানে যদি বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন কোন নিগ্রহস্থানও ( তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে ) সূত্রকাহের কথিত বলিয়া ভাষ্যকারের অন্তিমত হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার ঐরূপ কথা কিরূপে বলিয়াছেন, তাহা সুদীপ্ত চিন্তা করিয়া দেখুন।

মহর্ষি এই সূত্রে ঐ স্থলে সমাস না করিয়া বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে, ইহাই সূচনা করিয়াছেন অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি পদার্থই নিগ্রহস্থান নহে, তন্মূলক প্রতিজ্ঞা-হানি প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য বুঝিলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা হয়; পরবর্তী সূত্রভাষ্যেরও সুসংগতি হয়। বস্তুতঃ মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি নিগ্রহস্থান, বিপ্রতিপত্তি পদার্থ অথবা অপ্রতিপত্তি পদার্থ নহে। উহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি বায় এবং উহার মধ্যে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক এবং কতকগুলি অপ্রতিপত্তিমূলক। বিপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকেই ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকে অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি পদার্থই নিগ্রহস্থান নহে, হতরাং সূত্রকার ও ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। বুদ্ধিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা পুঙ্খই বলা হইয়াছে। ফলকথা, বাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদী নিগৃহীত বা পরাজিত হইয়া থাকেন, তাহাই নিগ্রহস্থান। নিগ্রহস্থানের বিশেষ তত্ত্ব পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে পরিষ্কৃত হইবে। ১২।

ভাষ্য। কিং পুনর্দৃষ্টান্তবজ্জাতিনিগ্রহস্থানরোরভেদোহথ সিদ্ধান্ত-বদভেদ ইত্যত আহ।

অনুবাদ। ( প্রশ্ন ) জাতি ও নিগ্রহস্থানের কি দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা অভেদ ? অথবা সিদ্ধান্ত পদার্থের দ্বারা ভেদ আছে ? এই জন্য বলিয়াছেন—

সূত্র। তদ্বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থান-বহুত্বম্ ॥২০॥৩১॥

অনুবাদ। সেই সাধর্ম্যা ও বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানেব বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ কল্প আছে বলিয়া এবং বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্প আছে বলিয়া জাতি এবং নিগ্রহস্থানের বহুত্ব আছে অর্থাৎ জাতিও বহুপ্রকার, নিগ্রহস্থানও বহুপ্রকার।

ভাষ্য। তস্য সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিবহুত্বং তয়োশ্চ বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোর্বিকল্পান্নিগ্রহস্থানবহুত্বম্। নানাকল্পে।

বিকল্পঃ, বিবিধো বা কল্পো বিকল্পঃ। তত্রাননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা-  
বিকল্পো মতানুজ্ঞা-পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষামিত্যপ্রতিপত্তির্নিগ্রহস্থানং, শেষস্ত  
বিপ্রতিপত্তিরিতি।

ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থী উদ্ভিষ্টা যথোদ্দেশঃ লক্ষিতা যথালক্ষণং  
পরীক্ষ্যন্ত ইতি, ত্রিবিধাস্থ শাস্ত্রস্থ প্রবৃত্তির্বেদিতব্যেতি।

ইতি বাংসারানীয়ে স্তায়ভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

অনুবাদ। সেই সাধর্ম্যা ও বৈষর্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্পবশতঃ জাতির  
বহুত্ব এবং সেই বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ নিগ্রহস্থানের বহুত্ব।  
নানা কল্প বিকল্প অথবা বিবিধ কল্প বিকল্প। তন্মধ্যে অর্থাৎ বহুবিধ নিগ্রহস্থানের  
মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিকল্প, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষা,  
এইগুলি অর্থাৎ এই সকল নামে যে নিগ্রহস্থান, তাহা অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান।  
অবশিষ্ট কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থান ভিন্ন আর যে সকল নিগ্রহস্থান আছে,  
সেগুলি বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান।

এই প্রমাণাদি পদার্থগুলি অর্থাৎ প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার  
পদার্থ উদ্ভিষ্ট হইয়া উদ্দেশানুসারে লক্ষিত হইল, অর্থাৎ মহর্ষি গোতম তাঁহার  
স্তায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের  
উদ্দেশ পূর্ব্বক বথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। লক্ষণানুসারে অর্থাৎ  
পদার্থের স্বরূপানুসারে পদার্থগুলি পরীক্ষা করিবেন, এইরূপে এই শাস্ত্রের ( স্তায়  
দর্শনের ) তিন প্রকার ( উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা ) প্রবৃত্তি ( উপদেশ-ব্যাপার )  
জানিবে।

বাংসারান-প্রণীত স্তায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম তাঁহার কথিত প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার  
পদার্থের লক্ষণ বলিয়া এই লক্ষণ-প্রকরণেই শেষে আবার এই সূত্র বলিয়াছেন কেন? আর  
এখানে অস্ত্র সূত্রের প্রয়োজন কি? এতদ্বন্ধে ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির এই সূত্রটির প্রয়োজন  
ব্যাপার জন্ত একটি প্রশ্ন করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ভাংপর্থা এই  
যে, মহর্ষির শিষ্যগণের এইরূপ প্রশ্ন হওয়াতেই মহর্ষি এই সূত্রটি শেষে বলিয়াছিলেন। সেই  
প্রশ্ন এই যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান নামে যে দুইটি পদার্থের লক্ষণ বলা হইল, ঐ দুইটি পদার্থ কি



the first of these is the fact that the  
 the second is the fact that the  
 the third is the fact that the  
 the fourth is the fact that the  
 the fifth is the fact that the  
 the sixth is the fact that the  
 the seventh is the fact that the  
 the eighth is the fact that the  
 the ninth is the fact that the  
 the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the  
 the twelfth is the fact that the  
 the thirteenth is the fact that the  
 the fourteenth is the fact that the  
 the fifteenth is the fact that the  
 the sixteenth is the fact that the  
 the seventeenth is the fact that the  
 the eighteenth is the fact that the  
 the nineteenth is the fact that the  
 the twentieth is the fact that the  
 the twenty-first is the fact that the  
 the twenty-second is the fact that the  
 the twenty-third is the fact that the  
 the twenty-fourth is the fact that the  
 the twenty-fifth is the fact that the  
 the twenty-sixth is the fact that the  
 the twenty-seventh is the fact that the  
 the twenty-eighth is the fact that the  
 the twenty-ninth is the fact that the  
 the thirtieth is the fact that the

the thirty-first is the fact that the  
 the thirty-second is the fact that the  
 the thirty-third is the fact that the  
 the thirty-fourth is the fact that the  
 the thirty-fifth is the fact that the  
 the thirty-sixth is the fact that the  
 the thirty-seventh is the fact that the  
 the thirty-eighth is the fact that the  
 the thirty-ninth is the fact that the  
 the fortieth is the fact that the  
 the forty-first is the fact that the  
 the forty-second is the fact that the  
 the forty-third is the fact that the  
 the forty-fourth is the fact that the  
 the forty-fifth is the fact that the  
 the forty-sixth is the fact that the  
 the forty-seventh is the fact that the  
 the forty-eighth is the fact that the  
 the forty-ninth is the fact that the  
 the fiftieth is the fact that the

THE END OF THE FIRST VOLUME

THE SECOND VOLUME

the first of these is the fact that the  
 the second is the fact that the  
 the third is the fact that the  
 the fourth is the fact that the  
 the fifth is the fact that the  
 the sixth is the fact that the  
 the seventh is the fact that the  
 the eighth is the fact that the  
 the ninth is the fact that the  
 the tenth is the fact that the

## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	অঙ্ক	উদ্ধ
৫	কিরূপ	কিরূপে
৯	সমাংসা	সীমাংসা
২১	নির্দেশ	নির্দেশ
	ব্যাসবাক্যের	ব্যাসবাক্যের
২৮	দৃষ্টহেতু	দৃষ্টহেতু
	হইতেছে।	হইতেছে,
৩৭	“আবীক্ষিকৌ তর্কবিদা।”	আবীক্ষিকৌ তর্কবিদা।
৪০	পুরস্ক্রীণশের	পুরস্ক্রীণশের
৪০	অব্যভিচারী	ব্যভিচারী
৪৭	সং	সংস্থ
	পদার্থ	পদার্থ
৫৮	বষ্টি	ব্যষ্টি
৬১	নিবর্ত্তবতীতি	নিবর্ত্তবতীতি
	প্রমাণনি	প্রমাণানি
৬২	প্রবর্ত্তমান	প্রবর্ত্তমান
৭১	পাওয়া	পাওয়া যায়।
১০০	মহর্ষি	মহর্ষি
১০০	প্রমাণসমুচ্চয়	প্রমাণসমুচ্চয়
১০৮	জৈন	জৈন
১৪৬	নির্ভুক্ত, শব্দ	নির্ভুক্ত শব্দ,
১৪৬	সং পদার্থ	সং পদার্থ
১৪৫	অনুমান প্রমাণ	উপমান প্রমাণ
১৬১	সমস্ত সুখসাগরের	সমস্ত সুখ সুখ সাগরের
২১৫	অ গ্রহণ	অর্থ গ্রহণ
২০৪	ভেদ থাকিলে	ভেদ না থাকিলে
২৪৮	উৎপত্তিদর্শনকর্ত্তা	উৎপত্তিদর্শনকর্ত্তা
২৬৭	ব্যাপ্ত্যপদর্শকো	ব্যাপ্ত্যপদর্শকো
২৭৭	বৈদগ্ধ্যোদাহরণ	বৈদগ্ধ্যোদাহরণ
২৯৫	নাবগচ্ছ	নাবগচ্ছ



পৃষ্ঠাঙ্ক	অঙ্ক	ওক
৩০৮	প্রমাণবিষয়	প্রমাণবিষয়
৩১৫	হওয়ায়	হওয়ায়
৩২৪	বিশেষতা	বিশেষতা
৩২৬	নির্ধৃত	নির্ধৃত
৩২৭/৩৩৭	৪২ সূ.	১ সূ.
৩৩৩	তহা	তহা
৩৩৭	উপালম্ব	উপালম্ব
৩৩৯/৩৪০	৪৩ সূ.	২ সূ.
	বেয়াং	বৈয়াং
৩৪০	বিশেষণলক্ষণ	বিশেষ লক্ষণ
৩৪২	উপলব্ধি হয়	উপলব্ধ হয়
৩৬২	ব্যাপার	ব্যাপ্য
৩৬৪	ইহ	ইহা
৩৭৪	অনিত্য	অনিত্য
৩৭৬	বিশেষ্য	বিশেষ্য
৩৮৮	অতিক্রম বরায়	অতিক্রম করায়
৪০৩	সত্যো অপলাপ	সত্যের অপলাপ
৪০৬	সম্মতার্থ	সম্মতার্থ
	নিবৃত্তি ন	নিবৃত্তি



(93) ৯৩





M.E. ad  
5 28/1/77

Philosophy - Nyaya

Nyaya - Philosophy

*"A book that is shut is but a block"*

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA  
Department of Archaeology  
NEW DELHI.

Please help us to keep the book  
clean and moving.